ইসলামের ইতিহাস

দ্বিতীয় খণ্ড

মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী

ইসলামের ইতিহাস

দ্বিতীয় খণ্ড

মূল

মাওলানা আকবর শাহ্ খান নজিবাবাদী

অনুবাদক

মাওলানা আবদুল মতীন জালালাবাদী

ও

মাওলানা আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী

দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পাদনায়

আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী

অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

ইসলামের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড)
মাওলানা আকবর শাহ্ খান নজিবাবাদী
মাওলানা আবদুল মতীন জালালাবাদী ও
মাওলানা আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী অনূদিত

পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৫৮০

দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পাদনায়
আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী

ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা ঃ ২২১/১
ইফাবা প্রকাশনা : ২১০২১
ইফাবা গ্রন্থাগার : ২৯৭.০৯
ISBN : 984-06-1223-9

প্রথম প্রকাশ
জুন ২০০৩

দ্বিতীয় সংস্করণ
জুন ২০০৮
আষাঢ় ১৪১৫
জমাদিউসসানী ১৪২৯

মহাপরিচালক
মোঃ ফজলুর রহমান

প্রকাশক
মুহাম্মাদ শামসুল হক
পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭
ফোন : ৯১৩৩৩৯৪

প্রুফ সংশোধন
মোঃ আবদুল বারেক মল্লিক

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মুহাম্মদ আবদুর রহীম শেখ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭
ফোন ঃ ৯১১২২৭১

প্রচ্ছদ শিল্পী : **জসিমউদ্দিন**

মূল্য ঃ ২৩০.০০ (দুইশত ত্রিশ) টাকা

ISLAMER ITIHAS (The History of Islam Vol-2) : written by Maulana Akbar Shah Khan Nagibabadi in Urdu and translated by Maulana Abdul Matin Jalalabadi & Maulana Abdullah bin Sayeed Jalalabadi into Bangla, published by Director, Translation and Compilation Dept. Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 9133394. June 2008

Price : Tk 230.00; US Dollar : 8.00
Website : www.islamicfoundation.org.bd
E-mail : islamicfoundationbd@yahoo.com

প্রকাশকের কথা

কুরআন, হাদীস, তাফসীর, ফিক্‌হ আকাইদ প্রভৃতি ধর্মীয় গ্রন্থের অনুবাদের সাথে সাথে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ইব্‌ন ইসহাক, ইব্‌ন হিশাম এবং আল্লামা ইব্‌ন কাছীরের মত জগদ্বিখ্যাত ঐতিহাসিকদের বিরচিত ইসলামের ইতিহাস বিষয়ে প্রামাণ্য এবং নির্ভরযোগ্য বহু গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করেছে। এরই ধারাক্রমে ২০০৩ সালে প্রকাশ করা হয় বিখ্যাত ঐতিহাসিক এবং সাহিত্যিক মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী প্রণীত 'তারীখে ইসলাম' গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ 'ইসলামের ইতিহাস' দ্বিতীয় খণ্ড।

ইতিহাস জাতির দর্পণস্বরূপ। এর মাধ্যমে মানুষ জানতে পারে বিগত দিনের সাফল্য ও ব্যর্থতার ইতিকথা। আর জানতে পারে এর কারণসমূহ। তাই মানুষ ইতিহাস পাঠে সাবধানী হয়, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় বিচক্ষণতার পরিচয় দেয়, সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সচেষ্ট, উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হয়। ইতিহাসকে জাতির বিবেক বলা চলে। এটা একটা জাতির দিকদর্শন যন্ত্রের মতও কাজ করে।

ঐতিহাসিক মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী তাঁর গ্রন্থের প্রথমদিকে ইতিহাসের সংজ্ঞা, ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা, ইসলামের ইতিহাস ও সাধারণ ইতিহাস সংক্রান্ত পর্যালোচনা করেছেন। এরপর আরবদেশ, আরবদেশের অবস্থান, প্রকৃতি ও এর অধিবাসী সম্পর্কিত আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জন্ম হতে ওফাত পর্যন্ত যাবতীয় ঘটনা সবিস্তার বিধৃত হয়েছে। গ্রন্থখানির পরিসমাপ্তি ঘটেছে খুলাফায়ে রাশেদার আমলে ইসলাম প্রচার, দেশ বিজয় ও রাজ্য শাসন ইত্যাদি বিষয়ের নিখুঁত, নির্ভুল ও হৃদয়গ্রাহী উপস্থাপনার মাধ্যমে। যার ফলে গ্রন্থখানি প্রাণবন্ত, অনবদ্য ও অনিন্দ্যরূপ পরিগ্রহ করেছে। এ ধরনের একখানি মূল্যবান গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করতে পেরে আল্লাহ্ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করছি।

দ্বিতীয় খণ্ডটি অনুবাদ করেছেন মাওলানা আবদুল মতীন জালালাবাদী ও মাওলানা আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী। প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ায় এবার বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের পূর্বে পুনঃ সম্পাদনা করেছেন মাওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী এবং প্রুফ দেখেছেন মোঃ আবদুল বারেক মল্লিক। আমরা তাঁদেরকেসহ গ্রন্থখানি প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত অন্য সকলকেও জানাই মুবারকবাদ।

গ্রন্থখানি নির্ভুলভাবে প্রকাশ করার প্রচেষ্টায় কিংবা আন্তরিকতায় কোন ইচ্ছাকৃত গাফলতি করা হয়নি। তবু সুধীজনের নজরে কোন প্রমাদ পরিলক্ষিত হলে তা অনুগ্রহ করে আমাদের অবহিত করলে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করার ব্যবস্থা করা হবে ইন্‌শাআল্লাহ্।

মুহাম্মাদ শামসুল হক
পরিচালক
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সূচিপত্র

বিষয় | প্রথম অধ্যায় | পৃষ্ঠা

উমাইয়া বংশের শাসনামল

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিষয়	পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায়

উমাইয়া বংশের শাসনামল

ভূমিকা

খিলাফতে রাশিদার পর এখন আমরা বনূ উমাইয়ার শাসনকাল সম্পর্কে আলোচনা করব। খিলাফতে রাশিদার প্রথম দুইজন খলীফা না উমাইয়া বংশীয় ছিলেন, আর না হাশিম বংশীয়। তাঁদের উভয়ের খিলাফতকাল ছিল খিলাফতে রাশিদার শ্রেষ্ঠতম শাসনকাল। তৃতীয় খলীফা ছিলেন উমাইয়া বংশীয় এবং চতুর্থ খলীফা হাশিম বংশীয়। খিলাফতে রাশিদার শেষার্ধে বনূ উমাইয়া ও বনূ হাশিম উভয় গোত্রই ফিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রথমার্ধের অনুপাতে শেষার্ধকে 'একটি ব্যর্থতার যুগ' আখ্যা দেওয়া যেতে পারে– যদিও তা তৎপরবর্তী শাসনকালের তুলনায় ছিল নিশ্চিতভাবে শ্রেষ্ঠতর। কেননা ঐ সময়ে সাহাবায়ে কিরাম (রা) রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন এবং বেশির ভাগ সাহাবী তখনও জীবিত ছিলেন। শিরকের মূলোৎপাটন এবং তাওহীদ তথা একত্ববাদের প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই ইসলামের আবির্ভাব। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মানুষকে পরিপূর্ণ তাওহীদ এবং সত্যিকার সাফল্যের পথ প্রদর্শন করেছেন। মানুষের জন্য শিরকের চাইতে ক্ষতিকর এবং তাওহীদের চাইতে মঙ্গলজনক আর কিছুই হতে পারে না। শির্ক প্রকৃতপক্ষে একটি মারাত্মক জুলুম। তাই পবিত্র কুরআনে এটাকে 'জুল্‌মে 'আযীম' (চরম জুলুম) আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এর চাইতে বড় জুলুম আর কী হতে পারে যে, মানুষ তার প্রকৃত মাবূদ বা উপাস্যকে ছেড়ে ঐসব দুর্বল সত্তাকে নিজের মাবূদ বলে গ্রহণ করে, যারা সত্যিকার মাবূদের মাখলুক (সৃষ্ট) ও গোলাম ছাড়া কিছু নয়। অতএব শুধু ঐ ব্যক্তিই শির্ক করতে পারে, যে ন্যায়বিচারের পরিবর্তে জুলুম ও অবিচারকে নিজের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছে। যে বস্তুটি তাকে এই জুলুমে লিপ্ত করেছে তা হচ্ছে তার মূর্খতা এবং দুনিয়ার প্রতি তার সীমাহীন আসক্তি। কুরআনের ভাষায় এটাকে 'ইদলাল' (পথভ্রষ্টতা) আখ্যা দেওয়া হয়েছে। লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, নিজের পরিবার ও নিজের গোত্রের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের প্রতি সীমাহীন ভালবাসা এবং তাদের নাম, তাদের ছবি, তাদের মূর্তি ও তাদের কবরের প্রতি অযথা সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে শিরকের প্রচলন হয়েছে সবচেয়ে বেশি। এই সীমালংঘন ও পথভ্রষ্টতার মাধ্যমে মানুষ তার সৃষ্টিকর্তা, তার মালিক এবং তার উপাস্যকে ভুলে গিয়ে নিজের সর্বনাশ সাধন করেছে। পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) শিরকের সম্ভাব্য পথসমূহ রুদ্ধ করতে গিয়ে মানুষকে বিরত রেখেছেন গোত্রীয় পক্ষপাতিত্বের প্রেম-ভালবাসা থেকেও। অপর যে জিনিসটি মানুষকে 'জুল্‌মে 'আযীম' তথা শিরকের মধ্যে নিক্ষেপ করতে

পারে এবং চিরদিন করেও আসছে তা হলো দাম্ভিকতা ও অযথা গর্ববোধ। এটাই ইবলীসকে অভিশপ্ত শয়তানে পরিণত করেছে এবং এটাই অধিকাংশ মানুষকে সরল পথ থেকে হটিয়ে ধ্বংসের পথে চালিত করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই ধ্বংসাত্মক শিরকী উপাদানসমূহ দূর করার জন্য মক্কা বিজয়ের দিন কা'বা ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে মক্কার সমগ্র অধিবাসী এবং আরবের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের বিশাল সমাবেশে উপস্থিত জনতাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন ঃ

يا معشر قريش! ان الله قد اذهب منكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالاباء الناس من ادم وادم خلق من تراب

"হে কুরাইশ বংশের লোকেরা ! আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের থেকে জাহিলিয়া যুগের দাম্ভিকতা এবং পূর্বপুরুষদের নিয়ে গর্ব করাকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। সমগ্র মানুষ আদমের সন্তান এবং আদম মাটি থেকে সৃষ্ট। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

قَالَ اللهُ تَعَالٰى يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَّجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ط اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ اَتْقٰكُمْ –

"হে মানুষ ! আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে অধিক মুত্তাকী" (৪৯ ঃ ১৩)।

উক্ত ভাষণে বংশগত ও গোত্রগত দাম্ভিকতা এবং শিরকের আশংকাসমূহ দূর করে তাওহীদের রং-এ রঞ্জিত হওয়ার প্রতিই আহবান জানানো হয়েছে। তাই বলে বংশ ও গোত্রের অস্তিত্ব এবং তার বৈশিষ্ট্যসমূহ অস্বীকার করা হচ্ছে না। এখানে যা বলা হচ্ছে তা এই, বুযুর্গী ও কৌলীন্য বংশ ও গোত্রের সাথে সম্পর্কিত নয়, বরং এটা সম্পর্কিত শুধু তাক্ওয়া ও পরহিযগারীর সাথে। প্রত্যেক ব্যক্তি মুত্তাকী ও আল্লাহ্ওয়ালা হয়ে নিজেকে সম্মান ও আভিজাত্যের অধিকারী করতে পারে। আবার যে কোন গোত্রের যে কোন লোক আপন অসদাচরণের কারণে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হতে পারে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই সহজ ও সরল পথে মানুষকে পরিচালিত করেছেন, আর এ পথে চলেই মানুষ দুনিয়া-আখিরাতের সাফল্যের অধিকারী হতে পারে। খিলাফতে রাশিদার প্রথমার্ধে পূর্বের পরিত্যাজ্য পথভ্রষ্টতা ও গোত্রগত পক্ষপাতিত্বের সাথে মুসলমানদের কোন সম্পর্ক ছিল না। কাফ্রী বিলালকে কুরায়শের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা 'সাইয়িদ' (আমার নেতা) বলে সম্বোধন করতেন এবং (তাঁর) পুণ্যকর্মের কারণে তাঁকে নিজেদের থেকে অধিক সম্মানিত ও অভিজাত মনে করতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক উসামা ইব্ন যায়দের নেতৃত্বাধীনে অভিজাত বংশের গণ্যমান্য মুহাজির ও আনসারদেরকে যুদ্ধে প্রেরণের মধ্যে যে হিকমত বা রহস্য লুকায়িত ছিল তা হলো এই যে, কারো অন্তরে যেন এই ধারণা আর বাকি না থাকে যে, শুধু জাতি, বংশ কিংবা গোত্রের কারণে মানুষ সম্মানের অধিকারী হতে পারে। হুকুমত ও খিলাফত যদি কোন বিশেষ বংশ বা বিশেষ গোত্রের অধিকার

হতো তাহলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিভিন্ন প্রদেশ ও বিভিন্ন অঞ্চলের প্রশাসনিক দায়িত্বে বনূ হাশিম ছাড়া অন্য কোন গোত্রের লোককে নিয়োগ করতেন না। সেনাবাহিনীর অধিনায়কত্বও বনূ হাশিমের লোক ছাড়া অন্য কারো ভাগ্যে জুটত না। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, তিনি (রাসূলুল্লাহ্) বনূ হাশিমের খুব কম সংখ্যক লোককেই সেনাবাহিনীর অধিনায়ক কিংবা কোন প্রদেশ ও অঞ্চলের প্রশাসক নিয়োগ করেছেন। তিনি সব সময়ই ব্যক্তিগত যোগ্যতা অনুযায়ী মানুষকে নেতৃত্বে বা প্রশাসনিক পদে অধিষ্ঠিত করেছেন। কোন বংশ বা গোত্রের সাথে সম্পর্কিত থাকাকে তিনি নেতৃত্বের জন্য একটি বৈধ অধিকার হিসেবে কখনো গণ্য করেন নি। এ কারণেই নবী করীম (সা)-এর দরবারে ক্রীতদাসরা পর্যন্ত আপন আপন ব্যক্তিগত যোগ্যতার কারণে কুরায়শের গণ্যমান্য ব্যক্তিবৃন্দ সম্বলিত বিরাট বাহিনীর উপর নেতৃত্ব লাভ করতে পারত। আর পরিপূর্ণ তাওহীদ শিক্ষাদানকারী শুধু একজন কামিল উস্তাদের কাছ থেকেই এ ধরনের সুন্দর ও ন্যায়ভিত্তিক ব্যবহার আশা করা যেতে পারে।

বনূ উমাইয়া ও বনূ হাশিম গোত্রের মধ্যে প্রথম থেকেই এক ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা রেষারেষি চলে আসছিল। তাদের প্রত্যেকেই একে অপরের উপর প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা করত। খুব সম্ভব এ কারণেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবুয়তের প্রথম দিকে (যেহেতু তিনি বনূ হাশিম গোত্রের লোক ছিলেন) বনূ উমাইয়ার লোকেরাই তাঁর কঠোর বিরোধিতা করেছে এবং বনূ হাশিমের লোকেরা তাঁকে সাহায্য-সহায়তা করেছে অপেক্ষাকৃত বেশি। যখন আরব দেশ থেকে মুশরিকদের মূলোৎপাটন করা হলো, বনূ উমাইয়া ও হাশিম গোত্রের বিদ্বেষী মুশরিকরা নিহত হলো বাকি সবাই আশ্রয় গ্রহণ করল ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে তখন এই নবদীক্ষিত মুসলিমদের মধ্যে উমাইয়া গোত্রের যথেষ্ট সংখ্যক প্রতিভাধর ও সুযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের এই প্রতিভা ও যোগ্যতার প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করেন। তিনি মক্কা বিজয়ের দিন আবূ সুফিয়ানের ঘরকে নিরাপদ ঘোষণা করে তাঁকে সম্মানিত করেন। উমাইয়া গোত্রের উসমান (রা) ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জামাতা। তাঁর উপলক্ষেই 'বায়আতে রিদওয়ান' অনুষ্ঠিত হয়। উম্মুল মু'মিনীন উম্মে হাবীবা (রা)-ও ছিলেন উমাইয়া গোত্রের মেয়ে তথা আবূ সুফিয়ানের কন্যা ও মু'আবিয়ার বোন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ সুফিয়ানকে নাজরানের গভর্নর নিয়োগ করেছিলেন। উসমান ইব্ন আবুল 'আস (রা) ছিলেন উসমান (রা)-এর চাচা। তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাইফ ও তাঁর পার্শ্ববর্তী এলাকার গভর্নর নিয়োগ করেছিলেন। পরবর্তীকালে ফারূকে আযম তাঁকে আম্মান ও বাহরাইনের শাসনকর্তা নিয়োগ করেছিলেন। আত্তাব ইব্ন উসাইদ আবূ সুফিয়ানের চাচা আবুল ঈসের নাতি ছিলেন। তিনি মক্কা বিজয়ের দিন মুসলমান হন এবং সেখানকার শাসক নিযুক্ত হন। খালিদ ইব্ন সাঈদ আবূ সুফিয়ানের চাচা। মহানবী (সা) তাঁকে ইয়ামানের গভর্নর নিয়োগ করেন এবং তিনি ইয়ারমুকের যুদ্ধে শহীদ হন। উসমান ইব্ন সাঈদকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) খায়বারের এবং তাঁর ভাই আবানকে বাহরাইনের শাসক নিয়োগ করেছিলেন। যদি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অন্তরে বনূ উমাইয়া ও বনূ হাশিমের পুরাতন শত্রুতার কারণে তাদের প্রতি কোন আক্রোশ থাকত এবং তিনি ব্যক্তিগত যোগ্যতার উপর বংশগত ও গোত্রগত সম্বন্ধকে প্রাধান্য দিতেন তাহলে তিনি বনূ উমাইয়ার উল্লিখিত ব্যক্তিদেরকে বিভিন্ন দেশের প্রশাসক নিয়োগ করতেন না। আসল কথা

হলো, তিনি কখনো ব্যক্তিগত যোগ্যতার উপর বংশগত বৈশিষ্ট্যকে প্রাধান্য দিতেন না। তবে হ্যাঁ, তিনি এই পর্যন্ত বংশগত বৈশিষ্ট্যকে স্বীকৃতি দিতেন যে, যে সব বংশ ও গোত্রের মধ্যে নেতৃত্বের যোগ্যতা সর্বদা বিদ্যমান ছিল, প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন ও সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব প্রদানের যোগ্য লোক খুঁজতে গিয়ে তিনি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ঐ সব বংশ বা গোত্রেরই শরণাপন্ন হতেন। যেহেতু উমাইয়া ও হাশিম গোত্রের মধ্যকার পুরাতন রেষারেষি, ইসলাম সবেমাত্র মুছে দিয়েছিল তাই তখন সতর্কতার দাবি অনুযায়ী উচিত ছিল খিলাফতের ব্যাপারে তাদের আরো কিছুদিন কোন সুযোগ-সুবিধা না দেওয়া যাতে তারা তাদের সেই পুরাতন রেষারেষি চিরতরে ভুলে যাবার অবকাশ পায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন এবং শুধু যোগ্যতার ভিত্তিতে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে সালাতের ইমামতির দায়িত্ব দিয়ে, তাঁর (রাসূলুল্লাহ্) পরে তিনিই যে খলীফা হওয়ার সর্বাধিক যোগ্য ব্যক্তি, সেদিকে ইঙ্গিত করেছিলেন এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সাহাবায়ে কিরামও তাঁর সেই অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত যথার্থভাবে হৃদয়ঙ্গম করে তদনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন। অনুরূপভাবে আবূ বকর সিদ্দীক (রা)ও তাঁর পরে এমন স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করেন যিনি ছিলেন যোগ্যতার দিক দিয়ে সবার উপরে, অথচ উল্লিখিত দু'টি গোত্রের কোনটির সাথেই তাঁর সম্বন্ধ ছিল না। অনুরূপভাবে হযরত উমর ফারূক (রা)-এর পর যদি আবূ উবায়দা ইব্‌নুল জার্‌রাহ্ (রা) অথবা আবূ হুযায়ফার আযাদকৃত গোলাম সালিম-এর মধ্যে কোন একজন খলীফা হতেন, যেমন হযরত উমর ফারূক (রা)-এর আকাঙ্ক্ষা ছিল, তাহলে ঐ মৃত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও রেষারেষি পুনরুজ্জীবিত হতো না। কিন্তু উমর ফারূক (রা)-এর পূর্বেই ঐ দু'ব্যক্তি ইনতিকাল করেন।

এরপর যে ছয়জন সাহাবীকে নিয়ে মজলিসে শূরা তথা 'খলীফা নির্বাচক কমিটি' গঠিত হয়েছিল তাঁরা যদি নিজেদের মধ্য থেকে একজন খলীফা নির্বাচনের ক্ষেত্রে উপরোক্ত নীতি অনুযায়ী কাজ করতেন অর্থাৎ উমাইয়া ও হাশিম গোত্রের কাউকে খলীফা না বানাতেন তাহলে সম্ভবত সেই বিশৃঙ্খলা দেখা দিত না, যা পরবর্তীকালে দেখা দিয়েছিল এবং অন্ততপক্ষে এই দুই গোত্রের লোকেরা তাদের ভুলে যাওয়া বিদ্বেষ পুনরায় স্মরণ করার সুযোগ পেত না। যদি আলী (রা) উমর ফারূক (রা)-এর পর খলীফা হতেন তাহলেও ঐ আগুন পুনরায় প্রজ্বলিত হবার সুযোগ লাভের আশংকা ছিল না। কেননা আলী (রা) সম্পর্কে এরূপ আশা ছিল যে, তিনি খিলাফত ও রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে বনূ হাশিমের লোকদেরকে সেরূপ অস্বাভাবিক ও দৃষ্টিকটু কোন সুযোগ-সুবিধা দিতেন না, যেরূপ হযরত উসমান (রা) বনূ উমাইয়ার লোকদেরকে দিয়েছিলেন। যাহোক আমাদের এ বিশ্বাস অবশ্যই রাখতে হবে যে, যা ঘটেছিল তা আল্লাহ্‌র ইচ্ছাতেই ঘটেছিল এবং সেরূপ ঘটাই ছিল স্বাভাবিক। কেননা আমাদের কাছে এমন কোন কষ্টিপাথর নেই, যার সাহায্যে আমরা বলতে পারি যে, ঘটনাটি যেরূপ ঘটেছে সেরূপ না ঘটে অন্যরূপ ঘটলেই সব দিক দিয়ে মঙ্গলজনক হতো। একথা আমরা অবশ্যই বলতে পারি যে, বনূ হাশিম ও বনূ উমাইয়ার পরস্পর রেষারেষি ইসলামী যুগে পুনরুজ্জীবিত হয়ে দীর্ঘদিন অস্তিত্বশীল থাকার কারণে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ্‌র যে ক্ষতি হয়েছিল তা ছিল অত্যন্ত মারাত্মক। আজও যারা এই বিদ্বেষ জীবন্ত রাখার পক্ষপাতী বা যারা কোন বংশ অথবা গোত্রের সম্বন্ধকে খিলাফতের জন্য অপরিহার্য মনে করেন তারা নিঃসন্দেহে ইসলামী শিক্ষার

ঘোর বিরোধী। আর তাদের দ্বারা যে ইসলামের মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে তাতেও সন্দেহের অবকাশ নেই।

বনূ উমাইয়া তাদের ব্যক্তিগত যোগ্যতার কারণে প্রথম থেকেই ইসলামী খিলাফত কাঠামোর একটি অপরিহার্য অঙ্গে পরিণত হয়েছিল। হযরত উসমান (রা) খলীফা হওয়ার পর তাঁর নম্র স্বভাব এবং তাঁর দ্বারা মারওয়ান ইবনুল হাকামকে প্রদত্ত ক্ষমতার সুযোগ নিয়ে বনূ উমাইয়া তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি অতি অল্প সময়ের মধ্যে এমনভাবে বৃদ্ধি করে যে, তা সমগ্র ইসলামী বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে এবং সেই সাথে তারা সমগ্র আরবের উপর তাদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় জোর তদবীরও চালাতে থাকে। হযরত উসমান (রা)-এর শাহাদত লাভ এবং সেই সাথে মুনাফিক ও মুসলিম নামধারী ইহুদীদের ষড়যন্ত্র বনূ উমাইয়ার জন্য তাদের লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে সহায়কই প্রমাণিত হয়। হযরত আলী (রা)-কে তাঁর খিলাফত আমলে এ কারণেও বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় যে, তিনি বনূ হাশিমের লোক ছিলেন। তখন সমগ্র আরববাসীর চোখে বনূ হাশিম ও বনূ উমাইয়ার মধ্যকার বিদ্বেষের ছবি ভাসতে শুরু করেছিল। তাই মুআবিয়া (রা) ও বনূ উমাইয়ার বিরুদ্ধে আলী (রা) যে ব্যবস্থাই অবলম্বন করতেন, ঐ রেষারেষির দিকে লক্ষ্য করে তারা তাতে পুরোপুরিভাবে তাঁর পক্ষাবলম্বন করত না। কেননা তারা দুই গোত্রের পুরাতন শত্রুতার পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্রে কোন ধরনের ভূমিকাই পালন করতে চাইতেন না। যদি হযরত আলী (রা)-এর স্থলে অন্য কোন অ-হাশিমী ব্যক্তি খলীফা হতেন তাহলে তিনি নিশ্চিতভাবেই আরব গোত্রসমূহের অধিকতর সাহায্য-সহযোগিতা লাভ করতেন। স্বয়ং আলী (রা)-এর পরিবর্তে যদি অন্য কোন অ-হাশিমী ব্যক্তি খলীফা হতেন তাহলে তিনি আমীরে মুআবিয়া (রা)-কে পরাস্ত করতে এবং বনূ উমাইয়াকে সঠিক পথে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে আরো গুরুত্বপর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারতেন এবং ঐ অ-হাশিমী খলীফার শাসন সফল করার ক্ষেত্রে নিজের শক্তি ও প্রতিপত্তি আরো বেশি কাজে লাগাতে পাতেন।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে হযরত ইমাম হাসান (রা)-এর সেই কথাগুলো মনে পড়ে, যা তিনি তাঁর অন্তিম মুহূর্তে হযরত ইমাম হুসাইন (রা)-কে ওসীয়তস্বরূপ বলেছিলেন ঃ

"রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পর খিলাফত যখন হযরত আলী (রা) পর্যন্ত এসে পৌঁছল তখন তরবারিসমূহ খাপ থেকে বেরিয়ে পড়ল এবং বিবাদেরও কোন মীমাংসা হলো না। এখন আমি ভালোভাবে বুঝতে পারছি, নবুয়ত ও খিলাফত আমাদের বংশে একত্রিত হতে পারে না।"

হযরত ইমাম হাসান (রা)-এর এই কথাগুলো সুদীর্ঘ চৌদ্দশ বছর পর আজ পর্যন্ত সত্যই রয়ে গেছে। খিলাফতে রাশিদার পর বনূ উমাইয়া দামিশকে রাজধানী প্রতিষ্ঠার প্রায় নব্বই বছর সমগ্র ইসলামী বিশ্বকে শাসন করেছে। স্পেনেও কয়েকশ বছর তাদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। বাগদাদকেন্দ্রিক বনূ আব্বাসের শাসনও পাঁচশ বছরের অধিককাল স্থায়ী হয়েছিল। বনূ আব্বাস নিঃসন্দেহে বনূ হাশিমের অন্তর্ভুক্ত, তবে তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চাচার বংশধর— তাঁর কন্যার বংশধর ছিল না, যাদেরকে 'সাদাত' বা' খান্দানে 'নবুওয়াত' বলা যেতে পারে। কেননা তাদের সাথেই হযরত ফাতিমা (রা)-এর মাধ্যমে খোদ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রক্ত সম্বন্ধ রয়েছে। কিন্তু আব্বাসীদের সাথে খোদ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সরাসরি কোন রক্ত সম্বন্ধ নেই।

অতএব আব্বাসী বংশকে 'খান্দানে নবুওয়াত' বলা যেতে পারে না। মিসরের একটি রাজবংশ নিজেদেরকে ফাতিমী বলে দাবি করেছে, কিন্তু পর্যালোচকদের দৃষ্টিতে তাদের সে দাবি ভুয়া। হিন্দুস্তানেও এমন একটি রাজবংশ ছিল, যাদেরকে 'খান্দানে সাদাত' বা সাইয়িদ বংশ নামে অভিহিত করা হয়। কিন্তু একথা দিবালোকের মত সত্য যে, মুলতানের শাসক খিযির খান, যাকে ঐ বংশের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়, তিনি মোটেই সাইয়িদ ছিলেন না। 'সাইয়িদ' উপাধিতে তাঁর ভূষিত হওয়ার একমাত্র কারণ এই ছিল যে, জনৈক বুযুর্গ সূফী তাকে 'সাইয়িদ' (সর্দার অর্থে) বলে সম্বোধন করেছিলেন। আজকালও লোকেরা মুঘল এবং পাঠান সর্দারদেরকে 'সাইয়িদী' (আমার নেতা) বলে সম্বোধন করে থাকে। মোটকথা, আজ পর্যন্ত সাইয়িদ বংশের কোন স্বাধীন রাষ্ট্র বা সাম্রাজ্য বিশ্বের কোথাও প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। ইতিহাসের এই বাস্তবতার সাথে ইমাম হাসান (রা)-এর অন্তিম বাক্যের যে অপূর্ব মিল রয়েছে তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

জীবনের অন্তিম মুহূর্তে ইমাম হাসান (রা) আপন ভাই ইমাম হুসাইন (রা)-কে যা বলেছিলেন তা শুধু তাঁরই ইজতিহাদ বা ইলহাম ছিল না, বরং সাহাবীদের ঐ সমগ্র দলটি যাঁরা দীর্ঘদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংসর্গে থাকার সুযোগ পেয়েছিলেন–একথা ভালোভাবে জানতেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন হাশিমীকে না, কোন প্রদেশের স্বাধীন শাসক নিয়োগ করেছিলেন, আর না নিয়োগ করেছিলেন কোন বিরাট বাহিনীর স্বাধীন ও দায়িত্বশীল অধিনায়ক। মূতা যুদ্ধে তিনি জা'ফর ইব্ন আবূ তালিব (রা)-কে অধিনায়কের তালিকায় রেখেছিলেন সত্যি, তবে তাও নিজের মুক্তদাস যায়দ ইব্ন হারিসার পরের নম্বরে। নবী করীম (সা) আলী (রা)-কে কিছুদিনের জন্য ইয়ামানের খারাজ (কর) আদায়ের দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন, কিন্তু সামরিক ও প্রশাসনিক কোন দায়িত্ব দেন নি বরং তখন এই সব দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল হযরত মুআয ইব্ন জাবাল ও আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-এর উপর। অনুরূপভাবে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক ও হযরত উমর ফারূক (রা)-ও বনূ হাশিমকে কোন দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করেন নি। অথচ একথা কে না জানে যে, এ দুই খলীফাই বনূ হাশিমকে অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার চোখে দেখতেন এবং তাদের সুযোগ-সুবিধার দিকেও সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। তাঁরা যে কোন ব্যাপারে বনূ হাশিমের গণ্যমান্য লোকদের কাছ থেকে পরামর্শ নিতেন এবং প্রধানত তাদের পরামর্শের উপরই ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা গৃহীত হতো।

ফারূকে আযম (রা) তো প্রসঙ্গক্রমে একবার পরিষ্কার বলেই ফেলেছিলেন, বনূ হাশিম যদি নবুয়তের মর্যাদার সাথে সাথে হুকুমতেরও অধিকারী হয়, তাহলে তারা জনসাধারণকে তাদের প্রতি সীমাতিরিক্ত বাধ্য ও অনুগত দেখে 'বংশগত দাম্ভিকতায় আক্রান্ত হয়ে পড়বে। ফলে তারা ইসলামের প্রকৃত রূহকে ধ্বংস করে নিজেরাও ধ্বংস হয়ে যাবে। একদা তিনি বলেছিলেন, যে ব্যক্তি জাহিলিয়া যুগের সাম্প্রদায়িকতার প্রতি উস্কানি দেয় সে অবশ্যই হত্যাযোগ্য। আরেকবার তিনি এও বলেছিলেন, যদি কেউ আপন আত্মীয়তা বা বন্ধুত্বের কারণে কোন ব্যক্তিকে আমীর বা হাকিম (শাসক) নিয়োগ করে এমতাবস্থায় যে, এই পদের জন্য মুসলমানদের মধ্যে তাঁর চাইতেও যোগ্য ব্যক্তি রয়েছেন তাহলে সে আল্লাহ্, আল্লাহ্র রাসূল ও সমগ্র মুসলমানের কাছে প্রতারক হিসেবে গণ্য হবে।

মোটকথা, শুধু ইমাম হাসান (রা)-এরই ধারণা ছিল না যে, নবী বংশের জন্য নবুয়তের মর্যাদাই যথেষ্ট এবং এই মর্যাদার সাথে হুকুমতের (রাজ্য শাসন) একত্রিত হওয়া উচিত নয়–বরং বেশির ভাগ সাহাবীরই এই ধারণা ছিল। প্রকৃত পক্ষে দুনিয়া থেকে শির্‌ক ও শিরকের আশংকাসমূহ দূর করার মহান দায়িত্বে নিয়োজিত 'সাদাতে ইযাম' তথা রাসূল-বংশের লোকদের, দুনিয়ার হুকুমত ও পার্থিব সম্পদের প্রতি আসক্তি থাকা উচিতও নয়, যাতে তাঁরা নিজেদেরকে আলে রাসূল [মুহাম্মদ (সা)-এর বংশধর] হওয়ার প্রমাণ হাতে-কলমে পেশ করতে পারেন। যদি রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই নির্দেশ না দিতেন যে, 'সাদাতে ইযাম-এর জন্য সাদাকা (যাকাত গ্রহণ) হারাম তাহলে আমাদের এই ধারণা হতে পারত যে, 'সাদাত' (নবী বংশই) খিলাফত তথা রাষ্ট্র পরিচালনার অধিকারী। কিন্তু রাসূল কর্তৃক আপন বংশের জন্য সাদাকা হারাম করাটা একথারই প্রমাণ যে, পার্থিব হুকুমত, সাম্রাজ্য ইত্যাদির সাথে সম্পর্কহীন থাকার বিষয়টি তিনিই প্রথম তাঁর বংশের জন্য বেছে নিয়েছেন অথবা ইলহামে ইলাহীর মাধ্যমে জেনে নিয়েছেন। আসলে পার্থিব সম্পদ ও সাম্রাজ্য এমনই বিষয় যা মানুষকে আল্লাহ্ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, আর একারণেই কুরআন ও হাদীসে পার্থিব সম্পদকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে। ইতিহাস আমাদের সামনে এ তথ্য প্রকাশ করে যে, দওলত ও হুকুমতের কারণে সঠিক জ্ঞানও মানুষকে 'আমালে সালিহা' (পুণ্যকর্ম)-তে উদ্বুদ্ধ করতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে দীন ইসলামের হিফাযত তাঁরাই করেছেন, যারা সম্পদ ও রাষ্ট্রের সাথে খুব একটা সম্পর্ক রাখতেন না। আর এ ধরনের লোকই কিয়ামত পর্যন্ত ইসলামের হিফাযত করতে থাকবেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, "ইসলাম গরীবদের মধ্যেই কার্যকর হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত গরীবদের মধ্যেই অব্যাহত থাকবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ঐ হাদীসটিও বিশেষভাবে লক্ষণীয় ঃ আমি তোমাদের মধ্যে কুরআন এবং আমার 'আলে' (পরিবার) রেখে যাচ্ছি।" এ থেকেও পরিষ্কার প্রমাণিত হয় যে, ইমাম হাসান (রা) হাদীসের মর্মানুসারেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন ঃ "আমি ভালোভাবে জানি যে, নবুয়ত ও খিলাফত আমাদের বংশে একত্রিত হতে পারে না।"

হযরত আমীরে মুআবিয়া (রা)

প্রাথমিক অবস্থা

হযরত আমীরে মুআবিয়া (রা) হিজরতের সতের বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। অর্থাৎ তিনি বয়সের দিক দিয়ে হযরত আলী (রা)-এর ছয় বছরের ছোট ছিলেন। আমীরে মুআবিয়া (রা)-এর মা হিন্দা বিনতে উতবার প্রথম বিবাহ হয় কুরায়শ বংশীয় ফাকাহ্ ইব্‌ন মুগীরার সাথে। একদা হিন্দা-এর চরিত্র (সতীত্ব) সম্পর্কে ফাকাহ্‌র মনে সন্দেহ জাগে। তাই সে গলা ধাক্কা দিয়ে তাকে ঘর থেকে বের করে দেয়। বিষয়টি নিয়ে সাধারণ্যে চর্চা হতে থাকে। তখন হিন্দার পিতা উতবা মেয়েকে বলল, তুমি আমাকে সত্যি করে বল, আসল ঘটনা কি ? তোমার বিরুদ্ধে ফাকাহ্‌র অপবাদ যদি সত্যি হয় তাহলে দুর্ণাম থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমি ফাকাহ্‌কে হত্যার ব্যবস্থা করব। আর যদি সে মিথ্যাবাদী হয় এবং অকারণে তোমার দুর্ণাম রটায় তাহলে আমরা এ ব্যাপারে কোন কাহিন (গণক ভবিষ্যৎ বক্তা)-এর শরণাপন্ন হব। তখন

হিন্দা নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের জন্য পিতার সামনে কঠিন শপথ করে এবং তাঁর বিরুদ্ধে উথাপিত ঐ অভিযোগ সর্বতোভাবে অস্বীকার করে। উতবা তাঁর মেয়ের নির্দোষিতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে ফাকাহ্ ইব্ন মুগীরাকে আপন গোত্রের (বনূ মাখযূমের) কিছু লোক সঙ্গে নিয়ে ইয়ামানের জনৈক কাহিনের কাছে যেতে বাধ্য করে। অনুরূপভাবে উতবা ইব্ন রাবীআ ও তাঁর সাথে আবদে মানাফের কিছু লোক হিন্দা ও তার এক বান্ধবীকে নিয়ে ঐ কাহিনের কাছে যায়। উভয় পক্ষই কাহিনকে বলে, আপনি এই দু'টি স্ত্রীলোক সম্পর্কে ধ্যান করে দেখুন।

কাহিন প্রথমে হিন্দা-এর বান্ধবীর কাছে গেল এবং তার উভয় কাঁধে মৃদু আঘাত করে বলল, উঠে পড়। এরপর হিন্দার কাছে গিয়ে তার কাঁধে আঘাত করে বলল, না তুমি কোন পাপ করেছ, আর না ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছ। তুমি একটি বাদশাহ্র জন্ম দেবে, যার নাম হবে মুআবিয়া। ফাকাহ্ এই কথা শোনামাত্র হিন্দাকে ধরে ফেলল। কিন্তু হিন্দা ঝটকা মেরে ফাকাহের হাত দূরে ঠেলে দিয়ে বলল, যদি আমার ঘরে কোন বাদশাহ্র জন্ম হয় তাহলে সে বাদশাহ্র জন্ম তোমার বীর্যে হবে না। যাহোক এই নির্দোষিতা প্রমাণিত হওয়ার পর হিন্দা ফাকাহের সাথে আর কোন সম্পর্ক রাখেনি। এরপর আবূ সুফিয়ান হিন্দাকে বিবাহ করে এবং তাঁরই ঔরসে মুআবিয়ার জন্ম হয়।

মুআবিয়ার জন্মের সময় আবূ সুফিয়ানের বয়স চল্লিশ বছরের কিছু উর্ধ্বে ছিল। আবূ সুফিয়ানের বয়স ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চাইতে দশ বছর বেশি। শিশু বয়সেই আমীরে মুআবিয়ার মধ্যে এমন কিছু লক্ষণ পাওয়া যেত যার কারণে লোকেরা তাঁকে 'কিসরা-ই আরব' (আরব সম্রাট) বলে সম্বোধন করত। তাঁর বুদ্ধিমত্তা, ধীরতা, স্থিরতা ও দূরদর্শিতার বিশেষ খ্যাতি ছিল। তিনি ছিলেন দীর্ঘাকৃতির এবং লালিমা মিশ্রিত শুভ্র বর্ণের। তাঁর চেহারা ছিল সুন্দর ও আকর্ষণীয়, তবে এমন গাম্ভীর্যপূর্ণ যে, যে কেউ তাঁর ধারে ঘেঁষতে সাহস পেত না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুআবিয়াকে দেখে বলেছিলেন, এ হচ্ছে আরবের 'কিসরা' (সম্রাট)। যেদিন মুআবিয়া তোমাদের থেকে অন্তর্হিত হবে সেদিন তোমরা দেখবে, অনেক মস্তক দেহ থেকে পৃথক করা হচ্ছে। ভুঁড়ি বেড়ে যাওয়ার কারণে তিনি মিম্বরের উপর বসে খুতবা দিতেন। বসে বসে খুতবা দেওয়ার প্রচলন আমীরে মুআবিয়া (রা) থেকেই হয়েছে। তিনি অত্যন্ত লেখাপড়া জানা লোক ছিলেন। মক্কা বিজয়ের দিন তিনি তাঁর পিতা আবূ সুফিয়ানের সাথে পঁচিশ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাত পর্যন্ত তিনি তাঁর সংসর্গে থাকেন। তিনি হুনায়ন যুদ্ধ এবং তাইফ অবরোধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কায় উমরা পালনের পর যখন মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হন তখন আমীরে মুআবিয়াও তাঁর সাথে ছিলেন। মদীনায় পৌঁছে তিনি ওহী লেখার কাজে নিযুক্ত হন। ওহী লেখা ছাড়াও বহিরাগত প্রতিনিধিদলকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন এবং তাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাপনার দায়িত্বও রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর উপর অর্পণ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাতের পর প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর (রা) যখন আমীরে মুআবিয়ার ভাই ইয়াযীদ ইব্ন আবূ সুফিয়ানকে একটি বাহিনীসহ সিরিয়ায় প্রেরণ করেন তখন তাঁর সাথে যে সহায়ক বাহিনী পাঠান তার অধিনায়ক তাঁকেই নিযুক্ত করেন। সিরিয়ার বিজয় অভিযানে অগ্রবর্তী বাহিনীর অধিনায়ক

হিসাবে তিনি অত্যন্ত কৃতিত্বের পরিচয় দেন। আর তখন থেকেই একজন বীর সৈনিক হিসাবে তিনি সর্বত্র খ্যাতি লাভ করেন। ফারূকে আযম (রা) তাঁকে জর্দানের স্বতন্ত্র শাসক নিয়োগ করেন। 'ত্বা-উনে আম ওয়াসে' (আমওয়াস মহামারীতে) যখন হযরত আবূ উবায়দা, ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান প্রমুখ ইনতিকাল করেন তখন ফারূকে আযম (রা) মুআবিয়াকে তাঁর ভাই ইয়াযীদের পদে অর্থাৎ সিরিয়ার গভর্নর পদে নিয়োগ করেন। জর্দান এবং তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য জেলাও তাঁরই শাসনাধীনে থাকে। ফারূকে আযম (রা) যখন বায়তুল মুকাদ্দাসে যান তখন মুআবিয়াও অগ্রসর হয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। সেখানে হযরত উমর (রা)-এর অবস্থানকালীন সময়ে তিনিও তাঁর সাথে সাথে থাকেন। তখন ফারূকে আযম (রা) তাঁর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন করেন যে, তুমি রাজা-বাদশাহদের চালচলন গ্রহণ করেছ এবং দ্বাররক্ষীও নিয়োগ করেছ। তিনি উত্তর দেন, সিরিয়া সীমান্তে সব সময়ই কায়সারের সেনাবাহিনী মোতায়েন রয়েছে। তাই যে কোন সময় আমাদের উপর তাদের আক্রমণের আশংকা রয়েছে। তাছাড়া কায়সারের গুপ্তচররা সিরিয়ার সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। এমতাবস্থায় কায়সার এবং খ্রিস্টানদের ভীত-সন্ত্রস্ত রাখার জন্য বাহ্যিক শৌর্যবীর্যের এবং কায়সারের গুপ্তচর থেকে নিরাপদ থাকার জন্য দ্বাররক্ষীর প্রয়োজন রয়েছে বলে আমি মনে করি। এই উত্তর শুনে ফারূকে আযম (রা) তাঁর উপর থেকে উপরোক্ত অভিযোগ প্রত্যাহার করেন।

আমীরে মুআবিয়া ফারূকে আযম (রা)-এর কাছে নৌহামলার অনুমতি প্রার্থনা করেন যাতে কনসটান্টিনোপল ও রোম সাগরের দ্বীপসমূহের উপর নৌহামলা পরিচালনা করা যায়। কিন্তু ফারূকে আযম (রা) তাঁকে অনুমতি দেননি। ফারূকে আযমের পর হযরত উসমান (রা) খলীফা হলে তিনি তাঁকে সিরিয়া ও তৎসংশ্লিষ্ট এলাকাসমূহের শাসক নিয়োগ করেন। তিনি (মুআবিয়া) (রা) সমগ্র সিরিয়া নিজ দখলে ও শাসনাধীন এনে সেখানকার শাসন ব্যবস্থা খুব মজবুত এবং সুদৃঢ় করে তোলেন। তিনি তাঁর সুষ্ঠু নেতৃত্ব ও প্রশাসনিক দক্ষতা দ্বারা রোমের কায়সারকে সর্বক্ষণ এমনভাবে ভীত-সন্ত্রস্ত করে রাখেন যে, তখন রোমান তথা খ্রিস্টান জাতি ইসলামী রাষ্ট্রের উপর হামলা করার কথা চিন্তাও করতে পারত না। হযরত উসমান (রা)-এর শাহাদাত লাভের পর আমীরে মুআবিয়া হযরত আলী (রা)-এর মুকাবিলায় কি করেছিলেন সে সম্পর্কে প্রথম খণ্ডে আলোচনা করা হয়েছে। হিজরী ৪১ সনের (জুলাই ৬৬১ খ্রি.) রবিউল আউয়ালের শেষ দশদিনে আমীরে মুআবিয়া ও ইমাম হাসান (রা)-এর মধ্যে আপোস চুক্তি সম্পাদিত হয়। এরপর তিনি সমগ্র ইসলামী বিশ্ব আমীরে মুআবিয়ার হাতে বায়আত করে এবং তাঁকে মুসলিম বিশ্বের একক শাসক হিসাবে মেনে নেয়। ঐ সময়ের অর্থাৎ হিজরী ৪১ (৬৬০-৬১ খ্রি.) সালের বিশ বছর পূর্ব থেকে মুআবিয়া (রা) সিরিয়ার গভর্নর পদে নিয়োজিত ছিলেন। এরপর তিনি সমগ্র মুসলিম বিশ্বের রাজাধিরাজ অধিপতি হয়ে আরো বিশ বছর জীবিত থাকেন। তাঁর শাসনকালের মেয়াদ সর্বমোট চল্লিশ বছর। এই চল্লিশ বছরের প্রথমার্ধে তিনি ছিলেন একজন প্রাদেশিক গভর্নর এবং শেষার্ধে ছিলেন মুসলিম বিশ্বের শাহানশাহ। এর প্রথমার্ধের অবস্থা সংক্ষেপে প্রথম খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে। এখানে শেষার্ধ তথা তাঁর রাজত্বকালীন জীবন সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

আমীরে মুআবিয়ার চরিত্র ও গুণাবলী

মুআবিয়া (রা) থেকে একশ তেষট্টিটি হাদীস বর্ণিত আছে–যেগুলো পরবর্তীকালে ইব্‌ন আব্বাস, ইব্‌ন উমর, ইব্‌ন যুবায়র, আবুদ্‌-দারদা (রা) প্রমুখ সাহাবী এবং ইবনুল মুসায়্যাব, হুমায়াদ ইব্‌ন আবদুর রহমান প্রমুখ তাবিঈ বর্ণনা করেছেন। তাঁর গুণাবলী সম্বন্ধেও অনেক হাদীস প্রসিদ্ধ। ইমাম তিরমিযী (র) হাসান হাদীসসমূহের অধীনে লিখেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমীরে মুআবিয়া সম্পর্কে বলেছেন, 'প্রভু মুআবিয়াকে হিদায়াতকারী ও হিদায়াতপ্রাপ্ত করে দাও।' মুসনাদে আহমদ ইব্‌ন হাম্বলে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন : 'যখন তুমি বাদশাহ হয়ে যাবে তখন মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করবে। একবার মুআবিয়া (রা) তাঁর খিলাফত আমলে হজ্জ সম্পাদন করে মদীনায় আসেন এবং সেখানে কিছুদিন অবস্থান করেন। একদা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আকীল ইব্‌ন আবূ তালিব মুআবিয়া (রা)-এর কাছে বসা ছিলেন। এমন সময় আবূ কাতাদা আনসারী (রা) সেখানে আসেন। মুআবিয়া (রা) তাঁকে দেখে বলেন, আমাকে দেখার জন্য সব লোকই এসেছে, কিন্তু আনসাররা আসেনি। আবূ কাতাদা (রা) বলেন, আমার কাছে কোন বাহন নেই তাই আসতে পরিনি। মুআবিয়া (রা) বলেন, তোমার উটের কি হলো ? তিনি উত্তরে বলেন, তোমার এবং তোমার পিতার পশ্চাদ্ধাবন করতে করতে আমার সব উট ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তিনি আরো বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি : আমার পরে এমন এক যুগ আসবে, যখন লোকেরা হকদারের চাইতে না-হকদারকে প্রাধান্য দেবে। তখন মুআবিয়া (রা) বলেন, এরূপ পরিস্থিতিতে কি করতে হবে সে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কি কিছু বলেছেন ? আবূ কাতাদা (রা) উত্তর দেন, হ্যাঁ। তিনি বলেছেন : এরূপ পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধারণ করতে হবে। মুআবিয়া (রা) তখন বলেন, ব্যস! তাহলে তুমি ধৈর্য ধারণ কর।

কুরায়শ বংশের একটি যুবক মুআবিয়া (রা)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে গালমন্দ করলে তিনি বলেন, ভাতিজা! তুমি এই দুষ্কর্ম থেকে বিরত হও। কেননা বাদশাহ্‌র রাগ হয় শিশুর মত, আর তার পাকড়াও হয় বাঘের মত। শাবী বলেন, আরবে তীক্ষ্ণবুদ্ধি লোকের সংখ্যা হচ্ছে চার। আর তাঁরা হচ্ছেন মুআবিয়া, আমর ইব্‌নুল আস, মুগীরা ইব্‌ন শু'বা ও যিয়াদ ইব্‌ন আবীহি। মুআবিয়া ছিলেন সহিষ্ণু ও প্রখরবুদ্ধি সম্পন্ন, আমর যে কোন পরিস্থিতির মুকাবিলা করার যোগ্যতা রাখতেন, মুগীরা কখনো হতবুদ্ধি হতেন না, আর যিয়াদ প্রতিটি ছোটবড় ব্যাপারেই ছিলেন সমান মনোযোগী। কাযীর সংখ্যাও চার। আর তাঁরা হচ্ছেন উমর, আলী, ইব্‌ন মাসউদ ও যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা)। জাবির (রা) বলেন, হযরত উমর (রা)-এর চাইতে কুরআন ও ফিকহের উপর অধিক জ্ঞানসম্পন্ন তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্‌র চাইতে অধিক বদান্য, মুআবিয়ার চাইতে অধিক জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান এবং আমর ইব্‌নুল আসের চাইতে অধিক অকৃত্রিম বন্ধু আমি দেখিনি। হযরত আকীল ইব্‌ন আবূ তালিব একদা আমীরে মুআবিয়ার কাছে গেলে তিনি তাঁকে দেখে রসিকতা করে বলেন, দেখ দেখ, ইনি হচ্ছেন আকীল, যার চাচা ছিলেন আবূ লাহাব। আকীল (রা) সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেন, আর দেখ, ইনি হচ্ছেন মুআবিয়া, যার ফুফু ছিলেন 'হাম্মালাতাল হাতাব' (ইন্ধন বহনকারী)। জনৈক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস

(রা)-কে আমীরে মুআবিয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, তাঁর সহিষ্ণুতা তাঁর ক্রোধের উপর 'তিরইয়াক' বা বিষহরি ওষুধির ন্যায় কাজ করত, আর তাঁর বদান্যতা মানুষের জিহ্বার উপর তালা লাগিয়ে দিত। কিভাবে মানুষের হৃদয় জয় করতে হয় তা তিনি ভালভাবেই জানতেন এবং তাঁর রাজত্ব সুদৃঢ় হওয়ার এটাই ছিল প্রধান কারণ। একদা স্বয়ং মুআবিয়া (রা) বলেন, চারটি কারণে আমি আলীর বিরুদ্ধে সাফল্য অর্জন করেছি।

১. আমি আমার সব কথা গোপন রাখতাম এবং আলী (রা) তাঁর সব কথা লোকের কাছে বলে দিতেন।
২. আমার বাহিনী ছিল বাধ্য ও অনুগত, আর তাঁর বাহিনী ছিল অবাধ্য ও অশিষ্ট।
৩. আমি জামাল যুদ্ধে কোনভাবেই অংশগ্রহণ করিনি।
৪. আমি কুরায়শের মধ্যে ছিলাম জনপ্রিয়। আর আলী (রা)-এর প্রতি লোকেরা ছিল অসন্তুষ্ট।

আমীরে মুআবিয়া (রা)-এর শাসনামলের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী

আমীরে মুআবিয়া (রা) যখন খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হন তখন ইসলামী বিশ্বে আকাইদ ও আমলের (বিশ্বাস ও কার্যের) দিক দিয়ে তিন শ্রেণীর লোক বিদ্যমান ছিল। প্রথম শ্রেণী হচ্ছে শীআনে আলী। এই দল আলী (রা)-কে খিলাফতের জন্য সর্বাধিক যোগ্য ব্যক্তি মনে করত। তারা আরও মনে করত যে, তাঁর পরে তাঁর বংশধররাই খিলাফতের উত্তরাধিকারী হবে। এ দলের লোক ইরাক ও ইরানে ছিল বেশি। মিসরেও তাদের সংখ্যা ছিল প্রচুর। কিন্তু ইমাম হাসান (রা) খিলাফত ত্যাগ করেন। আমীরে মুআবিয়ার সাথে আপোস চুক্তি করায় এই দলের লোকসংখ্যা অনেক হ্রাস পায়। অপর শ্রেণীর লোক হচ্ছে শীআনে মুআবিয়া বা শীআনে বনূ উমাইয়া। সিরিয়ার সমগ্র লোক এবং হিজাযের বনূ কাল্‌ব এবং আরো কয়েকটি গোত্রের লোক এই দলের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

হযরত উসমান (রা)-কে হত্যা করার কারণে এই দল আমীরে মুআবিয়া এবং বনূ উমাইয়াকেই খিলাফতের অধিকারী মনে করত এবং তাদের সাহায্য-সহযোগিতার জন্য সব সময় তৈরি থাকত। তৃতীয় শ্রেণীর লোক হচ্ছে খাওয়ারিজ। এই দল শীআনে আলী ও শীআনে বনূ উমাইয়া উভয়কে পথভ্রষ্ট ও কাফির জ্ঞান করত এবং তাদের মুকাবিলার জন্য সব সময় তৈরি থাকত। মুনাফিক এবং ষড়যন্ত্রকারী লোক, যারা সর্বসম্মতিক্রমে ইসলামী বিশ্বের শত্রু ছিল তারা এই দলের সাথে অবাধে মেলামেশা করত। এই দলের বেশির ভাগ লোক ইরাক, বসরা, কূফা ও ইরানে বসবাস করত। এই তিন দল ছাড়া আরেকটি দল ছিল, যারা সর্বপ্রকার ঝগড়াঝাটি ও দাঙ্গাহাঙ্গামা থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করত এবং নিভৃত জীবন পছন্দ করত। বেশির ভাগ শীর্ষস্থানীয় সাহাবা এই দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই দলের বেশির ভাগ লোক মক্কা, মদীনা ও হিজাযের পল্লী অঞ্চল এবং উটের চারণভূমিসমূহে বসবাস করতেন। খিলাফতে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর আমীরে মুআবিয়াকে সর্বপ্রথম খারিজীদের মুকাবিলা করতে হয়। হিজরী ৪১ সনের রবিউল আউয়ালের শেষাংশে যখন আপোসচুক্তি সম্পাদিত হয় এবং কূফায় সাধারণভাবে আমীরে মুআবিয়াকে খলীফা বলে স্বীকার করে নেওয়া হয় তখন

ফারওয়া ইব্‌ন নাওফাল আশজায়ী' নামীয় জনৈক খারিজী পাঁচশ লোকের একটি বাহিনী নিয়ে প্রকাশ্যে আমীরে মুআবিয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় এবং কূফা থেকে বের হয়ে নাখলিয়া নামক স্থানে গিয়ে শিবির স্থাপন করে।

মুআবিয়া (রা) ওদের সাথে জোরজবরদস্তি করা অসমীচীন মনে করেন এবং নিজ মতলব উদ্ধারের জন্য কূটনীতির আশ্রয় নেন। তিনি কূফাবাসীদের একত্রিত করে উপদেশের সুরে বলেন, এই সমস্ত লোক তোমাদেরই ভাই বন্ধু। তোমরাই এদের বুঝাও এবং যুদ্ধবিগ্রহ ও বিরোধিতার কুফল সম্পর্কে তাদের সাবধান করে দাও। আশ্‌জা গোত্রের লোকেরা তাঁর এই উপদেশে এতই প্রভাবিত হয় যে, তারা একযোগে ছুটে গিয়ে ফারওয়া ইব্‌ন নাওফাল আশজায়ীকে বন্দী করে নিয়ে আসে। এরপর খারিজীরা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবুল হাওসাকে তাদের নেতা নির্বাচিত করে এবং কোনরূপ আপোস-মীমাংসায় আসতে অস্বীকার করে। শেষ পর্যন্ত কূফাবাসীরা তাদের সাথে মুকাবিলা করে এবং তাতে অন্যান্যের সাথে আবদুল্লাহ্ও মারা যায়। তারপর খারিজীদের সংখ্যা দেড়শতে গিয়ে পৌঁছে। এবার তারা হাওসারা আসাদীকে তাদের নেতা নির্বাচিত করে। মুষ্টিমেয় এই লোকদের প্রতিও আপোস-মীমাংসার আহ্বান জানানো হয়। কিন্তু তারা আপোস-মীমাংসার চাইতে মৃত্যুকেই শ্রেয় জ্ঞান করে। শেষ পর্যন্ত আবূ হাওসারা ও তার সঙ্গীরা যুদ্ধ করতে করতে মৃত্যু বরণ করে এবং কিছু লোক ইরাক ও ইরানের বিভিন্ন শহরে চলে যায়। আমীরে মুআবিয়া খলীফা হওয়ার সাথে সাথে কূফায় এই প্রথম রক্তপাতের ঘটনা ঘটে। সাথে সাথে এই তথ্যও প্রকাশ পায় যে, প্রত্যেক শহরে এবং সমগ্র ইরাকে খারিজীদের অস্তিত্ব রয়েছে।

গভর্নর নিয়োগ

আমীরে মুআবিয়া (রা) ইতিপূর্বেই মিসরের শাসন ক্ষমতা আমর ইবনুল 'আস (রা)-এর হাতে ন্যস্ত করেছিলেন। সমগ্র ইসলামী বিশ্বের শাসক হওয়ার পর তিনি সাইয়িদ ইবনুল আসকে মক্কার এবং মারওয়ান ইবনুল হাকামকে মদীনার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। সাইয়িদ ও মারওয়ান উভয়ই ছিলেন তাঁর আত্মীয়। এ কারণেই তিনি এ দু'জনের হাতে ইসলামী বিশ্বের দু'টি কেন্দ্রীয় শহরের শাসন ক্ষমতা ন্যস্ত করেছিলেন, যাতে সেখানে তাঁর বিরুদ্ধে কোন দল গড়ে না ওঠে বা কোন ষড়যন্ত্রও সফল না হয়। তিনি প্রতিবছর স্বয়ং হজ্জে যেতেন না। তাই ঐ দু'জনের মধ্য থেকে যে কোন একজনকে 'আমীরুল হজ্জের' দায়িত্ব প্রদান করতেন। মক্কা ও মদীনার কেন্দ্রিকতা ও সর্বজনমান্যতার সুযোগ নিয়ে যাতে এ দু'জনের কেউ আবার তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষমতাশালী হয়ে না ওঠে সেজন্য তিনি প্রতিবছর এদের দু'জনকে একে অন্যের জায়গায় বদলী করতেন। কূফায় খিলাফতের বায়আত নেওয়ার পরই মুআবিয়া (রা) মুগীরা ইব্‌ন শু'বাকে কূফার গভর্নর নিয়োগ করেন এবং তাঁকে নির্দেশ দেন, যেন তিনি যেভাবে সম্ভব সেখানে থেকে খারিজীদের বিশৃংখলা দূর করেন। অন্যান্য প্রদেশ এবং রাজ্যের কর্মকর্তাদের নামেও তিনি একটি নির্দেশনামা পাঠান। তাতে লেখা ছিল, জনসাধারণের কাছ থেকে আমার নামে বায়আত গ্রহণ কর এবং তুমি এজন্য নিজেকে আমার পক্ষ থেকে ভারপ্রাপ্ত ও আদিষ্ট মনে কর। আলী (রা) যিয়াদ ইব্‌ন আবূ সুফিয়ানকে পারস্যের

শাসক নিয়োগ করেছিলেন। যিয়াদকে শীআনে আলী-এর অন্তর্ভুক্ত মনে করা হতো। সমগ্র আরবে তার বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতার খ্যাতি ছিল। যিযাদ অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে পারস্য প্রদেশ শাসন করছিলেন। আমীরে মুআবিয়া এই ভেবে চিন্তিত হয়ে পড়লেন যে, যিয়াদ যদি তার বিরুদ্ধে চলে যায় এবং আলী (রা)-এর বংশধরদের মধ্য থেকে কাউকে খলীফা বানিয়ে তার হাতে বায়আত করে এবং তাঁর (মুআবিয়ার) প্রতি বিদ্রোহী হয়ে ওঠে তাহলে তো এক বিরাট সমস্যা দেখা দেবে। অতএব কি কৌশল অবলম্বন করলে যিয়াদকে কাবু করা যাবে তিনি সর্ব প্রথম তাই চিন্তা করতে লাগলেন।

যিয়াদ ইব্ন আবূ সুফিয়ান

যিয়াদের মা সুমাইয়া ইব্ন কিলাব সাকাফীর ক্রীতদাসী ছিল। যিয়াদের পিতা সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে কিছুটা সংশয় ছিল। আসল ঘটনা এই যে, জাহিলিয়া যুগে আবূ সুফিয়ান সুমাইয়াকে বিবাহ করেছিল এবং তার ঔরসেই যিয়াদের জন্ম হয়। আবূ সুফিয়ানের সাথে যিয়াদের অনেক দৈহিক মিলও ছিল। কিন্তু আবূ সুফিয়ানের গোত্রের লোকেরা ও আমীরে মুআবিআ যিয়াদকে তার পুত্র স্বীকার করতেন না। সে যখন শুনতে পেল, আমীরে মুআবিয়াকে সর্বসম্মতিক্রমে খলীফা মেনে নেওয়া হয়েছে তখন সে বায়আত করবে কিনা বা আমীরে মুআবিয়াকে খলীফা স্বীকার করবে কিনা সেই সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে থাকে। এই সুযোগে মুআবিয়া (রা) মুগীরা ইব্ন শু'বাকে (যিনি যিয়াদের একজন বন্ধু ছিলেন) একটি আমাননামাসহ (নিরাপত্তা পত্র) যিয়াদের কাছে পাঠান। সেই সাথে তিনি যিয়াদকে আবূ সুফিয়ানের পুত্র বলে স্বীকার করে নিয়ে তাকে উমাইয়া গোত্রের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। মুগীরা (রা) আমাননামাসহ যিয়াদের কাছে পারস্যে গিয়ে পৌঁছেন। তিনি সেখানকার হিসাব-কিতাব ও কোষাগার দেখে সবকিছু ঠিক আছে বলে প্রত্যয়ন করেন এবং যিয়াদকে সঙ্গে নিয়ে মুআবিয়ার কাছে চলে আসেন। মুআবিয়া (রা) যিয়াদকে খুব আদর-আপ্যায়ন করেন এবং আপন ভাই বলে প্রকাশ্যে স্বীকার করে নেন। সমস্ত চিঠিপত্রে তার নাম 'যিয়াদ ইব্ন আবূ সুফিয়ান' লেখা হতে থাকে। হযরত আলী (রা) বিশ্বাস করতেন যে, যিয়াদ আবূ সুফিয়ানেরই পুত্র। আবূ সুফিয়ান একবার হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর মজলিসে স্বীকার করেছিলেন যে, যিয়াদ তারই পুত্র। এজন্য তিনি যিয়াদকে পারস্যের শাসক নিয়োগ করেছিলেন। এবার মুআবিয়া (রা) যিয়াদের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করে তাকে বসরার গভর্নর নিয়োগ করেন এবং বসরাবাসীদের সঠিক পথে আনার জন্যে তাকে বিশেষভাবে নির্দেশ দেন। যিয়াদ বসরায় পৌঁছেই তাদের জামি' মসজিদে একত্র করে একটি কড়া ভাষণ দেন। ঐ সময়ে বসরাবাসীরা অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়েছিল। সেখানে অহরহ চুরি, ডাকাতি ও বিদ্রোহের ঘটনা ঘটত। যিয়াদ সেখানে পৌঁছেই সামরিক আইন জারি করেন এবং এই মর্মে এক নির্দেশ দেন যে, যাকেই রাতের বেলা ঘরের বাইরে কিংবা রাস্তায় অথবা মাঠে দেখা যাবে তাকে কোনরূপ শুনানি ছাড়াই সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করা হবে। এই নির্দেশ অত্যন্ত কঠোরভাবে কার্যকরী করা হয়। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই বসরাবাসীদের সব বক্রতা ও ধৃষ্টতা যেন হাওয়ায় উবে যায়।

আমীরে মুআবিয়া বসরায় যিয়াদকে এবং কূফায় মুগীরাকে গভর্নর নিয়োগ করে ইরাক ও পারস্যের দিক থেকে অনেকটা স্বস্তি লাভ করেন। কেননা ইরানের সমগ্র প্রদেশ কূফা ও

বসরার অধীনে ছিল। এরপর তিনি সরাসরি পারস্য, জাযীরা ও সিজিস্তানের শাসন ক্ষমতাও যিয়াদের হাতে ন্যস্ত করেন। এই সমগ্র অঞ্চল বসরার গভর্নরের শাসনাধীনে ন্যস্ত করে তিনি প্রাচ্য দেশীয় ফিতনাসমূহের দরজা একেবারে বন্ধ করে দিয়েছিলেন। খারিজীরা নিত্যদিন ইরাক ও পারস্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করত। যিয়াদ ও মুগীরা উভয়ে মিলে অত্যন্ত যোগ্যতা ও দুঃসাহসিকতার সাথে তা দমন করেন। মোটকথা, আমীরে মুআবিয়ার দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পেতে পারে, ঐ অঞ্চলে তাঁরা এমন কোন পরিস্থিতির সৃষ্টিই হতে দেননি। যিয়াদ প্রকৃতিগতভাবে অত্যন্ত কঠোর হলেও তার শাসনাধীন এলাকাসমূহের যেখানে যেখানে সহৃদয় ও নম্র ব্যবহারের প্রয়োজন ছিল সেখানে নম্র ব্যবহারই করতেন। একদা তিনি জানতে পারেন, আবুল খায়র নামীয় জনৈক দুঃসাহসী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি খারিজীদের সমমতাবলম্বী হয়ে গেছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে আবুল খায়রকে ডেকে পাঠান এবং তাকে 'জুনদী সাপূর' এলাকার শাসক নিয়োগ করে সেখানে পাঠিয়ে দেন। এভাবে তিনি অত্যন্ত কৌশলের সাথে একটি আপাত বিপদ কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হন।

মিসরের গভর্নর আমর (রা) হিজরী ৪৩ (৬৬২-৬৩ খ্রি) সনে ইনতিকাল করেন। মুআবিয়া (রা) তাঁরই পুত্র আবদুল্লাহ ইব্ন আমরকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন। এই বছরই খারিজীরা যখন দেখল মুগীরা ইব্ন শুবা যিয়াদ ইব্ন আবূ সুফিয়ানের মত তত কঠোর ও পাষাণ হৃদয় নন, বরং ক্ষমাশীল এবং দয়ালু তখন তারা পুনরায় বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র শুরু করে। তখন মুগীরার স্থলে যদি যিয়াদ কূফার গভর্নর হতেন তাহলে খারিজীরা এই ষড়যন্ত্র করার সাহস পেত না। যিয়াদ খুব ভালভাবেই খারিজীদের' খবর রাখতেন। এজন্য তিনি বসরাবাসীদেরকেও শায়েস্তা করতে পেরেছিলেন। মুসতাওরিদ ইব্ন আলকামার নেতৃত্বে তিন শতাধিক খারিজী হিজরী ৪৩ (৬৬৩ খ্রি) ১লা শাওয়াল ঠিক ঈদুল ফিত্রের দিন কূফা থেকে বের হয়। মুগীরা তাদের বন্দী করার জন্য তিন হাজার সৈন্যর একটি বাহিনী পাঠান। উভয় বাহিনী মুখোমুখি হয় এবং তিনশ খারিজী তিন হাজার সৈন্যকে পরাজিত করে। এরপর আরো সৈন্য পাঠানো হয় এবং তাদেরকেও খারিজীরা পরাজিত করে। শেষ পর্যন্ত মাকিল ইব্ন কায়সের নেতৃত্বে তিনি একটি শক্তিশালী বাহিনী পাঠান। উভয় বাহিনী মুখোমুখি হয়। প্রথমে উভয় বাহিনীর অধিনায়ক অর্থাৎ মাকিল ও মুসতাওরিদ পরস্পরের সাথে মুকাবিলা করেন এবং উভয়ই নিহত হন। মাত্র পাঁচ ব্যক্তি ছাড়া খারিজী বাহিনীর সকলেই মারা যায়। এই ঘটনার কারণে মুগীরা (রা) খারিজীদের সম্পর্কে অত্যন্ত সতর্ক হয়ে ওঠেন।

রোম সম্রাটের দিক থেকে সিরিয়ার উত্তর সীমান্তে স্থল ও নৌ উভয় প্রকার হামলারই আশংকা ছিল। রোমানরা প্রায়ই মিসর ও আফ্রিকার উপর হামলা করত। মুআবিয়া (রা) প্রাচ্যের দিক থেকে নিশ্চিন্ত হওয়ার পর রোমানদের বিরুদ্ধেও তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। তিনি নৌবাহিনী গঠন করেন। স্থল বাহিনীর সৈন্যদের চাইতে নৌবাহিনীর সৈন্যদের জন্য অধিক ভাতা নির্ধারণ করা হয় যাতে লোকেরা নৌবাহিনীতে ভর্তি হওয়ার জন্য অধিক আগ্রহী হয়।

আনুমানিক দু'হাজার সামরিক নৌযান তৈরি করা হয় এবং জুনাদা ইব্ন উমাইয়াকে নৌবাহিনীর অধিনায়ক তথা এডমিরাল নিয়োগ করা হয়। মুআবিয়া (রা) স্থলবাহিনীকেও

পূর্বের চাইতে অনেক সুন্দর করেন। তিনি স্থল বাহিনীকে দু'ভাগে বিভক্ত করেন। এক ভাগকে বলা হতো 'শাতিয়াহ' তথা শীতকালীন বাহিনী এবং অপর ভাগকে বলা হতো 'সায়িফাহ' তথা গ্রীষ্মকালীন বাহিনী। ফলে শীত গ্রীষ্ম উভয় ঋতুতেই আমীরে মুআবিয়ার স্থলবাহিনী সীমান্ত-সমূহে রোমান বাহিনীকে প্রতিরোধ করত এবং প্রয়োজনবোধে অনেক দূর পর্যন্ত তাদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে যেত। ফলে রোমানরা সব সময়ই মুসলিম বাহিনী সম্পর্কে ভীতসন্ত্রস্ত থাকত। অপর দিকে মুসলিম নৌবাহিনী সাইপ্রাস, রোডস প্রভৃতি দ্বীপে স্থায়ী সামরিক কেন্দ্র স্থাপন করে সম্রাটের নৌযানসমূহকে রোম সাগর থেকে বেদখল করে দেয়। ফলে মিসর ও সিরিয়ার উপকূল অঞ্চল রোমানদের সামরিক আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়। হিজরী ৪৩ (৬৬২-৬৬৩ খ্রি) সনে সিজিস্তানের সন্নিকটবর্তী এলাকা, রাজাহ ইত্যাদি জয় করা হয়। ঐ বছর বারকা ও সুদানের দিকে ইসলামী বাহিনী এগিয়ে যায় এবং সমস্ত অঞ্চল পদানত করে ইসলামী রাষ্ট্রের আয়তন বহুলাংশে বৃদ্ধি করে।

কনসটান্টিনোপল আক্রমণ

কায়সারের (রোমান সম্রাটের) ক্ষমতা সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা করার পর আমীরে মুআবিয়া হিজরী ৪৮ (৬৬৮ খ্রি) সনে কায়সারের রাজধানী কনসটান্টিনোপল আক্রমণের পরিকল্পনা নেন, যাতে কায়সারের পরাক্রম খর্ব হয়ে যায় এবং খ্রিস্টানরা এতটা ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে যে, ভবিষ্যতে কখনো ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্তের দিকে এগিয়ে আসার সাহস হারিয়ে ফেলে। তিনি কনসটান্টিনোপলে আক্রমণ পরিচালনার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে মক্কা মদীনায়ও ঘোষণা করিয়ে দেন যে, শীঘ্রই মুসলমানরা কনসটান্টিনোপল আক্রমণ করবে। সাহাবায়ে কিরাম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সেই হাদীস সম্পর্কে অবহিত ছিলেন, যাতে তিনি বলেছেন ঃ

"আমার উম্মতের প্রথম যে বাহিনী কায়সারের শহর আক্রমণ করবে তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত।" তিনি আরও বলেছিলেন ঃ 'তোমরা অবশ্যই কনসটান্টিনোপল জয় করবে।' কত সৌভাগ্যবান সেই আমীর আর কত সৌভাগ্যবান সেই বাহিনী (সম্পাদক)। অতএব সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমর, আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র,আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস, হুসাইন ইব্ন আলী, আবূ আইয়ূব আনসারী (রা) প্রমুখ সাহাবী আল্লাহ্র মাগফিরাত ও সৌভাগ্য লাভের আশায় কনসটান্টিনোপল আক্রমণে অংশগ্রহণ করেন। ফলে একটি বিরাট বাহিনী গড়ে উঠে। মুআবিয়া (রা) সুফিয়ান ইব্ন আওফকে ঐবাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত করেন। তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ইয়াযীদকে (যিনি সাইফাহ্ বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন) তাঁর অধীনে একটি খণ্ড বাহিনীর অধিনায়ক নিয়োগ করেন। মুসলিম বাহিনী কনসটান্টিনোপল অবরোধ করে। যেহেতু শহরের প্রাচীর ছিল খুবই সুদৃঢ়, উপরন্তু প্রকৃতিগতভাবে এর অবস্থান এমন দুর্ভেদ্য ছিল যে, মুসলমানদের অবরোধ বা আক্রমণ সফল হতে পারেনি, বরং তাতে কিছুসংখ্যক নাম করা ইসলামী ব্যক্তিত্ব শাহাদাত বরণ করেন। অবরোধ চলাকালেই বিখ্যাত সাহাবী আবূ আইয়ূব (রা) শাহাদাত বরণ করেন এবং শহর প্রাচীরের নিম্নদেশে তাঁকে দাফন করা হয়। অত্যধিক ঠাণ্ডা আরো কিছু প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতার কারণে মুসলমানরা কনসটান্টিনোপল জয় না করেই

ফিরে আসেন। বাহ্যত ঐ আক্রমণ ব্যর্থ হয়েছিল। কেননা মুসলমানরা কনসটান্টিনোপল জয় করতে পারেনি। কিন্তু ভবিষ্যতের ফলশ্রুতির দিক দিয়ে এতে মুসলমানদের বিরাট সাফল্য অর্জিত হয়েছিল। কেননা, ঐ হামলার ফলে কায়সার ও তাঁর বাহিনী এতই ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে যে, মুসলমানদের ঐ প্রত্যাবর্তনকে তারা তাদের জন্য একটি সৌভাগ্যের বিষয় বলে ধরে নিয়েছিল এবং ভবিষ্যতে তাদের দিক থেকে মুসলমানদের উপরে আক্রমণ পরিচালনার যাবতীয় আশংকা তিরোহিত হয়ে গিয়েছিল। উপরন্তু যে সমস্ত এলাকাকে কেন্দ্র করে এতদিন মুসলমান ও ঈসায়ীদের মধ্যে সংঘর্ষ চলে আসছিল তা পুরোপুরিভাবে মুসলমানদের শাসনাধীনে চলে এসেছিল।

হিজরী ৫০ (৬৭০ খ্রি) সনে মুআবিয়া (রা) উকবা ইব্‌ন নাফিকে মিসর, বারকা ও সুদানের প্রধান সেনাপতি নিয়োগ করেন। পরবর্তীকালে তাদের কাছে দশ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী পাঠান এবং তাকে নির্দেশ দেন, আফ্রিকা মহাদেশের পশ্চিম প্রান্তের দেশসমূহ জয় করে ক্রমশ এগিয়ে যাও। আফ্রিকার বার্বারদের অবস্থা তখন পর্যন্ত এই ছিল যে, যখনই কোন ইসলামী বাহিনী তাদের এলাকায় গিয়ে পৌঁছত, তারা তাদের বশ্যতা স্বীকার করে নিত। কিন্তু যখনই তারা মুসলমানদের কিছুটা অসতর্ক দেখত তখনই বিদ্রোহ করতো। উকবা ইব্‌ন নাফি মিসর ও বারকা জয় করে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হন এবং তিউনিসিয়া ও ত্রিপোলীর উপর আক্রমণ পরিচালনা করেন। এসব এলাকা জয় করার পর তিনি আলজিরিয়ার দিকে অগ্রসর হন। ঐ বছরই মাকরান ও বেলুচিস্তানের প্রশাসক আবদুল্লাহ ইব্‌ন সাওয়ার সিন্ধীদেরকে শায়েস্তা করার জন্য সিন্ধু প্রদেশে আক্রমণ পরিচালনা করেন। সিন্ধী বাহিনী, যারা পূর্ব থেকে যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ তৈরি ছিল, কায়কান নামক স্থানে মুসলমানদের মুকাবিলা করে। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাওয়ার ঐ যুদ্ধে শহীদ হন। এরপর হালাব ইব্‌ন আবূ সুফরা প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সিন্ধু আক্রমণ করেন এবং এর একটি বিরাট অংশ জয় করতে সক্ষম হন।

ইয়াযীদকে যুবরাজ ঘোষণা

ঐ বছর অর্থাৎ হিজরী ৫০ (৬৭০ খ্রি) সনে মুগীরা ইব্‌ন শু'বা কূফা থেকে দামিশকে আসেন। তিনি একদা আমীরে মুআবিয়া (রা)-কে বলেন, আমি মদীনায় হযরত উসমান (রা)-এর শাহাদাতের ঘটনা দেখেছি। তখনকার দুঃখজনক দৃশ্যাবলী এখনো আমার চোখে ভাসছে। খিলাফতকে কেন্দ্র করে তখন মুসলমানদের মধ্যে যে দাঙ্গাহাঙ্গামা শুরু হয়েছিল তা আমি এখনো ভুলতে পারিনি। অতএব আমার মতে এটাই সমীচীন যে, আপনি আপনার পুত্র ইয়াযীদকে পরবর্তী খলীফা মনোনীত করুন। এর মধ্যেই মুসলমানদের মঙ্গল নিহিত রয়েছে। আমীরে মুআবিয়া নিজ পুত্রকে পরবর্তী খলীফা মনোনীত করবেন একথা তখনো চিন্তা করেননি। মুগীরা ইব্‌ন শু'বার একথা শোনার পর, প্রথমবারের মত তিনি এ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন। তিনি মুগীরাকে বলেন, এটা কি সম্ভব যে, জনসাধারণ পরবর্তী খলীফা হিসাবে আমার পুত্রের হাতে বায়আত করবে? মুগীরা বলেন, হ্যাঁ, এটা অতি সহজেই সম্ভব। এজন্য আমি কূফাবাসীদেরকে উদ্বুদ্ধ করব এবং যিয়াদ বসরাবাসীদেরকে বাধ্য করবে। মক্কা ও মদীনায় মারওয়ান ও সাঈদ ইবনুল 'আস অনুকূল ক্ষেত্র তৈরি করে নিতে পারবেন। আর

সিরিয়ায় কোনরূপ বিরোধিতার আশংকা নেই। একথা শুনে আমীরে মুআবিয়া মুগীরাকে কূফায় পাঠান এবং বলেন, তুমি সেখানে গিয়ে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ কর। অপর এক বর্ণনায় এ ঘটনা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা হলো, মুআবিয়া (রা) কূফার গভর্নর মুগীরা ইব্‌ন শু'বাকে লিখেন, তুমি আমার এই পত্র পাঠমাত্র নিজেকে পদচ্যুত মনে করবে। কিন্তু এই পত্র যখন মুগীরার কাছে পৌঁছে তখন তিনি এতে প্রদত্ত নির্দেশ পালন করতে কিছুটা বিলম্ব ঘটান। এরপর এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে বলেন, আমি তখন একটা বিশেষ কাজে ব্যস্ত ছিলাম। মুআবিয়া জিজ্ঞেস করেন, তা কি ? মুগীরা উত্তর দেন, পরবর্তী খলীফা হিসাবে আমি তোমার পুত্রের জন্য বায়আত নিচ্ছিলাম। তিনি একথা শুনে আনন্দিত হন এবং মুগীরাকে তার পদে পুনঃনিয়োগ করে কূফায় পাঠিয়ে দেন। মুগীরা দামিশ্‌ক থেকে কূফায় ফিরে এলে কূফাবাসী জিজ্ঞেস করে, বলুন ব্যাপার কি ? তিনি উত্তর দেন , আমি মুআবিয়াকে এমন একটি গোলকধাঁধায় ফেলেছি যে, তিনি কিয়ামত পর্যন্ত তা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন না। যাহোক এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মুগীরা ইব্‌ন শু'বাই আমীরে মুআবিয়াকে এমন একটি কাজে প্ররোচিত করেন, যার কারণে পরবর্তীকালে মুসলমানদের মধ্যে পিতার পর পুত্রেরই রাষ্ট্রনায়ক হওয়ার রীতি যেমন প্রচলিত হয় তেমনি গণরায়ের মাধ্যমে খলীফা নির্বাচনের রীতি হয় পরিত্যাজ্য। ইয়াযীদ ছিল আমীর মুআবিয়ার পুত্র। আর পুত্রের প্রতি পিতার ভালবাসা থাকা এবং তাকে মানমর্যাদা ও রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারী করার ইচ্ছা পোষণ একটি অতি স্বাভাবিক ব্যাপার। এজন্য মুআবিয়াকে এক্ষেত্রে কিছুটা নিরুপায় বা ক্ষমাযোগ্য মনে করা যেতে পারে। কিন্তু মুগীরার পক্ষ থেকে এর কোন কৈফিয়ত দেওয়া যেতে পারে না।

মুগীরা কূফায় ফিরে এসে সেখানকার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের উদ্বুদ্ধ করেন, যেন তারা ইয়াযীদের (অলী আহদী তথা) যুবরাজের ব্যাপারে রাযী হয়ে যান। যখন কূফার প্রভাবশালী লোকেরা এতে রাযী হয়ে যান এবং তারা একথা স্বীকার করে নেন যে, ভবিষ্যতে মুসলমানদেরকে ফিতনা-ফাসাদ ও রক্তপাত থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে আমীরুল মু'মিনীন কর্তৃক নিজ পুত্রকে তাঁর ভাবী উত্তরাধিকারী মনোনীত করাই বাঞ্ছনীয়, তখন মুগীরা আপন পুত্র মূসার সাথে কূফার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি প্রতিনিধি দল আমীরে মুআবিয়ার কাছে প্রেরণ করেন।

তারা দামিশকে পৌঁছে মুআবিয়ার কাছে নিবেদন করেন, আমরা এই অভিমতই পোষণ করি যে, ইয়াযীদের 'অলী আহ্‌দী'র জন্য বায়আত গ্রহণ করা হোক। এই প্রতিনিধিদল আসার কারণে মুআবিয়ার সেই আকাঙ্ক্ষা, যা মুগীরা তাঁর অন্তরে জাগ্রত করেছিলেন, আরো বেশি জোরদার হয়। তিনি ঐ প্রতিনিধিদলকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে বিদায় দেন এবং বলেন, অনুকূল সময় এলে তোমাদের কাছ থেকে বায়আত গ্রহণ করা হবে। আমীরে মুআবিয়া অত্যন্ত বিচক্ষণ ও দূরদর্শী লোক ছিলেন। তিনি প্রতিটি কাজই অত্যন্ত সতর্কতার সাথে করতেন। তিনি প্রথমে দেখে নিতে চাচ্ছিলেন, ইসলামী বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠের রায় তাঁর আকাঙ্ক্ষার অনুকূলে কিনা। তিনি একদিকে মদীনার গভর্নর মারওয়ান এবং অপরদিকে বসরার গভর্নর যিয়াদের কাছে লেখেন, আমি এখন বৃদ্ধ হয়ে গেছি। আমার ভয় হচ্ছে, আমার মৃত্যুর পরও খিলাফতকে কেন্দ্র করে মুসলমানদের মধ্যে ফিতনা-ফাসাদের সৃষ্টি হতে পারে। অতএব এটা

বন্ধ করার জন্য আমার একান্ত ইচ্ছা যে. আমি এমন কোন ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করব, যে আমার পরে খলীফা হবে। প্রবীণ লোকদের মধ্যে তো আমি সে ধরনের কোন লোক দেখতে পাচ্ছি না। আর যুবকদের মধ্যে আমার পুত্র ইয়াযীদকেই আমি এজন্য সর্বাধিক যোগ্য মনে করি। অতএব তোমাদের উচিত এ ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে জনসাধারণের সাথে আলাপ-আলোচনা করে তাদেরকে আমার পুত্র ইয়াযীদের খিলাফতের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা। বসরার গভর্নর যিয়াদের কাছে এই পত্র পৌঁছলে তিনি বসরায় একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি উবায়দ ইব্ন কা'ব নুমায়রীকে তা দেখান এবং বলেন, আমার মতে, আমীরুল মু'মিনীন এ ব্যাপারে তাড়াহুড়া করে ফেলেছেন এবং বিষয়টি ভালোভাবে খতিয়ে দেখেন নি। কেননা ইয়াযীদ হচ্ছে এমন এক যুবক, যে সব সময় খেলাধুলায় মগ্ন থাকে। সবাই জানে, শিকার করা ও ঘুরে বেড়ানোই তার প্রধান কাজ। অতএব জনসাধারণ তার বায়আতের ব্যাপারে ইতস্তত করবে। উবায়দ ইব্ন কা'ব বলেন, আমীরুল মু'মিনীনের সাথে দ্বিমত পোষণ করার কোন প্রয়োজন নেই। আপনি আমাকে দামিশকে পঠিয়ে দিন। আমি সেখানে গিয়ে ইয়াযীদের সাথে সাক্ষাৎ করব এবং তাকে বুঝিয়ে বলব, তুমি নিজেকে সংশোধন করে নাও, যাতে তোমার অনুকূলে বায়আত গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না হয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ইয়াযীদ আমার এই উপদেশ মেনে নেবে। এরপর তার আচার-আচরণে সন্তোষজনক পরিবর্তন ঘটলে জনসাধারণ তার অনুকূলে বায়আত করতে ইতস্তত করবে না। ফলে আমীরুল মু'মিনীনের লক্ষ্যও অর্জিত হবে। উবায়দের এই অভিমত যিয়াদের পছন্দ হলো এবং তাকে শীঘ্রই দামিশকে পাঠিয়ে দিল। উবায়দ ইয়াযীদকে আদ্যোপান্ত সবকিছু বুঝিয়ে বলেন এবং ইয়াযীদও স্বীয় অবস্থার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন করে জনসাধারণের সমালোচনার মুখ বন্ধ করে দেয়।

মদীনায় মারওয়ানের কাছে এই পত্র পৌঁছলে তিনি মদীনার গণ্যমান্য লোকদের একত্র করে শুধু এতটুকু বলেন, আমীরুল মু'মিনীনের ইচ্ছা এই যে, মুসলমানদেরকে ফিতনা-ফাসাদ থেকে রক্ষা করার জন্য তিনি তাঁর জীবনকালেই কোন এক ব্যক্তিকে তাঁর পরবর্তী খলীফা হিসাবে মনোনীত করবেন। একথা শুনে সকলেই বলে উঠেন, তাঁর এই অভিমত খুবই পছন্দনীয়। আমরা সকলেই তা সমর্থন করি। কিছুদিন পর মারওয়ান পুনরায় লোকদেরকে একত্র করে বলেন, দামিশ্‌ক থেকে আমীরুল মু'মিনীনের আর একটি পত্র এসেছে। তাতে তিনি লিখেছেন, আমরা মুসলমানদের মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রেখে ইয়াযীদকে আমার 'অলী আহদ' তথা ভাবী উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছি। একথা শুনে আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বকর, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর, আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র ও হুসাইন ইব্ন আলী (রা) অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। তাঁরা বলেন, মুসলমানদের মঙ্গলের জন্য নয়, বরং ধ্বংসের জন্য মুআবিয়ার এই মনোনয়ন। কেননা এতে ইসলামী খিলাফত কায়সার ও কিসরার সাম্রাজ্যের রূপ ধারণ করবে। খিলাফতের জন্য পিতা কর্তৃক পুত্রের মনোনয়ন নিঃসন্দেহে ইসলামী আদর্শ-বিরোধী।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যখন মারওয়ান মদীনায় আমীরে মুআবিয়ার এই ইচ্ছার কথা ঘোষণা করেন তার কয়েক মাস পূর্বেই ইমাম হাসান ইনতিকাল করেছিলেন। লোকেরা সাধারণভাবে একথা জানত যে, ইমাম হাসানের সাথে আপোসচুক্তি সম্পাদনের সময় আবদুল্লাহ্ ইব্ন

আমরের প্রস্তাব অনুযায়ী আমীরে মুআবিয়া নিজের পক্ষ থেকে এই অঙ্গীকারও করেছিলেন যে, তাঁর মৃত্যুর পর ইমাম হাসানকেই খলীফা মনোনীত করা হবে। কিন্তু যে কারণেই হোক, ইমাম হাসান (রা) একথা সন্ধিচুক্তিতে লিপিবদ্ধ করাননি। তবে জনসাধারণের ধারণা ছিল যে, সন্ধি চুক্তিতে ইমাম হাসানের পরবর্তী খলীফা হওয়ার কথা উল্লেখ না থাকলেও মুসলিম উম্মাহ্ খিলাফতের ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছবে। মদীনায় মারওয়ান প্রথমবারের মত আমীরে মুআবিয়ার পত্রের কথা সবাইকে শুনালে বেশির ভাগ লোকই মনে করেছিল যে, ইমাম হাসানের মৃত্যুর কারণেই তিনি তাঁর পরবর্তী খলীফা মনোনীত করতে চাচ্ছেন। কেননা ইমাম হাসান (রা) যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তিনি (মুআবিয়া) তাঁকেই ভাবী খলীফা বলে মনে করতেন। এই ধারণার মধ্যে একদিকে যেমন আমীরে মুআবিয়ার পবিত্রচিত্ততা ও ন্যায়ানুবর্তিতার দিকটি নিহিত ছিল, অন্যদিকে তেমনি বিদ্যমান ছিল ঐ সমস্ত ব্যক্তিবর্গের সুপ্ত আশার বিকাশ, যারা স্বয়ং নিজেদেরকে খলীফা পদের যোগ্য বিবেচনা করতেন। মারওয়ান দ্বিতীয়বার যখন ইয়াযীদের (অলী আহদীর) যুবরাজ ব্যাপারটি ঘোষণা করলেন তখন উল্লেখিত দু'টি কথা, যা প্রথম ঘোষণার ছদ্মাবরণে সৃষ্টি হয়েছিল, সকলের অন্তর থেকে একদম উবে গেল। উপরন্তু হযরত হাসানের ওফাতের পর পরই মুআবিয়া কর্তৃক এই কর্মপন্থা গ্রহণ করায় মানুষের মাঝে নানা ধরনের সন্দেহ সৃষ্টি হতে লাগল। কেউ কেউ তো এই মন্তব্য করে বসল যে, আমীরে মুআবিয়ার ইঙ্গিতেই ইমাম হাসান (রা)-কে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়েছিল। ইয়াযীদের যুবরাজ সম্পর্কে ঘোষণা দেওয়ার পূর্বে এমন কথা কেউ চিন্তাও করতে পারেনি যে, ইমাম হাসানের ওফাত এবং মুআবিয়ার এই কর্মপন্থার মধ্যে কোন সম্পর্ক আছে বা থাকতে পারে। তবে সন্দেহ নেই যে, মুআবিয়া (রা) ইমাম হাসানকে বিষ প্রয়োগে হত্যার সাথে মোটেই জড়িত ছিলেন না। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, মুগীরা (রা) ইমাম হাসান (রা)-এর ওফাতের পরে ইয়াযীদকে যুবরাজ করার ব্যাপার মুআবিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। অন্যথায় তিনি তখন পর্যন্ত এ ব্যাপারে কোন চিন্তাই করেন নি।

মুগীরাই সর্বপ্রথম ইয়াযীদকে যুবরাজ করার ব্যাপারে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন এবং এটা বাস্তবায়নের ব্যাপারেও তিনি পালন করেছিলেন অগ্রণীর ভূমিকা। মুআবিয়া (রা) মারওয়ানের পত্র মারফত মদীনা ও হিজাযবাসীদের বিরোধিতার সংবাদ শুনে কিছুটা থমকে গিয়েছিলেন। কিভাবে মদীনাবাসীদের স্বমতে আনা যায় সে ব্যাপারে তিনি চিন্তাভাবনা করেছিলেন এমন সময় এই সংবাদ এসে পৌঁছে যে, মুগীরা ইব্ন শু'বা কূফায় ইনতিকাল করেছেন। হিজরী ৫১ (৬৭১ খ্রি) সনের ঘটনা, মুগীরা (রা)-এর মৃত্যুর সংবাদ শুনে আমীরে মুআবিয়া যিয়াদের হাতে কূফার শাসনভার ন্যস্ত করেন। আর তখন থেকে যিয়াদকে 'হাকীমে ইরাকায়ন' বা 'বসরা ও কূফার শাসক' বলা হতে থাকে।

কূফায় যিয়াদ ইব্ন আবূ সুফিয়ান

যিয়াদ ইব্ন আবূ সুফিয়ানের হাতে বসরা ও কূফা উভয় অঞ্চলের শাসনক্ষমতা ন্যস্ত করার আরেকটি উদ্দেশ্য এও ছিল যে, সে যেরূপ ছলেবলে কৌশলে সমগ্র ইরাকবাসীকে ইয়াযীদের বায়আতের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে পারতো সেরূপ আর কারো পক্ষেই সম্ভব হতো না। মুগীরা ইব্ন

শু'বার মেযাজ কিছুটা নম্র ও উদার ছিল। কিন্তু যিয়াদ ইরাকীদের আসল প্রকৃতি সম্পর্কে খুব ভালোভাবে অবহিত ছিলেন। তিনি জানতেন, যতক্ষণ পর্যন্ত এদের সাথে কঠোর ব্যবহার করা না হবে ততক্ষণ এরা সরলপথে আসবে না এবং আসলেও টিকে থাকবে না। এ কারণেই ইরাকে তাঁর শাসনকাল ছিল খুবই সফল। আর তিনিই হচ্ছেন প্রথম ব্যক্তি, যাকে একাধারে কূফা ও বসরা উভয় অঞ্চলের শাসনকর্তা নিয়োগ করা হয়। পরবর্তীকালে তাঁর হাতে সমগ্র ইরানের এবং তুর্কিস্তান পর্যন্ত খুরাসানেরও শাসনভার ন্যস্ত করা হয়েছিল। যিয়াদ সামুরা ইবন্ জুনদুবকে বসরায় তাঁর সহকারী নিয়োগ করেন এবং নিজে দু'হাজার সৈন্য নিয়ে কূফার দিকে রওয়ানা হন। কূফার জামে মসজিদে গিয়ে প্রথমবারের মত বক্তৃতা দিতে শুরু করেন। কূফাবাসীরা, যারা যে কোন শাসকের বিরোধিতা করতে বা তাকে হেয় জ্ঞান করতে অভ্যস্ত ছিল, তার সাথে হাসি-তামাশা এমন কি চতুর্দিক থেকে তার উপর কংকর বর্ষণ করতে শুরু করে। যিয়াদ সঙ্গে সঙ্গে বক্তৃতা বন্ধ করে দেন এবং আপন সাথীদের নির্দেশ দেন, অবিলম্বে মসজিদ ঘেরাও করে ফেল এবং কাউকে বের হতে দিও না। এরপর তিনি একটি চেয়ার নিয়ে দরজায় বসে পড়েন এবং চার চার ব্যক্তিকে একসাথে ডেকে এনে তাদের শপথ দিয়ে জিজ্ঞেস করেন তারা কংকর নিক্ষেপ করেছে কিনা। শেষ পর্যন্ত ত্রিশ ব্যক্তি কংকর নিক্ষেপের কথা স্বীকার করে। যিয়াদ সঙ্গে সঙ্গে তাদের হত্যা করেন এবং বাকি সবাইকে ছেড়ে দেন। এভাবে বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে কূফাবাসীদেরকে আরো কিছু কঠোর শাস্তি দেন। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই তারা একেবারে শায়েস্তা হয়ে যায়। যিয়াদ ছয় মাস কূফায় এবং ছয় মাস বসরায় অবস্থান করতেন।

মুআবিয়া (রা) তাঁর সকল কর্মকর্তার নামে এই মর্মে একটি নির্দেশ পাঠান, 'তোমরা জনসাধারণের কাছে ইয়াযীদের গুণাবলী বর্ণনা কর এবং নিজ নিজ এলাকা থেকে গণ্যমান্য ব্যক্তিদের একটি প্রতিনিধিদল আমার কাছে পাঠাও, যাতে আমি ইয়াযীদের বায়আতের ব্যাপারে তাদের সাথে সরাসরি আলাপ করতে পারি।' এই নির্দেশ জারি করার পর প্রতি প্রদেশ থেকেই এক একটি প্রতিনিধিদল দামিশকে আসে এবং আমীরে মুআবিয়া তাদের সাথে পৃথক পৃথকভাবে কথাবার্তা বলেন। এরপর তিনি একটি সাধারণ সভায় সকলকে একত্র করে একটি ভাষণ দেন। তিনি প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা, রাসূলের প্রশস্তি ও ইসলামের সৌন্দর্য বর্ণনা করেন। এরপর খলীফাদের দায়িত্ব ও অধিকার, কর্মকর্তাদের আনুগত্য এবং জনসাধারণের করণীয় সম্পর্কে একটি বিশদ বর্ণনা দিয়ে ইয়াযীদের বীরত্ব, বদান্যতা, বিচার-বুদ্ধি এবং প্রশাসনিক যোগ্যতার উল্লেখ করে মন্তব্য করেন যে, ইয়াযীদের যুবরাজের ব্যাপারে সকলেরই একমত হওয়া উচিত। মদীনার প্রতিনিধিদলের সাথে মুহাম্মদ ইব্ন আমর ইব্ন হাযম দামিশকে এসেছিলেন। তিনি দাঁড়িয়ে বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি তো ইয়াযীদকে খলীফা বানাতে চলেছেন। কিন্তু কিয়ামতের দিন এজন্য যে আপনাকে আল্লাহ্র সমীপে জবাবদিহি করতে হবে একথা কি একবারও ভেবে দেখেছেন ? একথা শুনে আমীরে মুআবিয়া বলেন, আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে, আপনি আপনার অভিমত সোজাসুজি ব্যক্ত করে আমাকে উপকৃত করেছেন। কিন্তু ব্যাপার এই যে, এখন তো শুধু আমাদের ছেলেরাই রয়ে

গেছে। আর তাদের মধ্যে আমার ছেলেই সর্বাধিক যোগ্য। এরপর দাহ্হাক ইব্ন কায়স দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেন। তিনি আমীরে মুআবিয়ার ইচ্ছাকে অত্যন্ত জোরেশোরে সমর্থন করেন। এরপর বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিনিধিরা একের পর এক দাঁড়িয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত সমর্থন করেন। মিসর থেকে আহনাফ ইব্ন কায়স (রা) এসেছিলেন। সকলের বক্তব্য শেষ হবে মুআবিয়া (রা) তাঁকে সম্বোধন করে বলেন, আপনি নিশ্চুপ কেন? তিনি উত্তর দেন, যদি মিথ্যা বলি তাহলে আল্লাহ্র ভয় আর যদি সত্যি বলি তাহলে আপনার ভয়। আপনি এ ব্যাপারে আমাদের পরামর্শই বা নিচ্ছেন কেন। ইয়াযীদের অবস্থা সম্পর্কে তো আপনি আমাদের চাইতে অনেক বেশি ওয়াকিফহাল। আপনার যিম্মাদারীর উপর আমরা বায়আত করতে রাযী আছি। মুআবিয়া (রা) আহনাফের কথাগুলো অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে শ্রবণ করেন এবং পরে তাঁকে প্রচুর উপঢৌকন দিয়ে বিদায় দেন। অনুরূপভাবে বহিরাগত সকল প্রতিনিধিকেই প্রচুর উপহার-উপঢৌকন প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে মুআবিয়া (রা) হিজায অর্থাৎ মক্কা-মদীনার অধিবাসীদের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখেন। কেননা সেখানে এমন লোক বিদ্যমান ছিলেন যাঁরা সাহসের সাথে তাঁর ঐ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করতে পারতেন। মুআবিয়া (রা) হিজরী ৫১ (৬৭১ খ্রি) সনের শেষ দিকে হজ্জে যাওয়ার সংকল্প নেন। হিজাযবাসীদের স্বমতে নিয়ে আসাটাও এর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। যাহোক তিনি প্রথমে মদীনায় পৌঁছেন। কিন্তু তাঁর আগমনের সংবাদ পেয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস এবং হুসাইন (রা) মদীনা থেকে মক্কায় চলে যান। আমীরে মুআবিয়া মদীনায় পৌঁছে সেখানকার লোকদের নানাভাবে পুরস্কৃত ও সম্মানিত করেন। তাদেরকে স্বমতে নিয়ে আসেন। তিনি মারওয়ানকে নির্দেশ দেন, তুমি মদীনাবাসীদের ভাতা অবিলম্বে বাড়িয়ে দাও, তাদের ঋণের প্রয়োজন হলে বায়তুলমাল থেকে নির্দ্বিধায় ঋণ দাও, কিন্তু তা পরিশোধের জন্য তাগাদা করো না, উপরন্তু যার পক্ষ থেকেই বিরোধিতার আশংকা কর তাদের কোন না কোনভাবে তোমার কাছে ঋণী করে রাখ। এরপর তিনি উপরোক্ত চার ব্যক্তিকে ডেকে পাঠান এবং ইয়াযীদের বায়আতের ব্যাপারে তাঁদের সাথে আলোচনা করেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলেন, আমি আপনাকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দিতে পারি যে, আপনার পরে যার খিলাফতের উপরই জনসাধারণ একমত হবে আমি তাকেই খলীফা বলে স্বীকার করে নেব। একটি কাফ্রী ক্রীতদাসকেও যদি জনসাধারণ খলীফা নির্বাচন করে তাহলে আমি তারই আনুগত্য করব এবং সংখ্যাধিক্যের রায়কেই মেনে নেব। আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) বলেন, আমি আপনার সামনে কয়েকটি কথা বলব। আপনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সুন্নত অনুসরণ করুন এবং খিলাফতের ব্যাপারে কারো নাম উল্লেখ না করে বিষয়টি মুসলমানদের হাতে ছেড়ে দিন। তারা যাকে ইচ্ছা তাদের খলীফা নির্বাচন করবে। যদি আপনি এটা পছন্দ না করেন তাহলে সুন্নতে সিদ্দিকী অনুসরণ করুন। অর্থাৎ এমন এক ব্যক্তিকে আপনার স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করুন, যিনি না আপনার আত্মীয়, আর না আপনার স্বগোত্রীয়। যদি আপনি এটাও পছন্দ না করেন তাহলে সুন্নতে ফারূকী অনুসরণ করুন। অর্থাৎ খলীফা পদের জন্য এমন ছয় ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করুণ, যাদের মধ্যে আপনার স্বগোত্রীয় কেউ থাকবে না এবং আপনার পুত্রও থাকবে না। ঐ ছয় ব্যক্তি নিজেদের মধ্য থেকে

যাকে ইচ্ছা খলীফা নির্বাচিত করবে। এই তিন পথ ছাড়া আর কোন পথ নেই যাতে আমরা সম্মত হতে পারি। আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়রের এই কথা বাকি তিনজনও সমর্থন করেন। মুআবিয়া (রা) হজ্জ সমাপনান্তে উল্লিখিত ব্যক্তিদের ছাড়া সমগ্র মক্কাবাসীর কাছ থেকে ইয়াযীদের (অলী আহদীর) যুবরাজের ব্যাপারে বায়আত গ্রহণ করেন এবং নিজের বদান্যতা ও দান-দক্ষিণা দ্বারা সকলের মনও জয় করে নেন। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ইয়াযীদের ব্যাপারে জনসাধারণকে নিজের সমমতাবলম্বী করতে গিয়ে আমীরে মুআবিয়া প্রচুর অর্থসম্পদ খরচ করেন। অবশ্য এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, ইয়াযীদকে ভাবী খলীফা নির্বাচনের মধ্যে ইসলামী বিশ্বের ও মুসলিম মিল্লাতের অধিকতর মঙ্গল নিহিত রয়েছে বলে তিনি মনে করতেন এবং এর যে ক্ষতিকর দিকটি ছিল তা তার নজরে পড়েনি। যাহোক হজ্জ সম্পাদনের পর তিনি দামিশক্ অভিমুখে রওয়ানা হন। সেখানে পৌঁছে তিনি সংবাদ পান যে, আবূ মূসা আশ'আরী ইনতিকাল করেছেন।

আমীরে মুআবিয়া ইতিপূর্বে যিয়াদকে বসরা ও কূফার শাসনকর্তা নিয়োগ করেছিলেন। সিজিস্তান এলাকাও তাঁর অধীনে ছিল। এবার তিনি সিন্ধু, কাবুল, বাল্‌খ, জায়হূন, তুর্কিস্তান পর্যন্ত সমগ্র প্রাচ্য অঞ্চল যিয়াদের শাসনাধীনে ন্যস্ত করেন। ফলে যিয়াদের মর্যাদা এত বেড়ে গিয়েছিল যে, তিনি নিজেই পারস্য, খুরাসান প্রভৃতি প্রদেশের গভর্নর নিয়োগ করতেন এবং যাকে ইচ্ছা পদচ্যুতও করতেন। যিয়াদ অত্যন্ত যোগ্যতা ও দক্ষতার সাথে প্রাচ্যের ঐ সমস্ত দেশে শাসনব্যবস্থা বহাল রাখেন এবং খারিজীদেরকে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার কোন সুযোগই দেন নি। এটা আমীরে মুআবিয়ার জন্য একটি সৌভাগ্যই বলতে হবে যে, তিনি যিয়াদের মত একজন বিচক্ষণ ও সুযোগ্য ব্যক্তিকে আপন সাহায্যকারী হিসাবে পেয়েছিলেন। যদি যিয়াদ প্রাচ্যের ঐ দেশসমূহে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে না পারতেন তাহলে খারিজীদের বিদ্রোহ এবং মুনাফিকদের ফিতনা ছড়িয়ে পড়ার কারণে মুআবিয়া (রা) এতই ব্যস্তত্রস্ত থাকতেন যে, ইয়াযীদের জন্য এভাবে ধীরে সুস্থে বায়আত গ্রহণের কোন অবকাশই তাঁর হতো না। উপরন্তু প্রাচ্য দেশসমূহের বিদ্রোহের ঢেউ পশ্চিমের অঞ্চলসমূহেও গিয়ে লাগত এবং রোমানদের আক্রমণের আশংকায়ও তিনি শান্তিতে থাকতে পারতেন না।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমরের পর মুআবিয়া (রা) মাসলামা ইব্ন মুখাল্লাদকে মিসর, আফ্রিকা প্রভৃতি অঞ্চলের শাসনকর্তা নিয়োগ করেছিলেন। উকবা ইব্ন নাফি আল-ফিহরীকে– যিনি পশ্চিম ত্রিপোলী, আলজিরিয়া ও মরক্কোর দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন এবং যাঁকে স্বয়ং মুআবিয়া (রা) এই অভিযানে প্রেরণ করেছিলেন, এবার মাসলামার অধীনস্থ করে দেওয়া হয়। মারওয়ান মদীনার এবং সাইয়িদ ইব্নুল 'আস মক্কার গভর্নর ছিলেন। সিরিয়া ও ফিলিস্তিন সরাসরি মুআবিয়ার শাসনাধীনে ছিল। ওদিকে উকবা উত্তর আফ্রিকার শাসন পরিচালনার সুবিধার্থে বন-জঙ্গল পরিষ্কার করে কায়রাওয়ান নামক জনবসতির ভিত্তি স্থাপন করেন। আফ্রিকার জন্য কায়রাওয়ানের সেনাছাউনি ততটুকু প্রয়োজনীয় ছিল যতটুকু প্রয়োজনীয় ছিল ইরাকের জন্য বসরা ও কূফার সেনাছাউনি। হিজরী ৫৫ সনে (৬৭৪-৭৫ খ্রি) কায়রাওয়ানের জনবসতি যখন জমজমাট হয়ে ওঠে, ঠিক তখনি মাসলামা উকবা ইব্ন নাফিকে পদচ্যুত করে তাঁর স্থলে আবুল

মুহাজির নামক আপন দাসকে সেনাপতি নিয়োগ করেন। উকবা দামিশ্‌কে আমীরে মুআবিয়ার কাছে চলে যান। মারওয়ান, সাইয়িদ, উকবা, যিয়াদ প্রমুখ সুযোগ্য ও বিচক্ষণ ব্যক্তিবৃন্দের সহায়তায় যখন সমগ্র মুসলিম বিশ্বে মুআবিয়া (রা)-এর শাসন ব্যবস্থা সুদৃঢ় হয়ে ওঠে তখনি হিজরী ৫৬ সনে (৬৭৫-৭৬ খ্রি) উলামাবৃন্দের মাধ্যমে ইয়াযীদের 'অলী আহ্‌দীর' জন্য সাধারণ বায়আত গ্রহণ করা হয়। শুধু তিন-চার ব্যক্তি অর্থাৎ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র, হুসায়ন ইব্‌ন আলী (রা) প্রমুখ ছাড়া সকলেই বায়আত করে। মুআবিয়া (রা) ঐ ব্যক্তিদেরকে তাঁদের অবস্থার উপরই ছেড়ে দেন এবং বায়আত করার জন্য তাঁদের উপর কোনরূপ চাপ সৃষ্টি করেন নি।

যিয়াদের মৃত্যু

হিজরী ৫৩ সনে (৬৭২-৭৩ খ্রি) যিয়াদ প্লেগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। তাঁর মৃত্যুতে আমীরে মুআবিয়া অত্যন্ত মর্মাহত হন। যিয়াদ তাঁর কাছে আবেদন করেছিলেন, যেন তাকে ইরাক ও পারস্য ছাড়াও হিজায ও আরবের শাসন ক্ষমতা প্রদান করা হয় এবং তিনি তার ঐ আবেদন মঞ্জুরও করেছিলেন। কিন্তু হিজাযবাসী এই সংবাদ শুনে যারপর নাই আতংকিত হয়ে পড়ে। তারা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমরের কাছে ছুটে গিয়ে যিয়াদের শাসন থেকে কি ভাবে রক্ষা পাওয়া যায় সে সম্পর্কে পরামর্শ চায়। তিনি তখন কেবলামুখী হয়ে দু'আ করেন এবং সবাই তাঁর সাথে 'আমীন' 'আমীন' বলে। সম্ভবত এই দু'আর ফলে যিয়াদের অঙ্গুলিতে একটি দানা (প্লেগের ক্ষুদ্র ফোঁড়া) ফুটে উঠে এবং তাতেই তার মৃত্যু হয়। যিয়াদ রমযান মাসে কূফায় মৃত্যুবরণ করেন। তিনি নিজের পক্ষ থেকে কূফার শাসন ক্ষমতা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন উসায়দের হাতে ন্যস্ত করেছিলেন। যিয়াদের মৃত্যুর পর তার পঁচিশ বছর বয়স্ক পুত্র আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদকে মুআবিয়া (রা) বলেন, 'বল, তোমার পিতা কার হাতে কোন্ অঞ্চলের শাসনভার ন্যস্ত করে গেছেন? আবদুল্লাহ্ বলে, তিনি বসরার শাসন ক্ষমতা সামুরা ইব্‌ন জুনদুবের হাতে এবং কূফার শাসন ক্ষমতা উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন খালিদের হাতে ন্যস্ত করে গেছেন। মুআবিয়া বলেন, তোমাকে কোন্ অঞ্চলের শাসনভার দিয়ে গেছেন? আবদুল্লাহ্ উত্তর দেয় ঃ আমার হাতে কোন অঞ্চলেরই শাসনভার দিয়ে যাননি। এরপর মুআবিয়া বলেন, তোমাকে তোমার পিতাই যখন কোন অঞ্চলের শাসনভার দিয়ে যাননি তখন আমি তা দেই কি করে? উবায়দুল্লাহ্ তখন বলে, আমার কাছে এর চাইতে বড় অপমান ও লাঞ্ছনা আর কী হতে পারে যে, আমার পিতাও আমাকে কোন অঞ্চলের শাসনভার দিয়ে যাননি এবং আপনি চাচা হয়েও আমাকে কোন মর্যাদা দিচ্ছেন না? মুআবিয়া (রা) কিছুক্ষণ চিন্তা করেন এবং উবায়দুল্লাহ্ যে যথার্থ যোগ্যতার অধিকারী সে কথা বুঝতে পেরে তাকে বসরা, খুরাসান ও পারস্যের প্রধান শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। সাঈদ ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন আফফান ইয়াযীদের 'অলী আহ্‌দীর' বায়আত করেছিলেন। কিন্তু যখন জানতে পারলেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস, হুসায়ন ইব্‌ন আলী (রা) প্রমুখ বায়আত করেননি তখন তিনিও বলে উঠেন, আমার পিতা তো ওদের পিতার চাইতে কম ছিলেন না। অতএব ইয়াযীদের জন্য বায়আত করে আমি অন্যায়ই করেছি। এরপর তিনি আমীরে মুআবিয়ার খিদমতে হাযির হয়ে নিবেদন

করেন, আমার পিতা আপনার কোন ক্ষতি করেননি। এবার বলুন, আপনি আমার কি উপকার করেছেন ? তখন আমীরে মুআবিয়া উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদের কাছ থেকে খুরাসান প্রদেশ ছাড়িয়ে নিয়ে সাঈদকে সেখানকার গভর্নর নিয়োগ করেন এবং মুহাল্লাব ইব্ন আবূ সুফরাকে নিয়োগ করেন একাধারে তার সহকারী ও সেনাধ্যক্ষ। যিয়াদের পর তিনি মারওয়ান ও সাঈদকে পুনরায় মদীনা ও মক্কার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন।

যিয়াদের মৃত্যুর সাথে সাথে খারিজীরা পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদকে বসরায় সর্বপ্রথম খারিজীদেরই মুকাবিলা করতে হয়। খারিজীদের বিভিন্ন দল-উপদল অনবরত বিদ্রোহ করতে থাকে। তাই আমীরে মুআবিয়ার মৃত্যু পর্যন্ত উবায়দুল্লাহ্ খারিজী দমনেই ব্যস্ত থাকে।

হযরত আয়েশা (রা)-এর ইন্তিকাল

হিজরী ৫৮ সনে (৬৭৭-৭৮ খ্রি) উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) ইনতিকাল করেন। তাঁকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়। তিনি মারওয়ানের বিপক্ষেই ছিলেন। কেননা তার কর্মকাণ্ড সুবিধাজনক ছিল না। একদা মারওয়ান তাঁকে দাওয়াতদানের ছলে ধোঁকা দিয়ে ডেকে নিয়ে একটি গর্তের মধ্যে ফেলে দেয়। ঐ গর্তে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী উলংগ তরবারি, খঞ্জর ইত্যাদি রেখে দেওয়া হয়েছিল। হযরত আয়েশা (রা) তখন এমনিতেই অত্যন্ত বৃদ্ধ ও দুর্বল ছিলেন। তাই গর্তে পতিত হয়ে ভীষণভাবে আহত হওয়ার কারণে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ইনতিকাল করেন।

হিজরী ৫৯ সনে (৬৭৮-৭৯ খ্রি) হযরত আবূ হুরায়রা (রা) ইনতিকাল করেন। তিনি প্রায়ই দু'আ করতেন, আল্লাহ্! আমি ছেলে-ছোকরাদের শাসন থেকে এবং হিজরী ৬০ সন (৬৭৯-৮০ খ্রি) থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর দু'আ কবুল করেন এবং হিজরী ৬০ সনের পূর্বেই তিনি ইনতিকাল করেন।

মুআবিয়া (রা)-এর ইন্তিকাল

হিজরী ৬০ সনের রজব (৬৮০ খ্রি-এর এপ্রিল) মাসের প্রথম দিকে হযরত মুআবিয়া (রা) অসুস্থ হয়ে পড়েন। যখন তিনি বুঝতে পারেন যে, তাঁর শেষ দিন ঘনিয়ে এসেছে তখন তিনি ইয়াযীদকে ডেকে পাঠান। কিন্তু ইয়াযীদ তখন শিকার বা এ জাতীয় কোন অভিযানে দামিশ্কের বাইরে ছিল। সঙ্গে সঙ্গে লোক পাঠিয়ে তাকে দামিশ্কে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা হয়। ইয়াযীদ এসে পৌঁছলে মুআবিয়া (রা) তাঁকে সম্বোধন করে বলেন ঃ

"বৎস! আমার ওসীয়ত (অন্তিম উপদেশ) মনোযোগ দিয়ে শোন এবং আমার প্রশ্নাবলীর উত্তর দাও। আল্লাহ্ তা'আলার ফরমান অর্থাৎ আমার মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে। এবার বল, আমার পরে মুসলমানদের সাথে তুমি কিরূপ ব্যবহার করবে ? ইয়াযীদ উত্তর দেয় ঃ আমি আল্লাহ্র কিতাব ও রাসূলের সুন্নত অনুসরণ করব।

আমীরে মুআবিয়া বলেন ঃ 'সুন্নতে সিদ্দিকীর উপরও আমল করা উচিত। কেননা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) মুরতাদদের সাথে লড়েছেন এবং এমন অবস্থায় ইনতিকাল করেছেন যে, সমগ্র উম্মত তাঁর উপর সন্তুষ্ট ছিল।

পুত্র ঃ না, শুধু আল্লাহ্‌র কিতাব ও রাসূলের সুন্নত অনুসরণই যথেষ্ট।

পিতা ঃ বৎস! সীরাতে উমরের অনুসরণ কর। কেননা তিনি শহরসমূহ আবাদ করেছেন, সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করেছেন এবং তাদের মধ্যে গনীমতের মাল বণ্টন করেছেন।

পুত্র ঃ না, শুধু আল্লাহ্‌র কিতাব ও রাসূলের সুন্নত অনুসরণই যথেষ্ট।

পিতা ঃ বৎস! সীরাতে উসমানের অনুসরণ করবে। কেননা তিনি তাঁর জীবনে মানুষের অভূতপূর্ব কল্যাণ সাধন করেছেন এবং আল্লাহ্‌র পথে অকাতরে ধন-সম্পদ বিলিয়ে দিয়েছেন।

পুত্র ঃ না, শুধু আল্লাহ্‌র কিতাব ও রাসূলের সুন্নতই আমার জন্য যথেষ্ট।

মুআবিয়া (রা) একথা শুনে বলেন, বৎস! তোমার এই সমস্ত কথায় আমার এ বিশ্বাস জন্মেছে যে, তুমি আমার উপদেশ অনুযায়ী কাজ করবে না, বরং তুমি আমার বিরোধিতাই করবে। হে ইয়াযীদ! তুমি দম্ভ কর না যে, আমি তোমাকে তোমার আনুগত্যের অঙ্গীকার করেছি এবং সকল লোক তোমার আনুগত্যের অঙ্গীকার করেছে। এবার একটি জরুরী কথা শোন! আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমরের পক্ষ থেকে তোমার ভয়ের কোন কারণ নেই। কেননা সে দুনিয়াবিমুখ। হুসায়ন ইব্‌ন আলীকে ইরাকবাসীরা অবশ্যই তোমার বিরুদ্ধে দাঁড় করাবে। যদি তুমি তাঁর উপর জয়ী হও তাহলে তাঁকে কখনো হত্যা করবে না, বরং তাঁর সাথে আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখবে।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র হচ্ছে ফেরেববাজ, কাবুতে পেলে তুমি তাকে হত্যা করবে। সব সময় মক্কা ও মদীনাবাসীদের সাথে সৌজন্যমূলক ব্যবহার করবে। ইরাকবাসীরা যদি তোমাকে প্রতিদিনই তাঁদের কর্মকর্তা পরিবর্তন করতে বলে তাহলে তাদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য তুমি তাই করবে। সিরিয়াবাসীদেরকে সব সময় নিজের সাহায্যকারী মনে করবে এবং তাদের বন্ধুত্বের উপর ভরসা রাখবে।

এরপর ইয়াযীদ পুনরায় শিকারে চলে যান। মুআবিয়া (রা)-এর অবস্থার দ্রুত অবনতি হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত হিজরী ৬০ সনের ২২শে রজব (৬৮০ খ্রি এপ্রিল) বৃহস্পতিবার সত্তর বছর বয়সে তিনি ইনতিকাল করেন। তাঁর কাছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কিছু চুল ও নখ ছিল। মৃত্যুকালে তিনি ওসীয়ত করেছিরেন যেন এই চুল ও নখ তাঁর মুখে ও চোখে রেখে দেওয়া হয়। দাহ্‌হাক ইব্‌ন কায়স তাঁর জানাযার সালাত পড়ান। তাঁকে দামিশ্‌কের 'বাবে জাবিয়া' ও 'বাবে সগীরের' মধ্যবর্তী স্থানে দাফন করা হয়।

এক নজরে আমীরে মুআবিয়ার শাসনকাল

আমীরে মুআবিয়া (রা)-এর ২০ বছরব্যাপী শাসনকালকে অবশ্যই একটি সফল শাসনকাল বলা যেতে পারে। কেননা তাঁর সময়ে অন্য কেউ খিলাফতের দাবি উত্থাপন করতে পারেনি, বা তাঁর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায়ও নামতে পারেনি। তাঁর আমলে পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ সব দিকেই ইসলামী রাষ্ট্রের আয়তন বৃদ্ধি পায় এবং কোন প্রদেশ বা কোন অঞ্চলই ইসলামী রাষ্ট্র থেকে বের হয়ে যায়নি। উল্লেখযোগ্য কোন বিদ্রোহও সংঘটিত হয়নি। ইসলামী রাষ্ট্রের কোথাও ডাকাতি বা দাঙ্গা-হাঙ্গামা পরিলক্ষিত হয়নি (যেমন হযরত আলীর খিলাফত আমলে ইরাক ও ইরানে পরিলক্ষিত হতো)। ঐ যুগেই মুসলমানরা নৌ-অভিযান শুরু করে এবং রোমান

খ্রিস্টানরা মুসলিম নৌশক্তির কাছে হার মানে। ঐ সময়ে যিয়াদ এবং অন্য কিছু সংখ্যক শাসনকর্তা ইরাকী ও ইরানীদের সাথে অত্যন্ত কঠোর ব্যবহার করে সত্য, তবে এরূপ করা না হলে সেখানে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা কোনমতেই সম্ভব হতো না। মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম আমীরে মুআবিয়াই ডাক প্রথার প্রচলন করেন এবং এজন্য সুনির্দিষ্ট আইন-কানুনও রচনা করেন। প্রতিটি সরকারী আদেশের উপর মোহর লাগানোর এবং প্রতিটি নির্দেশের অফিস কপি সংরক্ষণের প্রথা তিনি উদ্ভাবন করেন। আমীরে মুআবিয়ার মোহরের উপর لكل عمل ثواب (প্রতিটি কাজেরই পুরস্কার রয়েছে) কথাটি খোদিত থাকত। তখন পর্যন্ত কা'বার গিলাফ চড়িয়ে দেওয়া হতো। তিনি সমস্ত পুরাতন গিলাফ নামিয়ে ফেলেন এবং নির্দেশ দেন যেন নতুন গিলাফ চড়াবার সময় পুরাতন গিলাফ নামিয়ে ফেলা হয়। ইসলামী সমাজে সর্বপ্রথম আমীরে মুআবিয়াই পাহারাদার ও দারোয়ান নিয়োগ করেন। ডাক বিভাগ এবং রেজিস্ট্রেশন বিভাগ তিনিই প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন। মুসিলম খলীফা ও শাসকদের মধ্যে তিনিই প্রথম জাহাজ নির্মাণ কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন এবং নৌবাহিনীও গঠন করেন।

মুআবিয়া (রা) আপন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং আপন গোত্রকে বনূ হাশিম গোত্রের উপর প্রাধান্য দানের ব্যাপারে আপোসহীন ছিলেন সত্যি, তবে তিনি এ ব্যাপারে এমন কাউকে নাক গলাতে দেননি, যে বনূ ইমাইয়া ও বনূ হাশিম কিংবা মুআবিয়া ও আলী উভয়েরই শত্রু এবং ইসলামী রাষ্ট্রের ক্ষতি সাধনে তৎপর। যখন মুআবিয়া ও আলী (রা)-এর মধ্যকার বিরোধ চরমে ওঠে তখন খ্রিস্টানদের একটি শক্তিশালী বাহিনী আলীর শাসনাধীন ইরানের উত্তরাঞ্চলীয় প্রদেশসমূহের উপর হামলা করার পরিকল্পনা নেয়। মুসলমানদের অনৈক্য ও পরস্পর বিরোধিতা থেকে সুবিধা আদায়ের উদ্দেশ্যেই তারা অনুরূপ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। কেননা আলী (রা) তখন যে অবস্থায় ছিলেন তাতে খ্রিস্টানদের হামলা থেকে ঐ সমস্ত এলাকা রক্ষার কোন চেষ্টাই তিনি করতে পারতেন না। খ্রিস্টানরা যদি তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী হামলা করে বসত তাহলে ইসলামী রাষ্ট্রের একটি বিরাট ভূখণ্ড খ্রিস্টান শাসনাধীনে চলে যেত। তারা আলী (রা)-এর অসুবিধা সম্পর্কে অবহিত ছিল, অপর দিকে আমীরে মুআবিয়ার পক্ষ থেকেও তারা ছিল নিশ্চিন্ত। কেননা তাঁর ও আলী (রা)-এর মধ্যকার নিত্যদিনের বিরোধ তো তারা অহরহ প্রত্যক্ষ করছিল। তারা ধারণা করেছিল, আলীর উপর হামলা করা হলে মুআবিয়া নিশ্চয়ই খুশি হবেন। কিন্তু তিনি এই সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে কায়সারের কাছে একটি জরুরী চিঠি পাঠান। তাতে তিনি লিখেছিলেন, "আমাদের পরস্পরের বিবাদ যেন তোমাকে প্রতারিত না করে। যদি তুমি আলীর দিকে অগ্রসর হও তাহলে তাঁরই পতাকার নিচে সর্বাগ্রে যে সেনাপতি তোমাকে পর্যুদস্ত করতে এগিয়ে আসবে সে মুআবিয়া ছাড়া আর কেউ নয়।" মুআবিয়ার চিঠিতে সেই কাজ হলো, যা একটি বিরাট বাহিনী পাঠিয়েও সম্ভব হতো কিনা সন্দেহ। কেননা এই চিঠি পেয়ে খ্রিস্টানরা এতই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে যে, এরপর তারা আর ইসলামী রাষ্ট্র আক্রমণ করার সাহসই পায়নি।

আলী (রা) ও মুআবিয়া (রা)-এর মধ্যকার বিরোধের সেই প্রকৃতি মোটেই ছিল না, যা অজ্ঞতাবশত আজকালকার মুসলমানরা ধারণা করে থাকে। এ সম্পর্কে সঠিক ধারণা করতে হলে আমাদের একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, আলী (রা)-এর সহোদর ভাই আকীল আমীরে

মুআবিয়ারই সভাসদ ছিলেন। অপর দিকে আমীরে মুআবিয়ার ভাই যিয়াদ ছিলেন আলী (রা)-এর পক্ষ থেকে পারস্যের গভর্নর। যিয়াদ ছিলেন আলীর কাছে একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি, অপরদিকে আকীল আমীরে মুআবিয়ার যে কোন কাজের সমালোচনা করতে দ্বিধাবোধ করতেন না। এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি ছিলেন আমীরে মুআবিয়ার একান্ত অনুগ্রহভাজন।

একটি সন্দেহের অপনোদন

মুআবিয়া (রা)-এর খিলাফত সম্পর্কিত আলোচনা শেষ করার পূর্বে একটি সন্দেহের অপনোদন করা দরকার। তা এই যে, আলী (রা) ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতিপালিত, তাঁর আহলে বায়তের অন্তর্ভুক্ত, তাঁর সাথে সর্বদা অবস্থানকারী এবং তাঁর চাচাত ভাই ও জামাতা। আর মুআবিয়া (রা) ছিলেন ওহী লেখক, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বন্ধু, তার শ্যালক (হযরত উম্মে হাবীবার ভাই) এবং সাহাবী। তাহলে আলী ও মুআবিয়ার মধ্যে কেন বিরোধ দেখা দিয়েছিল এবং কেনইবা তাঁরা একে অন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন ? এরপর আমর ইব্‌নুল 'আস, তালহা, যুবায়র, হযরত আয়েশা (রা) প্রমুখ সাহাবীই বা ঐ বিরোধ ও লড়াইয়ে কেন অংশগ্রহণ করেছিলেন ? তাহলে তো সাহাবায়ে কিরামের পরস্পর যুদ্ধ এবং আজ-কালকার দুনিয়াদারদের মধ্যকার যুদ্ধের মধ্যে বাহ্যত কোন প্রভেদ পরিলক্ষিত হচ্ছে না। তাহলে কি এটা স্বীকার করে নিতে হবে যে, উল্লিখিত ব্যক্তিবৃন্দের উপর নবীর সাহচর্যের সেই প্রভাব পড়েনি, যা পড়া উচিত ছিল ? এই সন্দেহের উত্তর এই যে, প্রত্যেক সাহাবীই হচ্ছেন হিদায়াতের এক একটি নক্ষত্র। সাহাবীদের উপর নিঃসন্দেহে নবী সংসর্গের সেই প্রভাব পড়েছিল যা পড়া উচিত ছিল। আমরা আমাদের বিবেক-বুদ্ধির স্বল্পতা ও অদূরদর্শিতার কারণেই উক্ত প্রশ্ন বা সংশয়ের সম্মুখীন হই। আমাদের ভালোভাবে জেনে রাখা প্রয়োজন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে শরীয়ত নিয়ে এসেছেন তাতে মানব জাতির শান্তি ও মঙ্গল লাভের যাবতীয় নীতি ও আদর্শ পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান রয়েছে। তিনি সেই পরিপূর্ণ শরীয়ত প্রচারের গুরুদায়িত্ব পুরোপুরিভাবে আনজাম দিয়েছেন, যে শরীয়তের পর (কিয়ামত পর্যন্ত) আর কোন শরীয়ত আসবে না। এই শরীয়ত কিয়ামতের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সৌভাগ্য ও সাফল্য লাভ করতে হলে মানবজাতির জন্য এই শরীয়তের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। অতএব এ ধরনের একটি বিরাট সুমহান ও পরিপূর্ণ শরীয়তকে অন্যান্য শরীয়তের মত পরিবর্তন ও ধ্বংস থেকে বাঁচাতে হলে একটি বিরাট ব্যবস্থাপনারও প্রয়োজন। এ ব্যাপারে মানব জাতিকে সান্ত্বনা প্রদানের জন্য খোদ আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন ঃ

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحَافِظُوْنَ-

"আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষক" (১৫ ঃ ৯)।

অতএব জানা গেল যে, এই শরীয়তের হিদায়াত ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা প্রয়োজন অনুযায়ী খোদ আল্লাহ্ তা'আলাই করতে থাকবেন এবং গত চৌদ্দশ বছরের দীর্ঘ সময় পূর্বেও আমরা দেখেছি, স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর এই পরিপূর্ণ শরীয়ত সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। মায়ের গর্ভে অবস্থানকালীন সময়ে যখন আমরা নিজেরা নিজেদের হিফাযতের ব্যবস্থা করিনি, নিজেদের শস্যক্ষেত্রকে সবুজ-শ্যামল রাখার জন্য সমুদ্র থেকে বাষ্প উঠিয়ে মেঘ তৈরি করে

প্রবল বায়ুর মাধ্যমে বারি বর্ষণ করার পরামর্শ যখন আমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে দেইনি তখন আমাদের কী অধিকার আছে যে, আমরাই ইসলামী শরীয়তের হিফাযতের উপায় ও পন্থা নির্ধারণ করবো এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণে আল্লাহ্ তা'আলাকে বাধ্য করবো ? আমাদের মন তো চায় যে, আকাশ থেকে তৈরি রুটি বর্ষিত হোক এবং যমীন থেকে রান্না করা তরকারির হাঁড়ি আপনা আপনি বেরিয়ে পড়ুক। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলাকে তো আমাদের এই আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য বাধ্য করা যেতে পারে না। তিনি সূর্য কিরণের সাহায্যে সমুদ্রের পানি বাষ্পে পরিণত করেন, এরপর বায়ু স্তরের উষ্ণতা ও শীতলতা সেগুলোর মধ্যে পরিবর্তন সৃষ্টি করে বৃষ্টি বর্ষণ করে। এরপর কৃষকরা নিজেদের বলদ ও কৃষিকার্যের সামগ্রীর মাধ্যমে জমি চাষ করে, তারপর বীজ বপন করে। মেঘ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয়, চারা অংকুরিত হয়, এরপর চারার হিফাযত করা হয়। শেষ পর্যন্ত তাতে শস্য ধরে এবং তা পরিপক্ব হওয়ার পর কাটা হয়। তারপর শস্যদানাকে ভূষি থেকে পৃথক করা হয়, তারপর শস্যদানাকে চাকায় পিষে আটা তৈরি করা হয়। এরপর আটা মাখা হয়, তারপর বিশেষ পদ্ধতিতে তা থেকে রুটি তৈরি করা হয়। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে শুধু রুটি সরবরাহ করতে গিয়ে একটি দীর্ঘ ও জটিল প্রক্রিয়া নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

কিন্তু এটা আমাদের মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতারই লক্ষণ হবে, যদি আমরা উপরোক্ত প্রক্রিয়া নির্ধারণের জন্য আল্লাহ্‌কে অভিযুক্ত করি এবং আমাদেরই মনগড়া সংক্ষিপ্ত প্রক্রিয়াকে প্রাধান্য দেই। আল্লাহ্ তা'আলার কর্মধারাকে দীর্ঘসূত্রিতার অভিযোগে অভিযুক্ত করা প্রকৃতপক্ষে আমাদেরই অন্ধত্ব ও অদূরদর্শিতা ছাড়া কিছু নয়। কেননা তাঁর প্রতিটি কাজের মধ্যে যে অসীম হিকমত ও কৌশল নিহিত রয়েছে তা অনুধাবন করা আমাদের সীমিত শক্তি দ্বারা সম্ভব নয়।

উপরোক্ত পটভূমিতে পূর্বাপর বিষয়টি বিবেচনা করলে আমাদেরকে স্বীকার করতেই হবে যে, সাহাবীদের পরস্পর মতবিরোধ ও লড়াই-ঝগড়া আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে শরীয়তের হিফাযতেরই একটি উপাদান ছিল। এর মধ্যে নিহিত ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সেই বাণীর হিকমত ও রহস্য যাতে তিনি বলেছিলেন اختلاف امتى رحمة (আমার উম্মতের মত-বিরোধের মধ্যে রহমত নিহিত রয়েছে)। কিন্তু আমরা অযোগ্যরা আল্লাহ্ তা'আলার এই রহমত বা আশীর্বাদকে অভিশাপে পরিণত করেছি এবং এ থেকে উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণের পরিবর্তে পথভ্রষ্টতা ও গোমরাহীকে বেছে নিয়েছি। বিষয়টির বিস্তারিত বিবরণ এই যে, আমীরে মুআবিয়া, আলী মুরতাযা (রা) এবং অন্যান্য সাহাবীর পরস্পর মতবিরোধ তাদের ইজতিহাদের উপর ভিত্তিশীল। এক্ষেত্রে তাঁদের কারো ভুল হয়ে থাকলে সেটা ছিল ইজতিহাদী ভুল। তাঁরা যথেচ্ছভাবে বা রিপুর বশবর্তী হয়ে তা করেন নি। তাঁদের মধ্যে এমন কেউই ছিলেন না, যিনি জেনেশুনে ইসলামী শরীয়ত, আল্লাহ্‌র হুকুম ও রাসূলের সুন্নতের বিরোধিতা করতে পারেন।

আলী (রা) যা কিছু করেছেন তা তাঁর বিবেক মতে ন্যায় ও সত্য ছিল। অনুরূপভাবে মুআবিয়া (রা) যা করেছেন তা তিনি ন্যায় ও সত্য জেনেই করেছেন। অনুরূপ অবস্থা ছিল অন্যান্য সাহবীরও। যিনি যেটাকে ন্যায় ও সত্য মনে করেছেন তিনি সেটা গ্রহণ করেছেন। আর এসব কিছুই হয়েছে আল্লাহ্‌রই ইচ্ছানুযায়ী। এই অভ্যন্তরীণ ঝগড়া-বিবাদের সৃষ্টি করে সাহাবায়ে কিরামের একটি দলকে তাতে লিপ্ত করে দিয়েছিলেন। আর অপর একটি দল এই

ঝগড়া-বিবাদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করত রাষ্ট্র ও হুকুমতের যাবতীয় কার্যের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে নির্জন জীবন বেছে নিয়েছিলেন। এই অভ্যন্তরীণ মতবিরোধ যতদিন সৃষ্টি হয়নি, ততদিন সাহাবায়ে কিরাম তাঁদের যাবতীয় উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা কাফিরদের মুকাবিলায় নিয়োজিত রেখেছিলেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক ও উমর ফারূক (রা)-এর সমগ্র খিলাফতকাল ছিল ঐ সমস্ত সংঘর্ষ ও যুদ্ধবিগ্রহে পরিপূর্ণ। তখন সাহাবীগণ একতাবদ্ধ হয়ে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে শত্রুদের মুকাবিলা করেছিলেন এবং দেশের পর দেশ জয় করে ইসলামী রাষ্ট্রের আয়তন বৃদ্ধি করেছিলেন। উল্লিখিত দুই মহান খলীফার খিলাফতকালে যদিও কুরআন সংকলনের কাজ সমাপ্ত করা হয়, যা করা তখন অপরিহার্যও ছিল– কিন্তু এটা সম্ভব ছিল না যে, সাহাবায়ে কিরামের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক কিংবা তাঁদের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের একটি জামাআত অন্যান্য কাজ থেকে অবসর নিয়ে নিজেদের সমগ্র চিন্তা ও বিবেক শক্তিকে একাগ্রতার সাথে ফিক্‌হী মাসআলাসমূহের বিন্যাস ও রাসূলের হাদীসসমূহের হিফাযত ও প্রচারে নিয়োজিত রাখেন। মদীনা তখন এমন একটি সামরিক ক্যাম্পের রূপ ধারণ করেছিল, যার তাঁবুসমূহে প্রায় সব সময়ই যুদ্ধক্ষেত্রের নকশা খোলা থাকত এবং বড় বড় সমর কৌশলীরা সেগুলোর মাধ্যমে যুদ্ধপলিসি প্রণয়ন এবং বাহিনী অধিনাকদের অগ্রযাত্রার পরিকল্পনা তৈরিতে নিমগ্ন থাকতেন। দেশ জয়ের পরিধি যতই প্রশস্ত হতো, এই সামরিক ব্যস্ততাও ততই বৃদ্ধি পেত। ফলে ঐ সব ব্যক্তি যাঁরা এক একজন শিক্ষকরূপে শরীয়তের পাঠ শিক্ষা দিতেন এবং রহস্যাদি উদঘাটন করতেন তাঁরা তরবারি ধার এবং তীরের ফলা পরখ করার কাজেই ব্যস্ত থাকতেন এবং প্রয়োজনবোধে বল্লমের সামনে ঢালের পরিবর্তে নির্ভয়ে নিজেদের বুক পেতে দিতেন। পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা এবং মুসলমানদেরকে নির্ভীক করে তোলার জন্য ঐ যুগে এ ধরনের যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রয়োজনও ছিল। উসমানী খিলাফত আমলে ঐ লক্ষ্য অর্জিত হয়ে গিয়েছিল এবং সমগ্র বিশ্বে ইসলাম একটি বিজয়ী জীবন-ব্যবস্থা ও অতুলনীয় শক্তি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। এবার যে জিনিসটির প্রয়োজন ছিল তা হলো, ইসলাম যেন একটি পরিপূর্ণ জীবন-ব্যবস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, শরীয়তের সমগ্র দিক সংরক্ষিত ও সুরক্ষিত হয়ে যায় এবং সাহাবায়ে কিরাম এমন সুযোগ-সুবিধা বা অবকাশ পান যে, তাঁদের পরবর্তী বংশধরদের জন্য তাবিঈদের এমন একটি জামাআত সংগঠিত করতে সক্ষম হন, যাঁরা তাঁদের পরবর্তীদের শিক্ষিত করে তুলতে পারেন এবং এই ধারা অনন্তকাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। অতএব মহান আল্লাহ্ তা'আলাই আপন পরিপূর্ণ কুদরতে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাবা ও তার অনুসারী অর্থাৎ মুসলিমরূপী ইহুদীদের একটি জামাআত সৃষ্টি করে হযরত উসমানের শাহাদাত এবং জামালযুদ্ধ ও সিফ্‌ফীন যুদ্ধের উপাদানসমূহ তৈরি করে দেন যার ফলশ্রুতিতে অনেক সাহাবী, যাঁরা যুদ্ধক্ষেত্রে রুস্তম ও ইসফিন্‌দিয়ারের বীরত্ব গাঁথাকে চিরতরে ম্লান করে দিয়েছিলেন, নিজ নিজ তীর-ধনুক এবং তরবারিসমূহ দূরে নিক্ষেপ করে নিজ নিজ ঘরে ঢুকে পড়েন এবং সেনাপতিত্বের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে শিক্ষকতার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইরান-বিজেতা হযরত সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) যাঁর অধিনায়কত্বে কাদেসিয়ার রক্তক্ষয়ী যুদ্ধক্ষেত্র মুসলমানদের মুঠোয় এসে গিয়েছিল, ঐ অভ্যন্তরীণ বিরোধ চলাকালে নিজের জন্য সম্পূর্ণ কোলাহলমুক্ত নির্জন জীবন বেছে নিয়ে উট-বকরীর দল

দেখা-শোনার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। অনুরূপ অবস্থা আরো অনেক সাহাবীরই ছিল। দেশ জয়ের অগ্রযাত্রা বন্ধ এবং অভ্যন্তরীণ বিরোধ ছড়িয়ে পড়ার পর অনেক সাহাবীই তীর-তরবারির ব্যবহার হেয় দৃষ্টিতে দেখতে থাকেন। অভ্যন্তরীণ বিরোধ ছাড়া প্রকৃতপক্ষে এমন আর কোন কারণ ছিল না, যা তাঁদেরকে যুদ্ধক্ষেত্রের প্রথম সারি থেকে এভাবে পিছনে হটিয়ে নিয়ে আসতে পারত।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) ছিলেন এমন এক ব্যক্তি যাঁকে খলীফা বলে স্বীকার করে নেওয়ার জন্য সমগ্র ইসলামী বিশ্ব একমত হতে পারত। কিন্তু ঐ অভ্যন্তরীণ বিবাদ তাঁকে একদম ঘরমুখী করে ফেলে। এই পুস্তকের মধ্যে ঐ সমস্ত ব্যক্তির উল্লেখ বার বার এসেছে, যাঁরা কোন না কোনভাবে অভ্যন্তরীণ বিরোধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এক বিরাট সংখ্যক সাহাবী এমনও ছিলেন, যাঁরা এ সমস্ত বিবাদে অংশগ্রহণ করেন নি যার কারণে ঐ সমস্ত ঘটনা প্রসঙ্গে তাঁদের উল্লেখও আসেনি।

এই বিরাট দলটি অন্তর্বিরোধ চলাকালে ভক্তি-শ্রদ্ধার সাথে তাঁদের খিদমতে হাযির হওয়া লোকদের ইসলামী শরীয়ত শিক্ষা দিতেন এবং সীরাতে নবী সম্পর্কে তাঁদের অবহিত করতেন।

মদীনা ছিল মুহাজির ও আনসারদের কেন্দ্রভূমি আর কা'বা ঘরের অবস্থানের কারণে মক্কা ছিল ইসলামের দ্বিতীয় বৃহত্তম কেন্দ্র। যতক্ষণ পর্যন্ত সাহাবায়ে কিরাম শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দানের অবকাশ পান নি ততক্ষণ মদীনা ছিল ইসলামী রাষ্ট্রের রাজধানী। কিন্তু যখন আল্লাহ্ তা'আলা সাহাবায়ে কিরাম থেকে ইসলামী শিক্ষার কাজ নিতে চাইলেন তখন মদীনা থেকে রাজধানী হটিয়ে দিলেন। ফলে যে মদীনা কিছুদিন পূর্বেও সামরিক শক্তির কেন্দ্র ও সামরিক ছাউনি হিসেবে পরগণিত হতো, এবার দারুল উলূম তথা শিক্ষা কেন্দ্রে রূপান্তরিত। হাদীস ও ফিক্‌হ গ্রন্থাদি পর্যালোচনা করলে একথা পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, হাদীস, ফিক্‌হ ও তাফসীরের যাবতীয় উপাদান শুধু ঐ যুগেই সংগৃহীত ও সংরক্ষিত হয় যখন মুসলমানদের মধ্যে অন্তর্বিরোধ ছড়িয়ে পড়েছিল।

যদি ঐ বিবাদ ছড়িয়ে না পড়ত, যদি আমীরে মুআবিয়া ও আলীর মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ না হতো তাহলে আমরা আজ ইসলামী শরীয়তের একটি বিরাট ও অপরিহার্য অংশ থেকে বঞ্চিত থাকতাম। কিন্তু এই বিরোধ দেখা দিয়েছিল কেন ? দেখা দিয়েছিল এই জন্য যে, স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলাই এই দীনের সংরক্ষক। তিনি স্বয়ং এর হিফাযতের উপাদান সৃষ্টি করেন। অতএব তিনিই হযরত আলী ও আমীরে মুআবিয়ার মধ্যে মতবিরোধের সৃষ্টি করেছিলেন। এবার একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, প্রতিটি রাষ্ট্র, প্রতিটি সাম্রাজ্য এবং প্রতিটি সভ্যতা-সংস্কৃতির জন্য যে সব প্রতিবন্ধকতা বা বাধা-বিপত্তিই সৃষ্টি হওয়া সম্ভব এবং আজ পর্যন্ত বিশ্বে যা হয়েও এসেছে তার নমুনা হযরত আলী ও মুআবিয়ার বিবাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। আর অনুরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার পর সাধারণভাবে রাষ্ট্রনায়করা এবং ক্ষমতাসীন রাজা-বাদশাহরা আজ পর্যন্ত যে সমস্ত আচরণ বিধি অনুসরণ করেছেন সেগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম ও সর্বাধিক প্রশংসনীয় ছিল সেই সব আচরণ-বিধি, যা সাহাবায়ে কিরাম অনুসরণ করেছিলেন। বিভিন্ন সাম্রাজ্য ও বিভিন্ন জাতির উত্থান-পতন এবং বিভিন্ন রাজবংশের সাফল্য ও ব্যর্থতার ঘটনাবলীতে বিশ্ব ইতিহাস পরিপূর্ণ হয়ে আছে। অতি চালাকি, অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ এবং

প্রতারণা-প্রবঞ্চনার ঘটনাবলী থেকে কোন যুগ এবং কোন শাসনামলই মুক্ত নয়। এই সব ঘটনা সম্পর্কে যখন আমরা অনুসন্ধান চালাই তখন হযরত আলী ও মুআবিয়ার পরস্পর বিরোধের ধারা বিবরণী আমাদের সামনে একসাথে সকলেরই নমুনা পেশ করে এবং আমরা নিজেদের জন্য শ্রেষ্ঠতর একটি কর্মপন্থা নির্ধারণে সফলকাম হই। এটা আমাদেরই অন্ধত্ব ও অদূরদর্শিতা যে, আমরা সাহাবায়ে কিরামের ইজতিহাদী মতবিরোধ এবং আমীরে মুআবিয়া ও আলী (রা)-এর ঝগড়াকে আমাদের উপদেশ গ্রহণের উপাদান এবং শান্তি ও মঙ্গলের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ না করে নিজেদের ধ্বংস ও সর্বনাশের কারণ হিসাবে গ্রহণ করি। যে ব্যক্তি কোন জিনিসের বাহ্যিক আচরণ নিয়ে মশগুল থাকে তারা সে জিনিসের সারবস্তু খুঁজে পায় না। মিল্লাত বা দীনের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

আমার উপরোক্ত মন্তব্যকে উপলক্ষ করে কেউ হয়ত বলবেন, আমি ইতিহাস রচনায় সীমালংঘন করছি। কিন্তু আমি প্রথমেই স্বীকার করেছি যে, আমি একজন বিধর্মী হিসাবে এই গ্রন্থ রচনা করছি না বরং আমি একজন মুসলমান হিসাবে মুসলমানদেরই অধ্যয়নের জন্য এই গ্রন্থ রচনা করছি। অতএব কোন আপত্তিই আমার এ চিন্তাধারা প্রকাশের পথে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে পারবে না।

আমীরে মুআবিয়া (রা) অবস্থাদির বর্ণনা শেষ করার পূর্বে আমরা এখানে কোলকাতা হাইকোর্টের সাবেক বিচারপতি সৈয়দ আমীর আলী, যাঁকে শিয়া ও মুতাযিলী বলা হয়ে থাকে– ঐ সব উক্তির উদ্ধৃতি দিতে চাই, যা তিনি মাসউদীর বরাতে তাঁর 'তারীখে ইসলাম' শীর্ষক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি বলেছেন, আমীরে মুআবিয়া প্রত্যেক ফজরের নামাযের পর স্থানীয় ফৌজদার বা পুলিশ প্রধানের রিপোর্ট শুনতেন। এরপর মন্ত্রী, উপদেষ্টা ও সভাসদবৃন্দ রাষ্ট্রীয় কার্যাদি সম্পাদনের লক্ষ্যে তাঁর দরবারে হাযির হতেন। ঐ বৈঠকে পেশকাররা বিভিন্ন প্রদেশ ও বিভিন্ন অঞ্চলের প্রশাসকদের কাছ থেকে আগত চিঠি-পত্রাদি ও রিপোর্টসমূহ পড়ে শুনত। যুহরের সময় সালাত আদায়ের জন্য তিনি মহল থেকে বেরিয়ে আসতেন এবং সালাতে ইমামতি শেষে মসজিদেই বসে যেতেন। তিনি সেখানে জনসাধারণের মৌখিক অভিযোগসমূহ শুনতেন এবং তাদের আবেদন গ্রহণ করতেন। এরপর মহলে ফিরে এসে গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাক্ষাত দান করতেন। তারপর দুপুরের খাবার খেয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতেন। আসরের সালাত সমাপনান্তে তিনি মন্ত্রী, সভাসদ ও উপদেষ্টাদেরকে সাক্ষাত দান করতেন। রাতের বেলা দরবারে বসেই সবার সাথে খাবার খেতেন এবং আরেকবার জনসাধারণকে সাক্ষাতের সুযোগ দিয়ে সে দিনের মত অন্দর মহলে চলে যেতেন।

আমীরে মুআবিয়ার রাজত্বকালে রাষ্ট্রের ভিতরে বাইরে বিজয় অভিযান অব্যাহত থাকে। আমর ইবনুল 'আস (রা) বলেন, আমি মুআবিয়ার চাইতে ধীরস্থির ও ধৈর্যশীল লোক আর দেখি নি। একদা ঘটনাচক্রে আমি তাঁর মজলিসে হাযির ছিলাম। তিনি তাঁর আসনে হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। এমন সময় তাঁর কাছে একটি লিখিত রিপোর্ট এসে পৌঁছল। তাতে লেখা ছিল, রোম-সম্রাট তাঁর বাহিনী নিয়ে মুসলমানদের উপর হামলা পরিচালনার সংকল্প নিয়েছে। মুআবিয়া ঐ রিপোর্ট পড়ে কাগজটি আমার দিকে ছুঁড়ে মারেন। আমি তা পড়লাম এবং তিনি কি বলেন, সেই অপেক্ষায় রইলাম। কিন্তু তিনি একইভাবে বসে রইলেন এবং কিছুই বললেন না। কিছুক্ষণ পর আর একটি চিঠি এসে পৌঁছল। তাতে লেখা ছিল, নায়েল ইব্‌ন কায়স নামীয়

খারিজীদের জনৈক নেতা একটি বাহিনী সংগঠিত করে ফিলিস্তীন আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তিনি এই চিঠিও পড়লেন। এরপর কাগজটি আমার দিকে ছুঁড়ে মারলেন। কিন্তু মুখে কিছুই বললেন না। আমি এই চিঠিও পড়লাম এবং তিনি কি বলেন, সেই অপেক্ষায় রইলাম। কিন্তু তিনি একইভাবে বসে রইলেন। তাঁর চেহারার মধ্যে কোন পরিবর্তনই লক্ষ্য করা গেল না। এর কিছুক্ষণ পর আর একটি চিঠি এসে পৌঁছল। তাতে লেখা ছিল, মাওসিলের জেলখানা ভেঙ্গে কয়েদীরা পালিয়ে গেছে এবং মাওসিলের সন্নিকটেই তাদের সমাবেশ হচ্ছে। তিনি এই চিঠি পড়েও আমার দিকে ছুঁড়ে মারলেন এবং একইভাবে হেলান দিয়ে স্বীয় আসনে বসে রইলেন। এর কিছুক্ষণ পর আর একটি চিঠি এসে পৌঁছল। তাতে লেখা ছিল, আলী (রা) এক বাহিনী নিয়ে সিরিয়া আক্রমণ করতে আসছেন। তিনি এই চিঠি পড়েও আমার দিকে ছুঁড়ে মারলেন এবং একইভাবে নিজ আসনে বসে রইলেন।

এরপর আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। আমি বললাম, চতুর্দিক থেকেই তো বিপদের খবর আসছে। এমতাবস্থায় আপনি কি করবেন ? তিনি বললেন, কায়সারের বাহিনী যদিও অনেক বিরাট, কিন্তু তিনি আমার সাথে সন্ধি করে ফিরে যাবেন। নায়েল ইব্ন কায়স স্বীয় আকীদার কারণে যুদ্ধ করছে এবং যে শহরটি দখল করে নিয়েছে তার উপর আপন কর্তৃত্ব বহাল রাখতে চায়। আমি ঐ শহরটি তার জন্য ছেড়ে দেব যাতে সে সেটা নিয়েই ব্যস্ত থাকে। যে সমস্ত খারিজী জেলখানা ভেঙ্গে পালিয়েছে তারা আল্লাহ্‌র জেলখানা থেকে কোথায় পালিয়ে যাবে ? কিন্তু আলীর ব্যাপারে আমার চেষ্টা-তদবীর ও চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন আছে। কিভাবে তাঁর থেকে উসমান হত্যার বদলা নেওয়া যায় আমি তাই ভাবছি। এরপর তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং প্রত্যেকটি বিষয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করে তদনুযায়ী নির্দেশও জারি করলেন। এরপর পূর্বের মতই আসনে হেলান দিয়ে বসে রইলেন।

উমর ফারূক (রা) সিরিয়ায় আমীরে মুআবিয়ার শানশওকত ও জাঁকজমক লক্ষ্য করে বলেছিলেন, যেভাবে ইরানে কিসরা ও রোমে কায়সার রয়েছে ঠিক সেভাবে আরবে রয়েছে মুআবিয়া।

সাহাবায়ে কিরামের শাসন ব্যবস্থার বিবরণী এখানেই শেষ হলো। আগামীতে আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়রের খিলাফত সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। আর এই খিলাফতই হচ্ছে সাহাবায়ে কিরামের সর্বশেষ খিলাফত বা সালতানাত।

ইয়াযীদ ইব্ন মুআবিয়া

আবু খালিদ ইয়াযীদ ইব্ন মুআবিয়া হিজরী ৬৫ (৬৮৪ খ্রি) অথবা ৬৬ (৬৮৫ খ্রি) সনে মুআবিয়া (রা) সমগ্র সিরিয়া প্রদেশের শাসক থাকাকালে জন্মগ্রহণ করেন। তার মাতার নাম ছিল মাইসূন বিনতি বাহ্‌দাল, যিনি ছিলেন বনু কাল্‌ব গোত্রের মেয়ে। তিনি অত্যন্ত হৃষ্টপুষ্ট লোক ছিলেন। তার গা ছিল ঘন চুলে ভরা। ইয়াযীদ জন্মগ্রহণ করেই তার ঘরে রাজসিক পরিবেশ দেখতে পান। মুআবিয়া (রা) ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ ও দূরদর্শী ব্যক্তি। তিনি ইয়াযীদের শিক্ষাদীক্ষার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। দু'-একবার তিনি তাকে 'আমীরে হজ্জ' করে পাঠান। একবার সেনাবাহিনীর অধিনায়কও নিয়োগ করেন। কনসটান্টিনোপল আক্রমণ ও

অবরোধেও ইয়াযীদ মুসলিম বাহিনীর একটি অংশের অধিনায়ক ছিলেন। শিকারের প্রতি তার অত্যন্ত ঝোঁক ছিল। মুআবিয়া (রা) যখন মৃত্যু ব্যাধিতে আক্রান্ত তখন ইয়াযীদ দামিশ্‌কে ছিলেন না। লোক মারফত তাকে ডেকে পাঠানো হয় এবং মুআবিয়া (রা) তার উদ্দেশ্যে কিছু ওসীয়ত করেন। কিন্তু তিনি পিতার এই ব্যাধিকে মারাত্মক মনে না করে পুনরায় শিকারে চলে যান। তাই মুআবিয়া (রা) যখন ইনতিকাল করেন তখন ইয়াযীদ দামিশ্‌কে ছিলেন না। বেশ কয়েকদিন পর ফিরে আসেন এবং পিতার কবরের উপর জানাযার সালাত আদায় করেন। কাব্য রচনায়ও তার দক্ষতা ছিল। আমীরে মুআবিয়ার জীবনকালেই তার জন্য বায়আত নেওয়া হয়েছিল। এ কারণে জনসাধারণ তার প্রতি ছিল আরো অসন্তুষ্ট। মদীনার কিছু সংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তি তো তার জন্য বায়আত করতে অস্বীকারই করেছিলেন।

আপন জীবনকালে ইয়াযীদের পক্ষে বায়আত গ্রহণ করাটা মুআবিয়ার জন্য ছিল একটি মারাত্মক ভুল। খুব সম্ভবত পিতৃস্নেহের কারণে তিনি এই ভুলের শিকার হয়েছিলেন। কিন্তু মুগীরা ইব্‌ন শু'বা তাঁর চাইতেও বড় ভুল করেছিলেন। কেননা তাঁর পরামর্শেই মুআবিয়া (রা) অনুরূপ ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণে এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তা বাস্তবায়নে তৎপর হয়ে উঠেছিলেন। এ কারণেই হযরত হাসান বসরী (র) বলেছিলেন, মুগীরা ইব্‌ন শু'বা মুসলমানদের মধ্যে এমন একটি রীতি চালু হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন, ফলে পারস্পরিক পরামর্শের গুরুত্ব লোপ পেয়েছে এবং পিতার পর পুত্র রাষ্ট্রনায়ক হতে শুরু করেছে।

আমীরে মুআবিয়ার পর সিরিয়াবাসী আগ্রহ সহকারে ও সন্তুষ্টচিত্তে ইয়াযীদের হাতে বায়আত করে। অন্যান্য প্রদেশের লোকেরাও গভর্নরদের মাধ্যমে বায়আত করে। অন্তরে ঘৃণা বা অস্বীকৃতি থাকলেও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ভয়ে বাহ্যত সকলেই ইয়াযীদের কর্তৃত্ব মেনে নেয়। ইয়াযীদ রাষ্ট্রনায়কের আসনে বসেই সমগ্র প্রদেশ ও রাজ্যের কর্মকর্তাদেরকে অবিলম্বে তার নামে বায়আত গ্রহণের নির্দেশ দেন। ঐ সময়ে মদীনার শাসনকর্তা ছিলেন ওয়ালীদ ইব্‌ন উতবা ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান এবং কূফার শাসনকর্তা ছিলেন নু'মান ইব্‌ন বাশীর। এরা দু'জনই ছিলেন অত্যন্ত পুণ্যবান এবং আপোস মনোভাবাপন্ন। অন্যান্য শাসনকর্তার অনুপাতে তাদের স্বভাবে কঠোরতা ছিল না বললেই চলে।

যখন মদীনায় ওয়ালীদ ইব্‌ন উতবার কাছে ইয়াযীদের নির্দেশ পৌছে তখন তিনি মদীনার গণ্যমান্য ব্যক্তিদেরকে একত্র করে সে সম্পর্কে অবহিত করেন। ইমাম হুসাইন (রা) মুআবিয়া (রা)-এর ওফাতের সংবাদ শুনে আক্ষেপ করেন এবং তাঁর মাগফিরাতের জন্য দু'আ করেন। এরপর তিনি ওয়ালীদকে বলেন, এখনি আমার বায়আতের জন্য আপনি তাড়াহুড়া করবেন না। আমি ভেবে-চিন্তে একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব। মারওয়ান যিনি ইতিপূর্বে মদীনার শাসনকর্তা ছিলেন এবং এখন ওয়ালীদের অধীনে উপদেষ্টা হিসাবে নিয়োজিত, ওয়ালীদকে প্ররোচিত করেন যেন তিনি তখনই ইমাম হুসাইনের বায়আত গ্রহণ করেন এবং তাকে সেখান থেকে উঠে যেতে না দেন। কিন্তু ওয়ালীদ মারওয়ানের পরামর্শ গ্রহণ করেন নি, বরং পরবর্তী দিন পর্যন্ত তিনি ইমাম হুসাইনের বায়আত গ্রহণ মুলতবি রাখেন।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র ওয়ালীদের কাছে আসেননি। তাই তাকে ডাকা হয়। কিন্তু তিনি আসতে অস্বীকার করেন এবং এক রাতের অবকাশ চান। তাকেও ওয়ালীদ অবকাশ দেন।

কিন্তু রাতের এই সুযোগে ইব্‌ন যুবায়র (রা) তাঁর পরিবার-পরিজনসহ মদীনা থেকে বেরিয়ে যান এবং পরিচিত রাস্তা ছেড়ে অপরিচিত রাস্তা ধরে চলতে থাকেন। পরদিন তাঁকে গ্রেফতার করার জন্য মারওয়ান ও ওয়ালীদ ত্রিশ সদস্যের একটি বাহিনী নিয়ে বের হন, কিন্তু তারা কোথাও তাঁর সন্ধান পান নি। বিফল মনোরথ হয়ে তারা সন্ধ্যায় মদীনায় ফিরে আসেন। ঐ সম্পূর্ণ দিনটি যেহেতু ইব্‌ন যুবায়রের সন্ধানে কেটেছিল তাই তারা ইমাম হুসাইন (রা)-এর দিকে দৃষ্টি দেওয়ার অবকাশই পান নি। দ্বিতীয় রাতে তিনিও সুযোগ বুঝে আপন পরিবার-পরিজনসহ মদীনা থেকে বেরিয়ে যান। ভোরবেলা এই সংবাদ ওয়ালীদের কাছে পৌঁছলে তিনি বললেন, আমি ইমাম হুসাইনের পশ্চাদ্ধাবন করব না। এটা সম্ভব যে, তিনি আমার মুকাবিলা করবেন, যার কারণে তাঁর রক্তে আমার হাত রঞ্জিত হবে এবং এটা আমার কাছে মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। ঐ দুই ব্যক্তি চলে যাবার পর ওয়ালীদ ইব্‌ন উতবা মদীনাবাসীদের কাছ থেকে ইয়াযীদের পক্ষে বায়আত গ্রহণ করেন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-এর দিক থেকে কোন আশংকা ছিল না। কেননা খিলাফতের প্রতি তাঁর কোন মোহ ছিল না। এ দিকে ইয়াযীদও ওয়ালীদের কাছে লিখেছিল, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বায়আত না করলেও যেন তাঁর উপর চাপ প্রয়োগ করা না হয়। অতএব বায়আতের জন্য আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-কে কেউ কিছু বলেনি।

কিছু দিন পর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) মক্কায় চলে গিয়েছিলেন। ইয়াযীদ হারিস ইব্‌ন হুরকে শাসনকর্তা নিয়োগ করে মক্কায় পাঠিয়েছিল। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র এবং হুসাইন ইব্‌ন আলী (রা)-কে সাথে মক্কা গিয়ে উপনীত হন। তাদেরকে দেখামাত্র আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়া, যিনি ছিলেন মক্কার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের অন্যতম, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের হাতে বায়আত করেন। এরপর মক্কার দু'হাজার অভিজাত ও গণ্যমান্য ব্যক্তিও তাঁর হাতে বায়আত করেন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা) হারিসকে বন্দী করে মক্কার শাসনক্ষমতা নিজের হাতে তুলে নেন। ইমাম হুসাইন (রা) তখন মক্কায় অবস্থান করলেও তাঁর হাতে বায়আত করেন নি। তিনিও ইমাম হুসাইন বা তাঁর পরিবারবর্গকে বায়আত করতে বলেন নি। অনুরূপভাবে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা) তার বেশির ভাগ সময় কা'বাঘরে ইবাদতে অতিবাহিত করতেন। উল্লিখিত কয়েকজন ব্যক্তি ছাড়া সমগ্র মক্কাবাসী তাঁর হাতে বায়আত করে।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা) ইমাম হুসাইনের সাথে প্রায়ই সাক্ষাৎ করতেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর সাথে আলোচনাও করতেন। অবস্থা এমন মনে হতো, যেন ইব্‌ন যুবায়র (রা) জনগণের কাছ থেকে প্রকৃত অর্থে খিলাফতের বায়আত গ্রহণ করেন নি, বরং তাঁর এ বায়আত গ্রহণের উদ্দেশ্য শুধু এই ছিল যে, ইয়াযীদকে খলীফা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে না। আর যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে একজন খলীফা নির্বাচিত না হবেন ততক্ষণ দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা) মক্কার শাসন পরিচালনা করবেন। কিন্তু এখানকার শাসনক্ষমতা তাঁর হাতে অর্পিত হোক, এটা ইমাম হুসাইনের মনঃপূত ছিল না। আর এ কারণেই তিনি ও তাঁর পরিবারের লোকেরা ইব্‌ন যুবায়রের পিছনে নামায পড়তেন না এবং মসজিদের জামাআতেও শরীক হতেন না।

এদিকে ইব্‌ন যুবায়র এবং হুসাইন (রা)-এর মদীনা থেকে প্রস্থান এবং মদীনাবাসীদের বায়আত সম্পর্কে মারওয়ান ইয়াযীদকে অবহিত করেন। ইয়াযীদ সঙ্গে সঙ্গে ওয়ালীদ ইব্‌ন উতবাকে পদচ্যুত করে তার স্থলে আমর ইব্‌ন সাইয়িদ ইব্‌ন 'আসকে মদীনার শাসনকর্তা নিয়োগ করে পাঠান। আমর ইব্‌ন সাইয়িদ মদীনায় পৌঁছে শাসনভার গ্রহণ করেন এবং ওয়ালীদ ইব্‌ন উতবা মদীনা থেকেই ইয়াযীদের কাছে চলে যান। অপর দিকে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা) কর্তৃক মক্কার শাসনক্ষমতা দখল এবং হারিসকে বন্দী করার সংবাদ হারিস ইব্‌ন খালিদ, যিনি মক্কায় অবস্থান করছিলেন এবং ঘর থেকে বের হতেন না, ইয়াযীদের কাছে লিখে পাঠান। মক্কার অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর ইয়াযীদ আমর ইব্‌ন 'আস (রা)-কে লিখেন– আপনি অবিলম্বে মক্কায় গিয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রকে বন্দী করুন এবং তাঁর পায়ে বেড়ী লাগিয়ে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন। আমর (রা) একটি বিরাট বাহিনী মক্কায় প্রেরণ করেন। যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং তাতে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা) জয়লাভ করেন। তিনি মদীনা থেকে আগত বাহিনীর সেনাপতিকে বন্দী করতেও সক্ষম হন।

কূফাবাসীরা আমীরে মুআবিয়ার শাসন আমলেই ইমাম হুসাইন (রা)-এর কাছে চিঠিপত্র লিখত এবং বার বার এই মর্মে অনুরোধ জানাত ঃ আপনি কূফায় চলে আসুন, আমরা আপনার হাতে বায়আত করব। কূফাবাসীদের এই গোপন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আমীরে মুআবিয়াও অবহিত ছিলেন। ইমাম হাসান (রা) কূফাবাসীদের স্বভাব-প্রকৃতি ভালভাবেই আঁচ করে নিয়েছিলেন। তাই তিনি মৃত্যুর পূর্বে হুসাইন (রা)-কে ওসীয়ত করেছিলেন, তুমি কখনো কূফাবাসীদের ধোঁকায় পড়বে না। অপরদিকে আমীরে মুআবিয়া (রা) ইয়াযীদকে বলে গিয়েছিলেন, কূফাবাসীরা ইমাম হুসাইনকে বিদ্রোহ করতে প্ররোচিত করবে। যদি তেমন অবস্থা দেখা দেয় এবং তুমি তাঁর বিরুদ্ধে জয়ী হও তাহলে তাঁর সাথে ক্ষমাসুন্দর ব্যবহার করবে। যেহেতু মক্কার শাসনক্ষমতা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের হাতে এসে গিয়েছিল তাই ইমাম হুসাইনের দৃষ্টি সব সময় কূফার দিকে নিবদ্ধ থাকত। কূফার শাসনকর্তা নু'মান ইব্‌ন বশীরের কাছে যখন ইয়াযীদের চিঠি এসে পৌঁছল এবং সাধারণভাবে জানাজানি হয়ে গেল যে, আমীরে মুআবিয়া (রা) ইনতিকাল করেছেন, তখন শীআনে বনূ উমাইয়া সঙ্গে সঙ্গে নু'মান ইব্‌ন বশীরের হাতে ইয়াযীদের পক্ষে বায়আত করে। কিন্তু শীআনে আলী ও শীআনে হুসাইন, যারা প্রথম থেকেই ইমাম হুসাইনকে কূফায় ডেকে আনার চেষ্টা করছিল, ইয়াযীদের পক্ষে বায়আত করার ব্যাপারে ইতস্তত করে এবং সুলায়মান ইব্‌ন সারদের ঘরে একত্রিত হয়। সেখানে তারা সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, ইয়াযীদকে খলীফা বলে স্বীকার করা হবে না এবং ইমাম হুসাইনকে কূফায় ডেকে আনা হবে। তখনও এই গোপন পরামর্শ চলছিল এমন সময় তাদের কাছে এ সংবাদ এল যে, ইমাম হুসাইন (রা) মদীনা থেকে মক্কায় চলে গেছেন। কিন্তু মক্কাবাসীরা তাঁকে নয়, বরং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রকেই তাদের শাসনকর্তা মনোনীত করেছিল। অবশ্য ইমাম হুসাইন (রা) মক্কায়ই অবস্থান করছিলেন, তবে ইব্‌ন যুবায়রের হাতে বায়আত করেননি। অতএব তারা ইমাম হুসাইনের কাছে নিম্নোক্ত মর্মে একটি চিঠি লিখেন ঃ

"আমরা আপনার ও আপনার মহামান্য পিতার অনুরক্ত এবং বনূ উমাইয়ার শত্রু। আমরা আপনার পিতার পক্ষ নিয়ে তালহা ও যুবায়রের বিরুদ্ধে লড়েছি, সিফ্‌ফীনের যুদ্ধক্ষেত্রে

মুআবিয়ার বিরুদ্ধে লড়েছি এবং সিরিয়াবাসীদের বিষদাঁত ভেঙে দিয়েছি। এখন আমরা আপনার পক্ষেও যুদ্ধ করতে প্রস্তুত। আপনি এই চিঠি পাওয়া মাত্র কূফায় চলে আসুন। আপনি এলেই আমরা নু'মান ইব্ন বশীরকে হত্যা করে কূফার শাসনক্ষমতা আপনার হাতে তুলে দেব। কূফা ও ইরাকে একলক্ষ যোদ্ধা রয়েছে এবং তারা সকলেই আপনার হাতে বায়আত করার জন্য তৈরি হয়ে আছে। আমরা আপনাকে খিলাফতের হকদার মনে করি। ইয়াযীদ তো আপনার মুকাবিলায় খিলাফত লাভের কোন অধিকারই রাখে না। এটাই সুযোগ, অতএব আপনি মোটেই দেরি করবেন না। আমরা ইয়াযীদকে হত্যা করে আপনাকে সমগ্র ইসলামী বিশ্বের একক খলীফা বানাতে চাই। আমাদের দলের লোকেরা ইয়াযীদের কর্মকর্তা অর্থাৎ নু'মান ইব্ন বশীরের পিছনে নামায পড়া ছেড়ে দিয়েছে। কেননা আমরা একমাত্র আপনাকে এবং আপনার প্রতিনিধিদেরকেই ইমামতের যোগ্য মনে করি।"

মক্কায় যখন ইমাম হুসাইনের কাছে অনরবত এই মর্মের চিঠি পৌঁছতে থাকে তখন তিনি আপন চাচাত ভাই মুসলিম ইব্ন আকীলকে (ইনি হচ্ছেন সেই আকীল ইব্ন আবূ তালিবের পুত্র, যাকে আমীরে মুআবিয়া তাঁর বিশিষ্ট সভাসদ ও উপদেষ্টা নিয়োগ করেছিলেন।) ডেকে পাঠান এবং বলেন, তুমি আমার প্রতিনিধি হয়ে কূফায় যাও। সেখানে গোপনে যাবে, গোপনে অবস্থান করবে এবং গোপনে আমার নামে জনসাধারণের কাছ থেকে বায়আত নেবে। যে সমস্ত লোক তোমার হাতে বায়আত হবে তাদের মোট সংখ্যা এবং তাদের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নাম আমাকে লিখে জানাবে। তুমি নিজেকে গোপন করে রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। আর যারা বায়আতের অন্তর্ভুক্ত হবে তাদেরকে বুঝিয়ে বলবে, আমি সেখানে গিয়ে না পৌঁছা পর্যন্ত তারা যেন কোনমতেই যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে না পড়ে।

মুসলিম অত্যন্ত সতর্কতার সাথে, যাতে আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র টের না পায় মক্কা থেকে সেভাবে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে বিষয়টি সম্পর্কে তিনি চিন্তাভাবনা করেন এবং ইমাম হুসাইনের কাছে এই মর্মে একটি চিঠি লিখেন যে, আমাদের এই উদ্যোগের পরিণাম আমার কাছে ভাল মনে হচ্ছে না। আপনি আমাকে মাফ করুন এবং আমার পরিবর্তে অন্য কাউকে কূফায় পাঠান। কিন্তু ইমাম হুসাইন (রা) তাঁর কাছে লিখেন, 'তুমি তোমার ভীরুতা এভাবে প্রকাশ করো না। তুমি অবশ্যই কূফায় যাও।' অগত্যা মুসলিম ইব্ন আকীল কূফায় গিয়ে পৌঁছেন এবং মুখতার ইব্ন উবায়দার বাড়িতে আশ্রয় নেন। মুহূর্তের মধ্যে এই খবর 'শীআনে আলী'-এর ভিতরে ছড়িয়ে পড়ে। লোকেরা দলে দলে এসে বায়আত হতে শুরু করে। প্রথম দিনই বার হাজার লোক বায়আত হয়। মুসলিম ইমাম হুসাইনের কাছে সাধারণের বায়আত গ্রহণের কথা লিখে জানান। তিনি লিখেন, প্রথম দিনই বার হাজার লোক বায়আত করেছে যাদের মধ্যে সুলতান ইব্ন সারদ, মুসাইয়াব ইব্ন নাজিয়াহ, রিকাতা ইব্ন শাদ্দাদ এবং হানী ইব্ন উরওয়াহ অন্যতম। আপনি যখন আসবেন এবং প্রকাশ্য বায়আত নিতে শুরু করবেন তখন আপনার হাতে বায়আত হবে। কায়স ও আবদুর রহমান নামীয় দুই ব্যক্তি এই চিঠি নিয়ে ইমাম হুসাইনের কাছে যায়। তিনি চিঠি পড়ে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং পত্রবাহকদ্বয়কে এই বলে সঙ্গে সঙ্গে ফেরত পাঠিয়ে দেন যে, আমি শীঘ্রই কূফা আসছি। এবার তিনি আপন এক নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি আহনাফ ইব্ন মালিককে বসরার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নামে চিঠি লিখে

সেখানে প্রেরণ করেন। এখানে তাঁর পিতার অনেক ভক্ত ছিল। ঐ সব চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, আমার হাতে আপনাদের বায়আত হওয়া উচিত এবং আপনার অবিলম্বে কূফায় এসেও পৌঁছা উচিত।

কূফায় মুসলিম ইব্ন আকীলের আগমন এবং জনসাধারণের কাছ থেকে ইমাম হুসাইনের পক্ষে বায়আত গ্রহণের খবর জানাজানি হয়ে গেলে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুসলিম হাদরামী নু'মান ইব্ন বশীরের কাছে এসে বললেন, হে আমীর! যুগের খলীফার কাজে আপনার এরূপ ঢিলেমি করা উচিত নয়। কিছুদিন যাবত মুসলিম ইব্ন আকীল কূফায় এসে হুসাইন ইব্ন আলীর খিলাফতের জন্য জনসাধারণের কাছ থেকে বায়আত নিচ্ছেন। এমতাবস্থায় আপনার উচিত মুসলিমকে হত্যা করা অথবা গ্রেফতার করে ইয়াযীদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া। আর যারা এ যাবত হুসাইনের জন্য বায়আত করেছে তাদেরকে যথোপযুক্ত শাস্তি দেওয়া। নু'মান ইব্ন বশীর বললেন, এ সমস্ত লোক আমার অজান্তে যে কাজ করেছে তা প্রকাশ করা আমি সমীচীন মনে করি না। যতক্ষণ এরা আমার মুকাবিলা না করবে ততক্ষণ আমি তাদের আক্রমণ করব না। আবদুল্লাহ্ এই উত্তর শুনে বেরিয়ে আসেন এবং সাথে সাথে ইয়াযীদকে লিখেন ঃ

"মুসলিম ইব্ন আকীল কূফায় এসে হুসাইন ইব্ন আলীর খিলাফতের জন্য বায়আত নিচ্ছেন এবং বিপুল সংখ্যক মানুষ তাঁর হাতে বায়আত হয়েছে। এখানে হুসাইন ইব্ন আলীর আগমনের সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। নু'মান এ ব্যাপারে অত্যন্ত শিথিলতা প্রদর্শন করেছেন। যদি আপনি কূফা দখলে রাখতে চান তাহলে কোন শক্তিশালী গভর্নরকে অবিলম্বে কূফায় পাঠিয়ে দিন, যাতে তিনি এখানে এসে মুসলিমকে গ্রেফতার করেন। জনসাধারণের বায়আত থেকে বিরত রাখেন এবং হুসাইন ইব্ন আলীকে কূফা প্রবেশে বাধা দেন। এতে যদি বিলম্ব করেন তাহলে জানবেন, কূফা আপনার হাতছাড়া হয়ে গেছে।"

উমারা ইব্ন উকবা ও আবূ মুঈতও ইয়াযীদের কাছে একই মর্মে চিঠি লিখেন। এই সব চিঠি পড়ে ইয়াযীদ অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েন। সারজূন নামীয় হযরত আমীরে মুআবিয়ার একজন মুক্ত দাস ছিল। আমীরে মুআবিয়াও কোন কোন জটিল বিষয় এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তার পরামর্শ নিতেন এবং তাতে উপকৃতও হতেন। ইয়াযীদ তাকেই ডেকে পাঠান এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাদরামীর চিঠি দেখিয়ে তার পরামর্শ চান। এখানে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, ইয়াযীদ সব সময়ই যিয়াদ ইব্ন আবূ সুফিয়ানের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। যিয়াদের পর তার পুত্র উবায়দুল্লাহ্র প্রতিও অসন্তুষ্ট ছিলেন এবং তাকে আন্তরিকভাবে ঘৃণা করতেন। উবায়দুল্লাহ্কে আমীরে মুআবিয়া বসরার শাসনকর্তা নিয়োগ করেছিলেন। ইয়াযীদ বসরার গভর্নর পদ থেকে উবায়দুল্লাহ্কে বরখাস্ত করে অন্য কাউকে সেখানকার গভর্নর নিয়োগ করতে মনস্থ করছিলেন। কূফা থেকে ভয়ংকর সংবাদ আসার পর ইয়াযীদ আমীরে মুআবিয়ার মুক্তদাস সারজূনের কাছে পরামর্শ চাইলে সে নিবেদন করল, ইরাক আপনার দখল থেকে চলে যাবার উপক্রম হয়েছে।

এখন আপনি যদি ইরাককে রক্ষা করতে চান তাহলে এ ব্যাপারে উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদ ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি আপনাকে সাহায্য করতে পারবে না। আমি জানি, এই পরামর্শ আপনার মনঃপূত হবে না। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, ইব্ন যিয়াদ ব্যতীত যাকেই আপনি

কূফার গভর্নর করে পাঠাবেন সেই কূফা রক্ষার ব্যাপারে ব্যর্থতার পরিচয় দেবে। এক্ষেত্রে আমার পরামর্শ এই যে, যেরূপ আপনার পিতা উবায়দুল্লাহ্‌র পিতা যিয়াদকে বসরা ও কূফা উভয় প্রদেশের গভর্নর নিয়োগ করেছিলেন সেরূপ আপনিও উবায়দুল্লাহ্‌কে ঐ প্রদেশদ্বয়ের গভর্নর নিয়োগ করুন। বসরার জন্য অন্য কোন গভর্নর নিয়োগের প্রয়োজন নেই। ইয়াযীদ এই পরামর্শ শুনে কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর উবায়দুল্লাহ্‌র নামে নিম্নোক্ত নির্দেশ নামা পাঠান ঃ

"আমি বসরার সাথে কূফার শাসনক্ষমতাও তোমার হাতে অর্পণ করলাম। আমার এই নির্দেশ পৌঁছার সাথে সাথে তুমি কাউকে বসরায় তোমার স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করে অবিলম্বে কূফায় চলে যাও। সেখানে মুসলিম ইব্‌ন আকীল এসেছেন এবং ইমাম হুসাইনের পক্ষে বায়আত নিচ্ছেন। তুমি তাঁকে বন্দী কর অথবা হত্যা কর এবং যে সমস্ত লোক তাঁর হাতে বায়আত হয়েছে তারা যদি এ বায়আত প্রত্যাহার না করে তাহলে তাদেরকেও তরবারির আঘাতে খতম কর এবং এ জাতীয় যে কোন আশংকা প্রতিরোধ করার চেষ্টা কর।"

উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদের বিশ্বাস ছিল, ইয়াযীদ তাকে বসরার শাসনকর্তার পদ থেকে বরখাস্ত না করে ছাড়বে না। তাই এই নির্দেশনামা পেয়ে সে একাধারে বিস্মিত, আনন্দিত ও চিন্তিত হলো। কেননা তার অন্তরে এই আশংকারও সৃষ্টি হলো যে, ইয়াযীদ এই বাহানায় তাকে বসরা থেকে বের করতে চাচ্ছে। এতদ্‌সত্ত্বেও নির্দেশ পালন করাই সমীচীন মনে করে এবং আপন ভাই উসমানকে বসরায় নিজের স্থলাভিষিক্ত করে পরদিন কূফা অভিমুখে রওয়ানা হওয়ার সংকল্প নেয়। এরিমধ্যে মুনযির ইব্‌ন হারিছ তার কাছে দৌড়ে এসে বলে, হুসাইন ইব্‌ন আলীর একজন দূত এসেছে এবং জনসাধারণের কাছ থেকে গোপনে তাঁর পক্ষে বায়আত নিচ্ছে। এ খবর পেয়ে উবায়দুল্লাহ্ ঐ রাতেই ধোঁকা দিয়ে ইমাম হুসাইনের দূতকে বন্দী করে এবং পরদিন জনসাধারণকে একত্র করে একটি ভাষণ দেয়। তাতে সে বলে ঃ

"হুসাইন ইব্‌ন আলীর একজন দূত বসরায় এসেছে। সে এখানকার অনেক লোকের নামে লেখা ইমাম হুসাইনের পত্রাদিও নিয়ে এসেছে। আমি তাকে বন্দী করেছি। বসরার যে সব লোকের নামে সে চিঠি নিয়ে এসেছে আমি তার কাছ থেকেই তাদের নাম জেনে নিয়েছি। ইতিমধ্যে যারা বায়আত করেছে আমি তাদের নামের তালিকাও তৈরি করেছি। আপনারা অবশ্যই জানেন, আমি হচ্ছি যিয়াদ ইব্‌ন আবূ সুফিয়ানের পুত্র। মুসলিম ইব্‌ন আকীল কূফায় এসে অবস্থান করছে। আমি এখন কূফা যাচ্ছি। সেখানে গিয়ে আমি তাকে এবং যে সব লোক তার হাতে বায়আত হয়েছে তাদের সকলকেই হত্যা করব। যদি সমগ্র কূফাবাসী বায়আত করে থাকে তাহলে আমি সেখানকার একটি লোকও জীবিত রাখব না। এখন আমি তোমাদের প্রতি এই অনুগ্রহ করছি যে, হুসাইন ইব্‌ন আলীর দূত ছাড়া আমি তোমাদের কাউকে কিছু বলব না। কিন্তু এখান থেকে আমার চলে যাবার পর কেউ যদি একটুও কান নাড়ে তাহলে তার পরিণাম হবে ভয়ংকর।"

এই বলে ইমাম হুসাইনের দূতকে ডেকে এনে উপস্থিত জনতার সামনে প্রকাশ্যে হত্যা করে। ভয়ে কেউ তখন টু শব্দটিও করেনি। এই কাজ সেরে সে এবার কূফা রওয়ানা হয়। ইমাম হুসাইন (রা) মক্কায় বসে ধারণা করছিলেন যে, বসরায়ও তাঁর পক্ষে বায়আত নেয়া হয়ে থাকবে। কিন্তু হায়! এখানে যে তাঁর দূতকে হত্যা করা হচ্ছে। উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদ

কাদিসিয়ায় পৌঁছে সেখানে আপন অশ্বারোহী বাহিনী রেখে দিয়ে নিজে আপন পিতার মুক্তদাসকে সঙ্গে নিয়ে একটি উটের সওয়ার হয়ে অতি দ্রুতবেগে কূফা অভিমুখে রওয়ানা হয়। ঐ দিনই মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে সে কূফায় গিয়ে পৌঁছে। সে হিজাযী ভঙ্গিতে মাথায় পাগড়ি বেঁধেছিল। সেখানকার লোকেরা হযরত ইমাম হুসাইনের আগমনের অপেক্ষায় ছিল। সেখানে শীআনে আলী ও হুসাইনের শক্তি এতই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, নু'মান ইব্‌ন বশীর সন্ধ্যা হতেই আপন অফিসের দরজা বন্ধ করে দিয়ে বিশেষ বিশেষ লোকদের নিয়ে সেখানে বৈঠক করতেন। তিনি দরজায় একটি গোলামকে এই বলে বসিয়ে রাখতেন যে, কোন লোক যদি আসে তাহলে প্রথমে তার নাম-ঠিকানা জিজ্ঞেস করবে। এরপর যদি তাকে ভিতরে আসার যোগ্য মনে কর তাহলে দরজা খুলে দেবে, অন্যথায় নয়। উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদ কূফায় প্রবেশ করলে লোকেরা মনে করল, তারা যে ইমাম হুসাইনের অপেক্ষা করছে তিনিই এসে পৌঁছেছেন। অতএব যে দিকেই উবায়দুল্লাহ্‌র উট যেত সেদিকেই লোকেরা অভ্যর্থনার ভঙ্গিতে বলতো, আপনার উপর সালাম, হে রাসূলের সন্তান! উবায়দুল্লাহ্ তার উট নিয়ে সরকারী অফিসে পৌঁছে দেখতে পায় যে, ভেতর থেকে অফিসের দরজা বন্ধ। সে দরজায় করাঘাত করে, কিন্তু মুখে কিছু বলেনি, তখন নু'মান ইব্‌ন বশীর আপন বন্ধুদের নিয়ে ছাদের উপর বসেছিলেন। সেখান থেকে উঠে এসে ছাদের এক প্রান্ত দিয়ে নিচের দিকে তাকালেন। যেহেতু সমগ্র শহরবাসী ইমাম হুসাইনের অপেক্ষা করছিল, তাই তিনি উবায়দুল্লাহ্‌কেই ইমাম হুসাইন মনে করে উপর থেকেই বলে উঠলেন, হে রাসূলের সন্তান! আপনি ফিরে যান, ফিতনার সৃষ্টি করবেন না। ইয়াযীদ কখনো কূফা আপনার হাতে ছেড়ে দেবেন না। নু'মানের যে সব বন্ধু ছাদে বসেছিলেন তারা নু'মানকে বললেন, ইমাম হুসাইনের সাথে এরূপ অশিষ্ট আচরণ করবেন না। অন্তত দরজা খুলে তাঁকে ভিতরে আসতে দিন। কেননা তিনি দীর্ঘ পথ সফর করে এসেছেন এবং সোজাসুজি আপনারই আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। নু'মান বললেন, আমি পছন্দ করি না, লোকেরা একথা বলার সুযোগ পাক যে, নু'মানেরই শাসনামলে কূফার মাটিতে ইমাম হুসাইনকে হত্যা করা হয়েছে।

উবায়দুল্লাহ্ তখন তার পাগড়ি খুলে বললো, হতভাগা আগে দরজা তো খোল। উবায়দল্লাহ্‌র কণ্ঠস্বর শুনে লোকেরা তাকে চিনে ফেলল এবং দরজা খুলে দিল। এরপর সবাই এদিকে ওদিকে ছুটে পালালো। উবায়দুল্লাহ্ ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই পিছনে রেখে আসা তার অশ্বারোহী বাহিনীও কূফায় প্রবেশ করতে শুরু করল। মুসলিম ইব্‌ন আকীলের কাছে সংবাদ পৌঁছল যে, ইব্‌ন যিয়াদ তার বাহিনী নিয়ে কূফায় এসে পৌঁছেছে তখন তিনি (মুসলিম) যে ঘরে অবস্থান করছিলেন এবং যে ঘরটি ছিল সকলের কাছেই পরিচিত, তিনি সেখান থেকে বের হয়ে হানী ইব্‌ন উরওয়ার ঘরে গিয়ে আশ্রয় নেন। ঐ পর্যন্ত মুসলিমের হাতে বায়আতকারীদের সংখ্যা আঠার হাজারে গিয়ে পৌঁছেছিল। পরদিন ভোরে ইব্‌ন যিয়াদ জনসাধারণের উদ্দেশে একটি ভাষণ দেয়। তাতে সে ইয়াযীদের ঐ নির্দেশনামা পড়ে শোনায়, যা বসরায় তার হস্তগত হয়েছিল। উবায়দুল্লাহ্ বলে ঃ

"তোমরা আমার পিতা যিয়াদকে ভাল ভাবেই চেন। তোমরা একথাও জান যে, তিনি কি ধরনের শাসন পরিচালনায় অভ্যস্ত ছিলেন। আমার মধ্যে আমার পিতার যাবতীয় স্বভাব-চরিত্র

বিদ্যমান। তোমরা আমার সম্পর্কেও ওয়াকিফহাল আছ। আর আমিও এক এক করে তোমাদের সকলের নাম জানি। তোমাদের প্রত্যেকের বাড়ি এবং মহল্লাও আমার জানা আছে। আমার থেকে তোমরা কিছুই লুকাতে পারবে না। আমি কূফায় রক্তের বন্যা বহাতে চাই না এবং তোমাদেরও হত্যা করতে চাই না। আমি জানি, তোমরা হুসাইন ইব্‌ন আলীর পক্ষে মুসলিম ইব্‌ন আকীলের হাতে বায়আত করেছ। আমি তোমাদের সবাইকে এই শর্তে নিরাপত্তা দান করছি যে, তোমরা তোমাদের বায়আত প্রত্যাহার কর। আর তোমাদের মধ্যে যে বিদ্রোহ করবে তাকে যেন কেউ আপন ঘরে আশ্রয় না দেয়। অন্যথায় প্রত্যেক আশ্রয়দাতাকে তারই ঘরের দরজায় হত্যা করা হবে।"

এই ভাষণের পর ইব্‌ন যিয়াদ সবাইকে মুসলিম ইব্‌ন আকীলের ঠিকানা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, কিন্তু কেউ তা বলেনি। শেষ পর্যন্ত উবায়দুল্লাহ্ তার গুপ্তচরদের মাধ্যমে জানতে পারে যে, তিনি হানী ইব্‌ন উরওয়ার ঘরে লুকিয়ে আছেন। উবায়দুল্লাহ্ মাকিল নামীয় এক ব্যক্তিকে— যে ছিল তামীম গোত্রের মুক্তদাসদের অন্যতম এবং যাকে কূফার কেউই চিনত না— নির্জনে ডেকে নিয়ে তার হাতে তিন হাজার দিরহামের একটি থলে দিয়ে বলে, তুমি অমুক মহল্লায় হানী ইব্‌ন উরওয়ার কাছে যাও। তার সাথে তোমার সাক্ষাত হলে তুমি তাকে বল, আমি আপনার সাথে নির্জনে কিছু কথা বলব। নির্জন স্থানে গিয়ে পৌঁছে হানীকে বল, আমাকে বসরার অমুক ব্যক্তি পাঠিয়েছে। তারা আমাকে তিন হাজার দিরহাম দিয়ে বলেছে, তুমি কূফায় মুসলিম ইব্‌ন আকীলের হাতে এই অর্থ পৌঁছে দাও এবং তাকে বল, আমাদের লিখছেন, তোমরা অমুক তারিখে কূফায় গিয়ে পৌঁছবে। ঐ তারিখে ইমাম হুসাইনও কূফায় গিয়ে পৌঁছবেন। আপনি একেবারে নিশ্চিন্ত থাকুন। আমরা সবাই নির্দিষ্ট দিনে ইমাম হুসাইনের সাথে কূফায় প্রবেশ করব। আর এই তিন হাজার দিরহাম আপনি আপনার প্রয়োজনীয় কাজে ব্যয় করুন এবং এটাকে আমাদের পক্ষ থেকে হাদিয়া হিসাবে গ্রহণ করুন। অতএব আপনি আমাকে মুসলিম ইব্‌ন আকীলের কাছে পৌঁছিয়ে দিন, যাতে আমি যাবতীয় সংবাদ এবং এই অর্থ তাঁর কাছে পৌঁছিয়ে সঙ্গে সঙ্গে কূফায় চলে যেতে পারি। কেননা উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদ কূফায় এসে পড়েছে এবং সে আমাকে চিনে এমন যেন না ঘটে যে, আমি তার হাতে বন্দী হয়ে যাব।

যা হোক মাকিল তিন হাজার দিরহামের থলে নিয়ে হানীর কাছে পৌঁছে। তিনি তার দরজায় বসা ছিলেন। মাকিলের কথা শুনে তিনি সঙ্গে সঙ্গে মুসলিমের কাছে তাকে নিয়ে যান। ইব্‌ন আকীল সন্তুষ্টচিত্তে ঐ থলে গ্রহণ করেন এবং যাবতীয় খবর শোনার পর মাকিলকে বিদায় দেন। সেখান থেকে বের হয়ে সে সোজা উবায়দুল্লাহ্‌র কাছে ফিরে আসে এবং তাকে বলে, আমি মুসলিমকে থলেটি দিয়ে এসেছি এবং স্বয়ং তার সাথে কথাও বলেছি। তিনি হানীর ঘরেই অবস্থান করছেন। উবায়দুল্লাহ্ সঙ্গে সঙ্গে হানীকে ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করল, মুসলিম কোথায়? হানী এ ব্যাপারে তার অজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

উবায়দুল্লাহ্ মাকিলকে ডেকে সবার সামনে প্রকৃত ঘটনা বিবৃত করতে বলে। এতে হানী অত্যন্ত লজ্জা পান। তবে অত্যন্ত প্রত্যয়ের সুরে বলেন, হ্যাঁ, মুসলিম আমার ঘরে আশ্রয় নিয়েছেন। তবে আমি এই অপমান সহ্য করতে পারব না যে, তাকে আপনার হাতে তুলে দেব। উবায়দুল্লাহ্ হানীকে তখনই গ্রেফতার করে। শহরে এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে যে,

উবায়দুল্লাহ্ হানীকে হত্যা করে ফেলেছে। তার ঘরের মেয়েরা এ সংবাদ শুনে ক্রন্দন করতে থাকে। মুসলিম ইব্ন আকীল এই অবস্থা দেখে আর সহ্য করতে পারলেন না। সঙ্গে সঙ্গে তরবারি হাতে হানীর ঘর থেকে বের হয়ে ঐ সমস্ত লোকদেরকে আহ্বান জানান, যারা তার হাতে বায়আত করেছিল। কিন্তু আঠারো হাজারের মধ্য থেকে মাত্র চার হাজার লোক তার আহ্বানে সাড়া দেয়। মুসলিম অবশিষ্টদের পুনরায় আহ্বান জানালে তারা উত্তর দেয়, বায়আত করার সময় তো আমাদের কাছ থেকে এই অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল যে, যতক্ষণ পর্যন্ত ইমাম হুসাইন (রা) কূফায় না আসবেন, আমরা কারো সাথে যুদ্ধ করব না। অতএব তাঁর এখানে এসে পৌছা পর্যন্ত আপনারও ধৈর্য ধারণ করা উচিত। মুসলিম ইব্ন আকীল যেহেতু বেরিয়ে এসেছিলেন তাই পুনরায় তাঁর আত্মগোপনের কোন সুযোগ ছিল না। অগত্যা তিনি ঐ চার হাজার লোক নিয়েই উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদকে ঘেরাও করেন। ঐ সময় উবায়দুল্লাহ্ মাত্র ত্রিশ-চল্লিশ জন লোক নিয়ে সরকারী কার্যালয়ে অবস্থান করছিল। অবস্থা বেগতিক দেখে সে ছাদের উপর চড়ে অবরোধকারীদের উপর তীর নিক্ষেপ করতে থাকে। এরপর মুসলিমের সঙ্গীদেরকে তাদের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবরা এই বলে বোঝাতে লাগল যে, এভাবে নিজেদের ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করা তোমাদের পক্ষে মোটেই উচিত হবে না। একথা শুনে মাত্র ত্রিশ-চল্লিশ জন লোক ছাড়া বাকি সকলেই মুসলিমকে ছেড়ে নিজ নিজ ঘরে ফিরে যায়।

মুসলিম ইব্ন আকীল ও হানী নিহত হন

শেষ পর্যন্ত মুসলিম সেখান থেকে পালিয়ে গিয়ে কূফার জনৈক ব্যক্তির ঘরে আশ্রয় নেন। উবায়দুল্লাহ্ তাঁকে গ্রেফতার করার জন্য আমর ইব্ন জারীর মাখযূমীকে পাঠায়। পলায়নের কোন উপায় না দেখে তিনি কোষ থেকে তরবারি বের করেন। কিন্তু আমর বলে, আপনি অন্যায়ভাবে নিজেকে ধ্বংস করছেন কেন ? আপনি নিজেকে আমার হাতে সমর্পণ করুন। আমি আমার নিজ দায়িত্বে আপনাকে আমীর ইব্ন যিয়াদের কাছে নিয়ে যাচ্ছি এবং প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, আমি তার থেকে আপনার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করব। মুসলিম তরবারি রেখে নিজেকে আমরের হাতে সমর্পণ করলেন। সে তাকে নিয়ে উবায়দুল্লাহ্র কাছে গেল। উবায়দুল্লাহ্ মুসলিমকে সেই কামরায়ই বন্দী করে রাখল, যেখানে হানী ইব্ন উরওয়া পূর্ব থেকেই বন্দী ছিলেন। পরদিন বায়আতকারী দশ হাজার লোক একত্রিত হয়। তারা উবায়দুল্লাহ্র গৃহ অবরোধ করে মুসলিম এবং হানী উভয়েরই মুক্তি দাবি করে। তারা বলতে থাকে, হে উবায়দুল্লাহ্! যদি তুমি স্বেচ্ছায় এদের দু'জনকে ছেড়ে দাও তাহলে তো ভাল কথা, অন্যথায় আমরা জোরপূর্বক এদেরকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাব। উবায়দুল্লাহ্ তার লোকদেরকে নির্দেশ দেয়, তোমরা এ দু'জনকে ছাদের উপর নিয়ে যাও এবং সবার চোখের সামনে হত্যা কর। অতএব দু'জনকেই হত্যা করা হলো। এ দৃশ্য দেখে সকলেই সেখান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, যেন তাদের মৃত্যুদণ্ড দেখার উদ্দেশ্যেই তারা এখানে এসেছিল। এরপর উবায়দুল্লাহ্ নির্দেশ দেন, মহলের দরজা খুলে এদের দু'জনের দেহ দরজায় ঝুলিয়ে রাখ এবং মাথা দু'টি ইয়াযীদের কাছে দামিশ্কে পাঠিয়ে দাও। এবার ইয়াযীদ উবায়দুল্লাহ্কে লিখল, ইমাম হুসাইন মক্কা থেকে রওয়ানা হয়ে গেছেন এবং অতি শীঘ্রই কূফায় গিয়ে পৌছবেন। তুমি ভালভাবে নিজের নিরাপত্তার ব্যবস্থা কর এবং এমনভাবে সেনাবাহিনী মোতায়েন কর যাতে কূফায় পৌছার পূর্বেই তাঁকে প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়।

ইমাম হুসাইন (রা)-এর কূফা যাত্রা

ইমাম হুসাইন (রা) মক্কা থেকে রওয়ানা হওয়ার প্রস্তুতি নেন। তিনি কূফা অভিমুখে রওয়ানা হচ্ছেন, মক্কায় এখবর ছড়িয়ে পড়লে যারা তাঁকে ভালবাসতেন অথবা তাঁর প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন, তারা একের পর এক তাঁর সাথে সাক্ষাত করে তাঁকে এই সংকল্প থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেন। তারা তাঁকে বুঝিয়ে বলেন, এখন আপনার কূফা যাত্রা আশংকামুক্ত নয়। সর্বপ্রথম আবদুর রহমান ইব্ন হারিস এসে নিবেদন করেন, আপনি কূফায় যাওয়ার সংকল্প পরিত্যাগ করুন। কেননা সেখানে ইরাকের গভর্নর উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদ রয়েছে। তাছাড়া ইরাকের লোকেরা লোভী। এটা অসম্ভব নয় যে, যারা আপনাকে সেখানে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে তারাই যুদ্ধক্ষেত্রে আপনার বিরুদ্ধে লড়বে। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলেন, তুমি বায়আত গ্রহণ এবং শাসনক্ষমতা লাভের জন্য বাইরে যেয়ো না। আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দুনিয়া ও আখিরাত এ দু'টির মধ্য থেকে যে কোন একটি বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আখিরাতকেই বেছে নিয়েছিলেন। তুমিও নবী বংশের সন্তান। তাই তুমি দুনিয়ার পিছনে ছুটো না, বরং পার্থিক উপায়-উপকরণ থেকে নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখ।

এই উপদেশ দিয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) কেঁদে ফেলেন, ইমাম হুসাইনও তাঁর সাথে কাঁদতে থাকেন। কিন্তু তিনি তাঁর উপদেশ মেনে নিতে পারেননি। বাধ্য হয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যান। এরপর আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) তাঁকে বলেন, মক্কা ছেড়ে যেয়ো না এবং খানায় কা'বার সংস্পর্শ ত্যাগ করো না। তোমার সম্মানিত পিতা কূফাকে মক্কা ও মদীনার উপর প্রাধান্য দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সাথে কূফাবাসী কিরূপ ধৃষ্টতামূলক আচরণ করেছিল তা তো তুমি নিজেই দেখেছ। তারা তাঁকে শেষ পর্যন্ত শহীদ করে ছেড়েছে। তোমার ভাই হাসানকেও কূফাবাসী লুণ্ঠন করেছিল, তাঁকে হত্যা করার উদ্যোগ নিয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত বিষপ্রয়োগে হত্যাও করেছে। ওদের উপর নির্ভর করা তোমার মোটেই উচিত নয়। ওদের বায়আতের কোন মূল্য নেই। ওদের চিঠিপত্রের উপরও ভরসা করা চলে না। ইব্ন আব্বাসের কাছ থেকে এসব কথা শুনে ইমাম হুসাইন (রা) বলেন, আপনি যা কিছু বলছেন সবই ঠিক। কিন্তু আমার কাছে মুসলিম ইব্ন আকীলের চিঠি এসেছে। ইতিমধ্যে তাঁর হাতে বার হাজার লোক বায়আত হয়েছে। ইতিপূর্বে কূফার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের দেড়শ' চিঠি আমি পেয়েছি। অতএব আশংকার কোন কারণ নেই। এমতাবস্থায় আমার সেখানে যাওয়াই উচিত। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, কমপক্ষে যিলহজ্জ মাস শেষ হতে দাও। নতুন বছর শুরু হোক, তারপর সফরের কথা ভাব। হজ্জের মওসুম এসে গেছে, সমগ্র বিশ্বের লোক দলে দলে মক্কায় আসছে, আর তুমি মক্কা ছেড়ে বাইরে চলে যাচ্ছ। আর এর উদ্দেশ্য শুধু এই যে, তুমি দুনিয়া ও দুনিয়াদারদের উপর ক্ষমতা লাভ করবে এবং দুনিয়ার ধন-সম্পদের অধিকারী হবে। বর্তমানে এটাই সমীচীন যে, তুমিও হজ্জে শরীক হও এবং জনসাধারণকেও হজ্জ করে নিজ নিজ ঘরে ফিরে যেতে দাও। হুসাইন (রা) বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে আর দেরি করা চলে না। আমার শীঘ্রই রওয়ানা হওয়া উচিত। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, তুমি যদি আমার কথা একান্তই না মান তাহলে অন্তত স্ত্রীলোক ও শিশুদের সঙ্গে

নিও না। কেননা কূফাবাসীদের উপর কোন বিশ্বাস নেই। বার হাজার লোক যদি তোমার খিলাফতের জন্য বায়আত করে থাকে তাহলে তো তাদের কর্তব্য ছিল, প্রথমেই ইয়াযীদের গভর্নরকে কূফা থেকে বের করে দেওয়া, রাজকোষের উপর কবজা করা, এরপর সেখানে যাওয়ার জন্য তোমাকে আহ্বান জানানো। কিন্তু পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে কূফার গভর্নরের বিরুদ্ধে ওরা কিছুই করতে পারবে না। যখন তাদের কাছে অর্থ-ভাণ্ডারও নেই তখন এটা নিশ্চিত যে, গভর্নর তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করে অথবা লোভ দেখিয়ে আপন ইচ্ছানুযায়ী যখনই চাইবে তখনই তাদেরকে ব্যবহার করতে পারবে। এমতাবস্থায় যারা তোমাকে আহবান জানাচ্ছে তারাই ইয়াযীদের পক্ষ নিয়ে তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়াটা অসম্ভব নয়। এই সব পরিস্থিতি লক্ষ্য করে আমি তোমার নিরাপত্তা সম্পর্কে দারুণভাবে শংকিত। যদি স্ত্রীলোক ও শিশুরাও তোমার সাথে থাকে তাহলে যেভাবে হযরত উসমান (রা) তাঁর পরিবার-পরিজনের সামনে নিহত হয়েছিলেন ঠিক সেভাবে তোমার পরিবার-পরিজনকেও হয়ত তোমার হত্যাকাণ্ড প্রত্যক্ষ করতে হবে। উপরন্তু এ আশংকাও রয়েছে যে, তাদেরকে বন্দী করে নিয়ে দাস-দাসীতে পরিণত করা হবে। তিনি যখন ইব্‌ন আব্বাসের একথাও মানলেন না তখন তিনি বললেন, তোমার যদি রাষ্ট্রক্ষমতা ও খিলাফত লাভের এতই আগ্রহ, তাহলে প্রথমে ইয়ামানে চলে যাও। সেখানে তোমার প্রতি সহানুভূতিশীল অনেক লোক রয়েছে। তাছাড়া সেখানে এমন পর্বত শ্রেণীও রয়েছে, যেগুলোকে তুমি তোমার প্রতিরক্ষায় অনায়াসে ব্যবহার করতে পারবে। যদি তুমি হিজাযের শাসনক্ষমতা চাও তাহলে অতি সহজেই তাও লাভ করতে পার। শেষ পর্যন্ত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাসের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হলো। ইমাম হুসাইন (রা) তাঁর কোন পরামর্শই মানলেন না। এরপর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা) এলেন। তিনিও তাঁকে বললেন, আপনি কখনো কূফা যাবেন না। আপনার কূফা যাত্রার সংবাদ যখন মক্কায় প্রচারিত হয় তখন আমি কোন কোন ব্যক্তিকে এই মন্তব্য করতে শুনেছি, হুসাইন ইব্‌ন আলীর কূফা রওয়ানা হওয়ার সংবাদে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (অর্থাৎ আমি) খুব খুশি হবে। কেননা এরূপ হলে মক্কায় তাঁর আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী থাকবে না। তাই আমি ঐ সমস্ত অলীক ধারণা পোষণকারী লোকদেরকে মিথ্যাবাদী প্রমাণিত করার জন্য আপনাকে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে বলছি, আপনি মক্কার শাসনক্ষমতা গ্রহণ করুন। আপনি আপনার হাত বাড়িয়ে দিন, আমি আপনার হাতে বায়আত করব এবং আপনার নির্দেশ পালন করতে গিয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতরণ করব। কিন্তু ইমাম হুসাইন (রা) উত্তর দিলেন, আমি ইতিমধ্যে তাদের কাছে সংবাদ পাঠিয়ে দিয়েছি এবং রওয়ানা হওয়ার দৃঢ়সংকল্প নিয়েছি। এমতাবস্থায় নিজেকে বিরত রাখতে পারি না।

শেষ পর্যন্ত হিজরী ৬০ সনের ৩রা যিলহজ্জ (৬৮০ খ্রি.-এর সেপ্টেম্বর) রোজ সোমবার ইমাম হুসাইন (রা) পরিবারসহ মক্কা থেকে রওয়ানা হন। আর ঐ তারিখেই মুসলিম ইব্‌ন আকীলকে কূফায় হত্যা করা হয়। ইমাম হুসাইন (রা) যখন মক্কা থেকে রওয়ানা হন তখন আমর ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন 'আস এবং আরো কয়েকজন মক্কাবাসী তাঁর পথরোধ করে দাঁড়ান। তাঁরা বলেন, আপনি বিরত না হলে আমরা শক্তি প্রয়োগে আপনাকে বাধা দেব এবং আপনার প্রতিরোধ করব। হুসাইন (রা) বলেন, তোমরা যা ইচ্ছা তাই কর। আমি কোন মতেই আমার

সংকল্প ত্যাগ করব না। একথা শুনে সবাই তাঁর রাস্তা ছেড়ে দেন এবং তিনি কূফায় রওয়ান হন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) তাঁকে বিদায় দিতে গিয়ে বললেন, আমি এই মুহূর্তে তোমার উটের সামনে এমনভাবে শুয়ে পড়তাম যে, তুমি আমাকে দলিত-মথিত না কে অগ্রসর হতে পারতে না। কিন্তু আমি জানি, তাতেও তুমি বিরত হবে না এবং কূফা যাত্রা সংকল্পও ত্যাগ করবে না। যাহোক তিনি মক্কা থেকে রওয়ানা হয়ে 'তিগমা' নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছলে একটি কাফেলার সাথে তাঁর দেখা হয়। ওরা ইয়ামানের শাসনকর্তার পক্ষ থেকে কিছু উপঢৌকন নিয়ে ইয়াযীদের কাছে যাচ্ছিল। তিনি ঐ কাফেলাকে বন্দী করে ফেলেন এবং তাদের কাছ থেকে কিছু মাল-সামগ্রী ছিনিয়ে নিয়ে সামনে অগ্রসর হন। মক্কা ও কূফার মধ্যবর্তী 'সাফাহ' নামক স্থানে প্রসিদ্ধ আরবী কবি ফারাযদাকের সাথে তাঁর দেখা হয়। ফারাযদাক কূফা থেকে আসছিলেন। তিনি যখন কূফা থেকে রওয়ানা হয়েছিলেন তখন পর্যন্ত উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদ কূফায় এসে পৌঁছেনি। ইমাম হুসাইন (রা) ফারাযদাকের কাছে কূফা ও কূফাবাসীদের অবস্থা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, কূফাবাসীরা তো আপনার সাথে আছে, কিন্তু তাদের তরবারিসমূহ আপনার সাথে আছে কিনা তাতে সন্দেহ রয়েছে। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফরের একটি চিঠি পান। তিনি নিজ পুত্র আওন ও মুহাম্মদের মাধ্যমে ঐ চিঠি পাঠিয়ে ছিলেন। তাতে তিনি লিখেছিলেন, আমি শুধু আল্লাহ্র ওয়াস্তে বলছি, আপনি কূফা যাত্রার সংকল্প ত্যাগ করুন এবং মদীনায় চলে আসুন। আমার আশংকা যে, আপনাকে হত্যা করা হবে। আল্লাহ্র ওয়াস্তে আপনি এ ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না। ঐ সাথে মদীনার গভর্নরের একটি চিঠিও দূতেরা ইমাম হুসাইনকে দিল। তাতে লেখা ছিল, যদি আপনি মদীনায় এসে থাকতে চান তাহলে আপনাকে নিরাপত্তা প্রদান করা হবে। কিন্তু ইমাম হুসাইন (রা) ফিরে যেতে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেন। তিনি মুহাম্মদ ও আওনকেও তাঁর সঙ্গী করে নেন এবং বসরাবাসী স্বীয় পথ প্রদর্শককে বলেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এগিয়ে চল, যাতে আমরা উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদের পূর্বেই কূফায় প্রবেশ করতে পারি। সেখানে সম্ভবত লোকেরা আমাদের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। ঘটনাক্রমে ঐ দিনই ইব্ন যিয়াদের কাছে ইয়াযীদের একটি জরুরী বার্তা পৌঁছেছিল। তাতে বলা হয়েছিল, তুমি তোমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা কর। যেহেতু ইমাম হুসাইন ইতিমধ্যে মক্কা থেকে রওয়ানা হয়ে থাকবেন, তাই তুমি প্রতিটি রাস্তায় সৈন্য মোতায়েন কর, যাতে তিনি কূফায় এসে পৌঁছুতে না পারেন। ইমাম হুসাইন (রা) মনে মনে এই ধারণা নিয়ে পথ চলেছিলেন যে, যেহেতু মুসলিম ইব্ন আকীলের হাতে প্রতিদিনই লোকেরা বায়আত করছে, তাই এতদিনে বায়আতকারীদের দল অনেক ভারী হয়ে গেছে। কিন্তু ওদিকে কূফায় উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদ তাঁকে বন্দী অথবা হত্যা করার জন্য সেনাবহিনী মোতায়েন করছিল। আরো কয়েক মনযিল অতিক্রম করার পর ইমাম হুসাইনের সাথে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুতীর সাক্ষাত হয়। তিনি ইমাম হুসাইনের সংকল্পের কথা জেনে তা থেকে তাঁকে বিরত রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন এবং আল্লাহ্র শপথ দিয়ে মক্কায় ফিরে যাবার অনুরোধ জানান। তিনি তাঁকে বুঝিয়ে বলেন, আপনি ইরাকীদের ধোঁকায় পড়বেন না। যদি আপনি বনূ উমাইয়া থেকে খিলাফত ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করেন, তাহলে তারা আপনাকে অবশ্যই হত্যা করবে।

অতএব আপনি নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করে ইসলাম, আরব এবং কুরায়শের মর্যাদাহানি করবেন না। কিন্তু এই সব কথায় ইমাম হুসাইন মোটেও প্রভাবিত হলেন না। তিনি যথারীতি কূফার দিকে এগিয়ে চললেন। আজির' নামক স্থানে পৌঁছে তিনি কায়স ইব্ন মুসহিরের হাতে কূফাবাসীদের কাছে একটি চিঠি পাঠালেন তাতে তিনি লিখলেন, আমি তোমাদের নিকটেই এসে পৌঁছেছি। তোমরা আমার অপেক্ষায় থাক। কায়স কাদিসিয়ায় পৌঁছতেই ইব্ন যিয়াদের বাহিনীর হাতে ধরা পড়েন। তাঁকে ইমাম হুসাইনের চিঠি সমেত ইব্ন যিয়াদের সামনে উপস্থিত করা হয়। ইব্ন যিয়াদ কায়সকে সরকারী মহলের ছাদের উপর উঠিয়ে সেখান থেকে নিচে ছুঁড়ে মারে। ফলে সে সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়। এদিকে ইমাম হুসাইন (রা) পরবর্তী মনযিল থেকে আপন দুধভাই আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াকতারের মাধ্যমে আরেকটি চিঠি পাঠান। তাকেও কায়সের ন্যায় গ্রেফতার করে নিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। ইমাম হুসাইনের কাফেলা সা'লাবা নামক স্থানে পৌঁছে জানতে পারে যে, মুসলিম ইব্ন আকীলকে কূফায় হত্যা করা হয়েছে এবং এখন কূফায় ইমাম হুসাইনের সমর্থক বা সাহায্যকারী বলতে কেউ নেই। এই সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে তাঁর কাফেলায় নৈরাশ্য ও বিষাদের ছায়া নেমে আসে এবং তারা সেখান থেকেই ফিরে যাবার সংকল্প নেন। কেননা কূফায় গেলে মুসলিমের সাথে যেরূপ আচরণ করা হয়েছে তা এই কাফেলার সাথেও অনুরূপ আচরণ করার আশংকা রয়েছে। একথা শুনে মুসলিম ইব্ন আকীলের ছেলেরা বলল, আমাদের কখনো ফিরে যাওয়া উচিত নয়। এখন আমরা হয় মুসলিমের হত্যার প্রতিশোধ নেব, অথবা নিজেদের প্রাণ দেব। তাছাড়া হুসাইন ইব্ন আলী মুসলিম ইব্ন আকীলের মত নন। তাঁকে কূফাবাসীরা দেখে অবশ্যই তাঁর পক্ষ নেবে এবং তারা ইব্ন যিয়াদকেও বন্দী করবে। ঐ কাফেলায় কয়েকশ লোক ছিল। পথিমধ্যেও লোকেরা যোগদান করায় তার সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পাচ্ছিল। কিন্তু সা'লাবায় পৌঁছার পর যখন ঐ দুঃখজনক খবর এলো তখন অন্যান্য গোত্রের লোক ক্রমান্বয়ে কাফেলা ছেড়ে চলে যেতে লাগল। শেষ পর্যন্ত কেবল ইমাম হুসাইনের পরিবার ও গোত্রের লোকেরাই অবশিষ্ট রইল। তাঁদের মোট সংখ্যা ছিল সত্তর অথবা আশির মত। কোন কোন বর্ণনা মতে তাঁদের সংখ্যা ছিল প্রায় আড়াইশ।

কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা

উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদ আমর ইব্ন সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাসকে 'রায়'-এর শাসনকর্তা নিয়োগ করেছিলেন। এবার সে তাকে চার হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী দিয়ে বলল, মরুভূমিতে গিয়ে সমগ্র রাস্তা ও জলপথে পাহারা বসাও এবং অনুসন্ধান করে দেখ, হুসাইন ইব্ন আলী কোন্ দিক থেকে আসছেন এবং বর্তমানে কোথায় আছেন। ইব্ন যিয়াদ হুর ইব্ন ইয়াযীদ তামীমীকেও এক হাজার সৈন্য দিয়ে টহল কাজে মোতায়েন করে। আমর ইব্ন সা'দ কাদিসিয়া হয়ে চতুর্দিক থেকে খবর সংগ্রহের ব্যবস্থা করেন। ইমাম হুসাইন (রা) অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে 'শারাফ' নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছেন। সেখান থেকে আরো একটু অগ্রসর হতেই হুর ইব্ন ইয়াযীদ তামীমী এক হাজার সৈন্যের একটি বাহিনীসহ তাঁর সামনে এসে হাযির হয়। ইমাম হুসাইন (রা) সামনে অগ্রসর হয়ে হুরকে বলেন, আমি তোমাদের আহ্বানেই

এখানে এসেছি। যদি তোমরা নিজেদের অঙ্গীকারে কায়েম থাক তাহলে আমি তোমাদের শহরে প্রবেশ করব, অন্যথায় যে দিক থেকে এসেছি সেদিকেই ফিরে যাব। হুর বলে, উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদের নির্দেশ এই যে, আমি আপনার সাথে থাকব এবং আপনাকে পাহারা দিয়ে তার সামনে নিয়ে হাযির করব। ইমাম হুসাইন (রা) বলেন, এই অপমান আমি কখনো সহ্য করতে পারব না। এর চেয়ে বরং ইয়াযীদের সামনে গিয়ে বন্দী অবস্থায় হাযির হব। এরপর তিনি সেখান থেকে ফিরে যাবার সংকল্প নেন। কিন্তু হুর ইব্‌ন যিয়াদের ভয়ে তাঁকে ফিরে যেতে বাধা দেয় এবং নিজ বাহিনীর সাহায্যে তাঁর রাস্তা অবরোধ করে দাঁড়ায়। ইমাম হুসাইন (রা) সেখান থেকে উত্তর দিকে রওয়ানা হন এবং কাদিসিয়ার নিকটে পৌঁছে জানতে পারেন যে, আমর ইব্‌ন সা'দ সেখানে একটি বাহিনী নিয়ে অবস্থান করছে। হুর তার পিছনে পিছনেই আসছিল। এবার ইমাম হুসাইন সেখান থেকে ফিরে দশ মাইল চলার পর কারবালা নামক স্থানে উপনীত হন। আমর ইব্‌ন সা'দ ইমাম হুসাইনের আগমন সংবাদ পেয়ে নিজ বাহিনী নিয়ে রওয়ানা হন এবং খুঁজতে খুঁজতে পরদিন কারবালায় এসে পৌঁছেন। ইমাম হুসাইনের একেবারে নিকটবর্তী হওয়ার পর আমর ইব্‌ন সা'দ নিজ বাহিনী থেকে পৃথক হয়ে একাকী এগিয়ে আসেন এবং ইমাম হুসাইনকে তার দিকে এগিয়ে যাবার অনুরোধ জানান। ইমাম হুসাইন এগিয়ে গেলে তিনি তাঁকে সালাম জানিয়ে বলেন ঃ

"এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আপনি ইয়াযীদের চাইতে খিলাফতের অধিক যোগ্য। কিন্তু আপনাদের বংশে হুকুমত ও খিলাফত আসবে, এটা আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা নয়। হযরত আলী ও হযরত হাসানের অবস্থা তো আপনি স্বচক্ষে দেখেছেন। যদি আপনি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভের ইচ্ছা পরিত্যাগ করেন তাহলে অতি সহজেই মুক্তি পেতে পারেন। অন্যথায় আপনার প্রাণের আশংকা রয়েছে। মনে রাখবেন, আমরা আপনাকে বন্দী করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি।"

ইমাম হুসাইন (রা) উত্তরে বলেন, "আমি এখন তোমাদের সামনে তিনটি প্রস্তাব পেশ করব। তোমরা এই তিনটির মধ্যে যে কোন একটি আমার জন্য মনজুর কর।"

১. "আমি যেদিক থেকে এসেছি সেদিকেই আমাকে ফিরে যেতে দাও। তাহলে আমি মক্কায় গিয়ে আল্লাহ্‌র বন্দেগীতে আত্মনিয়োগ করব।

২. আমাকে কোন একটি সীমান্তের দিকে বেরিয়ে যেতে দাও। তাহলে আমি সেখানে পৌঁছে কাফিরদের সাথে লড়তে লড়তে শাহাদাতবরণ করব।

৩. তোমরা আমার রাস্তা ছেড়ে দাও এবং আমাকে সোজা ইয়াযীদের কাছে দামিশ্‌কে যেতে দাও। অবশ্য নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য তোমরাও আমার পিছনে পিছনে আসতে পার। আমি ইয়াযীদের কাছে গিয়ে সোজাসুজি তার সাথেই আমার এ ব্যাপারটির একটা ফায়সালা করে নেব, যেমন আমার বড় ভাই হাসান (রা) আমীরে মুআবিয়ার সাথে করেছিলেন।"

আমর ইব্‌ন সা'দ একথা শুনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। তিনি বলেন, আমি নিজে থেকে এ ব্যাপারে আপনাকে কোন চূড়ান্ত কথা দিতে পারব না। তবে এখনি উবায়দুল্লাহকে এ সম্পর্কে অবহিত করব। আমার বিশ্বাস তিনি উপরোক্ত প্রস্তাবগুলোর যে কোন একটি আপনার জন্য মনজুর করবেন। আমরও ঐ প্রান্তরে তাঁবু ফেলেন এবং ইব্‌ন যিয়াদকে এখানকার যাবতীয় অবস্থা লিখে জানান।

৬১ হিজরী ২রা মুহাররম (৬৮০ খ্রি ২রা অক্টোবর) আমর ইব্‌ন সা'দ ইমাম হুসাইন (রা)-এর কারবালায় পৌঁছার পূর্বের দিন সেখানে পৌঁছেছিলেন। আমর লিখেন যে, ইমাম হুসাইন (রা) যে কথা বলেছেন তাতে ফিতনা-ফাসাদের দরজা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাবে এবং তিনি ইয়াযীদের নিকট পৌঁছে তার হাতে বায়আত করবেন এবং এতে বিপদের আশংকা থাকবে না।

ইব্‌ন যিয়াদ যখন উপরোক্ত প্রস্তাবগুলো সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করছিলেন তখন শিমার যিল-জাওশান নামক জনৈক ব্যক্তি তার কাছে বসা ছিল। সে যিয়াদকে বলল, হে আমীর! তোমার জন্য ইমাম হুসাইনকে নিঃসংকোচে হত্যা করার এটা এক সুবর্ণ সুযোগ। কেননা এতে তোমার উপর কোন অভিযোগ আসবে না। আর যদি ইমাম হুসাইন ইয়াযীদের কাছে একবার চলে যেতে পারেন তাহলে তার মুকাবিলায় ইয়াযীদের কাছে তোমার কোন মর্যাদা থাকবে না। কেননা ইয়াযীদের দরবারে ইমাম হুসাইন অতি সহজেই তোমার উপর প্রাধান্য লাভ করবেন। একথা শুনে ইব্‌ন যিয়াদ আমর ইব্‌ন সা'দকে লিখেন ঃ

"তিনটি প্রস্তাবের কোনটিই মনজুর করা যায় না। তবে হ্যাঁ, একটি পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। আর তা হলো, ইমাম হুসাইন আমার কাছে আত্মসমর্পণ করবেন এবং প্রথমে আমার হাতেই ইয়াযীদের জন্য বায়আত করবেন। এরপর আমি নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় তাঁকে ইয়াযীদের কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা করব।"

এই উত্তর আসার পর আমর ইব্‌ন সা'দ ইমাম হুসাইনকে বললেন, আমি নিরুপায়। ইব্‌ন যিয়াদ প্রথমে তার হাতে ইয়াযীদের জন্য বায়আত নিতে চান। অন্য কোন কথাই তিনি শুনতে রাযী নন। ইমাম হুসাইন বলেন, ইব্‌ন যিয়াদের হাতে বায়আত করার চাইতে আমার মৃত্যুই শ্রেয়।

ইব্‌ন সা'দ এই চেষ্টাই করছিলেন যাতে কোনরূপ রক্তপাত ঘটনা না ঘটে। তিনি চাচ্ছিলেন, হয় ইমাম হুসাইন (রা) ইব্‌ন যিযাদের শর্ত মেনে নিন, নয়ত ইব্‌ন যিয়াদ হুসাইনের ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁকে চলে যাবার অনুমতি দিন।

এই চিঠি বিনিময় এবং প্রত্যাখ্যান ও চাপ সৃষ্টির মধ্যে এক সপ্তাহ পর্যন্ত ইমাম হুসাইন ও ইব্‌ন সা'দ উভয়েই নিজ নিজ সঙ্গীদের নিয়ে কারবালা প্রান্তরে অবস্থান করেন। ঠিক তখনি ইব্‌ন যিয়াদের কাছে কোন না কোন ভাবে এই সংবাদ এসে পৌঁছে যে, ইমাম হুসাইন (রা) যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এতে সে অত্যন্ত চিন্তিত হয় এই ভেবে যে, সম্ভবত ইব্‌ন সা'দও তাঁর সাথে কোন ষড়যন্ত্র করে বসেছে। সে অবিলম্বে জুওয়ায়রা ইব্‌ন তামীমী নামক একজন লাঠিয়ালকে ডেকে তার মাধ্যমে ইব্‌ন সা'দের কাছে একটি চিঠি পাঠায়। তাতে সে লিখে ঃ

"হুসাইন ইব্‌ন আলীকে বন্দী করার জন্য আমি তোমাকে নির্দেশ দিয়েছিলাম। তোমার কর্তব্য ছিল তাঁকে বন্দী করে আমার সামনে হাযির করা। আর তা সম্ভব না হলে সোজা তাঁর মাথা কেটে নিয়ে আসা। আমি তো তোমাকে এই নির্দেশ দেইনি যে, তুমি তাঁর সংস্পর্শে থেকে তাঁর সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ট করবে। এখন এটাই তোমার কর্তব্য যে, এই পত্র পাঠ মাত্র হয় তুমি হুসাইন ইব্‌ন আলীকে আমার কাছে নিয়ে আসবে অথবা তাঁর বিরুদ্ধে

যুদ্ধ করবে এবং তাঁর দেহ থেকে মাথা পৃথক করে তা আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে। যদি তুমি এতে সামান্যমাত্র ইতস্তত কর তাহলে আমি আমার সিপাহীকে, যে এই পত্র নিয়ে তোমার কাছে যাচ্ছে, এই নির্দেশ দিয়ে রেখেছি যে, সে তোমাকে বন্দী করে আমার কাছে নিয়ে আসবে এবং তোমার সঙ্গের বাহিনী ততক্ষণ পর্যন্ত সেখানে অপেক্ষমাণ থাকবে যতক্ষণ না আমি অন্য কাউকে তোমার জায়গায় নিয়োগ করে পাঠাই।"

জুওয়ায়রা এই পত্র নিয়ে হিজরী ৬১ সনের ৯ই মুহাররম (৬৮০খ্রি -এর ১০ই অক্টোবর) বৃহস্পতিবার ইব্ন সা'দের কাছে পৌঁছে। তিনি তখন আপন তাঁবুতে বসাছিলেন। এই পত্র পাঠমাত্র তিনি দাঁড়িয়ে যান এবং ঘোড়ায় আরোহণ করে নিজ বাহিনীকে তৈরি হওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি জুওয়ায়রা ইব্ন বদর তামীমীকে বলেন, তুমি সাক্ষী থাক, আমি আমীরের নির্দেশ পাওয়া মাত্র তা কার্যকরী করেছি। এরপর তিনি সৈন্যদের সারিবদ্ধ করে সাজিয়ে জুওয়ায়রাকে সাথে নিয়ে অগ্রসর হন এবং ইমাম হুসাইনকে ডেকে বলেন, ইব্ন যিয়াদের একটি নির্দেশ এসেছে। আমি যদি তা কার্যকরী করতে সামান্য বিলম্ব করি তাহলে এই দূতকে, যিনি আমার সাথে রয়েছেন, নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আমাকে সঙ্গে সঙ্গে বন্দী করে ফেলতে। ইমাম হুসাইন বলেন, আমাকে আগামীকাল পর্যন্ত আরো কিছুটা চিন্তা করতে দাও। ইব্ন সা'দ তখন জুওয়ায়রার দিকে তাকালেন। সে বলে, আগামীকাল দূরে নয়, এই সময় পর্যন্ত তাকে অবকাশ দেওয়া উচিত। ইব্ন সা'দ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এসে তার বাহিনীকে নির্দেশ দেন, হাতিয়ার রেখে দাও। আজ কোন যুদ্ধ হবে না।

উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদ জুওয়ায়রার হাতে এই নির্দেশ পাঠানোর পর চিন্তা করল, যদি ইব্ন সা'দ আমার এই নির্দেশের প্রতি অনীহা প্রকাশ করে এবং জুওয়ায়রা তাকে বন্দী করে ফেলে তাহলে সেনাবাহিনী নেতৃত্বহীন অবস্থায় ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। এমন কি তারা ইমাম হুসাইনের দলেও ভিড়ে যেতে পারে। তখন আমাকে ভয়ানক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে এবং এই সুযোগে ইমাম হুসাইনও মক্কায় পালিয়ে যাবেন। আর এভাবে হাতের মুঠোয় পেয়েও যদি তাকে জব্দ করতে না পারি তাহলে তো এটা খুবই আক্ষেপের বিষয় হবে। অতএব শিমার যিল জাওশানকে সঙ্গে সঙ্গে ডেকে পাঠিয়ে বলে, আমি জুওয়ায়রাকে পাঠিয়েছি এবং তাকে নির্দেশ দিয়েছি যে, যদি ইব্ন সা'দ যুদ্ধ করতে ইতস্তত করে তাহলে তাকে যেন বন্দী করে নিয়ে আসে। ইব্ন সা'দের দিক থেকে আমি কপটতার আশংকা করছি। যদি জুওয়ায়রা ইব্ন সা'দকে বন্দী করে থাকে তাহলে যুদ্ধক্ষেত্রে যে সেনাবাহিনী পড়ে রয়েছে তারা ছিন্নভিন্ন এবং বিনষ্ট হয়ে যাবে। আমি এ কাজের জন্য তোমার চাইতে যোগ্য কাউকে দেখছি না। তুমি অবিলম্বে কারবালা প্রান্তরের দিকে যাও। যদি ইব্ন সা'দ ইতিমধ্যে বন্দী হয়ে থাকে তাহলে তুমি সেনাবাহিনীর অধিনায়কত্ব গ্রহণ কর এবং ইমাম হুসাইনের সাথে যুদ্ধ করে তাঁর মাথা কেটে নিয়ে আস। আর যদি সে বন্দী না হয়ে থাকে এবং যুদ্ধের ব্যাপারে ইতস্তত করতে থাকে তাহলে তুমি সেখানে পৌঁছেই যুদ্ধ বাঁধিয়ে দাও এবং কাজটি অতি তাড়াতাড়ি শেষ কর। তখন শিমার যিল-জাওশান বলল, আমার একটি শর্ত আছে। আর তা এই যে, আপনি তো জানেনই, আমার বোন উম্মুল বানীন বিন্ত হারাম হযরত আলীর স্ত্রী ছিল এবং তার গর্ভে উবায়দুল্লাহ্,

জাফর, উসমান, আব্বাস–এই চারটি ছেলে জন্মগ্রহণ করেছে। আমার এই চারটি তাগ্নেও তাদের ভাই হুসাইনের সাথে কারবালায় রয়েছে। আপনি এই চারজনের প্রাণের নিরাপত্তা দিন। উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন যিয়াদ তখনি কাগজ চেয়ে নিয়ে ঐ চারজনের জন্য একটি আমলনামা (নিরাপত্তা পত্র) লিখে তার উপর নিজের মোহর লাগিয়ে তা শিমার যিল-জাওশানের হাতে অর্পণ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাকে কারবালা অভিমুখে রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ দেন।

জুওয়ায়রা রাতের বেলা রওয়ানা হয়ে বৃহস্পতিবার দিন ভোরে কারবালায় গিয়ে পৌঁছেছিলেন। শিমার সকাল বেলা রওয়ানা হয়ে আসরের সময় গিয়ে পৌঁছল। ইব্‌ন সা'দ শিমারকে সেখানকার যাবতীয় ঘটনা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল করেন। কিন্তু সে বলে, আমি মুহূর্তের জন্যও ইমাম হুসাইনকে অবকাশ দেব না। তুমি হয় এখনি যুদ্ধের জন্য তৈরি হয়ে যাও, নতুবা সেনাবাহিনীর দায়িত্ব আমার হাতে ন্যস্ত কর। ইব্‌ন সা'দ তখনি ঘোড়ায় আরোহণ করে শিমারকে সঙ্গে নিয়ে ইমাম হুসাইনের কাছে আসেন এবং তাঁকে সম্বোধন করে বলেন, উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদ এই দ্বিতীয় দূত পাঠিয়েছেন। তিনি আপনাকে মোটেই অবকাশ দিতে চান না। ইমাম হুসাইন (রা) বলেন, সুবাহানাল্লাহ্। এখন আর অবকাশ দেওয়া না দেওয়ার কী প্রয়োজন ? এখন তো সূর্য অস্ত যাচ্ছে। এই রাতের বেলায়ও কি তোমরা যুদ্ধ মুলতবি রাখবে না ? একথা শুনে শিমার যিল-জাওশান পরদিন ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে রাযী হলো। ফলে উভয় বাহিনী রাতের মত নিজ নিজ তাঁবুতে ফিরে গেল।

পানি বন্ধ

রাতের বেলা উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদের একটি নির্দেশ এসে পৌঁছল যে, "যদি এখনো যুদ্ধ শুরু না হয়ে থাকে তাহলে এই নির্দেশ পৌঁছার সাথে সাথে পানির উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা কর এবং হুসাইন ইব্‌ন আলী ও তাঁর সঙ্গীদের জন্য পানি বন্ধ করে দাও। যদি সৈন্যরা শিমারের অধিনায়কত্বে এসে গিয়ে থাকে তাহলে শিমারকে এখনি এই নির্দেশ পালন করতে হবে।"

এই নির্দেশ পৌঁছার সাথে সাথে আমর ইব্‌ন সা'দ আমর ইব্‌নুল হাজ্জাজের নেতৃত্বে পাঁচশ অশ্বারোহী সৈন্য ফুরাত উপকূলে মোতায়েন করেন। ঘটনাচক্রে ঐ দিন দিনের বেলা ইমাম হুসাইনের সঙ্গীরা নদী থেকে পানি তুলেন নি। তাই তাদের সব কয়টি পাত্রই খালি ছিল। রাতের বেলা তারা পানি ভরতে গেলে জানতে পারলেন যে, শত্রুরা পানির উপর তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। ইমাম হুসাইন (রা) আপন ভাই আব্বাস ইব্‌ন আলীকে পঞ্চাশজন লোকসহ ফুরাতের দিকে এই বলে পাঠান যে, শক্তি প্রয়োগ করে হলেও পানি নিয়ে আস। কিন্তু ঐ জালিমরা পানি আনতে দিল না। এবার ক্রমে ক্রমে ইমাম হুসাইনের সঙ্গীরা পিপাসায় কাতর হয়ে উঠলেন। এই কষ্ট ছিল তীর ও তরবারির আঘাতের চাইতেও মারাত্মক। ইমাম হুসাইনের কনিষ্ঠপুত্র আলী অসুস্থ অবস্থায় তাঁবুতে শুয়েছিল! সে এবং তার বোন উম্মে কুলসুম এই ভেবে ক্রন্দন করতে লাগল যে, ভোর বেলা শত্রুরা হামলা চালাবে এবং আমাদের সমগ্র আত্মীয়-স্বজন, যারা এখানে রয়েছেন, তাদের সকলকেই হত্যা করে ফেলবে। এই দু'জনের কান্নার শব্দ শুনে হুসাইন (রা) তাঁবুর ভিতরে আসেন। তিনি বললেন, শত্রুরা আমাদের কাছেই

অবস্থান করছে। তোমাদের কান্নার শব্দ শুনে একদিকে তারা খুশি হবে এবং অন্যদিকে তোমাদের সঙ্গীরা হতাশ হয়ে পড়বে। অতএব তোমাদের হাহুতাশ করা মোটেই উচিত নয়। এভাবে অনেক কষ্টে তিনি তাদের কান্না থামালেন। এরপর বাইরে এসে বলেন, স্ত্রীলোক এবং শিশুদের সঙ্গে নিয়ে এসে আমি মস্ত বড় ভুল করেছি। ওদের সঙ্গে নিয়ে আসা মোটেই উচিত হয়নি। এর পর তিনি তাঁর সকল সঙ্গীকে নিজের কাছে ডেকে নিয়ে বলেন, তোমরা এখান থেকে যেদিকে ইচ্ছা চলে যাও। তোমাদের কেউ কিছু বলবে না। কেননা একমাত্র আমিই শত্রুদের লক্ষ্য বস্তু। তোমরা চলে গেলে বরং ওরা খুশিই হবে। আমি তোমাদের সবাইকে অনুমতি দিচ্ছি, তোমরা নিজ নিজ প্রাণ রক্ষা কর। সঙ্গীরা একথা শুনে বলল, আমরা কখনো আপনাকে ছেড়ে যাব না, বরং যতক্ষণ আমাদের দেহে প্রাণ আছে আপনার খাতিরে যে কোন কষ্ট সহ্য করে যাব। কিছুক্ষণ পর, ঐ রাতেই তারমাহ ইব্ন আদী নামীয় জনৈক ব্যক্তি, যে কোন না কোন কাজে এদিকে এসেছিল, হযরত ইমাম হুসাইন ও ইব্ন সা'দের বাহিনীর অবস্থা জানতে পেরে ইমাম হুসাইনের সাথে সাক্ষাত করল। সে আদ্যোপান্ত পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে বলল, আপনি একাকী আমার সাথে চলুন। আমি আপনাকে এমন এক গোপন রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাব যে, প্রতিপক্ষ তা ঘুণাক্ষরেও টের পাবে না। আমি আপনাকে আমার গোত্র 'বনী তাই'-এর কাছে নিয়ে যাব এবং আমারই গোত্র থেকে পাঁচ হাজার লোক আপনার খিদমতে পেশ করব। আপনি তাদেরকে দিয়ে যে কাজ ইচ্ছা, করিয়ে নিতে পারবেন। ইমাম হুসাইন (রা) বলেন, আমি এইমাত্র ওদের সবাইকে বলেছিলাম যে, আমাকে একাকী ছেড়ে তোমরা সবাই চলে যাও। কিন্তু তারা তাতে সম্মত হয়নি। অতএব এখন এটা কি করে সম্ভব যে, আমি তাদের সবাইকে ছেড়ে নিজের প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যাব ? তখন তাঁর সঙ্গীরা বলল, আমাদেরকে তো ওরা কিছুই করবে না, যেমন আপনি ইতিপূর্বে বলেছেন। ওরা শুধু আপনারই শত্রু। অতএব আপনি আপনার প্রাণের নিরাপত্তার জন্য বেরিয়ে যান। ইমাম হুসাইন (রা) বলেন, নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য এভাবে বন্ধু-বান্ধব ও নিকটাত্মীয়দের ছেড়ে যাওয়া কখনো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। শেষ পর্যন্ত ধন্যবাদ দিয়ে তিনি তারমাহকে বিদায় দেন। ভোর হলে শিমার যিল-জাওশান এবং আমর ইব্ন সা'দ তাদের বাহিনীকে বিন্যস্ত করে যুদ্ধক্ষেত্রে এসে হাযির হলো। ইমাম হুসাইনও তাঁর সঙ্গীদেরকে যথাযথ নির্দেশ দিয়ে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় মোতায়েন করলেন। শিমার যিল-জাওশান হযরত আলী (রা)-এর পুত্র উবায়দুল্লাহ্, জা'ফর, উসমান ও আব্বাসকে যুদ্ধক্ষেত্রে ডেকে এনে বলল, তোমাদেরকে ইব্ন যিয়াদ নিরাপত্তা প্রদান করেছেন। তারা উত্তর দিল, ইব্ন যিয়াদের নিরাপত্তার চাইতে আল্লাহ্র নিরাপত্তাই শ্রেয়। একথা শুনে শিমার অত্যন্ত বিস্মিত হয়। কোন কোন বর্ণনা মতে, হিজরী ৬১ সনের ১০ই মুহাররম (৬৮০খ্রি-এর ১১ই অক্টোবর) ভোর বেলা যখন লড়াই শুরু হয় তখন ইমাম হুসাইনের সাথে বাহাত্তর জন লোক ছিল। কারো কারো মতে, তাদের সংখ্যা ছিল একশ চল্লিশ, আবার কারো কারো মতে দুশ চল্লিশ। মোটকথা যদি সর্বাধিক সংখ্যা দুশ চল্লিশ বলেও স্বীকার করে নেওয়া হয় তাহলেও শত্রুপক্ষের হাজার হাজার যোদ্ধার মুকাবিলায় ইমাম হুসাইনের সঙ্গীদের সংখ্যা ছিল নেহাতই কম। ইমাম হুসাইন তাঁর সঙ্গীদেরকে যথাযোগ্য স্থানে দাঁড় করিয়ে

তাদেরকে প্রয়োজনীয় উপদেশ দেন। এরপর উটে আরোহণ করে একাই কূফী বাহিনীর সামনে গিয়ে দাঁড়ান এবং তাদের উদ্দেশ করে উচ্চৈঃস্বরে বক্তৃতা দিতে শুরু করেন। তিনি বলেন, হে কূফাবাসী! আমি জানি যে, এই বক্তৃতা এখন আমার জন্য কোন সুফল বয়ে আনবে না এবং তোমরা যা কিছু করবার তা করবেই, তা থেকে কখনো বিরত হবে না। তবু আমি বক্তৃতা দিচ্ছি, যাতে আল্লাহ্ তা'আলার 'হুজ্জত' (যুক্তি) তোমাদের উপর পূর্ণ হয় এবং আমার ওযরও প্রকাশ পায়। তিনি এতটুকুই বলেছেন– এমন সময় তাঁর তাঁবুর দিক থেকে স্ত্রীলোক ও শিশুদের কান্নার রোল ভেসে এল। এই আওয়াজ শুনে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হন এবং বক্তৃতা বন্ধ করে বলে উঠেন–

لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ–

(সমুন্নত ও মহান আল্লাহ্ তা'আলাই সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্যের মালিক)

এরপর তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) আমাকে ঠিকই বলেছিলেন, স্ত্রীলোক এবং শিশুদের সঙ্গে নিয়ে যেয়ো না। তাঁর পরামর্শ না শুনে আমি মস্তবড় ভুল করেছি। এরপর তিনি ফিরে গিয়ে আপন ভাই ও ছেলেদের বলেন, এই স্ত্রীলোকদের কাঁদতে নিষেধ কর এবং বল, এখন নীরব থাক, আগামীকাল মন ভরে কাঁদবে। তারা স্ত্রীলোকদের বুঝাল। ফলে কান্নার রোল থেমে গেল। হযরত হুসাইন (রা) এরপর কূফীদের দিকে মুখ করে পুনরায় বক্তৃতা দিতে শুরু করেন ঃ

"লোক সকল! তোমাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি, যে আমাকে জানে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি যে আমাকে জানে না, যেন ভালভাবে একথা জেনে রাখে যে, আমি হচ্ছি হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নাতি এবং হযরত আলী (রা)-এর পুত্র, হযরত ফাতিমা (রা) হচ্ছেন আমার মা এবং জা'ফর তাইয়ার (রা) হচ্ছেন আমার চাচা। এই বংশগত গর্ব ছাড়াও আমার আর একটি গর্বের বিষয় এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে এবং আমার ভাই হাসান (রা)-কে জান্নাতবাসী যুবকদের নেতা বলে আখ্যায়িত করেছেন। যদি আমার কথায় তোমাদের বিশ্বাস না হয় তাহলে এখনো অনেক সাহাবী জীবিত আছেন। তোমরা তাঁদের কাছে আমার কথার সত্যতা যাচাই করতে পার। আমি কখনো প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিনি, কখনো সালাত কাযা করিনি, কোন মু'মিনকে হত্যা করিনি এবং কষ্টও দেইনি। যদি ঈসা (আ)-এর গাধাও জীবিত থাকত তাহলে সমগ্র ঈসায়ী কিয়ামত পর্যন্ত সেই গাধার প্রতিপালন ও আদর-আপ্যায়নে নিমগ্ন থাকত। তোমরা কি ধরনের মুসলমান এবং কি ধরনের উম্মত যে, নিজেদের রাসূলের নাতিকে হত্যা করতে চাচ্ছ। তোমাদের না আছে আল্লাহ্র প্রতি ভয়, আর না রাসূলের প্রতি লজ্জা-শরম। আমি যখন সারা জীবনেও কোন লোককে হত্যা করিনি তখন তো এটা পরিষ্কার যে, আমার উপর কারো কোন কিসাস নেই। তাহলে বল, তোমরা কিভাবে আমার রক্তপাত বৈধ বলে ধরে নিয়েছ ? আমি দুনিয়ার সমস্ত ঝগড়া-বিবাদ থেকে পৃথক হয়ে মদীনায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র পদদ্বয়ের নিচে পড়েছিলাম। তোমরা সেখানেও আমাকে থাকতে দাওনি। এরপর পবিত্র মক্কায় আল্লাহ্র ঘরে ইবাদতে মগ্ন ছিলাম; তোমরা কূফীরা আমাকে সেখানেও শান্তিতে থাকতে দাওনি। তোমরা আমার কাছে অনবরত পত্রাদি পাঠিয়েছ এবং আমাকে বলেছ, তোমাকে আমরা ইমামতের (নেতৃত্ব) হকদার মনে করি এবং তোমার হাতেই খিলাফতের বায়আত

করতে চাই।' তোমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে যখন আমি এখানে এলাম তখন তোমরা আমা থেকে ফিরে গেলে। এখনও যদি তোমরা আমাকে সাহায্য না কর তাহলে তোমাদের কাছে আমি স্রেফ এতটুকু চাই যে, আমাকে তোমরা হত্যা করো না বরং স্বাধীনভাবে ছেড়ে দাও, যাতে আমি মক্কা অথবা মদীনায় গিয়ে নিজেকে ইবাদতে নিমগ্ন রাখতে পারি। বাদবাকি আল্লাহ্ তা'আলা ফায়সালা করবেন, কে এই দুনিয়ায় ন্যায় ও সত্যের উপর ছিল, আর কে জালিম ছিল।"

এই বক্তৃতা শুনে সবাই নীরব নিশ্চুপ। কারো মুখে কোন কথা নেই। অল্প কিছুক্ষণ পর হযরত ইমাম হুসাইন পুনরায় বলেন, "আল্লাহ্র শোকর যে, আমি তোমাদের উপর 'হুজ্জত' পূর্ণ করেছি (যুক্তি প্রদর্শন করেছি) এবং তোমরা এ ব্যাপারে কোন ওযর পেশ করতে পারনি এবং কখনো পারবে না।"

তারপর তিনি বেশ কয়েক ব্যক্তিকে একের পর এক নাম ধরে ডাকেন, হে শিব্ত ইব্ন রিবয়ী! হে হাজ্জাজ ইব্নুল হাসান! হে কায়স ইব্ন আশআছ! হে হুর ইব্ন ইয়াযীদ তামীমী! হে অমুক! হে অমুক! তোমরা কি আমার কাছে পত্র লেখনি? তোমরা কি আমাকে এখানে জোর করে ডেকে নিয়ে আসনি ? আর যখন আমি এসেছি তখন তোমরা আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছ।

এ কথা শুনে সবাই বলল, আমরা আপনাকে কোন পত্র লিখিনি এবং কূফায় আসার আহ্বানও জানাই নি। তখন হযরত ইমাম হুসাইন চিঠিগুলো বের করে পৃথক পৃথকভাবে পড়ে শুনিয়ে বললেন, এগুলো কি তোমাদের চিঠি নয় ? তারা এবার বলল, আমরা আপনার কাছে পত্র পাঠাই আর নাই পাঠাই, এখন আমরা প্রকাশ্যে আপনার প্রতি আমাদের অসম্মতি জ্ঞাপন করছি। একথা শুনে ইমাম হুসাইন (রা) উটের উপর থেকে নামলেন এবং ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধের জন্য তৈরি হয়ে গেলেন। বিপক্ষ দল থেকে এক ব্যক্তি তাঁর মুকাবিলার জন্য বেরিয়ে এল, কিন্তু তার ঘোড়া এমনভাবে কুঁচকাতে শুরু করল যে, সে ঘোড়ার উপর থেকে পড়ে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ হারাল। এই অবস্থা দেখে হুর ইব্ন ইয়াযীদ তামীমী সামনে ঢাল ধরে ঘোড়া দৌড়িয়ে একেবারে হামলার ভঙ্গিতে ইমাম হুসাইনের দিকে এগিয়ে এল। কিন্তু তাঁর কাছে এসেই ঢাল ফেলে দিল। ইমাম হুসাইন জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি জন্য এসেছ ? সে বলল, আমি হচ্ছি সেই ব্যক্তি, যে আপনাকে সব দিক থেকে ঘেরাও করে এই প্রান্তরে আটকে রেখেছে এবং এখান থেকে ফিরে যেতে দেয়নি। আমি আমার এই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে গিয়ে এখন আপনার পক্ষ নিয়ে কূফীদের মুকাবিলা করব। আপনি দু'আ করবেন যেন আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে মাফ করে দেন। ইমাম হুসাইন (রা) তার জন্য দু'আ করেন এবং এতে সে খুবই আনন্দিত হয়।

শিমার যিল-জাওশান এবার আমর ইব্ন সা'দকে বলল, এখন আর দেরি করছেন কেন? আমর ইব্ন সা'দ সঙ্গে সঙ্গে তার ধনুকে তীর জুড়ে হাসানের বাহিনীর দিকে নিক্ষেপ করল এবং বলল, তোমরা সাক্ষী থাক, সর্বপ্রথম তীর আমিই নিক্ষেপ করেছি। এরপর কূফীদের বাহিনী থেকে দু'ব্যক্তি বেরিয়ে এল। ইমাম হুসাইনের পক্ষ থেকে একজন বীরযোদ্ধা ওদের মুকাবিলায় এগিয়ে গেলেন এবং উভয়কেই হত্যা করলেন। এভাবে বেশ কিছুক্ষণ

প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক লড়াই অব্যাহত থাকল এবং এতে কূফীদেরই অধিক সংখ্যক লোক মারা গেল। এরপর ইমাম হুসাইনের পক্ষ থেকে এক একজন করে এগিয়ে গিয়ে কূফীদের সারিসমূহের উপর হামলা চালাতে লাগল। এতে অনেক কূফী মারা গেল। ইমাম হুসাইনের সঙ্গীরা তখন পর্যন্ত আবূ তালিবের বংশের লোকদেরকে যুদ্ধক্ষেত্রে নামতে দেয়নি, যতক্ষণ না তারা এক এক করে সকলেই শাহাদাতবরণ করেন। অবশেষে সর্বপ্রথম মুসলিম ইব্‌ন আকীলের পুত্ররা এগিয়ে যায়। তাঁরা অনেক শত্রুকে হত্যা করেন। এরপর নিজেরাও শহীদ হন। তাঁদের শহীদ হওয়ার পর ইমাম হুসাইনের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায় এবং তিনি কাঁদতে থাকেন। এরপর তাঁর ভাই আবদুল্লাহ্, মুহাম্মদ, জা'ফর ও উসমান শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং অনেক শত্রুকে হত্যা করে নিজেরাও চিরদিনের জন্য হারিয়ে যান। শেষ পর্যন্ত ইমাম হুসাইনের এক কিশোর পুত্র মুহাম্মদ কাসিম শত্রুদের উপর হামলা চালান এবং শেষ পর্যন্ত তিনিও শহীদ হন। মোটকথা, ইমাম হুসাইনকে, নিজের শাহাদাত এবং অন্যান্য যাবতীয় বিপদ থেকেও মর্মান্তিক যে দৃশ্যটি কারবালা প্রান্তরে প্রত্যক্ষ করতে হয়েছিল তা হলো এই যে, তিনি তাঁর চোখের সামনেই আপন ভাই ও ছেলেদেরকে একের পর এক শহীদ হতে দেখেছেন এবং দেখেছেন আপন বোন ও মেয়েদেরকে সেজন্য হাহুতাশ করতে। ইমাম হুসাইনের সঙ্গী এবং তাঁর বংশের লোকেরা এক দিকে যেমন বীরত্বের অপরূপ নমুনা পেশ করেছেন, অন্যদিকে তেমনি স্থাপন করেছেন বিশ্বস্ততা ও আত্মোৎসর্গের অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত। তাঁর দলের কোন লোকই যেমন ভীরুতা, কাপুরুষতা বা কোনরূপ দুর্বলতা প্রকাশ করেনি, তেমনি স্বার্থপরতা ও অবিশ্বস্ততার অভিযোগেও নিজেকে অভিযুক্ত করেনি। ইমাম হুসাইন (রা) শেষ পর্যন্ত একা থেকে যান। তাঁবুতে রুগ্ন শিশুপুত্র আলী ওরফে যয়নুল আবিদীন ছাড়া বাকি সবাই ছিল নারী। অত্যাচারী উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদ ইতিমধ্যে এই নির্দেশও পাঠিয়েছিল যে, হুসাইনের মস্তক কেটে যেন দেহ থেকে আলাদা করা হয় এবং দেহকে ঘোড়া দ্বারা এমনভাবে পিষ্ট করা হয় যে, তাঁর সব কয়টি অংগই যেন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়।

ইমাম হুসাইন (রা)-এর শাহাদাতবরণ

হযরত ইমাম হুসাইন (রা) নিঃসঙ্গ হয়ে যাওয়ার পর যে অপূর্ব বীরত্ব ও পৌরুষের সাথে শত্রুদের উপর আক্রমণ চালিয়েছিলেন তা প্রত্যক্ষ করার মত তাঁর সঙ্গীদের কেউই জীবিত ছিলেন না। কিন্তু আমর ইব্‌ন সা'দ ও শিমার যিল-জাওশান তখন আপোসে বলাবলি করছিল, আমরা আজ পর্যন্ত এমন একজন বীর বাহাদুর দেখিনি। এই বিষাদময় ও মর্মান্তিক ঘটনার সার সংক্ষেপ এই যে, হযরত ইমাম হুসাইনের দেহের উপর পঁয়তাল্লিশটি তীরের জখম ছিল। এতদসত্ত্বেও তিনি বীরত্বের সাথে মুকাবিলা করে যান। অন্য একটি বর্ণনানুযায়ী, তাঁর দেহে তেত্রিশটি বর্শার এবং তেতাল্লিশটি তরবারির জখম ছিল। আর তীরের জখম ছিল এগুলোর অতিরিক্ত। প্রথমে তিনি ঘোড়ায় আরোহণ করে হামলা চালাতে থাকেন। কিন্তু শত্রুর আঘাতে তাঁর ঘোড়া মারা গেলে তিনি মাটিতে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে থাকেন। শত্রুদের মধ্যে কোন ব্যক্তিই চাচ্ছিল না যে, ইমাম হুসাইন তার হাতে নিহত হোন বরং প্রত্যেক ব্যক্তিই তাঁর মুকাবিলা থেকে কিছুটা দূরে থাকার চেষ্টা করছিল। শেষ পর্যন্ত শিমার যিল-জাওশান ছয় ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর উপর হামলা চালায়। ওদের মধ্যে একজন এমনভাবে তরবারি দ্বারা

আঘাত করে যে, ইমাম হুসাইন (রা)-এর বাম হাত দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ইমাম হুসাইন (রা) তাকে পাল্টা আঘাত করতে চান কিন্তু তাঁর ডান হাতও এমনভাবে আহত হয়ে গিয়েছিল যে, তিনি তরবারি উঠাতেই পারছিলেন না। পিছন থেকে সানান ইব্‌ন আনাস নাখ্‌ঈ তাঁকে লক্ষ্য করে এমন ভাবে বর্শা নিক্ষেপ করল যে, তা তাঁর পেট ভেদ করে চলে গেল। এবার তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। সানান তখন বর্শা টেনে বের করল এবং সেই সাথে বের হয়ে গেল ইমাম হুসাইনের রূহও। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন (নিশ্চয় আমরা আল্লাহ্‌রই এবং নিশ্চয়ই আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী)।

এরপর শিমার কিংবা তার নির্দেশে অন্য কেউ ইমাম হুসাইনের দেহ থেকে তাঁর মস্তকটি পৃথক করে ফেলে। এরপর উবায়দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন যিয়াদের নির্দেশ পালনার্থে বারজন অশ্বারোহীকে মোতায়েন করা হয়। তারা তাদের ঘোড়ার খুরের আঘাতে ইমামের দেহকে মর্মান্তিকভাবে দলিত-মথিত করে। এরপর তাঁর পরিবার-পরিজনকে বন্দী করা হয়। তাঁদের মধ্যে শিশু যয়নুল আবিদীন ছাড়া আর কোন পুরুষ সদস্য ছিল না। শিমার যিল-জাওশান তাকেও হত্যা করার সংকল্প নেয়। কিন্তু আমর ইব্‌ন সা'দ তাকে বিরত রাখে। এরপর ইমাম হুসাইনের মস্তক এবং তাঁর পরিবারবর্গকে ইব্‌ন যিয়াদের কাছে পাঠানো হয়। এই উপলক্ষে ইব্‌ন যিয়াদ একটি দরবার আহ্বান করে। ইমামের মস্তক একটি পেয়ালার মধ্যে রেখে যিয়াদের সামনে পেশ করা হয়। ইব্‌ন যিয়াদ তা দেখে কিছু অশিষ্ট বাক্য উচ্চারণ করে। এরপর তৃতীয় দিন শিমার যিল-জাওশানের সাথে একদল সৈন্য দিয়ে ইমামের মস্তক এবং তাঁর বন্দী পরিবারবর্গকে দামিশকে ইয়াযীদের কাছে পাঠানো হয়। আলী ইব্‌ন হুসাইন (রা) অর্থাৎ ইমাম যয়নুল আবিদীন এবং হুসাইন পরিবারের মহিলাগণ ইয়াযীদের সামনে হাযির হলে সে তাদেরকে এবং সেই সাথে ইমাম হুসাইনের কর্তিত মস্তকটি দেখে কেঁদে ওঠে এবং ইব্‌ন যিয়াদকে ধিক্কার দিয়ে বলতে থাকে, এই সুমাইয়ার বাচ্চাকে আমি কখন নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, হুসাইন ইব্‌ন আলীকে হত্যা কর। এরপর তিনি শিমার যিল-জাওশান এবং ইরাকীদেরকে সম্বোধন করে বলে, আমি তোমাদের আনুগত্যে এমনিতেই সন্তুষ্ট ছিলাম। তোমরা হুসাইনকে হত্যা করতে গেলে কেন? শিমার যিল-জাওশান এবং তার সঙ্গীরা আশা করেছিল যে, ইয়াযীদ তাদেরকে পুরস্কৃত ও সম্মানিত করবে। কিন্তু ইয়াযীদ কাউকেও কোন পুরস্কার বা উপঢৌকন দেয়নি, বরং উষ্মা প্রকাশ করে তাদের সবাইকে ফেরত যেতে বলে। এরপর তার সভাসদবৃন্দকে সম্বোধন করে বলে, "ইমাম হুসাইনের মা আমার মায়ের চাইতে উৎকৃষ্ট ছিলেন, তাঁর নানা মুহাম্মদ (সা) সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল এবং মানবজাতির নেতা। কিন্তু তাঁর পিতা আলী ও আমার পিতা মুআবিয়ার মধ্যে ঝগড়া হয়েছিল। এভাবে আমার ও হুসাইনের মধ্যেও ঝগড়া হয়েছে। আলী এবং হুসাইন উভয়েই বলতেন, যার বাপ-দাদা শ্রেষ্ঠ সেই খলীফা হবে। কিন্তু কুরআন শরীফের ঐ আয়াতের দিকে তাঁরা লক্ষ্য করেননি, যাতে বলা হয়েছে ঃ

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ
مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ط اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ-

"বল, হে সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহ্! তুমি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা দান কর এবং যার নিকট থেকে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে লও; যাকে ইচ্ছা তুমি পরাক্রমশালী কর; আর যাকে ইচ্ছা তুমি হীন কর। কল্যাণ তোমার হাতেই। নিশ্চয়ই তুমি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।" (৩ ঃ ২৬)

শেষ পর্যন্ত সবাই জানতে পেরেছে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরই পক্ষে ফায়সালা করেছেন।

এরপর সে বন্দীদের মুক্ত করে দিয়ে সম্মানিত মেহমান হিসাবে নিজ প্রাসাদেই রাখে। মহিলারা অন্দর মহলের মহিলাদের কাছে গিয়ে দেখতে পেল যে, ইয়াযীদের প্রাসাদেও কান্নার রোল উঠেছে এবং স্ত্রীলোক মাত্রই কাঁদছে, যেমন ইমাম হুসাইনের বোন আপন ভাই এবং নিকটাত্মীয়দের জন্য কাঁদছিলেন। কয়েকদিন রাজকীয় মেহমান হিসাবে কাটিয়ে এই ভাগ্যাহত কাফেলাটি মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হয়। ইয়াযীদ তাঁদের সর্বপ্রকার আর্থিক সাহায্য প্রদান করে এবং আলী ইব্নুল হুসাইনকে সর্বপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়।

উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদের আশাভঙ্গ

উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদের আশা ছিল যে, ইমাম হুসাইনকে হত্যার পর তার মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি পাবে, কিন্তু কারবালার ঘটনার পর ইয়াযীদ, মুসলিম ইব্ন যিয়াদকে খুরাসানের শাসনকর্তা নিয়োগ করে। সেই সাথে ইরাকের কয়েকটি প্রদেশও, যা বসরার সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল, তার অধীনে ন্যস্ত করে। ইয়াযীদ মুসলিমকে কূফা হয়ে যেতে বলে এবং তার হাতে উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদের নামে একটি পত্র দেয়। তাতে উবায়দুল্লাহকে লিখেছিলেন, তোমার কাছে ইরাকের যে সেনাবাহিনী আছে তা থেকে মুসলিমকে ছয় হাজার সৈন্য দিয়ে দেবে। সে যাদেরকে পছন্দ করবে তাদেরকেই তার হাতে ন্যস্ত করবে। একথায় উবায়দুল্লাহ্ খুবই মনঃক্ষুণ্ণ হয় এবং হুসাইন হত্যার উপর আপেক্ষ করে বলতে থাকে, যদি তিনি (হুসাইন) জীবিত থাকতেন তাহলে ইয়াযীদও আমার উপর নির্ভরশীল থাকত এবং আমার মান-মর্যাদা বৃদ্ধি করতো। কিন্তু তিনি (হুসাইন) নিহত হওয়ায় ইয়াযীদ এমনভাবে চিন্তামুক্ত হয়ে গেছে যে, আমার কাছ থেকে শাসনক্ষমতা ও সেনাবাহিনী উভয়ই কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে। মুসলিম কূফার সেনাবাহিনীর অধিনায়কদের জিজ্ঞেস করে, তোমাদের মধ্যে কারা আমার সাথে খুরাসান যেতে চাও, তখন প্রত্যেকেই তার সাথে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে। রাতের বেলা উবায়দুল্লাহ্র বাহিনীর অধিনায়কদের কাছে তার নিজস্ব একজন লোক পাঠায় এবং তারই মাধ্যমে ওদেরক বলে, আক্ষেপের বিষয় যে, তোমরা মুসলিমকে আমার উপর প্রাধান্য দিচ্ছ। অধিনায়করা তখন উত্তর দেয়, আপনার সাথে থেকে তো আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্র পরিবারের সাথে যুদ্ধ করতে হয়। কিন্তু মুসলিমের সাথে গেলে আমরা তুর্কী ও মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সুযোগ পাব। পরদিন মুসলিম কূফার সেনাবাহিনী থেকে বাছাই করা ছয় হাজার সৈন্য নিয়ে খুরাসান অভিমুখে রওয়ানা হন। কারবালার ঘটনার পর উবায়দুল্লাহ্র ভাগ্যে লজ্জা ও অপমান ছাড়া কিছুই জোটেনি।

মক্কা-মদীনার ঘটনাবলী

ইয়াযীদ যখন আমর ইব্ন সা'দকে মদীনা থেকে কূফার দিকে আবদুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদের কাছে যাবার নির্দেশ দেন তখন আমরের স্থলে ওয়ালীদ ইব্ন উতবাকে মদীনার শাসনকর্তা

নিয়োগ করেন। এই ওয়ালীদ ইব্‌ন উতবা তার কার্যভার গ্রহণ করার পর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জা'ফরের অনুরোধক্রমে এই মর্মে একটি দলীল লিখে দিয়েছিলেন যে, যদি ইমাম হুসাইন মদীনায় চলে আসেন, তাহলে তাকে নিরাপত্তা প্রদান করা হবে। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জা'ফর নিজের একটি পত্রের সাথে এই দলীলটিও আপন পুত্র আওন ও মুহাম্মদের মাধ্যমে ইমাম হুসাইনের কাছে ঠিক তখনি পাঠিয়েছিলেন যখন তিনি কূফার দিকে যাচ্ছিলেন। মক্কা থেকে ইয়াযীদের শাসন বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। এখন সেখানকার সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র। ইমাম হুসাইনের শাহাদাতের খবর মক্কায় এসে পৌঁছলে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র জনসাধারণকে একত্র করে একটি ভাষণ দেন। তাতে তিনি বলেন ঃ

"লোক সকল! ইরাকীদের চাইতে খারাপ মানুষ বিশ্বের কোথাও নেই। তাদের মধ্যে আবার সবচেয়ে খারাপ হচ্ছে কূফার লোকেরা। তারা পর পর চিঠি লিখে ইমাম হুসাইনকে কূফায় যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছে এবং তার খিলাফতের বায়আত করেছে। কিন্তু ইব্‌ন যিয়াদ কূফায় পৌঁছলে তারা তারই চারপাশে ভিড় জমায় এবং ইমাম হুসাইনকে হত্যা করায়— যিনি ছিলেন নামাযী, রোযাদার, কুরআনের অনুসারী এবং সব দিক দিয়ে খিলাফতের যোগ্য। আর হত্যা করতে গিয়ে আল্লাহকে বিন্দুমাত্রও ভয় করেনি।

এই বলে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র কেঁদে ফেলেন। লোকেরা বলল, এখন আপনার চাইতে খলীফা পদের অধিকযোগ্য তো আর কেউ নেই। আপনি হাত বাড়িয়ে দিন। আমরা আপনারই হাতে বায়আত করব এবং আপনাকে যুগের খলীফা হিসাবে মানব। যা হোক, সমগ্র মক্কাবাসী আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের হাতে বায়আত করে। এই বায়আতের খবর ইয়াযীদের কাছে গিয়ে পৌঁছলে দু'জন বাহক মারফত একটি রৌপ্য-নির্মিত শিকল ওয়ালীদ ইব্‌ন উতবার কাছে মদীনায় পাঠায় এবং তাকে লিখে ঃ 'তুমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রকে মক্কা থেকে গ্রেফতার করে এবং তাঁর গলায় এই শিকল ঝুলিয়ে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।' কিন্তু পরে সে নিজের এই কাজের জন্য নিজেই আক্ষেপ করে। কেননা সে জানত, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র এত সহজ লোক নন যে, এমনিতেই এই শিকল নিজের গলায় পরে নেবেন। অতএব সঙ্গত কারণেই ওয়ালীদ ইব্‌ন উতবা ইয়াযীদের নির্দেশ পালন করেনি। কিভাবে আবদুল্লাহকে কাবু করা যায় এবং রক্তপাত থেকে কা'বা ঘরের পবিত্রতাও রক্ষা করা যায় সে ব্যাপারে ইয়াযীদ গভীরভাবে চিন্তা করছিল। হিজরী ৪১ সনের যিলহজ্জ (৬৬২ খ্রি এপ্রিল) মাসে হজ্জব্রত পালনের জন্য বিভিন্ন দিক থেকে লোকেরা দলে দলে মক্কা অভিমুখে আসতে শুরু করে। ইয়াযীদের পক্ষ থেকে মদীনার শাসনকর্তা ওয়ালীদ 'আমীরুল হজ্জ' নিযুক্ত হয়ে মক্কায় আসে। অপরদিকে স্বয়ং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রও ছিলেন আমীরুল হজ্জ। যাহোক তারা উভয়ে পৃথকভাবে স্ব স্ব অনুসারীদের নিয়ে হজ্জ করেন এবং কেউ কারো বিরোধিতা করেননি। অবশ্য ওয়ালীদ এমন ফন্দিও আঁটতে থাকে যাতে আব্দুল্লাহকে বন্দী করে ইয়াযীদের কাছে পাঠানো যায়। কিন্তু তিনি ওয়ালীদের এই গোপন ষড়যন্ত্রের কথা জেনে ফেলেন এবং হজ্জের মওসুম অতিক্রান্ত হবার পর ধীরেসুস্থে ইয়াযীদের কাছে নিম্নোক্ত চিঠি লিখেন ঃ

"ওয়ালীদ যদিও তোমার চাচাত ভাই, কিন্তু সে মস্তবড় আহাম্মক। আপন আহম্মকীর কারণে সে সব কাজই লণ্ডভণ্ড করে দিচ্ছে। তোমার উচিত, অন্য কাউকে মদীনার শাসনকর্তা নিয়োগ করা।"

এই পত্রে ইয়াযীদ খুবই প্রভাবিত হয়। ধারণা করেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়রের অন্তর আমার প্রসঙ্গে বিরূপ নয় এবং তিনি মোটেই আমার বিরোধী নন। ইতিপূর্বে মারওয়ান ইব্ন হাকামও ওয়ালীদের বিরুদ্ধে অনুরূপ অভিযোগ উত্থাপন করে ইয়াযীদের কাছে পত্র লিখেছিলেন। তাই ইব্ন যুবায়রের উক্ত চিঠি সম্পর্কে স্বাভাবিকভাবেই ইয়াযীদের অন্তরে কোন ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়নি। ফলে সে সঙ্গে সঙ্গে ওয়ালীদকে পদচ্যুত করে তার স্থলে নিজের অপর চাচাত ভাই উসমান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবূ সুফিয়ানকে মদীনার শাসনকর্তা নিয়োগ করে পাঠায়।

উসমান ইব্ন মুহাম্মদ মদীনায় এসে মদ্যপান শুরু করে। ফলে জনসাধারণ তার উপর ভীষণভাবে ক্ষেপে যায়। উসমান হিজরী ৬২ সনের মুহাররম (৬৮১ খ্রি-এর সেপ্টেম্বর) মাসে মদীনার শাসনভার গ্রহণ করেছিল। কিছুদিন পর সে মদীনার গণ্যমান্য দশজন লোকের একটি প্রতিনিধি দল ইয়াযীদের কাছে দামিশকে পাঠায়। ঐ প্রতিনিধিদলে মুনযির ইব্ন যুবায়র, আবদুল্লাহ্ ইব্ন হানযালা ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্ন হাফ্স ইব্ন মুগীরাও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এরা দামিশকে উপনীত হলে ইয়াযীদ তাদের প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করেন এবং প্রথমোক্ত দু'ব্যক্তিকে এক লাখ করে এবং বাকি আট ব্যক্তিকে দশ হাজার দিরহাম করে উপঢৌকন দিয়ে বিদায় করেন। প্রতিনিধি দলটি ইয়াযীকে দামিশকে গানবাজনার মজলিসের আয়োজন এবং শরীয়তের খিলাফ কাজকর্ম করতে দেখে এসেছিলেন। মদীনায় ফিরে এসে তারা সিদ্ধান্ত নিলেন যে, ইয়াযীদের খিলাফতের বিরুদ্ধে কাজ করা উচিত। প্রতিনিধিদলের নয় ব্যক্তি মদীনায় ফিরে এসেছিলেন, কিন্তু একজন অর্থাৎ মুনযির কূফার দিকে চলে গিয়েছিলেন। কেননা ইব্ন যিয়াদ ও মুনযিরের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল। তিনি উবায়দুল্লাহ্র সাথে সাক্ষাতের জন্যই কূফার দিকে চলে গিয়েছিলেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন হানযালা তার সঙ্গীদের নিয়ে মদীনায় এসে পৌঁছলে দামিশকের অবস্থাদি জানার জন্য লোকেরা তাদের কাছে এসে ভিড় জমায়।

ইয়াযীদের খিলাফতের বিরোধিতা

আবদুল্লাহ্ বলেন, ইয়াযীদ কোন মতেই খিলাফতের যোগ্য নয়। কেননা তাকে শরীয়ত-বিরোধী কাজে লিপ্ত থাকতে দেখা যায়। তার মুসলমান হওয়ার ব্যাপারেও সন্দেহ রয়েছে। তার বিরুদ্ধে মুসলমানদের জিহাদ করা উচিত। মদীনাবাসীরা বললো, আমরা শুনেছি ইয়াযীদ আপনাকে অনেক উপহার-উপঢৌকন দিয়ে সম্মানিত করেছে। আবদুল্লাহ্ বললেন, আমি এজন্য তা গ্রহণ করেছি যে, তার সাথে মুকাবিলা করার মত শক্তি আমার ছিল না। এসব কথা শুনে লোকেরা ইয়াযীদের প্রতি অত্যন্ত ঘৃণা পোষণ করতে থাকে। আবদুল্লাহ্ প্রস্তাব করলেন, ইয়াযীদকে খলীফা পদ থেকে বরখাস্ত করা হোক। অতএব কুরায়শরা আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুতীকে এবং আনসাররা আবদুল্লাহ্ ইব্ন হানযালাকে নিজ নিজ নেতা নির্বাচিত করে ইয়াযীদের খিলাফত ও হুকুমত অস্বীকার করে বসল। উসমান ইব্ন মুহাম্মদ মারওয়ানের ঘরে আশ্রয় নিল। মদীনাবাসীরা বনূ উমাইয়ার যাকেই পেল তাকেই বন্দী করল। তারা শুধু মারওয়ানের পুত্র আবদুল মালিককে– যে মদীনার বিখ্যাত ফকীহ্ হযরত সাঈদ ইব্ন মুসাইয়িবের খিদমতে সব সময় হাযির থাকত, মসজিদ থেকে কখনো বের হতো না এবং যাকে সবাই অত্যন্ত

পবিত্রচেতা ও মুত্তাকী মনে করত— কিছুই বলল না। এই অবস্থা সম্পর্কে বনূ উমাইয়ার লোকেরা ইয়াযীদকে অবহিত করল। সে সঙ্গে সঙ্গে ইব্ন যিয়াদের কাছে এই মর্মে একটি চিঠি লিখল, মুনযির ইব্ন যুবায়র তোমার কাছে কূফায় গিয়েছে। তুমি অবিলম্বে তাকে বন্দী কর এবং কখনো মদীনার দিকে যেতে দিও না। ইব্ন যিয়াদ যেহেতু ইয়াযীদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিল না, কেননা হুসাইন হত্যার বিনিময়ে সে তাকে কোনভাবেই পুরস্কৃত বা সম্মানিত করেনি, তাই সে মুনযিরকে বন্দী করার পরিবর্তে তাকে মদীনার দিকে চলে যাবার সুযোগ দেয় এবং ইয়াযীদকে লেখে, আপনার চিঠি আসার পূর্বেই মুনযির মদীনায় চলে গেছে। মুনযির মদীনায় পৌঁছে আবদুল্লাহ্ ইব্ন হানযালা ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুতীকে বলেন, তোমাদের উচিত, আলী ইব্ন হুসাইন (ইমাম যায়নুল আবেদীন)-এর হাতে খিলাফতের বায়আত করা। অতএব তাঁরা সবাই মিলে আলী ইব্ন হুসাইনের কাছে যান। কিন্তু বায়আত গ্রহণ করতে সরাসরি অস্বীকার করেন এবং বলেন, আমার পিতা এবং পিতামহ উভয়েই খিলাফত লাভ করতে গিয়ে নিজেদের প্রাণ দিয়েছেন। অতএব আমি পুনরায় ঐ একই ঝুঁকি নিতে পারি না। কেউ আমাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করুক, তা আমার মোটেই কাম্য নয়। তিনি একথা বলে মদীনার বাইরে কোন একটি পল্লীতে চলে যান। মারওয়ান তার গোত্রের আরো কিছু লোকসহ আপন ঘরে স্বেচ্ছা বন্দিত্ব গ্রহণ করেছিল। সে আবদুল মালিকের মাধ্যমে আলী ইব্ন হুসাইনের কাছে বলে পাঠাল, (খিলাফতের ব্যাপারে) আপনি যা করেছেন ভালই করেছেন। এখন আমরা একটি ব্যাপারে আপনার সাহায্য কামনা করি। আমরা আমাদের কিছু ধন-সম্পদ এবং পরিবার-পরিজন, যাদের এখানে স্থান সংকুলান হচ্ছে না, আপনার কাছে পাঠিয়ে দিতে চাই। আপনি অনুগ্রহপূর্বক তাদের হিফাযতের ব্যবস্থা করবেন। তিনি তার আবেদন মঞ্জুর করেন। অতএব মারওয়ান রাতের অন্ধকারে গোপনে তার পরিবার-পরিজন এবং মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী আলী ইব্ন হুসাইনের কাছে পাঠিয়ে দেয়। আলী ইব্ন হুসাইন নিজের অবস্থা সম্পর্কে ইয়াযীদের কাছেও পত্র লিখেন। তাতে তিনি বলেন, আমি আপনার প্রতি বিশ্বস্ত। তাছাড়া আমি বনূ উমাইয়ার লোকদের রক্ষা করার জন্যও যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। ইয়াযীদ মদীনার পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়ার পর নু'মান ইব্ন বশীর আনসারীকে ডেকে বলেন, তুমি মদীনায় গিয়ে জনসাধারণকে বুঝিয়ে বল, যেন তারা এই সমস্ত দুষ্কর্ম থেকে বিরত থাকে এবং মদীনায় রক্তপাত ঘটার মত অবস্থার সৃষ্টি না করে। তুমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন হানযালাকেও বুঝিয়ে বল, তুমি তো দামিশকে গিয়ে ইয়াযীদের কাছ থেকে সম্মান ও উপহার-উপঢৌকন নিয়ে সন্তুষ্টচিত্তে ফিরে এসেছ, অথচ মদীনায় পৌঁছেই তার বিরোধিতা করছ, তার বায়আত অস্বীকার করছ, তাকে কাফির আখ্যা দিয়ে জনসাধারণকে তার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলছ। এটা তো কোন বুদ্ধিমান ও সুপুরুষের কাজ নয়। আর আলী ইব্ন হুসাইন (ইমাম যায়নুল আবিদীন)-এর সাথে সাক্ষাত করে আমার পক্ষ থেকে তাকে বল, 'তোমার বিশ্বস্ততা ও সৎকর্মের মর্যাদা অবশ্যই দেওয়া হবে।' আর সেখানে বনূ উমাইয়ার যে সমস্ত লোক আছে তাদেরকে বল, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী মাত্র দুটি লোককে হত্যা করে মদীনায় শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবে। আফসোস, এ কাজটিও তোমাদের দ্বারা হলো না। যাহোক, নু'মান ইব্ন বশীর উটে চড়ে দ্রুত মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হলেন। মদীনায় পৌঁছে তিনি সবাইকে অনেক করে বুঝালেন, কিন্তু তাতে

কোন ফল হলো না। অতএব তিনি বাধ্য হয়ে মদীনা থেকে দামেশকে ফিরে গেলেন এবং মদীনার পরিস্থিতি সম্পর্কে ইয়াযীদকে অবহিত করলেন। এবার সে মুসলিম ইব্‌ন উকবাকে ডেকে বলল, তুমি বাছাই করা একহাজার যোদ্ধা নিয়ে মদীনায় যাও এবং সেখানকার লোকদেরকে আমার আনুগত্য স্বীকার করতে বল। যদি তারা আনুগত্য স্বীকার করে তাহলে তো ভাল, অন্যথায় তরবারি চালিয়ে তাদেরকে শায়েস্তা করো।

মুসলিম বলল, আমি আপনার অনুগত, কিন্তু আজ অসুস্থ। ইয়াযীদ বললেন, তুমি অসুস্থ হলেও অন্য সুস্থদের চেয়ে ভাল। আর তুমি ছাড়া একাজ অন্য কেউ সুষ্ঠুভাবে করতেও পারবে না। বাধ্য হয়ে মুসলিম বাছাই করা একটি সেনাবাহিনী নিয়ে তৃতীয় দিন দামিশক থেকে রওয়ানা হলো। বিদায়কালে ইয়াযীদ তাকে উপদেশ দিতে গিয়ে বললেন, যতদূর সম্ভব ক্ষমা ও নম্র ব্যবহারের সাহায্যে মদীনাবাসীদেরকে সরল পথে নিয়ে আসার চেষ্টা করবে। কিন্তু যখন তোমার এ বিশ্বাস হয়ে যাবে যে, নম্র ব্যবহার ও উপদেশ দ্বারা কোন কাজ হবে না তখন অবাধে রক্তপাত, হত্যা ও লুটপাট চালাবে; তবে লক্ষ্য রাখবে, যেন আলী ইব্‌ন হুসাইনের কোন কষ্ট না হয়। কেননা তিনি আমার শুভাকাঙ্ক্ষী এবং আমার প্রতি বিশ্বস্ত। আমি তাঁর একটি পত্র পেয়েছি। তাতে তিনি লিখেছেন, এ সব বিশৃঙ্খলা ও বিদ্রোহের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। সে মুসলিমকে আরও বলে, যদি তোমার রোগ বেড়ে যায় এবং তুমি সেনাবাহিনীর নেতৃত্বদান করতে সক্ষম না হও তাহলে হুসাইন ইব্‌ন নুমায়র সম্মত হলে তাকে তোমার স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করবে। এই বাহিনীকে বিদায় দেওয়ার পর ইয়াযীদ ঐ দিনই একজন দূত মারফত ইব্‌ন যিয়াদের কাছে একটি পত্র প্রেরণ করেন। তাতে লিখেন, তুমি তোমার বাহিনী নিয়ে কূফা থেকে মক্কা যাও এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের বিশৃঙ্খলা নির্মূল কর। উত্তরে ইব্‌ন যিয়াদ লিখল, আমার দ্বারা এ কাজ হবে না। আমি ইমাম হুসাইনকে হত্যা করার মত একটি (জঘন্য) কাজ করেছি। এখন কা'বা ঘর ধ্বংস করার মত আর একটি (জঘন্য) কাজ আমার দ্বারা হবে না। আপনি এ কাজের দায়িত্ব অন্য কারো উপর ন্যস্ত করুন। মুসলিম ইব্‌ন উকবা তার বাহিনী নিয়ে মদীনার নিকটবর্তী হলে মদীনাবাসীরা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হানযালাকে বলল, উমাইয়া গোত্রের যে সমস্ত লোক মদীনায় রয়েছে; দামিশকের বাহিনী মদীনায় পৌঁছার সাথে সাথে তারা তাদের সাথে গিয়ে মিলিত হবে এবং এক অভ্যন্তরীণ যুদ্ধে ঠেলে দিয়ে আমাদেরকে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। অতএব মুসলিম এখানে এসে পৌঁছার পূর্বেই উমাইয়াদের হত্যা করে ফেলা উচিত। আবদুল্লাহ্ বললেন, আমরা যদি উমাইয়াদের হত্যা করি তাহলে ইয়াযীদ সমগ্র সিরিয়াবাসী এবং ইব্‌ন যিয়াদ সমগ্র ইরাকবাসীকে নিয়ে আমাদের উপর চড়াও হবে এবং আমাদের থেকে 'কিসাস' তলব করবে। অতএব এটাই বাঞ্ছনীয় যে, আমরা সমগ্র বনূ উমাইয়াকে ডেকে তাদের থেকে শপথসহ এই স্বীকারোক্তি নেব যে, তারা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না এবং যারা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে তাদেরকেও কোন সাহায্য করবে না। এই প্রতিশ্রুতি নিয়ে আমরা তাদেরকে মদীনা থেকে বের করে দেব। সকলেই এই অভিমত পছন্দ করল এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হানযালা মদীনায় অবস্থানরত উমাইয়া গোত্রের সকল লোকের কাছ থেকে উল্লিখিত প্রতিশ্রুতি নিয়ে তাদেরকে মদীনা থেকে বের করে দিলেন। শুধু আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ানকে মদীনায় থাকার অনুমতি দেওয়া হলো। ওয়াদিউল কুরা নামক স্থানে বনূ উমাইয়ার লোকদের সাথে মুসলিম ইব্‌ন উকবা ও তার

বাহিনীর সাক্ষাত হলো। মুসলিম তাদেরকে জিজ্ঞেস করল, মদীনার উপর কোন্ দিক থেকে আমার হামলা করা উচিত? কিন্তু তারা তাদের প্রদত্ত অঙ্গীকার অনুযায়ী মুসলিমকে কোন জবাব দিতে অস্বীকার করল। এবার মুসলিম জিজ্ঞেস করল, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছে, যার কাছ থেকে উপরোক্ত মর্মে কোন অঙ্গীকার নেওয়া হয়নি ? তারা বলল, হ্যাঁ, এমন একজন লোক মদীনায় আছে, আর সে হচ্ছে আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান। মুসলিম বলল, সে তো একজন যুবক। আমার তো এমন একজন প্রবীণ ও অভিজ্ঞ লোকের দরকার, যিনি যুদ্ধের কৌশল সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। তারা উত্তরে বলল, ঐ যুবক বৃদ্ধদের চাইতেও যোগ্য। অতএব মুসলিম একজন দূতের মাধ্যমে আবদুল মালিককে মদীনা থেকে ডেকে পাঠাল এবং তার পরামর্শ শুনে বিস্মিত হলো। এরপর আবদুল মালিকেরই পরামর্শ অনুযায়ী সে মদীনার নিকটবর্তী হয়ে মদীনাবাসীদের কাছে এই মর্মে একটি পয়গাম পাঠাল, 'আমীরুল মু'মিনীন ইয়াযীদ তোমাদেরকে অভিজাত বলেই মনে করেন এবং তিনি তোমাদের সাথে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করতেও চান না। অতএব এটাই সমীচীন যে, তোমরা আমার বশ্যতা স্বীকার কর, অন্যথায় বাধ্য হয়ে আমাকে কোষ থেকে তরবারি বের করতে হবে। এই পয়গাম পাঠিয়ে মুসলিম তিন দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করল। কিন্তু মদীনাবাসী যুদ্ধের পক্ষেই রায় দিল। শেষ পর্যন্ত মুসলিম হাররার দিক থেকে মদীনার উপর হামলা করল। মদীনাবাসী অত্যন্ত বীরত্বের সাথে মুকাবিলা করল। কিন্তু মুসলিমের বীরত্ব ও অভিজ্ঞতার সামনে তাদেরকে শেষ পর্যন্ত পরাজয়বরণ করতে হলো। আবদুল্লাহ্ ইব্ন হানযালা, ফাসীল ইব্ন আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব, মুহাম্মদ ইব্ন সাবিত ইব্ন কায়স, আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়দ ইব্ন আসিম, মুহাম্মদ ইব্ন আমর ইব্ন হাযম আনসারী, ওয়াহ্ব ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন যামআ, যুবায়র ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আওফ, আবদুল্লাহ্ ইব্ন নাওফাল ইব্ন হারস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব প্রমুখ মদীনার অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এই যুদ্ধে নিহত হন। বিজয়ীপক্ষ মদীনায় প্রবেশ করল। মুসলিম ইব্ন উকবা তিনদিন পর্যন্ত অবাধে হত্যাকাণ্ড ও লুটপাট চালাল। প্রায় এক হাজার লোক এই যুদ্ধ ও অবাধ হত্যাকাণ্ডের শিকারে পরিণত হলো। তাদের মধ্যে তিনশ' জনেরও অধিক ছিলেন কুরায়শ ও আনসারের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ। চতুর্থ দিন মুসলিম অবাধ হত্যাকাণ্ড বন্ধ করে সকলকে বায়আতের নির্দেশ দিল। যারা এসে মুসলিমের হাতে বায়আত করল তারা রক্ষা পেল, আর যারা বায়আত করতে অস্বীকার করল তাদেরকে হত্যা করল। হিজরী ৬৩ সনের ২৭শে যিলহজ্জ (৬৮২ খ্রিস্টাব্দের ৬ই সেপ্টেম্বর) মুসলিম বিজয়ী বেশে মদীনায় প্রবেশ করে এবং অবাধে হত্যাকাণ্ড চালাবার নির্দেশ দেয়। এই দিনই মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব জন্মগ্রহণ করেন। ইনি হচ্ছেন সেই মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ যিনি ইতিহাসে মুহাম্মদ আবুল আব্বাস সাফ্ফাহ নামে পরিচিত। ইনিই আব্বাসী বংশের প্রথম খলীফা। অনেক অনুসন্ধান করেও মুসলিম মুনযির ইব্ন যুবায়রকে পাকড়াও করতে পারেনি। কেননা তিনি ইতিমধ্যে কোন এক ফাঁকে মক্কায় পালিয়ে গিয়েছিলেন।

মক্কা অবরোধ এবং ইয়াযীদের মৃত্যু

মদীনায় ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড সমাপ্ত করার পর মুসলিম ইব্ন উকবা নিজ বাহিনী নিয়ে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করে। সে এমনিতেই অসুস্থ ছিল। পথিমধ্যে তার অসুস্থতা

আরো বৃদ্ধি পায়। 'আবওয়া' নামক স্থানে পৌঁছে যখন তার অবস্থা শোচনীয় হয়ে দাঁড়ায় তখন সে হুসাইন ইব্‌ন নুমায়রকে ডেকে সেনাবাহিনীর অধিনায়ক নিয়োগ করে মারা যায়। অপর দিকে মদীনা থেকে যারা পালিয়ে গিয়েছিল তারাও মক্কায় গিয়ে সমবেত হয়। খারিজীরাও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রকে সাহায্য করা সমীচীন মনে করে। তাই তারাও মক্কায় এসে জড়ো হয়। ঐ বছর হজ্জ মওসুমে হিজাযের বাসিন্দারা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের হাতে বায়আত করে। হুসাইন ইব্‌ন নুমায়র সিরীয় বাহিনী নিয়ে মক্কার নিকটবর্তী হলো এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের কাছে এই মর্মে পয়গাম পাঠাল, 'তুমি ইয়াযীদের বশ্যতা স্বীকার কর, অন্যথায় মক্কার উপর হামলা পরিচালনা করা হবে।' আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র মুকাবিলার প্রস্তুতি নেন। তিনি তাঁর ভাই মুনযিরকে নিজ বাহিনীর একটি অংশের অধিনায়ক নিয়োগ করেন। মুনযির সর্বপ্রথম যুদ্ধক্ষেত্রে এগিয়ে গিয়ে সিরীয় বাহিনীকে মুকাবিলার আহবান জানায়। প্রথম প্রথম দ্বন্দ্বযুদ্ধে মুনযিরের হাতে বেশ কয়েকজন সিরীয় সৈন্য মারা যায়। এরপর এক বাহিনী অপর বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সন্ধ্যা পর্যন্ত যুদ্ধ চলে কিন্তু জয়-পরাজয়ের কোন ফায়সালা হয়নি। এই যুদ্ধ হিজরী ৬৪ সনের ২৭শে মুহাররম (৬৮৩ খ্রিস্টাব্দের ২৫শে সেপ্টেম্বর) শুরু হয়েছিল। পরদিন হুসাইন ইব্‌ন নুমায়র আবূ কুবায়স পাহাড়ের উপর 'মিনজানীক' (প্রস্তর নিক্ষেপক যন্ত্র) স্থাপন করে কা'বা ঘরের উপর প্রস্তর বর্ষণ করতে শুরু করে এবং মক্কাও অবরোধ করে ফেলে। এই অবরোধ ও প্রস্তর বর্ষণ হিজরী ৬৪ সনের ৩রা রবিউল আউয়াল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। ঐ দিন সিরীয়রা তূলা, গন্ধক ও আলকাতরার সংমিশ্রণে গোলা তৈরি করে তাতে আগুন লাগিয়ে কা'বার উপর নিক্ষেপ করতে শুরু করে। ফলে কা'বার সম্পূর্ণ গেলাফ পুড়ে যায় এবং প্রাচীরসমূহ কৃষ্ণ বর্ণ ধারণ করে। দু'টি মিনজানীক থেকে রাত-দিন প্রস্তর ও গোলা বর্ষিত হতে থাকে। এই অবস্থায় মক্কাবাসীদের পক্ষে ঘর থেকে বের হওয়াও ছিল দুষ্কর। পাথরের আঘাতে কা'বা ঘরের প্রাচীরসমূহ বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল এবং ছাদও ধসে পড়েছিল। পরবর্তী সময়ে আগত সহায়ক বাহিনীসহ সিরীয় বাহিনীর মোট সৈন্যসংখ্যা পাঁচ হাজারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং তারা অনবরত কা'বা ঘর ও মক্কা শহরের উপর প্রস্তর বর্ষণ করে চলছিল। অপর দিকে ইয়াযীদ ১০ই রবিউল আউয়াল হাওরান নামক স্থানে মৃত্যুবরণ করে। সে মোট ৩ বছর ৮ মাস দেশ শাসন করে। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র সর্বপ্রথম ইয়াযীদের মৃত্যু সংবাদ পান। তিনি সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে সিরীয়দের সম্বোধন করে বলেন, 'হতভাগারা' তোমরা আর কার জন্য লড়ছ ? তোমাদের পথভ্রষ্ট নেতা তো মারা গেছে।'

হুসাইন ইব্‌ন নুমায়র একথা বিশ্বাস করেনি। সে এটাকে আবদুল্লাহ্‌র একটি কূটচাল মনে করে। কিন্তু তৃতীয় দিন যখন কায়স ইব্‌ন সাবিত নাখঈ' কূফা থেকে এসে ইয়াযীদের মৃত্যু সংবাদ দিল তখন সে সঙ্গে সঙ্গে তার বাহিনীকে অবরোধ উঠিয়ে মক্কা থেকে চলে যাবার নির্দেশ দিল। রওয়ানা হওয়ার আগে হুসাইন ইব্‌ন নুমায়র ইব্‌ন যুবায়রের কাছে এই মর্মে পয়গাম পাঠাল, আজ রাতে বাত্হা নামক স্থানে আমি আপনার সাথে সাক্ষাত করতে চাই। উভয় পক্ষের গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র এবং হুসাইন ইব্‌ন নুমায়র উভয়ে দশজন করে লোক সঙ্গে নিয়ে নির্দিষ্টস্থানে গিয়ে হাযির হন। হুসাইন বলে, আমি আপনাকে খলীফা বলে স্বীকার করতে এবং আপনার হাতে বায়আত করতে প্রস্তুত আছি। আমার সাথে

সিরীয় বাহিনীর যে পাঁচ হাজার যোদ্ধা রয়েছে এ ব্যাপারে তারাও আমাকে অনুসরণ করবে। আপনি আমার সাথে সিরিয়ায় চলুন। আমিসহ সমগ্র সিরীয়বাসী আপনার হাতে বায়আত করেই ফেলেছি। এবার সিরিয়াবাসীরা বায়আত করে ফেললে সমগ্র ইসলামী বিশ্ব কোনরূপ মতবিরোধ ছাড়াই আপনাকে খলীফা বলে স্বীকার করে নেবে। আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র ভাবলেন, হুসাইন তাকে প্রতারণা করছে। তাই তিনি সিরিয়ায় যেতে অস্বীকার করলেন এবং বললেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি সিরীয়দের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ না করব ততক্ষণ ওদেরকে কোনমতেই ক্ষমা করব না। হুসাইন আস্তে আস্তে কথা বলছিল এবং আবদুল্লাহ্ উচ্চৈঃস্বরে ও কঠোর ভাষায় তার জবাব দিচ্ছিলেন। হুসাইন বলল, আমি আপনাকে খিলাফত দিতে চাচ্ছি, আর আপনি আমাকে যুদ্ধের হুমকি দিচ্ছেন। যা হোক, ইব্ন নুমায়র বৈঠক থেকে উঠে নিজ বাহিনীতে ফিরে এলো এবং অবিলম্বে তাদেরকে সিরিয়া অভিমুখে রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ দিল। পরবর্তী সময়ে আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র নিজের ভুল বুঝতে পারেন। তখন তিনি একজন দূত মারফত হুসাইনকে বলে পাঠান, আমাকে সিরিয়া যাবার জন্য বাধ্য কর না, বরং তোমরা এখানে এসেই আমার হাতে বায়আত কর। হুসাইন উত্তর দিল, সিরিয়ায় না যাওয়া পর্যন্ত কোন কাজ হবে না। কিন্তু আবদুল্লাহ্ মক্কা ছাড়তে রাযী হলেন না। হুসাইন যখন মক্কা ছেড়ে মদীনার নিকটবর্তী হলো তখন জানতে পারল যে, ইয়াযীদের মৃত্যু সংবাদ শুনে মদীনাবাসীরা পুনরায় বনূ উমাইয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। তারা ইতিমধ্যে ইয়াযীদের সেই কর্মকর্তাকে মদীনা থেকে বের করে দিয়েছে যাকে মুসলিম ইব্ন উকবা সেখানে নিয়োগ করে এসেছিল। হুসাইন মদীনার বাইরে তাঁবু স্থাপনের সাথে সাথে মদীনার হৈ-হাঙ্গামা থেমে গেল এবং এই ফাঁকে বনূ উমাইয়ার যে সমস্ত লোক মদীনায় ছিল তারা সবাই তার বাহিনীতে মিলিত হয়ে বলল, তুমি আমাদেরকে তোমার সাথে সিরিয়ায় নিয়ে চল। সে বলল, তোমরা আজ রাতের মত এখানে থাক। ভোরবেলা আমি তোমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে রওয়ানা হব। রাত ঘনিয়ে এলে ইব্ন নুমায়র একাকি আলী ইব্ন হুসাইনের সন্ধানে বের হলো এবং তার সাথে সাক্ষাত করে বলল, ইয়াযীদ তো মারা গেছে। এখন মুসলিম বিশ্বের কোন ইমাম নেই। আপনি আমার সাথে সিরিয়ায় চলুন। আমরা সমগ্র মুসলিম বিশ্বকে আপনার হাতে বায়আত করার জন্য উদ্বুদ্ধ করব এবং আপনি সর্বসম্মতিক্রমে ইসলামী রাষ্ট্রের খলীফা হবেন। সিরীয়দেরকে আপনি ইরাকীদের মত মনে করবেন না। ওরা আপনাকে কখনো প্রতারিত করবে না এবং কোন কষ্টও দেবে না। আলী ইব্ন হুসাইন উত্তর দিলেন, আমি আল্লাহ্ তা'আলার সাথে অঙ্গীকার করেছি যে, আমি আমার সমগ্র জীবনে কারো কাছ থেকে বায়আত নেব না। তুমি আমাকে এই অবস্থায়ই থাকতে দাও এবং অন্য কাউকে খলীফাদের জন্য অনুসন্ধান কর। এই বলে তিনি হুসাইনের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। শেষ পর্যন্ত হুসাইন নিজের বাহিনীর কাছে ফিরে এল এবং ভোর বেলা বনূ উমাইয়াদের সাথে নিয়ে সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করল।

ইয়াযীদের আমলে বিজয় অভিযান

আমরা আলোচনা প্রসঙ্গে ইয়াযীদের মৃত্যু পর্যন্ত পৌঁছে গেছি। কিন্তু সেই ঘটনার উল্লেখ করা হয়নি, যা কায়রাওয়ান নগরীর প্রতিষ্ঠাতা উকবা ইব্ন নাফিঈ'-এর ক্ষেত্রে ঘটেছিল।

উকবা আফ্রিকা থেকে দামিশকে আমীরে মুআবিয়ার কাছে গিয়ে তিনি আবুল মুহাজিরের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করলে মুআবিয়া (রা) তাকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দেন যে, তিনি তাকে পুনরায় আফ্রিকার প্রধান শাসনকর্তা নিয়োগ করবেন। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি পূরণ করার পূর্বেই তিনি ইন্তিকাল করেন। ইয়াযীদ খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে উকবাকে আফ্রিকার কর্তৃত্ব প্রদান করে সেখানে প্রেরণ করেন। উকবা কায়রাওয়ান পৌঁছে আবুল মুহাজিরকে বন্দী করেন। এর কারণ ছিল এই যে, আবুল মুহাজির তার শাসনামলে অন্যায়ভাবে উকবার নিন্দা করেছিলেন এবং তার দুর্নামও রটনা করেছিলেন। বন্দী অবস্থায়ই আবুল মুহাজির মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি উকবাকে এই মর্মে ওসীয়ত করেন, 'কাসীলা নামীয় জনৈক বার্বার নওমুসলিম সম্পর্কে তুমি অবশ্যই সাবধান থাকবে। আবুল মুহাজির কাসীলাকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন এবং তিনি তার স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কেও সম্যক অবহিত ছিলেন। তাই তিনি জানতেন, উকবা যেহেতু তাকে বন্দী করেছেন, তাই কাসীলা সুযোগ পেলে অবশ্যই উকবার উপর প্রতিশোধ নেবে। উকবা ইব্ন নাফিঈ আবুল মুহাজিরের একথায় খুব একটা কান দেন নি। তাই কাসীলাকে যথারীতি নিজ বাহিনীর একটি ক্ষুদ্র অংশের অধিনায়কত্ব প্রদান করেন। হিজরী ৬২ সনে (৬৮১-৮২ খ্রি) উকবা তার ছেলেদের ডেকে ওসীয়ত করে বলেন, আমি আল্লাহ্র পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে শীঘ্রই বের হব। শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করব, এটাই আমার আন্তরিক বাসনা। এরপর তিনি যুহায়র ইব্ন কায়স বালাবীকে একটি ক্ষুদ্র বাহিনী দিয়ে কায়রাওয়ানের প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত করে নিজে মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে আল-মাগরিবের দিকে রওয়ানা হন। 'বাগানা' নগরীতে রোমান বাহিনীর সাথে তার মুকাবিলা হয়। ঘোরতর যুদ্ধের পর রোমানরা পলায়ন করে। এরপর আরবাহ্ নগরীতে রোমানরা পুনরায় মুসলমানদের মুকাবিলা করে। কিন্তু এই যুদ্ধেও তারা পরাজিত হয়। মুসলমানদের এই ক্রমবর্ধমান বিজয় প্রত্যক্ষ করে রোমানরা বার্বারদেরকেও, যারা তখন পর্যন্ত খ্রিস্ট ধর্মেও দাখিল হয়নি, নিজেদের পক্ষে টেনে নেয়। এবার রোমান ও বার্বারদের সম্মিলিত বিরাট বাহিনী মুসলমানদের ক্ষুদ্র বাহিনীর মুকাবিলায় রণক্ষেত্রে অবতরণ করে। এক ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কিন্তু মুসলমানরা শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করে। এরপর তানজা শহরে রোমান প্যাট্রিয়কের সাথে মুসলমানদের সর্বশেষ মোকাবিলা হয়। এই যুদ্ধেও রোমানরা পরাজিত এবং রোমান প্যাট্রিয়ক (গভর্নর) উকবার নিকট আত্মসমর্পণ করেন। উকবা প্যাট্রিয়ককে মুক্ত করে দেন এবং তানজা শহরের কোন ক্ষতি না করে সম্মুখে অগ্রসর হন। এভাবে তিনি ক্রমে ক্রমে মরক্কো জয় করে একেবারে আটলান্টিক উপকূলে উপনীত হন এবং দ্রুতবেগে আপন ঘোড়া দৌড়িয়ে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং বলেন, 'হে আল্লাহ! সমুদ্র আমার পথে প্রতিবন্ধক না হলে আমি তোমার পথে এভাবে জিহাদ করতে করতে এগিয়ে যেতাম।'

উকবার শাহাদাত লাভ

এবার উকবা কায়রাওয়ানের দিকে প্রত্যাবর্তনের সংকল্প নেন। তখন পর্যন্ত সমগ্র উত্তর আফ্রিকা ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে এসে গিয়েছিল। প্রত্যাবর্তনকালে তিনি নিজ বাহিনীকে কয়েকটি অংশে বিভক্ত করে পৃথক পৃথকভাবে তাদের এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন এবং

একটি অংশকে নিজের সাথে রাখেন। এগিয়ে যাবার সময় তিনি এবং তাঁর সাথের মুজাহিদরা এমন একটি স্থানে উপনীত হন, যেখানে মোটেই পানি পাওয়া যাচ্ছিল না। মুজাহিদরা তৃষ্ণায় মৃত্যুবরণ করতে থাকে। উকবা তখন আল্লাহ্‌র দরবারে পানির জন্য দু'আ করেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁর ঘোড়ার পায়ের খুর দ্বারা মাটির উপর সজোরে আঘাত করে এবং সঙ্গে সঙ্গে মাটির নিচ থেকে একটি পানির ফোয়ারা বেরিয়ে আসে। এবার তাঁর বাহিনীর লোকেরা তৃপ্তির সাথে পানি পান করে এবং ঐ ফোয়ারাটি 'মাউল ফারাস' (অশ্বঝর্ণা) নামে খ্যাতি লাভ করে। আজও তা ঐ নামেই পরিচিত। সেখান থেকে উকবা যখন নিজের ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে 'হাতূয়া' নামক স্থানে উপনীত হন তখন রোমান ও বার্বাররা তাঁর সাথে সামান্য সংখ্যক সৈন্য দেখে তাঁর মুকাবিলা করতে উদ্যত হয়। অথচ তারা ইতিপূর্বে তাঁর কাছে বশ্যতা স্বীকার করেছিল। কাসীলা, যে উকবার সাথেই ছিল, এটাকে একটা সুবর্ণ সুযোগ মনে করে রোমানদের সাথে গিয়ে মিলিত হয় এবং আপন সম্প্রদায়কেও যুদ্ধের জন্য অনুপ্রাণিত করে। এভাবে সে একটি বিরাট বাহিনী গড়ে তোলে এবং উকবার বাহিনীকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলে। অগত্যা মুসলিম মুজাহিদরা কোষ থেকে তরবারি বের করে শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং তাদেরকে হত্যা করতে করতে একে একে নিজেরাও শাহাদাতবরণ করেন। উকবা ইব্‌ন নাফি'ঈও শাহাদাতবরণ করে নিজের মনের গোপন বাসনা পূরণ করেন।

উকবাকে হত্যা করার পর কাসীলা নিজের বিরাট বাহিনী নিয়ে কায়রাওয়ানের দিকে অগ্রসর হয়। কায়রাওয়ানে যখন উকবার শাহাদাতবরণ এবং কাসীলার বিরাট বাহিনী নিয়ে আগমনের সংবাদ পৌঁছে তখন যুহায়র ইব্‌ন কায়স তাঁর মুকাবিলার প্রস্তুতি নেন। কিন্তু তার বাহিনীর মধ্যে অনৈক্য ও অন্তর্বিরোধ দেখা দেয়। তিনি এর কোন প্রতিবিধান করতে পারেন নি। ফলে মুসলমানদেরকে বাধ্য হয়ে কায়রাওয়ান ছেড়ে বারকার দিকে পিছিয়ে আসতে হয়। ফলে কাসীলা বিনা যুদ্ধেই কায়রাওয়ান দখল করেন।

এক নজরে ইয়াযীদের শাসনামল

ইয়াযীদ আনুমানিক পৌনে চার বছর ইসলামী রাষ্ট্রের অধিপতি ছিল। তার শাসনামলে মুসলমানরা কোন দেশ জয় করেনি। ইয়াযীদের জন্য সবচেয়ে বড় কলংক হলো, তারই শাসনামলে ইমাম হুসাইন (রা) অত্যন্ত অন্যায়ভাবে শাহাদাতবরণ করেন। এ নিষ্ঠুর কাজটি ইয়াযীদের যাবতীয় গুণাবলীকে ম্লান করে দেয়। কিন্তু আসল সত্য উদঘাটনের জন্য ধীরস্থির মস্তিষ্কে পূর্বাপর বিষয়টি আমাদের বিবেচনা করে দেখতে হবে। ভেবে দেখতে হবে, সেই আসল কারণ কি ছিল যার ফলে কারবালার মাঠে ইমাম হুসাইন (রা)-এর সাথে অনুরূপ অন্যায় ও অত্যাচারমূলক আচরণ করা হয়েছিল।

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, মুগীরা ইব্‌ন শুবার প্ররোচণায়ই আমীরে মুআবিয়া (রা) ইয়াযীদকে তাঁর 'অলী আহ্‌দ' নিয়োগ করিয়েছিলেন। এরপূর্বে তিনি কখনো চিন্তা করেননি যে, আপন পুত্রকে ইসলামী রাষ্ট্রের খলীফা মনোনীত করবেন। সর্বপ্রথম মুগীরাই কূফায় এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কিন্তু যেহেতু নীতিগতভাবে এ প্রস্তাবটি ছিল খিলাফতে

রাশিদার সুন্নতের এবং ইসলামী জামহুরিয়াতের আদর্শবিরোধী, তাই ঐ সময়েই মদীনায় এর বিরোধিতা শুরু হয়ে যায়। হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বকর, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর, আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র এবং হযরত ইমাম হুসাইন (রা) ছিলেন এ প্রস্তাবের ঘোর বিরোধী। মারওয়ান যখন মদীনার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সামনে বিবেচনার জন্য এ বিষয়টি পেশ করে তখন সব মহল থেকেই এর বিরোধিতা শুরু হয়। আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) তো পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করেন, খলীফা নির্বাচনের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং খোলাফায়ে রাশিদীনের নীতি ছাড়া আর কোন পদ্ধতিই আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বকর (রা) এর উপর মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, আমীরুল মু'মিনীন হযরত মুআবিয়া (রা) পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন তা খোলাফায়ে রাশিদীনের নীতি নয়, বরং কায়সার ও কিসরার পদ্ধতি। অতএব তা আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। ইমাম হুসাইন (রা) বলেন, এই নির্বাচন পদ্ধতি মুসলমানদের কল্যাণের জন্য নয়, বরং তাদের ধ্বংসের জন্য গ্রহণ করা হয়েছে। কেননা এতে 'খিলাফতে ইসলামিয়া কায়সার ও কিসরার সাম্রাজ্যের রূপ ধারণ করবে। অর্থাৎ পিতার পর তার পুত্রই খিলাফতের অধিকারী হবে।

আমীরে মুআবিয়া উপরোক্ত ব্যক্তিদের রাযী করাতে গিয়ে এতটুকু পর্যন্ত বলেন, আপনারা শুধু একে খলীফা হিসাবে মেনে নিন। এরপর রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা, কর্মকর্তাদের নিয়োগ ও বদলী এবং অন্যান্য যাবতীয় কাজকর্ম আপনাদেরই পরামর্শ অনুযায়ী সম্পাদন করা হবে। এতদ্‌সত্ত্বেও তাঁরা কেউই তাঁর কথা মেনে নিতে রাযী হননি।

এ থেকে ঐ যুগের সাধারণ লোকের মনোবৃত্তি এবং ইয়াযীদের চরিত্র সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা করা যায়। যা হোক, মুআবিয়া (রা) মদীনা থেকে দামিশ্‌কে গিয়ে আপন কর্মকর্তাদের নামে একটি নির্দেশ জারি করেন। তাতে বলা হয়, 'তোমরা জনসাধারণের কাছে ইয়াযীদের সৌন্দর্যাবলী বর্ণনা কর এবং নিজ নিজ এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তিদের এক একটি প্রতিনিধিদল আমার কাছে পাঠাও যাতে আমি ইয়াযীদের বায়আতের ব্যাপারে তাদের সাথে কথা বলতে পারি। এরপর প্রত্যেক প্রদেশ থেকে যেসব প্রতিনিধিদল এসেছিল আমীরে মুআবিয়া তাদের সাথে পৃথক পৃথকভাবে আলাপ করেন। এরপর তাদের একটি সম্মিলিত বৈঠকও আহবান করেন। উক্ত বৈঠকে তিনি খলীফাদের দায়িত্ব, সরকারী কর্মকর্তাদের আনুগত্য এবং জনসাধারণের কর্তব্য সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণ দেন। এরপর ইয়াযীদের বীরত্ব, বদান্যতা, বিচার-বুদ্ধি ও প্রশাসনিক যোগ্যতার উল্লেখ করে এ আশা ব্যক্ত করেন যে, এবার সকলেই ইয়াযীদের 'অলী আহ্‌দীর' প্রস্তাবটি মেনে নেবেন এবং এজন্য বায়আতও করবেন। কিন্তু এর উত্তরে মদীনার প্রতিনিধিদলের সদস্য মুহাম্মদ ইব্ন আমর ইব্ন হায্‌ম দাঁড়িয়ে বলেন, আমীরুল মু'মিনীন! আপনি তো ইয়াযীদকে খলীফা বানাচ্ছেন, কিন্তু এ বিষয়টি কি চিন্তা করে দেখেছেন যে, কিয়ামতের দিন এ কাজের জন্য আপনাকে আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহি করতে হবে। মুহাম্মদ ইব্ন আমর ইব্ন হায্‌মের এই উক্তি থেকে অনুমিত হয় যে, সাধারণ লোকও ইয়াযীদের খিলাফতের প্রতি সন্তুষ্ট ছিল না এবং তারা এ জাতীয় কোন প্রস্তাব মেনে নিতে প্রস্তুতও ছিল না।

আমীরে মুআবিয়ার জীবনের অন্তিম মুহূর্তে ইয়াযীদ তাঁর সাথে যে দুর্ব্যবহার করেছিল তা থেকেও খিলাফতের ক্ষেত্রে তার অযোগ্যতা সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা করা যায়।

হিজরী ৬০ সনের রজব (৬৮০ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল) মাসে মুআবিয়া (রা) অসুস্থ হয়ে পড়েন। যখন তিনি বুঝতে পারেন যে, এবার তাঁর জীবনের চরম দিনটি ঘনিয়ে এসেছে তখন তিনি ইয়াযীদকে ডেকে পাঠান। কিন্তু সে তখন শিকারের উদ্দেশ্যে বা অন্য কোন ব্যক্তিগত কাজে দামিশ্‌কের বাইরে ছিল। একজন দূত তার সাথে দেখা করে এবং তাকে সঙ্গে নিয়েই দামিশ্‌কে আসে। তখন মুআবিয়া (রা) ইয়াযীদকে সম্বোধন করে বলেন, 'হে বৎস! আমার ওসীয়ত মনোযোগ দিয়ে শোন এবং আমার প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। এখন আল্লাহ্ তা'আলার ফরমান অর্থাৎ আমার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে। তুমি বল, আমার পরে তুমি মুসলমানদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করবে?' ইয়াযীদ উত্তর দিল, আমি আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নত অনুসরণ করব।

মুআবিয়া (রা) বলেন, সুন্নতে সিদ্দিকীর উপরও আমল করা উচিত। তিনি মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন এবং এমন অবস্থায় ইনতিকাল করেছেন যে, সমগ্র উম্মত তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু ইয়াযীদ উত্তর দিল, না, শুধু আল্লাহর কিতাব এবং রাসূলের সুন্নতই যথেষ্ট।

এরপর আমীরে মুআবিয়া বলেন, 'হে বৎস! সীরাতে উমরের অনুসরণ কর। তিনি নতুন নতুন শহর আবাদ করেছেন, শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন করেছেন এবং মালে গনীমত সৈন্যদের মধ্যে বণ্টন করেছেন। কিন্তু ইয়াযীদ উত্তর দিল, 'শুধু আল্লাহ্‌র কিতাব ও রাসূলের সুন্নতের অনুসরণই যথেষ্ট।'

এরপর আমীরে মুআবিয়া বলেন, 'হে বৎস! সীরাতে উসমান গনীরও অনুসরণ কর। তিনি সারা জীবন মানুষের উপকার সাধন এবং আল্লাহ্‌র পথে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছেন।' ইয়াযীদ উত্তর দিল, 'না, শুধু আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নতই আমার জন্য যথেষ্ট।'

একথা শুনে আমীরে মুআবিয়া (রা) বলেন, তোমার এই সব কথা শুনে আমার বিশ্বাস হয়ে গেছে যে, তুমি আমার ওসীয়ত (অন্তিম উপদেশ) পালন তো করবেই না, বরং এর বিরোধিতা করবে।

যা হোক, মুগীরা ইব্‌ন শু'বার প্ররোচণা ও আমীরে মুআবিয়ার চেষ্টায় ইয়াযীদ শেষ পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্রের খলীফা হয়। ইয়াযীদের জন্য বায়আত গ্রহণ ছিল মুআবিয়ার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল। খুব সম্ভব পিতৃস্নেহের কারণেই তিনি এ ভুল করেছিলেন। কিন্তু মুগীরার ভুল ছিল এর চাইতেও মারাত্মক। কেননা তাঁর প্ররোচনায়ই আমীরে মুআবিয়ার অন্তরে অনুরূপ ইচ্ছা জাগ্রত হয়েছিল। তাছাড়া ইয়াযীদও নিজেকে খলীফা পদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারে নি। তিনি ভালভাবে জানতেন যে, তার যুগে এমন গণ্যমান্য ব্যক্তিও বিদ্যমান আছেন, যাঁরা একাধারে পবিত্রচেতা ও অনুপম চরিত্রের অধিকারী এবং ইবাদত-বন্দেগী ও ঈমানের দৃঢ়তায় অনন্য। এই সব ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহণ করে রাষ্ট্র পরিচালনার পরিবর্তে ইয়াযীদ জনসাধারণের উপর জুলুম অত্যাচার চালায়। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র, ইমাম হাসান এবং অন্যান্য যেসব গণ্যমান্য ব্যক্তি তখন মদীনায় অবস্থান করছিলেন তাদের কাছ থেকে বায়আত গ্রহণের জন্য

তাড়াহুড়া করে সেখানকার কর্মকর্তাদের নামে জরুরী নির্দেশ জারি করে। কিন্তু ইমাম হুসাইনের মত পবিত্রচেতা ও উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি কী করে ইয়াযীদের হাতে বায়আত হতে পারেন ? প্রথমত ইয়াযীদের নির্বাচনই ছিল শরীয়ত বিরোধী। তাই তার হুকুমতও ছিল শরীয়ত বিরোধী। দ্বিতীয়ত, তার স্বভাব-চরিত্র ও আচার-আচরণ ছিল অত্যন্ত নিম্নমানের। সব সময় খেলাধুলা ও শিকার নিয়ে ব্যস্ত থাকত, নৃত্যগীতের মজলিসেও অংশগ্রহণ করত। এছাড়াও তার মধ্যে আরো অনেক দোষ ছিল। মুসলমানদের খলীফা বা নেতা নির্বাচিত হওয়ার কোন যোগ্যতাই তার মধ্যে ছিল না। এমতাবস্থায় কী করে ইমাম হুসাইন তাকে খলীফা বলে স্বীকার করে নিতে পারেন বা তার হাতে বায়আত করতে পারেন।

উপরোক্ত কারণেই তিনি ইয়াযীদ হুকুমতের বিরোধিতা করেন এবং জুলুম অত্যাচার ও স্বেচ্ছাচারী শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনা করতে গিয়ে যে অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন তা ন্যায় ও সত্যের অনুসারীদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত পথ প্রদর্শন করবে। ইমাম হুসাইন কূফা সফরকালে এবং কারবালা প্রান্তরে যে সমস্ত ভাষণ দেন তা চিরদিন বিশ্ববাসীর কাছে অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় হয়ে থাকবে। বায়দা নামক স্থানে হুরের সঙ্গী-সাথীদের সম্বোধন করে তিনি যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছিলেন ঃ

"লোক সকল! রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন বাদশাহকে দেখল, যে অত্যাচারী, আল্লাহ্র হারামকৃত বস্তুসমূহকে হালাল করে, আল্লাহ্র অঙ্গীকার ভংগ করে, রাসূলের সুন্নতের বিরোধিতা করে, আল্লাহ্র বান্দাদের উপর পাপাচার ও জবরদস্তিমূলকভাবে হুকুমত চালায়– অথচ তার বিরোধিতা করল না বা অন্ততঃপক্ষে তার কার্যকলাপের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করল না– আল্লাহ্র এই অধিকার রয়েছে যে, তিনি ঐ বাদশাহ্র পরিবর্তে ঐ সব লোককে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। তোমরা ভালভাবে বুঝে নাও, এ সমস্ত লোক শয়তানের বশ্যতা স্বীকার করেছে এবং আল্লাহ্র আনুগত্য ছেড়ে দিয়েছে। তারা ভূপৃষ্ঠে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছে এবং আল্লাহ্র নির্ধারিত শাস্তিসমূহ অকেজো করে দিয়েছে। তারা অন্যায়ভাবে মালে গনীমতে ভাগ বসিয়েছে এবং আল্লাহ্ যে সমস্ত বস্তু হারাম করেছেন সেগুলোকে হালাল এবং যে সমস্ত বস্তু হালাল করেছেন সেগুলোকে হারাম মনে করেছে। অতএব তাদের ব্যাপারে আমাদের দায়িত্ববোধ জাগ্রত হওয়ার যথেষ্ট অধিকার রয়েছে।

এগুলো ছিল সেই কারণ, যা ইমাম হুসাইনকে কারবালা প্রান্তরে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। তিনি এবং তাঁর পরিবার-পরিজন আল্লাহ্র বাণী প্রচার এবং বাতিল শাসনব্যবস্থার মুলোৎপাটন করতে গিয়েই অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে জালিমদের হাতে শাহাদাতবরণ করেন।

সাধারণ দৃষ্টিকোণ থেকেও ইয়াযীদ আমীরে মুআবিয়ার কোন উত্তরাধিকারী ছিল না। ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার সাথে তার সম্পর্ক ছিল খুবই গৌণ। সে রাজনৈতিক তথা রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে কোন যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারেনি। যদি সে আমীরে মুআবিয়ার যোগ্য উত্তরাধিকারী হতো তাহলে তার সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা এই হতো যে, মানুষ যাতে আমীরে মুআবিয়া ও হযরত আলী (রা)-এর মতবিরোধের কথা ভুলে যায় সে ব্যাপারে তার সর্বশক্তি নিয়োগ করতো। কিন্তু এই বিষয়ের উপর হয় অতি অল্প গুরুত্ব আরোপ করেছে অথবা নিজের অযোগ্যতার কারণে এ ক্ষেত্রে কোন সাফল্যই অর্জন করতে পারেনি। ইয়াযীদ তার বাস্তব

জীবনের যে নমুনা জনসাধারণের সামনে পেশ করেছে তাতে ছিল পাপাচার ও শরীয়ত বিরোধী কাজকর্মের সমাহার। তাই তার দ্বারা সাধারণ মুসলমানদের ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য ও আমলী যিন্দেগী দারুণভাবে আঘাত প্রাপ্ত হয়। দুর্বল ঈমানের লোকেরা পাপাচারের রাজসিক নমুনা প্রত্যক্ষ করে নৈতিকতা-বিরোধী কাজকর্মে বেপরোয়া হয়ে উঠে। ইয়াযীদেরই আদর্শহীনতা মুসলমানদেরকে গান-বাজনা ও মদ্যপানের প্রতি প্ররোচিত করে। কেননা ইতিপূর্বে ইসলামী বিশ্বে এইসব কুকর্মের কোন অস্তিত্বই ছিল না। ইয়াযীদের যুগ পর্যন্ত মুসলমানরা খিলাফতের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারিত্বের নীতিকে মেনে নেয়নি। তারা মনে করত, আমীরে মুআবিয়ার পর ইয়াযীদের খলীফা মনোয়ন একটি ভ্রান্ত পদক্ষেপ এবং এর নিরসন একান্ত অপরিহার্য। একারণেই হুসাইন ইব্‌ন নুমায়র আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রকে খলীফা নির্বাচন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ইয়াযীদের পর বনূ উমাইয়াদের প্রচেষ্টার ফলে উত্তরাধিকারিত্বের এই ধারণা ক্রমে ক্রমে জোরদার হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত এই ভ্রান্ত রীতি এমনভাবে শিকড় গেড়ে বসে যে, আজ পর্যন্ত মুসলমানরা তা থেকে মুক্তি পায়নি।

ইয়াযীদ প্রথমে উম্মে হাশিম বিন্‌ত উতবা ইব্‌ন রাবীআকে বিবাহ করে। তার গর্ভে মুআবিয়া ও খালিদ এই দুই পুত্রের জন্ম হয়। ইয়াযীদ খালিদকে অধিকতর ভালবাসত, কিন্তু মুআবিয়াকেই তার 'অলী আহদ' মনোনীত করে। ইয়াযীদের দ্বিতীয় স্ত্রী ছিল উম্মে কুলসুম বিন্‌ত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমির। তার গর্ভে আবদুল্লাহ্‌র জন্ম হয়। আবদুল্লাহ্ তীর নিক্ষেপে অত্যন্ত দক্ষ ছিল। এ ছাড়াও ইয়াযীদের দাসীদের গর্ভে আরো কয়েকটি সন্তানের জন্ম হয়।

মুআবিয়া ইব্‌ন ইয়াযীদ

মুআবিয়া ইব্‌ন ইয়াযীদের উপনাম ছিল আবূ লায়লা ও আবূ আবদুর রহমান। মুআবিয়ার মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল বিশ বছর কয়েক মাস। তিনি একজন সৎ ও ধর্মপরায়ণ যুবক ছিলেন। সিরিয়াবাসীরা ইয়াযীদের মৃত্যুর পর তাঁর হাতে বায়আত করে। হুসাইন ইব্‌ন নুমায়র সিরিয়া বাহিনী ও বনূ উমাইয়াদের নিয়ে যখন দামিশকে পৌঁছে তখন মুআবিয়ার হাতে বায়আত-পর্ব সমাপ্ত হয়ে গেছে। মুআবিয়া খিলাফত লাভ এবং বায়আত গ্রহণের প্রতি আগ্রহী ছিলেন না। তিনি কিছুটা অসুস্থও ছিলেন এবং এই অবস্থায়ই তাঁর হাতে বায়আত করা হয়। জনসাধারণের চাপে তিনি বায়আত গ্রহণ করতে বাধ্য হন এবং শুধু চল্লিশ দিন, অপর বর্ণনা মতে দু'মাস এবং তৃতীয় বর্ণনা মতে, তিন মাস খিলাফত পরিচালনা করে মৃত্যুবরণ করেন। এই অল্প সময়ে তিনি উল্লেখযোগ্য কোন কাজ করতে পারেন নি। মুআবিয়া যখন মৃত্যু শয্যায় তখন লোকেরা তাকে বলল, আপনি কাউকে আপনার পরবর্তী খলীফা মনোনীত করুন। তিনি উত্তর দেন, আমি প্রথমেই আমার মধ্যে খিলাফত পরিচালনার কোন দক্ষতা প্রত্যক্ষ করিনি।

তোমরা আমাকে জবরদস্তি করে খলীফা বানিয়েছ। আমি চিন্তা করেছিলাম, যদি উমর ফারূকের মত কোন ব্যক্তিকে পাই তাহলে তার হাতেই খিলাফতের দায়িত্ব অর্পণ করব। কিন্তু তেমন কোন ব্যক্তি আমার নজরে পড়েনি। এরপর আমি চাইলাম, উমর ফারূক (রা) যেমন তাঁর পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের জন্য কয়েক ব্যক্তিকে মনোনীত করেছিলেন তেমনি আমিও কয়েক ব্যক্তিকে মনোনীত করব। কিন্তু তেমন ব্যক্তিরাও আমার নজরে পড়েনি। অতএব এখন

আমি এ ব্যাপারে কিছুই বলব না। তোমরা যাকে ইচ্ছা খলীফা মনোনীত কর। এই বলে তিনি তার ঘরের দরজা বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দেন। শুধু তার মৃতদেহ বের করার জন্যই সেই দরজা খোলা হয়।

বসরায় ইব্ন যিয়াদের বায়আত গ্রহণ

মুআবিয়া ইব্ন ইয়াযীদের খিলাফতকে শুধু সিরিয়াবাসী ও মিসরবাসীরাই স্বীকার করেছিল। হিজাযবাসীরা হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়রের হাতে বায়আত করেছিল। ইয়াযীদের মৃত্যু সংবাদ ইরাকে পৌঁছলে উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদ বসরায় ছিল। সে বসরাবাসীদের একত্র করে বলে, আমীরুল মু'মিনীন ইয়াযীদ ইনতিকাল করেছেন। এখন এমন কোন ব্যক্তি আমার নজরে পড়ছে না, যিনি খিলাফত পরিচালনার যোগ্যতা রাখেন। আমি এই অঞ্চলেই জন্মগ্রহণ করেছি এবং এখানেই প্রতিপালিত হয়েছি। আমার পিতাও এই অঞ্চলের শাসক ছিলেন এবং আমিও এই অঞ্চল শাসন করছি। এখানকার আয়-আমদানির অবস্থা পূর্বের চাইতে অনেক ভালো। মানুষের বেতন-ভাতাও পূর্বের চাইতে বেশি। এখানে দুষ্কৃতিকারীদেরও কোন অস্তিত্ব নেই। এই বক্তৃতা শুনে সবাই বলল, আমরা আপনার হাতে বায়আত করাই সমীচীন মনে করি এবং এজন্য প্রস্তুতও রয়েছি। যাহোক, বসরাবাসীরা উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদের হাতে বায়আত করে। কিন্তু অন্তরে অন্তরে তারা তাকে অপছন্দ করত। বসরাবাসীদের কাছ থেকে বায়আত নিয়ে সে কূফা অভিমুখে রওয়ানা হয়। কিন্তু সেখানকার লোকেরা তার হাতে বায়আত করতে সরাসরি অস্বীকার করে। বসরাবাসীরা যখন জানতে পারল যে, কূফাবাসীরা ইব্ন যিয়াদকে প্রত্যাখ্যান করেছে তখন তারাও তাদের বায়আত প্রত্যাহার করে নেয়। ইব্ন যিয়াদ শেষ পর্যন্ত নিরাশ হয়ে ইরাক থেকে দামিশকে পালিয়ে যায়। সে ঠিক সেই সময় দামিশকে গিয়ে পৌঁছে যখন মুআবিয়া ইব্ন ইয়াযীদ মৃত্যুবরণ করেছেন এবং পরবর্তী খলীফা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সিরিয়ায় গণ্ডগোল শুরু হয়ে গেছে।

ইরাকে ইব্ন যুবায়রের খিলাফত

কারবালার ঘটনার পর ইমাম হুসাইনের শাহাদাত কূফাবাসীদের অন্তরে দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। তারাই ইমাম হুসাইনকে পত্র মারফত সেখানে যাবার আহ্বান জানিয়েছিল এবং পুনরায় তাঁর হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেছিল। তারা তাদের এই আচরণের জন্য অত্যন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত ছিল। অপরদিকে ইব্ন যিয়াদও এই হত্যাকাণ্ডের বিনিময়ে কোন উপহার পায়নি, বরং উল্টা তার কাছ থেকে খুরাসানের শাসনক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়া হয়। অতএব সেও হুসাইন হত্যার জন্য অনুতপ্ত ছিল। কূফার ঐ সমস্ত লোক, যাদের 'শীআনে আলী' বলা হতো, সুলায়মান ইব্ন সারদ খুযায়ীর ঘরে একটি গোপন বৈঠকে মিলিত হয় এবং নিজেদের অপরাধের কথা স্বীকার করে তার প্রতিবিধানের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত নেয় যে, হুসাইন হত্যার প্রতিশোধ অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। অতএব তারা সবাই সুলায়মান ইব্ন সারদের হাতে বায়আত করে। সুলায়মান তাদেরকে বুঝিয়ে বলল, তোমরা তোমাদের এই সংকল্পে অটল থাক, কিন্তু একথা কারো কাছে প্রকাশ করো না বরং ধীরে ধীরে জনসাধারণকে তোমাদের সমমতাবলম্বী করতে থাক। যখন সময় ও সুযোগ আসবে তখন আমরা বিদ্রোহ করব এবং হুসাইন-হত্যার প্রতিশোধ নিয়ে তবে ছাড়ব।

উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন যিয়াদ কূফাবাসীদেরকে তার হাতে বায়আত হওয়ার আহ্বান জানালে তারা তাতে এজন্য সাড়া দেয়নি যে, তারা সুলায়মান ইব্‌ন সারদের প্রস্তাব ও পরামর্শ অনুযায়ী ইব্‌ন যিয়াদ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এমতাবস্থায় তো তারা ইব্‌ন যিয়াদের হাতে বায়আত করতে পারে না। ইয়াযীদের মৃত্যু-সংবাদ শুনে শীআনে আলী সুলায়মানকে বলল, এই সুযোগে আপনি বিদ্রোহ ঘোষণা করুন। কিন্তু সে তাদেরকে এই সংকল্প থেকে বিরত রেখে বলল, এখনো কূফার এক বিরাট সংখ্যক লোক এমনও আছে যারা আমাদের সমমতাবলম্বী হয়ে উঠেনি। এটাই সমীচীন যে, তোমরা আরো কিছুদিন ভেতরে ভেতরে তোমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখ এবং নিজেদের দল ও ক্ষমতা বৃদ্ধি কর।

ইব্‌ন যিয়াদকে সাফ জবাব দেওয়ার পর কূফাবাসীরা তার পক্ষ থেকে নিযুক্ত কূফার হাকিম আমর ইব্‌ন হাফিসকে সেখান থেকে বের করে দেয় এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের খিলাফত মেনে নেয়। আবদুল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াযীদ আনসারী কূফার গভর্নর এবং ইবরাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন তালহা রাজস্ব কর্মকর্তা নিযুক্ত হন। ইব্‌ন যুবায়রের গভর্নর কূফায় আসার এক সপ্তাহ পূর্বে মুখতার ইব্‌ন আবূ উবায়দাও, যিনি মুহাম্মদ ইব্‌ন হানাফিয়ার কাছে গিয়েছিলেন, কূফায় এসে পৌঁছেন। এটা হচ্ছে হিজরী ৬৪ সনের রমযান (জুলাই ৬৮৪ খ্রি) মাসের ঘটনা। বসরাবাসীরাও ইব্‌ন যিয়াদের চলে যাওয়ার পর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হারিসকে নিজেদের নেতা নির্বাচিত করে। এরপর কূফাবাসীদের ন্যায় নিজেদের একটি প্রতিনিধিদল পাঠিয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের খিলাফত স্বীকার করে নেয়। এভাবে সমগ্র ইরাকে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের শাসনকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

মিসরে ইব্‌ন যুবায়রের খিলাফত

মিসরের গভর্নর ছিলেন আবদুর রহমান ইব্‌ন জাহ্‌দাম। তিনি মুআবিয়া ইব্‌ন ইয়াযীদের মৃত্যু সংবাদ শোনার সঙ্গে সঙ্গে একজন দূত মারফত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের হাতে বায়আত করেন। হিম্‌সের গভর্নর ছিলেন নু'মান ইব্‌ন বশীর এবং কিন্‌নাসরীনের শাসনকর্তা ছিলেন জুফার ইব্‌ন হারিস। এরাও মুআবিয়া ইব্‌ন ইয়াযীদের মৃত্যু-সংবাদ শুনে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের খিলাফত মেনে নেওয়াকে সমীচীন মনে করেন। মুআবিয়া ইব্‌ন ইয়াযীদের মৃত্যুর সাথে সাথে যেহেতু খলীফা নির্বাচন করা সম্ভব হয়নি তাই দামিশকবাসীরা দাহ্‌হাক ইব্‌ন কায়সের হাতে এই প্রতিশ্রুতির সাথে বায়আত করে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানদের কোন আমীর নির্বাচিত না হবে ততক্ষণ আমরা আপনাকেই আমীর মানব এবং আপনারই নির্দেশ পালন করব। এই দাহ্‌হাকও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রকে খলীফা পদের জন্য সর্বাধিক যোগ্য মনে করতেন। ফিলিস্তীনের গভর্নর ছিলেন হাস্‌সান ইব্‌ন মালিক। তিনি অবশ্য চাইতেন যে, বনূ উমাইয়া থেকে পরবর্তী খলীফাও যেন নির্বাচিত হয়।

মোটকথা, মুআবিয়া ইব্‌ন ইয়াযীদের মৃত্যুর পর সমগ্র ইসলামী বিশ্ব হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের খিলাফতের উপর একমত হয়ে যায়। বনূ উমাইয়া ব্যতীত অন্য সব বংশ ও গোত্রের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা খিলাফতের ইত্তরাধিকার প্রথা বাতিলের এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রকে খলীফা নির্বাচনে আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

ইয়াযীদের মৃত্যুর পর ইরাকে উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদের যে অবস্থা হয়েছিল তা আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। এখন তার ভাই ও খুরাসানের গভর্নর মুসলিম সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করব।

খুরাসানে ইয়াযীদের মৃত্যুসংবাদ পৌঁছলে মুসলিম ইব্‌ন যিয়াদ খুরাসানবাসীদেরকে বলেন, ইয়াযীদের মৃত্যু হয়ে গেছে। যতক্ষণ অন্য কোন খলীফা মনোনীত না হয় ততক্ষণের জন্য তোমরা আমার হাতে বায়আত কর। খুরাসানবাসীরা সন্তুষ্টচিত্তে তার হাতে বায়আত করে। কিন্তু কিছুদিন পর তারা তাদের বায়আত প্রত্যাহার করে নেয়। অতএব খুরাসানে মুসলিম প্রায় সেই পরিণতির সম্মুখীন হন, যে পরিণতির সম্মুখীন হয়েছিল ইরাকে তার ভাই উবায়দুল্লাহ্। মুসলিম ইব্‌ন যিয়াদ, মুহাল্লাব ইব্‌ন আবূ সুফরাকে নিজের জায়গায় খুরাসানের শাসনকর্তা নিয়োগ করে স্বয়ং দামিশক অভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাযিমের সাথে তার সাক্ষাত হয়। তখন তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাযিমকে নিজের পক্ষ থেকে খুরাসানের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন এবং মুহাল্লাব যথারীতি সেনাবাহিনীর অধিনায়ক পদে বহাল থাকেন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাযিম খুরাসানে পৌঁছেই সমস্ত দুষ্কৃতিকারী ও বিদ্রোহীদেরকে একদম শায়েস্তা করেন। এরপর একদিকে দামিশকে খিলাফতের ব্যাপারটি ফায়সালা হচ্ছিল এবং অন্যদিকে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাযিম তুর্কী ও মুঘলদের পরাজিত করে জনসাধারণের মনে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করছিলেন।

যদি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র হুসাইন ইব্‌ন নুমায়রের পরামর্শ গ্রহণ করতেন এবং সিরিয়ায় চলে যেতেন, তাহলে খলীফা পদে তাঁর মনোনীত হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকত না। তিনি এককভাবে ইসলামী বিশ্বের খলীফা নির্বাচিত হয়ে অবশ্যই ঐ সমস্ত অন্যায় অপকর্মের মূলোৎপাটন করতে পারতেন যেগুলো ইতিমধ্যে শিকড় গেড়েছিল। কিন্তু মানুষের ভাগ্যলিপি যে অপরিবর্তনীয়। ইব্‌ন যুবায়রের ভাগ্যেও তাই ঘটল, যা পূর্ব থেকে তাঁর জন্য নির্ধারিত ছিল।

মারওয়ান ইব্‌ন হাকাম

মারওয়ান ইব্‌ন হাকাম ইব্‌ন আবিল আস ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন আবদে শাম্‌স ইব্‌ন আবদে মানাফ-এর জন্ম হয় হিজরী ২ সনে (৬২২-২৩ খ্রি)। তাঁর মাতার নাম ছিল আমিনা বিন্‌ত আলকামা ইব্‌ন সাফওয়ান। হযরত উসমান (রা)–এর খিলাফত আমলে তিনি মীর মুনশী ও উযীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আমীরে মুআবিয়ার যুগে তিনি বেশ কয়েকবার মদীনার শাসনকর্তা ছিলেন। মুআবিয়া ইব্‌ন ইয়াযীদের মৃত্যুর পর ছয়মাস পর্যন্ত হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র এককভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের খলীফা ছিলেন, বনূ উমাইয়ার কোন ব্যক্তি তখন পর্যন্ত খিলাফতের দাবি করেনি। তাই সমগ্র কর্মচারী ও শাসনকর্তারা তাঁর খিলাফতকে স্বীকার করে নিয়েছিল। ছয়-সাত মাস পর মারওয়ান আপন প্রচেষ্টায় সফল হয়ে সিরিয়ায় নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এমতাবস্থায় তাকে একজন বিদ্রোহী হিসাবেই গণ্য করা যেতে পারে। আর যেহেতু খিলাফত বনূ উমাইয়াদের হাত থেকে একদম চলে গিয়েছিল, তাই মারওয়ানকে বনূ উমাইয়ার খিলাফতের একজন পুনরুজ্জীবনদানকারী বলা যেতে পারে।

খিলাফতের বায়আত এবং মার্‌জ রাহিতের যুদ্ধ

মুআবিয়া ইব্‌ন ইয়াযীদের মৃত্যুর পর, যেমন উপরে বর্ণিত হয়েছে, সিরিয়ার লোকেরাও দু'দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। একদলে ছিল বনূ ইমাইয়ার লোক। তারা তাদের গোত্রেই 'খলীফা পদ' ধরে রাখতে চাচ্ছিল। অপর দলে ছিলেন দামিশকের শাসনকর্তা দাহ্‌হাক ইব্‌ন কায়স এবং তার সমমনা কর্মকর্তারা। তারা ভেতরে ভেতরে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের খিলাফতের সমর্থক ও সহায়ক ছিলেন, কিন্তু এ সম্পর্কে প্রকাশ্যে কিছু বলতেন না। সর্বপ্রথম নু'মান ইব্‌ন বশীর হিমসে আবদুল্লাহ্‌র নামে বায়আত গ্রহণ শুরু করেন। কিন্নাসরীনের শাসনকর্তা যুফার ইব্‌ন হারিসও এক্ষেত্রে তাকে অনুসরণ করে। দামিশ্‌কে ছিল বনূ উমাইয়া ও বনূ কাল্‌বের সংখ্যাধিক্য। এই দুই গোত্র আবদুল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে ছিল। তাই দামিশকের শাসনকর্তা দাহ্‌হাক ইব্‌ন কায়স, যিনি ভেতরে ভেতরে ইব্‌ন যুবায়রের পক্ষে ছিলেন, খিলাফত সম্পর্কে মুখ খুলে কিছু বলছিলেন না। দামিশ্‌কবাসীরা একথা জানত না যে, হিম্‌স এবং কিন্‌নাসরীনের সেনাবাহিনী আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের পক্ষে বায়আত করে ফেলেছে। সর্বপ্রথম হাস্‌সান ইব্‌ন মালিক কালবী যিনি ফিলিস্তীনের কর্মকর্তা এবং আত্মীয়তা সূত্রে বনী উমাইয়াদের পক্ষপাতী ছিলেন, এ খবর জানতে পারেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে রাওহ্ ইব্‌ন যানবা'কে আপন স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করেন এবং বলেন, বাহিনীর অধিনায়করা ইব্‌ন যুবায়রের পক্ষে বায়আত করছে। আমাদের গোত্রের লোকেরা জর্দানে রয়েছে, আমি সেখানে গিয়ে ওদেরকে সাবধান করে দিচ্ছি। তুমি এখানে খুব সতর্ক অবস্থায় থাক এবং যে কেউ তোমার বিরোধিতা করে সঙ্গে সঙ্গে তাকে হত্যা করবে। এরপর হাস্‌সান ইব্‌ন মালিক জর্দান অভিমুখে যাত্রা করেন। তার চলে যাওয়ার সাথে সাথে নাবিল ইব্‌ন কায়স আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের পক্ষ নিয়ে রাওহ্ ইব্‌ন যানবা'কে ফিলিস্তীন থেকে বের করে দেন। অতএব রাওহ্ও জর্দানে হাস্‌সানের কাছে চলে যান। ফলে ফিলিস্তীন এলাকাও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের অধীনে চলে যায়। হাস্‌সান ইব্‌ন মালিক জর্দানবাসীদেরকে একত্র করে তাদেরকে আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়রের বিরুদ্ধে দাঁড় করান এবং তাদেরকে এই মর্মে অঙ্গীকারাবদ্ধ করেন যে, আমরা খালিদ ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন মুআবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ানকে খলীফা মনোনয়নের চেষ্টা করব। হাস্‌সান এটাও জেনে ফেলেছিলেন যে, দামিশকের শাসনকর্তা দাহ্‌হাক ইব্‌ন কায়সও গোপনে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের পক্ষে রয়েছেন, তবে সে ব্যাপারে মুখ খুলে কিছু বলছেন না। অতএব হাস্‌সান দাহ্‌হাকের কাছে একটি পত্র লিখেন। তাতে তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের নিন্দা করেন এবং মুআবিয়ার বংশধররাই যে খিলাফতের অধিকতর হকদার সে সম্পর্কে যুক্তি প্রদর্শন করেন। এরপর তিনি বলেন, লোকেরা এখানে সেখানে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের পক্ষে বায়আত করছে। তুমি অতিসত্তর তা প্রতিহত কর। তিনি এই চিঠি যে দূতের মাধ্যমে দামিশকে পাঠান তাকে বুঝিয়ে বলেন, জুমুআর দিন জামে মসজিদে যখন শহরের সমগ্র গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং বনূ উমাইয়ার লোকেরা সমবেত হবে ঠিক তখনি তুমি এই পত্রটি দাহ্‌হাককে পড়ে শুনাবে। দূত তাই করল।

এখানে প্রথম থেকেই দাহ্‌হাকের সমমতাবলম্বী যথেষ্ট লোক বিদ্যমান ছিল। এই চিঠির বিষয়বস্তু জানাজানি হওয়ার সাথে সাথে তারা দু'দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এক দলে ছিল বনূ উমাইয়া ও তাদের পক্ষের লোকেরা। অন্য দলে ছিল আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের পক্ষের

লোকেরা। দুই দলের মধ্যে পরস্পর রেষারেষি শুরু হয় এবং পরিস্থিতি শেষ পর্যন্ত এই পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে যে, তারা একে অন্যের উপর হামলা পরিচালনার জন্য যথাসম্ভব প্রস্তুতি গ্রহণ করে। কিন্তু খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ ইব্ন মুআবিয়া মধ্যখানে পড়ে উভয় দলকে বুঝিয়ে সম্মুখযুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত রাখেন। দাহ্হাক চুপচাপ মসজিদ থেকে বের হয়ে আপন অফিসে চলে আসেন এবং তিন দিন পর্যন্ত সেখান থেকে বের হননি। ঠিক ঐ সময়ে উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদ ইরাকের দিক থেকে নিরাশ হয়ে সিরিয়া তথা দামিশকে পালিয়ে আসে। সে তথায় পৌঁছাতেই বনূ উমাইয়া এবং তাদের পক্ষের লোকেরা অনেক শক্তিশালী হয়ে ওঠে। দাহ্হাক এবং বনূ উমাইয়া সবাই মিলে জাবিয়া অভিমুখে যাত্রা করে। তখন সাওর ইব্ন মাআন সুলমী দাহ্হাকের কাছে যান এবং তাকে বলেন, তুমি আমাদেরকে আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়রের পক্ষে বায়আত করার পরামর্শ দিয়েছিলে এবং আমরা তোমার সেই পরামর্শ গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি, তুমি হাস্সান ইব্ন মালিক কাল্বীর কথা শুনে তার ভাগ্নে খালিদ ইব্ন ইয়াযীদের পক্ষে বায়আত গ্রহণের চেষ্টা করছ। এতে দাহ্হাক কিছুটা লজ্জা পান এবং সাওরকে বলেন, আচ্ছা বল তো, এ ব্যাপারে তোমার অভিমত কি ? তিনি উত্তর দেন, তুমি এ পর্যন্ত যে জিনিসটি গোপন রেখেছ তা প্রকাশ করে দাও এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়রের পক্ষে বায়আত করার জন্য জনসাধারণকে আহ্বান জানাও। একথা শুনে দাহ্হাক তার সমমতাবলম্বী লোকদের নিয়ে পৃথক হয়ে যান এবং 'মারজে রাহিত' নামক স্থানে গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করেন। অপরদিকে বনূ উমাইয়া তার পক্ষাবলম্বী বনূ কাল্বকে নিয়ে জাবিয়া নামক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করে। হাস্সান ইব্ন মালিক আপন বাহিনীসহ জর্দান থেকে সেখানে এসে পৌঁছেন। জাবিয়ায় সমবেত বনূ উমাইয়া ও বনূ কালবের লোকসংখ্যা পাঁচ হাজারে গিয়ে পৌঁছে। মারজে রাহিত দাহ্হাকের কাছে মোট এক হাজার বনূ কায়সের লোক ছিল। তিনি দামিশকে নিজের যে প্রতিনিধি রেখে এসেছিলেন তাকে ইয়াযীদ ইব্ন মালিক সেখান থেকে বেদখল করে বায়তুল মাল হস্তগত করে নেন। প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল দাহ্হাকের জন্য একটি বড় আঘাত। যদি দামেশ্ক এবং বায়তুলমাল তার দখলে থাকত তাহলে তিনি এ ধরনের বিপর্যস্ত অবস্থায় পড়তেন না। দাহ্হাক সঙ্গে সঙ্গে নিজের এই অবস্থা সম্পর্কে হিম্স, কিন্নাসরীন ও ফিলিস্তীনে যথাক্রমে নু'মান ইব্ন বশীর, যুফার ইব্ন হারিস ও নায়ল ইব্ন কায়সকে অবহিত করেন। তারা দাহ্হাকের সাহায্যার্থে মারজে রাহিতে সৈন্য প্রেরণ করে। এদিকে হাস্সান ইব্ন মালিক জাবিয়ায় ইমামতির দায়িত্ব পালন করতে শুরু করেন। সেখানেও নতুন একজন আমীর বা খলীফা নির্বাচনের প্রশ্ন ওঠে। এজন্য সাধারণভাবে খালিদ ইব্ন ইয়াযীদের নাম প্রস্তাব করা হয় এবং প্রতীয়মান হয় যে, তারই দিকে অধিকাংশ লোকের ঝোঁক রয়েছে।

মারওয়ান গোপনে গোপনে নিজের খিলাফতের জন্য জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করতে শুরু করেন। মারওয়ানেরই ইঙ্গিতে একদা রাওহ্ ইব্ন যানবা এক সাধারণ সভায় খিলাফতের ব্যাপারে নিজের অভিমত প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন ঃ

খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ এখনো বয়সে কচি। আমাদের একজন অভিজ্ঞ সদাসতর্ক খলীফার প্রয়োজন। আর এদিক দিয়ে মারওয়ান ইব্ন হাকামই হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তিনি হযরত উসমান (রা)-এর যুগ থেকে আজ পর্যন্ত খিলাফতের বিভিন্ন কাজে জড়িত থেকে প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। অতএব এটাই বাঞ্ছনীয় যে, আমরা মারওয়ানকেই খলীফা

নির্বাচিত করব। কিন্তু এই শর্তে যে, মারওয়ানের পর খালিদ ইব্ন ইয়াযীদ খলীফা হবেন। আর খালিদের পর খলীফা হবেন আমর ইব্ন সাঈদ ইব্ন 'আস।

মোটকথা, জাবিয়া নামক স্থানে খলীফা নির্বাচনের বিষয়টি চল্লিশ দিন পর্যন্ত বিবেচনাধীন থাকে। শেষ পর্যন্ত উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদের চেষ্টায় রাওহ্ ইব্ন যানবা-এর উপরোক্ত প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং তারই ভিত্তিতে বনূ উমাইয়া, বনূ কাল্ব, গাস্সান, তাঈ প্রভৃতি গোত্রের লোকেরা মারওয়ানের হাতে বায়আত করে। এরপর মারওয়ান আপন দলবলসহ মার্জ রাহিতের দিকে অগ্রসর হন এবং দাহ্হাক ইব্ন কায়সের মুখোমুখি হয়ে তাঁবু স্থাপন করেন। তখন মারওয়ানের কাছে মোট তের হাজার সৈন্য ছিল। অপর দিকে দাহ্হাকের সৈন্য সংখ্যা ছিল এর চার গুণ। উভয়পক্ষ নিজেদের ডান পাশের ও বাম পাশের বাহিনীকে বিন্যস্ত করে যুদ্ধ শুরু করে দেয়। বিশ দিন পর্যন্ত যুদ্ধ অব্যাহত থাকে, কিন্তু জয়-পরাজয়ের কোন ফায়সালা হয়নি। শেষ পর্যন্ত উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদ মারওয়ানকে তার সৈন্যের স্বল্পতার দিকে ইঙ্গিত করে এই পরামর্শ দেন যে, শত্রুদের উপর রাত্রের বেলায়ই আকস্মিক হামলা করা উচিত। যেহেতু বিশ দিন পর্যন্ত উভয়বাহিনী সারিবদ্ধভাবে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং কেউ কারো উপর রাতের বেলা আক্রমণের চেষ্টা করেনি, তাই দাহ্হাক এবং তার বাহিনী এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিত ছিল। উপরন্তু দিনের বেলা মারওয়ান তার কাছে সন্ধি প্রস্তাব পাঠিয়ে এই ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন যে, যুদ্ধ অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে এবং সন্ধির শর্তাবলী মীমাংসিত না হওয়া পর্যন্ত কেউ কারো উপর হামলা করতে পারবে না। এই প্রস্তাব অনুযায়ী যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু অর্ধেক রাত অতিক্রান্ত হওয়ার পর যখন দাহ্হাক এবং তার বাহিনী গভীর নিদ্রায় মগ্ন ঠিক তখনি মারওয়ানের বাহিনী বিভিন্ন দিক থেকে তাদের উপর আকস্মিক হামলা চালায়। ফলে বনূ কায়সের ৮০ জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিসহ বনূ সালীমের ছয়শ লোক মারা যায়। দাহ্হাকও নিহত হন। বাকি সৈন্যরা পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করে।

এই যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে বনূ কাল্ব ও বনূ কায়সের মধ্যকার যুদ্ধ। এই দু'টি গোত্রের মধ্যে জাহিলিয়া যুগ থেকে শত্রুতা চলে আসছিল। ইসলাম তাদের এই শত্রুতাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল। আমীরে মুআবিয়া অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে দু'টি গোত্রকেই নিজের স্বার্থে ব্যবহার করেন। তিনি তাদের পরস্পর শত্রুতাকে অত্যন্ত কৌশলের সাথে দাবিয়ে রাখেন। তিনি তাঁর পুত্র ইয়াযীদকে বনূ কাল্ব গোত্রে এজন্য বিবাহ করান, যাতে সবসময় একটি শক্তিশালী গোত্রের সহায়তা লাভ করতে পারেন। বনূ কায়সের লোকসংখ্যা ছিল বনূ কালবের চাইতে অধিক। তাই তাদেরকেও সন্তুষ্ট রাখার প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয়। এই দু'টি গোত্রকেই সিরিয়ায় দু'টি বৃহৎ শক্তি হিসাবে গণ্য করা হতো। কিন্তু যেভাবে হযরত উমর ফারূকের ইনতিকালের পর বনূ উমাইয়া ও বনূ হাশিমের পুরাতন শত্রুতা পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল, ঠিক সেভাবে আমীরে মুআবিয়ার ইনতিকালের পর বনূ কায়স ও বনূ কালবের বিস্মৃত-প্রায় শত্রুতাও পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং 'মারজে রাহিত'-এর যুদ্ধ এই শত্রুতাকে চিরঞ্জীব করে দিয়ে ইসলামের একটি মহান আদর্শকে যারপরনাই ক্ষতিগ্রস্ত করে।

মুআবিয়া ইব্ন ইয়াযীদের মৃত্যুর পর যখন দামিশ্ক খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারে মতানৈক্য চলছিল এবং বনূ কাল্ব ও বনূ কায়সের মধ্যে পুনরায় শত্রুতা দেখা দিতে শুরু করেছিল তখন

মারওয়ান এই দেখে যে, ইরাক, মিসর ও সিরিয়ার বিরাট সংখ্যক লোক আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়রের খিলাফতকে স্বীকার করে নিয়েছে– যত শীঘ্র সম্ভব আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়রের খিদমতে হাযির হয়ে তাঁর হাতেই খিলাফতের বায়আত করার সংকল্প নেন। দামিশকের জামে মসজিদে যখন জনসাধারণের মধ্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় তখন মারওয়ান বনূ উমাইয়ার খিলাফত থেকে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে মক্কা সফরের প্রস্তুতি নেন। ইতিমধ্যে আবদুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদ দামিশকে এসে পৌঁছে এবং মারওয়ানের ইচ্ছার কথা জেনে তাকে অনেক বলে-কয়ে উক্ত সফর থেকে বিরত রাখে। ইব্ন যিয়াদেরই চেষ্টার ফলে মারওয়ানের হাতে বায়আত করা হয়। আর তারই কূটচালে পড়ে মারজে রাহিতের যুদ্ধে দাহ্হাক ইব্ন কায়স নিহত হন এবং বনূ কায়স পরাজিত হয়।

মারজে রাহিতে বিজয় লাভের পর মারওয়ান দামিশ্কে আসেন এবং ইয়াযীদ ইব্ন মুআবিয়ার প্রাসাদেই বসবাস করতে থাকেন। ইব্ন যিয়াদের পরামর্শ অনুযায়ী এখানে এসেই তিনি সর্বাগ্রে খালিদ ইব্ন ইয়াযীদের মাকে বিবাহ করেন, যাতে একাধারে বনূ কাল্বের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ এবং আগামীতে খালিদ ইব্ন ইয়াযীদের অলী আহ্দীর আশংকা থেকে মুক্তি লাভ করতে পারেন। এরপর তিনি ফিলিস্তীন ও মিসরের দিকে যাত্রা করেন এবং হিজরী ৬৫ (৬৮৪ খ্রি মধ্য ভাগে) সনের প্রথম ভাগে আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়রের পক্ষাবলম্বী সকল লোককে পরাজিত করে হয় হত্যা করেন অথবা দেশ থেকে তাড়িয়ে দেন।

এক্ষেত্রে আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়রের মারাত্মক ভুল এই হয়েছিল যে, সিরিয়ায় তার অনুকূলে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল তা থেকে তিনি লাভবান হওয়ার কোন চেষ্টা করেননি এবং যথাসময়ে নিজের সমর্থকদের কাছেও কোন সাহায্য পৌঁছাতে পারেন নি। তিনি তাঁর ভাই মুসআবকে সিরিয়ার উপর আক্রমণ পরিচালনার নির্দেশ দেন। কিন্তু এই নির্দেশ তখনি দেওয়া হয় যখন সিরিয়ায় তার সমর্থকরা একেবারে নিরাশ ও ভগ্নোৎসাহ হয়ে পড়েছিল।

তাওয়াবীনের যুদ্ধ

উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, হিজরী ৬৪ সনের রমযান (৬৮৪ খ্রি-এর মে) মাসে আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াযীদ আনসারী আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়রের পক্ষ থেকে কূফার শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়ে আসেন। ঐ সময়ে মুখতার ইব্ন আবূ উবায়দাও কূফায় এসে জনসাধারণকে হুসাইন হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের উস্কানি দিতে থাকে। লোকেরা তখন বলে, আমরা তো প্রথমেই এজন্য সুলায়মান ইব্ন সারদের হাতে বায়আত করেছি। কিন্তু কাজ সম্পাদনের সুযোগ এখনো আসেনি। মুখতার বলে, সুলায়মান কাপুরুষ। সে কোন না কোন ভাবে যুদ্ধ এড়িয়ে চলতে চায়। আমাকে ইমাম হুসাইনের ভাই ইমাম মাহ্দী মুহাম্মদ ইব্ন হানাফিয়া আপন প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছেন। তোমরা সবাই আমার হাতে বায়আত করে হত্যাকারীদের থেকে ইমাম হুসাইনের রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণ কর। একথা শুনে জনসাধারণ মুখতারের হাতে বায়আত করতে থাকে। এই সংবাদ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াযীদের কাছে কূফায় গিয়ে পৌঁছলে তিনি ঘোষণা করেন, মুখতার এবং তার সমর্থকরা যদি ইমাম হুসাইনের হত্যাকারীদের থেকে তাঁর খুনের প্রতিশোধ নিতে চায় তাহলে তাকে আমরাও একাজে সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু

যদি সে আমাদের বিরুদ্ধে কোন চক্রান্ত করতে চায় তাহলে আমরা তার মুকাবিলা করে তাঁকে উচিত শাস্তি দেব। এই ঘোষণার প্রতিক্রিয়া হলো এই যে, সুলায়মান ইব্ন সারদ এবং তার সমর্থকরা প্রকাশ্যে যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু করে দেয়। হিজরী ৬৫ সনের ১লা রবিউল আউয়াল (৬৮৫ খ্রি-এর অক্টোবর) সুলায়মান কূফা থেকে বের হয়ে নাখীলা নামক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করেন। সতের হাজার যোদ্ধা তার আশেপাশে সমবেত হয়। কূফার গভর্নর আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াযীদ তার কোন বিরোধিতা করেননি। যেহেতু মুখতার পৃথক দল গঠন করতে চাচ্ছিল এবং সুলায়মানের উদ্দেশ্যও তাই ছিল, যা মুখতার সর্বত্র বলে বেড়াত– তাই কূফার কিছু গন্যমান্য ব্যক্তির আন্দোলনের ফলে আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াযীদ মুখতারকে ধরে বন্দী করে ফেলেন। সুলায়মান রবিউস্ সানী সতের হাজার সৈন্য নিয়ে নাখীলা থেকে সিরিয়া সীমান্তের দিকে যাত্রা করেন। রওয়ানা হওয়ার সময় আবদুল্লাহ্ ইব্ন সা'দ ইব্ন নুফায়ল সুলায়মানকে বলেন, হুসাইনের প্রায় সকল হত্যাকারীই কূফায় রয়েছে। আপনি ওদেরকে ছেড়ে দিয়ে তাঁর হত্যাকারীদের সন্ধানে কোথায় যাচ্ছেন ? সুলায়মান বলেন, এরা তো সাধারণ সিপাহী ছিল। ইব্ন যিয়াদই হুসাইনকে হত্যা করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিল। এদিক দিয়ে প্রকৃত হত্যাকারী হচ্ছে সে-ই। অতএব সর্বপ্রথম তাকেই হত্যা করা উচিত। তাকে খতম করতে পারলে অবশিষ্ট লোকদের শায়েস্তা করা খুবই সহজ। যাহোক তারা নাখীলা থেকে রওয়ানা হয়ে কারবালায় গিয়ে পৌঁছে যেখানে হযরত হুসাইনকে হত্যা করা হয়েছিল এবং যেখানে তাঁর মস্তকবিহীন লাশ দাফন করা হয়েছিল। এরপর সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে 'আইনুল ওয়ারদা' নামক স্থানে গিয়ে তাঁবু গাড়ে। এদের সংবাদ শুনে আবদুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদ, যিনি মুসেলের গভর্নর হিসাবে সেখানে অবস্থান করছিলেন, তাদের মুকাবিলা করার জন্য হুসাইন ইব্ন নুমায়রের নেতৃত্বে বার হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। সুলায়মান হিজরী ৬৫ সনের ২১শে জমাদিউল উলা (৬৮৫ খ্রি-এর ডিসেম্বর) আইনুল ওয়ারদায় গিয়ে পৌঁছেছিলেন। পাঁচদিন অপেক্ষা করার পর ২৬শে জমাদিউল আউয়াল হুসাইন ইব্ন নুমায়রও সেখানে গিয়ে পৌঁছেন। ঐ দিনই যুদ্ধ শুরু হয়। সন্ধ্যা পর্যন্ত সিরীয়রা খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল, কিন্তু রাত এসে পড়ায় তারা সেদিনকার মত রক্ষা পায়। পরদিন ভোরে ইব্ন যিয়াদ প্রেরিত আট হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী হুসাইন ইব্ন নুমায়রের সাহায্যার্থে সেখানে এসে পৌঁছে। আজও ফজর থেকে মাগরিব পর্যন্ত উভয় বাহিনীর মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ হয়; কিন্তু কোন চূড়ান্ত ফায়সালা হয়নি। উভয় বাহিনী অত্যন্ত উত্তেজনার মধ্যে রাত কাটায়। ভোর হওয়ার সাথে সাথে ইব্ন যিয়াদ প্রেরিত দশ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী সিরীয়দের সাহায্যার্থে সেখানে এসে পৌঁছে। আজও সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যুদ্ধ অব্যাহত থাকে এবং তাতে সুলায়মানসহ কূফার প্রায় সকল নেতাই নিহত হন। কূফী বাহিনীতে খুব কম সৈন্যই অবশিষ্ট থাকে। তাই রাত ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে তারা সেখান থেকে পলায়ন করে। হুসাইন ইব্ন নুমায়র তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেন। সুলায়মান ও তার সঙ্গীদেরকে 'তাওয়াবীন' (তাওয়াবের বহুবচন–তাওয়াব অর্থ তওবাকারী) বলা হতো। অর্থাৎ তারা ইমাম হুসাইনকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে তাকে হত্যা করবার মত জঘন্য অপরাধ করেছিল এবং এখন তওবা করে সেই অপরাধের ক্ষতিপূরণ করতে চাচ্ছে। এ কারণে আইনুল ওয়ারদার যুদ্ধকেও তাওয়াবীনের যুদ্ধ বলা হয়। তওবা কোন

সাম্রাজ্যের বা কোন শাসকের নিয়মিত সৈন্য ছিল না, বরং নিজে থেকে একত্রিত হয়ে ইব্‌ন যিয়াদকে হত্যা করতে গিয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত পালিয়ে আসা সামান্য সংখ্যক সৈন্য ব্যতীত ওদের সকলেই নিহত হয়।

খারিজীদের সাথে যুদ্ধ

একদিকে আইনুল ওয়ারদায় তাওয়াবীরা যুদ্ধ করছিল এবং অন্যদিকে বসরায় খারিজীরা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের পক্ষ থেকে বসরার গভর্নর ছিলেন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হারস। বসরা এবং বসরার বাইরের খারিজীরা আহওয়ায অঞ্চলের দূলাব নামক স্থানে সমবেত হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হারস মুসলিম ইব্‌ন আবীস ইব্‌ন কুরায়স ইব্‌ন রাবীআকে খারিজী দমনে প্রেরণ করেন। মুসলিম ইব্‌ন আবীস আপন বাহিনী নিয়ে দূলাবে গিয়ে পৌঁছেন। খারিজীরা নাফিঈ ইব্‌ন আরযাককে তাদের নেতা ও প্রধান সেনাপতি মনোনীত করে। হিজরী ৬৫ সনের জমাদিউস্‌সানী (৬৮৫ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারী) 'দুআব' নামক স্থানে নাফিঈ ইব্‌ন আরযাক ও মুসলিম ইব্‌ন আবীসের মধ্যে যুদ্ধ হয়। এতে মুসিলম এবং নাফিঈ উভয়েই নিহত হন। বসরাবাসীরা মুসলিমের স্থলে হাজ্জাজ বাবকে এবং খারিজীরা নাফিঈ-এর স্থলে আবদুল্লাহ্ তামীমীকে নিজেদের সেনাপতি নিয়োগ করে। শেষ পর্যন্ত খারিজীরা বিজয় লাভ করে। বসরাবাসীরা খারিজীদের বিজয় এবং বসরাবাসীদের পরাজয়ের কথা জানতে পেরে অত্যন্ত মর্মাহত হয়। একজন দ্রুতগামী দূত সঙ্গে সঙ্গে এ খবর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের কাছে মক্কায় পৌঁছিয়ে দেয়। তিনি মুহাল্লাব ইব্‌ন আবী সুফরাকে খুরাসানের এবং হারস ইব্‌ন রাবীআকে বসরার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। যখন হারস ইব্‌ন রাবীআ বসরার শাসনকর্তার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং মুহাল্লাব খুরাসান যাত্রার সংকল্প নেন তখন খারিজীদের সেনাবাহিনী এবং তাদের বিদ্রোহের প্রবল বন্যা বসরার নিকটে এসে পৌঁছে। হারস ইব্‌ন রাবীআ আহ্‌নাফ ইব্‌ন কায়সকে খারিজীদের মুকাবিলার জন্য সেনাপতি নিয়োগ করতে চাইলে আহ্‌নাফ বলেন, এ কাজের জন্য মুহাল্লাবই হচ্ছেন যোগ্যতম ব্যক্তি। কিন্তু মুহাল্লাব বলেন, আমি খুরাসানের শাসনকর্তা হিসাবে সেখানে যাব এবং এ কাজ আনজাম দিতেও আমার আপত্তি নেই—তবে এই শর্তে যে, যুদ্ধের প্রয়োজনীয় ব্যয় বাবদ আমাকে বায়তুলমাল থেকে যথেষ্ট অর্থ ও আসবাব-সামগ্রী সরবরাহ করতে হবে। এরপর যুদ্ধ করে আমি খারিজীদের কাছ থেকে যে সমস্ত অঞ্চল কেড়ে নেব সেগুলো আমাকে জায়গীর হিসাবে প্রদান করতে হবে।

হারস ইব্‌ন রাবীআ উপরোক্ত শর্ত মেনে নিলে মুহাল্লাব বার হাজার বাছাই করা সৈন্য নিয়ে খারিজীদের মুকাবিলায় রওয়ানা হন। উভয় পক্ষ মুখোমুখি হলে খারিজীরা অত্যন্ত দৃঢ়তার পরিচয় দেয়। ফলে বেশ কয়েকবারই বসরাবাসীদের অবস্থা অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুহাল্লাবের ব্যক্তিগত বীরত্ব ও অভিজ্ঞতা বসরাবাসীদেরকে যুদ্ধক্ষেত্রে টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়। খারিজীরা বিপুল বিক্রমে বার বার হামলা করেও শেষ পর্যন্ত পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে কিরমান ও ইস্পাহানের দিকে চলে যায়।

কিরকীসা অবরোধ

ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, মারওয়ান ইব্ন হাকামের খিলাফতের পূর্বে কিন্নাসসিরীনের শাসনক্ষমতা যুফার ইব্ন হারিসের হাতে ছিল। মারওয়ান সাফল্যলাভ করার পর যুফার আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়রের কাছে গিয়ে মারওয়ান কর্তৃক মিসর দখলের সংবাদ দেন। তিনি তখন যুফারকে কিরকীসার কর্মকর্তা নিয়োগ করে পাঠান। কিরকীসা ছিল সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী একটি সীমান্ত জেলা। আইনুল ওয়ারদার যুদ্ধের পর, মারওয়ান উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদকে নির্দেশ দেন, 'যুফারকে কিরকীসা থেকে বহিষ্কার করে দাও। ইব্ন যিয়াদ সঙ্গে সঙ্গে কিরকীসা অবরোধ করেন। যুফার অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে ইব্ন যিয়াদকে প্রতিহত করার চেষ্টা করেন। এই অবরোধ এত দীর্ঘস্থায়ী হয় যে, শেষ পর্যন্ত উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদ মারওয়ানের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে এবং নিজের সাফল্যের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে অবরোধ প্রত্যাহার করে দামিশ্‌কে ফিরে আসে।

মারওয়ান পুত্রদের অলীআহ্‌দ নিয়োগ

আবদুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদকে কিরকীসা অবরোধের নির্দেশ দিয়ে মারওয়ান নিজ পুত্র আবদুল মালিক ও আবদুল আযীযের 'অলীআহ্‌দ' নিয়োগের প্রচেষ্টা চালান। তিনি সাধারণত প্রচার করে দেন যে, আমর ইব্ন সা'দ ইব্ন 'আস বলে, মারওয়ানের মৃত্যুর পর আমি খালিদ ইব্ন ইয়াযীদকে কখনো তার স্থলাভিষিক্ত হতে দেব না, বরং আমি আমার নিজের খিলাফতের জন্য জনসাধারণের বায়আত গ্রহণ করব। একথা প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথে জনসাধারণের মধ্যে কানাঘুষা শুরু হয়ে গেল। মারওয়ান এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে হাস্‌সান ইব্ন মালিক কালবীকে, যে খালিদ ইব্ন ইয়াযীদের সবচেয়ে বড় সমর্থক ছিল, লোভ-লালসা দেখিয়ে এবং প্রতারিত করে স্বমতে নিয়ে আসেন। এবার হাস্‌সানই এই মর্মে আন্দোলন শুরু করেন যে, মারওয়ানের পর আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ানকে এবং তারপর আবদুল আযীয ইব্ন মারওয়ানকে খলীফা মনোনীত করতে হবে। হাস্‌সান ইব্ন মালিক দামিশ্‌কের জামে মসজিদে জনতার সামনে দাঁড়িয়ে বলেন, আমরা শুনতে পাচ্ছি যে, আমীরুল মু'মিনীন মারওয়ানের পর লোকেরা খিলাফতের ব্যাপারে পুনরায় ঝগড়া-বিবাদ শুরু করবে। এই বিপদ থেকে মুসলিম জাতিকে রক্ষার জন্য আমি একটি প্রস্তাব পেশ করছি এবং আশা করছি আমিরুল মু'মিনীন ও সমগ্র মুসলমান আমার এই প্রস্তাব সমর্থন করবেন। প্রস্তাবটি এই যে, আমীরুল মু'মিনীন তার পরবর্তী খলীফা হিসাবে পর্যায়ক্রমে তার পুত্র আবদুল মালিককে ও আবদুল আযীযকে খিলাফতের জন্য মনোনীত করবেন এবং জনসাধারণের কাছ থেকে এজন্য বায়আত গ্রহণ করবেন। তখন কেউই এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেনি বা করার সাহস পায়নি। তাই সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবটি গৃহীত হয় এবং তখন আবদুল মালিক ও আবদুল আযীযের 'অলীআহ্‌দী'র বায়আত গ্রহণ করা হয়।

মারওয়ানের মৃত্যু

উপরোক্ত বায়আত যেহেতু খালিদ ইব্ন ইয়াযীদের বিরুদ্ধে ছিল এবং তার ঘোর সমর্থকদেরকে মারওয়ান ইতিমধ্যে নিজের পক্ষে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন, তাই এতে তিনি

অত্যন্ত মর্মাহত হন। কিন্তু এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে কেউ কিছুই করতে পারেনি। এরপর মারওয়ান খালিদের প্রভাব-প্রতিপত্তি নষ্ট করার জন্য অবিরাম চেষ্টা চালাতে থাকেন। তাকে কিভাবে জনসাধারণের সামনে হেয় প্রতিপন্ন করা যায়, রাতদিন তিনি সেই ফন্দি-ফিকিরই আঁটতে থাকেন। এতেও যখন তার মন ভরল না তখন তিনি খালিদকে হত্যার ষড়যন্ত্র শুরু করেন। খালিদ তার মা অর্থাৎ মারওয়ানের স্ত্রীর কাছে যখন অভিযোগ করল যে, সে আমাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করছে তখন তার মা উম্মে খালিদ বলল, তুমি চুপচাপ থাক। আমিই মারওয়ান থেকে এর প্রতিশোধ নিচ্ছি। এরপর একদিন উম্মে খালিদ তার চার-পাঁচটি দাসীকে পূর্ব থেকে তৈরি করে রাখে। সেদিন রাতের বেলা মারওয়ান প্রাসাদে এসে শুয়ে পড়েন। তখন উম্মে খালিদের নির্দেশ অনুযায়ী ঐ দাসীরা মারওয়ানের মুখে কাপড় গুঁজে এমনভাবে চেপে ধরে যে, তার মুখ দিয়ে কোন শব্দই বের হতে পারেনি এবং এই সুযোগে দাসীরা তাকে গলাটিপে হত্যা করে। এটা হিজরী ৬৫ সনের ৩রা রমযানের (৬৮৫ খ্রি-এর এপ্রিল) ঘটনা। ঐ দিনই দামিশ্কে আবদুল মালিকের হাতে লোকেরা বায়আত করে। আবদুল মালিক তাঁর পিতার কিসাসস্বরূপ উম্মে খালিদকে হত্যা করেন। মাওয়ান ইব্ন হাকাম ৬৩ বছর বয়সে মারা যান। তিনি সর্বমোট সাড়ে নয় মাস খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা)

হযরত আবুদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) ও তাঁর খিলাফতের বর্ণনা ইতিপূর্বে শুরু হয়েছে। যেহেতু মারওয়ানের মৃত্যু অবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়রের খিলাফত আমলে হয়েছে এবং তার মৃত্যুর পরও তার খিলাফত অনেক দিন পর্যন্ত টিকে ছিল তাই মধ্যখানে ইয়াযীদ ইব্ন মুআবিয়া এবং মুআবিয়া ইব্ন ইয়াযীদের অবস্থা বর্ণনা করার পর মারওয়ানের অবস্থাও বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর পুনরায় আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। তবে এখন আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত। কিন্তু যেহেতু তাঁর খিলাফত ও শাসনকাল আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়রের খিলাফতের পরেও অব্যাহত ছিল তাই তাঁর ও তাঁর রাষ্ট্র পরিচালনা সম্পর্কে আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়রের পর আলোচনা করা হবে। কারবালার মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পর যে যুগ শুরু হয় তা পরবর্তী বিশ বছর পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বের জন্য অত্যন্ত গোলযোগপূর্ণ ছিল, যেমন ছিল হিজরী ৩৬ থেকে ৪০ সন (৬৫৬ থেকে ৬৬০-৬১ খ্রি) পর্যন্ত সময়পর্ব। আমরা এখন একটি ভয়ংকর যুগের আলোচনায় এসেছি। এই যুগের পরিস্থিতি বর্ণনায় কালের ধারা বজায় রাখা খুবই কঠিন। এই সময়পর্বের ঘটনাবলী এতই জটিল যে, কালের ধারাবাহিকতা বজায় না রেখেও এগুলোকে পৃথক পৃথকভাবে সাজানো সম্ভব নয়। এতদসত্ত্বেও অন্যান্য ইতিহাস গ্রন্থের তুলনায় আমার এই গ্রন্থে যতবেশি সম্ভব ঘটনার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার চেষ্টা করেছি, যাতে পাঠকের মস্তিষ্ক ভারী হয়ে না ওঠে এবং তারা প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা করতে পারেন।

বংশ পরিচয়, প্রাথমিক অবস্থা, চরিত্র ও গুণাবলী

আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা)-এর বংশতালিকা হচ্ছে আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র ইব্ন আওয়াম ইব্ন খুয়ায়লিদ ইব্ন আসা ইব্ন আবদুল উয্যা ইব্ন কুসাই। তাঁর উপনাম ছিল আবূ

খুবায়ব। তিনি নিজে সাহাবী ছিলেন এবং সাহাবীর পুত্র ছিলেন। তাঁর পিতা যুবায়র ইব্ন আওয়াম (রা) জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবীর অন্যতম। তাঁর মা হযরত আসমা (রা) হযরত আবূ বকর (রা)-এর কন্যা এবং হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-এর বোন। তাঁর দাদী সুফিয়্যা ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ফুফু।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) হিজরত করে মদীনায় যাওয়ার বিশ মাস পর হযরত আবদুল্লাহ্ (রা)-এর জন্ম হয়। মদীনায় তিনি মুহাজিরদের সর্বপ্রথম সন্তান। তাই তাঁর জন্মের পর মুহাজিররা আনন্দ উৎসব করেন। কেননা ইহুদীরা যখন দেখল যে, মদীনায় হিজরত করার পর বেশ কিছুদিন পর্যন্ত মুহাজিরদের কোন সন্তান হচ্ছে না তখন তারা একথা প্রচার করে দেয় যে, আমরা যাদু করেছি, এখন মুহাজিরদের আর কোন সন্তান হবে না। তাই তাঁর জন্মের পর যেমন মুসলমানরা আনন্দ প্রকাশ করে, তেমনি লজ্জা ও অপমানে ইহুদীদের মুখ কালো হয়ে যায়। জন্মের পর পরই তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে পেশ করা হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজে খেজুর চিবিয়ে তরল করে তা আবদুল্লাহ্র মুখে দেন এবং নবজাতক তা চুষে খান।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) অনেক বেশি রোযা রাখতেন এবং প্রচুর নামাযও পড়তেন। কখনো কখনো তিনি সারারাত দাঁড়ানো অবস্থায় অথবা রুকূর অবস্থায় অথবা সিজদার অবস্থায় কাটিয়ে দিতেন। আত্মীয়তার সম্বন্ধ বহাল রাখার প্রতি তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। তিনি ছিলেন একজন প্রখ্যাত বীর সেনাপতি। তাঁর অশ্বারোহণের দক্ষতা কুরায়শের মধ্যে প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছিল। তিনি ছিলেন দৃঢ় প্রত্যয়ী, অত্যন্ত ধৈর্যশীল এবং বাগ্মী পুরুষ। তাঁর কণ্ঠস্বর যেমন ছিল উঁচু, তেমনি স্পষ্ট। যখন তিনি ভাষণ দিতেন তখন তাঁর কণ্ঠধ্বনি নিকটস্থ পাহাড়ে প্রতিধ্বনি হতো।

আমর ইব্ন কায়স বলেন, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়রের একশ ক্রীতদাস এবং তাদের প্রত্যেকেরই ভাষা ছিল পৃথক। আর তিনি তাদের প্রত্যেকের সাথে তাদের স্ব-স্ব ভাষায় কথা বলতেন। তিনি আরো বলেন, আমি যখন তাঁকে কোন ধর্মীয় কাজে মগ্ন দেখতাম তখন আমার ধারণা হতো, ঐ অবস্থায় এক মুহূর্তের জন্যও দুনিয়ার কোন কথাই তাঁর মনে পড়ছে না।

একদা আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র আসাদী আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়রের কাছে আসেন এবং বলেন, 'হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি এবং আপনি অমুক সূত্রে পরস্পর আত্মীয়। আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র তখন বলেন, ঠিকই বলেছ। তবে যদি চিন্তা কর তাহলে দেখবে সকল মানুষই পরস্পরের আত্মীয়। কেননা তারা সকলেই যে আদম ও হাওয়ার সন্তান। আবদুল্লাহ্ আসাদী বলেন, আমার 'নাফাকাহ্' শেষ হয়ে গেছে। অর্থাৎ আমার হাতে এখন খরচ করার মত কোন অর্থ নেই। আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) বলেন, আমি তো তোমার 'নাফাকাহ্র দায়-দায়িত্ব নেইনি। আবদুল্লাহ্ আসাদী বলেন, আমার উটটি ঠাণ্ডায় মরে যাচ্ছে। আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র বলেন, তুমি এটাকে কোন গরম জায়গায় নিয়ে রাখ এবং গরম বস্ত্র (কম্বল ইত্যাদি) দিয়ে ঢেকে দাও। আবদুল্লাহ্ আসাদী বলেন, আমি আপনার কাছে পরামর্শ নিতে আসি নি বরং কিছু সাহায্য চাইতে এসেছি। অভিশাপ ঐ উটের উপর, যে আমাকে আপনার কাছে এভাবে আসতে বাধ্য করেছে।

ইব্ন যুবায়র (রা)-এর খিলাফতের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী

আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) আমীরে মুআবিয়া (রা)-এর মৃত্যুর পরই মক্কার শাসন ক্ষমতার অধিকারী হন। ইয়াযীদের শাসনামলে তিনি মক্কায় বনূ উমাইয়ার শাসন প্রতিষ্ঠিত হতে দেন নি। ইয়াযীদের মৃত্যুর পর তিনি নিজের পক্ষে খিলাফতের বায়আত নেন এবং সিরিয়ার কিছু জায়গা ছাড়া সমগ্র ইসলামী বিশ্ব তাঁর খিলাফত স্বীকার করে নেয়। ঐ যুগে সিরিয়ায় তাঁর জন্য যে অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তা তিনি সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারেননি। আমীরে মুআবিয়ার পর সিরিয়ায় বনূ উমাইয়ার অবস্থা যে শোচনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল তা তাঁর উপলব্ধিতে আসেনি। যদি তিনি বনূ কায়স ও বনূ কালবের পরস্পর শত্রুতা এবং সিরিয়ায় তাঁর যে জনপ্রিয়তা সৃষ্টি হয়েছিল তা যথাসময়ে অনুধাবন করতে পারতেন তাহলে তিনি অবশ্যই একবার না একবার সিরিয়া সফর করতেন। আর তাঁর ঐ সফর তাঁর জন্য ঠিক সেরূপ কল্যাণকর হতো, যেমন কল্যাণকর প্রমাণিত হয়েছিল মুসলিম বিশ্বের জন্য হযরত উমর ফারূক (রা)-এর সিরিয়া সফর। তিনি সিরিয়া সফর করলে মারওয়ানের খিলাফত লাভ এবং বনূ উমাইয়ার প্রভাব-প্রতিপত্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠার কোন সুযোগই থাকত না। যদি তিনি মক্কার পরিবর্তে মদীনাকে রাজধানী করতেন এবং ইয়াযীদের মৃত্যুর পর পরই মদীনায় চলে আসতেন তাহলে অপেক্ষাকৃত নিকটতর হওয়ার কারণে তিনি সিরিয়ার উপর অতি সহজেই নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন এবং দাহ্হাক ইব্ন কায়স, যুফার ইব্ন হারিস, নু'মান ইব্ন বশীর ও আবদুর রহমান ইব্ন জাহ্দামকে এভাবে পরাস্ত হতে দিতেন না। উল্লিখিত ব্যক্তিগণ যদি ইব্ন যুবায়রের পক্ষ থেকে সামান্য সাহায্য-সহযোগিতাও পেতেন তাহলে কখনো মাওয়ান, হাস্সান ইব্ন মালিক এবং উবায়দুল্লাহ্র কাছে পরাজিত হতেন না। মোটকথা, এই ভুলের বা ভুল বোঝাবুঝির কারণে মিসর, সিরিয়া ও ফিলিস্তীন তাঁর থেকে বেদখল হয়ে যায় এবং সেই সুযোগে মারওয়ান তার বংশের জন্য খিলাফতের ভিত্তি স্থাপন করতে সক্ষম হন।

মুখতারের বিশৃংখলা সৃষ্টি

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সুলায়মান ইব্ন সারদ তাওয়াবদের নিয়ে হুসাইন হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য কূফা থেকে রওয়ানাকালে কূফার গভর্নর শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে মুখতার ইব্ন উবায়দা ইব্ন মাসউদ সাকাফীকে বন্দী করেন। এতে সংঘর্ষ বাঁধে এবং তাতে তাওয়াবরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। অবশ্য তাদের কিছু লোক কোনমতে প্রাণ নিয়ে কূফায় পালিয়ে আসে। তখন মুখতার বন্দীশালা থেকে একটি পত্র মারফত তাওয়াবদের কাছে একটি শোকবাণী পাঠায়। তাতে সে বলে, তোমরা মোটেই দুঃখ করো না, বরং নিশ্চিন্ত থাক। যদি আমি জীবিত থাকি তাহলে তোমাদের চোখের সামনেই হত্যাকারীদের থেকে ইমাম হুসাইনের এবং সেই সাথে তোমাদের সকল শহীদের হত্যার প্রতিশোধ নেব। আমি শত্রুদের কাউকে ছাড়ব না এবং এমনভাবে রক্তবন্যা বইয়ে দেব যে, মানুষের চোখের সামনে পুনরায় বখতে নসরের শাসনকাল এবং বনী ইসরাঈলের সাথে সে যে নির্মম ব্যবহার করেছিল সেই দৃশ্য ভেসে উঠবে। ঐ বাণীতে সে আরো বলে, দুনিয়ায় কি এমন কেউ অবশিষ্ট আছে যে হুসাইন হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে আমার দিকে এগিয়ে আসবে এবং সেজন্য আমার সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবে ?

রিফাআ ইব্ন শাদ্দাদ, সায়নী ইব্ন মাখরাবা আবদী, সা'দ ইব্ন হুযায়ফা ইব্নুল ইয়ামান, ইয়াযীদ ইব্ন আনাস, আহমার ইব্ন শামীত হিমসী, আবদুল্লাহ্ ইব্ন শাদ্দাদ ইয়ামানী, আবদুল্লাহ্ ইব্ন কামিল প্রমুখ তাওয়াবীন ঐ পত্র পাঠে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয় এই ভেবে যে, আল্লাহ্র মেহেরবানীতে এখনো এমন এক ব্যক্তি বিদ্যমান আছে, যে আন্তরিকভাবে হুসাইন হত্যার প্রতিশোধ নিতে চায় এবং এজন্য সে বদ্ধপরিকর। এরপর রিফাআ ইব্ন শাদ্দাদ চার-পাঁচ জন লোক সঙ্গে নিয়ে জেলখানায় যায় এবং কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে মুখতারের সাথে দেখা করে। তারা বলে, জেলখানা ভেংগে হলেও আমরা আপনাকে মুক্ত করব। মুখতার উত্তরে বলে, এজন্য আপনাদের কষ্ট করতে হবে না। আমি যখন ইচ্ছা, নিজেই বের হয়ে আসতে পারব। স্বয়ং কূফার গভর্নর আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াযীদ আমাকে মুক্ত করে দেবেন। সে সময় এখনো আসেনি। আপনারা আরো কিছুদিন ধৈর্য ধরুন।

তাওয়াবরা (তাওয়াবীন) পরাজিত ও পর্যুদস্ত হয়ে কূফায় ফিরে আসার পূর্বে মুখতার জেলখানা থেকেই কোন একটি লোকের মাধ্যমে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-এর কাছে একটি চিঠি পাঠিয়েছিল। তাতে সে লিখেছিল, আমাকে কূফার শাসনকর্তা আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াযীদ বন্দী করে রেখেছে। আপনি অনুগ্রহ করে আমার জন্য সুপারিশ করে তার কাছে একটি চিঠি লিখুন। আমি মজলুম ও অত্যাচারিত। আল্লাহ্ তা'আলা এই সুপারিশের জন্য আপনাকে উত্তম পুরস্কার দেবেন। মুখতারের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) তার জন্য সুপারিশ করবেন। ফলে সে জেলখানা থেকে অনায়াসে মুক্তি পাবে। কিন্তু সে এ কথাটি গোপন রেখে নিজের মুক্তির ব্যাপারে রিফাআর সাথে এমন ভঙ্গিতে আলাপ করে যেন সে তার 'কারামতী' দ্বারাই আদুল্লাহ্‌কে বশীভূত করে মুক্তিলাভ করবে। সে এর দ্বারা তাওয়াবদের উপর তার কারামতী যাহির করতে চাচ্ছিল। যাহোক কিছুদিন পর হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াযীদের কাছে একটি সুপারিশপত্র পাঠান। আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন উমরের সুপারিশের প্রতি সম্মান প্রদর্শন পূর্বক মুখতারকে জেলখানা থেকে ডেকে পাঠিয়ে বলেন, তোমাকে আমি মুক্ত করে দিচ্ছি, তবে এই শর্তে যে, তুমি কূফায় কোন গণ্ডগোল বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে না এবং সব সময় নিজের ঘরে থাকবে। মুখতার ঐ শর্তটি মেনে নেয় এবং জেল থেকে ছাড়া পেয়ে নিজের ঘরে এসে অবস্থান করতে থাকে। শীআনে হুসাইন এই আকস্মিক মুক্তি লাভকে মুখতারের একটি কারামত বলেই ধরে নেয় এবং তার কাছে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তির সাথে আসা-যাওয়া করতে থাকে। তাদের এই আসা-যাওয়া হতো অত্যন্ত সঙ্গোপনে। কিছুদিন এভাবে অতিবাহিত হয়। এরপর আমীরুল মু'মিনীন হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াযীদকে পদচ্যুত করে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুতীকে তার স্থলে কূফার গভর্নর করে পাঠান। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুতী' হিজরী ৬৬ সনের ২৫শে রমযান (৬৮৬ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল) কূফা এসে পৌঁছেন। এই নিয়োগ ও বরখাস্তের মধ্যে মুখতার একটি আশার আলো দেখতে পায়। প্রাক্তন গভর্নর কূফা থেকে চলে যাওয়ার পর সে তার আরোপিত বিধিনিষেধ লংঘন করে স্বাধীনভাবে চলাফেরা শুরু করে। তার কাছে লোকের আসা-যাওয়া অনেক বেড়ে যায় এবং সেই সাথে তার ভক্ত-অনুরক্তের সংখ্যাও বিস্ময়করভাবে বৃদ্ধি পায়। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুতী ইয়াস ইব্ন আবূ মাদারাবকে কূফার পুলিশ

প্রধান নিয়োগ করেছিলেন। একদা তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুতী'কে বলেন, মুখতারের দল অনেক শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। আমার আশংকা হচ্ছে, সে আবার বিদ্রোহ করে বসে কিনা। অতএব তাকে ডেকে পাঠিয়ে পূর্বের ন্যায় গৃহবন্দী করে রাখাই সমীচীন হবে বলে আমি মনে করি।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুতী মুখতারের চাচা যায়দ ইব্‌ন মাসঊদ সাকাফী ও হুসাইন ইব্‌ন রাফিঈ আযাদীকে মুখতারের কাছে এই বলে পাঠান, 'তোমরা মুখতারকে আমার কাছে একটু ডেকে নিয়ে এস। তার সাথে আমার কিছু দরকারী কথা আছে। তারা উভয়ে মুখতারের কাছে গেল এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুতীর উপরোক্ত পয়গাম পৌঁছিয়ে দিল। মুখতার দ্রুত পোশাক পরে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুতীর কাছে আসার জন্য তৈরি হয়ে গেল। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে তার চাচা যায়দ নিম্নোক্ত আয়াতটি আবৃত্তি করল।

وَاِذْ يَمْكُرُبِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ ط وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُاللهُ ط وَاللهُ خَيْرُالْمَاكِرِيْنَ-

"স্মরণ কর, কাফিররা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তোমাকে বন্দী করার জন্য, হত্যা করার অথবা নির্বাসিত করার জন্য; তারা ষড়যন্ত্র করে এবং আল্লাহ্ও কৌশল করেন। আর আল্লাহ্ই কৌশলীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ" (৮ ঃ ৩০)।

মুখতার এই আয়াত শুনে বুঝে নিল, যায়দ তাকে কি বলতে চাচ্ছে। সে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, শীঘ্র লেপ নিয়ে এস, জ্বর জ্বর মনে হচ্ছে। এরপর সে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল এবং হুসাইন ইব্‌ন রাফিঈকে বলল, দেখুন আমি তো যাওয়ার জন্য তৈরিই ছিলাম। কিন্তু কি করব, হঠাৎ জ্বর এসে গেল, আপনারা তো আমার অবস্থা দেখতেই পাচ্ছেন। গর্ভনরের কাছে গিয়ে বলুন, আগামীকাল যখন আমার অবস্থা কিছুটা ভাল হবে তখন অবশ্যই তার খিদমতে গিয়ে হাযির হব। এরপর ঐ দুই ব্যক্তি মুখতারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। পথিমধ্যে হুসাইন যায়দকে বললেন, তুমি যে ঐ আয়াতটি পাঠ করে আকারে ইঙ্গিতে মুখতারকে গভর্নরের কাছে যেতে নিষেধ করেছিলে তা আমি টের পেয়েছি। সে তোমার ইঙ্গিত পেয়ে যাবার জন্য তৈরি হয়েও যে জ্বরের ভান করেছে তা আমার বুঝতে বাকি নেই। তবে হ্যাঁ,তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার, আমি একথা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুতীকে বলব না। কেননা হয়ত মুখতারের মাধ্যমেই আমি কোন দিন উপকৃত হব। যাহোক তারা উভয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুতীর কাছে এসে বলল, আমরা স্বচক্ষে দেখে এসেছি, মুখতার অসুস্থ। এখন আপনার কাছে আসা তার পক্ষে সম্ভব নয়। আগামীকাল ইনশাআল্লাহ্ সে আসবে।

যায়দ এবং হুসাইন চলে যাবার পর মুখতার তার হাতে বায়আতকারীদের মধ্য থেকে কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তিকে ডেকে পাঠাল এবং বলল, আর বেশিদিন অপেক্ষা করার সময় নেই। বিদ্রোহ ঘোষণার জন্য আমাদের শীঘ্রই তৈরি হয়ে যেতে হবে। তারা বলল, আপনি যে নির্দেশই দেবেন আমরা তা মেনে নিতে প্রস্তুত আছি। তবে আমাদের এক সপ্তাহের সময় দিতে হবে, যাতে আমরা অস্ত্রশস্ত্রে শান দিয়ে পুরোদমে তৈরি হয়ে যেতে পারি।

মুখতার বলল, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুতী আমাকে কখনো এক সপ্তাহের সময় দেবেন না। তখন সা'দ ইব্ন আবূ সা'দ বলল, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। যদি আবদুল্লাহ্ আপনাকে একান্তই বন্দী করে ফেলে তাহলে আমরা জোর করে আপনাকে জেলখানা থেকে মুক্ত করে নিয়ে আসব। মুখতার একথা শুনে নীরব হয়ে যায়। এবার ভক্তরা তাকে তার ঘর থেকে নিয়ে গিয়ে একটি অখ্যাত জায়গায় লুকিয়ে রাখে। এরপর সা'দ ইব্ন আবূ সা'দ তার সমমনাদের বলে, বিদ্রোহ করার পূর্বে আমাদের একথা যাচাই করে দেখতে হবে যে, মুহাম্মদ ইব্নুল হানাফিয়া মুখতারকে একাজের জন্য তার প্রতিনিধি নিয়োগ করেছেন কি না। যদি মুখতার তাঁর পক্ষে বায়আত গ্রহণের জন্য সত্যিই আদিষ্ট হয়ে থাকে তাহলে দ্বিধাহীন চিত্তে তার অধীনে আমাদের বিদ্রোহ করা উচিত। আর যদি মুহাম্মদ ইব্নুল হানাফিয়া কর্তৃক তিনি আদিষ্ট না হয়ে থাকেন এবং আমাদের প্রতারণা করতে চান তাহলে তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক রাখা উচিত নয়। এরপর সেই মুহূর্তেই সা'দ ইব্ন আবূ সা'দ তিন-চার ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে মদীনা অভিমুখে যাত্রা করে। সেখানে পৌঁছে তারা মুহাম্মদ ইব্নুল হানাফিয়াকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তর দেন, আমি মুখতারকে আলী-হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের অনুমতি দিয়েছি। একথা শুনে সা'দ তার সঙ্গীদের নিয়ে কূফায় ফিরে আসে এবং পূর্বাপর অবস্থা সম্পর্কে সবাইকে অবহিত করে। এবার লোকেরা মুখতারের হাতে বায়আত করতে এগিয়ে আসে। মুখতার যখন জানতে পারে যে, তার কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়ে গেছে তখন সে অত্যন্ত আনন্দিত হয় এই ভেবে যে, তার ব্যাপারে জনসাধারণের মনে আর কোন সন্দেহ রইল না। এবার সে সবাইকে বলে, আমাদের সাফল্য অর্জন করতে হলে ইবরাহীম ইব্ন মালিক ইব্ন উশতারকেও, যিনি কূফার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অন্যতম, আমাদের দলে ভিড়াতে হবে। অতএব মুখতারের অন্যতম শিষ্য আমের ইব্ন শুরাহবিল ইবরাহীম ইব্ন মালিকের সাথে সাক্ষাত করে বলে, তোমার পিতা হযরত আলী (রা)-এর পক্ষে ছিলেন এবং তাঁর অনেক গুরুত্বপূর্ণ খিদমত আনজাম দিয়েছেন। এখন লোকেরা এ ব্যাপারে দৃঢ়-সংকল্প যে, যেভাবেই হোক হুসাইন হত্যার প্রতিশোধ নিতে হবে। এ উদ্দেশ্যে বহু সংখ্যক লোক ইতিমধ্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে গেছে। অতএব তোমারও এতে শরীক হওয়া উচিত।

ইবরাহীম উত্তর দেয়, আমি এই শর্তে তোমাদের সাথে শরীক হতে পারি যে, আমাকে দলের আমীর নিযুক্ত করতে হবে। আমের বলে, প্রকৃতপক্ষে মুহাম্মদ ইব্নুল হানাফিয়া হচ্ছেন আমাদের ইমাম এবং তিনি মুখতারকে তাঁর প্রতিনিধি নিয়োগ করেছেন। তাই আমরা মুখতারের হাতে বায়আত করেছি। ইবরাহীম তখন বলে, ঠিক আছে, আমি নিজেই মুখতারের সাথে সাক্ষাত করব। আমের ফিরে এসে মুখতারকে সবকিছু খুলে বলে। পরদিন মুখতার তার পনেরজন অনুসারীকে সঙ্গে নিয়ে স্বয়ং ইবরাহীমের বাড়িতে যায়। তখন ইবরাহীম জায়নামাযের উপর বসা ছিল। মুখতার ঘরে ঢুকেই বলে, তোমার পিতা 'শীআনে আলী'র মধ্যে একজন অতি বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। আমরা তোমাকেও আমাদের দলের লোক মনে করি। ইমাম মাহদী মুহাম্মদ ইব্নুল হানাফিয়া আমাকে তাঁর প্রতিনিধি নিয়োগ করে কূফায় পাঠিয়েছেন। অতএব তোমাকে আমার হাতে বায়আত করতে হবে। আমি অঙ্গীকার করছি যে,

বিজয় লাভের পর যে পদই তুমি পছন্দ করবে তাই তোমাকে দেওয়া হবে। মুখতারের সঙ্গে যারা গিয়েছিল তারাও তার এই অঙ্গীকারকে সমর্থন করে এবং এজন্য সাক্ষী হয়ে থাকে। একথা শুনে ইবরাহীম সঙ্গে সঙ্গে তার জায়নামায থেকে উঠে মুখতারকে নিজের জায়গায় বসিয়ে তার হাতে বায়আত করে। মুখতার বায়আত নিয়ে সেদিনকার মত ফিরে আসে। পরদিন অর্থাৎ হিজরী ৬৬ সনের ১৪ই রবিউল আউয়াল (৬৮৫ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর) রাতের বেলা মুখতার ইবরাহীমের কাছে লোক পাঠিয়ে বলে, আমরা এখনি বিদ্রোহ করার সংকল্প নিয়েছি। তুমিও তোমার সঙ্গীদের নিয়ে আমাদের কাছে চলে এসো। অর্ধেক রাত অতিবাহিত হতে না হতেই ইবরাহীমের কাছে তার দলের লোকেরা এসে সমবেত হয়।

ইয়াস ইব্‌ন মাযারিবকে গুপ্তচরেরা এই মর্মে একটি সংবাদ দিয়েছিল যে, আজ রাতেই শীআনে আলী বিদ্রোহ ঘোষণা করবে। তাই তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুতীকে এ সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। তিনি তখন ইয়াসকে এর প্রতিকারের উপায় জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছিলেন, কূফায় মোট সাতটি মহল্লা রয়েছে। অতএব আপনি প্রত্যেক মহল্লায় পাঁচশ লোকের একটি বাহিনী মোতায়েন করুন। রাতের বেলা মহল্লার ভিতর থেকে কোন লোক বের হলে ওরা যেন তাকে সঙ্গে সঙ্গে বন্দী অথবা হত্যা করে। ইয়াসের এই পরামর্শ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। প্রত্যেক মহল্লায় এক একজন অধিনায়ককে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, যাতে রাস্তায় অথবা রাজপথে লোকের সমাবেশ ঘটতে না পারে। ঘটনাক্রমে ইবরাহীম যখন আপন সঙ্গীদের নিয়ে মুখতারের কাছে যাচ্ছিল তখন পথিমধ্যে সে ইয়াসের মুখোমুখি হয়ে যায় এবং তারা একে অপরকে আক্রমণ করে বসে। শেষ পর্যন্ত ইবরাহীমের হাতে ইয়াস নিহত হন। অপরদিকে মুখতারের ঘরেও চার হাজার লোক এসে সমবেত হয় এবং তৎক্ষণাৎ সরকারী বাহিনীর অপর একটি দল তাদেরকে আক্রমণ করে। এদিকে ইবরাহীম লড়তে লড়তে মুখতারের ঘরের কাছে এসে পৌঁছে। ওদিকে প্রত্যেকটি মহল্লায় মোতায়েনকৃত সরকারী ফৌজও একের পর এক সেখানে এসে সমবেত হয়। এবার দুই পক্ষের মধ্যে রীতিমত যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় এবং ইবরাহীম সরকারী বাহিনীকে পৃষ্ঠ প্রদর্শনে বাধ্য করে। অপরদিকে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুতী অপর একটি বাহিনী নিয়ে হাযির হন। ফলে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হয়। কখনো ইবরাহীম ও মুখতার আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুতীকে দারুল ইমারত (গভর্নর ভবন) পর্যন্ত হাঁকিয়ে নিয়ে যেত, আবার কখনো আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুতী ওদেরকে পিছনে হটিয়ে কূফার বাইরে নিয়ে যেতেন। সারারাত যুদ্ধ চলে। যুদ্ধ যতই প্রলম্বিত হয় মুখতারের বাহিনীও ততই ভারী হয়ে ওঠে অর্থাৎ তাতে নতুন লোক এসে যোগ দেয়। শেষ পর্যন্ত আবদুল্লহ্ ইব্‌ন মুতীকে দারুল ইমারতে অবরুদ্ধ হতে হয়। মুখতার তিনদিন পর্যন্ত অবরোধ অব্যাহত রাখে। যেহেতু দারুল ইমারতে লোকসংখ্যা ছিল অনেক এবং খাদ্যপানীয়ের তেমন কোন ব্যবস্থা ছিল না, তাই আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুতী একটি গোপন রাস্তা দিয়ে বের হয়ে আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-এর ঘরে গিয়ে লুকিয়ে থাকেন। লোকেরা নিরাপত্তা প্রার্থনা করে দারুল ইমারতের দরজা খুলে দেয়। মুখতার দারুল ইমারত ও বায়তুলমাল দখল করে সেখান থেকে প্রচুর অর্থ তার অনুসারীদের মধ্যে বিতরণ করে। কূফার জামে মসজিদে সকলে সমবেত হয়। মুখতার একটি ভাষণ দেয়

এবং তাতে মুহাম্মদ ইব্নুল হানাফিয়ার হাতে বায়আত করতে এবং তাঁর নেতৃত্ব মেনে নিতে সকলকে উদ্বুদ্ধ করে। কূফাবাসীরা বায়আতের মাধ্যমে কিতাব ও সুন্নাহ্র অনুসরণ এবং আহলে বায়তের প্রতি তাদের সহানুভূতির অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। মুখতারও তাদের প্রতি সদয় ব্যবহারের প্রতিশ্রুতি দেয়। এই সাধারণ বায়আতের পর মুখতার জানতে পারে যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুতী আবূ মূসা (রা)-এর ঘরে লুকিয়ে আছেন। সে তখনি লোক মারফত তার কাছে এক লক্ষ দিরহাম পাঠিয়ে দেয় এবং সেই সাথে একথাও বলে পাঠায়, আমি জানতে পেরেছি যে, সফরসামগ্রী না থাকার কারণে তুমি আবূ মূসার ঘরে অবস্থান করছ। অতএব আমার এই এক লক্ষ দিরহাম গ্রহণ কর এবং তিন দিনের মধ্যে আপন সফরসামগ্রীর ব্যবস্থা করে কূফা থেকে চলে যাও। এই পরাজয়ের কারণে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুতী এতই লজ্জা ও অপমানবোধ করেন যে, এরপর কূফা থেকে মক্কায় না গিয়ে বসরায় চলে আসেন।

সুলায়মান ইব্ন সারদের যেসব সঙ্গী পরাজিত ও পর্যুদস্ত হয়ে কূফায় এসেছিল তাদের মধ্যে মুসান্না ইব্ন মাখরামা আবদী নামীয় বসরার একজন অধিবাসীও ছিল। মুখতারের চিঠি পড়ে ওরা যে জেলখানায় তার সাথে দেখা করতে গিয়েছিল একথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তখন মুসান্না মুখতারের হাতে বায়আতও করেছিল এবং মুখতার তাকে এই ওসীয়ত করে বসরায় পাঠিয়েছিল যে, তুমি সেখানে গিয়ে শীআনে আলীর কাছ থেকে আমার পক্ষে বায়আত গ্রহণ কর এবং সমর্থকদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে থাক। আর যখন আমি কূফায় বিদ্রোহ ঘোষণা করব তখন তুমিও বসরায় বিদ্রোহ ঘোষণা করবে। যাহোক, মুসান্না ইব্ন মাখরামা বসরায় গিয়ে জনসাধারণের কাছ থেকে বায়আত গ্রহণ শুরু করে এবং বেশ বড় একটি দল গড়ে তোলে। মুখতার যখন কূফায় বিদ্রোহ ঘোষণার সংকল্প নেয় তখন মুসান্নাকে সে সম্পর্কে অবহিত করে। অতএব মুসান্নাও নির্দিষ্ট তারিখে বসরায় বিদ্রোহ ঘোষণা করে। কিন্তু তখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা)-এর পক্ষ থেকে বসরার গভর্নর ছিলেন হারিস ইব্ন আবী রাবীআ। তিনি কৌশলের সাথে বিদ্রোহীদের পরিকল্পনা বানচাল করে দিয়ে তাদেরকে একটি পল্লীতে ঘেরাও করে ফেলেন। এরপর তাদের সবাইকে বসরা থেকে বের করে দেন। ওরা তখন সেখান থেকে বের হয়ে কূফায় মুখতারের কাছে চলে আসে। এভাবে বসরা রক্ষা পায় বটে, তবে কূফা আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়রের দখল থেকে ছুটে যায়। মুখতার কূফায় নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে সেখানকার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরকে তার সভাসদ নিয়োগ করে। ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যান্য শহর জয় করার জন্য সে কয়েকটি পতাকা তৈরি করে এবং একটি পতাকা দিয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্ন হারস ইব্ন আশতারকে আওবিনিয়ার দিকে, একটি পতাকা দিয়ে মুহাম্মদ ইব্ন আমের ইব্ন আতারুদকে আযারবায়জানের দিকে, একটি পতাকা দিয়ে আবদুর রহমান ইব্ন সা'ঈদ ইব্ন কায়সকে মাওসিলের দিকে, একটি পতাকা দিয়ে ইসহাক ইব্ন মাসউদকে মাদায়েনের দিকে এবং অপর একটি পতাকা দিয়ে সা'দ ইব্ন হুযায়ফাকে হুলওয়ানের দিকে প্রেরণ করে। সে আবদুল্লাহ্ ইব্ন কামিলকে কূফার কোতওয়াল (পুলিশ প্রধান) এবং শুরায়হ্কে কাযী (বিচারপতি) নিয়োগ করে। পরে অবশ্য শুরায়হকে পদচ্যুত করে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মালিক তায়ীকে কূফার কাযী নিয়োগ করা হয়। সবদিকেই মুখতার প্রেরিত

অধিনায়করা সাফল্য অর্জন করে। ফলে জনসাধারণ মুখতারের আধিপত্য মেনে নিয়ে তার হাতে বায়আত করে। শুধু মাওসিলে আবদুর রহমান ইব্ন সাঈদ সুবিধা করে উঠতে পারেনি। কেননা সেখানে আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ানের পক্ষ থেকে আবদুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদ নিয়োজিত ছিলেন। আবদুর রহমান মাওসিলের পরিবর্তে তিকরীতে গিয়ে অবস্থান নেয় এবং মুখতারকে সেখানকার অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করে। তখন মুখতার ইয়াযীদ ইব্ন আনাসের উপর মাওসিল অভিযানের দায়িত্ব অর্পণ করে এবং তিন হাজার সৈন্যসহ তাকে সেখানে পাঠিয়ে দেয়। উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদের কাছে এই সংবাদ পৌঁছলে সে রাবীআ ইব্ন মুখতার গানাবীকে ইয়াযীদের মুকাবিলা করার জন্য প্রেরণ করে। বাবিল নামক স্থানে উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

হিজরী ৬৬ সনের ৯ই যিলহজ্জ (৬৮৬ খ্রি জুলাই) তারিখে সংঘটিত এই যুদ্ধে রাবীআ নিহত হন এবং সিরীয় বাহিনী পরাজিত হয়। পরাজিত সৈন্যরা যখন সিরিয়ায় ফিরে যাচ্ছিল তখন পথিমধ্যে আবদুল্লাহ্ ইব্ন হিমলাহ্ খাশ'আমীর সাথে তাদের সাক্ষাত হয়। আবদুল্লাহ্কে তিন হাজার সৈন্যসহ উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদ রাবীআরই সাহায্যার্থে পাঠিয়েছিলেন। যাহোক আবদুল্লাহ্ পরাজিত সৈন্যদেরকেও সাথে নিয়ে যান এবং পরদিন অর্থাৎ ১০ই যিলহজ্জ ঈদুল আযহার দিনে কূফী বাহিনীর উপর হামলা চালান। এই যুদ্ধেও কূফীরা জয়ী এবং সিরীয়রা পরাজিত হয়। কূফীরা কয়েক হাজার সিরীয়কে গ্রেফতার করে এবং ইয়াযীদ ইব্ন আনাসের নির্দেশে তাদের হত্যা করা হয়। ঐ দিন সন্ধ্যার সময় পূর্ব থেকে রোগাক্রান্ত ইয়াযীদও মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মৃত্যুর পূর্বে সে ওরাকা ইব্ন আযিবকে তার বাহিনীর অধিনায়ক নিয়োগ করে। পরদিনও রাকার গুপ্তচরেরা এসে সংবাদ দেয় যে, স্বয়ং উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদ মুকাবিলার জন্য আসছেন। ওরাকা তার নাম শুনতেই বাবিল থেকে পিছিয়ে এসে ইরাক সীমান্তের অভ্যন্তরে অবস্থান নেয় এবং মুখতারের কাছে এই মর্মে একটি চিঠি লিখে, "আমার সৈন্য সংখ্যা অল্প থাকায় আমি পিছিয়ে এসেছি।" এই সংবাদ শুনে কূফার লোকেরা ওরাকার নিন্দা করতে থাকে। কেননা সে জয়ী হওয়া সত্ত্বেও পরাজিতদের মত পিছিয়ে এসেছে। মুখতার কূফা থেকে সাত হাজার সৈন্য দিয়ে ইবরাহীমকে ওরাকার কাছে প্রেরণ করে এবং তাকে নির্দেশ দেয়, "তুমি ইয়াযীদ ইব্ন আনাসের সমগ্র বাহিনীকেও (ওরাকার কাছ থেকে) নিজের নেতৃত্বাধীনে নিয়ে আসবে।"

ইবরাহীম চলে যাওয়ার পর কূফাবাসীরা শীস ইব্ন রিবয়ীর কাছে এসে এই মর্মে অভিযোগ করে যে, মুখতার আমাদের প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করে না, এমনকি আমাদের অধিকার পর্যন্ত কেড়ে নেয়। শীস বলে, আমি মুখতারের সাথে আলাপ করে দেখি, সে এ ব্যাপারে কি বলে। শীস মুখতারের সাথে সাক্ষাত করে। সে বলে, আমি প্রতিটি কাজই কূফাবাসীদে মর্জি মত করব এবং মালে গনীমত থেকেও তাদেরকে অংশ দেব। তবে এই শর্তে যে, তারা আমাকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দেবে যে, তারা বনূ উমাইয়া ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়রের সমগ্র শক্তি নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে লড়ে যাবে। শীস ইব্ন রিবয়ী বলে, ঠিক আছে, আমি কূফাবাসীদের এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করব। এই বলে সে মুখতারের

কাছ থেকে বিদায় নেয়। কূফার কিছু লোক এমন ছিল, যারা মুখতারের হাতে শাসনক্ষমতা আসার পূর্বেই বায়আত করেছিল। ওরা ছিল মুখতারের একান্ত অনুগত। তাই সে ওদের প্রতি বিরাট আনুকূল্য প্রদর্শন করত। কিছু লোক ছিল যারা শুধু তার শাসনক্ষমতা স্বীকার করে নিয়ে তার হাতে আনুগত্যের বায়আত করেছিল। ওরা তার সমমনা ছিল এবং হুসাইন-হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্রে তাকে সমর্থন করত। মুখতারের বিরুদ্ধে ওরাই অভিযোগ উত্থাপন করেছিল। অতএব শীস ইব্ন রিবয়ী ফিরে এলে তারা মুখতারের বিরুদ্ধে জনসমাবেশের আয়োজন করে এবং দারুল ইমারতে গিয়ে মুখতারকে বলে, আমরা তোমাকে পদচ্যুত করলাম। তুমি শাসনক্ষমতা ছেড়ে দাও। কেননা তুমি মুহাম্মদ ইব্নুল হানাফিয়ার প্রতিনিধি, খলীফা নও। সে জনতাকে বুঝিয়ে বলে, আমি তোমাদের সাথে কোনরূপ রূঢ় ব্যবহার করতে চাই না। আমি তোমাদের সবাইকে হুসাইন-হত্যার অপরাধ থেকেও ক্ষমা করে দিচ্ছি। আগামীতেও আমি তোমাদের প্রতি সর্বপ্রকার আনুকূল্য প্রদর্শন করব। এখন বনূ উমাইয়াদের সাথে আমাদের যুদ্ধ চলছে। এমতাবস্থায় তোমাদের উচিত, কোনরূপ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি না করা। যদি তোমরা এরূপ কর তাহলে পরিণাম ভাল হবে না। যাও, এবার পূর্বাপর বিষয়টি ভালভাবে চিন্তা করে দেখ। তোমরা ইতিমধ্যে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছ তা তোমাদের জন্য কোনই সুফল বয়ে আনবে না।

ওদের নেতৃবৃন্দ তখন মুখতারের কথা প্রকাশ্যে মেনে নিয়ে বলে, ঠিক আছে, আমরা বিষয়টি পুনরায় চিন্তা করে দেখব। কিন্তু তারা মনে মনে বলে, ইবরাহীম (যাকে মুখতার একটি বাহিনীসহ কূফার বাইরে পাঠিয়েছিল) কিছুটা দূরে চলে যাক। এরপর আমরা তোমাকে এক হাত দেখিয়ে তবে ছাড়ব। এদিকে মুখতারও ইবরাহীমের অনুপস্থিতিতে নিজের অসহায়ত্বের দিকটি অনুভব করতে পেরেছিল। অতএব সে সঙ্গে সঙ্গে একটি দ্রুতগামী উষ্ট্রী দিয়ে আপন দূতকে ইবরাহীমের কাছে পাঠায় এবং তাকে অতিসত্বর কূফায় ফিরে আসতে বলে। এরপর সে অত্যন্ত নির্ভীকচিত্তে দারুল ইমারতে বসে থাকে। জনসাধারণ পরদিন দারুল ইমারত অবরোধ করে ফেলে। কিন্তু ইবরাহীম তৃতীয় দিন কূফায় ফিরে এসে মুখতারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল নির্বিচারে হত্যা করে। ফলে তখন কূফায় এমন কোন ঘর বাকি থাকেনি, যেখানে এক অথবা একাধিক ব্যক্তি ইবরাহীমের হাতে নিহত হয়নি। মুখতার জনসাধারণকে একত্র করে ঐ সমস্ত লোকের তালিকা তৈরি করে, যারা হুসাইন হত্যার সময় ইব্ন যিয়াদের বাহিনীতে ছিল কিংবা যারা কোন না কোনভাবে কারবালার যুদ্ধক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করেছিল। তখন আমর ইব্ন সা'দ এবং শিমার যিল-জাওশানকেও বন্দী করে হত্যা করা হয়। আমর ইব্ন সা'দ মুখতারের কাছ থেকে নিরাপত্তা লাভ করেছিল, কিন্তু মুখতার তার অঙ্গীকার ভঙ্গ করে তাকে হত্যা করে। আমরের পুত্র হাফ্স ইব্ন আমর মুখতারেরই সভাসদ ছিল। আমরের কর্তিত মস্তক দরবারে এসে পৌঁছলে মুখতার হাফ্সকে বলে, তুমি কি চেন এটা কার মস্তক? হাফ্স উত্তর দেয়, হ্যাঁ, আমি চিনি। কিন্তু এই মুহূর্ত থেকে আমার জীবনের সব সাধ-আহলাদ মাটি হয়ে গেছে। মুখতার সাথে সাথে জল্লাদকে হুকুম দেয়, 'হাফ্সের মস্তকও কেটে ফেল এবং ত্বরিত হুকুম পালিত হয়। মোটকথা এভাবে কয়েকদিন পর্যন্ত হত্যা ও গ্রেফতারের

কার্য অব্যাহত থাকে। লোকদেরকে ঘর থেকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসা হতো এবং সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করা হতো। আমর ইব্‌ন সা'দ এবং শিমার প্রমুখের কর্তিত মস্তক মুখতার মুহাম্মদ ইব্‌নুল হানফিয়ার কাছে মদীনায় পাঠিয়ে দিয়েছিল।

মুখতার ছিল অত্যন্ত ধূর্ত ও ত্বরিৎকর্মা। কূফা দখল করার পর সে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের কাছে এই মর্মে একটি পত্র লিখে, 'আমি বর্তমানে কূফায় অবস্থান করছি। আমি অন্তর দিয়ে আনুগত্য ও আপনার খিলাফত স্বীকার করি। আপনি অনুগ্রহপূর্বক আমাকে কূফার গভর্নর পদটি দান করুন। কিন্তু আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের বুঝতে বাকি ছিল না যে, এই লোকটি তাকে ধোঁকা দিয়ে এবং নিজের দিক থেকে তাকে অন্যমনস্ক রেখে রাষ্ট্রক্ষমতা করায়ত্ত করতে চাচ্ছে। তিনি মুখতারের আনুগত্য যাচাই করার জন্য আমর ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন হারস মাখযূমীকে কূফার গভর্নর পদে নিয়োগ করে পাঠান। মুখতার যখন এ সংবাদ জানতে পারে তখন যায়দ ইব্‌ন কুদামাকে সত্তর হাজার দিরহাম দিয়ে পাঁচশ অশ্বারোহী সৈন্যসহ এই বলে পাঠায় যে, তুমি পথিমধ্যেই আমর ইব্‌ন আবদুর রহমানকে রুখবে এবং তাকে এই অর্থ দিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দেবে। যদি সে ফেরত যেতে অস্বীকার করে তাহলে তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসবে। আমর ইব্‌ন আবদুর রহমান প্রথমে ফিরে যেতে অস্বীকার করেন। কিন্তু যখন দেখেন যে, যায়দের সাথে পাঁচশ অশ্বারোহী যোদ্ধা রয়েছে তখন সত্তর হাজার দিরহাম গ্রহণ করাকেই সমীচীন মনে করেন এবং ঐ অর্থ নিয়ে বসরায় চলে যান। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুতীও বসরায় চলে গিয়েছিলেন। এবার আমর ইব্‌ন আবদুর রহমানও সেই বসরার দিকে যাত্রা করলেন, যেখানে হারস ইব্‌ন আবী রাবীআ কর্তৃত্ব করছিল।

মুখতারের নবুয়ত দাবি এবং আলী (রা)-এর সিংহাসন

হযরত আলী (রা) যখন কূফায় অবস্থান করছিলেন তখন তাঁর একটি কুরসী (চেয়ার) ছিল। এর উপর উপবেশন করেই তিনি তাঁর বেশির ভাগ হুকুম-আহকাম জারি করতেন। তাঁর এক ভাগ্নে জা'দা ইব্‌ন উম্মে হানী বিন্‌তে আবূ তালিব কূফায় বাস করত। ঐ কুরসীটি তারই দখলে ছিল। মুখতার কূফায় নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার পর কুরসীটি হস্তগত করার চেষ্টা চালায়। জা'দা তখন বলে, আমাকে এক সপ্তাহের সময় দিন। আমি তা খুঁজে বের করে আপনার ঘরে পৌঁছিয়ে দেব। মুখতার উত্তরে বলে, আমি কখনো তিন দিনের বেশি সময় দেব না। তুমি এর মধ্যে তা আমার হাতে পৌঁছিয়ে না দিলে আমি তোমার সাথে কঠোর ব্যবহার করব।

জা'দার মহল্লায় এক তেল বিক্রেতা বাস করত। তার কাছেও এ ধরনের একটি কুরসী ছিল। জা'দা ঐ কুরসীটি তার কাছ থেকে ক্রয় করে অতি সংগোপনে নিজের ঘরে নিয়ে আসে। এরপর তা খুব ভালভাবে পরিষ্কার করে অত্যন্ত যত্ন ও সতর্কতার সাথে কম্বল দিয়ে মুড়িয়ে মুখতারের কাছে নিয়ে আসে। সে জা'দার কাছ থেকে কুরসীটি গ্রহণ করে তাকে নানাভাবে পুরস্কৃত ও সম্মানিত করে। সে কুরসীটি প্রথমে চুম্বন করে। এরপর সেটা সামনে রেখে দু'রাকাআত নফল নামায আদায় করে। এবার সে তার মুরীদ ও ভক্তদের একত্র করে বলে, আল্লাহ্ তা'আলা যেমন বনী ইসরাঈলের (সাহায্য, বরকত ও কল্যাণ)-এর নিদর্শন হিসাবে

'তাবূতে সাকীনা' (প্রশান্তিকর সিন্দুক) দান করেছিলেন তেমনি 'শীআনে আলী'-এর জন্যও নিদর্শন হিসাবে এই কুরসীটি দান করেছেন। এখন প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমার জয় অবশ্যম্ভাবী।' তখন তার মুরীদ ও ভক্তরা শ্রদ্ধাভরে কুরসী চুম্বন করে। এরপর মুখতার তার ভক্তদের একটি সিন্দুক তৈরির নির্দেশ দেয়। অতএব একটি সুন্দর সিন্দুক তৈরি করা হয় এবং তার ভিতর রাখা হয় ঐ কুরসী। সিন্দুকে রৌপ্য নির্মিত একটি তালা লাগানো হয় এবং তা পাহারা দেওয়ার জন্য কয়েকজন পাহারাদার নিযুক্ত করা হয়। এরপর কূফার জামে মসজিদে সিন্দুকটি স্থাপন করা হয়। নামাযান্তে প্রত্যেক ব্যক্তি সেটা চুম্বন করতো। কূফায় হুকুমত প্রতিষ্ঠার পূর্বেই মুখতার তার প্রতারণার জাল বিস্তার করে এবং ছলচাতুরী দ্বারা অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করে জনসাধারণকে নিজের ভক্তে পরিণত করার প্রচেষ্টা শুরু করে দিয়েছিল। কূফার হুকুমত লাভ করার পর তার চাতুর্য ও দূরদর্শিতা যেন ষোলকলায় গিয়ে পৌঁছে এবং ধীরে ধীরে সে নবুয়তের দাবি উত্থাপনের কথাও চিন্তা করতে থাকে।

সে সময়ে মুখতার কূফা দখল করে এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়রের কাছে উল্লিখিত চিঠি লিখে তার সামান্য কিছুদিন পর আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান আবদুল মালিক ইব্ন হারসকে একটি বাহিনীসহ ওয়াদিউল কুরা'-এর দিকে প্রেরণ করেন। এটা যেন ছিল আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ানের পক্ষ থেকে আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়রের উপর প্রথম আক্রমণ। এই আক্রমণের সংবাদ শুনে মুখতার ইব্ন যুবায়রের কাছে আর একটি পত্র লিখে। তাতে সে বলে, যদি আপনি চান তাহলে আপনার সাহায্যের জন্য আমি কূফা থেকে সৈন্যবাহিনী পাঠাব। ইব্ন যুবায়র উত্তরে লিখেন, যদি তুমি আমার অনুগত হিসাবে সেনাবাহিনী পাঠাতে চাও তাহলে অবিলম্বে 'ওয়াদিল কুরা'-এর দিকে একটি বাহিনী পাঠিয়ে দাও। মুখতার শুরাহবিল ইব্ন দাওস হামদানীকে তিন হাজার সৈন্যের একটি বাহিনীর অধিনায়ক নিয়োগ করে এবং তাকে নির্দেশ দেয়, তুমি সোজা মদীনায় চলে যাও এবং সেখানে অবস্থান কর। তারপর সেখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাকে অবহিত কর। এরপর আমি তোমাকে যে নির্দেশ দেব তাই পালন কর। এর দ্বারা মুখতার যে উদ্দেশ্য হাসিল করতে চাচ্ছিল তা ছিল এই যে, এই বাহানায় মদীনায় সৈন্য পাঠিয়ে সে মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়ার সন্তুষ্টি এমনভাবে অর্জন করবে যে, তাতে ইব্ন যুবায়রেরও কোন আপত্তি থাকবে না, অথচ 'শীআনে আলী'র এর উপর তার (মুখতারের) প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) মুখতারের এই সব চালাকি ভালভাবেই ধরতে পেরেছিলেন। তিনি মুখতারের কাছে উপরোক্ত জবাব পাঠিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আব্বাস ইব্ন সাহ্ল ইব্ন সাদের নেতৃত্বে দু'হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী ওয়াদিল কুরার দিকে প্রেরণ করেন। তিনি আব্বাসকে বলেন, যদি মুখতার কূফা থেকে কোন বাহিনী পাঠায় তাহলে প্রথমে জেনে নেবার চেষ্টা করবে, তারা আমার আজ্ঞাবহ হিসাবে এসেছে, না নিজেদের স্বার্থে। যদি তারা আমার আজ্ঞাবহ হিসাবে এসে থাকে তাহলে তাদেরকে কাজে নিয়োজিত করবে। আর যদি তারা নিজেদের স্বার্থে এসে থাকে তাহলে তাদেরকে ফিরিয়ে দেবে। আর যদি তারা ফিরে যেতে অস্বীকার করে তাহলে তাদের মুকাবিলা করবে। 'আকীম' নামক স্থানে আব্বাসের সাথে শুরাহ্বিলের সাক্ষাত হয়। আব্বাস তখন বলেন, শত্রুর মুকাবিলা করার জন্য তোমরা আমার সাথে ওয়াদিউল কুরার

দিকে চল। শুরাহ্বিল উত্তর দেয়, আমাদের তো সোজা মদীনায় যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেখানে পৌঁছার পর আমরা দ্বিতীয় নির্দেশের অপেক্ষা করব এবং তা পাওয়ার পর যেখানে যাবার সেখানে যাব। আব্বাস প্রথমে পানাহার সামগ্রী দিয়ে ঐ কূফীদের আতিথ্য প্রদর্শন করেন। এরপর যখন তারা তার নির্দেশ পালন করতে অস্বীকার করল তখন তিনি তার দু'হাজার সৈন্য নিয়ে শুরাহবিলের তিন হাজার সৈন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। সংঘর্ষে শুরাহবিলের সত্তর জন লোক নিহত হয় এবং অবশিষ্টরা কূফার দিকে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। মুখতার এই ঘটনা থেকেও নিজেদের স্বার্থোদ্ধারের চেষ্টা করে। সে এক পত্র মারফত মুহাম্মদ ইব্নুল হানাফিয়ার কাছে আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়রের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে বলে, আপনার হিফাযতের জন্য আমি যে বাহিনী পাঠিয়েছিলাম তা তিনি আপনার কাছে পৌঁছতে দেননি। এখন এটাই সমীচীন যে, আপনি আপনার একজন অতি বিশ্বস্ত দূতকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন, যাতে আমি তার সাথে একটি শক্তিশালী বাহিনী পাঠিয়ে দিতে পারি এবং এখানকার লোকেরাও আপনার বিশ্বস্ত দূতকে দেখে স্বস্তি লাভ করতে পারে। মুহাম্মদ ইব্নুল হানাফিয়া উত্তরে লেখেন, আমি তোমার সত্যপরায়ণতা সম্পর্কে অবহিত আছি। তুমি আমাকে পবিত্র পরিবেশে থাকতে দাও এবং আল্লাহ্র বান্দাদের রক্তপাত ঘটানো থেকে বিরত থাক। খিলাফত ও হুকুমতের প্রত্যাশী হলে আমি তোমার চাইতেও অধিক লোককে আমার চারপাশে জড় করতে পারতাম। কিন্তু খিলাফত ও হুকুমতের প্রতি আমার কোন আসক্তি নেই। আমি আমার অনুসারীদেরও এ থেকে সম্পূর্ণ নিরস্ত রেখেছি। স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলাই তাঁর মর্জিমতে এ বিষয়টির ফায়সালা করবেন।

উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদকে হত্যা

ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, হিজরী ৬৬ সনের (৬৮৬ খ্রি) ঈদুল আযহার দিনে বাবিলের যুদ্ধক্ষেত্রে কূফীদের হাতে সিরীয়রা পরাজিত হয়। কিন্তু কূফী সেনাপতি ইব্ন যিয়াদের আগমন সংবাদ শুনে তারা (কূফীরা) সেখান থেকে পিছনে হটে আসে। এই খবর পেয়ে মুখতার তার প্রধান সেনাপতি ইবরাহীম-ইব্ন মালিক ইব্ন আশতারকে সাত হাজার সৈন্যসহ সিরীয়দের মুকাবিলায় প্রেরণ করেন। কিন্তু ইবরাহীমকে পথিমধ্য থেকেই কূফায় ফিরে আসতে হয়েছিল। এরপর কূফায় অনেক লোককে হত্যা করা হয়। শীআনে আলীর বিরোধী অথবা শীআনে আলী ব্যতীত যে সমস্ত লোক ছিল তাদেরকে একেবারে শেষ করে ফেলা হয়। ফলে ভবিষ্যতে এ ধরনের আশংকার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। এই অভিযান শেষ করে মুখতার হিজরী ৬৬ সনের ২২শে যিলহজ্জ (জুলাই ৬৮৫ খ্রি) ইবরাহীমকে পুনরায় ইব্ন যিয়াদের মুকাবিলায় প্রেরণ করেন। এবার যেহেতু কূফায় বিদ্রোহের কোন আশংকা ছিল না এবং জনসাধারণ আক্রান্ত ভীত-সন্ত্রস্ত ছিল তাই ইবরাহীমের সাথে সকল বড় বড় সরদার এবং নামকরা বীরযোদ্ধা দেরকেও পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সাথে সেই তাবূতও (সিন্দুক) প্রেরণ করা হয়, যার মধ্যে 'কুরসীয়ে আলী' সংরক্ষিত ছিল। তা পাঠানোর উদ্দেশ্য ছিল, যাতে সেনাবাহিনী প্রথম থেকেই তাদের বিজয় সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে যায়।

ইবরাহীম অত্যন্ত দ্রুততার সাথে ইরাক সীমান্ত পেরিয়ে মাওসিল সীমান্তে প্রবেশ করেন, যেখানে উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদ আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ানের পক্ষ থেকে গভর্নর হিসাবে

নিয়োজিত ছিল। ইব্‌ন যিয়াদ ইবরাহীমের আগমন সংবাদ শুনে মাওসিল থেকে রওয়ানা হয়। উভয় বাহিনী খারিয নদী সংলগ্ন একটি প্রান্তরে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে শিবির স্থাপন করে এবং পরদিন ফজরের নামায পড়ার সাথে সাথে একে অন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এক ভয়ংকর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। প্রথম দিকে কূফীদের পরাজয়ের চিহ্ন ফুটে ওঠে, কিন্তু ইবরাহীমের বীরত্ব ও দৃঢ়তা তাদের পুনরায় চাংগা করে তুলে। উভয় পক্ষের অধিনায়করা চমৎকার বীরত্ব প্রদর্শন করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সিরীয়রা পরাজিত হয় এবং তাদের প্রধান সেনাপতি উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদ নিহত হয়। তার সাথে সিরীয়দের অপর বিখ্যাত অধিনায়ক হুসাইন ইব্‌ন নুমায়রও শারীক ইব্‌ন জাদীর তাগলাবীর হাতে নিহত হয়। যুদ্ধ শেষে ইবরাহীম ইব্‌ন মালিক বলেন, নদীর কূলে প্রতিপক্ষের পতাকার নিচে আমি এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছি যার পোশাক থেকে মৃগনাভির সুগন্ধ আসছিল। আমার তরবারি তাকে একেবারে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলেছে। তোমরা গিয়ে দেখ সে কে? লোকেরা সেখানে গিয়ে লাশ দেখার পর জানতে পারল, ঐ ব্যক্তি উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদ। অতএব তার দেহ থেকে মস্তক ছিন্ন করা হলো এবং বাকি দেহ পুড়িয়ে ফেলা হলো। মুখতারের কাছে বিজয় সংবাদ পাঠানো হলো এবং সেই সাথে পাঠানো হলো উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদের ছিন্ন মস্তকও।

নাজ্‌দাহ ইব্‌ন আমের কর্তৃক ইয়ামামা দখল

নাজদাহ ইব্‌ন আমের ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন মুফরিহ ইয়ামামা অঞ্চলে হিজরী ৬৫ সন (৬৮৪ থেকে ৮৫ খ্রি) অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে রেখেছিল। কিন্তু সে ইচ্ছাপূর্বক আপন বাহিনীর নেতৃত্ব নিজে গ্রহণ না করে আবূ তালূত নামীয় এক ব্যক্তির হাতে সমর্পণ করেছিল। ৬৫ হিজরীতে (৬৮৪-৮৫ খ্রি) ঐ দলটির খুব একটা পরিচিতি বা প্রভাব ছিল না। তারা তখন শুধু বিভিন্ন কাফেলার উপর আক্রমণ চালাত এবং ধনসম্পদ লুটে নিত। ৬৬ হিজরীতে (৬৮৫-৮৬ খ্রি) তারা এতটা ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে যে, বিভিন্ন শহরেও লুটপাট শুরু করে। এবার নাজদাহ আবূ তালূতকে পদচ্যুত করে নিজেই আপন দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করে এবং হিজরী ৬৬ সনের শেষের দিকে ইয়ামামা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের একচ্ছত্র শাসক হয়ে বসে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নুয যুবায়র (রা) ঐ সময়ে ইয়ামামার দিকে কোন সৈন্য পাঠাতে পারেন নি। কেননা সিরিয়া ও ইরাক সমস্যা নিয়ে তিনি তখন এতই ব্যস্ত ছিলেন যে, অন্য কোন অঞ্চলের দিকে নজর দেওয়ার মত অবকাশ তাঁর ছিল না। ফলে ৬৯ অথবা ৭০ হিজরী (৬৮৮-৮৯ অথবা ৬৮৯-৯০ খ্রি) পর্যন্ত ইয়ামামা নাজ্‌দার কর্তৃত্বাধীনে থাকে।

কূফা আক্রমণের প্রস্তুতি

৬৪ হিজরীতে (৬৮৩-৮৪ খ্রি) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা)-কে মোটামুটিভাবে সমগ্র ইসলামী বিশ্ব খলীফা বলে স্বীকার করত। কিন্তু ঐ বছরই মিসর, ফিলিস্তীন এবং সমগ্র সিরিয়া অঞ্চল তাঁর খিলাফতের আওতা থেকে বের হয়ে যায় এবং দামিশ্‌কে বনূ উমাইয়ার খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। ৬৫ হিজরীতে (৬৮৪-৮৫ খ্রি.) কোন কোন প্রদেশে বিদ্রোহ দেখা দেয়। তবে খলীফা হিসাবে তাঁর প্রতি সাধারণ স্বীকৃতি অব্যাহত থাকে এবং কোন প্রদেশই তাঁর কবজা থেকে বের হয়ে যায়নি। কিন্তু ৬৬ হিজরীতে কূফা ও ইয়ামামা উভয় অঞ্চলই তাঁর কবজা

থেকে বের হয়ে যায়। কূফায় মুখতার এবং ইয়ামামায় নাজদাহ্ নিজ নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। তখন পর্যন্ত বসরাকে হারস্ ইব্ন রাবীআ এবং পারস্যকে মুহাল্লাব ইব্ন আবী সুফরা সামলে রেখেছিলেন। খারিজীরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা মাত্র তারা কঠোর হস্তে তা দমন করতেন। মুখতারের পক্ষ থেকে বসরায় প্রতিপক্ষকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করা হচ্ছিল। তখন সেখানে কূফার প্রাক্তন গভর্নর আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুতী এবং প্রস্তাবিত গভর্নর আমর ইব্ন আবদুর রহমানও অবস্থান করছিলেন। এরা উভয়েই আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়রের কাছে লজ্জিত ছিলেন। তাই বসরায় এ দু'জনের উপস্থিতি আশংকার কারণ ছিল এজন্য যে, কোন না কোন ষড়যন্ত্রে এদেরও ফেঁসে যাওয়ার আশংকা ছিল। যখন ইব্ন যুবায়র (রা) শুনতে পেলেন যে, উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদ ইবরাহীম ইব্ন মালিকের হাতে নিহত হয়েছে তখন তিনি সিরিয়াবাসী ও আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ানের পক্ষ থেকে কিছুটা স্বস্তি লাভ করেন এই ভেবে যে, তাদের ক্ষমতায় একটি বিরাট আঘাত এসেছে বিধায় তারা বর্তমানে হিজাযের উপর হামলা করার সাহস পাবে না। কিন্তু বসরার ব্যাপারে তাঁর আশংকা বেড়ে যায়। কেননা সাম্প্রতিক বিজয় লাভের পর মুখতার এবার বসরার দিকে হাত বাড়াতে পারে। তাই তিনি বসরার শাসনকর্তা হারস্ ইব্ন রাবীআকে অবিলম্বে পদচ্যুত করে তার স্থলে আপন ভাই মুসআবকে বসরার গভর্নর নিয়োগ করেন।

তখন মুখতারের ভয়ে অনেক লোক কূফা থেকে পলায়ন করে বসরায় এসে জড় হয়েছিল। এরা ছিল ঐ সমস্ত লোক, যাদের আশংকা ছিল যে, মুখতার হুসাইন-হত্যার প্রতিশোধ নিতে গিয়ে হয়ত তাদেরকেও হত্যা করবে। মাফরূর ইব্ন শীস ইব্ন রিব্য়ী এবং মুহাম্মদ ইব্ন আশআছ ছিলেন ঐ পলাতকদের অন্যতম। মুস্আব ইব্ন যুবায়র বসরার শাসনভার গ্রহণ করে পূর্বাপর পরিস্থিতি গভীরভাবে পর্যালোচনা করেন। কূফা থেকে আগতদের মধ্যে অনেক অভিজ্ঞ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিও ছিলেন। তারা মুসআবকে অবিলম্বে কূফা আক্রমণের পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, আমাকে আমীরুল মু'মিনীন আবদুল্লাহ্ (রা) নির্দেশ দিয়েছেন, যেন আমি মুহাল্লাবকে সঙ্গে না নিয়ে কূফা আক্রমণ না করি। অতএব সর্বাগ্রে পারস্য থেকে মুহাল্লাবকে ডেকে পাঠানোর প্রয়োজন। যাহোক মুসআব একটি পত্র লিখে মুহাম্মদ ইব্ন আশআছের মাধ্যমে তা মুহাল্লাবের কাছে পাঠিয়ে দেন। মুহাল্লাব তাকে দেখে মন্তব্য করেন, মুসআব তোমাকে ছাড়া কি আর কোন দূত পান নি। মুহাম্মদ বলেন, আমি নিজেই ইচ্ছা করে এসেছি, যাতে কূফার অবস্থা সম্পর্কে আপনাকে সরাসরি অবহিত করতে পারি। (কূফার বর্তমান অবস্থা এই যে) গোলামের বাচ্চারা আমাদের যাবতীয় সহায়-সম্পদ ও ঘরবাড়ি দখল করে নিয়েছে এবং আমরা বিপন্ন অবস্থায় বসরায় পালিয়ে এসেছি। আমি আপনার কাছে ফরিয়াদ করছি, আল্লাহ্র দিকে চেয়ে আমাদের সাহায্য করুন এবং এই কঠিন বিপদ থেকে উদ্ধার করুন।

মুহাল্লাব পারস্য প্রদেশের শাসন-ক্ষমতা আপন পুত্র মুগীরার হাতে অর্পণ করেন এবং সেখানকার যাবতীয় সন্তোষজনক ব্যবস্থা করে যথেষ্ট সম্পদ ও একটি শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে রওয়ানা হন এবং অতর্কিতে বসরায় এসে মুসআবের সাথে মিলিত হন। মুহাল্লাবের কাছে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়রেরও একটি চিঠি এসে পৌঁছেছিল। তাতে লেখা ছিল, 'তুমি বসরায় এসে মুসআবের সাথে মিলিত হও এবং কূফা আক্রমণ কর। মুহাল্লাব কিছুটা ইতস্তত

করছিলেন বিধায় মুসআবকেও বসরা থেকে তার কাছে একজন দূত পাঠাতে হয়েছিল। ইব্ন যুবায়র (রা) কূফা আক্রমণের ব্যাপারে হয়ত আরো কিছুটা চিন্তাভাবনা করতেন, কিন্তু মুখতারের বাড়াবাড়ির কারণে তিনি সেই অবকাশ আর পান নি। মুখতার কূফায় বিপুল সংখ্যক লোক হত্যা করে। সে এ কথাও প্রচার করে দেয় যে, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তার কাছে জিবরীল ফেরেশতা ওহী নিয়ে আসেন এবং সে একজন নবী হিসাবে প্রেরিত হয়েছে। তার এ ঘোষণার পর জনসাধারণ শহর ছেড়ে পলায়ন করে। তাদের মধ্যে কিছু লোক বসরায় যায়, কিছু লোক সরাসরি হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়রের কাছে গিয়ে পৌঁছে এবং মুখতারের নবুয়তের দাবি ও তার অকথ্য জুলুম-নির্যাতন সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করে। তিনি মুখতারের নবুয়ত দাবির কথা অবগত হয়ে তাকে দমনের ব্যাপারে আর ইতস্তত না করে সঙ্গে সঙ্গে মুহাল্লাবকে চিঠি লিখেন এবং মুসআবকেও সতর্ক করে দেন, মুহাল্লাব বসরায় এসে না পৌঁছা পর্যন্ত তিনি যেন কূফা আক্রমণ না করেন।

মুখতারকে হত্যা ও কূফা দখল

মুহাল্লাব বসরায় এসে পৌঁছুলে মুসআব ইব্ন যুবায়র তাকে সমগ্র সেনাবাহিনী ঢেলে সাজাবার নির্দেশ দেন। তিনি আবদুর রহমান ইব্ন আহ্নাফকে কূফায় পাঠান এবং নির্দেশ দেন ঃ তুমি সেখানে গিয়ে অবস্থান কর এবং গোপনে জনসাধারণের কাছ থেকে আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়রের জন্য বায়আত গ্রহণ কর। তিনি আব্বাদ ইব্ন হুসাইন হাতামী তামীমীকে মুকাদ্দিমাতুল জায়শ তথা অগ্রবর্তী বাহিনীর, আমর ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মা'মারকে ডান পাশের বাহিনীর এবং মুহাল্লাব ইব্ন আবূ সুফরাকে বাম পাশের বাহিনীর অধিনায়ক নিয়োগ করেন। আর মধ্যবর্তী বাহিনীর অধিনায়কত্ব নিজের হাতেই রাখেন। এভাবে সমগ্র বাহিনীকে সজ্জিত ও বিন্যস্ত করে তিনি বসরা থেকে কূফার দিকে রওয়ানা হন।

এই সংবাদ পেয়ে মুখতারও তার বাহিনী নিয়ে কূফা থেকে বের হয়। ঐ সময়ে ইবরাহীম ইব্ন মালিক মাওসিলের শাসনকর্তা ছিলেন। তাই তিনি বসরা হয়ে কূফায় আসতে পারেন নি। বসরা বাহিনীর মধ্যে একটি খণ্ড বাহিনী কূফা থেকে পালিয়ে আসা লোকদের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল। ঐ খণ্ড বাহিনীর অধিনায়কত্বে ছিলেন মুহাম্মদ ইব্ন আশআছ। 'মাদআয়া' নামক গ্রামের কাছে উভয় বাহিনীর মধ্যে মুকাবিলা হয়। এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর মুখতার পরাজিত হয়ে কূফার দিকে পলায়ন করে এবং সরকারী প্রাসাদকে সুদৃঢ় করে সেখানে অবরুদ্ধ হয়ে অবস্থান করে।

মুহাম্মদ ইব্ন আশআছ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়নকারীদের পশ্চাদ্ধাবন করেন এবং তাদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে যেতে থাকেন। মুসআব ইব্ন যুবায়র সরকারী প্রাসাদ অবরোধ করেন। এই অবরোধ বেশ কয়েকদিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রায় এক হাজার লোক মুখতারের সাথে অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিল। শেষ পর্যন্ত রসদ সামগ্রী ফুরিয়ে যাওয়ায় মুখতার দুর্গের বাইরে এসে প্রতিপক্ষের সাথে সরাসরি মুকাবিলার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু তার সঙ্গীরা তাকে বাধা দিয়ে বলে ঃ মুসআবের কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা কর এবং দরজা খুলে দাও। সম্ভবত তিনি তোমাকে নিরাপত্তা দান করবেন। কিন্তু মুখতার তাদের এই পরামর্শ অগ্রাহ্য

করে। সে মাথায় তেল ও কাপড়ে সুগন্ধি মেখে অস্ত্রসজ্জিত হয়ে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে পড়ে। মাত্র কয়েকজন লোক তার সাথে আসে এবং বাকিরা প্রাসাদের ভিতরেই থেকে যায়। মুখতার দুর্গ থেকে বের হয়ে প্রতিপক্ষের উপর হামলা চালায় এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন দাজাজাহ হানীফীর পুত্রদ্বয় তুরফা ও তাররাফের হাতে নিহত হয়।

মুখতার হিজরী ৬৭ সনের ১৪ই রমযান (৬৮৭ খ্রি এপ্রিল) মাসে নিহত হয়। তার সঙ্গীদের মধ্যে উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আলী ইব্ন আবী তালিবও মারা যান। যারা প্রাসাদের অভ্যন্তরে অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিল মুসআব তাদের বন্দী করেন। যুদ্ধক্ষেত্রে যারা বন্দী হয়েছিল তাদেরকেও কূফার অভ্যন্তরে নিয়ে আসা হয়। তারপর একটি প্রশস্ত জায়গায় তাদের সকলকে একত্র করে তাদের পরিণাম সম্পর্কে সলাপরামর্শ চলতে থাকে। মুহাল্লাব ইব্ন আবূ সুফরা অভিমত প্রকাশ করেন যে, এদের সকলকেই ছেড়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু মুহাম্মদ ইব্ন আশআছ এবং সমগ্র কূফী এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে।

এমতাবস্থায় মুসআব অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েন। কূফীরা বলছিল, এই সমস্ত লোক মুখতারের হাতে বায়আত করে এত বাড়াবাড়ি করেছে যে, কূফায় এমন কোন ঘর নেই যেখানে কেউ না কেউ তাদের হাতে মারা পড়েনি। এমতাবস্থায় যদি এদের ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে এখনি সমগ্র কূফায় বিদ্রোহ দেখা দিবে। ঐ লোকদের মোট সংখ্যা ছিল ছয় হাজার। তার মধ্যে মাত্র সাতশ লোক ছিল আরব এবং বাকি সবাই ইরানী। মুসআব শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেন, এদের সবাইকে হত্যা করা হবে। সঙ্গে সঙ্গে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয় এবং তাতে কূফাবাসীরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। মুসআব মুখতারের উভয় হাত দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে কূফার জামে মসজিদের দরজায় ঝুলিয়ে রাখেন। হাজ্জাজের শাসনকাল পর্যন্ত তা ঐভাবেই ঝুলন্ত ছিল।

মুসআব ইব্ন যুবায়র কূফার শাসনক্ষমতা হস্তগত করে ইবরাহীম ইব্ন মালিকের কাছে– যিনি মুখতারের পক্ষ থেকে মাওসিলের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন– এই মর্মে একটি পত্র পাঠান ঃ তুমি আমার বশ্যতা স্বীকার কর। তাহলে আমি তোমাকে সিরিয়ার শাসনকর্তা নিয়োগ করব। এই সাথে আমি এও অঙ্গীকার করছি যে, সিরিয়া থেকে পশ্চিম দিকে তুমি যতগুলো দেশ জয় করবে তার সবগুলোই তোমার জায়গীর হিসাবে গণ্য হবে। এদিকে মুখতারের নিহত হওয়ার সংবাদ শুনে আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান দামিশ্ক থেকে ইবরাহীমের কাছে এই মর্মে একটি পত্র প্রেরণ করেন ঃ তুমি আমার বশ্যতা স্বীকার কর। আমি তোমাকে ইরাকের শাসনকর্তৃত্ব দান করব এবং পূর্ব দিকে তুমি যতগুলো দেশ জয় করবে তার সবগুলোই তোমার শাসন কর্তৃত্বের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। উভয়পক্ষ থেকে একই ধরনের চিঠি ইবরাহীমের হাতে এসে পৌঁছে। তিনি কিছুটা ভেবেচিন্তে শেষ পর্যন্ত মুসআবকেই প্রাধান্য দেন এবং কূফায় এসে আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়রের খিলাফত স্বীকার করে নিয়ে মুসআবের হাতে বায়আত করেন। মুসআব তখন মুহাল্লাবকে মাওসিল ও জাযিরার গভর্নর নিয়োগ করেন এবং তার জায়গায় ইবরাহীমকে নিয়োগ করেন প্রধান সেনাপতি।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) যখন মুখতারের মৃত্যু এবং কূফায় আপন শাসন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সংবাদ পান তখন মুসআবকে কূফার গভর্নর নিয়োগ করে তার স্থলে নিজ

পুত্র হামযাকে বসরার গভর্নর নিয়োগ করেন। হামযার আচার-ব্যবহারে বসরাবাসীদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। তারা আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়রকে এই মর্মে বেশ কয়েকটি চিঠি লিখেনঃ আপনি হামযাকে পদচ্যুত করে তার স্থলে মুসআবকে বসরার গভর্নর নিয়োগ করুন। শেষ পর্যন্ত হিজরী ৬৮ সনে (৬৮৭-৮৮ খ্রি) আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র বসরার শাসনভারও মুসআবের হাতে অর্পণ করেন।

আমর ইব্ন সাইয়িদকে হত্যা

ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, ইব্ন হারসের সাথে মুকাবিলা এবং তাকে অবরোধ করতে ব্যর্থ হয়ে উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদ কিরকীসা থেকে ফিরে এসেছিল। যখন ইব্ন যিয়াদ নিহত হলো তখন আবদুল মালিক একটি বাহিনী গঠন করে ইরাক আক্রমণের সংকল্প নেন এবং সর্বপ্রথম কিরকীসার গভর্নর যুফার ইব্ন হারস কালবীকেই আক্রমণ করতে মনস্থ করেন। তিনি তার ভাগ্নে আব্দুর রহমান ইব্ন উম্মে হাকামকে দামেশ্‌কে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে খোদ আমর ইব্ন সাইয়িদ ইব্নুল আসকে সঙ্গে নিয়ে একটি শক্তিশালী বাহিনীসহ ইরাক অভিমুখে রওয়ানা হন। ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে, মারওয়ান ইব্নুল হাকামকে এই শর্তে খিলাফতের আসনে বসানো হয়েছিল যে, তার পরে খালিদ ইব্ন ইয়াযীদ এবং তাঁর পরে আমর ইব্ন সাইয়িদ খিলাফতের অধিকারী হবেন। কিন্তু মারওয়ান খালিদ ও আমর উভয়কে 'অলীআহ্‌দ' থেকে বরখাস্ত করে আপন পুত্রদ্বয় আবদুল মালিক ও আবদুল আযীযকে নতুনভাবে অলী আহ্‌দ নিয়োগ করেন।

আমর ইব্ন সাইয়িদ বনূ উমাইয়ার কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় ও সম্মানিত ছিলেন। তিনি ছিলেন নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে যথেষ্ট যোগ্যতার অধিকারী। মারওয়ানের পর যখন আবদুল মালিক খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হন তখন তিনি আমর ইব্ন সাইয়িদের সাথে এমন মধুর ব্যবহার করতে শুরু করেন যে, তাতে তার (আমরের) অন্তরের সব জ্বালা-যন্ত্রণা দূর হয়ে যায়। এবার যখন আবদুল মালিক সেনাবাহিনী নিয়ে কিরকীসা অভিমুখে রওয়ানা হন তখন আমর ইব্ন সাইয়িদ পথিমধ্যে তাকে বলেন, আপনি আমাকেই আপনার পরবর্তী খলীফা তথা 'অলীআহ্‌দ' নিয়োগ করুন। প্রকৃতপক্ষে তাকে এ ধরনের প্রতিশ্রুতি প্রথমেই দেওয়া হয়েছিল। এখন তিনি এর 'যথারীতি ঘোষণা' চাচ্ছিলেন মাত্র। কিন্তু আবদুল মালিক তার এই ইচ্ছা পূরণে অসম্মতি প্রকাশ করেন। এতে তার মনে খুব কষ্ট লাগে এবং তিনি সুযোগ বুঝে রাস্তা থেকেই দামিশকে ফিরে আসেন এবং এখানে এসেই আবদুর রহমানকে গভর্নর পদ থেকে সরিয়ে দিয়ে নিজেকেই খলীফা ঘোষণা করেন। তিনি জনসাধারণকে সমবেত করে একটি ভাষণ দেন, তাদের জন্য ভাতা নির্ধারণ করেন এবং তাদের সাথে সর্বদা ভাল ব্যবহার করবেন বলেও প্রতিশ্রুতি দেন। এই সংবাদ শুনে আবদুল মালিকও অবিলম্বে দামিশকে ফিরে আসেন এবং রাজধানী শহর ঘেরাও করে ফেলেন। দীর্ঘদিন পর্যন্ত সংঘর্ষ অব্যাহত থাকে। ফলে আবদুল মালিক অন্য কোন কাজে মনোযোগ দিতে পারেন নি। শেষ পর্যন্ত লোকেরা মধ্যস্থতা করে উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের ব্যবস্থা করে। চুক্তিপত্র লিপিবদ্ধ করা হয় এবং আমর ইব্ন সাইয়িদ শহর থেকে বেরিয়ে এসে আবদুল মালিকের সাথে সাক্ষাত করে তার হাতে দামেশ্‌কের কর্তৃত্বভার ন্যস্ত করেন। তার পক্ষ থেকে সব সময়ই আবদুল মালিকের মনে এক

ধরনের আশংকা বিরাজ করত। এবার তিনি ঐ আশংকা চিরতরে দূর করার উদ্দেশ্যে একদা তাকে সাক্ষাতের বাহানায় ডেকে পাঠান। আমর ইব্ন সাইয়িদ সরলমনে দরবারে এসে যথারীতি তার সম্মুখবর্তী আসন গ্রহণ করেন। আবদুল মালিক প্রথম থেকেই সেখানে কয়েকজন লোক মোতায়েন করে রেখেছিলেন। আমর ইব্ন সাইয়িদ আসন গ্রহণ করার পরপরই ওরা তাকে পাকড়াও করে সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করে।

আমরের ভাই ইয়াহ্ইয়ার কাছে এই সংবাদ পৌঁছলে তিনি এক হাজার সৈন্য নিয়ে আসেন এবং সরকারী প্রাসাদ ঘেরাও করে ফেলেন। আবদুল মালিক তখন আমর ইব্ন সাইয়িদের দেহ থেকে তার মস্তকটি বিচ্ছিন্ন করে ইয়াহ্ইয়ার দিকেই ছুঁড়ে মারেন এবং সেই সাথে ছুঁড়ে মারেন অসংখ্য স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা। তখন প্রতিপক্ষের লোকেরা স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। শুধু ইয়াহ্ইয়া অসহায় অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকেন। শেষ পর্যন্ত আবদুল মালিক তাকে গ্রেফতার করে ফেলেন। আমরের পুত্রদেরও গ্রেফতার করা হয়। মুসআব ইব্ন যুবায়র নিহত হওয়া পর্যন্ত এই সমস্ত লোক বন্দী জীবন যাপন করে। মুসআব নিহত হওয়ার পর ইরাকের উপর আবদুল মালিকের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। আমর ইব্ন সাইয়িদের হত্যার ঘটনা হিজরী ৩৫ (৬৫৫ খ্রি) সনে ঘটে।

মুসআব ইব্ন যুবায়রের অসতর্কতা

ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, কয়েক মাস এবং বড় জোর এক বছর হামযা ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র বসরার শাসনকর্তা ছিলেন। এরপর সেখানকার শাসন ব্যবস্থা মুসআবের হাতে ন্যস্ত করা হয়। মুসআব স্বয়ং বসরায় গিয়ে উমর ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মা'মারকে বসরায় আপন স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করেন এবং তাকে নির্দেশ দেন ঃ যদি প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে খারিজীদের মুকাবিলার জন্য তুমি স্বয়ং পারস্যে যাবে এবং বসরায় নিজের একজন প্রতিনিধি নিয়োগ করবে। মুসআব বসরার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যেও প্রয়োজন অনুযায়ী রদবদল করেন এবং কিছুদিন এখানে অবস্থান করার পর আপন মূল কর্মস্থল কূফায় চলে যান। কিন্তু হিজরী ৭০ সনে (৬৮৯-৯০ খ্রি) পারস্যে খারিজীদের ফিতনা এমনভাবে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে যে, মুগীরা ইব্ন মুহাল্লাব এবং উমর ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মা'মারের পক্ষে তা দমন করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। মুসআব মুহাল্লাবকে মাওসিলের শাসনকর্তার পদ থেকে বদলী করে পারস্যের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন এবং অবিলম্বে সেখানে গিয়ে খারিজীদের ফিতনা দমনের নির্দেশ দেন। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, খারিজীদের শায়েস্তা করার ক্ষেত্রে তখন মুহাল্লাবই ছিলেন যোগ্যতম ব্যক্তি। তবে তিনি মুসআবকে বলেন ঃ আমি তো পারস্যে যেতে রাযী আছি, কিন্তু বর্তমানে আমাকে মাওসিল থেকে সরানো আপনার জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর হবে। কেননা আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান ইরাকে একটি গোপন ষড়যন্ত্র জাল বিস্তার করে চলেছেন এবং আমি তার যাবতীয় চেষ্টা-তদবীর অত্যন্ত সতর্কতার সাথে লক্ষ্য করে আসছি। এমনও হতে পারে যে, আমর এখান থেকে চলে যাওয়ার পর তিনি তার ষড়যন্ত্র সফল করার একটা সুবর্ণ সুযোগ লাভ করেন।

মুসআব পারস্যের প্রয়োজনকে এই কল্পিত প্রয়োজনের উপর প্রাধান্য দেন। অতএব মুহাল্লাবকে বাধ্য হয়ে পারস্যের দিকে রওয়ানা হতে হয়। মুসআবের কাছে যে দুজন অভিজ্ঞ ও

প্রতাপশালী সমরনায়ক ছিলেন তারা হচ্ছেন ইবরাহীম ও মুহাল্লাব। তিনি এই দুজনের একজনকে নিজের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে ফেলেন। সেই সাথে তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আযিমকে খুরাসানের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন এবং আব্বাদ ইব্‌ন হুসাইনকেও মুহাল্লাবের সাথে খুরাসানে যাওয়ার নির্দেশ দেন। এ দুজনও ছিলেন অত্যন্ত নামকরা ও অভিজ্ঞ সমরনায়ক। এভাবে মুসআব ইব্‌ন যুবায়র সুযোগ্য ব্যক্তিদের নিজের কাছ থেকে পৃথক করে দূরে পাঠিয়ে দিলেন। কূফায় তার সাথে ছিলেন শুধু ইবরাহীম ইব্‌ন মালিক এবং বসরায় ছিলেন আমর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মা'মার।

আমর ইব্‌ন সাইয়িদকে হত্যার পর আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান নানা ধরনের ষড়যন্ত্রমূলক তদবীর শুরু করেন। তিনি পারস্যে নিজস্ব লোক পাঠিয়ে সেখানকার খারিজীদের আশা-ভরসা দিয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য তাদেরকে অনুপ্রাণিত করেন। এদিকে কূফা ও বসরায়ও তিনি নিজস্ব লোক পাঠিয়ে বনূ উমাইয়ার সমর্থকদের মাধ্যমে একটি ষড়যন্ত্র জাল বিস্তার করেন। মুসআবের সমর অধিনায়কদের কাছেও তিনি গোপনে পত্র লিখে তাদের নিজের দিকে প্রলুব্ধ করতে শুরু করেন। এমন কি মুহাল্লাব এবং ইবরাহীমকেও তিনি আপন দলে টানার চেষ্টা করেন। কিন্তু মুসআবের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার মত লোক তারা ছিলেন না। এ কারণেই মুহাল্লাব পারস্য অভিমুখে রওয়ানা হওয়ার সময় কিছুটা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন এবং তার সেই দুশ্চিন্তার কথা মুসআবের কাছে প্রকাশও করেছিলেন।

আবদুল মালিকের যুদ্ধ প্রস্তুতি

আবদুল মালিক গোপনে খালিদ ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন উসায়দকে বসরায় পাঠান, যেন তিনি সেখানে গিয়ে যে সমস্ত লোক আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের বিপক্ষে এবং বনূ উমাইয়ার পক্ষে রয়েছে তাদেরকে স্বমতে আনার চেষ্টা করেন। খালিদ বসরায় এসে প্রথমে বনূ বক্‌র ইব্‌ন ওয়াইল এবং আয্‌দ গোত্রের মধ্যে ষড়যন্ত্র জাল বিস্তার করেন এবং বিপুল সংখ্যক লোককে স্বমতে নিয়ে আসতে সক্ষম হন। উমর ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন মা'মারের কাছে এই সংবাদ পৌঁছলে তিনি খালিদের বিরুদ্ধে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। খালিদের সঙ্গীরা তাদের মুকাবিলা করলেও শেষ পর্যন্ত খালিদকে বসরা থেকে বের করে দেওয়া হয়।

বসরার এই সমস্ত ঘটনার সংবাদ যখন কূফায় গিয়ে পৌঁছে এবং মুসআব ইব্‌ন যুবায়র এখানকার অন্যান্য অবস্থা সম্পর্কেও অবহিত হন তখন তার পক্ষে নীরবে বসে থাকা মোটেই সম্ভব ছিল না। তিনি দ্রুত কূফা থেকে বসরায় চলে আসেন এবং খালিদের সংগীসাথী ও সমর্থকদের সমুচিত শাস্তি প্রদান করেন। তিনি কিছু লোককে জরিমানা করেন, আবার কারো কারো ঘরবাড়ি ধ্বংস করে দেন। অনুরূপভাবে কূফায়ও আবদুল মালিকের লোকেরা ভেতরে ভেতরে কাজ করছিল। এর ফলে শুধু সাধারণ লোকেরা নয়, বরং আত্তাব ইব্‌ন ওরাকা প্রমুখ অধিনায়কও গোপনে আবদুল মালিকের দলে ভিড়ে যেতে থাকেন।

একদিকে আবদুল মালিক যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু করেন এবং অন্যদিকে নানা প্রলোভন দেখিয়ে কূফা ও বসরার সৈন্যদের আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলেন। একদা

ইবরাহীম ইব্‌ন আশতারের কাছে আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ানের সীলমোহরকৃত একটি চিঠি আসে। ইবরাহীম জানতেন তাতে কি লেখা রয়েছে। তিনি খাম না খুলেই চিঠিটি মুসআবের সামনে পেশ করেন। মুসআব তা খুলে পড়েন। তাতে আবদুল মালিক ইবরাহীমকে লিখেছেন, 'তুমি আমার কাছে চলে আস। আমি তোমাকে সমগ্র ইরাকের গভর্নর করব।'

মুসআব ইবরাহীমকে বলেন, তোমার মত একজন লোক কি এসব কথায় প্রলুব্ধ হতে পারে? ইবরাহীম বলেন, আমি তো কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করব না। কিন্তু স্মরণ রাখবেন, আবদুল মালিক আপনার সকল অধিনায়কের কাছেই এ ধরনের চিঠি লিখেছেন। যদি আপনি আমার পরামর্শ গ্রহণ করেন তাহলে বলব, ঐ সব অধিনায়ককে হয় হত্যা করুন অথবা বন্দী করে রাখুন। মুসআব ইবরাহীমের ঐ মত পছন্দ করেন নি। তাই কোন অধিনায়ককে এজন্য পাকড়াও করা তো দূরের কথা, তিনি কাউকে কিছু জিজ্ঞেস পর্যন্ত করেন নি।

মুসআব ইব্‌ন যুবায়রকে হত্যা

আবদুল মালিক পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণের পর আপন বাহিনী নিয়ে সিরিয়া থেকে ইরাক অভিমুখে রওয়ানা হন। তিনি দামেশ্‌ক থেকে তখনি রওয়ানা হন যখন তার কাছে কূফার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা এই মর্মে অনেক চিঠি লিখেন যে, অবিলম্বে আপনার ইরাক আক্রমণ করা উচিত। আবদুল মালিকের উপদেষ্টারা রওয়ানা হওয়ার সময় তাকে বাধা দেন এই ভেবে যে, ইরাকী ও কূফীরা এই সব চিঠি তো সেরূপ হুজুগের বশবর্তী হয়েই লিখতে পারে যেরূপ তারা ইতিপূর্বে ইমাম হুসাইনের কাছে লিখেছিল। আবদুল মালিক উত্তরে বলেন, ইমাম হুসাইন তো শুধু কূফীদের উপর ভরসা করেই কূফায় রওয়ানা হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু আমি আমার সঙ্গে একটি শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে যাচ্ছি। কূফীরা যদি আমার সাথে বেঈমানী করে বা অবিশ্বস্ততার পরিচয় দেয় তাহলে তাতে আমার কোন ক্ষতি হবে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমার সাথে একটি শক্তিশালী বাহিনী দেখলে তাদের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার সাহসই থাকবে না।

শেষ পর্যন্ত আবদুল মালিক তার বাহিনী নিয়ে রওয়ানা হন। এদিকে তার আগমনের সংবাদ শুনে মুসআব ইব্‌ন যুবায়রও যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু করে দেন। যে মুহূর্তে আবদুল মালিকের আগমন সংবাদ কূফায় পৌঁছে তার পূর্বেই মুসআব উমর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মা'মারকে খারিজীদের মুকাবিলার জন্য বসরা থেকে পারস্যে প্রেরণ করেছিলেন। অতএব উমর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ঐ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নি। যা হোক 'দ্বারে জাসলীক'-এর নিকটবর্তী একটি প্রান্তরে উভয় বাহিনী মুখোমুখি অবস্থায় শিবির স্থাপন করে। মুসআবের বাহিনী ছিল অত্যন্ত ছোট। কেননা ঠিক রওয়ানা হওয়ার মুহূর্তে অনেক লোক নানা ছল-ছুঁতায় তার সাথে আসতে অস্বীকার করেছিল। আর যারা যুদ্ধক্ষেত্র পর্যন্ত এসেছিল তাদের মধ্যে বেশির ভাগ লোকেরই শত্রুপক্ষের সাথে যোগসাজশ ছিল এবং যুদ্ধ শুরু হওয়ার সাথে সাথে তারা শত্রুদলের সাথে মিশে যাবার ফন্দি আঁটছিল। যাহোক যুদ্ধ শুরু হলো। আবদুল মালিক তার সর্বশক্তি নিয়োগ করে প্রথমে শত্রুবাহিনীর ইবরাহীমের নেতৃত্বাধীন অংশের উপর হামলা চালান। কেননা ইবরাহীমকেই তিনি সবচেয়ে বেশি ভয় করতেন। আবদুল মালিকের ভাই মুহাম্মদ ইব্‌ন মারওয়ানের নেতৃত্বে ইবরাহীমের উপর হামলা চালানো হয়। উভয় পক্ষই অত্যন্ত বীরত্বের

পরিচয় দেয়। শেষ পর্যন্ত ইবরাহীম মুহম্মদকে পিছনে হটিয়ে দেন। মুহাম্মদকে পর্যুদস্ত হতে দেখে আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান সঙ্গে সঙ্গে উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াযীদকে তার সাহায্যের জন্য পাঠান। এবার দুইপক্ষ পুনরায় দৃঢ়তার সাথে একে অপরের মুকাবিলা করতে থাকে। এই সংঘর্ষে কুতায়বার পিতা মুসলিম ইব্‌ন আমর আল-বাহিলী নিহত হন।

ইবরাহীমের সামনে শত্রু সৈন্যের ভিড় লক্ষ্য করে তার সাহায্যের জন্য মুসআব ইব্‌ন যুবায়র আত্তাব ইব্‌ন ওয়ারাকাকে প্রেরণ করেন। কিন্তু আত্তাব যেহেতু এখানে আসার পূর্বেই গোপনে আবদুল মালিককে খলীফা বলে মেনে নেয়েছিলেন এবং সেজন্য বায়আতও করেছিলেন তাই পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী তিনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেন। ইবরাহীম চতুর্দিক থেকে শত্রুপরিবেষ্টিত হয়ে অত্যন্ত বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করতে করতে নিহত হন। তার নিহত হওয়ার সাথে সাথে আবদুল মালিক এবং তার বাহিনীর সাহস অনেক বৃদ্ধি পায় এবং তারা তাদের বিজয় সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে ওঠে।

মুসআব ইব্‌ন যুবায়র অন্যান্য অধিনায়ক এবং নিজের সঙ্গীদেরকে আগে বেড়ে আক্রমণ করতে বলেন, কিন্তু কেউই তার অবস্থান থেকে সামান্যমাত্র টলেনি। মুসআবের কথা যেন তাদের এক কান দিয়ে ঢুকে অন্য কান দিয়ে বেরিয়ে গেল। মুসআবের বাহিনীর মাত্র গোটা কয়েক লোক যুদ্ধক্ষেত্রে লড়ছিল, আর বাকি সবাই দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছিল।

কূফীদের এই বিশ্বাসঘাতকতা ছিল প্রকৃতপক্ষে তাদের ঐ বিশ্বাসঘাতকতার চাইতেও নির্মম, যা তারা ইমাম হুসাইনের সাথে করেছিল। কেননা ইব্‌ন যিয়াদ এবং তার বাহিনীর ভয়ে হয়ত তারা ইমাম হুসাইনের পক্ষ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল, কিন্তু মুসআবের পক্ষ ত্যাগের ক্ষেত্রে সে ধরনের কোন কারণই বিদ্যমান ছিল না। এটা ছিল তাদের দুষ্টামি, বিশ্বাসঘাতকতা ও উপকারীর অপকার করার জন্মগত প্রবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ। আবদুল মালিক মুসআবকে হত্যা করতে চাচ্ছিলেন না। তাই তিনি আপন ভাই মুহাম্মদকে মুসআবের কাছে এই বলে পাঠান ঃ

এখন আপনার বাহিনীর অবস্থা সম্পূর্ণ বিগড়ে গেছে। আপনি কোনমতেই জয়ী হতে পারবেন না। আমি আপনাকে নিরাপত্তা দিচ্ছি। আপনি এই নিরাপত্তা গ্রহণ করুন। কিন্তু মুসআব উত্তরে বলেন ঃ আমি আপনার নিরাপত্তা চাই না। আল্লাহ্‌র নিরাপত্তাই আমার জন্য যথেষ্ট। এরপর মুহাম্মদ মুসআবের পুত্র ঈসাকে বলেন, তোমাকে এবং তোমার পিতাকে আবদুল মালিক নিরাপত্তা দান করেছেন। ঈসা পিতার কাছে এসে একথা বললে তিনি উত্তরে বলেন, হ্যাঁ, আমার নিশ্চিত বিশ্বাস এই যে, সিরিয়াবাসী তাদের প্রতিশ্রুতি পালন করবে। অতএব তুমি ইচ্ছা করলে তাদের নিরাপত্তায় চলে যেতে পার। তখন ঈসা বলেন, আমি কুরায়শ বংশের মেয়েদের কখনো একথা বলার সুযোগ দেব না, ঈসা নিজের প্রাণ রক্ষার জন্য পিতার কাছ থেকে পৃথক হয়ে গেছে। মুসআব বলেন, তাহলে তুমি তোমার চাচা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের কাছে মক্কায় চলে যাও এবং তাঁর কাছে ইরাকবাসীদের এই বিশ্বাসঘাতকতার কথা বর্ণনা কর। আমাকে এখানেই রেখে যাও। আমি নিজেকে মৃতই ধরে নিয়েছি। ঈসা উত্তরে বলেন, আমি এসব কথা তাকে বলব না বরং আপনার জন্য এই মুহূর্তে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে সোজা বসরায় চলে যাওয়াই সমীচীন। সেখানকার লোক আপনার প্রতি সন্তুষ্ট এবং আপনার

একান্ত অনুগত। আপনি বসরায় পৌঁছে এর একটা প্রতিবিধান করতে পারবেন। অন্যথায় মক্কায় চলে যাবেন।

মুসআব উত্তরে বলেন, বৎস! এটা কখনো সম্ভব নয়। কেননা এরূপ করলে সমগ্র কুরায়শ বংশে আলোচিত হতে থাকবে যে, আমি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেছি। অতএব তুমি তোমার অন্তর থেকে সব ধরনের চিন্তাভাবনা মুছে ফেল এবং অবিলম্বে শত্রুকে আক্রমণ কর। একথা শোনামাত্র ঈসা তার সঙ্গীদের নিয়ে শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং শত শত শত্রুকে হত্যা করে মুসআবের চোখের সামনে নিজেও নিহত হন। এরপর আবদুল মালিক এগিয়ে এসে অত্যন্ত মিনতির সুরে মুসআবকে বলেন, আপনি এখনো যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে চলে যান, নয়ত আমার নিরাপত্তা গ্রহণ করুন। কিন্তু তিনি আবদুল মালিকের কথায় মোটেই কান দেন নি। সম্ভবত ঐ মুহূর্তটা ছিল আবদুল মালিকের জন্য অত্যন্ত চমকপ্রদ। কেননা তার গোপন ষড়যন্ত্র যে অত্যন্ত সার্থকভাবে ফলপ্রসূ হয়েছে এটা ছিল তারই স্পষ্ট প্রমাণ।

কূফীদের বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে বিদ্যমান ছিল, অথচ নিজেদের অধিনায়কের নির্দেশ অমান্য করে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে শুধু তামাশা দেখছিল। অপর দিকে মুসআব অবাক বিস্ময়ে এই দৃশ্য অবলোকন করছিলেন। যে বাহিনী তার ইংগিত পাওয়া মাত্র মারা অথবা মরার জন্য সদা প্রস্তুত থাকত তারাই আজ তার সাহায্যে মোটেই এগিয়ে আসছে না। কূফীরা মুসআব ও ইমাম হুসাইন উভয়ের হত্যাকাণ্ডে একই ধরনের অপরাধ করেছে। কিন্তু এ দু'টি অপরাধ সংঘটিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন আকারে। যেমন ওখানে ইমাম হুসাইন (রা) তাঁর শত্রুদের কাছে চাচ্ছিলেন, যেন তারা তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে মক্কা কিংবা দামিশকে কিংবা সীমান্তের দিকে চলে যাওয়ার অনুমতি দেয়, আর এখানে স্বয়ং মুসআবের শত্রু চাচ্ছে যেন তিনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে চলে যান। ওখানে ইমাম হুসাইনের শত্রুরা তাঁর কথায় কান দেয়নি, আর এখানে খোদ মুসআব তার শত্রুদের কথায় কান দিচ্ছেন না। শেষ পর্যন্ত উভয়কেই একই পরিণতি ভোগ করতে হয়।

ঈসা নিহত হওয়ার পর মুসআব আপন তাঁবুতে যান, মাথায় তেল এবং সারা দেহে সুগন্ধি মাখেন, এরপর তরবারি হাতে শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। মাত্র সাতজন লোক তখন তার সঙ্গী হয়েছিল। একে একে তারা সকলেই নিহত হয়। তিনি শত্রুদের উপর এমন দুর্বার আক্রমণ চালান যে, তাদের সারি ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত তিনি তীর, তরবারি ও বর্শার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে চেতনা হারিয়ে ফেলেন। সঙ্গে সঙ্গে সিরীয়রা তার দেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। কারবালার ঘটনার দশ বছর পর হিজরী ৭১ সনে (৬৯০-৯১ খ্রি) পুনরায় 'দ্বারে জাসলীকে' অনুরূপ মর্মান্তিক ঘটনারই পুনরাবৃত্তি হলো।

আবদুল মালিক যুদ্ধক্ষেত্রেই কূফী বাহিনীর কাছ থেকে বায়আত গ্রহণ করেন। এরপর সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে কূফার নিকটবর্তী নাখীলা নামক স্থানে ৪০ দিন অবস্থান করেন। কূফাবাসীদের পক্ষ থেকে তিনি পুরোপুরি আশ্বস্ত হয়ে শহরে প্রবেশ করেন। তিনি জামে মসজিদে খুতবা দেন, জনসাধারণের সাথে সদয় ব্যবহারের অঙ্গীকার করেন এবং তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের উপহার-উপঢৌকন দিয়ে সন্তুষ্ট করেন। এরপর তিনি পারস্য, খুরাসান, বসরা, আহওয়ায প্রভৃতি অঞ্চলের প্রশাসকদের কাছে চিঠি লিখেন যেন তারা তার নামে জনসাধারণের

কাছ থেকে বায়আত গ্রহণ করে। তিনি মুহাল্লাব ইব্ন আবূ সুফরাকেও তার পদে বহাল রাখেন। যাহোক, সকলেই আবদুল মালিকের খিলাফত স্বীকার করে নেয়। আর স্বীকার করা ছাড়া তাদের সামনে কোন বিকল্প পথও ছিল না। শুধু আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাযিম (যিনি তখন খুরাসানের একটি অংশের প্রশাসক ছিলেন) আবদুল মালিকের হাতে বায়আত করতে অস্বীকার করেন এবং কিছু দিনের মধ্যেই বাহরায়ন ইব্ন ওয়ারাকা সারিমীর হাতে নিহত হন।

আবদুল মালিক খালিদ ইব্ন উসায়দকে বসরার এবং আপন ভাই বশীরকে কূফার গভর্নর নিয়োগ করেন। মুসআব ইব্ন যুবায়রের কর্তিত মস্তক আবদুল মালিক কূফা থেকে দামিশ্‌কে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। মস্তকটি দামিশ্‌কে পৌঁছলে জনসাধারণ সেটাকে কেন্দ্র করে বিজয় উৎসব করতে চায়। কিন্তু আবদুল মালিকের স্ত্রী আতিকা বিন্‌ত ইয়াযীদ ইব্ন মুআবিয়া তা থেকে সকলকে নিরস্ত রাখেন এবং মস্তকটিকে গোসল দিয়ে দাফনের ব্যবস্থা করেন। মুহাল্লাবও আবদুল মালিকের বশ্যতা স্বীকার করে জনসাধারণের কাছ থেকে বায়আত গ্রহণ করেন।

যুফার ইব্ন হার্‌স ও আবদুল মালিক

কিরকীসা অবরোধ সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদ এবং অন্যান্য অধিনায়ক যুফার ইব্ন হারসকে পরাজিত করতে পারেন নি। অর্থাৎ তার সাথে প্রতিটি যুদ্ধে সিরীয় বাহিনীকে পরাজয়বরণ করতে হয়। এবার আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান যখন একটি বাহিনী নিয়ে ইরাকের দিকে রওয়ানা হন তখন আবান ইব্ন উতবা ইব্ন আবী মুঈতকে (যিনি হিম্‌সের গভর্নর ছিলেন) অপর একটি বাহিনী দিয়ে কিরকীসার দিকে প্রেরণ করেন এবং সেখানে পৌঁছে যুফার ইব্ন হার্‌সকে অবিলম্বে দমন করার নির্দেশ দেন। আবান সেখানে পৌঁছেই প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করেন। তখনো হারজিতের কোন ফয়সালা হয়নি এমনি সময় স্বয়ং আবদুল মালিকও একটি বিরাট বাহিনী নিয়ে সেখানে এসে পৌঁছেন এবং অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে কিরকীসা ঘেরাও করতে শুরু করেন। যুফার ইব্ন হার্‌স আপন পুত্র হুযায়লকে নির্দেশ দেন ঃ সিরীয় বাহিনীকে তাড়া কর এবং আবদুল মালিকের তাঁবু ধূলিসাৎ না করা পর্যন্ত ফিরে এস না। হুযায়ল পিতার হুকুম যথার্থভাবে পালন করেন এবং প্রতিপক্ষের উপর এমন জোরদার আক্রমণ পরিচালনা করেন যে, শেষ পর্যন্ত আবদুল মালিকের তাঁবু ধূলিসাৎ করে তবে ফিরে আসেন। আবদুল মালিক যখন দেখলেন যে, কিরকীসা জয় এবং যুফার ইব্ন হার্‌সকে পরাস্ত করা মোটেই সহজ কাজ নয় তখন তিনি তার কাছে এই মর্মে পয়গাম পাঠান ঃ তোমাকে এবং তোমার ছেলেদেরকে আমি নিরাপত্তা দান করছি। যে এলাকা বা যে পদ তুমি চাইবে তাই তোমাকে দেওয়া হবে।

উত্তরে যুফার বলে পাঠান, আমি এই শর্তে সন্ধি করতে প্রস্তুত আছি যে, এক বছর পর্যন্ত আমার কাছ থেকে বায়আত গ্রহণের আশা করবেন না এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়রের বিরুদ্ধে আমার সাহায্যও চাইবেন না। সন্ধিপত্র লেখার উপক্রম হয়েছে ঠিক সেই মুহূর্তে আবদুল মালিকের কাছে এই সংবাদ পৌঁছে যে, নগর প্রাচীরের চারটি টাওয়ার ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে সন্ধি করতে অস্বীকার করেন এবং নব উদ্যমে শহরের উপর এক

জোরদার হামলা চালান। কিন্তু তার ঐ হামলা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। যুফার তাকে এবং তার বাহিনীকে পশ্চাদপসরণে বাধ্য করেন এবং তাদেরকে তাড়িয়ে তাদের সেই পূর্বের অবস্থানে নিয়ে যান। এবার আবদুল মালিক দ্বিতীয়বারের মত যুফারের কাছে পয়গাম পাঠান ঃ আমি আপনার যাবতীয় শর্ত মেনে নিচ্ছি। তিনি উত্তর দেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র জীবিত থাকা অবস্থায় আমি অন্য কারো হাতে বায়আত করব না। সাথে সাথে আমাকে এ প্রতিশ্রুতিও দিতে হবে যে, আমাকে এবং আমার সঙ্গীদেরকে কোন অজুহাতেই পাকড়াও করা হবে না কিংবা আমাদের থেকে কোনরূপ প্রতিশোধও নেওয়া হবে না। আবদুল মালিক সব শর্তই মনজুর করেন এবং এই মর্মে একটি চুক্তিপত্র লিখে যুফারের কাছে পাঠিয়ে দেন। এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি আবদুল মালিকের কাছে আসেন নি। কেননা আমর ইব্ন সাইয়িদের ঘটনা তো সবারই জানা ছিল। শেষ পর্যন্ত আবদুল মালিক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর লাঠি, যা তখন তাঁর কাছে ছিল, যুফারের কাছে পাঠিয়ে দেন। তিনি এটাকে বিশ্বস্ততার একটি সন্তোষজনক জামানত মনে করে সঙ্গে সঙ্গে আবদুল মালিকের কাছে চলে আসেন। তিনি যুফারকে তাঁরই সমপর্যায়ের আসনে বসান এবং তার মেয়েকে মুসায়লামার স্ত্রী তথা আপন পুত্রবধূ হিসাবে গ্রহণ করেন।

মুসআব ইব্ন যুবায়রের হত্যা সংবাদ মক্কায় পৌঁছল

মক্কায় আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়রের কাছে যখন এই সংবাদ পৌঁছল যে, ইরাকীদের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে তার ভাই মুসআব নিহত হয়েছেন এবং সমগ্র ইরাক আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ানের অধিকারে চলে গেছে তখন তিনি সমগ্র মক্কাবাসীকে একত্র করে একটি ভাষণ দেন। তাতে তিনি বলেন ঃ

الحمد لله الذى له الخلق والامر يؤتى الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء -

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি সমগ্র সৃষ্টি ও আদেশের মালিক। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান করেন এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে নেন। তিনি যাকে ইচ্ছা পরাক্রমশালী করেন এবং যাকে ইচ্ছা হীন করেন।"

আপনাদের অবশ্যই জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ্ ঐ ব্যক্তিকে হীন করেন না, যে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, চাই সে যতই নিঃসংগ হোক। আর তিনি ঐ ব্যক্তিকে সম্মানিত করেন না, যার অভিভাবক হচ্ছে শয়তান, তার সাথে যত বেশি লোকই থাকুক। আপনাদের জেনে রাখা উচিত যে, আমাদের কাছে ইরাক থেকে এমন একটি সংবাদ এসেছে, যা একাধারে দুঃখজনক ও আনন্দদায়ক। অর্থাৎ আমাদের কাছে মুসআবের হত্যা সংবাদ এসেছে। আমরা আনন্দিত এজন্য যে, সে নিহত হয়ে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেছে। আর আমরা দুঃখিত এজন্য যে, বিপদের মুহূর্তে বন্ধুর বিদায় এমন একটি যন্ত্রণা, যা শুধু বন্ধুই হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করতে পারে। তবে সে সুস্থবুদ্ধি এবং ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সাথে নিজের দায়িত্ব পালন করে গেছে। মুসআব কে ছিল? সে ছিল আল্লাহ্‌র অন্যতম প্রিয় বান্দা এবং আমার অন্যতম সাহায্যকারী। আপনাদের অবশ্যই জেনে রাখা উচিত যে, ইরাকবাসী হচ্ছে অত্যন্ত

বিশ্বাসঘাতক ও কপট। তারা মুসআবের মাধ্যমে যে উপকার পেয়েছিল তা অতি অল্পমূল্যে বিক্রি করে দিয়েছে। মুসআব যদি নিহত হয়ে থাকে তাহলে তার বাপ-ভাইও তো নিহত হয়েছেন, যারা অত্যন্ত সৎ ও পুণ্যবান ছিলেন। আল্লাহ্র কসম! আমরা আমাদের শয্যায় সেভাবে মৃত্যুবরণ করব না, যেভাবে মৃত্যুবরণ করেছে আবুল 'আসের সন্তানেরা। আল্লাহ্র কসম! এদের কোন ব্যক্তি যুদ্ধ করে না জাহিলিয়া যুগে মারা গেছে, আর না ইসলামী যুগে। আর আমরা বর্শার আঘাতে ও তরবারির ছায়াতলে মৃত্যুবরণ করি। ভাইয়েরা, জেনে রাখুন, এই দুনিয়া ঐ মহাপরাক্রমশালী শাহানশাহের কাছ থেকে ঋণ হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে, যাঁর হুকুমত চিরদিন থাকবে এবং যার বাদশাহী কখনো বিলীন হয়ে যাবে না। অতএব দুনিয়া যদি আমাদের হাতে আসে তাহলে আমরা সেটাকে পথভ্রষ্ট, লাঞ্ছিত, কাঙ্গাল ও কমজাতের মত গ্রহণ করব না। আর দুনিয়া যদি আমাদের থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালিয়ে যায় তাহলে আমরা তার জন্য দুর্বল ও অসহায় লোকদের মত ক্রন্দন করব না। তোমাদের কাছে এই হচ্ছে আমার বক্তব্য। আমি আমার জন্য এবং তোমাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

আবদুল মালিক ও হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা)

ইরাক দখলের পর আবদুল মালিক উরওয়া ইব্ন উনায়ফকে ছয় হাজার সৈন্যের একটি বাহিনীসহ মদীনার দিকে প্রেরণ করেন এবং তাকে নির্দেশ দেন, তুমি মদীনার বাইরে অবস্থান করবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত আমার পরবর্তী নির্দেশ না পৌঁছবে ততক্ষণ মদীনার অভ্যন্তরে প্রবেশ করবে না। তখন হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়রের পক্ষ থেকে মদীনার শাসনকর্তা ছিলেন হার্স ইব্ন হাতিব। উরওয়ার নিকটবর্তী হওয়ার সংবাদ শুনে হার্স মদীনা থেকে চলে যান। উরওয়া একমাস পর্যন্ত মদীনার বাইরে অবস্থান করেন এবং কোনরূপ বাড়াবাড়ি না করে আবদুল মালিকের পরবর্তী নির্দেশ অনুযায়ী দামিশকে প্রত্যাবর্তন করেন। হার্স এরপর মদীনায় ফিরে আসেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র, সুলায়মান ইব্ন খালিদকে খায়বার ও ফাদাকের শাসক নিয়োগ করেছিলেন। আবদুল মালিক আবদুল মালিক ইব্ন হার্স ইব্ন হাকামকে চার হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী দিয়ে দামিশ্ক থেকে এই বলে রওয়ানা করেন যে, তুমি হিজায আক্রমণ করে সম্মুখ দিকে অগ্রসর হতে থাকবে। আবদুল মালিক ইব্ন হার্স ওয়াদিল কুরায় পৌঁছে অবস্থান গ্রহণ করেন এবং সেখান থেকে একটি বিরাট বাহিনীসহ ইব্ন কামকামকে খায়বারের দিকে প্রেরণ করেন এবং তাকে নির্দেশ দেন, 'তুমি রাতের বেলা অতর্কিতে সুলায়মানের উপর হামলা চালাবে।' এতে সুলায়মান বন্দী হয়ে নিহত হন এবং ইব্ন কামকাম খায়বারে অবস্থান নেন। হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা) হিজায আক্রমণের সংবাদ শুনে হার্স ইব্ন হাতিবকে পদচ্যুত করে তার স্থলে জাবির ইব্ন আসওয়াদ যুহরীকে মদীনার গভর্নর নিয়োগ করেন। জাবির মদীনায় পৌঁছে ছশ সৈন্যের একটি বাহিনীসহ আবূ বকর ইব্ন আবূ কায়সকে খায়বারের দিকে প্রেরণ করেন। ইব্ন কামকাম ও আবূ বকরের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইব্ন কামকাম পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন। তার সঙ্গীদের মধ্যে কেউ নিহত হয় এবং কেউ পালিয়ে গিয়ে প্রাণ রক্ষা করে।

আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ানের কাছে এই সংবাদ পৌঁছলে তিনি তারিক ইব্‌ন উমরকে একটি বাহিনীর অধিনায়ক নিয়োগ করে হিজায অভিযানে প্রেরণ করেন। তিনি তাকে নির্দেশ দেন, তুমি ওয়াদিল কুরা ও আয়লার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান নিয়ে যতটুকু সম্ভব ইব্‌ন যুবায়রের কর্মকর্তাদেরকে প্রতিহত করবে এবং হিজাযীদের মধ্যে আমাদের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছে তা সফল হওয়ার পূর্বেই পণ্ড করে দেবার চেষ্টা করবে। আবদুল মালিকের নির্দেশ অনুযায়ী তারিক হিজাযে গিয়ে অবস্থান নেন এবং একটি শক্তিশালী বাহিনী খায়বারের দিকে প্রেরণ করেন। সেখানে যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং আবূ বকর ইব্‌ন আবূ কায়স তার দুশ সঙ্গী-সাথীসহ যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন। তারিক খায়বারে গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করেন। জাবির ইব্‌ন আসওয়াদ এই সংবাদ শুনে মদীনা থেকে দু'হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী তারিকের মুকাবিলা করার জন্য খায়বারের দিকে প্রেরণ করেন। খায়বারের সন্নিকটে দুই বাহিনীর মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। তারিক জয়লাভ করেন এবং প্রতিপক্ষের যুদ্ধবন্দী ও আহতদের হত্যা করেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা) জাবির ইব্‌ন আসওয়াদকে পদচ্যুত করে তার স্থলে হিজরী ৭০ (৬৮৯ খ্রি) সনে তালহা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ওরফে 'তালহাতুন নিদা'কে মদীনার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। এরপর খায়বার অঞ্চল আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ানের কর্তৃত্বাধীনে চলে আসে এবং তালহা হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের পক্ষ থেকে মদীনা শাসন করতে থাকেন। দু'বছর পর্যন্ত উভয় পক্ষের মধ্যে আর কোন উল্লেখযোগ্য সংঘর্ষ হয়নি। তাই আবদুল মালিকের দৃষ্টি তখন ইরাক ও ইরানের দিকে নিবদ্ধ থাকে।

মক্কা অবরোধ

আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান সিরীয় নেতৃবৃন্দকে মক্কা আক্রমণে অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তারা সকলেই হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের মুকাবিলা করতে এবং তার পরিণাম স্বরূপ কা'বাঘরকে একটি যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করতে অস্বীকার করেন। আবদুল মালিক দামিশ্‌ক থেকে কূফায় যান। সেখানে তিনি হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফ সাকাফীকে একাজে উদ্বুদ্ধ করেন। হাজ্জাজ তিন হাজার সৈন্য সাথে নিয়ে ৭২ হিজরীর জুমাদাল-উলা (৬৯১ খ্রি অক্টোবর) মাসে কূফা থেকে রওয়ানা হন। তিনি মদীনা অতিক্রম করে আবদুল মালিকের নির্দেশ অনুযায়ী তাইফে গিয়ে পৌঁছেন এবং সেখানেই অবস্থান গ্রহণ করেন। সেখান থেকে তিনি তার অশ্বারোহীদেরকে প্রতিদিন আরাফার দিকে প্রেরণ করতেন। তারা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের অশ্বারোহীদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হতো এবং পুনরায় তাইফে ফিরে আসত। কয়েকমাস এভাবে অতিক্রান্ত হওয়ার পর হাজ্জাজ আবদুল মালিককে লিখেন, আমার সাহায্যের জন্য আরো কিছু সৈন্য প্রেরণ করুন এবং আমাকে এখান থেকে এগিয়ে গিয়ে মক্কা অবরোধের অনুমতি দিন।

আবদুল মালিক হাজ্জাজের আবেদন মনজুর করে তার সাহায্যের জন্য আরো পাঁচ হাজার সৈন্য প্রেরণ করেন এবং তারিককে লিখেন, তুমি প্রথমে মদীনা আক্রমণ কর এবং একাজ সম্পন্ন করে মক্কার দিকে যাও এবং হাজ্জাজকে সাহায্য কর। হাজ্জাজ রমযান মাসে মক্কা অবরোধ করে এবং আবূ কুবায়স পাহাড়ের উপর 'মিনজানীক' স্থাপন করে প্রস্তর বর্ষণ করতে

শুরু করে। এমতাবস্থায় মক্কাবাসীদের জন্য ঐ বছরের রমযান মাস ছিল একটি বিপদের মাস। তারা অবরোধের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে মক্কা ছেড়ে পালাতে শুরু করে। রমযান ও শাওয়ালের পর যিলকদ মাস আসে। কিন্তু মক্কাবাসীদের বিপদ ও অবরোধের কঠোরতা মোটেই হ্রাস পায়নি। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্নুয যুবায়র (রা) প্রতিদিন মুকাবিলায় যেতেন এবং অবরোধকারীদের পিছিয়ে দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। কিন্তু দিন দিন তার সঙ্গীদের সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে। সেই সাথে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে থাকে তাঁর সাফল্যের আশাও।

মক্কাবাসীরা একদিকে মক্কা থেকে বের হয়ে যাচ্ছিল এবং অপর দিকে রসদসামগ্রী দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠায় অবরুদ্ধদের উৎসাহ-উদ্দীপনাও ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছিল। ৭২ হিজরীর যিলকদ (৬৯২ খ্রি-এর এপ্রিল) মাসে তারিক আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়রের শাসনকর্তা তালহাতুন-নিদাকে মদীনা থেকে বের করে দেন এবং একজন সিরীয়কে তথাকার শাসনকর্তা নিয়োগ করে স্বয়ং পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে মক্কার দিকে রওয়ানা হন। এই বিরাট সাহায্য এসে পৌঁছায় হাজ্জাজের শক্তি অনেক বৃদ্ধি পায়। এই অবস্থায়ই যিলহজ্জ মাস শুরু হয় এবং দূর-দূরান্ত থেকে মুসলমানরা হজ্জ সম্পাদনের জন্য মক্কায় আসতে শুরু করে। আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) হাজ্জাজকে হজ্জ সম্পাদনের অনুমতি দিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু তিনি তাওয়াফও করেন নি এবং সাফা-মারওয়ার মধ্যে সাঈও করেন নি। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) আরাফার মাঠে যেতে চাইলে হাজ্জাজ বাধা দেন। তাই তিনি মক্কায়ই কুরবানী করেন। আরাফার মাঠে কোন ইমাম ছিলেন না। মোটকথা, ঐ বছর লোকেরা 'আরকানে হজ্জ' আদায় করতে পারে নি। হজ্জের দিনগুলোতেও হাজ্জাজ প্রস্তর বর্ষণ বন্ধ করেন নি। তাই কা'বাঘর তাওয়াফ করাও আংশকামুক্ত ছিল না। হাজীদের আগমনের কারণে মক্কায় দুর্ভিক্ষ আরো বেড়ে গিয়েছিল। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-ও ঐ বছর হজ্জ করতে এসেছিলেন। তিনি এই পরিস্থিতি লক্ষ্য করে হাজ্জাজের কাছে এই মর্মে একটি পয়গাম পাঠান ঃ হে আল্লাহ্র বান্দা! তুমি অন্তত এটুকু লক্ষ্য কর যে, লোকেরা দূর-দূরান্ত থেকে হজ্জ করতে এসেছে। তারা যাতে তাওয়াফ ও সাঈ করার সুযোগ পায় এবং হজ্জ সম্পাদন করতে পারে এ সময়টুকুর জন্যও তো প্রস্তর বর্ষণ বন্ধ রাখতে পার। এই পয়গামে এতটুকু কাজ হয় যে, হাজ্জাজ প্রস্তর বর্ষণ বন্ধ রাখেন। কিন্তু তিনি নিজে তাওয়াফ করেননি এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়রকেও আরাফার মাঠে যেতে দেননি। হজ্জের দিনগুলো অতিক্রান্ত হতেই হাজ্জাজের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয় যে, বাইরে থেকে আগত লোকেরা যেন অতিসত্বর নিজ নিজ শহর অভিমুখে যাত্রা করে। কেননা ইব্ন যুবায়রের উপর অবিলম্বে প্রস্তর বর্ষণ শুরু হবে। এই ঘোষণা শুনতেই বহিরাগতদের কাফেলা নিজ নিজ শহর অভিমুখে যাত্রা করে। সেই সাথে মক্কার অধিবাসীদের মধ্যে যারা অবশিষ্ট ছিল, তাদের অনেকেও আত্মরক্ষার জন্য মক্কা ছেড়ে চলে যায়।

হাজ্জাজ পুনরায় প্রস্তর বর্ষণ শুরু করেন। একটি বিরাট পাথর কা'বাঘরের ছাদের উপর পতিত হয় এবং তাতে ছাদ ভেঙ্গে পড়ে। ঐ পাথর পতিত হওয়ার সাথে সাথে আসমান থেকে বজ্রাঘাতের একটি বিকট শব্দ আসে। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ চমকায় এবং সমগ্র আসমান-যমীন অন্ধকারে ছেয়ে যায়। এতে হাজ্জাজের সৈন্যরা ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং প্রস্তরবর্ষণ বন্ধ করে দেয়। হাজ্জাজ লোকদেরকে সান্ত্বনা দেন এবং বলেন, এই বিদ্যুৎ এবং এই কড় কড় শব্দ

আমার সাহায্যের জন্য এসেছে। এটা আমার বিজয়ের চিহ্ন। তোমরা তোমাদের অন্তর থেকে ভয়ভীতি একেবারে মুছে ফেল। দু'দিন পর্যন্ত এই অন্ধকার বাকি থাকে এবং বজ্রাঘাতের শব্দের ভয়ে হাজ্জাজের বাহিনীতে ভয়ানক আতংক ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাচক্রে পরদিন পুনরায় বজ্রাঘাত হয় এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়রের বাহিনীর দু'জন লোকও সেই আতংকে মারা যায়। এতে হাজ্জাজ অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং তার বাহিনীর লোকদের মধ্যেও কিছুটা স্বস্তি ফিরে আসে। এবার স্বয়ং হাজ্জাজ নিজ হাতে মিনজানীকের মধ্যে পাথর ঢুকিয়ে তা নিক্ষেপ করতে শুরু করেন। এতে তার বাহিনীর লোকদের আতংক দূর হয়ে যায় এবং তারাও পুনরায় প্রস্তর বর্ষণ করতে থাকে।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) কা'বা ঘরে নামায পড়তেন এবং বিরাট বিরাট পাথর তার আশেপাশে এসে পতিত হতো। এই অবস্থায়ও আল্লাহ্র প্রতি তাঁর নিবিষ্টতা এবং তাঁর নামাযের বিনয় ও আন্তরিকতার মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য পরিলক্ষিত হতো না।

অবরোধ কঠোরভাবে অব্যাহত থাকে। মক্কার বাইরে থেকে কোন প্রকার সাহায্য এবং রসদ সামগ্রী আসতে পারত না। পরিস্থিতি শেষ পর্যন্ত এই পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ায় যে, ইব্ন যুবায়র (রা) নিজের ঘোড়াটি যবেহ্ করে তার গোশত লোকদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। তাঁর কাছে রসদসামগ্রী ও খেজুরের একটি ভাণ্ডার ছিল। তিনি তা থেকে শুধু এই পরিমাণ খাদ্য লোকদের মধ্যে বণ্টন করতেন, যাতে কোন মতে তাদের জীবন রক্ষা পায়। উদ্দেশ্য ছিল, যেন দীর্ঘদিন অবরোধকারীদের মুকাবিলা করা সম্ভব হয়। হাজ্জাজ যখন দেখেন যে, তার কোন কৌশলই কার্যকরী হচ্ছে না তখন তিনি ইব্ন যুবায়র (রা)-এর সঙ্গীদের কাছে পৃথক পৃথক 'আমান নামা' (নিরাপত্তাপত্র) লিখে পাঠাতে শুরু করেন। তার এই কৌশল ফলপ্রসূ হয় এবং বহুলোক ইব্ন যুবায়রের সঙ্গ ছেড়ে হাজ্জাজের কাছে চলে যায়। ফলে অতি সামান্য সংখ্যক লোকই তাঁর সঙ্গে থাকে। এমন কি, তাঁর আপন দুইপুত্র হামযা এবং হাবীবও পিতাকে ছেড়ে হাজ্জাজের কাছে চলে যান। অবশ্য তাঁর তৃতীয় পুত্র পিতার সঙ্গেই থাকেন এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বীরত্ব প্রদর্শন করে যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণ ত্যাগ করেন। যখন হাজার হাজার লোক ইব্ন যুবায়রের সঙ্গ ছেড়ে হাজ্জাজের কাছে চলে যায় এবং মাত্র গুটি কয়েক লোক তাঁর কাছে অবশিষ্ট থাকে তখন হাজ্জাজ আপন সৈন্যদেরকে একত্র করে নিম্নোক্ত ভাষণ দেন ঃ

"তোমরা নিশ্চয়ই আবদুল্লাহ্র শক্তি নিরূপণ করতে পেরেছ। প্রকৃতপক্ষে তাঁর সঙ্গীদের সংখ্যা এতই অল্প যে, তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তি যদি তাদের উপর এক এক মুষ্টি কংকর নিক্ষেপ করে তাহলেও তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আরো মজার ব্যাপার এই যে, তারা সকলেই ক্ষুধিত ও পিপাসার্ত। হে সিরীয় ও কূফী বাহাদুরেরা! সামনে এগিয়ে চল। ইব্ন যুবায়র এ দুনিয়ার আর মাত্র কয়েক মুহূর্তের মেহমান।"

এই ভাষণদানের পূর্বে হাজ্জাজ আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়রের কাছে একটি পত্র প্রেরণ করেছিলেন। তাতে তিনি লিখেছিলেন, "এখন আপনার কাছে আর কোন শক্তি বাকি থাকে নি। আপনি সব দিক দিয়েই এখন অসহায়। অতএব এটাই সঙ্গত যে, আপনি আমাদের নিরাপত্তায় চলে আসুন এবং আমীরুল মু'মিনীন আবদুল মালিকের হাতে বায়আত করুন। আপনার সাথে

অত্যন্ত সম্মানজনক আচরণ করা হবে এবং আপনার সব ইচ্ছাই পূরণ করা হবে। আমাকে আমীরুল মু'মিনীন এই নির্দেশই দিয়েছেন যে, আমি যেন আপনাকে যথাসম্ভব আপোস-মীমাংসার দিকে আকৃষ্ট করি এবং আপনার হত্যার ব্যাপারে মোটেই তাড়াহুড়া না করি।"

ইব্‌ন যুবায়র (রা)-এর শাহাদাত

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা) ঐ চিঠি পড়ে তাঁর মা আসমা বিন্‌ত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর কাছে যান এবং নিবেদন করেন ঃ

"আমায় সাথে এখন আর কোন লোক নেই। নামে মাত্র চার-পাঁচ জন আছে, যারা বাহ্যত আমাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত। আমার সাথে লোকেরা ঠিক সেরূপ প্রতারণামূলক আচরণ করেছে যেরূপ আচরণ করেছিল কূফীরা হুসাইন ইব্‌ন আলী (রা)-এর সাথে। কিন্তু তাঁর ছেলেরা যতক্ষণ জীবিত ছিল ততক্ষণ পিতার সামনে তরবারি নিয়ে শত্রুর মুকাবিলা করেছে। কিন্তু আমার ছেলেরাও ঐ ফাসিকের নিরাপত্তায় চলে গেছে। এখন হাজ্জাজ বলছে, তুমিও আমার নিরাপত্তায় এস। এরপর তুমি যা কিছু চাও আমি তোমাকে তাই দিতে রাযী আছি। শেষ পর্যন্ত আমি আপনার খিদমতে হাযির হয়েছি। আপনি এই মুহূর্তে আমাকে কি করতে বলেন?"

হযরত আসমা (রা) উত্তরে বলেন ঃ "তুমি তোমার ব্যাপার আমার চেয়ে ভালো বোঝ। যদি তুমি সত্যের উপর থাক এবং সত্যের দিকে মানুষকে আহবান করে থাক তাহলে একাজেই নিজেকে আগাগোড়া নিয়োজিত রাখ। তোমার সঙ্গীরা আল্লাহ্‌র পথে শাহাদাতবরণ করেছে। তুমিও এ পথে অটল থেকে শাহাদাতবরণ কর। আর যদি তুমি দুনিয়া লাভের সংকল্প করে থাক তাহলে তুমি খুবই অযোগ্য লোক। তুমি নিজেও ধ্বংস হয়েছ এবং তোমার সঙ্গী-সাথীদেরও ধ্বংস করেছ। আমার অভিমত এই যে, তুমি নিজেকে বনূ উমাইয়ার হাতে সঁপে দিও না। মৃত্যু তার নির্ধারিত সময়ে অবশ্যই এসে হাযির হবে। তোমাকে সুপুরুষের মত বাঁচতে হবে এবং সুপুরুষের মত মরতেও হবে। তোমার একথা, 'আমি সত্যের উপর ছিলাম এবং লোকেরা আমাকে ধোঁকা দিয়ে দুর্বল করে ফেলেছে'– এমনি একটি কথা যা পুণ্যবান লোকদের মুখে শোভা পায় না।"

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র তখন বলেন ঃ "আমার এই আশংকা যে, ওরা আমাকে হত্যা করার পর 'মুসলা' (দেহ থেকে বিভিন্ন অংগ-প্রত্যংগ কেটে বিচ্ছিন্ন করা) করবে এবং ফাঁসি কাষ্ঠেও ঝুলাবে।"

হযরত আসমা (রা) উত্তর দেন ঃ "বৎস! বকরী যখন যবেহ হয়ে যায় তখন কি সে একথার পরওয়া করে যে, তার দেহ থেকে চামড়া উপড়ে ফেলা হবে? তুমি যা কিছু করছ দূরদর্শিতার সাথে করে যাও এবং আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর।"

এবার আবদুল্লাহ্ (রা) মায়ের মাথায় চুমু খান এবং নিবেদন করেন ঃ আমারও ঐ একই মত ছিল যা আপনি ব্যক্ত করেছেন। আমার দুনিয়ার প্রতি আসক্তি ও দুনিয়ার হুকুমত লাভের কোন আকাঙ্ক্ষা ছিল না। আমি একাজটি বেছে নিয়েছিলাম শুধু এজন্য যে, লোকেরা আল্লাহ্

তা'আলার আদেশ যথাযথভাবে পালন করত না এবং নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকত না। যতক্ষণ আমার দেহে প্রাণ আছে ততক্ষণ আমি লড়ে যাব। আমি আপনার পরামর্শ গ্রহণ করা জরুরী মনে করেছি এবং আপনার উপদেশ আমার দৃষ্টিকে অনেক বেশি প্রসারিত করে দিয়েছে। আম্মাজান! আমি আজ অবশ্যই নিহত হব। আপনি কোন দুঃখ করবেন না বরং আমাকে আল্লাহ্‌র হাতে অর্পণ করুন। আমি কখনো কোন অবৈধ কাজের সংকল্প করিনি, কারো সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি, কারো উপর জুলুম করিনি, কোন জালিমের সাহায্যকারী হইনি এবং জেনেশুনে আল্লাহ্‌র মর্জির বিরুদ্ধে কোন কাজও করিনি। প্রভু! আমি একথাগুলো দম্ভ প্রকাশের জন্য বলিনি, বলেছি শুধু আমার মায়ের সান্ত্বনার জন্য।

এবার হযরত আসমা (রা) বলেন ঃ আমি আশা করছি, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে এর উত্তম প্রতিদান দেবেন। তুমি আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে শত্রুকে আক্রমণ কর।

বিদায়কালে দৃষ্টি শক্তিহীনা আসমা (রা) যখন ছেলের সাথে গলাগলি করেন তখন তাঁর হাত ছেলের বর্মের উপর পড়ে। অমনি তিনি প্রশ্ন করেন, তুমি কি উদ্দেশ্যে এই বর্ম পরিধান করেছ? পুত্র উত্তর দেন, শুধু সান্ত্বনা ও মানসিক দৃঢ়তার জন্য। আসমা (রা) তখন বলেন, 'এটা খুলে ফেল এবং সাধারণ পোশাক পরেই শত্রুর সাথে লড়াই কর।' তিনি সঙ্গে সঙ্গে বর্ম খুলে দূরে নিক্ষেপ করেন, জামার ঝুল উঠিয়ে কোমরের সাথে বাঁধেন, হাতা দু'টি উপরে উঠান এবং ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন। তিনি আপন সঙ্গীদের বলেন ঃ

"হে আলে-যুবায়র ! তরবারির ঝংকারে তোমরা শংকিত হবে না। কেননা ক্ষতসৃষ্টির সময় যে কষ্ট অনুভূত হয় তার চাইতে ক্ষতস্থানে ঔষধ লাগানোর কষ্টই অপেক্ষাকৃত বেশি। তোমরা নিজ নিজ তরবারি তুলে নাও। যেভাবে তোমরা নিজেদের চেহারাকে যে কোন আঘাত থেকে রক্ষা কর ঠিক সে ভাবে এই তরবারিকেও অন্যায় হত্যা থেকে রুখে রাখবে। তোমরা নিচের দিকে তাকাও, যাতে তরবারির চমক তোমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিতে না পারে। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের সম্মুখবর্তী শত্রুর সাথে লড়বে। আমাকে তোমরা খুঁজে ফিরো না। যদি একান্তই খোঁজ তাহলে আমাকে সবার আগে শত্রুর সাথে লড়তে দেখবে।"

একথা বলেই তিনি সিরীয়দের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং একের পর এক তাদের সারিগুলো বিদীর্ণ করে সম্মুখে যাকে পান তাকেই মেরে ভূপাতিত করে একেবারে পিছনের সারিতে গিয়ে পৌঁছেন এবং পুনরায় এভাবে শত্রু বাহিনীর জনসমুদ্রে সাঁতার কাটতে কাটতে পূর্বের জায়গায় ফিরে আসেন।

হাজ্জাজ নানাভাবে তার লোকদের উৎসাহিত করছিল, তবু কেউই আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়রের সম্মুখবর্তী হওয়ার সাহস পাচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত স্বয়ং হাজ্জাজ পদাতিক বাহিনী নিয়ে তাঁর পতাকাবাহীকে ঘিরে ফেলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা হামলা চালিয়ে তার পতাকাবাহীকে শত্রুদের বেষ্টনী থেকে বের করে নিয়ে আসেন এবং হাজ্জাজকে পিছনে হটিয়ে দেন। এরপর যুদ্ধক্ষেত্র থেকে মাকামে ইবরাহীমে ফিরে এসে দুই রাকাআত নামায আদায় করেন। হাজ্জাজ পুনরায় হামলা চালান। এতে আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়রের পতাকাবাহী 'বাব-ই-বনূ শায়বায়' নিহত হন। মসজিদে হারামের প্রতিটি গেটে সিরীয়রা অটল হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

তারা সমগ্র মক্কা নগরীও অবরোধ করে রেখেছিল। হাজ্জাজ ও তারিক 'আবতাখ' (ابطح)-এর দিক থেকে মারওয়া পর্যন্ত ঘিরে ফেলেছিলেন। ইব্‌ন যুবায়র (রা) কখনো এদিকে, আবার কখনো ওদিকে হামলা করছিলেন। নামায সমাপনান্তে তিনি পুনরায় লড়তে শুরু করেন। সাফার দিকের গেটে তিনি হামলা করেন এবং সিরীয়দের অনেকদূর পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে যান। সাফা পাহাড়ের উপর থেকে এক ব্যক্তি তাকে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়ে। তাতে তাঁর কপালে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয় এবং তা থেকে রক্ত ঝরতে থাকে। এই অবস্থায়ও তিনি লড়তে থাকেন। মোটকথা তিনি এবং তাঁর সঙ্গীরা সকাল থেকে যোহর পর্যন্ত শত্রুদের মুকাবিলায় এমনি বিস্ময়কর বীরত্ব প্রদর্শন করেন, যা এ পৃথিবী কখনো দেখেনি। শেষ পর্যন্ত এক এক করে তাঁর সকল সঙ্গীই নিহত হয়। এবার শত্রুপক্ষ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের উপর চতুর্দিক থেকে প্রস্তর ও তীর বর্ষণ করতে থাকে। তাতে বিশ্বের এই প্রখ্যাত বীর ও আল্লাহ্‌ভীরু ব্যক্তি ৭৩ হিজরীর জুমাদাস-সানী (৬৯২ খ্রি নভেম্বর) মাসের শেষ মঙ্গলবার শাহাদাতবরণ করেন। সিরীয় বাহিনী এই মৃত বীরের দেহ থেকে তাঁর মস্তক বিচ্ছিন্ন করে ফেলে এবং হাজ্জাজের সামনে তা পেশ করা হয়। হাজ্জাজ তখন সিজদাতুশ শোকর আদায় করেন এবং তার বাহিনীর লোকেরা তাকবীর جيحون ধ্বনি দিয়ে উঠে। লাশটি ঐ জায়গায় অর্থাৎ জীহূন নামক স্থানে ঝুলিয়ে রাখা হয় এবং মস্তকটি পাঠিয়ে দেওয়া হয় আবদুল মালিকের কাছে। অপর এক বর্ণনা মতে, মস্তকটি আবদুল মালিকের কাছে পাঠানো হয়নি, বরং তা কা'বাঘরের প্রাচীরে কিংবা ছাদে পানি নিষ্কাষণী নালায় ঝুলিয়ে রাখা হয়।

হযরত আসমা বিন্‌ত আবূ বকর (রা) লাশ দাফনের অনুমতি চান; কিন্তু হাজ্জাজ অনুমতি দেননি। আবদুল মালিক এই বিষয়টি জানতে পেরে হাজ্জাজকে তিরস্কার করেন এবং লাশ দাফনের অনুমতি দান করেন। এর কিছুদিন পর হযরত আসমা (রা)-ও ইনতিকাল করেন।

ইব্‌ন যুবায়রের শাহাদাতের পর হাজ্জাজ কা'বা ঘরে প্রবেশ করেন। বাইরে থেকে নিক্ষিপ্ত প্রচুর পাথর সেখানে স্তূপীকৃত হয়ে পড়েছিল। পবিত্র মেঝের এখানে সেখানে রক্তের দাগ বিদ্যমান ছিল। তিনি পাথরগুলো সেখান থেকে উঠিয়ে ফেলেন এবং রক্তের দাগসমূহও ধুয়ে ফেলার নির্দেশ দেন। এরপর তিনি মক্কাবাসীদের থেকে আবদুল মালিকের খিলাফতের বায়আত নিয়ে মদীনায় ফিরে যান। তিনি মদীনায় দুই মাস অবস্থান করেন এবং সমগ্র মদীনাবাসীকে হযরত উসমান (রা)-এর হত্যাকারী ধারণা করে তাদের উপর জুলুম-নির্যাতন শুরু করেন। ফলে সাহাবায়ে কিরামকে অমানুষিক নির্যাতন ভোগ করতে হয়। তিনি সেখান থেকে পুনরায় মক্কার দিকে আসেন এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা)-এর নির্মিত কা'বাঘর ধ্বংস করে দিয়ে পুনরায় নতুনভাবে তা নির্মাণ করেন। আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান হাজ্জাজকে হিজাযের গভর্নর নিয়োগ করেন এবং তিনি তারিকের স্থলে মদীনায় অবস্থান করতে শুরু করেন।

এক নজরে ইব্‌ন যুবায়র (রা)-এর খিলাফত

হযরত আমীরে মুআবিয়া (রা)-এর পর তাঁর পুত্র ইয়াযীদ এতটা যোগ্য ছিল না যে, তাকে মুসলমানদের খলীফা নির্বাচন করা যায়। কেননা তখন মুসলমানদের মধ্যে এমন বহু লোক

বিদ্যমান ছিলেন যারা সব দিক দিয়েই হুকুমত ও খিলাফতের ক্ষেত্রে ইয়াযীদের চাইতে ঢের বেশি যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) ছিলেন তাঁদের অন্যতম। ইয়াযীদের অনেক আচার-আচরণই ছিল আপত্তিকর। তাই কিছু সংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তি তার হাতে বায়আত করতে অস্বীকার করেছিলেন।

আমীরে মুআবিয়ার পর যদি ইমাম হাসান (রা) জীবিত থাকতেন তাহলে মুসলমানরা তাঁকে খলীফা হিসাবে মেনে নেওয়ার অনেক বেশি সম্ভাবনা ছিল। ইয়াযীদের মুকাবিলায় যদি হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) খিলাফতের দাবি করতেন তাহলে শুধু বিভিন্ন দল-উপদলের মুসলমান নয়, বরং বনূ উমাইয়ারও একটি বিরাট দল তাঁকে সমর্থন করত। কিন্তু তিনি এ ব্যাপারে মোটেই আগ্রহ দেখাননি। ইমাম হুসাইন (রা) স্বয়ং খিলাফত লাভের জন্য অনেক চেষ্টা করেন, কিন্তু কূফাবাসীরা তাঁকে ধোঁকা দেয়। হিজায তথা মক্কা-মদীনার লোকদের কোন পরামর্শই তিনি গ্রহণ করেননি। তাই হিজাযবাসীরাও তাঁকে কোন সাহায্য করতে পারেনি। এমতাবস্থায় খিলাফতের জন্য আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়রই ছিলেন যোগ্যতম ব্যক্তি। তাঁর খিলাফত যে সঠিক ও ন্যায়ভিত্তিক ছিল তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ এই যে, সমগ্র ইসলামী বিশ্বের লোকেরা স্বেচ্ছায় ও সন্তুষ্টচিত্তে তাঁর খিলাফত মেনে নিয়েছিল। যে সমস্ত জায়গায় মত প্রকাশের স্বাধীনতা ছিল সেখানকার কোন লোকই তাঁর খিলাফত অস্বীকার করেনি। তবে হ্যাঁ, বনূ উমাইয়ার লোকেরা, যারা এ ব্যাপারে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল, তাঁর বিরোধিতা করতে থাকে। তারা জবরদস্তিমূলক সিরিয়া, মিসর, ফিলিস্তীন প্রভৃতি অঞ্চলে নিজেদের হুকুমত পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে এবং এভাবে ধীরে ধীরে সমগ্র মুসলিম বিশ্বের উপরও নিজেদের আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হয়। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়রের খিলাফতের মুকাবিলায় মারওয়ান ইব্ন হাকাম ও আবদুল মালিকের হুকুমতকে বিদ্রোহীদেরই হুকুমত আখ্যা দেওয়া যায়। অতএব শুধু আবদুল মালিকের ঐ শাসনামল, যা হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়রের শাহাদাতের পর শুরু হয়েছিল সেটাকে যথারীতি হুকুমত এবং বৈধ খিলাফত মনে করা যেতে পারে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) তাঁর শাসনামলে অনবরত লড়াই-ঝগড়া ও বিদ্রোহের কারণে একটুখানিও স্বস্তি পাননি। তাই তাঁর শাসনামলে, দেশজয় ও অভ্যন্তরীণ সংস্কারের কোন চিহ্নই নজরে পড়ে না। আর এতে বিস্মিত হওয়ারও কোন কারণ নেই। কেননা এ জাতীয় কাজ করার কোন অবকাশই তিনি পাননি। তিনি একজন বিরাট সেনাধ্যক্ষ ও সমর বিশেষজ্ঞ ছিলেন এবং সেই সাথে ছিলেন বিচক্ষণ শাসকও। কিন্তু এটাকে একটা দুর্ঘটনাই বলতে হবে যে, তাঁর প্রতিপক্ষের যাবতীয় চেষ্টা-তদবীর অপ্রত্যাশিতভাবে সফল হয় এবং তারই জের হিসাবে তাঁকে শাহাদাতবরণ করতে হয় অত্যন্ত মর্মান্তিকভাবে। সংসার-বিমুখতা ও ইবাদত-বন্দেগীর দিক দিয়ে তিনি ছিলেন প্রশংসনীয় জীবনাদর্শের অধিকারী।

বনূ উমাইয়ার খলীফাদের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, প্রচুর টাকা-পয়সা বিলিয়ে দিয়ে নিজেদের খিলাফত প্রতিষ্ঠা এবং তা সুদৃঢ় করার কৌশলটি তারা খুব ভালোভাবেই রপ্ত করেছিলেন। তারা যে কোন উপায়ে অর্থোপার্জনেও খুব দক্ষ ছিলেন এবং নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য কিভাবে এবং কোথায় সেই অর্থ বিলিয়ে দিতে হবে সে ব্যাপারেও ছিলেন অপূর্ব

পারদর্শিতার অধিকারী। যদি মানুষের মধ্যে টাকা-পয়সার আসক্তি না থাকতো তাহলে বনূ উমাইয়ারা কখনো তাদের লক্ষ্য অর্জনে সফল হতে পারত না এবং হযরত আলী ও হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়রকেও তাদের মুকাবিলায় বিফল হতে হতো না।

ইব্ন যুবায়রও যদি আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ানের মত বায়তুলমালকে আপন বন্ধু-বান্ধব ও সাহায্যকারীদের জন্য উৎসর্গ করে দিতেন এবং দুর্বল লোকদের স্বার্থের প্রতি দৃকপাত না করতেন তাহলে তাঁর আশেপাশেও অনেক বীর বাহাদুরেরা ভিড় জমাত। ফলে বনূ উমাইয়াকেই ব্যর্থতার মুখ দেখতে হতো। কিন্তু তিনি কখনো অন্যায় ও অসত্যকে প্রশ্রয় দেন নি। তাই পার্থিব বিজয়লাভের জন্য অনুরূপ আচরণ করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। আর এটাই ছিল তাঁর চরিত্রের সাথে সর্বতোভাবে মানানসই।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়রের খিলাফত আমলে কূফায় মুখতারকে হত্যা, পারস্যে খারিজীদের বিশৃংখলা দমন এবং যথাসম্ভব তাদেরকে পুনর্গঠিত হতে না দেওয়া নিঃসন্দেহে তাঁর এক একটি বিরাট কীর্তি। যদি বনূ উমাইয়াদের সাথে তাঁর অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ ও পরস্পর রশি টানাটানি সর্বক্ষণ লেগে না থাকত তাহলে তিনি নিজেকে শ্রেষ্ঠতম খলীফা হিসাবে প্রমাণ করতে পারতেন এবং বিশ্বে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারতেন। তাঁর শাহাদাত লাভের পর সাহাবায়ে কিরামের শাসন পরিচালনার পরিসমাপ্তি ঘটে। এক্ষেত্রে তিনিই ছিলেন সর্বশেষ সাহাবী। তাঁর ধর্মপরায়ণতা ও আল্লাহ্প্রীতি ছিল হিদায়াতের মশালস্বরূপ। তিনি ছিলেন একমাত্র খলীফা যাঁর রাজধানী ছিল মক্কা। তাঁর পূর্বে অথবা পরে মক্কা কখনো কোন রাজ্যের রাজধানী ছিল না বা হয়নি।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা), তাঁর ভাই মুসআব এবং তাঁর পিতা হযরত যুবায়র ইব্নুল আওয়ামের অতুলনীয় বীরত্বগাথা, তাঁর মাতা হযরত আসমা বিন্ত সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর সত্যের প্রতি অপূর্ব আসক্তি মানুষের অন্তরকে যারপরনাই আলোড়িত ও বিমোহিত করে এবং বিশ্বের বীর-বাহাদুরদের অন্তরে জাগ্রত হয় তাঁদের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য ধুলায় ও রক্তে লুটোপুটি খাওয়া এবং তীর ও বর্শার উপর্যুপরি আঘাত বুকে বয়ে নিয়ে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়া এবং শত্রুবাহিনীকে তরবারি দিয়ে ছিন্নভিন্ন করা যেমন কঠিন ও দুরূহ কাজ, তেমনি আনন্দদায়ক ব্যাপারও বটে। তীক্ষ্ণধার বর্শার ঝলক এবং তরবারির চমকের মধ্যেই হৃদয়ের দৃঢ়তা এবং বীরত্ব ও উচ্চ সাহসিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। আমাদের যুগ এতই অপয়া যে, আমাদের এই যুগের মু'মিনদের রক্ত শিরায় বীরত্ব ও বীরশ্রেষ্ঠদের কাহিনীসমূহ মাত্র কিছুক্ষণের জন্য খানিকটা আলোড়ন সৃষ্টি করে। কিন্তু আমরা এমন কোন ময়দান দেখতে পাই না, যেখানে যোদ্ধাদের মস্তকরাজি একের পর এক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে, বর্শাসমূহ বক্ষ ভেদ করে এপার ওপার হয়েছে, গর্দানসমূহ থেকে রক্তের ফোয়ারা তীরবেগে প্রবাহিত হচ্ছে, লাশসমূহ লহুর সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে, অশ্বরাজির খুরের নিচে ক্ষতবিক্ষত লাশসমূহ কীমায় পরিণত হচ্ছে, কর্তিত মস্তকসমূহ অশ্বের পায়ের আঘাতের পর আঘাত খেয়ে এদিক থেকে ওদিকে ছুটে যাচ্ছে, ধুলো মেঘের আড়ালে সূর্যকিরণ ঢাকা পড়ছে, অনবরত তাকবির ধ্বনি উচ্চারিত হচ্ছে, আল্লাহ্ প্রেমে আসক্ত বান্দারা তাঁদের প্রভুর নাম উচ্চে তুলে ধরার জন্য নিজেদের জান কুরবানীর ক্ষেত্রে

একে অন্যের সাথে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে, আর আল্লাহ্র অপার রহমত ও করুণারাশি বেষ্টন করে আছে তাঁদের সেই পবিত্র ময়দান ও পবিত্র পরিবেশ। এই আনন্দদায়ক, চিত্তাকর্ষক ও মনোমুগ্ধকর দৃশ্যরাজি অবলোকন করার সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছিলেন তালহা, যুবায়র, খালিদ, দিরার, শুরাহবিল, আবদুর রহমান, হুসাইন ইব্ন আলী, আবদুর রহমান ইব্নুয যুবায়র, তারিক ইব্ন যিয়াদ, মুহাম্মদ ইব্ন কাসিম, মুহাম্মদ খান (দ্বিতীয়), সুলায়মান আযম, সালাহুদ্দীন আইয়ূবী, নূরুদ্দীন যঙ্গী, মাহমূদ গাযনাবী, শিহাবুদ্দীন ঘুরী প্রমুখ বীর জনেরা। আমাদের মত দুর্বল ঈমান ও ভীরু হৃদয়ের লোকদের সেই সৌভাগ্য কোথায় ? আর বোধ হয় এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা তরবারি, বর্শা, তীর-ধনুক ইত্যাদি বেকার করে দিয়ে সেগুলোর পরিবর্তে দুনিয়ায় পাঠিয়ে দিয়েছেন কামান, বন্দুক এবং উড়োজাহাজের মত যুদ্ধাস্ত্র। কেননা হৃদয়ের ক্ষমতা, সংকল্পের দৃঢ়তা ও সাহস-উদ্দীপনার প্রাবল্য অর্থাৎ পূর্ণ ঈমানের কিরণধারা যেরূপ সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে তীক্ষ্ণধার তরবারির উপর প্রতিফলিত হয় সেরূপ বারুদের উদগীরণ বা অন্য কিছুতেই হয় না, হতে পারে না।

কূফা

এ যাবত যে সমস্ত দেশ ও তার অধিবাসীদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে তা থেকে দেখা যায়, কূফা হচ্ছে ভূপৃষ্ঠের একটি বিস্ময়কর জনবসতি। আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাবা এবং প্রত্যেকটি ষড়যন্ত্রকারী দলই কূফায় নিজ নিজ লক্ষ্য অর্জনে সফল হয়েছে। কূফাবাসীরাই হযরত উসমান (রা)-এর হত্যার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। এরাই ছিল হযরত আলী (রা)-এর একান্ত ভক্ত অনুরক্ত। আবার তারাই তাঁকে ত্যক্ত-বিরক্ত করেছে সব চাইতে বেশি এবং তারাই ছিল তাঁর অনেক ব্যর্থতার কারণ। এই কূফাবাসীরাই হযরত ইমাম হাসান (রা)-কে অনেক কষ্ট দিয়েছে, তারাই আবার পরবর্তী সময়ে হযরত আলী হত্যার কিসাস দাবি করেছে এবং হযরত ইমাম হুসাইনের খিলাফত সমর্থন করেছে। এই কূফাবাসীরাই ছিল ইমাম হুসাইনের শাহাদাতের কারণ। তারাই কারবালা প্রান্তরে ইমাম হুসাইনকে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে হত্যা করিয়েছে। এরপর তারাই সবার আগে ইমাম হুসাইন হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের দাবি তুলেছে। এই কূফাবাসীরাই আহ্লে বায়তের সবচেয়ে বড় সমর্থক মুখতার ইব্ন উবায়দার বিরোধিতা করেছে এবং মুসআব ইব্নুয যুবায়রকে ডেকে এনে তাঁর মাধ্যমে মুখতারকে হত্যা করিয়েছে। এই কূফাবাসীরাই ছিল মুসআব হত্যার মূল হোতা। কূফাবাসীরা একদিকে যেমন বীরত্বের অনেক বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, তেমনি চরম ভীরুতা ও কাপুরুষতার অনেক ঘটনা ঘটিয়ে বিশ্ববাসীকে হাসিয়েছে। তারা কখনো নিজেরাই নিজেদের অত্যন্ত নির্মমভাবে হত্যা করিয়েছে এবং প্রকাশ্যে কূফার শাসনকর্তাদের বিরোধিতা করেছে। আবার কখনো কখনো এমন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদ প্রমুখ কূফার গভর্নরের প্রতিটি জবরদস্তিমূলক নির্দেশ একেবারে মুখ বুঁজে মেনে নিয়েছে।

স্বভাব-চরিত্রের এই বৈপরিত্যের কারণ জানতে হলে আমাদেরকে কূফার অধিবাসীদের অবস্থা ও প্রকৃতি সম্পর্কে কিছু চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। ফারূকে আযমের খিলাফত আমলে কূফায় ঐ সমস্ত লোকের জন্য সেনাছাউনি নির্মাণ করা হয়, যারা অগ্নিউপাসক ইরানীদের মুকাবিলায় যুদ্ধরত ছিলেন। ঐ বাহিনীর একটি অংশ সেই সমস্ত লোকের সমন্বয়ে গঠিত

হয়েছিল, যারা ছিল হিজায, ইয়ামান, হাদরামাউত প্রভৃতি এলাকার অধিবাসী। এসব লোক ফারূকে আযমের সাধারণ আহ্বানের পর জিহাদের জন্য মদীনায় এসে সমবেত হয়েছিল এবং তাঁরই নির্দেশে ইরাকের দিকে প্রেরিত হয়েছিল। কিছু সংখ্যক লোক আরবের ঐ সমস্ত প্রদেশের অধিবাসী ছিল, তবে তারা ইরাক সীমান্তে নিজেদের বসতি গড়ে তুলেছিল। তাদের অধিবাস ছিল কূফা ও বসরার সন্নিকটে। ঐ সমস্ত লোক, সাহাবায়ে কিরামের হাতে ইসলাম গ্রহণ করে ইসলামী বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে মদীনার সাথে তাদের কোন বিশেষ সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারেনি, এমন কি তারা মদীনা স্বচক্ষে দেখেও নি। কিছু লোকের ভাষা আরবী ছিল বটে, কিন্তু তারা ছিল অগ্নিউপাসক-সাম্রাজ্যের প্রজা। তারা সবেমাত্র মুসলমান হয়েছিল এবং মুসলমানদের শাসন ব্যবস্থাকে শ্রেষ্ঠতম শাসনব্যবস্থা মনে করে মুসলমানদের পক্ষ নিয়েছিল। তারা মুসলমানদের হাতে হাত মিলিয়ে ইরানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাচ্ছিল। কিছু সংখ্যক নেতৃস্থানীয় মদীনার অধিবাসী মুহাজির ও আনসারও ছিলেন। যখন কূফায় ঐ বাহিনীর শিবির স্থাপিত হলো এবং তৎকালীন খলীফার প্রতিনিধি ও ইরাকী বাহিনীর অধিনায়ক কূফায় বসবাস করতে লাগলেন তখন তাদেরই প্রয়োজনে ইরানী শহরসমূহের বহু সংখ্যক অধিবাসী কূফার সরকারী দফতরের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে বাধ্য হলো। ফলে ইরানীদেরও একটি দল কূফায় বসবাস করতে শুরু করল। আরবের মরু অঞ্চলের সরল-সহজ জীবনের অনুপাতে কিসরা, নওশেরওয়াঁ, কায়কাউস ও খসরুর দেশসমূহ জয়কারী সেনাবাহিনীর বিজেতাও শাসক সুলভ জীবন, যা কূফায় অতিবাহিত হয়েছিল, তা নিশ্চিতভাবে অধিক সুখকর ও জাঁকজমকপূর্ণ হয়ে থাকবে। মালে গনীমতের প্রাচুর্য ও তাদের জীবনকে প্রভাবিত করে থাকবে। অতএব বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন বর্ণের সমন্বয়ে গঠিত ঐ বাহিনীর অধিকাংশ লোক কূফায় তাদের স্থায়ী বসতি গড়ে তুলে। ফলে কূফা শুধু একটি সেনাছাউনি বা সৈন্যদের সামরিক আবাসস্থল থাকেনি, বরং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই একটি বিরাট নগরীর রূপ ধারণ করে এবং শেষ পর্যন্ত 'দারুল খুলাফা' তথা রাজধানীতে পরিণত হয়। ঐ শহরের অধিবাসীদের বেশির ভাগ লোকই ছিল যোদ্ধা এবং জ্ঞানার্জন, চরিত্রগঠন এবং সভ্যতা-সংস্কৃতির উপাদান যেহেতু সেখানে অনেক কম ছিল তাই সাধারণভাবে সেখানকার অধিবাসীদের মনমেযাজ ও স্বভাব-চরিত্রও ছিল অনেকটা বিশৃঙ্খল ও বিকৃত ধরনের। এ ধরনের একটি জনবসতিতে বাহ্যত বিবেক ও সুস্থ বুদ্ধির অভাব থাকলেও উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও উদ্ভট কল্পনার কোন অভাব থাকে না। এ কারণেই কূফাবাসীদেরকে সব সময়ই তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও উদ্ভট কল্পনার কোন অভাব থাকে না। এ কারণেই কূফাবাসীদেরকে সব সময়ই তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও ভাবোচ্ছ্বাস দ্বারা পরিচালিত হতে দেখা গেছে। আর এ কারণেই তাদেরকে যে-ই চেয়েছে, সে-ই ক্ষেপিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। আবার বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করে যে-ই তাদেরকে অনুগত করতে চেয়েছে তারা তার অনুগতও হয়েছে। আবার যে-ই তাদেরকে ভয় দেখাতে পেরেছে, তারা তাকে ভয় করেছে। আবার যখন কেউ তাদেরকে কারো বিরুদ্ধে উস্কানি দিয়েছে তারা সঙ্গে সঙ্গে তার বিরুদ্ধাচরণে দাঁড়িয়ে গেছে। যখন তাদেরকে বীরত্বের জন্য অনুপ্রাণিত করা হয়েছে তারা বীর বাহাদুরে পরিণত হয়েছে। পুনরায় যখন তাদেরকে বিশ্বস্ততার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে তারা সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বস্ততার শর্তাদি পূরণে আত্মনিয়োগ করেছে।

কূফীদের উচ্ছ্বাস-উন্মাদনা ছিল, কিন্তু মস্তিষ্ক ছিল না। তাদের ভাবাবেগ ছিল, কিন্তু বুদ্ধিমত্তা ছিল না। এমতাবস্থায় তাদের কাছ থেকে সেই আচরণই আশা করা যেতে পারে, যা

তারা বার বার করে দেখিয়েছে। কিন্তু যখন তাদের কয়েক পুরুষ অতিক্রান্ত হয় এবং বিভিন্ন ঘটনা-দুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে তাদের বিভিন্ন জাতি ও বর্ণের পরস্পর সংমিশ্রণ ঘটে তখন তাদের মধ্যে এক নতুন মন-মেযাজের সৃষ্টি হয় এবং তাদের মধ্যে প্রথম প্রথম যে অস্থিরচিত্ততা ও অপরিণামদর্শিতা ছিল তা ধীরে ধীরে বিলীন হতে থাকে।

আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান

আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান ইব্নুল হাকাম ইব্ন আবুল 'আস ইব্ন উমাইয়া ইব্ন আব্দ শামস ইব্ন আব্দ মানাফ ইব্ন কুসাঈ ইব্ন কিলাব ২৩ হিজরীর রমযান (৬৪৩ খ্রি-এর জুলাই) মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতৃদত্ত নাম আবুল ওয়ালীদ। তিনি আবুদল মালিক নামেই বদুখ্যাত। কেননা তাঁর কয়েকজন পুত্র একের পর এক খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হন। ইয়াহ্ইয়া গাস্সানী বলেন, আবদুল মালিক প্রায়ই মহিলা সাহাবী উম্মু দারদা (রা)-এর কাছে বসতেন। একদা উম্মু দারদা (রা) তাঁকে বলেন, আমি শুনেছি, তুমি ইবাদত-গুযার হয়েও মদ্য পান করে থাক। আবদুল মালিক উত্তরে বলেন, আমি তো রক্তপায়ীও হয়ে গেছি। নাফিঈ বলেন, মদীনার কোন যুবকই আবদুল মালিকের মত চালাক, চতুর, কুরআন-হাদীসে অভিজ্ঞ এবং আবিদ ও যাহিদ ছিল না। আবুল যিনাদ বলেন, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব, আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান এবং উরওয়া ইব্ন যুবায়র ছিলেন মদীনার ফকীহ্। উবাদা ইব্ন মুসান্না ইব্ন উমর জিজ্ঞেস করেন, আপনাদের পর আমরা কার কাছে মাসলা-মাসাইল জিজ্ঞেস করব ? তিনি উত্তর দিন, মারওয়ানের পুত্র (আবদুল মালিক) একজন ফকীহ্। তাঁর কাছে জিজ্ঞেস কর।

একদা আবদুল মালিক হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর খিদমতে হাযির হলে তিনি তাকে উদ্দেশ করে বলেন, এই ব্যক্তি একদিন আরবের বাদশাহ্ হবে। আবদুল মালিক খলীফা হওয়ার পর উম্মু দারদা (রা) একদা তাঁকে বলেন, আমি প্রথমেই বুঝতে পেরেছিলাম, তুমি একদিন বাদশাহ্ হবে। আবদুল মালিক জিজ্ঞেস করেন, কিভাবে বুঝতে পেরেছিলেন ? তিনি উত্তর দেন, আমি তোমার মত না কোন আলাপকারী দেখেছি, আর না আলাপ শ্রবণকারী। শা'বী বলেন, আমি যার সংস্পর্শেই গিয়েছি সেই আমার জ্ঞান ও বিজ্ঞতার কথা স্বীকার করেছে, কিন্তু আমি আবদুল মালিককে (আমার চাইতেও অধিক) জ্ঞান ও বিজ্ঞতার অধিকারী মনে করি। আমি যখনই তাঁর কাছে কোন হাদীস বর্ণনা করেছি, তখনি তিনি তাতে কিছু না কিছু সংযোজন করেছেন। আবার যখনই তাঁর সামনে কোন কবিতা আবৃত্তি করেছি তখনই তিনি ঐ বিষয়ের উপর এক গাদা কবিতা শুনিয়ে দিয়েছেন। যাহাবী বলেন, আবদুল মালিক উসমান, আবূ হুরায়রা, আবূ সাঈদ, উম্মু সালামা, বারীরা, ইব্ন উমর এবং মুআবিয়া (রা) থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন এবং তাঁর থেকে উরওয়া, খালিদ ইব্ন সা'দান, রাজা ইব্ন হায়াত, যুহরী, ইউনুস ইব্ন মায়সারা, রবীআ ইব্ন ইয়াযীদ, ইসমাঈল ইব্ন উবায়দুল্লাহ্, জারীর ইব্ন উসমান প্রমুখ হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইয়াহ্ইয়া গাসসানী বলেন, মুসলিম ইব্ন উকবা মদীনায় এসে পৌঁছালে আমি মসজিদে নববীতে যাই এবং আবদুল মালিকের কাছে গিয়ে বসি। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমিও কি এই বাহিনীতে আছ ? আমি বললাম, হ্যাঁ!

আবদুল মালিক বললেন, তুমি এমন এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে হাতিয়ার তুলে নিয়েছ, যিনি ইসলামের আবির্ভাবের পর (মুসলিম সমাজ) সর্বাগ্রে জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্‌র সাহাবী, যাতুন নাতাকায়ন (হযরত আসমা)-এর সন্তান এবং যাকে খোদ রাসূলুল্লাহ্ (সা) 'তাহ্নীক' (খেজুর চিবিয়ে তরল করে নবজাত শিশুর মুখে ঢেলে দেওয়া) করেছেন। তাছাড়া আমি যখনই তাঁর সাথে দিনের বেলা সাক্ষাত করেছি তাকে রোযাদার পেয়েছি এবং যখনই রাতের বেলা তাঁর কাছে গিয়েছি তাঁকে নামাযরত অবস্থায় দেখেছি। স্মরণ রাখ, যেই তাঁর বিরুদ্ধে লড়বে তাকেই আল্লাহ্ তা'আলা উল্টামুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। কিন্তু আবদুল মালিক খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি নিজেই হাজ্জাজকে আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রেরণ করেন এবং তারই হাতে তিনি নিহত হন।

জুরায়জ বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়রের শাহাদাতের পর আবদুল মালিক একটি ভাষণ দেন। আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও নবীর প্রশস্তির পর তাতে তিনি বলেন, "আমি না দুর্বল খলীফা, (অর্থাৎ উসমান), না মন্থর খলীফা (অর্থাৎ মুআবিয়া) আর না দুর্বলমনা খলীফা (অর্থাৎ ইয়াযীদ) আমার কাছে তরবারিই হচ্ছে মানুষের বক্রতা দূর করার একমাত্র ওষুধ। তোমাদের কর্তব্য হবে আমারই সাহায্যে তোমাদের বর্শা উঁচিয়ে ধরা। মুহাজিরদের কর্মধারা অনুসরণের জন্য তোমরা আমার উপর চাপ সৃষ্টি কর, কিন্তু নিজেরা তাদেরকে অনুসরণ কর না। স্মরণ রেখ, আমি তোমাদেরকে কঠোর শাস্তি দিয়ে একেবারে শেষ করে ফেলব। তরবারিই তোমাদের ও আমাদের ফায়সালা করবে। আমার তরবারি কি অবস্থার সৃষ্টি করে তা তোমরা হাড়ে হাড়ে টের পাবে। আমি তোমাদের সব কথাই সহ্য করব কিন্তু হাকিমের (খলীফার) বিরুদ্ধে তোমাদের বিদ্রোহ কখনো সহ্য করব না। আমি সব কাজের দায়-দায়িত্ব তোমাদের ঘাড়ের উপর চাপাব। এরপর যার ইচ্ছা সে আমাকে যেন আল্লাহ্‌র ভয় দেখায়।

সর্বপ্রথম আবদুল মালিকই কা'বা ঘর রেশমী পর্দা দিয়ে ঢেকে দেন। তাঁকে জনৈক ব্যক্তি বলল, 'হে আমীরুল মু'মিনীন! অনেক তাড়াতাড়ি আপনার বার্ধক্য এসে গেছে। তিনি উত্তর দেন, আসবে না কেন! আমি প্রত্যেক জুমুআয় আমার শ্রেষ্ঠতম বুদ্ধিটুকু মানুষের জন্য খরচ করি। জনৈক ব্যক্তি আবদুল মালিককে জিজ্ঞেস করল, শ্রেষ্ঠতম মানুষ কে ? তিনি উত্তর দিলেন, যে উচ্চমর্যাদা লাভ করার পরও মানুষের সাথে নম্র ব্যবহার করে, ক্ষমতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও সংসার বিমুখতাকে প্রাধান্য দেয় এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে। আবদুল মালিকের কাছে বাইরে থেকে কোন লোক আসলে তিনি তাকে বলতেন, চারটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখবে।

এক ঃ মিথ্যা বলবে না। কেননা মিথ্যাকে আমি অত্যন্ত ঘৃণা করি। দুই ঃ আমি তোমাকে যা জিজ্ঞেস করব তারই উত্তর দেবে। তিন ঃ আমার প্রশংসা করবে না, কেননা আমি নিজেকে খুব ভালোভাবেই জানি। চার ঃ আমাকে আমার প্রজাদের বিরুদ্ধে কখনো উস্কানি দেবে না। কেননা তারা আমার অনুগ্রহেরই অধিক মুখাপেক্ষী।

মাদায়িনী বলেন, যখন আবদুল মালিকের নিশ্চিত বিশ্বাস হলো যে, তিনি আর বাঁচবেন না তখন তিনি বলেন, জন্মগ্রহণ করার পর থেকে আজ পর্যন্ত আমি এই আক্ষেপই করে আসছি,

'হায়! আমি যদি কুলি হতাম।' এরপর তিনি আপন পুত্র ওয়ালীদকে ডেকে বলেন, আল্লাহ্‌কে ভয় করবে এবং অন্তঃবিরোধ থেকে দূরে থাকবে। তিনি তাকে আরো বলেন ঃ

"যুদ্ধের মধ্যে কর্তব্যপরায়ণতার পরিচয় দেবে এবং পুণ্যকর্মে প্রবাদ বাক্যে পরিণত হওয়ার চেষ্টা করবে। কেননা যুদ্ধ কখনো নির্ধারিত সময়ের পূর্বে মৃত্যুকে ডেকে আনে না। আর পুণ্যকর্মের পুরস্কার অবশ্যই পাওয়া যায় এবং বিপদে আল্লাহ্ মানুষের সাহায্যকারী হন। কঠোরতার মধ্যে নম্রতা অবলম্বন করাই বাঞ্ছনীয়। নিজেদের মধ্যে মনঃবিবাদ বাড়াবে না। কেননা একটি তীর যে কেউ ভাঙ্গতে পারে। কিন্তু যখন অনেকগুলো তীর একত্রে জড় করা হয় তখন সেগুলো কেউ ভাঙ্গতে পারে না। হে ওয়ালীদ! আমি যে ব্যাপারে তোমাকে খলীফা করেছি সে ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে ভয় করবে। হাজ্জাজের দিকে লক্ষ্য রাখবে। সেই তোমাকে খিলাফত পর্যন্ত পৌছিয়ে দিয়েছে। তাকে তুমি নিজের ডান হাত এবং নিজের তরবারি মনে করবে। সে তোমাকে তোমার শত্রুদের থেকে নিরাপত্তা প্রদান করবে। তার সম্পর্কে কারো কোন কথা শুনবে না। স্মরণ রাখবে, হাজ্জাজের প্রয়োজন তোমার অনেক বেশি, কিন্তু তোমার প্রয়োজন হাজ্জাজের বড় একটা নেই। আমি মরে যাওয়ার পর জনসাধারণের কাছ থেকে খিলাফতের বায়আত নেবে। যে ব্যক্তি বায়আত করতে অস্বীকার করবে তার গর্দান উড়িয়ে দেবে।"

মৃত্যুর ঠিক পূর্বক্ষণে ওয়ালীদ তাঁর কাছে এসে কাঁদতে থাকেন। তখন আবদুল মালিক বলেন, "মেয়েদের মত কেঁদে কি লাভ ? আমার মৃত্যুর পর কাঁধের উপর তরবারি ঝুলিয়ে নির্ভীকচিত্তে সদা প্রস্তুত থাকবে। যে কেউ তোমার সামান্য মাত্র বিরোধিতা করবে তুমি তার মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। যে চুপ থাকবে তাকে ছেড়ে দেবে। সে তার মৃত্যু রোগে আপনা-আপনি মারা পড়বে।"

আবদুল মালিক ৮৬ হিজরীর শাওয়াল (৭০৫ খ্রি-এর অক্টোবর) মাসে ৬৩ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। সালাবী বলেন, আবদুল মালিক বলতেন, আমি রমযানে জন্মগ্রহণ করেছি, রমযানেই আমার দুধ (মাতৃস্তন) ছাড়ানো হয়েছে, রমযানেই আমি প্রথম কুরআন খতম করেছি, রমযানেই আমি প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছি, রমযানেই 'অলীআহ্‌দ' নিযুক্ত হয়েছি, রমযানেই আমি মারা যাব। কিন্তু যখন রমযান অতিক্রান্ত হয় এবং আবদুল মালিক নিজের জীবন সম্পর্কে কিছুটা আশাবাদী হয়ে উঠেন ঠিক তখনি অর্থাৎ শাওয়াল মাসে তিনি ইনতিকাল করেন।

একদা আবদুল মালিকের কাছে এক স্ত্রীলোক এসে বলে, আমার ভাই ছয়শ দীনার রেখে মারা গেছেন। কিন্তু মীরাস বণ্টনকালে আমাকে একটি মাত্র দীনার দেওয়া হয়েছে এবং বলা হচ্ছে, এটুকুই তোমার প্রাপ্য।

আবদুল মালিক তখনি শা'বীকে ডেকে পাঠান এবং এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। শা'বী বলেন, এই বণ্টন যথাযথ হয়েছে। মৃত ব্যক্তি দু'টি মেয়ে রেখে মারা গেছে। মেয়েরা দুই-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ চারশ দীনার পাবে, মা পাবে এক-ষষ্ঠাংশ অর্থাৎ একশ দীনার, স্ত্রী পাবে এক অষ্টমাংশ অর্থাৎ পঁচাত্তর দীনার এবং বার ভাই পাবে চব্বিশ দীনার। অতএব এই হিসাব তার (বোনের) অংশে এক দীনারই আসবে।

আবদুল মালিকের খিলাফত আমলের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা)-এর মৃত্যুর পর আবদুল মালিক হাজ্জাজকে হিজাযের গভর্নর নিয়োগ করেছিলেন। হাজ্জাজ কা'বাঘর ভেঙে ফেলেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) নির্মিত কা'বা ঘরের একটি অংশ বাদ দিয়ে নতুনভাবে তা নির্মাণ করেন। হাজ্জাজ মক্কা ও মদীনায় অবস্থানরত সাহাবায়ে কিরামের সাথে অত্যন্ত নির্দয় ব্যবহার করেন। হযরত আনাস (রা) প্রমুখ প্রবীণ সাহাবীদের দ্বারাও তিনি পানির মশক টানিয়েছেন, এমনকি তাঁদেরকে বেত্রাঘাতও করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমরের মত উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় সাহাবীর সাথেও হাজ্জাজ শত্রুতা পোষণ করতেন। আর তা শুধু এজন্য যে, ইব্ন উমর (রা) সব সময় স্পষ্টবাদী ও ন্যায়ানুসারী ছিলেন। হাজ্জাজের শাসন তাঁকে ভীতগ্রস্ত করতে পারত না। সৎকর্মের নির্দেশ ও অসৎকর্মের নিষেধ থেকে কোন কিছুই তাঁকে রুখতে পারত না। ইব্ন উমরকে আহত, এমনকি শেষ করে ফেলার জন্য হাজ্জাজ জনৈক ব্যক্তিকে মোতায়েন করেন। হজ্জের সময় যখন তিনি ক'বাঘর প্রদক্ষিণ করছিলেন ঠিক তখনই ঐ লোকটি ভিড়ের মধ্যে তাঁর পায়ের উপর বর্শা নিক্ষেপ করে এবং তা তাঁর পায়ের পাতা ভেদ করে মাটিতে গিয়ে ঠেকে। ঐ ক্ষতের যন্ত্রণায় কিছু দিনের মধ্যেই তিনি ইনতিকাল করেন। হাজ্জাজের ঐ সমস্ত জুলুম-অত্যাচার যা তিনি সাহাবীদের উপর চালিয়েছিলেন তাতে শুধু তিনিই দোষী বা অপরাধী প্রমাণিত হন না, সেই সাথে আবদুল মালিকের উপরও সেই অপরাধের দায়-দায়িত্ব গিয়ে বর্তায়। কেননা তিনিই তো এ ধরনের জালিম ও স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তির হাতে মক্কা মদীনার শাসনভার ন্যস্ত করেছিলেন। আবদুল মালিক ও হাজ্জাজের মধ্যে কিছু কিছু সৎগুণাবলী অবশ্যই ছিল, তবে সেই সাথে ছিল উল্লিখিত জঘন্য ধরনের দোষত্রুটিও।

খারিজীদের ফিতনা

যে যুগে ইব্ন যুবায়রের খিলাফতের পতনের আলামতসমূহ ফুটে উঠে এবং আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ানের লোকেরা ইরাক ও পারস্যে তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের ষড়যন্ত্র আঁটতে থাকে তখন খারিজীদের বিভিন্ন গ্রুপ, যারা এতদিন ইরানের বিভিন্ন প্রদেশে নীরব জীবন-যাবন করছিল, পুনরায় পার্শ্ব পরিবর্তন করে জেগে উঠতে শুরু করে। মুসআব ইব্ন যুবায়রকে হত্যার মাধ্যমে ইরাকে আবদুল মালিকের আধিপত্য বিস্তৃত হওয়ার সাথে সাথে সেখানকার বিদ্রোহী ভাবাপন্ন লোকেরা পুনরায় কানাঘুষা শুরু করে দেয়। ইরাক দখল করার পর আবদুল মালিক খালিদ ইব্ন আবদুল্লাহ্র হাতে বসরার শাসনভার অর্পণ করেছিলেন। ইরাক থেকে দামিশ্কে ফিরে যাবার পর তিনি খারিজীদের প্রতি তাঁর দৃষ্টি পুরোপুরি নিবদ্ধ রাখতে পারেন নি। কেননা তখন তাঁর অন্তরে হিজায ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়রের চিন্তাও ছিল। তাঁকে হত্যা করার পর আবদুল মালিক বসরা ও কূফার গভর্নরদের পদচ্যুত করে আপন ভাই বশীরকে একাধারে কূফা ও বসরার গভর্নর নিয়োগ করেন এবং তাকে নির্দেশ দেন ঃ তুমি মুহাল্লাব ইব্ন আবূ সুফরাকে খারিজীদের মুকাবিলায় পারস্যে প্রেরণ কর। সে খারিজীদের যেখানে পায় সেখানেই যেন নির্মূল করে। মুহাল্লাব বসরা থেকে যাকে ইচ্ছা তাকেই সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে। এ ব্যাপারে তার পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। আর তুমি কূফা থেকে একটি শক্তিশালী বাহিনী গঠন করে মুহাল্লাবের সাহায্যার্থে প্রেরণ কর, যাতে সে সম্পূর্ণরূপে এই

বিশৃংখলা নির্মূল করতে সক্ষম হয়। এই নির্দেশ মুহাল্লাবের নামেও সরাসরি পাঠানো হয়েছে। আমীরুল মু'মিনীন কর্তৃক সরাসরি মুহাল্লাবকে এভাবে দায়িত্ব প্রদান করাটা বশীরের মনঃপূত হয়নি। তার মতে খারিজীদের দমনে সম্পূর্ণ দায়িত্ব তার উপরই অর্পিত হওয়া উচিত ছিল যাতে তিনি যাকে ইচ্ছা এ কাজে নিয়োগ করতে পারেন। মুহাল্লাব ইব্‌ন আবূ সুফরা আবদুল মালিকের নির্দেশ অনুযায়ী বসরা থেকে একটি বাহিনী নিয়ে রওয়ানা হন। এদিকে বশীর ইব্‌ন মারওয়ানও আবদুর রহমান ইব্‌ন মিখনাফের নেতৃত্বে একটি বাহিনী মুহাল্লাবের সাহায্যার্থে প্রেরণ করেন। কিন্তু রওয়ানা হওয়ার সময় তিনি আবদুর রহমান ইব্‌ন মিখনাফকে বলেন, নেতৃত্বের ক্ষেত্রে আমি তোমাকে মুহাল্লাবের চাইতে অধিকযোগ্য মনে করি। অতএব তুমি নিজেকে পুরাপরি মুহাল্লাবের অধীনে ন্যস্ত করবে না, বরং নিজের মতামতও কাজে লাগাবে। আবদুর রহমান ইব্‌ন মিখনাফ 'দ্বারে হরমুয' নামক স্থানে গিয়ে মুহাল্লাবের সাথে মিলিত হন। তবে নিজের বাহিনী পৃথক রেখেই শিবির স্থাপন করেন এবং নিজের স্বাতন্ত্র্যের হাবভাব প্রকাশ করতে থাকেন। কিছুদিন পরই ঐ জায়গায় সংবাদ পৌঁছে যে, বশীর ইব্‌ন মারওয়ান মৃত্যুবরণ করেছেন এবং মৃত্যুর পূর্বে খালিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌কে আপন স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করে গেছেন। এই সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে বসরা ও কূফার সৈন্যরা নিজ নিজ শহরে ফিরে যেতে শুরু করে। খালিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ তাদেরকে অনেক করে বোঝান, এমন কি ভীতি প্রদর্শনও করেন, তবু তারা মুহাল্লাবের কাছে ফিরে যেতে রাযী হয়নি। অপরদিকে খুরাসানের অবস্থা এই ছিল যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাযিমকে হত্যার পর (যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে) তুর্কিস্তান ও মুঘালিস্তানের বাদশাহ্ রুতবেল খুরাসান সীমান্তে সৈন্য পাঠাতে শুরু করে দিয়েছিল। আর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাযিম আপন পিতামাতার সঙ্গী ও অনুসারীদেরকে নিয়ে মার্ভ থেকে পালিয়ে 'তিরমিয' নামক দুর্গে অবস্থান নেন এবং নিজেই একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

মূসা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ একদিকে তুর্কীদের সাথে যুদ্ধ করে যেমন সাফল্য অর্জন করতেন, অন্যদিকে আবদুল মালিক কর্তৃক নিযুক্ত খুরাসানের শাসনকর্তার সাথেও সব সময় যুদ্ধরত থাকতেন। খুরাসানের শাসনকর্তা ছিলেন বুকায়র ইব্‌ন বিশাহ্। আবদুল মালিক তাকে পদচ্যুত করে উমাইয়া ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন খালিদ উসায়দকে খুরাসানের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। উসায়দ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ তার পদচ্যুতির পর খুরাসানেই অবস্থান করতে থাকেন এবং উমাইয়া ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ পরবর্তীকালে তাকে মার্ভের কোতওয়াল (পুলিশ প্রধান) নিয়োগ করেন। উমাইয়া খুরাসানে পৌঁছে তুর্কিস্তানের বাদশাহ্ রুতবেলকে আক্রমণ করেন। এর ফলে তিনি এই শর্তের উপর সন্ধি স্থাপনে বাধ্য হন যে, আগামীতে তিনি কখনো মুসলমানদের উপর হামলা করবেন না। উমাইয়া তুর্কিস্তানের বাদশাহের সাথে উপরোক্ত চুক্তি সম্পাদন করে বল্‌খ থেকে মার্ভের দিকে ফিরে আসছিলেন এমন সময় মূসা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ তার উপর হামলা করেন। কিন্তু উমাইয়া বেশ কিছুটা ক্ষতি স্বীকার করে হলেও ঐ হামলা থেকে নিজেকে কোনমতে রক্ষা করে মার্ভের ধারেকাছে গিয়ে পৌঁছেন। অগত্যা মূসা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ পৌঁছে জানতে পারেন যে, বুকায়র ইব্‌ন বিশাহ্ মার্ভের উপর নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে মুকাবিলার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছেন। এখানেও যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং বুকায়র শহরকে সুদৃঢ় করে বসে থাকেন। শেষ পর্যন্ত কয়েকদিন পর সন্ধি স্থাপিত হয় এবং উমাইয়া ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ বুকায়রকে

খুরাসানের কোন একটি প্রদেশের শাসন কর্তৃত্ব প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে মার্ভকে তার দখল থেকে ছাড়িয়ে নেন।

ওদিকে মুহাল্লাব ইব্ন আবূ সুফরা এবং আবদুর রহমান ইব্ন মিখনাফ ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে খারিজীদের সাথে যুদ্ধরত ছিলেন। বাহিনীর লোকেরা ফিরে যাওয়ায় তাদের অবস্থা অত্যন্ত করুণ হয়ে দাঁড়ায়। এই সমস্ত পরিস্থিতি লক্ষ্য করে আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফ সাকাফীকে হিজাযের গভর্নর পদ থেকে বদলী করে ৭৫ হিজরীতে (৬৯৪ খ্রি) তার হাতে একাধারে কূফা ও বসরার শাসনভার অর্পণ করেন। হাজ্জাজ ৭৫ হিজরীর রমযান (৬৯৫ খ্রি জানুয়ারী) মাসে কূফায় প্রবেশ করেন। তিনি সোজা জামে মসজিদের মিম্বরে গিয়ে বসেন এবং জনসাধারণকে সেখানে একত্রিত হওয়ার নির্দেশ দেন।

কূফার লোকেরা সাধারণত অশিষ্ট ছিল। তারা শাসনকর্তাদের হেয় প্রতিপন্ন করতে ছিল অভ্যস্ত। তারা হাজ্জাজের আহ্বানে সাড়া দেয় বটে, তবে ভাষণ দানকালে তার উপর ছুঁড়ে মারার জন্য মুঠি ভরে কংকর নিয়ে আসে। কিন্তু হাজ্জাজ যখন বক্তৃতা করতে শুরু করেন তখন তার এমনি প্রতিক্রিয়া হয় যে, শ্রোতা মাত্রেই আতংকিত হয়ে ওঠে এবং ভয়ের চোটে কংকরগুলোও আপনা-আপনি তাদের হাত থেকে মাটিতে পড়ে যায়। হাজ্জাজ তার বক্তৃতায় বলেন ঃ

"এখানে অনেক পাগড়ি ও দাড়ি আমার দৃষ্টিগোচর হচ্ছে যা অচিরেই রক্তাপ্লুত হবে। এই সমাবেশে এমন অনেক মাথা আমি দেখতে পাচ্ছি যেগুলোকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করার সময় ঘনিয়ে এসেছে। আমীরুল মু'মিনীর আবদুল মালিক তাঁর তূনীরের সবগুলো তীর পরীক্ষা করে যেটাকে সবচাইতে শক্ত ও অব্যর্থ পেয়েছেন সেটাই তোমাদের উপর নিক্ষেপ করেছেন। অর্থাৎ তিনি আমার মত পাষাণ হৃদয়ের ব্যক্তিকে তোমাদের শাসনকর্তা নিয়োগ করেছেন। আমি তোমাদের সমস্ত দুষ্টামি ও বক্রতা দূর করে তোমাদের শায়েস্তা করে ছাড়ব। তোমরা দীর্ঘদিন থেকে ফাসাদ ও বিশৃঙ্খলার কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছ। এবার তোমাদের উচিত শিক্ষা দেবার এবং তোমাদের চোখ খুলে দেবার সময় এসে গেছে। তোমাদের মধ্যে ভাতা বণ্টন করে দেওয়ার জন্য আমীরুল মু'মিনীন নির্দেশ দিয়েছেন। তোমরা খারিজীদের মুকাবিলার জন্য অতি সত্বর মুহাল্লাবের কাছে চলে যাও। ভাতা বণ্টনের পর শুধু তিন দিন তোমাদের অবকাশ দেওয়া হবে। চতুর্থ দিন যদি কোন লোককে কূফায় দেখা যায় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তার গর্দান উড়িয়ে দেওয়া হবে। ভালোভাবে স্মররণ রেখ, এটা স্রেফ হুমকি নয়, বরং তোমরা স্বচক্ষেই দেখতে পাবে, আমি যা বলি তা করেও ছাড়ি।"

হাজ্জাজ জামে মসজিদ থেকে উঠে 'দারুল ইমরাত' তথা সরকারী প্রাসাদে যান এবং জনসাধারণের মধ্যে ভাতা বিতরণ করতে শুরু করেন। জনৈক বৃদ্ধ ব্যক্তি বার্ধক্যের কারণে যার দেহে ভাঁজ পড়ে গিয়েছিল, হাজ্জাজের কাছে এসে বলল, আমি একজন বৃদ্ধ লোক। আমার ছেলে আমার চাইতে অধিক শক্তিশালী। অতএব আমার স্থলে তাকেই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করুন। হাজ্জাজ জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কি ? সে উত্তর দিল, উমায়র ইব্ন দাবী বারজানী। হাজ্জাজ বললেন, তুমি কি সেই উমায়র ইব্ন দাবী, যে হযরত উসমান ইব্ন আফ্ফানের গৃহে হামলা করেছিল ?' সে উত্তর দিল, হ্যাঁ। হাজ্জাজ বললেন, কোন্ জিনিসটি তোমাকে এ কাজে

উদ্বুদ্ধ করেছিল ? সে উত্তর দিল, উসমান আমার বৃদ্ধ পিতাকে বন্দী করেছিলেন। হাজ্জাজ বললেন, তুমি জীবিত থাক এটা আমি পছন্দ করি না। এই বলে তিনি তাকে হত্যার এবং তার সব কিছু ছিনিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেন। তৃতীয় দিন হাজ্জাজের ঘোষক ঘোষণা দিল, আজ রাতে যে ব্যক্তি তার ঘরে থাকবে এবং মুহাল্লাবের কাছে রওয়ানা না হবে তাকে হত্যা করা হবে। এই ঘোষণা শোনার সাথে সাথে লোকেরা ত্বরিত বেগে মুহাল্লাবের বাহিনীর দিকে রওয়ানা হয়। ফলে খারিজীদের মুকাবিলার জন্য অতি অল্প সময়ের মধ্যেই মুহাল্লাব একটি বিরাট বাহিনীর অধিকারী হয়ে যান।

এরপর হাজ্জাজ হাকাম ইব্ন আইয়ূব সাকাফীকে বসরার এবং সাঈদ ইব্ন আসলাম ইব্ন যুরআকে সিন্ধুর শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। মুআবিয়া ইব্ন হারস কিলাবী এবং তার ভাই মুহাম্মদও জিহাদে বেরিয়ে পড়েন। তারাই বেশির ভাগ শহর দখল করে নেন এবং বিরুদ্ধবাদীদের হত্যা অথবা বন্দী করেন। এই কাজ শেষ করে তারা খোদ সাঈদকেও খতম করেন। এই সংবাদ শুনে হাজ্জাজ তার স্থলে মুজাআ ইব্ন সাঈদ তামীমীকে নিয়োগ করেন। সাঈদ ইব্ন আসলাম ইব্ন যুরআ নিজ ক্ষমতাবলে ঐ সীমান্তে একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার শাসনামলের এক বছর পর মাকরান দারাবীলের বেশির ভাগ শহর জয় করেন।

হাজ্জাজ কূফার ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন করে এখানে উরওয়া ইব্ন মুগীরা ইব্ন শোবাকে আপন প্রতিনিধি নিয়োগ করে স্বয়ং বসরায় চলে আসেন। বসরায় এসে তিনি সে ধরনেরই ভাষণ দেন, যা কূফায় দিয়েছিলেন। যারা মুহাল্লাবের পক্ষাবলম্বন করেছিল তিনি তাদেরকে খুব করে ধমকিয়ে দেন।

শারীক ইব্ন আমর ইয়াশকুরী হাজ্জাজের কাছে এসে বলল, আমি হার্নিয়া রোগে আক্রান্ত। আমার এই ওযর বশীর ইব্ন মারওয়ানও গ্রহণ করেছিলেন। অতএব আপনিও গ্রহণ করুন এবং আমাকে মুহাল্লাবের বাহিনীতে যোগদান থেকে রেহাই দিন। হাজ্জাজ সঙ্গে সঙ্গে তাকে হত্যার নির্দেশ দেন। এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করে সমগ্র বসরাবাসী ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে এবং মুহাল্লাবের বাহিনীতে যোগদান করার জন্য ঊর্ধ্বশ্বাসে সেদিকে ছুটতে থাকে। কূফা ও বসরা থেকে লোকদেরকে বের করে হাজ্জাজ নিজেও মুহাল্লাবের বাহিনীর দিকে রওয়ানা হন। মুহাল্লাবের অবস্থান স্থল 'দ্বারে হরমুয' থেকে ১৮ ফার্লং দূরত্বে তিনি শিবির স্থাপন করেন এবং বলেন, হে কূফাবাসী ও বসরাবাসী! তোমরা এখানে ততক্ষণ পর্যন্ত অবস্থান কর যতক্ষণ না খারিজীরা সমূলে ধ্বংস হয়ে যায়। এই জায়গায় হাজ্জাজ স্বয়ং নিজের জন্য একটি নতুন ফিতনার সৃষ্টি করেন।

মুসআব ইব্ন যুবায়রের যুগে সৈন্যদের ভাতা শত শত দিরহাম বাড়িয়ে দেয়া হয়েছিল এবং তখন পর্যন্ত সেই নিয়মই অব্যাহত ছিল। কিন্তু হাজ্জাজ নির্দেশ দিলেন, প্রত্যেক সৈন্যকে সেই পরিমাণ ভাতা দেওয়া হবে, যা মুসআবের পূর্বে নির্ধারিত ছিল। এর অর্থ হচ্ছে প্রত্যেক সৈন্যের ভাতা থেকে শত শত দিরহাম কমিয়ে দেওয়া হলো। তখন আবদুল্লাহ্ ইবনুল জারূদ বললেন, আমাদের এই বেতন আবদুল মালিক এবং তার ভাই বশীরও অনুমোদন করেছেন। অতএব আপনি তা হ্রাস করবেন না।

হাজ্জাজ আবদুল্লাহ্র কথায় কর্ণপাত করেননি। তাই তিনি পুনরায় অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে হাজ্জাজের ঐ হুকুমের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করেন। মুসকালা ইব্ন কারাব আবদী তাকে বলেন, আমীর যে হুকুম দিয়েছেন তা মান্য করা কর্তব্য, বিরোধিতা করা আমাদের জন্য মোটেই উচিত নয়। তখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন জারূদ মুসকালাকে তিরস্কার করতে করতে হাজ্জাজের দরবার থেকে চলে আসেন এবং হাকীম ইবন মুজাশিয়ীর কাছে গিয়ে যাবতীয় অবস্থা বর্ণনা করেন। হাকীম তাকে সমর্থন করেন। এভাবে একের পর এক অধিকাংশ সৈন্যই আবদুল্লাহ্ ইবনুল জারূদের সমর্থন করে এবং তারা সকলে মিলে তার হাতে এই মর্মে বায়আত করে যে, তারা যে করেই হোক হাজ্জাজকে কূফার গভর্নরের পদ থেকে অপসারণ করবে। এরপর তারা এক জোট হয়ে তার নেতৃত্বে হাজ্জাজের তাঁবু ঘেরাও করে।

হাজ্জাজের সাথে অতি অল্পসংখ্যক লোক ছিল। দুই দলের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধলে প্রতীয়মান হচ্ছিল যে, হাজ্জাজকে অচিরেই হত্যা অথবা বন্দী করা হবে। কিন্তু সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসায় সেদিনকার মত যুদ্ধ মুলতবি রাখা হয় এবং আবদুল্লাহ্র লোকেরা নিজ নিজ তাঁবুতে ফিরে যায়। প্রকৃত পক্ষে হাজ্জাজকে হত্যা নয়, বরং তাকে ইরাক থেকে বের করে দেওয়াই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। রাতের বেলা হাজ্জাজের বন্ধুরা তাকে পরামর্শ দেয়, তুমি এখান থেকে পালিয়ে আবদুল মালিকের কাছে চলে যাও। হাজ্জাজ এ ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে তার বিরুদ্ধ পক্ষের মধ্যে পরস্পর মতবিরোধ দেখা দেয় এবং তারই ফলশ্রুতিতে উবাদা ইব্ন হুসাইন সাবতী ইবনুল জারূদের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে হাজ্জাজের কাছে চলে আসে। এরপর তার দেখাদেখি যথাক্রমে কুতায়বা ইব্ন মুসলিম, সাব্য়া ইব্ন আলী কিলাবী, সাঈদ ইব্ন আসলাম কিলাবী, জা'ফর ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন মিখনাফ আযদী প্রমুখ নিজ নিজ অনুসারীদের সঙ্গে নিয়ে হাজ্জাজের কাছে চলে আসেন। মোটকথা, ভোর হতে না হতেই হাজ্জাজের কাছে ছয় হাজার সৈন্য এসে জড় হয়। তাই ভোর বেলা তিনি প্রতিপক্ষের উপর জোর হামলা চালান।

হাজ্জাজ এবং তার সঙ্গীদের যখন পৃষ্ঠপ্রদর্শনের উপক্রম হয় ঠিক তখনি আবদুল্লাহ্ ইব্নুল জারূদের গলদেশে একটি তীর বিদ্ধ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি মারা যান। এই ঘটনার পর যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা বিলকুল পাল্টে যায়। হাজ্জাজের বাহিনীর মধ্যে নব উদ্যম এবং ইব্নুল জারূদের বাহিনীর মধ্যে নৈরাশ্য দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত ইব্নুল জারূদের অনেক সঙ্গী নিহত হয় এবং অনেক নিরাপত্তা প্রার্থনা করে হাজ্জাজের বাহিনীতে এসে যোগ দেয়। হাজ্জাজ আবদুল্লাহ্ ও তার আঠার জন নেতৃস্থানীয় সঙ্গীর মস্তক ছিন্ন করে তা মুহাল্লাবের কাছে প্রেরণ করেন। মুহাল্লাব সেগুলোকে বর্শায় গেঁথে রাখেন যাতে খারিজীরা তা দেখে ভীত হয়। যখন ইবনুল জারূদের সাথে হাজ্জাজের সংঘর্ষ চলছিল ঠিক সেই মুহূর্তে বসরা থেকে এই সংবাদ আসে যে, সুদানের 'রান্জ' নামীয় একটি গোত্র, যারা বসরা ও তার আশেপাশে বসবাস করছিল, বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে।

ইব্নুল জারূদকে হত্যা করার পর হাজ্জাজ আপন পুত্র হাফ্সকে একটি ক্ষুদ্র বাহিনী দিয়ে রান্জ গোত্রের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। তিনি কূফাস্থ তার প্রতিনিধিকেও লিখেন, 'তুমি এই

নতুন বিদ্রোহ দমনের জন্য কূফা থেকে সৈন্য পাঠাও। শেষ পর্যন্ত বেশ কয়েকটি সংঘর্ষের পর রান্‌জদের বিদ্রোহ পুরোপুরি দমন সম্ভব হয়।

মুহাল্লাবের মুকাবিলা করার জন্য ইরান, খুরাসান ও ইরাকের বিভিন্ন শহর থেকে খারিজীরা 'দ্বারে হরমুয'-এ এসে সমবেত হয়। মুহাল্লাবকে পিছনে হটিয়ে বসরা দখল করে নেওয়ার জন্য তারা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে লড়ে যাচ্ছিল, এমনি সময়ে কূফা ও বসরা থেকে ক্রমান্বয়ে সাহায্যকারী বাহিনী আসতে থাকে। ফলে মুহাল্লাব ও আবদুর রহমান ইব্‌ন মিখনাফ, যারা শক্ত প্রাচীরের ন্যায় খারিজীদের মুকাবিলায় দাঁড়িয়েছিলেন, আরো শক্তিশালী হয়ে উঠল। সৈন্য সংখ্যা অল্প থাকার দরুন তারা এতক্ষণ শত্রু হামলা শুধু প্রতিরোধ করছিলেন, এবার সাহায্যকারী বাহিনী এসে পৌঁছায় খারিজীদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক যুদ্ধ শুরু করেন। খারিজীরা পিছু হটতে হটতে 'গাযরূন' নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছে এবং সেখানে শক্ত অবস্থান নিয়ে প্রতিপক্ষের মুকাবিলা করতে থাকে।

মুহাল্লাব এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করে প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে আপন বাহিনীর চারপাশে পরিখা খনন করেন। আবদুর রহমান ইব্‌ন মিখনাফ প্রথম থেকেই আপন বাহিনীকে মুহাল্লাবের বাহিনী থেকে পৃথক রাখতেন এবং পৃথক জায়গায় তাঁবুও গাড়তেন। এখানেও তিনি কিছুটা দূরত্বে আপন ছাউনি স্থাপন করেছিলেন। মুহাল্লাব আবদুর রহমানের কাছে বলে পাঠান, এখানে রাতের বেলা শত্রুদের আকস্মিক হামলার আশংকা রয়েছে। অতএব তুমিও তোমার বাহিনীর আশেপাশে পরিখা খনন কর। প্রত্যুত্তরে আবদুর রহমান বলে পাঠান, আপনি আশ্বস্ত থাকুন। আমাদের তরবারিই পরিখার কাজ দেবে। এই বলে তিনি উন্মুক্ত প্রান্তরে তাঁবুতেই অবস্থান করতে থাকেন।

একদা খারিজীরা রাতের বেলা মুহাল্লাবের উপর আকস্মিক হামলা চালায়। কিন্তু পরিখা থাকার কারণে তারা সম্মুকে অগ্রসর হতে পারে নি। এবার তারা আবদুর রহমানের দিকে অগ্রসর হয়। একেবারে খালি প্রান্তর। পথে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। তাই তারা বিদ্যুৎ বেগে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে তার বাহিনীর উপর হামলা চালিয়ে তাদেরকে অবাধে হত্যা করতে থাকে। আবদুর রহমানের ঘুমন্ত বাহিনী এই আক্রমণ প্রতিরোধ করার কোন অবকাশই পায়নি, তাই যে দিকে পারে সেদিকেই পালিয়ে যায়। আবদুর রহমান তার সামান্য কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে খারিজীদের আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টা করেন বটে, তবে শেষ পর্যন্ত তিনি এবং তাঁর সকল সঙ্গীকে খারিজীদের হাতে প্রাণ দিতে হয়। মুহাল্লাব ও আবদুর রহমান দু'জনই ছিলেন অধিনায়ক। মুহাল্লাবের বাহিনীর সমগ্র লোক ছিল বসরার এবং আবদুর রহমানের বাহিনীর লোক ছিল কূফার অধিবাসী। এ সংঘর্ষে কূফা বাহিনী মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। হাজ্জাজের কাছে এই সংবাদ পৌঁছালে তিনি আবদুর রহমানের স্থলে আত্তাব ইব্‌ন ওয়ারাকাকে কূফা বাহিনীর অধিনায়ক নিয়োগ করেন এবং তাকে পরিষ্কার নির্দেশ দেন ঃ তুমি মুহাল্লাবের অধীনে থাকবে এবং তার প্রতিটি নির্দেশ পালন করবে। একথা আত্তাবের কাছে খুবই অপছন্দনীয় ঠেকে। ফলে মুহাল্লাব ও আত্তাবের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়।

আত্তাব হাজ্জাজের কাছে আবেদন করেন, আপনি আমাকে এখান থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যান। হাজ্জাজ তার সে আবেদন মঞ্জুর করেন এবং তাকে সেখান থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যান।

এরপর কূফী বাহিনীকে সরাসরি মুহাল্লাবের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। মুহাল্লাব আপন পুত্র হাবীবকে আপন বাহিনীর এই কূফী অংশের অধিনায়ক নিয়োগ করেন এবং প্রায় এক বছর নিশাপুরে অবস্থান করে খারিজীদের মুকাবিলা করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত খারিজীদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় এবং তারা দুই দলে বিভক্ত হয়ে একে অন্যের বিরুদ্ধে লড়তে থাকে। মুহাল্লাব এই অবস্থায় তাদের উপর আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকেন। যখন তাদের একদল অপর দলকে পরাজিত করে তাবারিস্তানের দিকে তাড়িয়ে দিল তখন মুহাল্লাব বিজয়ী পক্ষের উপর হামলা চালিয়ে তাদেরকে একেবারে বিপর্যস্ত করে ফেলেন। এভাবে হিজরী ৭৭ সনে (৬৯৬ খ্রি) মুহাল্লাব খারিজীদের ফেতনা থেকে অব্যাহতি পান। খারিজীরা এমনি অতুলনীয় বীরত্ব সহকারে লড়ত যে, কোন কোন সময় তারা তাদের চাইতে দশগুণ, এমন কি বিশগুণ প্রতিপক্ষ বাহিনীকেও মেরে তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হতো। খারিজীদের বিরুদ্ধে যারা লড়েছেন তাদের মধ্যে একমাত্র মুহাল্লাবই ছিলেন এমন একজন অধিনায়ক, যিনি সব দিক দিয়েই সাফল্যের অধিকারী হতে পেরেছিলেন। খারিজীদের পর্যুদস্ত করে তিনি কূফায় ফিরে এলে হাজ্জাজ একটি জাঁকজমকপূর্ণ দরবারের আয়োজন করেন। মুহাল্লাবকে তার পার্শ্ববর্তী আসনেই বসান। মুহাল্লাবের সাত পুত্র ছিল এবং তারা সকলেই খারিজীদের মুকাবিলায় অত্যন্ত বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। অতএব তাদের বার্ষিক ভাতার পরিমাণ দু'হাজার দিরহাম করে বৃদ্ধি করা হয়। খারিজীদের যে পরাজিত দলটি তাবারিস্তানের দিকে পলায়ন করেছিল হাজ্জাজ তাদের পশ্চাদ্ধাবনের জন্য একটি বাহিনী প্রেরণ করেন এবং তারা তাদেরকে বিধ্বস্ত করে দেয়। ৭৬ হিজরীতে (৬৯৫ খ্রি) সালিহ ইব্‌ন মুসাররিহ-এর নেতৃত্বে খারিজীদের একটি দল মাওসিলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। তাদের দমনের জন্য মাওসিলের আমীর একটি বাহিনী মোতায়েন করেন। অনেক সংঘর্ষের পর সালিহ নিহত হন। এবার তার স্থলে শাবীব খারিজীদের নেতা নির্বাচিত হন। তিনি তার বাহিনী নিয়ে মাদায়েনে চলে যান। হাজ্জাজ তার পশ্চাদ্ধাবনের জন্য বাহিনীর পর বাহিনী প্রেরণ করতে থাকেন। এতদ্‌সত্ত্বেও তাকে পরাজিত করা সম্ভব হয়নি। শাবীবের সাথে মোট এক হাজ্জার লোক ছিল। একদা তিনি তার সাথীদের নিয়ে কূফায় আসেন এবং তথায় কিছুদিন অবস্থান করে চলে যান। হাজ্জাজ ঐ এক হাজার লোকের মুকাবিলার জন্য পঞ্চাশ হাজার কূফীর একটি বাহিনী পাঠান। খারিজীরা ঐ বাহিনীকেও পরাজিত করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেয়। শেষ পর্যন্ত একদিন শাবীব তার এক হাজার সঙ্গীসহ ধ্বংস ও নির্মূল হয়ে যান।

মুহাল্লাবের প্রতি হাজ্জাজের সম্মান প্রদর্শন

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের পর আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ানের জন্য খারিজীদের ফিতনাই ছিল সবচেয়ে ভয়ংকর। আবদুল মালিক যদি আরো কিছুদিন খারিজীদের সম্পর্কে উদাসীন থাকতেন এবং তাদের মূলোৎপাটনের উপায় অবলম্বন না করতেন তাহলে নিশ্চিতভাবে খুরাসান, পারস্য, ইরাক প্রভৃতি প্রদেশ তার হাতছাড়া হয়ে যেত। আর এই ফিতনা দমনের জন্য হাজ্জাজকে ইরাকের গভর্নর নিয়োগ করাই ছিল যুক্তিসংগত। কেননা অনুরূপ পরিস্থিতিতে ঐ পদের জন্য তিনিই ছিলেন সর্বাধিক যোগ্য ব্যক্তি। যা হোক হাজ্জাজ ইরাকে এসে তার দায়িত্ব অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেন। খারিজীদের মূলোৎপাটনের জন্য

মুহাল্লাব ইব্ন আবূ সুফরার নির্বাচনও ছিল খুবই যথার্থ। বেশ কয়েক বছরের চেষ্টার পর খারিজীদের দিক থেকে স্বস্তি পাওয়া গেল, তখন আবদুল মালিক ৭৮ হিজরীতে (৬৯৭ খ্রি) কূফা, বসরা অর্থাৎ ইরাকসহ খুরাসান ও সিজিস্তান এলাকাও সোজাসুজি হাজ্জাজের কর্তৃত্বাধীনে অর্পণ করেন। এভাবে প্রাচ্যের সমগ্র ইসলামী দেশসমূহের শাসনকর্তৃত্ব হাজ্জাজের হাতে চলে যায়। হাজ্জাজ ঐ বছরই নিজের পক্ষ থেকে মুহাল্লাবকে খুরাসানের এবং উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বকরকে সিজিস্তানের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। এতদিন পর্যন্ত মুহাল্লাব একজন সেনাপতি হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন। এবার তিনি প্রশাসক পদে অধিষ্ঠিত হলেন।

মুহাল্লাব ৮০ হিজরী (৬৯৯ খ্রি) পর্যন্ত স্বয়ং বসরায় অবস্থান করেন এবং নিজের পক্ষ থেকে আপন পুত্র হাবীবকে শাসনকর্তা নিয়োগ করে খুরাসানে প্রেরণ করেন। হাবীব পিতার নির্দেশ অনুযায়ী খুরাসানে গিয়ে উমাইয়া ইব্ন আবদুল্লাহ্ এবং তার অফিসারদের সাথে কোনরূপ বিরূপ ব্যবহার করেননি, বরং তাদের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করেন। হাজ্জাজ মুহাল্লাবের মেয়ে হিন্দকে বিবাহ করেন। আর এভাবে হাজ্জাজের সাথে মুহাল্লাবের আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

৮০ হিজরীতে (৬৯৯ খ্রি) মুহাল্লাব স্বয়ং খুরাসানে এসে শাসন কর্তৃত্ব নিজের হাতে গ্রহণ করেন এবং পাঁচ হাজার সৈন্যর একটি বাহিনী নিয়ে মাওরাউন নাহরের দিকে অগ্রসর হন এবং কুশ নামক দুর্গটি অবরোধ করেন। বাদশাহ্ খুতানের চাচাত ভাই এখানে এসে মুহাল্লাবের সাহায্য প্রার্থনা করেন। তিনি আপন পুত্র ইয়াযীদকে তার সাথে প্রেরণ করেন। ইয়াযীদ বাদশাহ্ খুতানকে হত্যা করে তার রাজ্য তারই ভাতিজার হাতে অর্পণ করেন এবং আপন ইচ্ছানুযায়ী তার কাছ থেকে অঙ্গীকার পত্র লিখিয়ে নিয়ে সেখান থেকে ফিরে আসেন। ঐ সময়েই মুহাল্লাব আপন পুত্র হাবীবকে চার হাজার সৈন্যসহ বুখারা আক্রমণের জন্য প্রেরণ করেন। বুখারার শাসক চল্লিশ হাজার সৈন্য নিয়ে হাবীবের মুকাবিলা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে হাবীবের কাছে পরাজয়বরণ করতে হয়। হাবীব প্রচুর মালে গনীমত নিয়ে মুহাল্লাবের কাছে ফিরে আসেন। কুশ অবরোধ দু'বছর পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। শেষ পর্যন্ত কুশবাসীরা জিয্য়া প্রদানে রাযী হয়। মুহাল্লাব তাদের সাথে সন্ধি চুক্তি সম্পাদন করেন এবং কুশ দুর্গের অবরোধ তুলে নেন।

কুশবাসী এবং হুরায়ছ ইব্ন কাতানার বিশ্বাসঘাতকতা

মুহাল্লাব যখন খুরাসানের রাজধানী মার্ভে আসেন তখন নিজের পক্ষ থেকে মুগীরাকে মার্ভের প্রশাসক নিয়োগ করেন, এরপর সেখানে থেকে 'মাওয়ারাউন নাহ্র' অর্থাৎ কুশ শহরের দিকে রওয়ানা হন। কুশ অবরোধ তখনো অব্যাহত ছিল এমনি সময়ে মুহাল্লাবের কাছে মুগীরার মৃত্যু সংবাদ এসে পৌছে। তখন মুহাল্লাব আপন পুত্র ইয়াযীদকে, যিনি তারই সঙ্গে ছিলেন মার্ভের প্রশাসক নিয়োগ করেন এবং ত্রিশজন সঙ্গীসহ তাকে তথায় পাঠিয়ে দেন। ইয়াযীদ যখন বুসত-এর একটি উপত্যকায় গিয়ে পৌছেন তখন সেখানকার পাঁচশ 'তুর্কী তাদেরকে ঘেরাও করে ফেলে। তুর্কীরা তাদের সাথে যত ধন-সম্পদ ছিল তার সবটাই দাবি করে কিন্তু ইয়াযীদ তা দিতে অস্বীকার করেন। শেষ পর্যন্ত ইয়াযীদের সঙ্গীরা সামান্য পরিমাণ ধন-সম্পদ দিয়ে তুর্কীদেরকে সন্তুষ্ট করে নেয়। কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর তুর্কীরা

পুনরায় ফিরে আসে এবং বলে, যাবতীয় ধন-সম্পদ না দেওয়া পর্যন্ত আমরা তোমাদেরকে ছাড়ব না।

ইয়াযীদ ত্রিশজন সঙ্গী নিয়েই তুর্কীদের মুকাবিলা করেন। শেষ পর্যন্ত তুর্কীদের নেতা নিহত হয় এবং বাকিরা পলায়ন করে। মার্ভে পৌঁছে ইয়াযীদ আপন ভাইয়ের জায়গায় শাসন পরিচালনা করতে থাকেন। এই ঘটনার কয়েকদিন পরই মুহাল্লাব কুশবাসীদের সাথে সন্ধি করে ফিরে আসেন। সন্ধি চুক্তিতে একথাও ছিল যে, কুশবাসীরা তাদের বাদশাহের ছেলেদেরকে মুসলমানদের হাতে অর্পণ করবে। আর ঐ ছেলেরা ততক্ষণ পর্যন্ত জামানত হিসাবে মুসলমানদের হিফাযতে থাকবে, যতক্ষণ না কুশবাসীরা নির্ধারিত পরিমাণ জিয্‌য়া মুসলমানদের হাতে সমর্পণ করে। জিয্‌য়া বা ফিদ্‌য়ার অর্থ আদায়, এরপর বাদশাহর ছেলেদেরকে ফেরত দানের জন্য মুহাল্লাব নিজের পক্ষ থেকে হুরায়স ইব্‌ন কাতানাকে সেখানে রেখে এসেছিলেন। মুহাল্লাব যখন কুশ থেকে রওয়ানা হয়ে বলখে এসে পৌঁছেন তখন একজন দূত মারফত হুরায়স ইব্‌ন কাতানাকে নির্দেশ দেন, ফিদ্‌য়ার অর্থ আদায় করার পর তুমি বাদশাহর ছেলেদেরকে তখন পর্যন্ত ছাড়বে না, যতক্ষণ না তুমি বল্‌খে এসে পৌঁছ।

মুহাল্লাব উক্ত নির্দেশ এজন্য দিয়েছিলেন যাতে হুরায়সকেও সেই পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে না হয় যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল ইয়াযীদকে। হুরায়স কুশবাসীদের এই নির্দেশনামা দেখিয়ে বলেন, যদি তোমরা অবিলম্বে জিয্‌য়ার অর্থ পরিশোধ কর তাহলে আমি এখানেই তোমাদের ছেলেদের তোমাদের হাতে তুলে দেব এবং মুহাল্লাবকে বলব, 'আপনার নির্দেশনামা হস্তগত হওয়ার পূর্বেই আমি জিয্‌রা অর্থ বুঝে পেয়ে ছেলেদের তাদের হাতে ফিরিয়ে দিয়েছি।' তখন কুশবাসীরা অবিলম্বে জিয্‌য়া পরিশোধ করে তাদের ছেলেদের ফেরত নিয়ে নেয়।

পথিমধ্যে তুর্কীরা হুরায়সের সাথেও সেই আচরণই করে, যা তারা ইয়াযীদের সাথে করেছিল। যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এতে হুরায়সের অনেক লোক নিহত হয়। অনেককে তুর্কীরা বন্দী করে, এরপর মুক্তিপণের বিনিময়ে ফেরত দেয়। যখন হুরায়স ইব্‌ন কাতানা মুহাল্লাবের কাছে এসে পৌঁছেন তখন মুহাল্লাব তার নির্দেশ পালন না করার শাস্তিস্বরূপ হুরায়সকে বিশ ঘা বেত্রদণ্ড প্রদান করেন। এই শাস্তি ভোগ করার পর হুরায়স জনসাধারণের সামনে এই মর্মে শপথ করেন যে, তিনি যে ভাবেই হোক, মুহাল্লাবকে হত্যা করবেন। মুহাল্লাব যখন এই সংবাদ পান তখন তিনি হুরায়সের ভাই সাবিত ইব্‌ন কাতানাকে ডেকে পাঠান। এরপর তার সামনেই মুহাল্লাবকে ডেকে পাঠিয়ে অত্যন্ত নম্র ভাষায় তাকে তার শপথ পরিহার করতে বলেন। কিন্তু হুরায়স মুহাল্লাবের সামনেই অশিষ্টের মত তার শপথের পুনরাবৃত্তি করে। মুহাল্লাব বিষয়টি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখেন এবং হুরায়সের অশিষ্টতার কোন উত্তর না দিয়েই তাকে বিদায় দেন। হুরায়স ও সাবিত এবার মনে মনে ভয় পেয়ে যায় এবং নিজেদের তিনশ' সঙ্গীকে সাথে করে মুহাল্লাবের কাছ থেকে পালিয়ে যায় এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাযিমের কাছে তিরমিযে গিয়ে পৌঁছে। ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, মূসা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাযিম নিজেই একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং খুরাসানের শাসকদের সাথে তার সংঘর্ষ সব সময়ই লেগে থাকত। এটা হচ্ছে ৮২ হিজরীর (৭০১ খ্রি) ঘটনা।

মুহাল্লাবের মৃত্যু এবং নিজ পুত্রদের প্রতি তার অন্তিম উপদেশ

মুহাল্লাব আপন পুত্র মুগীরার মৃত্যুতে অত্যন্ত ব্যথিত হন। মার্ভে ফিরে আসার পর তিনি বেশি দিন জীবিত ছিলেন না। ৮২ হিজরীর (৭০১ খ্রি) শেষ দিকে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মারা যান। আমীর মুহাল্লাবের বীরত্ব, পবিত্রচিত্ততা ও বিশ্বস্ততার বিশেষ খ্যাতি ছিল। তার আচার-আচরণ ও চালচলন ছিল অবিশ্বস্ততা ও বিদ্রোহ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তিনি সব সময়ই খলীফার আনুগত্য এবং তার প্রতিটি নির্দেশ পালন জরুরী মনে করতেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তার পুত্র ইয়াযীদকে নিজের স্থলে খুরাসানের আমীর এবং অপর পুত্র হাবীবকে সালাতের ইমাম নিয়োগ করেন। এরপর সকল পুত্রকে একত্র করে নিম্নোক্ত অন্তিম উপদেশ (ওসীয়ত) প্রদান করেন ঃ

"তোমাদের প্রতি আমার অন্তিম উপদেশ এই যে, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখবে। কেননা এর দ্বারা জীবন দীর্ঘ হয়, ধন-সম্পদে প্রাচুর্য আসে এবং জনশক্তিও বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ্‌র ভয় পরিত্যাগ এবং আত্মীয়তার বন্ধন বিচ্ছিন্ন করা থেকে আমি তোমাদেরকে নিষেধ করছি। কেননা এতে জাহান্নামে যাওয়ার পথ প্রশস্ত হয়, লাঞ্ছিত ও অপমানিত হতে হয় এবং জনশক্তিও হ্রাস পায়। আমীর-উমারা তথা প্রশাসকদের আনুগত্য এবং মুসলিম জামাআতের সাথে ঐকমত্য পোষণ করা তোমাদের জন্য ফরয। তোমাদের কার্যকলাপ তোমাদের কথাবার্তার চাইতে শ্রেষ্ঠ হওয়া উচিত। প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তাড়াহুড়া করো না। নিজের জিহ্বাকে স্খলন ও বিচ্যুতি থেকে রক্ষা কর। কেননা মানুষ পায়ের স্খলনে টিকে থাকতে পারে, কিন্তু জিহ্বার স্খলনে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তোমাদের উপর যে সমস্ত লোকের হক রয়েছে তা তোমরা আদায় কর।

সকাল-সন্ধ্যা বসে বসে অনর্থক গাল-গল্প বলার চাইতে মানুষের প্রাপ্য আদায় করা অনেক ভাল। তোষামোদকারীদের জালে আটকা পড়ো না। বদান্যতাকে কার্পণ্যের উপর প্রাধান্য দাও। পুণ্যকে জীবিত রাখ এবং সব সময় পুণ্যকাজ করার চেষ্টা কর। যুদ্ধের সময় সদা-সতর্ক থাক। কেননা এটা বীরত্বের চাইতে অধিক ফলদায়ক। যখন যুদ্ধ বাঁধে তখন আসমান থেকে মৃত্যু অবতীর্ণ হয়। তখন যদি মানুষ সাহসে বুক বেঁধে সদা-সতর্ক থাকতে পারে তাহলে জয় সুনিশ্চিত। আর যদি কেউ বোধশক্তি হারিয়ে ফেলে তাহলে তার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। তবে এসব কিছুই আল্লাহ্‌র হুকুমের অধীন। কুরআন ও সুন্নতের শিক্ষা অনুসরণ এবং পুণ্যবানদের প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শন তোমরা নিজেদের জন্য বাধ্যতামূলক করে নাও। তোমরা নিজেদের মজলিসে অধিক কথাবার্তা বলা থেকে বিরত থাক।"

হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফ ও আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মদ

উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, হাজ্জাজ ৭৮ হিজরীতে (৬৯৭ খ্রি) মুহাল্লাবকে খুরাসানের এবং উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বকরকে সিজিস্তান ও সিন্ধুর আমীর নিয়োগ করেছিলেন। সিন্ধু ও সিজিস্তানের পূর্ব দিক থেকে হিন্দুরা এবং উত্তর দিক তেকে তুর্কী ও মুঘলরা মুসলিম রাষ্ট্রের উপর প্রায়ই হামলা করত। তাই হাজ্জাজ হিমইয়ান ইব্‌ন আদী আসাদীকে সমরাস্ত্রে সজ্জিত একটি দুর্ধর্ষ বাহিনীর অধিনায়ক করে কিরমানে পাঠান এবং সেখানে অবস্থানের নির্দেশ দেন।

তিনি তাকে এও নির্দেশ দেন, যখন সিজিস্তান ও সিন্ধুর প্রশাসকদের কোন প্রয়োজন দেখা দেবে তখন তুমি তাদের সাহায্যে এগিয়ে যাবে। উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বকর কর্মস্থলে পৌঁছে নিজ দায়িত্ব পালনে আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু হিমইয়ান ইব্ন আদী কিরমানে নিজের অধীনে একটি দুর্ধর্ষ বাহিনী রয়েছে দেখে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং খোদ উবায়দুল্লাহ্‌কে সাহায্য করার পরিবর্তে তার এলাকা আক্রমণ করেন।

হাজ্জাজ এই সংবাদ পেয়ে হিমইয়ান ইব্ন আদীকে দমনের জন্য আবদুর রহমান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আশআছকে পাঠান। আবদুর রহমান হিমইয়ানকে পরাজিত ও পর্যুদস্ত করেন। এরপর কিছু দিন কিরমানে অবস্থান করে ফিরে আসেন। ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, তুর্কিস্তানের বাদশাহ রুতবেল কর প্রদানের প্রতিশ্রুতিতে মুসলমানদের সাথে সন্ধি স্থাপন করেছিলেন। উবায়দুল্লাহ্ আসার পর তিনি তার কাছে কিছুদিন কর প্রদান করেন। এরপর বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। উবায়দুল্লাহ্ রুতবেলের রাজ্য আক্রমণ করেন। তখন বাদাখশান, কাফিরিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে শুরু করে তিব্বত পর্যন্ত রুতবেলের অধীনে ছিল। উবায়দুল্লাহ্ যখন আক্রমণ চালাল রুতবেল পিছনে হটতে হটতে উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বকরকে এমন এক স্থানে নিয়ে যান যেখান থেকে ফিরে আসাটা তার পক্ষে ছিল সুকঠিন। শেষ পর্যন্ত মুসলমানরা গিরি-গুহায় পতিত হতে লাগল এবং তাতে অনেকেই নিহত হলো। শুরায়হ ইব্ন হানীও ঐ জায়গায় নিহত হন। যারা কোন মতে ফিরে আসে তাদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত করুণ। সিজিস্তান-বাহিনীর এই বিপর্যয়কর অবস্থার কথা হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফ সাকাফীর কানে পৌঁছলে তিনি আবদুল মালিককে সে সম্পর্কে অবহিত করেন এবং তার কাছ থেকে রুতবেলের এলাকা আক্রমণের অনুমতি প্রার্থনা করেন। আবদুল মালিক সঙ্গে সঙ্গে অনুমতি প্রদান করেন। হাজ্জাজ কূফা থেকে বিশ হাজার অশ্বারোহী এবং বসরা থেকে বিশ হাজার পদাতিক সৈন্য সংগ্রহ করে এবং আবদুর রহমান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আশআছকে ঐ চল্লিশ হাজার অভিজ্ঞ সৈন্যের অধিনায়ক নিয়োগ করেন। ঐ সময়ে সংবাদ এসে পৌঁছে যে, উবায়দুল্লাহ্ সিজিস্তানে ইনতিকাল করেছেন।

হাজ্জাজ আবদুর রহমান ইব্ন মুহাম্মদ আশআছকে সিজিস্তানের গভর্নর নিয়োগ করেন এবং তাকে রুতবেলের রাজ্য আক্রমণের নির্দেশ দেন। আবদুর রহমান যখন ইসলামী বাহিনী নিয়ে সিজিস্তানে গিয়ে পৌঁছেন এবং রুতেবল জানতে পারেন যে, এখনি তার দেশের উপর হামলা চালানো হবে তখন তিনি অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু তখন তার আর করার কিছুই ছিল না। আবদুর রহমান রুতবেলের দেশ জয় করে ক্রমশ অগ্রসর হতে থাকেন। তবে পথিমধ্যে যেখানেই কোন উপত্যকা বা ঘাঁটি পড়ত তিনি সেখানেই সেনাচৌকি স্থাপন করে সামনের দিকে অগ্রসর হতেন। শেষ পর্যন্ত তিনি রুতবেলের রাজ্যের অর্ধেকের চাইতেও বেশি জয় করে পরবর্তী বছরের জন্য অগ্রাভিযান মুলতবি রাখেন। তিনি হাজ্জাজের কাছে তার বিজয়বার্তা প্রেরণ করে বলেন ঃ

"আমরা আগামী বছরের জন্য অগ্রাভিযান মুলতবি রেখেছি, যাতে বিজিত এলাকার শাসন ব্যবস্থা সুসংগঠিত করে তোলা যায় এব সৈন্যরাও কিছুটা বিশ্রাম গ্রহণের সুযোগ পায়। হাজ্জাজ

এই বার্তা পাঠ করে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ দেন, তুমি তোমার অগ্রাভিযান অব্যাহত রাখ। রুতবেলের বাহিনীর যে সমস্ত লোক তোমার কাছে বন্দী আছে তাদেরকে অবিলম্বে হত্যা কর এবং দুর্গসমূহ ধ্বংস করে ফেল। আবদুর রহমানের কাছে এই নির্দেশ পৌঁছার পূর্বেই তিনি একই মর্মে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় নির্দেশও তার কাছে প্রেরণ করেন। তৃতীয় নির্দেশে এও লেখা হয়, তুমি যদি আমার এই নির্দেশ পালন কর তাহলে তো ভাল অন্যথায় নিজেকে পদচ্যুত মনে করবে এবং তোমার স্থলে মুসলিম বাহিনীর অধিনায়ক হবে তোমার ভাই ইসহাক। তিনটি নির্দেশই একের পর এক আবদুর রহমানের কাছে পৌঁছে। তিনি হাজ্জাজের নির্দেশসমূহ পাঠ করে সমগ্র বাহিনীকে একত্র করেন এবং নিম্নোক্ত ভাষণ দেন ঃ

"আমি তোমাদের সকলের সাথে পরামর্শক্রমে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে, আমরা এখন তুর্কীদের বিজিত এলাকার শাসনব্যবস্থা সুসংগঠিত করব, নিজেদেরকে আরো সুদৃঢ় করব এবং পরিপূর্ণ রণপ্রস্তুতি নিয়ে আগামী বছর রুতবেলের রাজ্যের বাকি অংশ জয় করব। কিন্তু হাজ্জাজ তুর্কীদের সাথে অবিরাম লড়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তোমরা যে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছ এবং এখন তোমাদের বিশ্রাম গ্রহণের যে খুবই প্রয়োজন সেদিকে তার কোন লক্ষ্য নেই। এটা হচ্ছে সেই দেশ, যেখানে কিছুদিন পূর্বেও তোমাদের ভাইরা ধ্বংসের সম্মুখীন হয়েছে। আমি তোমাদের ভাই এবং তোমাদের মতই একজন মানুষ। যদি তোমরা সকলে লড়তে এবং অগ্রাভিযান চালাতে প্রস্তুত থাক তাহলে আমিও তোমাদের সাথে রয়েছি।"

এই ভাষণ শুনে সমগ্র কূফী ও বসরী সৈন্য অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে ওঠে। তারা আবদুর রহমানকে সম্বোধন করে সমস্বরে বলে ওঠে, আমরা কখনো হাজ্জাজের আনুগত্য করব না। তার কোন কথাই শুনব না। আমির ইব্‌ন দাইলা কিনানী বলেন, হাজ্জাজ হচ্ছে আল্লাহর দুশমন। তাকে আমীরের (গভর্নরের) পদ থেকে বিচ্যুত করে তার স্থলে আবদুর রহমানকে বসাও এবং আমীর হিসাবে তার হাতে বায়আত কর। তখন চতুর্দিক দিকে আওয়াজ ওঠে, হ্যাঁ, আমরাও তাই চাই। আবদুর রহমান ইব্‌ন শীস রিবয়ী সকলের প্রতি আহবান জানিয়ে বলে, 'চল, আমরা আল্লাহর শত্রু হাজ্জাজকে আমাদের শহর থেকে বের করে দেই। একথা শোনামাত্র সৈন্যরা আবদুর রহমানের হাতে বায়আত করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা অঙ্গীকার করে, আমরা হাজ্জাজকে ইরাক থেকে বের করে তবে ছাড়ব। ঠিক ঐ মুহূর্তে আবদুর রহমান রুতবেলের কাছে একটি পয়গাম পাঠান এবং সঙ্গে সঙ্গে তার সাথে এই মর্মে সন্ধি স্থাপিত হয় যে, যদি আবদুর রহমান এবং তার বাহিনী হাজ্জাজকে তাদের শহর থেকে বের করে দিতে সক্ষম হয় তাহলে রুতবেলের রাজ্যের সমগ্র কর মাফ করে দেওয়া হবে। আর যদি হাজ্জাজ জয়লাভ করে তাহলে রুতবেল তাকে এবং তার বাহিনীকে নিজের এলাকায় প্রবেশ করতে দেবে না এবং তার মুকাবিলায় সর্বশক্তি নিয়োগ করবে।

শেষ পর্যন্ত মুসলিম বাহিনী সমগ্র বিজিত এলাকা ত্যাগ করে ইরাক অভিমুখে যাত্রা করে। হাজ্জাজ এই বাহিনীর প্রত্যাবর্তন সংবাদ জানতে পেরে আবদুল মালিককে যাবতীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করে বলেন, আপনি আমার সাহায্যের জন্য সৈন্য প্রেরণ করুন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে সৈন্য পাঠান। মুহাল্লাব এই ঘটনার কথা জানতে পেরে হাজ্জাজকে সহানুভূতির সাথে

লিখেন, তুমি ইরাকবাসীদেরকে তাদের নিজ নিজ ঘরে ফিরে আসতে দাও এবং তাদের সামনে কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করো না।

হাজ্জাজ ঐ পরামর্শের কোন পরওয়া করেন নি। কেননা ইরাকীদের উপর তার আর কোন আস্থা ছিল না। এবার মুহাল্লাব সম্পর্কেও তার অন্তরে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হয়। এমনকি তিনি এ চিন্তাও করে বসেন যে, খুরাসানের গভর্নর মুহাল্লাবও নিশ্চয়ই তাদের সমর্থক ও উপদেষ্টা হয়ে থাকবে। আবদুল মালিক প্রেরিত সৈন্যরা এসে পৌঁছলে হাজ্জাজ তাদেরকে নিয়ে বসরা থেকে রওয়ানা হন এবং 'তাশ্‌তার' নামক স্থানে পৌঁছে অশ্বারোহী বাহিনীকে অগ্রবর্তী বাহিনী হিসাবে সামনে বাড়িয়ে দেন। আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মদও সেখানে এসে পৌঁছে গিয়েছিলেন। তার অশ্বারোহীরা হাজ্জাজের অশ্বারোহীদেরকে আক্রমণ করে ভাগিয়ে দেয় এবং তাদের একটি বিরাট অংশকে হত্যা করে।

এবার হাজ্জাজ বাধ্য হয়ে 'তাশতার' থেকে বসরার দিকে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি যাবিয়ার দিকে মোড় নেন, আর আবদুর রহমান সোজাসুজি বসরায় এসে প্রবেশ করেন। বসরাবাসীরা আবদুর রহমানের হাতে বায়আত করে। তখন মুহাল্লাবের উপদেশটি হাজ্জাজের মনে পড়ে। তিনি হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেন, মুহাল্লাব যা কিছু লিখেছিলেন, যথার্থই লিখেছিলেন। হাজ্জাজের কঠোর ব্যবহারের কারণে বসরাবাসীরা তার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল। এবার তারা একজোট হয়ে আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ানের খিলাফত অস্বীকার করে বসে এবং হাজ্জাজের মুকাবিলার প্রস্তুতি নেয়। এটা হচ্ছে ৮১ হিজরীর (৭০০ খ্রি) ঘটনা। ৮২ হিজরীর মুহাররম (৭০১ খ্রি ফেব্রুয়ারী) মাসের প্রথম থেকে হাজ্জাজ এবং আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মদের মধ্যে একের পর এক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কখনো হাজ্জাজ জয়ী হতেন, আবার কখনো আবদুর রহমান। কিন্তু ২৯শে মুহাররমে যে যুদ্ধ হয় তাতে আবদুর রহমান শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। তিনি তার পরাজিত সৈন্যদের নিয়ে কূফা রওয়ানা হন এবং সেখানকার সরকারী প্রাসাদ দখল করেন। আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মদ পরাজিত হলে বসরাবাসীরা আবদুর রহমান ইব্‌ন আব্বাস ইব্‌ন রাবীআর হাতে বায়আত করে এবং হাজ্জাজের বিরুদ্ধে অনবরত লড়ে যেতে থাকে। চার-পাঁচ দিন পর্যন্ত আবদুর রহমান ইব্‌ন আব্বাস অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে হাজ্জাজের মুকাবিলা করেন। এই অবসরে আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মদ অতি সহজে কূফার উপর নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। শেষ পর্যন্ত আবদুর রহমান ইব্‌ন আব্বাসও অনেক বসরী সৈন্য নিয়ে বসরা থেকে কূফায় এসে তার সাথে মিলিত হন। এবার হাজ্জাজ বসরায় প্রবেশ করে হাকীম ইব্‌ন আইয়ুব সাকাফীকে সেখানকার শাসনকর্তা নিয়োগ করে স্বয়ং কূফা রওয়ানা হন। 'দায়রে কুবরা' নামক স্থানে পৌঁছে তিনি তাঁবু ফেলেন। এদিকে কূফা থেকে আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মদ রওয়ানা হন এবং 'দায়রে জাম্ম' নামক স্থানে অবস্থান নেন। উভয় পক্ষই পরিখা, বেষ্টনী ইত্যাদি নির্মাণ করে এবং ঘোরতর যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধ দীর্ঘদিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। প্রতিদিনই উভয় পক্ষের সৈন্যরা যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতো এবং একে অপরকে পিছনে হটিয়ে নিয়ে যেত। কিন্তু চূড়ান্ত কোন ফায়সালা হতো না। শেষ পর্যন্ত আবদুল মালিক আপন পুত্র আবদুল্লাহ্ এবং আপন ভাই মুহাম্মদের নেতৃত্বে একটি বিরাট বাহিনী কূফায় প্রেরণ করেন এবং তাদের মাধ্যমে ইরাকবাসীদের প্রতি নিম্নোক্ত পয়গাম পাঠান।

'আমি হাজ্জাজকে পদচ্যুত করব। আর ইরাকীদের ভাতাসমূহ সিরীয়দের মতই নির্ধারণ করে দেব। আর আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মদ যে প্রদেশেরই গভর্নর হতে চাইবে আমি তাকে তথাকার গভর্নর করব।

হাজ্জাজ এই পয়গামের বিবরণী শুনে অত্যন্ত ব্যথিত হন। তিনি আবদুল্লাহ্ এবং আবদুল মালিককে লিখেন, 'আপনার এই কর্মপন্থা ইরাকীদেরকে কখনো অনুগত করতে পারবে না, বরং এতে তাদের অবাধ্যতা আরো বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু আবদুল মালিক হাজ্জাজের একথা অপছন্দ করেন। শেষ পর্যন্ত আবদুল্লাহ্ এবং মুহাম্মদ ইরাকীদের কাছে আবদুল মালিকের ঐ পয়গাম পৌঁছিয়ে দেন।

ইরাকবাসীদের জন্য এটি ছিল একটি বিরাট সাফল্য। আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মদ আবদুল মালিকের এই প্রস্তাব মেনে নিতেও সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু সৈন্যরা বেঁকে বসল। তারা সমস্বরে বলে উঠল, আমরা আবদুল মালিকের খিলাফতের বায়আত ইতিমধ্যে প্রত্যাহার করে নিয়েছি। অতএব তার কোন কথাই মানা চলে না। আবদুল্লাহ্ এবং মুহাম্মদ এই অবস্থা দেখে নিজেদের বাহিনী হাজ্জাজের কাছে রেখে আবদুল মালিকের কাছে চলে যান। এরপর নতুন উদ্যম ও নতুন প্রস্তুতির সাথে উভয় পক্ষের মধ্যে পুনরায় ঘোরতর যুদ্ধ শুরু হয় এবং এক বছর পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। উভয় পক্ষ প্রতিদিন ভোরে নিজ নিজ অবস্থান থেকে বেরিয়ে আসতে এবং সারাদিন যুদ্ধ করে সন্ধ্যার সময় ফিরে যেত। এই সমস্ত যুদ্ধে আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মদের পাল্লা ভারী দেখাচ্ছিল এবং হাজ্জাজ অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিলেন। কিন্তু হাজ্জাজের কাছে সিরিয়া থেকে অনবরত সাহায্য এসে পৌঁছছিল। শেষ পর্যন্ত ৮৩ হিজরীর ১৫ই জামাদিউস সানী (৭০২ খ্রি জুলাই) একটি চূড়ান্ত ফায়সালাকারী যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং আকস্মিক কিছু ঘটনার কারণে হাজ্জাজ তাতে জয়লাভ করেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে কূফায় প্রবেশ করেন এবং সেখানে নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। হাজ্জাজ পুনরায় কূফাবাসীদের কাছ থেকে বায়আত গ্রহণ করেন এবং এক্ষেত্রে কেউ ইতস্তত করলে তাকে সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করেন।

বসরায় আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মদের কাছে বহু সংখ্যক সৈন্য এসে জড় হয়। তিনি তখন হাজ্জাজের বিরুদ্ধে হামলা পরিচালনার সংকল্প নেন। হাজ্জাজ এই সংবাদ শোনামাত্র কূফা থেকে একটি বিরাট বাহিনী নিয়ে বসরা অভিমুখে রওয়ানা হন। ৮৩ হিজরীর ১লা শাবান (৭০২ খ্রি সেপ্টেম্বর) যুদ্ধ শুরু হয় এবং ১৫ই শাবান পর্যন্ত তা অত্যন্ত জোরেশোরে চলতে থাকে। হাজ্জাজ বেশ কয়েকবারই পরাজিত হন, কিন্তু পুনরায় নিজেকে কোনমতে সামলে নেন। হাজ্জাজের বাহিনীতে আবদুল মালিক ইব্‌ন সুলবও ছিলেন। ১৫ শাবান যখন আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মদ হাজ্জাজকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন তখন আবদুল মালিক ইব্‌ন মুহাল্লাব আপন অশ্বারোহী সঙ্গীদের নিয়ে আবদুর রহমানের উপর আকস্মিক হামলা চালান। ঠিক তখনি এই হামলা চালানো হয় যখন আবদুর রহমান হাজ্জাজের ক্যাম্পে লুটপাট চালিয়ে এবং তাকে তার অবস্থান থেকে তাড়িয়ে বিজয়ীবেশে আপন অবস্থানে ফিরে আসছিলেন। যাহোক আবদুল মালিকের হামলা আবদুর রহমানের সঙ্গী-সাথীদেরকে একেবারে ছিন্নভিন্ন করে দেয় এবং তারা ঊর্ধ্বমুখে পলায়ন করে। তাদের অনেকেই পরিখায় পতিত হয়ে ধ্বংস হয়।

অনেকে আবদুল মালিকের হাতে মারা যায়, আবার অনেকে কোনমতে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ রক্ষা করে।

এবার পরাজিত হাজ্জাজ ফিরে এসে আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মদের ছাউনি দখল করে নেন। এই পরাজয়ের পর আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মদ বসরা থেকে সূস, সাবূর, কিরমান, যারানজ ও বুস্‌ত হয়ে তুর্কিস্তানের বাদশাহ্‌ রুতবেলের কাছে চলে যান। আবদুর রহমানের সঙ্গীরা সিজিস্তানের নিকটে একত্রিত হয়ে আবদুর রহমান ইব্‌ন আব্বাসকে নিজেদের নামাযের ইমাম মনোনীত করে এবং আপন সঙ্গী-সাথীদেরকে সবদিক থেকে ডেকে এনে সেখানে জড় করে। এরপর তারা আবদুর রহমানের কাছে এই মর্মে পয়গাম পাঠায়, আপনি ফিরে আসুন এবং খুরাসান দখল করে নিন। আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মদ বলেন, ইয়াযীদ ইব্‌ন মুহাল্লাব খুরাসান শাসন করছেন। তার থেকে এটা ছিনিয়ে আনা মোটেই সহজ নয়। কিন্তু তার সাথীরা তার উপর এমনভাবে চাপ সৃষ্টি করে যে, বাধ্য হয়ে তাকে রুতবেলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে আসতে হয়। এবার তার বাহিনীর লোকসংখ্যা ছিল ২০ হাজার। তিনি তাদেরকে নিয়ে হিরাতের দিকে অগ্রসর হন এবং সহজেই হিরাত দখল করে নেন। ইয়াযীদ ইব্‌ন মুহাল্লাব তার বাহিনী নিয়ে আবদুর রহমানের মুকাবিলা করতে আসেন। উভয় বাহিনী পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বেই আবদুর রহমানের বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করতে শুরু করে। বাধ্য হয়ে তিনি সামান্য সংখ্যক সৈন্য নিয়ে ইয়াযীদের মুকাবিলা করেন। তাতে তার অনেক সৈন্য নিহত অথবা বন্দী হয়। তিনি সেখান থেকে সিন্ধুতে পালিয়ে যান। ইয়াযীদ তার বাহিনীকে প্রতিপক্ষের পশ্চাদ্ধাবন থেকে রুখে রাখেন। আবদুর রহমান শেষ পর্যন্ত সিন্ধুতে গিয়ে হিরাত যুদ্ধে ইয়াযীদ যে সমস্ত লোককে বন্দী করেছিলেন তাদের মার্ভে নিয়ে যান এবং সেখান থেকে হাজ্জাজের কাছে পাঠিয়ে দেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস ছিলেন ঐ সমস্ত বন্দীর অন্যতম। হাজ্জাজের নির্দেশে তাকেও হত্যা করা হয়। আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আশআছ সিন্ধু থেকে রুতবেলের কাছে চলে যান এবং সেখানে পৌঁছে সিলরোগে (ফুসফুসের ক্ষত) আক্রান্ত হন। হাজ্জাজ রুতবেলকে লিখেন, যদি তুমি আবদুর রহমানের ছিন্ন মস্তক আমার কাছে পাঠিয়ে দাও তাহলে আমি তোমার দশ বছরের কর মাফ করে দেব। রুতবেল অসুস্থ আবদুর রহমানের মাথা কেটে হাজ্জাজের কাছে পাঠিয়ে দেন। এটা হচ্ছে ৮৪ হিজরীর (৭০৩ খ্রি) ঘটনা।

ওয়াসিত নগরীর পতন

উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মদের সাথে মুকাবিলা করার উদ্দেশ্যে হাজ্জাজকে আবদুল মালিকের কাছ থেকে বার বার সামরিক সাহায্য চাইতে হয়েছিল। যখন আবদুর রহমান ইরাক থেকে বেদখল হয়ে সিজিস্তানের দিকে ফিরে এলো তখন হাজ্জাজের কাছে বিরাট সংখ্যক সিরীয় সৈন্য ছিল। বসরা ও কূফাবাসীদের দিক থেকে হাজ্জাজের স্বস্তি ছিল না। কেননা কূফা ও বসরার লোকেরা তো আবদুর রহমানের সাথে শরীক হয়ে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। অতএব হাজ্জাজ দীর্ঘদিন পর্যন্ত সিরীয় বাহিনীকে নিজের কাছে রাখার প্রয়োজনবোধ করেন। প্রথমে তিনি নির্দেশ দেন, সিরীয়রা যেন কূফীদের ঘরে অবস্থান করে। কিন্তু কিছুদিন পরই সিরীয়রা কূফী স্ত্রীলোকদের সাথে শ্লীলতা হানিকর কার্যকলাপ শুরু করে।

হাজ্জাজ এটা জানতে পেরে সিরীয় বাহিনীর জন্য তিনি একটি পৃথক ছাউনি নির্মাণের প্রয়োজনবোধ করেন। তিনি কয়েকজন অভিজ্ঞ লোককে ছাউনির জন্য একটি উপযুক্ত জায়গা নির্বাচনের নির্দেশ দেন। তারা দেখতে পান যে, এক রাহিব (খ্রিস্টান পুরোহিত) একটি নোংরা জায়গা পরিষ্কার করছে। তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, আমি আমাদের ধর্মীয় গ্রন্থে পড়েছি, এই জায়গায় আল্লাহ্‌র উপাসনার জন্য একটি মসজিদ নির্মাণ করা হবে। তাই আমি এটা পরিষ্কার করছি। তারা হাজ্জাজের কাছে এই ঘটনার কথা বললে তিনি ঐ বিশেষ জায়গায় একটি মসজিদ নির্মাণ করে তার আশেপাশে সেনাছাউনি গড়ে তোলেন এবং সেখানে অবস্থান গ্রহণের জন্য সিরীয়দের নির্দেশ দেন। এটাই ওয়াসিত শহরের পত্তন। এটা ৮৩ হিজরীর (৭০২ খ্রি) ঘটনা।

ইয়াযীদ ইব্‌ন মুহাল্লাবের পদচ্যুতি

আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মদকে দমন করার পর হাজ্জাজ ইরাকবাসীদের সাথে অত্যন্ত কঠোর ব্যবহার করেন। তিনি বেছে বেছে তাদের নেতৃবৃন্দকে হত্যা করেন। ইরাক অর্থাৎ কূফা ও বসরার এমন কোন বিখ্যাত পরিবার ছিল না, যার কোন না কোন ব্যক্তি হাজ্জাজের নির্দেশে নিহত অথবা লাঞ্ছিত হয়নি। শুধু মুহাল্লাবের পরিবার তাদের বিশ্বস্ততার দরুন তখন পর্যন্ত হাজ্জাজের জুলুম-অত্যাচার থেকে রক্ষা পেয়েছিল। ইয়াযীদ ইব্‌ন মুহাল্লাব খুরাসানের গভর্নর এবং হাজ্জাজ ও আবদুল মালিকের অনুগত ছিলেন। হাজ্জাজ বেশ কয়েকবার ইয়াযীদকে এমন অবস্থায় কূফায় তলব করেন যখন তিনি খুরাসানে অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যে ছিলেন। ফলে তিনি হাজ্জাজের কাছে তার অসুবিধার কথা জানান এবং তখনকার মত কূফায় আসতে পারেননি। হাজ্জাজের মধ্যে সন্দেহ প্রবণতাও ছিল। তাই ইয়াযীদ ইব্‌ন মুহাল্লাব সম্পর্কেও তার অন্তরে ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়। তিনি তাকে খুরাসানের শাসনকর্তা থেকে কিভাবে অপসারণ করা যায় সে চিন্তা করতে থাকেন। তিনি প্রথমে আবদুল মালিকের কাছে ইয়াযীদের বিরুদ্ধে নানা ধরনের অভিযোগ উত্থাপন করতে থাকেন। আবদুল মালিক কিন্তু প্রতিবারই হাজ্জাজকে লিখতেন, মুহাল্লাব এবং তার পুত্র সব সময়ই আমাদের সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করে আসছে। অতএব তারা ক্ষমারযোগ্য। এতদ্‌সত্ত্বেও হাজ্জাজ বার বার ইয়াযীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত আবদুল মালিক বাধ্য হয়ে হাজ্জাজকে লিখেন, যেহেতু তুমি তোমার অভিমতের উপর বার বার গুরুত্ব আরোপ করছ তাই আমি তোমাকে অনুমতি দিচ্ছি, তুমি যাকে ইচ্ছা খুরাসানের গভর্নর নিয়োগ করতে পার। ব্যাপারটি যাতে জটিল হয়ে না দাঁড়ায় এবং অন্য গভর্নর সেখানে গিয়ে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয় সে চিন্তা করে হাজ্জাজ প্রথমে ইয়াযীদকে নির্দেশ দেন, তুমি তোমার ভাই মুফাদ্দালের কাছে খুরাসানের শাসনক্ষমতা অর্পণ করে আমার কাছে আস। ইয়াযীদ সফর সামগ্রীর আয়োজন করছিলেন এমন সময় খুরাসানে হাজ্জাজের দ্বিতীয় নির্দেশ গিয়ে পৌঁছল। সেই সাথে ছিল মুফাদ্দালের নামে খুরাসানের গভর্নর পদের নিয়োগপত্র। ইয়াযীদ তার ভাইকে বললেন, তুমি এই নিয়োগপত্র দ্বারা প্রতারিত হয়ো না। আমি হয়ত খুরাসানের শাসনক্ষমতা ত্যাগ করতে অস্বীকার করব এই আশংকায় হাজ্জাজ তোমাকে খুরাসানের গভর্নর নিয়োগ করেছেন। কিছুদিন পর তিনি তোমাকেও পদচ্যুত করবেন। এই বলে ইয়াযীদ ৮৫ হিজরীর রবিউস সানী

(৭০৪ খ্রি এপ্রিল) মাসে মার্ভ থেকে রওয়ানা হন। ইয়াযীদের ধারণা শেষ পর্যন্ত সত্য প্রমাণিত হয়। নয় মাস পর হাজ্জাজ মুফাদ্দালকে অপসারণ করে তার স্থলে কুতায়বা ইব্ন মুসলিমকে খুরাসানের গভর্নর নিয়োগ করেন।

মূসা ইব্ন হাযিম

ইতিপূর্বে মূসা ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাযিম সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তিনি তিরমিযে একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ইতিপূর্বে এও আলোচিত হয়েছে যে, কাতানা খুযায়ীর পুত্রদ্বয় হুরায়স ও সাবিত মুহাল্লাবের কাছ থেকে পালিয়ে মূসা ইব্ন আবদুল্লাহ্র কাছে তিরমিযে চলে গিয়েছিলেন। মুহাল্লাব খুরাসানে গভর্নর থাকাকালীন মূসার সাথে কোনরূপ সংঘর্ষে যাননি। তিনি তার পুত্রদেরকেও উপদেশ দেন, যেন তারা মূসার সাথে সর্বদা ক্ষমাসুন্দর ব্যবহার করেন। কেননা তার অস্তিত্ব না থাকলে খুরাসানের গভর্নর পদে বনূ কায়সেরই কোন ব্যক্তি অধিষ্ঠিত হয়ে যাবে। হিরাতের নিকটে যখন ইয়াযীদ ইব্ন মুহাল্লাবের কাছে আবদুর রহমান ইব্ন মুহাম্মদ পরাজিত হন তখন তার এবং আব্দুর রহমান ইব্ন আব্বাসের যে সব সঙ্গী-সাথী পলায়ন করেছিল তারাও সোজা মূসার কাছে তিরমিযে চলে যায়। যখন রুতবেল আবদুর রহমান ইব্ন মুহাম্মদের ছিন্ন মস্তক হাজ্জাজের কাছে প্রেরণ করেন তখন আবদুর রহমানের সঙ্গীরা তার নিকট থেকে পালিয়ে মূসার কাছে চলে আসে এবং তিরমিযেই আশ্রয় নেয়। এভাবে তিরমিযে মূসার কাছে আট হাজার আরব যোদ্ধা এসে সমবেত হয়। হুরায়স ও সাবিত দুই ভাই মন্ত্রীত্ব ও সেনাপতিত্বের দায়িত্ব আনজাম দিতেন এবং মূসা স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন করতেন। হুরায়স ও সাবিত মূসাকে বলেন, বুখারাবাসী এবং সমগ্র তুর্কী নেতৃবৃন্দ ইয়াযীদের প্রতি অসন্তুষ্ট। চলুন, আমরা ওদের সবাইকে সাথে নিয়ে তাকে বিতাড়িত করে খুরাসান দখল করে নেই। মূসা বলেন, যদি ইয়াযীদকে খুরাসান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয় তাহলে আবদুল মালিকের অপর কোন গভর্নর এসে তা দখল করে নেবে এবং আমরা তা রক্ষা করতে পারব না। বরং এর চেয়ে ভালো হবে, যদি আমরা মাওয়ারাউন নাহর অর্থাৎ তুর্কিস্তান এলাকা থেকে আবদুল মালিকের কর্মকর্তাদেরকে বের করে দিই। এই এলাকার উপর আমরা অনায়াসে আমাদের কর্তৃত্ব বহাল রাখতে পারব। কেননা ওখানে চতুর্দিক থেকে আবদুল মালিকের সৈন্যরা আসতে পারবে না। তাছাড়া সমগ্র সীমান্ত এলাকায় তুর্কী ও মোঙ্গলরা রয়েছে, যারা সব সময়ই আমাদের সাহায্য করবে। শেষ পর্যন্ত মাওয়ারাউন নাহর এলাকা থেকে আবদুল মালিকের কর্মকর্তাদের বের করে দেওয়া হয় এবং তিরমিযে মূসা ইব্ন আবদুল্লাহর শাসন কর্তৃত্ব দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।

কিছুদিন পর তুর্কী, মোঙ্গল ও তিব্বতীরা একজোট হয়ে মূসার রাজ্য আক্রমণ করে। তুর্কীদের অধিনায়ক দশ হাজার সৈন্য নিয়ে একটি টিলার উপর দাঁড়িয়ে ছিল। হুরায়স ইব্ন কাতানা তাকে আক্রমণ করেন। এই আক্রমণ এতই জোরদার ছিল যে, তুর্কীদের শেষ পর্যন্ত টিলার পিছনে আশ্রয় নিতে হয়। কিন্তু যুদ্ধ চলাকালে একটি তীর সোজা হুরায়স ইব্ন কাতানার কপালে বিদ্ধ হয় এবং তাতে এমন গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয় যে, তিনি এর মাত্র দু'দিন পর মৃত্যুবরণ করেন। ঐ দিন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসায় যুদ্ধ মুলতবি হয়ে যায়। পরদিন মূসা অত্যন্ত জোরদার আক্রমণ চালান। তাতে তুর্কী ও শত্রুপক্ষের অন্যান্য লোকের শোচনীয় পরাজিত

হয়। মূসা প্রচুর গনীমতসামগ্রী নিয়ে তিরমিয দুর্গে ফিরে আসেন। হুরায়সের মৃত্যুর পর তার ভাই সাবিত ইব্‌ন কাতানা মূসার দিক থেকে ভ্রান্তধারণার বশবর্তী হয়ে তিরমিয থেকে পালিয়ে যান এবং হাওশারা নামক স্থানে এসে অবস্থান নেন এবং আরব-অনারব উভয় প্রকার সৈন্য সংগ্রহের কাজে মনোনিবেশ করেন।

মূসা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ তিরমিয থেকে যখন তার বাহিনী নিয়ে সাবিতের মুকাবিলা করতে আসেন তখন বুখারা, কুশ, নাসাফ প্রভৃতি এলাকার অধিবাসীরা সাবিতের পক্ষাবলম্বন করে। ফলে মূসাকে বাধ্য হয়ে তিরমিযে ফিরে আসতে হয়। কিছুদিন পর সমগ্র তুর্কী একত্রিত হয়ে সাবিতকে তাদের পক্ষে টেনে নেয় এবং ৮০ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী নিয়ে তিরমিয অবরোধ করে। মূসা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে তুর্কীদের মুকাবিলা করেন। শেষ পর্যন্ত সাবিত নিহত হন। তুর্কীরা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় এবং অবরোধ উঠিয়ে সেখান থেকে দ্রুত পলায়ন করে।

এই যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার মাত্র কিছুদিন পর ইয়াযীদ ইব্‌ন মুহাল্লাব তার পদ থেকে অপসারিত হন এবং তার স্থলে তার ভাই মুফাদ্দাল খুরাসানের গভর্নর নিযুক্ত হন। তিনি খুরাসানের কর্তৃত্ব গ্রহণ করার সাথে সাথে মূসার উপর আক্রমণ পরিচালনার জন্য মার্ভ থেকে উসমান ইব্‌ন মাসউদের নেতৃত্বে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন এবং বলখে অবস্থানরত আপন ভাই মুদরিককে লিখেন, "তুমিও তোমার বাহিনী নিয়ে তিরমিয আক্রমণের জন্য রওয়ানা হও।" এ ছাড়া তিনি রুতবেল, তারখুন প্রমুখ তুর্কী বাদশাহর কাছে লিখেন, "তোমরাও নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে উসমান ইব্‌ন মাসউদের সাহায্যে এগিয়ে যাও।" এই তুর্কী নেতারা ইতিপূর্বে মূসার কাছে বার বার পরাজিত ও পর্যুদস্ত হয়েছিলেন। তাই তারা সঙ্গে সঙ্গে নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে তিরমিয অভিমুখে রওয়ানা হন। এভাবে মূসার এলাকায় চতুর্দিক থেকে শত্রুবাহিনী প্রবেশ করতে থাকে। তাই তিনি বাধ্য হয়ে তিরমিয দুর্গে অবরুদ্ধ অবস্থায় শত্রুদের মুকাবিলা করতে থাকেন। বিরাট শত্রুবাহিনী একাধারে দু'মাস পর্যন্ত অবরোধ অব্যাহত রাখে। কিন্তু জয়ের কোন চিহ্ন পরিলক্ষিত হচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত মূসা তার সঙ্গীদের বলেন, আর কত ধৈর্য ধারণ করব? চল, আমরা আকস্মিকভাবে শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ি। সকলেই তার এই প্রস্তাব গ্রহণ করে।

মূসা আপন ভাতিজা নাসর ইব্‌ন সুলায়মানকে তিরমিয শহর ও দুর্গের জন্য স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করেন এবং তাকে উপদেশ দেন ঃ যদি আমি যুদ্ধে নিহত হই তাহলে তুমি শহর ও দুর্গ উসমান ইব্‌ন মাসউদের পরিবর্তে মুদরিক ইব্‌ন মুহাল্লাবের হাতে অর্পণ করবে। মূসা তার এক-তৃতীয়াংশ সঙ্গীকে উসমানের বিরুদ্ধে মোতায়েন করেন এবং তাদের নির্দেশ দেন ঃ তোমরা প্রথমে আক্রমণ করবে না। উসমান যখন তোমাদের আক্রমণ করবে কেবল তখনই তোমরা তাকে প্রতি-আক্রমণ করবে। এরপর তিনি তার অবশিষ্ট দুই-তৃতীয়াংশ সৈন্য নিয়ে স্বয়ং রুতবেল ও তারখুনের উপর হামলা চালান। ওরা মূসার আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে পলায়ন করে এবং তিনি অনেক দূর পর্যন্ত তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেন। যখন মূসা ফিরে আসছিলেন তখন দাওরবাসী ও অন্যান্য তুর্কী তার পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। ফলে যুদ্ধ শুরু হয়। মূসাকে তুর্কীরা চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলে। উসমান ইব্‌ন মাসউদও এদিকে মনোনিবেশ করেন। প্রথমে মূসার ঘোড়া নিহত হয়। এরপর তিনিও অতুলনীয় বীরত্ব প্রদর্শন করে প্রাণত্যাগ করেন। এভাবে ১৫ বছর পর্যন্ত একজন স্বাধীন অধিপতি হিসাবে তিরমিয

শাসন করে ৮৫ হিজরীতে (৭০৪ খ্রি) মূসা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাযিম ইহলোক ত্যাগ করেন। তিনি কায়স গোত্রের লোক ছিলেন। মুফাদ্দাল হাজ্জাজকে মূসা-হত্যার সুসংবাদ দেন। কিন্তু তিনি তাতে সন্তুষ্ট হননি। নাসর ইব্‌ন সুলায়মান মুদরিকের হাতে তিরমিয অর্পণ করেন এবং মুদরিক তা অর্পণ করেন উসমানের হাতে।

ইসলামী মুদ্রা তৈরির সূচনা

আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ানের একটি কৃতিত্বপূর্ণ কাজ এই যে, তাঁরই যুগে প্রথমবারের মত মুসলমানরা নিজস্ব মুদ্রা তৈরি করে। তখন পর্যন্ত সিরিয়া, আরব, মিসর প্রভৃতি অঞ্চলে রোমানদের মুদ্রা প্রচলিত ছিল। আরবে যেহেতু কোন বিরাট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি তাই আরবী মুদ্রারও কোন অস্তিত্ব ছিল না। প্রাচীনকাল থেকে সমগ্র আরবে রোমান মুদ্রার প্রচলন ছিল। যখন ইসলামী রাষ্ট্র বল্‌খ থেকে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে তখনও কোন খলীফা বা সুলতানের মনে এ চিন্তার উদয় হয়নি যে, তাদেরও নিজস্ব কোন মুদ্রা থাকা উচিত। ঘটনাচক্রে রোমান সম্রাটের কাছে আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ানকে কয়েকটি চিঠি লিখতে হয়। তিনি ইসলামী রীতি অনুযায়ী চিঠিগুলোর শিরোভাগে কালেমা তাওহীদ ও দরূদ শরীফ লিখেন। এরপর নিজস্ব বক্তব্য পেশ করেন।

রোমান বাদশাহ তখন আবদুল মালিককে লিখেন, তুমি তোমার চিঠির শিরোভাগে তাওহীদ (আল্লাহ্‌র একত্ব) ও দরূদ লিখো না। কেননা এটা আমাদের কাছে অপছন্দনীয়। যদি তুমি তোমার এই রীতি ত্যাগ না কর তাহলে আমরা আমাদের টাকশালে এমন সব দিরহাম ও দীনার ঢালাই করব, যেগুলোতে তোমাদের নবী সম্পর্কে এমন সব অপমানকর কথা লিপিবদ্ধ থাকবে, যা তোমাদের কাছে অত্যন্ত বিরক্তিকর ঠেকবে।

এই চিঠি পড়ে আবদুল মালিকের মনে দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। তিনি এ ব্যাপারে খালিদ ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন মুআবিয়ার পরামর্শ চাইলে তিনি বলেন, তুমি তোমার দেশে রোমান মুদ্রার প্রচলন একদম বন্ধ করে দাও এবং নিজস্ব মুদ্রা ঢালাই করে নাও। এই পরামর্শ আবদুল মালিকের খুবই মনঃপূত হয়। তিনি নিজস্ব টাকশাল স্থাপন করে তাতে চৌদ্দ কিরাত তথা পাঁচ মাশা ওজনের দিরহাম ঢালাই করে নেন। এরপর হাজ্জাজ দিরহাম ও দীনারের একপিঠে 'কুলহু ওয়াল্লাহু আহাদ' (বলো, তিনিই আল্লাহ্ অদ্বিতীয়) অংকিত করেন। মোট কথা, আবদুল মালিক নির্দেশ জারি করেন যে, এখন থেকে খারাজ বাবদ আরবী মুদ্রা ছাড়া অন্য কোন মুদ্রা গ্রহণ করা হবে না। ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সমগ্র দেশে আরবী মুদ্রা প্রচলিত হয়ে পড়ে।

আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান খলীফা হওয়ার পর ৭৫ হিজরীতে (৬৯৪ খ্রি) প্রথমবার হজ্জ করেন। তিনি ৭৭ হিজরী (৬৯৬ খ্রি) হারকালা জয় করেন। ঐ বছরই মিসরের গভর্নর এবং আবদুল মালিকের ভাই আবদুল আযীয মিসরের জামে মসজিদ ভেঙে চারপাশের আয়তন বৃদ্ধি করে তা পুনঃনির্মাণ করেন। তিনি ৮১ হিজরীতে (৭০০ খ্রি) রোমানদের কাছ থেকে কালীকালা ছিনিয়ে নেন। ৮২ হিজরীতে (৭০১ খ্রি) সিনান দুর্গ দখল করা হয়। খুরাসানের গভর্নর মুফাদ্দাল ইব্‌ন মুহাল্লাব মূসা ইব্‌ন আবদুল্লাহকে হত্যা করার পর বাদগীস জয় করেন। ৮৪ হিজরীতে (৭০৩ খ্রি) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল মালিক রোমানদের কাছ থেকে মাসীসাহ্ দখল করে নেন। হিজরী ৮৫ সনের জমাদিউল আউয়াল (৭০৪ খ্রি মে) মাসে আবদুল

মালিকের ভাই আবদুল আযীয মিসরে ইনতিকাল করেন এবং আবদুল মালিক আপন পুত্র আবদুল্লাহকে তার স্থলে মিসরের গভর্নর নিয়োগ করেন।

ওয়ালীদ ও সুলায়মানের অলীআহদী (যৌবরাজ্য)

কিভাবে আপন ভাই আবদুল আযীযকে অলীআহদী থেকে খারিজ করে তার স্থলে আপন পুত্রদেরকে অলী আহদ নিয়োগ করবেন আবদুল মালিক গভীরভাবে সেই চিন্তা করছিলেন। কিন্তু ব্যাপারটি মোটেই সহজ ছিল না। কেননা এতে জনসাধারণের মধ্যে বিরোধ ছড়িয়ে পড়ার আশংকা ছিল। যখন আবদুল আযীযের স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে তখন আবদুল মালিক স্বাভাবিকভাবেই নিজের গোপন বাসনা চরিতার্থ করার সুযোগ পেয়ে যান। তিনি ৮৬ হিজরীতে (৭০৫ খ্রি) সমগ্র প্রদেশের গভর্নর ও কর্মকর্তাদের নামে একটি ফরমান জারি করেন। তাতে বলা হয়েছিল যে, তারা যেন ১লা শাওয়াল (অক্টোবর) তথা ঈদুল ফিতরের দিনে জনসাধারণের কাছ থেকে ওয়ালীদ ও সুলায়মানের অলীআহদীর বায়আত গ্রহণ করেন। সেই ফরমান অনুযায়ী সর্বত্রই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। তখন মদীনার প্রশাসক ছিলেন হিশাম ইব্‌ন ইসমাঈল মাখযুমী। তিনি মদীনাবাসীদেরকে ওয়ালীদ ও সুলায়মানের অলীআহদীর পক্ষে বায়আত করতে বললে সকলেই তা মেনে নেয়, কিন্তু সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (রা) বেঁকে বসেন। হিশাম তাঁকে গ্রেফতার করেন। এরপর তাঁকে প্রকাশ্যে বেত্রাঘাত করে কয়েদখানায় আটকে রাখেন। আবদুল মালিক এই সংবাদ জানতে পেরে তাকে লিখেন, তুমি সাঈদ ইব্‌নুল মুসাইয়্যাবের সাথে কঠোর ব্যবহার করে ভুল করেছ। কেননা তাঁর মধ্যে না শত্রুতা রয়েছে, আর না রয়েছে বিরোধিতা বা কপটতা। এমন ব্যক্তিকে কখনো কষ্ট দেওয়া উচিত নয়।

আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ানের মৃত্যু

ওয়ালীদ ও সুলায়মানের অলীআহদীর বায়আত গ্রহণের পর আবদুল মালিক এক মাসের বেশি জীবিত ছিলেন না। কিছুদিন রোগ ভোগের পর ৮৫ হিজরীর ১৫ই শাওয়াল (৭০৫ খ্রি-এর ১৯শে অক্টোবর) আবদুল মালিক মৃত্যুমুখে পতিত হন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র-এর শাহাদাতের পর আবদুল মালিক মোট তের বছর তিন মাস তেইশ দিন জীবিত ছিলেন। আর এটাই ছিল তার খিলাফত-আমল। মৃত্যুকালে আবদুল মালিক তার পুত্রদেরকে ডেকে এনে নিম্নোক্ত ওসীয়ত করেন ঃ

"আমি ওসীয়ত করছি, তোমরা আল্লাহকে ভয় করে চলবে। কেননা তাক্‌ওয়াই হচ্ছে শ্রেষ্ঠতম পোশাক এবং শ্রেষ্ঠতম আশ্রয়। তোমাদের বড়দের উচিত ছোটদের স্নেহ করা এবং ছোটদের উচিত বড়দের সম্মান করা। তোমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের অভিমত ও পরামর্শের মূল্য দেবে এবং তাদের বিরোধিতা থেকে দূরে থাকবে। কেননা এরাই হচ্ছে সেই মাড়ি যার দ্বারা তোমরা চিবাও এবং এরাই হচ্ছে সেই দাঁত যার সাহায্যে তোমরা খাদ্য-সামগ্রী চূর্ণ কর। তোমরা বুদ্ধিমানদের সাথে ভালো আচরণ কর। কেননা ওরাই হচ্ছে এর যথার্থ হকদার।"

এরপর তিনি ঐ সমস্ত কথা বলেন, যা আবদুল মালিকের প্রাথমিক অবস্থা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। তার মৃত্যুর পর লোকেরা ওয়ালীদের হাতে বায়আত করে। আবদুল মালিকের

পনের-ষোল জন পুত্র এবং বেশ কয়েকজন কন্যা ছিলেন। তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে একজন ইয়াযীদ ইব্ন মুআবিয়ার কন্যা, একজন হযরত আলীর এবং একজন আবদুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফরের কন্যা ছিলেন। ওয়ালীদ ও সুলায়মান উভয়ই বিলাদাহ্ বিন্ত আব্বাসের গর্ভজাত ছিলেন।

আবদুল মালিকইব্ন মারওয়ান ছিলেন একজন বিখ্যাত ও সৌভাগ্যশালী খলীফা। তিনি সমগ্র ইসলামী বিশ্বকে একই কেন্দ্রের অধীনে নিয়ে আসতে এবং উসমান (রা) হত্যার পর মুসলিম বিশ্বে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল তা দূর করে একটি বিরাট ইসলামী সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সক্ষম হন। এ লক্ষ্য অর্জন করতে গিয়ে তাঁকে মুসলমানদের সাথে অত্যন্ত কঠোর ব্যবহার করতে হয়। অবশ্য এর কৈফিয়ত দিতে গিয়ে তিনি স্বয়ং বলতেন, যদি হযরত সিদ্দীকে আকবর ও উমর ফারূককেও এ ধরনের মূর্খ ও অবাধ্য লোকদের সম্মুখীন হতে হতো তাহলে তাঁরাও তাদের সাথে আমারই অনুরূপ ব্যবহার করতেন। আবদুল মালিকের পূর্বে বনূ উমাইয়া সাম্রাজ্যের ভিত্তি ছিল নড়বড়ে। তিনি তা শক্ত ও সুদৃঢ় করেন। তার মেযাজ ছিল অত্যন্ত কঠোর, তবে তিনি প্রচুর বুদ্ধিমত্তারও অধিকারী ছিলেন এবং গুণীজনদের প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করতেন। তার চরিত্রের দৃঢ়তা এবং উচ্চ সাহসিকতারও প্রশংসা না করে পারা যায় না। আবদুল মালিকের সবচেয়ে বড় ভ্রান্তি ছিল এই যে, তিনি হাজ্জাজকে তার পাওনার চাইতেও অধিক ক্ষমতা দিয়ে রেখেছিলেন। আর হাজ্জাজও সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করেছিলেন একজন নিষ্ঠুর পাষাণের মত। অবশ্য এমন প্রত্যেক শাসকের মধ্যেই এ ধরনের কিছু না কিছু ভুল-ভ্রান্তি পাওয়া যায়, যিনি নিজের সাম্রাজ্যকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করতে দৃঢ়-সংকল্প। আবদুল মালিকের বহুমুখী সাফল্যের ক্ষেত্রে উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদ, হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফ সাকাফী এবং মুহাল্লাব ইব্ন আবূ সুফরার বিশেষ অবদান ছিল। তার শাসনামলে মুসলমানদের হাতে যেমন অনেক দেশ বিজিত হয়েছে, তেমনি এক এক করে মুসলিম সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ বিরোধ-বিশৃঙ্খলাও দূরীভূত হয়ে গেছে। আবদুল মালিক তার তের বছরের খিলাফত আমলে যেসব কৃতিত্বপূর্ণ কাজ আনজাম দিয়েছেন তাতে তিনি একজন বিখ্যাত ও সফল খলীফা হিসাবে পরিগণিত হওয়ার যোগ্য। তিনি নিঃসন্দেহে একজন অত্যন্ত পরাক্রমশালী খলীফাও ছিলেন। জ্ঞান ও বিজ্ঞতার ক্ষেত্রেও তিনি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন বীরশ্রেষ্ঠ ও প্রখ্যাত সেনাপতিদের অন্যতম। আবদুল মালিকের মৃত্যুকালে ইসলামী বিশ্ব সব রকম অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা কাটিয়ে উঠতে এবং শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ওয়ালীদ ইব্ন আবদুল মালিক

আবুল আব্বাস ওয়ালীদ ইব্ন আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান ৫০ হিজরীতে (৬৭০ খ্রি) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর পিতার মৃত্যুর পর ছত্রিশ বছর বয়সে খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হন। অত্যন্ত আদর-সোহাগে লালিত-পালিত হয়েছিলেন বলে তিনি জ্ঞানার্জন থেকে একেবারে বঞ্চিত ছিলেন। আবদুল মালিকের কাফন-দাফন সম্পন্ন করে তিনি দামিশকের জামে মসজিদে এসে একটি ভাষণ দেন। তাতে তিনি বলেন ঃ

"লোক সকল! আল্লাহ্ তা'আলা যাকে সামনে বাড়িয়ে দেন তাকে কেউ পিছনে হটাতে পারে না। আর যাকে আল্লাহ্ তা'আলা পিছনে হটিয়ে দেন তাকে কেউ সামনে বাড়াতে পারে না। মৃত্যু আল্লাহ্ তা'আলার অনন্ত জ্ঞানের অন্তর্গত এবং নবী-রাসূল, জ্ঞানীগুণী সকলের জন্য নির্ধারিত। এবার আল্লাহ্ তা'আলা এমন এক ব্যক্তিকে এই উম্মতের অভিভাবক নিয়োগ করেছেন, যে অপরাধীদের সাথে কঠোর ব্যবহার, জ্ঞানীগুণী ও সৎ ব্যক্তিদের সাথে নম্র ব্যবহার এবং শরীয়ত-নির্ধারিত শাস্তিসমূহের প্রয়োগ করার দৃঢ়-সংকল্প রাখে। সে কা'বা ঘরের হজ্জ পালনে এবং সীমান্ত অঞ্চলে জিহাদ তথা ইসলামের শত্রুদের উপর আক্রমণ পরিচালনায়ও দৃঢ়-সংকল্প। এ কাজে সে যেমন উদাসীন থাকতে চায় না তেমনি সীমালংঘন করাকেও শ্রেয় জ্ঞান করে না। লোক সকল! তোমরা যুগের খলীফাকে মান্য কর এবং মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখ। স্মরণ রেখ, যে অবাধ্য হবে তার মাথা উড়িয়ে দেওয়া হবে। আর যে চুপ থাকবে সে স্বাভাবিক রোগে আপনা-আপনি মৃত্যুবরণ করবে।"

এরপর লোকেরা তাঁর হাতে খিলাফতের বায়আত করে। ওয়ালীদ খলীফা হওয়ার পর হাজ্জাজের ক্ষমতা যথারীতি বহাল রাখেন। হাজ্জাজ রায়-এর শাসনকর্তা কুতায়বা ইব্ন মুসলিম বাহিলীকে মুফাদ্দাল ইব্ন মুহাল্লাবের স্থলে খুরাসানের গভর্নর নিয়োগ করেন। কুতায়বা চীন ও তুর্কিস্তান জয় করেন। আর পশ্চিম দিকে আফ্রিকার গভর্নর মূসা ইব্ন নুসায়র মরক্কো থেকে স্পেন পর্যন্ত দেশসমূহে ইসলামী বিজয় পতাকা উড্ডীন করেন। ওয়ালীদের ভাই মাসলামা রোমানদের সাথে যুদ্ধ করে অনেকগুলো শহর ও দুর্গ দখল করেন।

মুহাম্মদ ইব্ন কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ সাকাফী, যিনি একাধারে হাজ্জাজের ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা ছিলেন, হিন্দুস্থানের সিন্ধু রাজ্য জয় করেন। ওয়ালীদ আপন চাচাত ভাই হযরত উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র)-কে মদীনার গভর্নর নিয়োগ করেন। ৮৭ হিজরী (৭০৫ খ্রি) ওয়ালীদ দামিশকের জামে মসজিদ সম্প্রসারণ ও পুনঃনির্মাণ করেন। ঐ বছরই হযরত উমর ইব্ন আবদুল আযীযের ব্যবস্থাপনায় মদীনায় মসজিদে নববী পুনঃনির্মাণ করা হয়। তখন রাসূলুল্লাহ

(সা)-এর সহধর্মিণীদের কক্ষগুলোকেও অন্তর্ভুক্ত করে মসজিদ সম্প্রসারিত করা হয়। মসজিদে নববী নির্মাণের জন্য রোমান সম্রাটও উপঢৌকনস্বরূপ অনেক মূল্যবান পাথর এবং বেশ কয়েকজন সুদক্ষ কারিগর ওয়ালীদের কাছে প্রেরণ করেন। ওয়ালীদ জনকল্যাণমূলক অনেক কাজ করেন। তিনি অনেক রাস্তাঘাট নির্মাণ করেন, শহরে ও পল্লীতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন, সরাইখানা নির্মাণ করেন, পানির কূপ খনন করেন, হাসপাতাল নির্মাণ করেন এবং শহর ও পল্লী সর্বত্রই শান্তি ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন। মদীনায় পানির অভাব ছিল। তিনি একটি খাল কেটে সেখানে পর্যাপ্ত পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করেন। তিনি লঙ্গরখানাও স্থাপন করেন। জনসাধারণের সুখ-সুবিধার প্রতি তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। তাঁর শাসনামলে চতুর্দিকে মুসলমানদের জয়যাত্রা অব্যাহত থাকে এবং উল্লেখযোগ্য কোন অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ বা বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়নি। তাঁর যুগে মুসলমানদের অনবরত বিজয়লাভ জনসাধারণকে ফারূকে আযমের যুগের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ওয়ালীদ অভাবগ্রস্ত, ফকীহ্ ও আলিমদের এই পরিমাণ ভাতা নির্ধারণ করে দেন যে, তাঁরা অত্যন্ত সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করতে থাকেন। তিনি অনেকগুলো জনকল্যাণমূলক আইন-কানুন ও রীতি-নীতির প্রবর্তন করেন।

তিনি হিশাম ইব্‌ন ইসমাঈল মাখযূমীকে পদচ্যুত করে যখন উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র)-কে মদীনার শাসক নিয়োগ করেন তখন তিনি (উমর) সর্বপ্রথম যে কাজটি করেন তা হলো, তিনি মদীনার ফকীহদের মধ্য থেকে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন দশজন আলিমকে নির্বাচন করেন। মদীনার 'ফুকাহা-ই সাব'আ' তথা সপ্তফকীহ্ও ছিলেন তাঁদের অন্যতম। যাহোক তিনি ঐ দশ ব্যক্তির একটি মজলিস (কমিটি) গঠন করেন এবং ঐ মজলিসের পরামর্শ অনুযায়ী প্রতিটি কাজ আনজাম দিতে থাকেন। ঐ মজলিসের সদস্যদেরকে নিজের শাসন-ব্যবস্থার সাথে শরীক করে হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) রাষ্ট্রের শাসনকর্তাদের জন্য এমন একটি অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন যে, তাঁকে মদীনার শাসনকর্তা নিয়োগ করার জন্য মদীনাবাসীরা অসংখ্য চিঠি মারফত ওয়ালীদকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান এবং তাঁর সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করেন।

ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুল মালিক খিলাফতের আসনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পরই হাজ্জাজ ইয়াযীদ ইব্‌ন মুহাল্লাব ও তার ভাইদের বন্দী করেন এবং তাদের উপর দায়িত্বপালনে অবহেলা প্রদর্শনের অভিযোগ উত্থাপন করা হয়।

৮৭ হিজরীতে (৭০৫-৭০৬ খ্রি) মাসলামা ইব্‌ন আবদুল মালিক মাসীসার পথে রোমান শহরগুলোর উপর আক্রমণ পরিচালনা করেন এবং লূলাক, আখরাম, বোলুস, কামীকাম প্রভৃতি দুর্গ জয় করেন। ৮৮ হিজরীতে (৭০৬-৭০৭ খ্রি) জারসূমা এবং তাওয়ানাও বিজিত হয়।

৮৯ হিজরীতে (৭০৭-৭০৮ খ্রি) মাসলামা ইব্‌ন আবদুল মালিক ও আব্বাস ইব্‌ন ওয়ালীদ রোমান-সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন। রোমানদের একটি দুর্ধর্ষ বাহিনী তাদের মুকাবিলা করে। কিন্তু মুসলমানরা প্রতিটি ক্ষেত্রেই রোমানদের পরাজিত করে। সূরাইয়া, আর্দূলিয়া, আমূরিয়া, হারকালা, কামূলিয়া প্রভৃতি দুর্গ মুসলমানরা দখল করে নেয়। ঐ বছরই মাসলামা ইব্‌ন আবদুল মালিক আযারবায়জানের দিক থেকে তুর্কীদের উপর হামলা চালিয়ে অনেকগুলো শহর ও দুর্গ দখল করেন। ঐ বছরই মানূরাকা এবং মাবূরাকা দ্বীপও বিজিত হয়।

৯০ হিজরীতে (৭০৮-৭০৯ খ্রি.) আব্বাস ইব্ন ওয়ালীদ সুরিয়া অঞ্চলে পাঁচটি বিরাট দুর্গ নির্মাণ করেন।

৯১ হিজরীতে (৭০৯-৭১০ খ্রি.) ওয়ালীদ আপন চাচা মুহাম্মদ ইব্ন মারওয়ানকে দারিনিয়া দ্বীপের গভর্নরের পদ থেকে অপসারণ করে তার স্থলে আপন ভাই মাসলামা ইব্ন আবদুল মালিককে নিয়োগ করেন। মাসলামা আযারবায়জানের দিক থেকে তুর্কীদের উপর হামলা চালান এবং শহরের পর শহর দখল করে 'বাব' পর্যন্ত এগিয়ে যান। ঐ বছর নাসাফ, কুশ, শূমান প্রভৃতি দুর্গও মুসলমানরা জয় করে।

৯২ হিজরীতে (৭১০-১১ খ্রি.) মাসলামা তিনটি দুর্গ জয় করেন এবং সারসানার অধিবাসীদেরকে রোমান সাম্রাজ্যে র্নিবাসিত করেন। ঐ বছর সিন্ধু রাজ্যের দেবল (বর্তমানে করাচী) বিজিত হয়। কারখ, বারহাম, বাজাহ, বায়যা, খাওয়ারিজম এবুং সমরকন্দের উপরও মুসলমানরা তাদের আধিপত্য বিস্তার করে।

৯৩ হিজরীতে (৭১১-১২ খ্রি.) মাসলামা ইব্ন আদুল মালিক, আব্বাস ইব্ন ওয়ালীদ ও মারওয়ান ইব্ন ওয়ালীদ গাযালা পুনর্দখল করেন এবং সাবীতালা, হানজারা, মাশাহ, হিসনুল হাদীদ, মালাতিয়া প্রভৃতি জয় করেন।

৯৪ হিজরীতে (৭১২-৭১৩ খ্রি.) আব্বাস ইব্ন ওয়ালীদ ইনতাকিয়া (এন্টিওক) এবং আবদুল আযীয ইব্ন ওয়ালীদ গাযালা পুনর্দখল করেন। ঐ বছরই ওয়ালীদ ইব্ন হিশাম 'মারাজুল হাম্মাম' এবং ইয়াযীদ ইব্ন আবূ কাবশাহ সূরিয়া পর্যন্ত বিজয় পতাকা উড্ডীন করেন। ঐ বছর কাবুল, ফারগানা, শাশ, সিন্ধু প্রভৃতি অঞ্চল বিজিত হয়।

৯৫ হিজরীতে (৭১৩-১৪ খ্রি) হারকালাবাসীরা ইসলামী বাহিনীকে অন্যত্র ব্যস্ত দেখে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। আব্বাস ইব্ন ওয়ালীদ তাদেরকে পুনরায় দমন করেন। ঐ বছরই মূকান, 'মদীনাতুল বাব' প্রভৃতিও মুসলমানরা জয় করে।

৯৬ হিজরীতে (৭১৪-১৫ খ্রি.) তূস ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল বিজিত হয়।

ওয়ালীদ ইব্ন আবদুল মালিকের যুগে এত অধিক সংখ্যক যুদ্ধ হয়েছে যে, এই স্বল্প পরিসরে তার বিবরণ দেওয়া মোটেই সম্ভব নয়। নিম্নে দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁর যুগের শুধু কয়েকজন স্বনাম খ্যাত অধিনায়কের কীর্তিসমূহ অতি সংক্ষেপে পেশ করা হচ্ছে। মাসলামা ইব্ন আবদুল মালিকও ওয়ালীদের যুগের দিগ্বিজয়ী অধিনায়কদের অন্যতম। উপরে তাঁর সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করা হয়েছে। নিম্নে আরো কয়েকজন অধিনায়ক সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা গেল।

কুতায়বা ইব্ন মুসলিম আল-বাহিলী

হাজ্জাজ কুতায়বা ইব্ন মুসলিম আল-বাহিলীকে ৮৬ হিজরীতে (৭০৫-৭০৬ খ্রি) খুরাসানের আমীর নিয়োগ করেছিলেন। কুতায়বা মার্ভে পৌঁছে আয়াস ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমরকে সামরিক বিভাগ ও পুলিশ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অফিসার নিয়োগ করেন এবং উসমান ইব্ন সা'দীর হাতে বায়তুল মালের দায়িত্ব অর্পণ করেন। এরপর স্বয়ং একটি দুর্ধর্ষ বাহিনী নিয়ে তালিকানের দিকে অগ্রসর হন। সেখানে তুর্কী সম্রাট তাঁর সাথে সাক্ষাত করে তাঁর

বশ্যতা স্বীকার করেন এবং রাজস্ব প্রদানের অঙ্গীকার করে আখিরদান ও শূমান তথা তাগারিস্তানের শাসনকর্তাদের উপর হামলা করার জন্য তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেন। কুতায়বা আখিরদান ও শূমানের সন্নিকটে গিয়ে পৌঁছলে সেখানকার শাসকরাও বশ্যতা স্বীকার ও রাজস্ব প্রদানের অঙ্গীকার করে তাঁর সাথে সন্ধি করেন। কুতায়বা তখন আপন ভাই সালিহ্কে ফারগানায় পাঠিয়ে দিয়ে মার্ভে ফিরে আসেন। সালিহ্ ফারগানার কাশান, দারাশত আখ্শকীত প্রভৃতি শহর জয় করেন।

৮৭ হিজরীতে (৭০৬ খ্রি.) কুতায়বা বুখারা অঞ্চলের উপর আক্রমণ পরিচালনা করেন। আশেপাশের তুর্কীরা একজোট হয়ে মুকাবিলা করে কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয় এবং গনীমতস্বরূপ তাদের অনেক ধন-সম্পদ মুসলিম বাহিনীর হস্তগত হয়।

৮৮ হিজরীতে (৭০৭ খ্রি.) সাগাদ ও ফারগানার অধিবাসীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তারা চীন-সম্রাটের ভাগ্নেকে নিজেদের অধিনায়ক নিয়োগ করে দুইলাখ সৈন্যসহ মুসলমানদের মুকাবিলায় এগিয়ে আসে। কুতায়বা তাদের পরাজিত করে মার্ভে ফিরে আসেন।

৮৯ হিজরীতে (৭০৮ খ্রি.) বুখারা, কুশ, নাসাফ ও সাগাদের নেতারা একতাবদ্ধ হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। কুতায়বা তাদের উপর হামলা চালান। তারা পরাজিত হয়ে বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়। এরপর তিনি পুনরায় মার্ভে ফিরে আসেন।

৯০ হিজরীতে (৭০৮-৯ খ্রি.) বুখারার বাদশাহ্ ওয়ার্দান ও সাগাদের বাদশাহ্ এবং আশে-পাশের সর্দাররা পুনরায় বিদ্রোহ ঘোষণা করে। কিন্তু বাদগীসের শাসনকর্তা নিযকতুরখান মুসলমানদের অনুগত থাকেন। কুতায়বা নিযকতুরখানকে সঙ্গে নিয়ে বুখারার দিকে অগ্রসর হন। তুর্কীরা অত্যন্ত দৃঢ়তা সহকারে তাঁর মুকাবিলা করে। প্রথমে স্থানীয় অগ্রবর্তী বাহিনী পরাজিত হয়। এরপর মুসলমানরা যখন নিজেদের সামলে নিয়ে তুর্কীদের উপর হামলা চালায় তখন তুর্কীদের বাদশাহ্ খাকান ও তার পুত্র আহত হয়ে পলায়ন করেন। ফলে মুসলমানরা জয়লাভ করে। সাগাদের শাসনকর্তা তারখুন বার্ষিক জিয্য়া নিয়মিত পরিশোধ করার প্রতিশ্রুতি দেন। কুতায়বা পুনরায় মার্ভে ফিরে আসেন। কিন্তু তাঁর প্রত্যাবর্তনের সাথে সাথে নিয্ক তাখারিস্তানে পৌঁছে পুনরায় বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। বলখের বাদশাহ আসবাহান্দ, মার্ভের বাদশাহ্ বাযান, তালিকানের বাদশাহ্ দূদ, জুরজানের শাসক ফায়ারাব এবং কাবুলের বাদশাহ্ একজোট হয়ে কুতায়বার সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে তাদের স্ব-স্ব এলাকা থেকে বের করে দেন। কুতায়বা আপন ভাই আবদুর রহমানকে বার হাজার সৈন্যসহ প্রেরণ করেন এবং তাকে বারূকান নামক স্থানে অবস্থান করতে বলেন। শীত মওসুম শেষ হওয়ার সাথে সাথে কুতায়বা নিশাপুরের দিকে সৈন্য প্রেরণ করেন এবং বিভিন্ন দিক থেকে বিদ্রোহীদের উপর হামলা চালান। তিনি তাদেরকে যথাযোগ্য শাস্তি দেন এবং তারা সকলেই বশ্যতা স্বীকার করে নিয়মিত জিয্য়া প্রদানের অঙ্গীকার করে। ঐ সময় সামানগানের দুর্গ দখল করে ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। নিযক বন্দী হন এবং তাকে হত্যা করা হয়।

জুরজানের বাদশাহ্র অপরাধ ক্ষমা করে দিয়ে তাঁকে তাঁর দেশে বহাল রাখা হয়। মোটকথা তুর্কী সর্দাররা বার বার বিদ্রোহ করে এবং প্রতিবারই কুতায়বা তাদের পরাজিত

করেন। শেষ পর্যন্ত ধীরে ধীরে তাদের মস্তিষ্ক থেকে বিদ্রোহ ও অবাধ্যতার মনোবৃত্তি লোপ পেতে থাকে।

৯২ হিজরীতে (৭১০-১১ খ্রি.) সিজিস্তানের বাদশাহ্ রুতবেল বিদ্রোহের সংকল্প নেন। কুতায়বা তাঁর বাহিনী নিয়ে রুতবেলকে আক্রমণ করেন। শেষ পর্যন্ত তিনি ক্ষমাপ্রার্থনা করে জিয্‌য়ার যাবতীয় অর্থ পরিশোধ করেন।

৯৩ হিজরীতে (৭১১-১২ খ্রি.) কুতায়বা খাওয়ারিযম জয় করে সেখানকার বাদশাহ্‌র কাছ থেকে খারাজ পরিশোধের অঙ্গীকার নিয়ে ফিরে আসেন। যখন তিনি খাওয়ারিযম জয় করছিলেন তখন সাগাদবাসীরা এই ভেবে যে, কুতায়বা আমাদের থেকে অনেক দূরে রয়েছেন, তাঁর কর্মকর্তাকে দেশ থেকে বিতাড়িত করে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। কুতায়বা গনীমতের মাল খাওয়ারিযম থেকে প্রেরণ করেন এবং একটি সেনাবাহিনী নিয়ে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে সাগাদের দিকে রওয়ানা হন।

কুতায়বার আগমনের সংবাদ শুনে সাগাদবাসীরা চীনের খাকানের সাহায্য প্রার্থনা করে। তিনি নিজের প্রখ্যাত অধিনায়কবৃন্দ এবং রাজকুমারদেরকে কুতায়বার মুকাবিলায় প্রেরণ করেন। তুর্কীরা সমরকন্দ দুর্গে মুকাবিলার প্রস্তুতি নেয়। কুতায়বা সেখানে পৌঁছেই যুদ্ধ শুরু করে দেন। এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর খাকানের পুত্র নিহত হন। মুসলমানরা দুর্গ দখল করে নেয় এবং হাজার হাজার তুর্কী নিহত হয়। এরপর তুর্কীদের উপর বিপুল পরিমাণ কর ধার্য করা হয় এবং তাদের যে সমস্ত বিখ্যাত অধিনায়ক মুসলমানদের হাতে গ্রেফতার হয়েছিল তাদেরকে হাজ্জাজের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ঐ বন্দীদের মধ্যে ইয়াযদিগার্দের বংশের একটি মহিলাও ছিল। হাজ্জাজ তাকে ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুল মালিকের কাছে পাঠিয়ে দেন। তিনি তাকে বিবাহ করেন। এই মহিলার গর্ভেই তাঁর পুত্র ইয়াযীদের জন্ম হয়। কুতায়বা মার্ভে ফিরে এসে মুগীরা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌কে নিশাপুরের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন।

৯৪ হিজরীতে (৭১২-১৩ খ্রি.) শাশবাসীরা বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র করে। কুতায়বা বুখারা, কুশ, নাসাফ ও খাওয়ারিযমের অধিবাসীদের কাছ থেকে সাহায্যকারী বাহিনী তলব করেন। তাতে সকলেই সাড়া দেয় এবং বিশ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী গড়ে ওঠে। তিনি স্বয়ং খোজান্দ নামক এলাকায় অবস্থান নেন এবং একটি সেনাবাহিনী শাশের দিকে প্রেরণ করেন। শাশ বিজিত হয় এবং কুতায়বা মার্ভে ফিরে আসেন। এখানে ফিরে এসেই তিনি শুনতে পান যে, হাজ্জাজ মৃত্যুবরণ করেছেন। এরপর তিনি কাশগড় পর্যন্ত সমগ্র এলাকা পদানত করে সম্পূর্ণ তুর্কিস্তানের উপর মুসলমানদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর তিনি হুবায়রাহ্ ইব্‌ন মাশ্‌মারজ কিলাবীর নেতৃত্বে চীনের বাদশাহ্‌র কাছে একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেন। তাদের মাধ্যমে তিনি বাদশাহকে বলে পাঠান ঃ তুমি মুসলমানদের কর্তৃত্ব স্বীকার করে নাও, অন্যথায় মুসলিম যোদ্ধাদের ঘোড়ার খুরের আঘাতে চীন পদদলিত হবে। এই প্রতিনিধিদল পৌঁছার পর চীনের বাদশাহ ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েন এবং মূল্যবান উপহার-উপঢৌকন পাঠিয়ে কুতায়বার কাছে সন্ধি প্রার্থনা করেন।

মুহাম্মদ ইব্ন কাসিম

যে যুগে মুসলমানগণ বিজয় পতাকা নিয়ে আরব থেকে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েন তখন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এক রাজা সিন্ধু দেশ শাসন করতেন। ইরান সাম্রাজ্য মুসলমানদের পদানত হলে কিছুসংখ্যক ইরানী অধিনায়ক তাদের দেশ থেকে সিন্ধু, তুর্কিস্তান ও চীনে পালিয়ে গিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে নানা ধরনের ষড়যন্ত্র পাকাতে থাকে। অবশ্য কিছুসংখ্যক অধিনায়ক ইসলাম গ্রহণ করে সম্মান ও মর্যাদার সাথে নিজেদের দেশে বসবাস করতে থাকেন। দুর্ভাগ্যক্রমে যখন বনূ হাশিম ও বনূ উমাইয়ার মধ্যে গোত্রগত শত্রুতা চরমে ওঠে তখন ইরানীদের মধ্যেও জাতিগত শত্রুতা পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। তারা আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাবা ও অন্যান্য মুনাফিকের বিভিন্ন ষড়যন্ত্রে অত্যন্ত আগ্রহের সাথে যোগ দেয়। এই সমস্ত ষড়যন্ত্র এবং মুসলমানদের আন্তঃবিরোধের কারণে কাবুল, চীন, তিব্বত প্রভৃতি দেশে নির্বাসিত জীবন যাপনকারী ইরানীদের মধ্যে এক নবজীবনের সঞ্চার হয়। একমাত্র এই কারণেই ইরানীদের দ্বারা কূফা, বসরা, ইরান ও খুরাসান অঞ্চলে মুসলমানদেরকে বার বার অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়।

সিন্ধু দেশ যেহেতু বসরা-কূফা তথা ইরাকের অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী ছিল এবং ইরানী সাম্রাজ্যের সীমা যেহেতু এর সাথে সংযুক্ত ছিল, তাই বেশির ভাগ দুষ্ট প্রকৃতির ইরানী সিন্ধু দেশেই আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। মুসলমানদের বিজয় এবং ইরানীদের শোচনীয় পরাজয় লক্ষ্য করে সিন্ধুর রাজা নিজে থেকেই ইরানীদের জন্য আক্ষেপ করতেন। তিনি মনে মনে কামনা করতেন, যেন ইরানীরা পুনরায় তাদের আধিপত্য ফিরে পায়। তাই দেখা যায়, ইরানের সর্বশেষ সম্রাট নিহাওয়ান্দ যুদ্ধের পর বেশ কয়েকবার সৈন্য সংগ্রহ করে যখন মুসলমানদের মুকাবিলা করেন তখন তার সাহায্যার্থে সিন্ধুর রাজাও সৈন্য প্রেরণ করেছিলেন। ইরান সাম্রাজ্য যখন ধ্বংস হয়ে গেল তখন সিন্ধুর রাজা তার সীমান্তবর্তী ইরানী প্রদেশসমূহ নিজের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। পরাজিত ইরানীরাও কিরমান, বেলুচিস্তান প্রভৃতি প্রদেশ সন্তুষ্টচিত্তে সিন্ধুর রাজার হাতে অর্পণ করে যাতে সেগুলো মুসলমানদের দখলে চলে না যায় এবং তার বদলে তারা সিন্ধুর রাজার সমর্থন ও সহানুভূতি লাভে সক্ষম হয়।

এই সমস্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে সিন্ধুর রাজাকে শায়েস্তা করা মুসলমানদের জন্য জরুরী হয়ে পড়েছিল। কিন্তু হযরত উসমান (রা)-এর যুগে ইরান ও খুরাসানের উপর মুসলমানদের পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পূর্বেই অভ্যন্তরীণ বিরোধ দেখা দেয়। ফলে সিন্ধু অভিযানের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া আর সম্ভব হয়নি। আমীরে মুআবিয়া (রা) অভ্যন্তরীণ সংঘাত কাটিয়ে ওঠার পর বাইরের দেশসমূহের প্রতি দৃষ্টি দেন। তাঁর যুগে সিন্ধু রাজার নিকট থেকে ইরানী সাম্রাজ্যের প্রদেশগুলো ফেরত আনার চেষ্টা করা হয়। এই সুবাদে সিন্ধী বাহিনীর সাথে ছোট-খাটো সংঘর্ষও হয়। কিন্তু ইয়াযীদ খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে পুনরায় মুসলমানদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ বিরোধ দেখা দেয়। ফলে তারা বহির্দেশের দিকে আর দৃষ্টি দিতে পারেননি।

আবদুল মালিকের যুগে মুসলমানরা বহির্দেশের প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার সুযোগ পায়নি। প্রাচ্য দেশসমূহের শাসক হাজ্জাজ সিন্ধু অভিযানের চাইতে আফগানিস্তান ও বাদাখশানের শাসক রুতবেলকে দমন করার উপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করতেন। কেননা তিনি আশংকা করতেন, রুতবেল একদিন ইসলামী প্রদেশের জন্য সমূহ বিপদের কারণ হতে পারেন। হাজ্জাজের দৃষ্টি প্রধানত রুতবেল এবং তারই কারণে বুখারা প্রভৃতি অঞ্চলের দিকে নিবদ্ধ থাকত। তাঁর গভর্নর কুতায়বা চীন পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চলের অবাধ্যদের শায়েস্তা করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত কৃতিত্বের পরিচয় দেন। এরপর সিন্ধুর রাজার দখল থেকে মুসলমানদের প্রাপ্য অঞ্চলসমূহ ফিরিয়ে আনা এবং তিনি যাতে ভবিষ্যতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে আর অবাধ্যতা না দেখান সেজন্য তাকে মুসলমানদের কিছু বীরত্ব ও পরাক্রমের নমুনা প্রদর্শনের সময় এসে উপস্থিত হয়। কিন্তু মুসলমানরা নিজেদের পক্ষ থেকে সেই জরুরী কাজটি শুরু করার পূর্বেই ঘটনাচক্রে খোদ সিন্ধুরাজ মুসলমানদেরকে তার দেশ আক্রমণের আহ্বান জানান।

ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, কিছু সংখ্যক মুসলিম বণিক সফররত অবস্থায় সিংহল দ্বীপে ইনতিকাল করেছিলেন। তাদের যে সব ইয়াতীম সন্তান ও বিধবা স্ত্রীরা সেখানে রয়ে গিয়েছিল, তাদেরকে সিংহলের রাজা ইরাক শাসক হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফ ছাকাফী এবং খলীফা ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুল মালিকের কৃপাদৃষ্টি নিজের দিক আকর্ষণের একটি মাধ্যমে পরিণত করেন। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, একের পর এক মুসলমানদের বিজয় সংবাদ শুনে তিনি একেবারে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং অনেকদিন যাবত মুসলিম খলীফার কাছে নিজের ভক্তিশ্রদ্ধা ও বিনয়ভাব প্রকাশের একটা মাধ্যম খুঁজছিলেন। যাহোক এবার সেই মাধ্যম তিনি পেয়ে গেলেন। তিনি ঐ সব ইয়াতীম শিশু ও বিধবাদের অত্যন্ত সম্মানের সাথে নিজের কিছু সংখ্যক নির্ভরযোগ্য কর্মচারীসহ বিশেষ জাহাজযোগে হাজ্জাজের কাছে প্রেরণ করেন। তিনি তাদের সাথে হাজ্জাজ ও খলীফা ওয়ালীদের জন্য অনেক মূল্যবান উপহারসামগ্রীও পাঠান। তাঁর আশা ছিল, এই সব বিধবা ও ইয়াতীম শিশু নিশ্চয়ই হাজ্জাজের কাছে আমার প্রশস্তি বর্ণনা করবে। ঐ জাহাজগুলো শ্রীলংকা থেকে রওয়ানা হয়ে সমুদ্র উপকূল ধরে পারস্য উপসাগরের দিকে রওয়ানা হয়। পথিমধ্যে প্রতিকূল অবহাওয়া ঐ জাহাজগুলোকে সিন্ধুর দেবল (করাচী) বন্দরে নিয়ে ভিড়ায়। সেখানে সিন্ধুর রাজা দাহিরের সৈন্যরা ঐ জাহাজগুলোতে লুটপাট চালায় এবং আরোহীদের বন্দী করে। এই সংবাদ হাজ্জাজের কানে পৌঁছলে তিনি সিন্ধুর রাজাকে লিখেন, ঐ জাহাজগুলো আমার কাছে আসছিল। তুমি লুটেরাদের যথোপযুক্ত শাস্তি দাও এবং জাহাজগুলো সমস্ত আরোহী ও ধনসম্পদসহ অবিলম্বে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। কিন্তু রাজা দাহির তাঁকে এর যে উত্তর দেয় তা ছিল অত্যন্ত ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও বিবেকবর্জিত।

ফলে হাজ্জাজ প্রথমবারের মত আবদুল্লাহ্ আসলামীর নেতৃত্বে সিন্ধু অভিমুখে ছয় হাজার সৈন্য প্রেরণ করেন। তিনি সিন্ধুতে পৌঁছে রাজা দাহিরের সেনাবাহিনীর মুকাবিলা করতে গিয়ে নিহত হন। অতএব এই অভিযান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। দ্বিতীয়বার হাজ্জাজ বুদায়ল নামক একজন অধিনায়কের অধীনে পুনরায় সিন্ধুর দিকে ছয় হাজার সৈন্য প্রেরণ করেন। তিনি দেবলে গিয়ে পৌঁছেন এবং প্রতিপক্ষের সাথে মুকাবিলা করতে গিয়ে ঘোড়া থেকে পরে মারা যান।

এই সংবাদ শুনে হাজ্জাজ আরো বেশি ব্যথিত হন। এবার তিনি তৃতীয়বারের মত আপন ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা ১৭ বছর বয়স্ক মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসিমের নেতৃত্বে ছয় হাজার সিরীয় সৈন্যের একটি বাহিনী সিন্ধুতে প্রেরণ করেন। তাঁর সাথে এবার সিরীয় সৈন্য পাঠাবার কারণ হলো, ইতিপূর্বে হাজ্জাজ সিন্ধুতে দুই দুইবার যে সৈন্য পাঠিয়েছিলেন তারা ছিল যথাক্রমে ইরাকী ও ইরানী। এতে তার মনে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছিল যে, ইরাকী ও ইরানী সৈন্যরা হয়ত সিন্ধীদের সাথে কোন না কোন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসিম প্রথমে মাকরান প্রদেশ জয় করেন যা সিন্ধীরা এতদিন পর্যন্ত দখল করে রেখেছিল। তিনি সিন্ধীদেরকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দিয়ে দেবলের দিকে অগ্রসর হন এবং দেবলও জয় করেন। এরপর তিনি নিরূন ও ব্রাহ্মণাবাদের দিকে অগ্রসর হন। রাজা দাহিরের কাছে শুরু ইরানীরাই আশ্রয় গ্রহণ করেনি, বরং সেখানে এমন বহু আরবও ছিল, যারা তৎকালীন খলীফা কিংবা সরকারী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে আরবের বিভিন্ন এলাকা থেকে পালিয়ে রাজা দাহিরের কাছে আশ্রয় নিয়েছিল। এ সমস্ত কারণেও সিন্ধু আক্রমণ করা মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। যাহোক রাজা দাহির মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসিমের মুকাবিলা করে নিহত হয়। এরপর তিনি একের পর এক সিন্ধুর শহরসমূহ জয় করতে থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত সিন্ধু ও মুলতানের সমগ্র অঞ্চল তাঁর হস্তগত হয়।

সিন্ধু বিজয়কালে হাজ্জাজের দৃষ্টি সব সময় মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসিমের প্রতি নিবদ্ধ থাকত। তিনি প্রতিদিন সিন্ধু অভিযানের সংবাদ জানতে চাইতেন এবং তাঁর কাছে প্রয়োজনীয় নির্দেশ পাঠাতেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসিম নিজেকে সিন্ধীদের কাছে একজন অতি দয়ালু, কোমল হৃদয় এবং প্রজাবৎসল শাসক হিসাবে প্রমাণ করেন। অভিযান চলাকালে এই দিগ্বিজয়ী যুবক যে ধৈর্য, সতর্কতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দেন, বিশ্বের ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত বিরল। মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসিমের অভিযানের বিস্তারিত বিবরণ হিন্দুস্তানের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করা হবে। তিনি মুলতান জয় করেছেন এমন সময় হাজ্জাজের মৃত্যু সংবাদ পৌঁছে। এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি তাঁর বিজয় অভিযান অব্যাহত রাখেন। তিনি ৯৬ হিজরী (৭১৪-১৫ খ্রি) পর্যন্ত সুরাট বন্দর থেকে শুরু করে কাশ্মীর পর্যন্ত সমগ্র পশ্চিম-ভারত জয় করেন।

হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফ সাকাফী

হাজ্জাজ সম্পর্কে ইতিপূর্বে যথেষ্ট আলোচনা করা হয়েছে। ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুল মালিক খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে হাজ্জাজ ইয়াযীদ ইব্‌ন মুহাল্লাবকে খুরাসানের গভর্নরের পদ থেকে এবং হাবীব ইব্‌ন মুহাল্লাবকে কিরমানের গভর্নরের পদ থেকে অপসারণ করেন। এরপর মুহাল্লাব এবং ইয়াযীদ ইব্‌ন মুহাল্লাবের সকল পুত্রকেই বন্দী করেন। ইয়াযীদ আপন ভাইদের নিয়ে জেলখানা থেকে পালিয়ে ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুল মালিকের ভাই সুলায়মানের কাছে ফিলিস্তীনে চলে যান। সুলায়মান তখন সেখানকার গভর্নর ছিলেন। হাজ্জাজ ওয়ালীদের কাছে ইয়াযীদ ইব্‌ন মুহাল্লাবের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ উত্থাপন করেন। কিন্তু সুলায়মান ইয়াযীদ বা তার ভাইদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেন নি। হাজ্জাজের কঠোর ব্যবহার ইরাকবাসীদের সহ্যের সীমা অতিক্রম করে। একারণে অনেক লোকই ইরাক থেকে পলায়ন

করে মক্কা-মদীনায় গিয়ে বসবাস করতে থাকে। তখন উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) ছিলেন হিজাযের গভর্নর। তিনি ইরাক থেকে আগত ঐ সমস্ত লোকদের সাথে অত্যন্ত ভালো ব্যবহার করতেন।

৯৩ হিজরীতে (৭১১-১২ খ্রি) হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) একটি পত্র মারফত আবদুল মালিকের কাছে হাজ্জাজের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন যে, তিনি ইরাকবাসীদের উপর সীমাতিরিক্ত কঠোর জুলুম-নির্যাতন চালাচ্ছেন। হাজ্জাজ ব্যাপারটি জানতে পেরে তিনিও একটি পত্র মারফত ওয়ালীদের কাছে উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করেন যে, বেশির ভাগ ফিতনাবাজ ও মুনাফিক ইরাক থেকে পালিয়ে উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের কাছে চলে যায় এবং তিনি তাদের গ্রেফতারীর পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেন। তার এই আচরণ রাষ্ট্রের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রমাণিত হবে। এমতাবস্থায় তাকে হিজাযের গভর্নরের পদ থেকে অপসারণ করা বাঞ্ছনীয়।

ওয়ালীদ ৯৩ হিজরীর শাবান (৭১২ খ্রি.-এর জুন) মাসে উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযকে গভর্নরের পদ থেকে অপসারণ করে তার স্থলে খালিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌কে মক্কার এবং উসমান ইব্‌ন হিব্বানকে মদীনার গভর্নর নিয়োগ করেন। খালিদ মক্কায় পৌঁছে ইরাকীদেরকে সেখান থেকে বের করে দেন এবং ঐ সমস্ত লোককেও সাবধান করে দেন, যারা ইরাকীদের জন্য তাদের ঘর ভাড়া দিয়ে রেখেছিল। হাজ্জাজের জুলুম-নির্যাতন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যারা মক্কায় চলে এসেছিলেন সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র)-ও ছিলেন তাদের অন্যতম। তাঁর অপরাধ ছিল, তিনি আবদুর রহমান ইব্‌ন আশআছের সমমনা ছিলেন। আর এটা হাজ্জাজের চোখে কোন সাধারণ অপরাধ ছিল না। খালিদ সাঈদকে গ্রেফতার করে হাজ্জাজের কাছে পাঠিয়ে দেন। হাজ্জাজ তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করেন। তিনি শুধু সাঈদকে নয়, বরং এ ধরনের আরো অনেক নির্দোষ লোককেই হত্যা করেছিলেন।

ওয়ালীদ ইব্‌ন আদুল মালিকের পর সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল মালিক খলীফা হওয়ার কথা। কেননা আবদুল মালিক সুলায়মানকে ওয়ালীদের পরবর্তী যুবরাজ নিয়োগ করেছিলেন এবং তদনুযায়ী জনসাধারণের কাছ থেকে বায়আত গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু ওয়ালীদ সুলায়মানকে যুবরাজ থেকে বঞ্চিত করে আপন পুত্র আবদুল আযীযকে অলীআহ্‌দ করতে চাচ্ছিলেন। তিনি তাঁর এই ইচ্ছার কথা পৃথক পৃথকভাবে আপন সভাসদদের কাছে ব্যক্তও করেছিলেন এবং হাজ্জাজ ও কুতায়বা তাতে সায়ও দিয়েছিলেন। কিন্তু অন্যান্য সভাসদ তাতে সায় দেননি, বরং তাঁরা ওয়ালীদকে এই মর্মে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, এরূপ করা হলে মুসলমানদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। ৯৫ হিজরীর শাওয়াল (৭১৪ খ্রি. জুলাই) মাসে বিশ বছর ইরাক শাসনের পর হাজ্জাজ মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুকালে তিনি আপনপুত্র আবদুল্লাহ্‌কে ইরাকের গভর্নর নিয়োগ করেন। ওয়ালীদ হাজ্জাজ কর্তৃক নিযুক্ত সমস্ত কর্মকর্তাকে স্ব-স্ব পদে বহাল রাখেন।

মূসা ইব্‌ন নুসায়র

হাজ্জাজ যেমন প্রাচ্য দেশসমূহের সবচেয়ে প্রভাবশালী গভর্নর ছিলেন তেমনি ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুল মালিকের শাসনামলে মূসা ইব্‌ন নুসায়র ছিলেন পাশ্চাত্য দেশসমূহের (উত্তর আফ্রিকা, তথা আল-মাগরিবের) সবচেয়ে প্রভাবশালী গভর্নর। কায়রাওয়ান ছিল মূসা ইব্‌ন নুসায়রের কর্মস্থল। উত্তর আফ্রিকার এই সর্ববৃহৎ শাসনকর্তার কাছে স্পেনের কিছু লোক এসে রাজা লাযারিকের (রডারিকের) বিরুদ্ধে জুলুম-অত্যাচারের অভিযোগ উত্থাপন করে আবেদন জানায়, যেন তিনি স্পেনের উপর হামলা চালিয়ে মরক্কোর মত তাও মুসলিম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন।

মুসা স্পেনবাসীদের এই আবেদন সম্পর্কে কয়েকদিন চিন্তাভাবনা করেন। এরপর নিজের একজন ক্রীতদাসের অধিনায়কত্বে চারটি জাহাজে মোট চারশ সৈন্য স্পেনে প্রেরণ করেন, যাতে তারা সেখানকার অবস্থা সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে অবহিত হতে পারে। অপরদিকে তিনি খলীফা ওয়ালীদের কাছে স্পেন আক্রমণের অনুমতি প্রার্থনা করেন। খলীফা অনুমতি প্রদান করেন। অপরদিকে ঐ চারশ সৈন্যও তাদের দায়িত্ব সম্পাদন করে সুস্থ শরীরে ফিরে আসে।

৯১ অথবা ৯২ হিজরীতে (৭১০ অথবা ৭১১ খ্রি) মূসা তাঁর অপর মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস তারিক ইব্‌ন যিয়াদকে স্পেন আক্রমণের নির্দেশ দেন। তাঁর অধিনায়কত্বে মোট সাত হাজার সৈন্য ছিল। তারিক তখন মূসা ইব্‌ন নুসায়রের পক্ষ থেকে মরক্কোয় অবস্থিত তাঞ্জার শাসনকর্তা ছিলেন। যাহোক তারিক নিজ বাহিনী নিয়ে জাহাজে আরোহণ করেন এবং বারো মাইল প্রশস্ত জিব্রাল্টার প্রণালী অতিক্রম করে স্পেনের সমুদ্র উপকূলে অবতরণ করেন। তিনি প্রথম উত্তর দিকে রওয়ানা হন। সাযূনা অঞ্চলে স্পেনের রাজা রডারিকের একলক্ষ দুর্ধর্ষ সৈন্যের সাথে তারিকের মুকাবিলা হয়। আটদিন পর্যন্ত রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ চলে। শেষ পর্যন্ত অষ্টম দিনে, ৯২ হিজরীর ২৮শে রমযান (৭১১ খ্রি. জুলাই) রডারিক নিহত হন এবং খ্রিস্টান বাহিনী পলায়ন করে। এরপর তারিক অতি সহজেই শহরের পর শহর জয় করে সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকেন। মূসা ইব্‌ন নুসায়র এই বিরাট বিজয় সংবাদ পেয়ে তারিককে আর সম্মুখে অগ্রসর না হয়ে সে যেখানে আছে সেখানেই অপেক্ষা করতে বলেন। কিন্তু তিনি এবং তাঁর দুর্দান্ত সৈন্যরা তো তখন অপেক্ষা করার মত অবস্থায় ছিল না। যাহোক ৯৩ হিজরীর রমযান (৭১২ খ্রি.-এর জুলাই) মাসের শেষ দিকে মূসা ইব্‌ন নুসায়রও আঠারো হাজার সৈন্য নিয়ে স্পেনে গিয়ে পৌঁছেন এবং পীরেনিজ পর্বত পর্যন্ত সমগ্র স্পেন উপদ্বীপ দখল করেন। পূর্ব স্পেনের বারসেলোনা এলাকা জয় করার পর মূসা ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুল মালিকের কাছে লিখেন ঃ আমি সমগ্র স্পেন দখল করেছি। এবার আমাকে অনুমতি দিন, যাতে আমি ইউরোপের মধ্য দিয়ে বিজয় নিশান উড়িয়ে কনসটান্টিনোপলে পৌঁছতে পারি এবং তা জয় করে আপনার খিদমতে হাযির হতে পারি।

কিন্তু ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুল মালিক মূসাকে লিখেন, তুমি কাউকে স্পেনের শাসক নিয়োগ করে আফ্রিকার পথে তারিকসহ আমার কাছে ফিরে আস। যদি ঐ সময় মূসা অনুমতি পেয়ে যেতেন তাহলে সমগ্র ইউরোপ জয় করা তাঁর জন্য কঠিন ছিল না। মোটকথা, খলীফার নির্দেশ

অনুযায়ী মূসা আপন পুত্র আবদুল আযীযকে স্পেনের গভর্নর নিয়োগ করেন। এরপর তিনি তাঁর দ্বিতীয় পুত্র আবদুল মালিককে মরক্কোয় এবং তৃতীয় পুত্র আবদুল্লাহ্‌কে কায়রোওয়ানে নিজের স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করে বেশ কিছু উপহার উপঢৌকনসহ দামিশ্‌ক অভিমুখে রওয়ানা হন। কিন্তু যেদিন তিনি দামিশ্‌কে গিয়ে পৌঁছেন সেদিন খলীফা ওয়ালীদ চিরতরে এ দুনিয়া ছেড়ে চলে গেলেন।

ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুল মালিকের মৃত্যু

ওয়ালীদ আপন ভাই সুলায়মানকে 'যৌবরাজ্য' থেকে বঞ্চিত করে, তাঁর স্থলে আপন পুত্রকে যুবরাজ নিযুক্ত করতে চাচ্ছিলেন কিন্তু তাতে সফল হতে পারেননি। তিনি যদি আরো কিছুদিন জীবিত থাকতেন তাহলে হয়ত তাঁর ঐ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হতো। এবার ওয়ালীদের মৃত্যুর পর অবস্থা এই দাঁড়ায়, যে সমস্ত সভাসদ ওয়ালীদের উপরোক্ত প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন সুলায়মান তাদের কট্টর শত্রুতে পরিণত হন। এছাড়াও যে ব্যক্তিই ওয়ালীদকে ভালোবাসত ও সম্মান করত, সুলায়মান তাদেরও শত্রু হয়ে দাঁড়ান। আর এই অবস্থা ছিল মুসলিম বিশ্বের ভবিষ্যতের জন্য নিঃসন্দেহে হতাশাব্যঞ্জক। ওয়ালীদ ৯৬ হিজরীর ১৫ জমাদিউস-সানী (৭১৫ খ্রি-এর ২৫ ফেব্রুয়ারী) প্রায় ৪৫ বছর বয়সে ৯ বছর ৮ মাস খিলাফত পরিচালনা করে সিরিয়ার 'দায়রে মারান' নামক স্থানে ইনতিকাল করেন। মৃত্যুকালে তিনি ১৯ জন পুত্র রেখে যান। ওয়ালীদের শাসনামলে সিন্ধু, তুর্কিস্তান, সমরকন্দ, বুখারা, স্পেন ও এশিয়া মাইনরের বেশির ভাগ শহর ও দুর্গ এবং কিছু সংখ্যক দ্বীপ ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। তাঁর যুগ একদিকে যেমন ছিল সমৃদ্ধি ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের যুগ, অন্যদিকে তেমনি ছিল বিরাট বিরাট বিজয়ের যুগ। হযরত উমর ফারূক (রা)-এর পর এ ধরনের বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ বিজয় তখন পর্যন্ত মুসলমানদের ভাগ্যে জুটেনি। ওয়ালীদের ইনতিকালের সময় তাঁর ভাই সুলায়মান রামলা নামক স্থানে ছিলেন।

সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল মালিক

সুলায়মান আপন ভাই ওয়ালীদের চাইতে চার বছরের ছোট ছিলেন। ওয়ালীদের মৃত্যুর পর ৯৬ হিজরীর জমাদিউস্ সানী (৭১৫ খ্রি-এর ফেব্রুয়ারী/মার্চ) মাসে তার হাতে খিলাফতের বায়আত করা হয়। সুলায়মানকে যৌবরাজ্য থেকে বঞ্চিত করার ব্যাপারে হাজ্জাজ যেহেতু ওয়ালীদের সাথে একমত ছিলেন এবং কুতায়বা ইব্‌ন মুসলিমও ছিলেন এ ব্যাপারে তাদের সমর্থক, তাই স্বাভাবিকভাবেই তিনি হাজ্জাজ ও কুতায়বার কট্টর শত্রু হয়ে দাঁড়ান। খলীফা হওয়ার পূর্বেই হাজ্জাজ মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তবে কুতায়বা তখনও জীবিত ছিলেন এবং খুরাসানের গভর্নর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে তার সাথে কিরূপ ব্যবহার করবেন তা কুতায়বা ভালোভাবেই জানতেন।

কুতায়বাকে হত্যা

খুরাসানের গভর্নর কুতায়বা ইব্‌ন মুসলিম বাহিলী যখন শুনলেন যে, ওয়ালীদ মৃত্যুবরণ করেছেন এবং তাঁর স্থলে খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল মালিক, তখন তিনি খুরাসানে অবস্থানকারী সমগ্র সৈন্য এবং সেনানায়কদের একত্র করে

অভিমত ব্যক্ত করেন, সুলায়মানের খিলাফত অস্বীকার করা উচিত। কুতায়বার কাছে যেসব সৈন্য ছিল তার একটি বিরাট অংশ ছিল তামীম গোত্রের। বনূ তামীমের নেতা ছিলেন ওয়াকী। তিনি এই পরিস্থিতি লক্ষ্য করে জনসাধারণের কাছ থেকে সুলায়মানের পক্ষে বায়আত গ্রহণ শুরু করেন। ধীরে ধীরে এ সংবাদ সমগ্র বাহিনীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং সব গোত্রের লোকেরাই ওয়াকীর চারপাশে এসে ভিড় জমায়। কুতায়বা অনেক চেষ্টা করেন, যাতে লোকেরা তাঁর কথা শোনে এবং তাঁর সাথে এ ব্যাপারে বোঝাপড়া করে। কিন্তু কেউই তাঁর কথা শোনেনি, বরং তাঁর সাথে প্রকাশ্যে অশিষ্ট আচরণ করে। কুতায়বার সাথে তাঁর ভাই, পুত্র এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন ছিল। শেষ পর্যন্ত সৈন্যরা তাঁর ক্যাম্পে লুটপাট শুরু করে এবং তাঁর কাছ থেকে প্রতিটি জিনিস ছিনিয়ে নিয়ে আগুনে নিক্ষেপ করে। কুতায়বার তাঁবুর হিফাযত করতে গিয়ে তাঁর সকল আত্মীয়-স্বজন নিহত হয়। শেষ পর্যন্ত তিনিও মারাত্মক আহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। লোকেরা সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দেহ থেকে মাথা ছিন্ন করে ফেলে। ঐ সময় কুতায়বার ভাই ও পুত্রদের মধ্যে এগারজনই মারা যান। তাঁর ভাইদের মধ্যে শুধু উমর ইব্ন মুসলিম রক্ষা পান একারণে যে, তার মা ছিলেন তামীম গোত্রের মেয়ে। ওয়াকী কুতায়বার মাথা এবং আংটি খুরাসান থেকে সুলায়মানের কাছে পাঠিয়ে দেন। কুতায়বা ইব্ন মুসলিম উমাইয়া গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে একজন প্রখ্যাত দিগ্বিজয়ী অধিনায়ক ছিলেন। এ রকম একজন বিরাট ব্যক্তির এ ধরনের শোচনীয় মৃত্যু নিঃসন্দেহে একটি আক্ষেপজনক ঘটনা। কিন্তু যেহেতু তিনি যুগের খলীফার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে গিয়ে অত্যন্ত অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন তাই সুলায়মান ইব্ন আবদুল মালিকের উপর হত্যার অভিযোগ উত্থাপন করা চলে না।

মুহাম্মদ ইব্ন কাসিমের মৃত্যু

সুলায়মান ইব্ন আবদুল মালিকের উপর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে অভিযোগ উত্থাপন করা যেতে পারে তা মুহাম্মদ ইব্ন কাসিম সম্পর্কিত। হাজ্জাজের সাথে সুলায়মানের শত্রুতা থাকতে পারে, তবে সেই শত্রুতা তার আত্মীয়-স্বজন পর্যন্ত সম্প্রসারিত হতে দেওয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, তিনি মুহাম্মদ ইব্ন কাসিমকেও কট্টর শত্রু মনে করেন, যে ধরনের কট্টর শত্রু মনে করতেন হাজ্জাজকে। মুহাম্মদ ইব্ন কাসিম ছিলেন একজন অতি বুদ্ধিমান, বীরহৃদয় ও পুণ্যবান যুবক। তিনি সিন্ধু ও হিন্দুস্থান বিজয়ে একদিকে নিজেকে রুস্তম ও ইসকান্দারের চাইতে উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন এবং অন্যদিকে নিজেকে প্রমাণিত করেছেন নওশেরওয়ানের চাইতেও অধিক ন্যায়বিচারক ও প্রজাবৎসলে। এই দিগ্বিজয়ী তরুণ অধিনায়ক সুলায়মানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা তো দূরের কথা, তাঁর বিরুদ্ধে কখনো টু শব্দটিও করেননি।

হাজ্জাজের মৃত্যুর পরও মুহাম্মদ ইব্ন কাসিম দেশ জয়ে মগ্ন থাকেন, যেমন ছিলেন হাজ্জাজের জীবনকালে। তাঁর কাছে যে সব সৈন্য ছিল তারা তাঁর জন্য ছিল উৎসর্গীকৃতপ্রাণ। তারা তাঁর যে কোন হুকুম পালন করতে পারলে নিজেদের ধন্য মনে করত। আর এটাও এ কথার বড় প্রমাণ যে, মুহাম্মদ ইব্ন কাসিম একজন অতি যোগ্য ও বিচক্ষণ সেনাপতি ছিলেন। যে যুবকের জীবনের সূচনা ছিল এরূপ পবিত্র ও মহৎ তাঁকে যদি যথাযথভাবে প্রতিপালন করা

হতো এবং তাঁর কাছ থেকে নিয়মিত সেবাও গ্রহণ করা হতো তাহলে তিনি নিঃসন্দেহে চীন, জাপান পর্যন্ত সমগ্র এশিয়া মহাদেশ সুলায়মান ইব্ন আবদুল মালিকের কর্তৃত্বাধীনে নিয়ে আসতে পারতেন। কিন্তু সুলায়মান বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে ইয়াযীদ ইব্ন আবূ কাবশাকে সিন্ধুর গভর্নর করে পাঠান এবং তাকে নির্দেশ দেন ঃ মুহাম্মদ ইব্ন কাসিমকে অবিলম্বে গ্রেফতার করে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। সুলায়মানের এই নির্দেশ ছিল প্রকৃতপক্ষে যে কোন একটি উদ্যমশীল ও দিগ্বিজয়ী অধিনায়কের গালে একটি চপেটাঘাত তুল্য। যে কোন খলীফা বা সম্রাটের জন্য এর চাইতে লজ্জাকর ব্যাপার আর কি হতে পারে যে, তিনি আপন অধিনায়কদের কৃতিত্বপূর্ণ ও প্রশংসনীয় কাজের জন্য তাঁদেরকে পুরস্কৃত ও সম্মানিত না করে বরং গ্রেফতারের নির্দেশ দেন ?

ইয়াযীদ ইব্ন আবূ কাবশা সিন্ধুতে এসে গায়ের জোরে মুহাম্মদ ইবন্ কাসিমকে কখনো পরাজিত করতে পারতেন না। তাঁর সঙ্গীরা খলীফার ঐ মান হানিকর নির্দেশের কথা জানতে পেরে তাঁকে বলেন, আপনি কখনো এই নির্দেশ পালন করবেন না, আমরা আপনাকেই আমীর বলে জানি এবং আপনার হাতে আনুগত্যের বায়আতও করেছি। খলীফা সুলায়মানের হাত কখনো আপনার নাগাল পাবে না। আর প্রকৃত ব্যাপার এই যে, মুহাম্মদ ইব্ন কাসিমকে পরাজিত করার জন্য খলীফা সুলায়মানকে আপন খিলাফতের সম্পূর্ণ শক্তি নিয়োজিত করতে হতো। কেননা এখানে তিনি এতই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন যে, মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে শুধু মানুষ নয়, বরং সিন্ধু মরুভূমির প্রতিটি বালুকণাও বোধ হয় তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসত। কিন্তু এই সুশীল যুবক কোনরূপ ইতস্তত না করে নিজেকে আবূ কাবশার হাতে অর্পণ করতে গিয়ে বলেন, যুগের ললীফার নির্দেশ অমান্য করার মত অপরাধ আমি কখনো করতে পারব না। যাহোক আবূ কাবশা তাঁকে গ্রেফতার করে দামিশকে পাঠিয়ে দেন। সেখানে সুলায়মানের নির্দেশে তাঁকে ওয়াসিতের জেলখানায় আটক করে রাখা হয় এবং তাঁর প্রতি নজর রাখার দায়িত্ব দেওয়া হয় সালিহ্ ইব্ন আবদুর রহমানকে। সালিহ্ নানাভাবে তাঁকে নির্যাতন করে এবং এর ফলেই তিনি অকালে মৃত্যুবরণ করেন।

মূসা ইব্ন নুসায়রের পরিণাম

ইতিপূর্বে মূসা ইব্ন নুসায়রের আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তিনি সমগ্র উত্তর আফ্রিকায় শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং স্পেন বিজয়ের পরিপূর্ণতাও দান করেছিলেন। মূসার পিতা নুসায়র আবদুল আযীয ইব্ন মারওয়ান ইব্নুল হাকামের মুক্তিপ্রাপ্ত একজন ক্রীতদাস ছিলেন। তাঁকে মারওয়ান গ্রোত্রের লোক বলেই মনে করা হতো। এই বীর অধিনায়কের বীরত্ব ও উদ্যমশীলতার পরিমাপ এভাবে করা যেতে পারে যে, তিনি শুধু পনের-বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে সমগ্র ইউরোপ মহাদেশ জয় করতে চেয়েছিলেন। মূসা যখন রাজধানীতে পৌঁছেন তখন তাঁর গুণগ্রাহী খলীফা ওয়ালীদ আর ইহজগতে নেই। আর সুলায়মান তাঁর সাথে সম্মানজনক আচরণ করা তো দূরের কথা, তাকে উল্টা কারাগারে নিক্ষেপ করেন এবং তাঁকে এত বিরাট পরিমাণ অর্থদণ্ড প্রদান করেন, যা পরিশোধ করা ছিল তাঁর সাধ্যের অতীত। শেষ পর্যন্ত মূসাকে জরিমানার অর্থ পরিশোধের জন্য আরবের নেতৃবৃন্দের কাছে হাত পাততে হয় এবং এভাবে ভূলুণ্ঠিত হয় তাঁর যাবতীয় সম্মান।

ওয়ালীদের যুগের প্রখ্যাত অধিনায়কদের মধ্যে শুধু মাসলামা ইব্ন আবদুল মালিক সুলায়মানের নির্যাতন থেকে রক্ষা পান। সুলায়মান তাঁকে যথারীতি তাঁর পদেই বহাল রাখেন। মাসলামা ছিলেন সুলায়মানের ভাই। তাছাড়া যৌবরাজ্যের ব্যাপারেও তিনি কোনভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন না। তাই সুলায়মান আপন শত্রু তালিকায় তাঁর নাম অন্তর্ভুক্ত করেননি।

ইয়াযীদ ইব্ন মুহাল্লাব

ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, হাজ্জাজ মুহাল্লাবের পুত্রদের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন এবং তিনি ইয়াযীদ ইব্ন মুহাল্লাবসহ তার সকল ভাইকে বন্দী করে রেখেছিলেন। ইয়াযীদ জেলখানা থেকে পালিয়ে সুলায়মান ইব্ন আবদুল মালিকের কাছে ফিলিস্তিনে চলে গিয়েছিলেন। তিনি তখন সেখানকার গভর্নর ছিলেন। ইতিপূর্বে এও বর্ণিত হয়েছে যে, হাজ্জাজ মৃত্যুকালে নিজ পুত্র আবদুল্লাহ্‌কে নিজের স্থলে ইরাকের গভর্নর নিয়োগ করেছিলেন এবং ওয়ালীদ তাঁর এ নিয়োগ অনুমোদন করেছিলেন। কিন্তু ওয়ালীদের মৃত্যুর পর সুলায়মান খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে সর্বপ্রথম হাজ্জাজের পুত্র আবদুল্লাহ্‌কে পদচ্যুত করে তার স্থলে ইয়াযীদ ইব্ন মুহাল্লাবকে ইরাকের গভর্নর নিয়োগ করেন। ইয়াযীদ জানতেন, জনসাধারণের কাছ থেকে কর আদায়কালে কড়াকড়ি করা হলে তিনিও হাজ্জাজের ন্যায় দুর্ণামের অধিকারী হবেন, আর যদি এক্ষেত্রে নম্র ও সহানুভূতিশীল ব্যবহার করেন তাহলে সুলায়মানের চোখে খাট হয়ে যাবেন। এই উভয় সংকট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তিনি অতি কৌশলে সুলায়মানকে সম্মত করান যে, তিনি (সুলায়মান) খারাজ আদায় তথা অর্থ বিভাগের সম্পূর্ণ দায়িত্ব সালিহ্ ইব্ন আবদুর রহমানের উপর ন্যস্ত করবেন। আর অন্যান্য বিভাগের (যেমন সামরিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার) দায়িত্ব ইরাকের গভর্নরের (ইয়াযীদ ইব্ন মুহাল্লাবের) উপর ন্যস্ত থাকবে। তাঁর এই আকাঙ্ক্ষা পূরণে সুলায়মান কোন আপত্তি করেননি এজন্য যে, তিনি জানতেন, হাজ্জাজ ইয়াযীদের উপর সরকারী অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ উত্থাপন করে তাকে বন্দী করেছিলেন। যাহোক প্রথমে সালিহ্ ইব্ন আবদুর রহমানকে অর্থ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অফিসার নিয়োগ করে ইরাকে পাঠানো হয়। এরপর ইয়াযীদ গভর্নরের দায়িত্ব নিয়ে কূফায় যান। সেখানে ইয়াযীদ ও সালিহের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয় এবং ক্রমে ক্রমে তার কাছে সালিহ্ ইব্ন আবদুর রহমানের কূফা উপস্থিতিও অত্যন্ত বিরক্তিকর হয়ে ওঠে।

ঐ সময়ে সংবাদ আসে যে, কুতায়বা ইব্ন মুসলিম খুরাসানে নিহত হয়েছেন। ইয়াযীদ খুরাসানের গভর্নরের পদই প্রাধান্য দিতেন। কেননা তিনি ও তাঁর পিতা ইতিপূর্বে খুরাসানের গভর্নরের পদে নিয়োজিত ছিলেন। সুলায়মান ইব্ন আবদুল মালিক ইয়াযীদ ইব্ন মুহাল্লাবকে তার ইচ্ছানুযায়ী খুরাসান প্রদেশের গভর্নর নিয়োগ করেন। তবে ইরাকও তাঁর অধীনে রাখেন। ইয়াযীদ ইরাকের কূফা, বসরা, ওয়াসিত প্রভৃতি এলাকায় নিজের পৃথক পৃথক নায়েব (সহকারী) নিয়োগ করে খোদ খুরাসান অভিমুখে রওয়ানা হন। সেখানে পৌঁছে তিনি প্রথমে কাহতান, এরপর জুরজান আক্রমণ করেন এবং সেখানকার বিদ্রোহী সর্দারদের সাথে জরিমানা ও কর পরিশোধের শর্তে সন্ধি স্থাপন করেন। জুরজানবাসীরা কিছুদিন পর পুনরায় বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ইয়াযীদ সঙ্গে সঙ্গে হামলা চালিয়ে চল্লিশ হাজার তুর্কীকে হত্যা করেন এবং

জুরজানের মৌলিক প্রশাসন নিজের হাতে রেখে জাহ্‌ম ইব্‌ন যাখার জুফীকে সেখানকার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। ইতিপূর্বে জুরজান বলে কোন শহর ছিল না, বরং তা ছিল এমন একটি পার্বত্য অঞ্চল, যেখানে ছোট বড় অনেক পল্লী ছিল। ইয়াযীদ ইব্‌ন মুহাল্লাব সেখানে একটি শহরের পত্তন করেন যা জুরজান নামে খ্যাতি লাভ করে। এরপর ইয়াযীদ তাবারিস্তান জয় করে সেখানে আপন কর্মকর্তা নিয়োগ করেন।

মাসলামা ইব্‌ন আবদুল মালিক

৯৭ হিজরীতে (৭১৫-১৬ খ্রি.) মাসলামা ইব্‌ন আবদুল মালিক রিদাখিয়া অঞ্চল জয় করেন। ৯৮ হিজরীতে (৭১৬-১৭ খ্রি.) আলকূন নামীয় জনৈক রোমান সর্দার খলীফার দরবারে হাযির হয়ে কনসটান্টিনোপল জয় করার জন্য তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেন। খলীফা সুলায়মান আপন পুত্র দাউদ এবং আপন ভ্রাতা মাসলামাকে সেনাবাহিনী দিয়ে কনসটান্টিনোপলে প্রেরণ করেন। মাসলামা ছিলেন ঐ বাহিনীর প্রধান সেনাপতি। তিনি সেখানে পৌঁছেই কনসটান্টিনোপল অবরোধ করেন। ইসলামী বাহিনী কনসটান্টিনোপলের নিকটে গিয়ে পৌঁছলে মাসলামা নির্দেশ দেন, যেন প্রত্যেক সৈন্য এক 'মুদ' পরিমাণ খাদ্য নিজের সঙ্গে করে নিয়ে যায় এবং তা সেনাছাউনিতে নিয়ে জমা করেন। কনসটান্টিনোপল অবরোধ করার পর যখন এই খাদ্য স্তূপীকৃত করা হয় তখন তা পাহাড়ের আকার ধারণ করে। মাসলামা কনসটান্টিনোপল অবরোধ করে সৈন্যদের জন্য মাটি ও পাথরের ঘর তৈরি করে দেন এবং তাদেরকে মাঠে শস্য ফলাবার নির্দেশ দেন। কিছুদিনের মধ্যেই ফসল পাকে এবং তা কেটে গুদামে তোলা হয়। প্রতিদিন যে খাদ্যের প্রয়োজন হতো তা অভিযানের মাধ্যমেই সংগ্রহ করা হতো। মূল খাদ্যের স্তূপ তখনো সংরক্ষিতই ছিল। তার সাথে আবার নতুন ফসল তোলা হলো। কনসটান্টিনোপলের বাসিন্দারা অবরোধের ক্ষেত্রে মুসলিম বাহিনীর এই দৃঢ়তা ও সাহসিকতা প্রত্যক্ষ করে ভীষণভাবে চিন্তিত হয়ে পড়ে। এভাবে প্রায় এক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর তারা গোপন প্রস্তাব পাঠিয়ে পূর্বোল্লিখিত রোমান সর্দার আলকূনকে লোভ দেখায় যে, যদি সে সুলায়মানদের অবরোধ উঠিয়ে দিয়ে তাদেরকে কনসটান্টিনোপল থেকে কোনমতে বিদায় করে দিতে পারে তাহলে তাকে অর্ধেক সাম্রাজ্য দিয়ে দেওয়া হবে। আলকূন এ প্রস্তাবে রাযী হয়ে যায়। এরপর সে মাসলামাকে পরামর্শ দেয়, যদি তুমি খাদ্য ভাণ্ডারে এবং শস্যক্ষেত্রে আগুন লাগিয়ে দাও তাহলে রোমানরা মনে করবে, এবার মুসলমানরা একটি চূড়ান্ত আক্রমণের প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছে। এরপর আশা করা যায়, তারা শহরটি আপনার হাতে সমর্পণ করবে। ফলে কোনরূপ যুদ্ধবিগ্রহ ছাড়াই শহরের উপর আপনার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। মাসলামা রোমান সর্দারের ঐ প্রতারণার শিকার হন। অথচ ইতিপূর্বে কনসটান্টিনোপলবাসীরা মাসলামার কাছে প্রস্তাব পেশ করেছিল ঃ আমরা মাথা পিছু এক আশরাফী করে জিয্‌য়া দেব, আপনি অবরোধ উঠিয়ে দেশে ফিরে যান। কিন্তু তিনি তাদের সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। যদি আরো কিছুদিন অবরোধ অব্যাহত থাকত তাহলে নিঃসন্দেহে কনসটান্টিনোপল মুসলমানদের হাতে চলে আসত। কিন্তু তখন মুসলমানরা কনসটান্টিনোপলের অধিকারী হোক, বোধ করি আল্লাহ্‌র সেই ইচ্ছা ছিল না। শেষ পর্যন্ত মাসলামা খাদ্যস্তূপ এবং শস্যক্ষেত্রে আগুন লাগিয়ে দেন। ঐ নির্বুদ্ধিতামূলক পদক্ষেপের ফলে রোমানরা অত্যন্ত আনন্দিত হয় এবং প্রতিরোধের ক্ষেত্রে

দুঃসাহসী হয়ে ওঠে। এদিকে মুসলিম সৈন্যদের মধ্যে খাদ্যকষ্ট দেখা দেয়। আর ওদিকে আলকূন আপন সঙ্গী-সাথীসহ ইসলামী বাহিনী থেকে পৃথক হয়ে রোমানদের সাথে গিয়ে যোগ দেন। সুলায়মান ইব্ন আবদুল মালিক মাসলামাকে প্রেরণ করে খোদ ওয়াবিক নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন এবং সেখান থেকেই মাসলামার কাছে সব ধরনের সাহায্য এসে পৌঁছেছিল। এবার একদিকে খাদ্যভাণ্ডার ও শস্যক্ষেত্র জ্বালিয়ে দেওয়া হলো এবং অন্যদিকে শীত মওসুম এসে পড়ায় সুলায়মান-প্রেরিত রসদসামগ্রী মাসলামার কাছে এসে পৌঁছতে পারল না। ফলে মুসলিম বাহিনীতে দারুণ খাদ্যাভাব দেখা দিল এবং ক্ষুৎপিপাসায় সৈন্যরা মরতে শুরু করল। কেননা তখন আশেপাশের এলাকা থেকেও লুটপাটের মাধ্যমে খাদ্য সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল না।

মুসলমানদের এই অবস্থা দেখে বারজান নামীয় কায়সারের জনৈক অধিনায়ক, যিনি সাকালিয়া শহরের গভর্নর ছিলেন, একটি বিরাট সেনাবাহিনীসহ মুসলমানদের উপর হামলা চালান। কিন্তু মাসলামা তাকে পরাজিত করে সাকালিয়া শহর দখল করেন। এ সময়ে মাসলামার কাছে সুলায়মান ইব্ন আবদুল মালিকের ইনতিকালের সংবাদ এসে পৌঁছে।

সুলায়মান ইব্ন আবদুল মালিকের চরিত্র ও ব্যবহার

সুলায়মান ইব্ন আবদুল মালিক অত্যন্ত স্পষ্টভাষী লোক ছিলেন। ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা ও জিহাদের প্রতি তাঁর বিশেষ ঝোঁক ছিল। তিনি হযরত উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র)-কে নিজের মন্ত্রী ও উপদেষ্টা নিয়োগ করেছিলেন এবং তাঁর (উমরের) সংস্পর্শে স্বাভাবিকভাবে তাঁর স্বভাব-চরিত্রও সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছিল। উমাইয়া যুগে একটি কু-রীতির প্রচলন হয়। তারা সাধারণত দেরি করে একেবারে শেষ ওয়াক্তে নামায পড়ত। সুলায়মান ইব্ন আবদুল মালিক গান-বাজনাকেও অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখতেন। তিনি গান-বাজনাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সুন্দর ও সুগঠিত দেহের অধিকারী। তিনি সুস্থ-সবল এবং ভোজন-বিলাসীও ছিলেন। একদা তিনি একই বৈঠকে সত্তরটি ডালিম, অনেকগুলো কিসমিস, ছয়মাস বয়স্ক একটি বকরী এবং ছটি মুরগী খান এবং তা হযম করতেও সক্ষম হন।

অলীআহ্দী (যৌবরাজ্য)

সুলায়মান ইব্ন আবদুল মালিক নিজ পুত্র আইয়ূবকে 'অলীআহ্দ' মনোনীত করেছিলেন। কিন্তু তিনি পিতার জীবিতাবস্থায়ই মারা যান। এবার সুলায়মান ওয়াকিব নামক স্থানে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে রাজা ইব্ন হায়াতের কাছে আপন স্থলাভিষিক্ত নিয়োগের ব্যাপারে পরামর্শ চান। তিনি এজন্য প্রথমে আপন পুত্র দাউদের নাম উল্লেখ করেন। কিন্তু রাজা ইব্ন হায়াত বলেন, তিনি তো কনসটান্টিনোপল অবরোধে নিয়োজিত রয়েছেন এবং কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করছেন। দীর্ঘদিন যাবত সেখানকার কোন খবর পাওয়া যাচ্ছে না। আল্লাহ্ই জানেন, তিনি জীবিত আছেন, না শাহাদাতবরণ করেছেন। তাছাড়া তিনি আপনার থেকে অনেক দূরে রয়েছেন। এমতাবস্থায় আমি তাকে অলীআহ্দ মনোনীত করার পরামর্শ দিতে পারি না। এরপর সুলায়মান বলেন, তাহলে আমি আমার কনিষ্ঠপুত্রকে অলীআহ্দ মনোনীত করি? রাজা ইব্ন হায়াত উত্তরে বলেন, তার বয়স এতই অল্প যে, সে খিলাফতের দায়িত্ব বহন করতে পারবে না। তখন সুলায়মান বলেন, তুমিই বল, আমি কাকে আমার স্থলাভিষিক্ত

নিয়োগ করব? রাজা ইব্‌ন হায়াত বলেন, মুসলমানদের মঙ্গল সাধন এবং আপনার পবিত্রচিত্ততা ও ধর্মপরায়ণতার দাবি তো এই হওয়া উচিত যে, আপনি আপনার চাচাত ভাই উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযকে নিজের অলীআহ্‌দ মনোনীত করবেন। কেননা তাঁর চাইতে ভাল লোক কোথাও পাওয়া যাবে না। তাছাড়া তিনি আপনার প্রধানমন্ত্রী থাকার কারণে রাষ্ট্র পরিচালনা সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞতার অধিকারী হয়েছেন। সুলায়মান বলেন, আমিও উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযকে সর্বাধিক যোগ্য মনে করি। তবে আমার ভয় হচ্ছে, আমার ভাইরা অর্থাৎ আবদুল মালিকের সন্তানরা তাতে রাযী হবে না এবং তারা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে। রাজা ইব্‌ন হায়াত বলেন, আপনি তাঁকে খলীফা মনোনীত করে সেই সাথে এই ওসীয়তও করে যাঁন যে, তাঁর (উমরের) পরে ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল মালিক খলীফা হবে। সুলায়মান এই পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের জন্য অলীআহ্‌দীর ফরমান লিখে তার উপর মোহর ল্যাগিয়ে দেন। তিনি ঐ দলীল একটি লেফাফায় ভরে সীলমোহর করে তার মুখও বন্ধ করে দেন। এরপর রাজা ইব্‌ন হায়াতের হাতে তা তুলে দিয়ে বলেন, তুমি বাইরে গিয়ে জনসাধারণকে এই লেফাফা দেখিয়ে বল, আমীরুল মু'মিনীন তাঁর পরবর্তী খলীফা মনোনীত করে একটি কাগজের মধ্যে তাঁর নাম লিখে তা এই লেফাফার মধ্যে বন্ধ করে রেখেছেন। অতএব এ ফরমানে যার নামই থাকবে তাঁর জন্য তোমরা বায়আত কর। রাজা বাইরে গিয়ে জনসাধারণকে একত্র করে এই নির্দেশ শুনালে তারা বলেন, আমরা তখনি বায়আত করব যখন আমাদের কাছে ঐ ব্যক্তির নাম প্রকাশ করা হবে। রাজা ইব্‌ন হায়াত সুলায়মানের কাছে এ অবস্থার কথা বললে তিনি সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ দেন, কোতওয়াল ও পুলিশ বাহিনী ডেকে নির্দেশ দাও, তারা যেন আমার হুকুম অনুযায়ী জনসাধারণের কাছ থেকে বায়আত গ্রহণ করে। কোন ব্যক্তি বায়আত গ্রহণে অস্বীকৃত হলে, সঙ্গে সঙ্গে তার গর্দান যেন উড়িয়ে দেওয়া হয়। সুলায়মানের এই হুকুম শোনার সাথে সাথে একে একে সকলেই বায়আত করে।

রাজা ইব্‌ন হায়াত যখন বায়আত নিয়ে ফিরে আসছিলেন তখন রাস্তার মধ্যেই হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিকের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। হিশাম বলেন, আমার ভয় হচ্ছে, আবদুল মালিক আমাকে অলীআহ্‌দী থেকে বঞ্চিত করেছেন। যদি তাই হয় তাহলে আমাকে বলে দিন, যাতে আমি এর একটা সুরাহা করতে পারি। রাজা উত্তরে বলেন, আমীরুল মু'মিনীন আমাকে সীল-মোহরকৃত লেফাফা দিয়েছেন এবং সকলের কাছেই একথা গোপন রেখেছেন। এমতাবস্থায় আমি তোমাকে কি উত্তর দিতে পারি ? কিছুদূর যাওয়ার পর উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের সাথে রাজার সাক্ষাৎ হয়। উমর তখন বলেন, আমি শংকিত এই ভেবে যে, সম্ভবত সুলায়মান তাঁর অলীআহদ হিসাবে আমার নামই লিখে দিয়েছেন। যদি তা তোমার জানা থাকে তাহলে আমাকে বলে দাও। আমি এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব। রাজা উমরকে সেই উত্তরই দেন যা তিনি হিশাম উব্‌ন আবদুল মালিককে দিয়েছিলেন।

সুলায়মানের মৃত্যু

সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল মালিক ৯৮ হিজরীতে (৭১৬-১৭ খ্রি.) দামিশ্‌ক থেকে জিহাদের সংকল্প নিয়ে রওয়ানা হয়েছিলেন, কনসটান্টিনোপ্‌লের দিকে সেনাবাহিনী পাঠিয়ে স্বয়ং ওয়াবিক নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন এবং সেখান থেকেই ঐ অভিযান সার্থক করে তোলার সবরকম

প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন। তাই একথা বলা যেতে পারে যে, তিনি জিহাদরত অবস্থায়ই ইনতিকাল করেছেন। ৯৯ হিজরীর ১০ই সফর (৭১৭ খ্রি-এর সেপ্টেম্বর) রোজ শুক্রবার তিনি ওয়াবিকের সন্নিকটস্থ কিননাসরীন নামক স্থানে ইনতিকাল করেন। তিনি প্রায় তিন বছর খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৫ বছর। এই খলীফার যুগেও মুসলমানরা অনেক দেশ জয় করে। শরীয়ত বিরোধী অনেক রীতি-নীতির উচ্ছেদ সাধন করা হয়। তিনি হাজ্জাজ কর্তৃক নিয়োগকৃত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে পদচ্যুত করেন। কেননা তাদের মধ্যে হাজ্জাজের ন্যায় জুলুম-প্রবণতা বিদ্যমান ছিল। কিন্তু এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসিমের প্রতি তিনি যে দুর্ব্যবহার করেছিলেন তা ছিল তাঁর জীবনের একটি মারাত্মক ভুল। সুলায়মানের জীবনের সবচেয়ে প্রশংসনীয় ও উল্লেখযোগ্য কীর্তি হচ্ছে, তিনি উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের মত পুণ্যের মূর্ত প্রতীককে নিজের পরবর্তী খলীফা নিয়োগ করেছিলেন। এই একটি পুণ্যের মুকাবিলায় তাঁর সমস্ত ভ্রান্তি ও অপরাধই অনায়াসে বিস্মৃত হওয়া যেতে পারে এবং প্রশংসনীয় ব্যক্তিদের তালিকায় তাঁর নামও অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র)

আবূ হাফ্‌স উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয ইব্‌ন মারওয়ান ইবনুল হাকাম হচ্ছেন খুলাফায়ে রাশিদীনের পঞ্চম খলীফা। তিনি খলীফায়ে সালিহ্ (ন্যায়পরায়ণ শাসক) নামেও বিখ্যাত। অধিকাংশ মুসলিম ঐতিহাসিকের মতে, খুলাফায়ে রাশিদীন হচ্ছেন পাঁচজন। যথা ঃ আবূ বকর (রা), উমর (রা), উসমান (রা), আলী (রা) ও উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র)। উমরের পিতা আবদুল আযীয ইব্‌ন মারওয়ান মিসরের শাসনকর্তা ছিলেন। উমর ৬২ হিজরীতে (৬৮১-৮২ খ্রি) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মাতা হযরত ফারূকে আযমের পৌত্রী তথা আসিম ইব্‌ন উমর ফারূকের কন্যা ছিলেন। তাঁর পিতা আবদুল আযীয আবদুল মালিকের পরবর্তী খলীফা হিসাবে মনোনীত হয়েছিলেন। কিন্তু আবদুল মালিকের জীবিতাবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করায় খলীফা হতে পারেন নি। ছোটবেলায় তাঁকে ঘোড়ায় লাথি মেরেছিল এবং সেই আঘাতের দাগ তাঁর দেহে বিদ্যমান ছিল। ফারূকে আযম (রা) প্রায়ই বলতেন, আমার বংশধরদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি হবে, যার চেহারায় একটি দাগ থাকবে এবং সে বিশ্বকে ন্যায় বিচারে ভরে দেবে। এ কারণেই ঘোড়া যখন তাঁকে লাথি মারে তখন তাঁর পিতা তাঁর চেহারা থেকে রক্ত মুছছিলেন আর বলছিলেন, যদি তুমি ঐ দাগযুক্ত ব্যক্তি হয়ে থাক তাহলে তো খুব সৌভাগ্যের কথা।

ইব্‌ন সা'দ থেকে বর্ণিত আছে, হযরত ফারূকে আযম (রা) প্রায়ই বলতেন, হায়! আমি যদি আমার সেই দাগযুক্ত পুত্রের (বংশধরের) যুগ পেতাম, যে বিশ্বকে ঠিক ঐ সময়ে ন্যায় বিচারে ভরে দেবে যখন তা থাকবে জুলুম-অত্যাচারে পূর্ণ। বিলাল ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমরের চেহারায়ও একটি দাগ ছিল। তাই ধারণা করা হতো যে, হযরত ফারূকে আযম (রা) যে ব্যক্তি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন ইনি সেই ব্যক্তি। কিন্তু হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) খলীফা হওয়ার পর সবাই বুঝতে পারলেন যে, ইনিই হচ্ছেন প্রকৃতপক্ষে সেই ব্যক্তি। ইতিপূর্বে লোকেরা সাধারণত বলাবলি করত যে, দুনিয়া শেষ হবে না যতক্ষণ উমরের মত কোন রাষ্ট্রনায়কের জন্ম না হয়।

বাল্যকালে উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের পিতা তাঁকে মদীনায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তথায়ই তিনি প্রতিপালিত হন। ফুকাহায়ে মদীনার সংস্পর্শে তাঁর জীবনের প্রথমভাগ কাটে। উলামায়ে মদীনার কাছে তিনি দীনী ইল্‌ম শিক্ষা করেন। জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও ফিক্‌হ শাস্ত্রে তিনি এত উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন যে, তিনি যদি খলীফা না হতেন তাহলে অবশ্যই শরীয়তের ইমামদের মধ্যে গণ্য হতেন এবং তাঁকেই সর্বশ্রেষ্ঠ ইমাম হিসাবে মান্য করা হতো। মদীনায় তাঁর পিতা তাঁকে উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌র কাছে পাঠিয়ে ছিলেন। তিনি উবায়দুল্লাহ্‌র কাছেই প্রশিক্ষিত ও প্রতিপালিত হন। যায়দ ইব্‌ন আসলাম আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পর আমি উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির পিছনে এ ধরনের নামায পড়িনি, যাঁর সাথে রাসূলুল্লাহ্‌র নামাযের অনেক মিল ছিল। যায়দ বলেন, তিনি রুকূ ও সিজদা পুরোপুরি আদায় করতেন, কিন্তু কিয়াম ও কূউ'দে (দাঁড়ানো ও বসা অবস্থায়) দেরি করতেন না। জনৈক ব্যক্তি উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে বলেন, তিনি হচ্ছেন বনূ উমাইয়ার 'নাজীর' (অভিজাত ব্যক্তি) এবং কিয়ামতের দিন তিনি একক উম্মত হিসাবে উত্থিত হবেন।

হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) খলীফা হওয়ার পূর্বে অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ মূল্যবান পোশাক পরিধান করতেন। কিন্তু খলীফা হওয়ার পর তিনি পানাহারে ও পরিধানে একেবারে দরবেশী রূপ ধারণ করেন। মায়মূন ইব্‌ন মিহরান বলেন, অনেক বিখ্যাত উলামা শাগরিদের ন্যায় তাঁর সংসর্গে থাকতেন। মুজাহিদ বলেন, আমি উমর উব্‌ন আবদুল আযীযের কাছে এই ধারণা নিয়ে এসেছিলাম যে, তিনি আমার কাছ থেকে কিছু শিখবেন। কিন্তু তাঁর কাছে এসে স্বয়ং আমাকেই অনেক কিছু শিখতে হলো।

তাঁর পিতা আবদুল আযীয ইব্‌ন মারওয়ানের মৃত্যুর সময় তিনি মদীনায়ই ছিলেন। আবদুল আযীযের মৃত্যু-সংবাদ শুনে আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান উমরকে দামিশকে ডেকে পাঠিয়ে তাঁর সাথে আপন কন্যা ফাতিমার বিবাহ দেন। আবদুল মালিকের মৃত্যুর পর ওয়ালীদ খলীফা হয়ে উমরকে মদীনায় শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। তিনি ৮৬ হিজরী থেকে ৯৩ হিজরী সন (৭০৩ থেকে ৭১২ খ্রি) পর্যন্ত মদীনার শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি 'আমীরে হজ্জ' হিসাবে বেশ কয়েকবার হজ্জ আদায় করেন। মদীনায় গভর্নর থাকাকালে সমগ্র ফুকাহা ও উলামা সব সময় তাঁর দরবারেই অবস্থান করতেন।

তিনি মদীনার ফকীহ্‌দের একটি কাউন্সিল গঠন করেছিলেন এবং সেই কাউন্সিলের পরামর্শ অনুযায়ী তিনি যাবতীয় কার্য সম্পাদন করতেন। হাজ্জাজের অভিযোগের ভিত্তিতে ৯৩ হিজরীতে (৭১১-১২ খ্রি) ওয়ালীদ তাঁকে পদচ্যুত করে মদীনা থেকে সিরিয়ায় ডেকে পাঠান। যখন ওয়ালীদ এই ইচ্ছা পোষণ করেন যে, তিনি আপন ভাই সুলায়মানকে 'অলীআহ্‌দী' থেকে বঞ্চিত করে আপন পুত্রকে অলীআহ্‌দী নিযুক্ত করবেন তখন হাজ্জাজ, কুতায়বা প্রমুখ ওয়ালীদকে সমর্থন করেন; কিন্তু অন্যান্য সভাসদ সমর্থন করেন নি। সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে এবং সজোরে ওয়ালীদের ঐ মতের বিরোধিতা করেন তিনি হচ্ছেন হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয। তাই ওয়ালীদ তাঁকে বন্দী করেন এবং তিন বছর তাঁকে বন্দী অবস্থায়ই

কাটাতে হয়। এরপর কারো সুপারিশে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এ কারণেই সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল মালিক উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ও ঋণী ছিলেন। সুলায়মান খলীফা হওয়ার পর উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযকে তাঁর প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন এবং মৃত্যুকালে তাঁকেই পরবর্তী খলীফা মনোনীত করেন।

খিলাফতের আসনে হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র)

যখন সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল মালিক ইনতিকাল করেন তখন (তাঁর প্রধানমন্ত্রী) রাজা ইব্‌ন হায়াত সমগ্র বনূ উমাইয়া এবং সকল অধিনায়ককে ওয়াবিকের মসজিদে একত্র করেন। সীলমোহরকৃত সুলায়মানের ঐ ফরমান তাঁর কাছে ছিল। তিনি সকলকে খলীফার মৃত্যু সংবাদ জানিয়ে পুনরায় সীলমোহরকৃত ঐ ফরমানের অনুকূলে জনসাধারণের কাছ থেকে বায়আত গ্রহণ করেন। এরপর তিনি সীলমোহর খুলে ফরমানটি সবাইকে পাঠ করে শুনান। তাতে সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল মালিক লিখেছিলেন ঃ

"এটি আল্লাহ্‌র বান্দা আমীরুল মু'মিনীন সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল মালিকের পক্ষ থেকে উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের নামে লিখিত।

আমি তোমাকে এবং তোমার পরই ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল মালিককে অলীআহ্‌দ নিযুক্ত করলাম। অতএব জনসাধারণের উচিত, আমার এই ফরমান শোনা, তা মান্য করা, আল্লাহ্‌কে ভয় করা এবং মতবিরোধ না করা, যাতে অন্যরা তোমাদের পরাজিত করার ব্যাপারে আশান্বিত হয়ে না ওঠে।"

এই ফরমান শুনে হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিক বলেন, আমরা উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের হাতে বায়আত করব না। কিন্তু রাজা ইব্‌ন হায়াত দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়ে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় জবাব দেন, 'আমি তোমার গর্দান উড়িয়ে দেব।' একথা শুনে হিশাম চুপ হয়ে যান। আবদুল মালিকের সন্তানরা এই ওসীয়তকে তাদের অধিকার হরণের একটি কারণ বলে মনে করতেন। কিন্তু সাধারণভাবে লোকেরা হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের খলীফা হওয়াকে অত্যন্ত পছন্দ করত। তিনি ছাড়া অন্য কেউ খলীফা হোক তা তারা চাইত না। অপরদিকে উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের পর যেহেতু ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল মালিককে 'অলীআহদ' নিয়োগ করা হয়েছিল তাই আবদুল মালিকের বংশধররা কিছুটা স্বস্তিবোধ করছিল এই ভেবে যে, খিলাফত তো পুনরায় আমাদের হাতেই ফিরে আসবে। যখন রাজা ইব্‌ন হায়াত সুলায়মানের ওসীয়তনামা পড়ে শুনান তখন উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয খিলাফতের জন্য তাঁকে মনোনীত করা হয়েছে শুনে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পড়েন এবং অসাড় হয়ে আপন জায়গায় বসে থাকেন। রাজা ইব্‌ন হায়াত তাঁকে হাত ধরে উঠিয়ে নিয়ে মিম্বরের উপর বসিয়ে দেন। সকলেই প্রথমে হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিককে ডেকে বায়আত করতে বলেন। হিশাম আসেন এবং বায়আত করেন। তাঁর বায়আতের পর সব লোকই সন্তুষ্টচিত্তে বায়আত করে। বায়আতের পর হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল মালিকের জানাযার সালাত পড়ান। লাশ দাফন করে যখন তিনি ফিরে যাচ্ছিলেন তখন লোকেরা তাঁর সামনে শাহী আস্তাবলের একটি ঘোড়া এনে দাঁড় করায় এবং বলে, আপনি এর উপর আরোহণ

করে তাঁবুতে ফিরে যান। তখন তিনি বলেন, আমাকে বহন করার জন্য আমার নিজস্ব খচ্চরই যথেষ্ট। তিনি শেষ পর্যন্ত নিজস্ব খচ্চরে আরোহণ করেই আপন তাঁবুতে ফিরে যান। লোকেরা তাঁকে খিলাফতের প্রাসাদে নিয়ে যেতে চাইলে তিনি বলেন, সেখানে আইয়ূব ইব্‌ন সুলায়মানের পরিবার-পরিজন রয়েছে। যতক্ষণ তারা ওখানে থাকবে ততক্ষণ আমি আমার তাঁবুতেই অবস্থান করব।

খিলাফতের বায়আত নেওয়ার পর হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) জনসাধারণের উদ্দেশ্যে যে ভাষণ দেন তা ছিল নিম্নরূপ ঃ

"(আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও রাসূলের প্রশস্তি বর্ণনার পর) লোকেরা! পবিত্র কুরআনের পর আর কোন গ্রন্থ নেই এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর পর আর কোন নবী নেই। আমি কোন জিনিসের সূচনাকারী নই, বরং সমাপ্তকারী। আমি মুবতাদি' (বিদআতী) নই, বরং মুত্তাবি' (অনুসরণকারী)। আমি কোন অবস্থায়ই তোমাদের চাইতে উৎকৃষ্ট নই। অবশ্য আমার কাঁধের বোঝা তোমাদের চাইতে অনেক ভারী। যে ব্যক্তি জালিম বাদশাহর কাছ থেকে পলায়ন করে সে জালিম হতে পারে না। স্মরণ রেখ, আল্লাহ্‌র হুকুমের বিরুদ্ধে কোন সৃষ্টির (মানুষের) আনুগত্য বৈধ নয়।"

উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল মালিকের কাফন-দাফন সেরে ফিরে এলে তাঁর ক্রীতদাস বলল, আপনাকে অত্যন্ত বিষাদগ্রস্ত দেখাচ্ছে। তিনি উত্তর দেন, আজ যদি এই বিশ্বে কোন ব্যক্তি বিষাদগ্রস্ত থাকে তো সে আমিই। আমার উপর এ বোঝা কি কম যে, আমি চাচ্ছি, আমার আমলনামা লিপিবদ্ধ হওয়া এবং আমার কাছ থেকে তার জবাব তলব করার পূর্বেই যেন আমি হকদারের হক তার কাছে পৌঁছিয়ে দেই। খিলাফতের বায়আত গ্রহণ এবং সুলায়মানের কাফন-দাফন শেষ করে তিনি ঘরে প্রবেশকালে তাঁর দাড়ি ছিল অশ্রুসিক্ত। এই অবস্থা দেখে তাঁর স্ত্রী শংকিত হয়ে জিজ্ঞেস করেন, আপনি ভালো তো ? তিনি উত্তর দেন, ভালো কোথায়? আমার ঘাড়ে উম্মতে মুহাম্মদীর বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন থেকে বস্ত্রহীন, অন্নহীন রোগী, মজলুম, মুসাফির, কয়েদী, শিশু, বৃদ্ধ, অসচ্ছল, আত্মীয়-স্বজন—সকলেরই বোঝা আমাকে বহন করতে হবে। আমি এই ভয়েই কাঁদছি। এমন যেন না হয় যে, আমাকে কিয়ামতের দিন এই বোঝা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, অথচ আমি তার জবাব দিতে অপারগ হয়ে পড়ব।

খলীফা হওয়ার পর তিনি তাঁর স্ত্রী ফাতিমা বিন্‌ত আবদুল মালিককে বলেন, তুমি তোমার যাবতীয় অলংকার বায়তুলমালে দান কর, অন্যথায় আমি তোমার থেকে পৃথক হয়ে যাব। কেননা এটা আমার কাছে মোটেই পছন্দনীয় নয় যে, তুমি ও তোমার অলংকারাদি এবং আমি একই ঘরে অবস্থান করি। একথা শুনে তাঁর স্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে তার যাবতীয় অলংকার মুসলমানদের কল্যাণার্থে বায়তুল মালে দান করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ঐ সমস্ত অলংকারের মধ্যে একটি অতি মূল্যবান মোতিও ছিল, যা আবদুল মালিক তাঁর মেয়েকে দান করেছিলেন।

উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের মৃত্যুর পর যখন ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল মালিক খলীফা হন তখন তিনি ফাতিমা বিন্‌ত আবদুল মালিককে বলেন, আপনি ইচ্ছা করলে আপনার অলংকারাদি বায়তুলমাল থেকে ফেরত নিতে পারেন। ফাতিমা উত্তরে বলেন, যে জিনিস আমি

সন্তুষ্টচিত্তে বায়তুলমালে দান করেছি তা এখন উমর আবদুল আযীযের পর আর ফেরত নিতে পারি না।

আবদুল আযীয ইব্‌ন ওয়ালীদ সুলায়মানের মৃত্যুকালে উপস্থিত ছিলেন না এবং তিনি উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের বায়আতের কথাও জানতেন না। সুলায়মানের মৃত্যুর সংবাদ শুনে তিনি খিলাফতের দাবি উত্থাপন করেন এবং সেনাবাহিনী নিয়ে দামিশ্‌ক অভিমুখে রওয়ানা হন। যখন তিনি দামিশকের নিকটবর্তী হন এবং উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের বায়আতের কথা শুনেন তখন নির্দ্বিধায় তাঁর খিদমতে হাযির হয়ে তাঁর হাতে বায়আত করেন এবং বলেন, আপনার হাতে বায়আত করা হয়েছে, একথা আমি জানতাম না। উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) উত্তরে বলেন, যদি তুমি খিলাফতের জন্য উদ্যোগী হতে তাহলে আমি কখনো তোমার মুকাবিলা করতাম না, বরং লড়াই-ঝগড়া পরিহার করে নিজের ঘরে বসে থাকতাম। আবদুল আযীয ইব্‌ন ওয়ালীদ তখন বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি আপনাকে ছাড়া অন্য কাউকে খিলাফতের যোগ্য মনে করি না।

হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে একটি নির্দেশ জারি করেন যে, এখন থেকে হযরত আলী (রা) সম্পর্কে কেউ যেন কোনরূপ অপ্রীতিকর ও শিষ্টাচার বিরোধী শব্দ ব্যবহার না করে। তখন পর্যন্ত বনূ উমাইয়াদের মধ্যে সাধারণভাবে এই রেওয়াজ চলে আসছিল যে, তারা হযরত আলী (রা)-কে মন্দ বলতে এবং জুমুআর খুতবায়ও তাঁকে গালিগালাজ করতে দ্বিধা করত না।

হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফ সাকাফীকে অত্যাচারী শাসক বলেই মনে করতেন। তাই সুলায়মানের যুগে যে সব আলিম ও সভাসদ হাজ্জাজের পদাঙ্ক অনুসরণ করতেন, তিনি তাদের পদচ্যুত করেন। খুরাসানের গভর্নর ইয়াযীদ ইব্‌ন মুহাল্লাবকে তিনি মন্দ লোক বলেই জানতেন। একথা তাঁর জানা ছিল যে, ইয়াযীদ জুরজান এলাকার জিয্‌য়া আদায় করে তা বায়তুলমালে জমা দেননি। তাই তিনি তাকে তলব করেন। ইয়াযীদ দরবারে হাযির হয়ে উল্লিখিত অর্থ দাখিল না করার পিছনে অনেক ওযর ও যুক্তি পেশ করেন। তিনি এ ব্যাপারে চাতুর্যের আশ্রয় নেন। কিন্তু উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) বলেন, এটা হচ্ছে সমগ্র মুসলমানের সম্পত্তি। আমি কি করে এটা মাফ করতে পারি ? এরপর তিনি ইয়াযীদকে পদচ্যুত করে হালাব (আলেপ্পো) দুর্গে বন্দী করে রাখেন এবং তার স্থলে জাররাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ হাকামীকে খুরাসানের গভর্নর নিয়োগ করেন। মাসলামা ইব্‌ন আবদুল মালিক এবং তাঁর সেনাবাহিনীর লোকদেরকে যারা দীর্ঘদিন থেকে রোমানদের মুকাবিলায় এবং কনসটান্টিনোপল অবরোধে নিয়োজিত থাকার কারণে একেবারে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে উঠেছিলেন, দেশে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। কিছুদিন পর খুরাসানের গভর্নর জার্‌রাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ হাকামীর বিরুদ্ধে তাঁর কাছে অভিযোগ আসে যে, তিনি মাওয়ালীদেরকে কোনরূপ ভাতা এবং রসদসামগ্রী না দিয়েই জিহাদে পাঠান। আর যিম্মীদের মধ্য থেকে যে সব লোক ইসলাম গ্রহণ করে তাদের কাছ থেকেও খারাজ আদায় করেন। এই অভিযোগ শ্রবণ করে তিনি জার্‌রাহ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌র কাছে নিম্নোক্ত নির্দেশ প্রেরণ করেন ঃ 'যে ব্যক্তি নামায পড়ে তার জিয্‌য়া মাফ করে দাও।'

এটা শোনার সাথে সাথে লোকেরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে। জার্‌রাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ এই সমস্ত নওমুসলিমের ব্যাপারে আশ্বস্ত ছিলেন না। তিনি খত্‌নার মাধ্যমে তাদের পরীক্ষা নেন। হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের কাছে এই সংবাদ পৌঁছলে তিনি জার্‌রাহ্‌কে লিখে পাঠান, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আল্লাহ্ তা'আলা দাঈ (আহ্বানকারী) রূপে প্রেরণ করেছিলেন। খাতিন (খতনাকরী) রূপে নয়। এরপর তিনি তাকে নিজের কাছে তলব করেন। জার্‌রাহ্ আবদুর রহ্‌মান ইব্‌ন নাঈমকে নিজের প্রতিনিধি নিয়োগ করে স্বয়ং খলীফার দরবারে এসে হাযির হন। উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কখন খুরাসান থেকে রওয়ানা হয়েছিলে ? তিনি নিবেদন করেন, পবিত্র রমযান মাসে। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি তোমাকে জালিম বলে সে সত্য কথাই বলে। তুমি কেন পবিত্র রমযান অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত তোমার কর্মস্থলে অবস্থান করলে না ?

এরপর তিনি আবদুর রহ্‌মান ইব্‌ন নাঈমকে জিহাদ ও নামাযের ইমাম এবং আবদুর রহ্‌মান কুশায়রীকে রাজস্ব কর্মকর্তা নিয়োগ করেন।

শত্রুরা আযারবায়জান আক্রমণ করে মুসলমানদের উপর লুটপাট চালিয়েছিল। হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) ইব্‌ন হাতিম বাহিলীকে অধিনায়ক নিয়োগ করে সেদিকে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। তিনি সেখানে পৌঁছে শত্রুদের যথোপযুক্ত শাস্তি দেন এবং ইসলামের ভাবমর্যাদা পুনরুজ্জীবিত করেন। হযর উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের শাসনামলেই সিন্ধুর জনসাধারণ ও সেখানকার রাজারা সন্তুষ্টচিত্তে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং সেখানে ইসলামের ব্যাপক প্রসার ঘটে। স্পেনের দিক থেকে প্রয়োজন অনুভূত হলে তিনি সেদিকেও সাজসরঞ্জামসহ সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। তাঁর আমলে রোমানদের বিরুদ্ধেও উল্লেখযোগ্য বিজয় অর্জিত হয়।

বনূ উমাইয়ার অসন্তুষ্টির কারণ

বনূ উমাইয়ার লোকেরা তাদের খিলাফত আমলে ভালো ভালো জায়গীরসমূহ জবরদস্তি-মূলকভাবে দখল করে নিয়েছিল। এতে অন্যান্য মুসলমানের অধিকার বিনষ্ট হয়। কিন্তু যেহেতু বনূ উমাইয়ারা রাষ্ট্র ক্ষমতার অধিকারী ছিল, তাই ভয়ে কেউ তাদের বিরুদ্ধে টু শব্দটি পর্যন্ত করত না। হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) খলীফা হওয়ার পর সর্বপ্রথম নিজের স্ত্রীর অলংকারাদি, যেগুলোর মধ্যে অন্যায়ভাবে অর্জিত মালের সংমিশ্রণ রয়েছে বলে তিনি মনে করতেন, নিজের ঘর থেকে বের করে বায়তুলমালে জমা করিয়ে নেন। এরপর তিনি বনূ উমাইয়াকে একত্র করে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অধিকারে ফাদাক উদ্যান ছিল, যার আয় থেকে তিনি বনূ হাশিমের শিশুদের দেখাশুনা করতেন এবং তাদের বিধবাদের বিবাহ দিতেন। হযরত ফাতিমা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে ঐ উদ্যানটি প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে তা দিতে অস্বীকার করেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ও হযরত উমর (রা)-এর যুগে ঐ বাগানটি সেই অবস্থায়ই ছিল। শেষ পর্যন্ত মারওয়ান তা দখল করে নেন। মারওয়ান থেকে হস্তান্তরিত হতে হতে এটা আমার উত্তরাধিকারিত্বে এসে পৌঁছেছে। কিন্তু একথা আমার বুদ্ধিতে আসে না যে, যে জিনিসটি রাসূলুল্লাহ্ (সা) আপন কন্যাকে দিতেও অস্বীকার করেছিলেন, তা আমার জন্য কিভাবে বৈধ হয়ে গেল ? অতএব আমি তোমাদের

সবাইকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি ফাদাক উদ্যান সেই অবস্থায়ই ছেড়ে দেব, যে অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগে ছিল। এরপর তিনি তাঁর সমগ্র আত্মীয়-স্বজন ও বনূ উমাইয়ার লোকদের যাবতীয় আসবাব সামগ্রী যা অবৈধভাবে তারা দখল করে রেখেছিল, বায়তুলমালে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। আওযাঈ (র) বলেন, একদা উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের ঘরে বনূ উমাইয়ার অধিকাংশ গণ্যমান্য লোক উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি তাদের সম্বোধন করে বলেন, তোমাদের ইচ্ছা কি এই যে, আমি তোমাদেরকে কোন বাহিনীর অধিনায়ক এবং কোন এলাকার মালিক ও হাকিম বানিয়ে দেব ? স্মরণ রেখ, আমি এটাও মানতে রাযী নই যে, আমার ঘরের মেঝে তোমাদের পদধূলিতে অপবিত্র হোক। তোমাদের অবস্থা অত্যন্ত দুঃখজনক। আমি তোমাদেরকে আপন ধর্ম এবং মুসলমানদের সহায়-সম্পদের মালিক কোনভাবেই করতে পারি না। তারা নিবেদন করলেন, আত্মীয়তা সূত্রেও কি আমরা আপনার কাছ থেকে কোন অনুগ্রহ বা বিশেষ সুযোগ-সুবিধা লাভ করতে পারি না ?

উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) উত্তরে বলেন, আমার মতে এক্ষেত্রে তোমাদের এবং একজন সাধারণ মুসলমানের মধ্যে তিল পরিমাণ পার্থক্য নেই। খুলাফায়ে রাশিদার পর খুলাফায়ে বনূ ইমাইয়ার অন্তর থেকে গণতান্ত্রিক মনোবৃত্তি একেবারে উধাও হয়ে গিয়েছিল এবং ইসলামী রাষ্ট্রে সেই স্বেচ্ছাচারিতার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল, যা এক সময়ে কায়সার ও কিস্‌রার সাম্রাজ্যে বিদ্যমান ছিল। হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) ইসলামী সাম্য নীতি ও গণতন্ত্র পুনরায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিলেন। ফলে সিদ্দীকে আকবর (রা) ও ফারূকে আযম (রা)-এর যুগ পুনরায় মানুষের চোখে ভাসতে থাকে। যেহেতু তাঁর খিলাফতকালে বনূ উমাইয়ার লোকেরা (তাদের ধারণা অনুযায়ী) বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল, অনেক সম্পত্তি, যা জোরপূর্বক তারা দখল করে নিয়েছিল, তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল এবং সম্মান ও মর্যাদার সুউচ্চ স্থান যা গোত্রগত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার কারণে তারা লাভ করেছিল, ইসলামী সাম্য নীতি ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুনঃ প্রতিষ্ঠার কারণে ক্রমশ তাদের কাছ থেকে হারিয়ে যাচ্ছিল, তাই তারা তাঁর খিলাফতকে নিজের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর মনে করতে থাকে। তাঁর ধর্মপরায়ণতা ও বিশুদ্ধ মন-মানসিকতার কথা অন্যান্যের মত বনূ উমাইয়ারাও স্বীকার করত, তবে তারা তাঁর অস্তিত্বকে তাদের জাতিগত ও সম্প্রদায়গত স্বার্থ উদ্ধারের পথে একটি বিরাট প্রতিবন্ধক হিসাবে দেখতে পেত।

একদা বনূ উমাইয়ার লোকেরা নিজেদের (অবৈধভাবে অর্জিত) সম্পত্তি রক্ষার জন্য এই কৌশল অবলম্বন করে যে, তারা উমর ইব্‌ন আব্দুল আযীযের ফুফু ফাতিমা বিন্‌ত মারওয়ানের কাছে গিয়ে এই মর্মে আবেদন জানায়, আপনি অনুগ্রহপূর্বক উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের কাছে গিয়ে আমাদের সম্পত্তির ব্যাপারে সুপারিশ করুন। উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) তাঁর ঐ ফুফুকে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখতেন। যা হোক, ফাতিমা আবদুল আযীযের কাছে সুপারিশ করলে তিনি তার সামনে ন্যায় ও সত্য অনুসরণের বিষয়টি এত সুন্দরভাবে তুলে ধরেন যে, শেষ পর্যন্ত ফাতিমা একথা বলতে বাধ্য হন যে, আমি তোমার ভাইদের (সম্প্রদায়ের লোকদের) অত্যধিক চাপ সৃষ্টির কারণে তোমাকে বুঝাতে এসেছি। কিন্তু তোমার ন্যায়পরায়ণতা ও পবিত্র চিত্ততার প্রেক্ষিতে আমি সে ব্যাপারে আর কিছুই বলতে চাই না। এই

বলে তিনি তাঁর কাছ থেকে উঠে যান এবং বনূ ইমাইয়াকে গিয়ে বলেন, তোমরা ফারূককে আযমের পৌত্রীর সাথে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলে বলে তাঁর সন্তানের মধ্যে আজ ফারূকী রং বিকশিত হচ্ছে।

চরিত্র ও গুণাবলী

আবূ নাঈম (নুআয়ম) বিশুদ্ধ সনদের বর্ণনা করেছেন, একদা রিবাহ ইব্‌ন উবায়দা দেখেন যে, উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) সালাত আদায়ের জন্য মসজিদের দিকে যাচ্ছেন এবং এক বৃদ্ধ তাঁর হাত ধরে তাঁর সাথে সাথে যাচ্ছে। তিনি সালাত শেষে আপন ঘরে ফিরে এলে রিবাহ জিজ্ঞেস করলেন, ঐ ব্যক্তি কে যে আপনার হাত ধরে যাচ্ছিল? তিনি একথা শুনে অবাক কণ্ঠে বলেন, আরে তুমিও দেখে ফেলেছ ? তাহলে তুমিও তো একজন উৎকৃষ্ট লোক। অতএব তোমাকে বলতে বাধা নেই যে, ঐ বৃদ্ধ লোকটি ছিলেন খিযির (খিজর) (আ)। তিনি আমার কাছে উম্মতে মুহাম্মদিয়ার অবস্থা জিজ্ঞেস করতে এবং আদ্‌ল ও ন্যায়বিচার শিক্ষা দিতে এসেছিলেন।

একদা জনৈক ব্যক্তি উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের খিদমতে হাযির হয়ে নিবেদন করল, আমি রাতে স্বপ্ন দেখলাম, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বসে আছেন। আর তাঁর ডানদিকে সিদ্দীকে আকবর, বাম দিকে ফারূকে আযম এবং সম্মুখে আপনি বসে আছেন। ইতোমধ্যে দু'জন লোক একটি বিবাদ নিয়ে হাযির হলো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আপনার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন, তুমি তোমার খিলাফত আমলে এ দু'জনের (আবূ বকর ও উমর) পদাংক অনুসরণ করে চলবে। একথা শুনে হযরত উমর ফারূক (রা) নিবেদন করলেন, আমি দেখি যে, সে এরূপই করে। এই স্বপ্ন বর্ণনা করে বর্ণনাকারী এর সত্যতার সম্পর্কে শপথ করলে তিনি কাঁদতে থাকেন।

হাকাম ইব্‌ন উমর বলেন, আমি একদা উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের দরবারে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় সরকারী আস্তাবলের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এসে তাঁর কাছে আস্তাবলের খরচ চাইলেন। তিনি বললেন, তুমি আস্তাবলের সবগুলো ঘোড়া সিরিয়ার শহরসমূহে নিয়ে গিয়ে যে দাম পাও তাতেই বিক্রি করে দাও এবং ঐ অর্থ আল্লাহ্‌র রাস্তায় বিলিয়ে দাও। আমার জন্য আমার খরচটাই যথেষ্ট।

ইমাম যুহ্‌রী (র) বলেন, উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয পত্র মারফত সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌কে জিজ্ঞেস করেন, যাকাতের ব্যাপারে ফারূকে আযম কি নীতি অবলম্বন করতেন? এর উত্তরের শেষাংশে তিনি লিখেন, আপনি যদি মানুষের সাথে সেরূপ আচরণ করেন যেরূপ আচরণ হযরত ফারূকে আযম (রা) তাঁর খিলাফত আমলে করতেন তাহলে আপনি আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর চাইতেও অধিক মর্যাদার অধিকারী হবেন। যখন হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয খলীফা নির্বাচিত হন এবং লোকেরা তাঁর হাতে বায়আত করে তখন তিনি কেঁদে ফেলেন এবং বলতে থাকেন, আমি আমার সম্পর্কে অত্যন্ত শংকিত। হযরত হাম্মাদ (র) জিজ্ঞেস করেন, আপনার কাছে দিরহাম-দীনার কি পরিমাণ প্রিয় ? হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয উত্তর দেন মোটেই (প্রিয়) নয়। হাম্মাদ বলেন, তাহলে আপনি ভয় পাচ্ছেন কেন ? আল্লাহ্ অবশ্যই আপনাকে সাহায্য করবেন।

খলীফা ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন 'আস (র) উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযকে বলেন, আপনার পূর্বে যত খলীফা হয়েছেন তারা সকলেই আমাকে বিভিন্নভাবে পুরস্কৃত করেছেন। কিন্তু আপনি খলীফা হওয়ার পর তার ব্যতিক্রম করেছেন। আমার কাছে কিছু জায়গীরও আছে। যদি আপনি হুকুম দেন তাহলে তা থেকে সেই পরিমাণ গ্রহণ করতে পারি, যা আমার পরিবার-পরিজনের জন্য যথেষ্ট। তিনি উত্তরে বলেন, যা কিছু তুমি পরিশ্রম করে অর্জন কর তাই তোমার সম্পত্তি। এরপর বলেন, মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ কর। কেননা তুমি কষ্টের মধ্যে থাকলে আরাম পাবে, আর আরামের মধ্যে থাকলে তাতে কোনরূপ কমতি দেখা দেবে না।

কোন কোন অঞ্চলের কর্মকর্তা উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের কাছে লিখেন, আমাদের শহর, দুর্গ ও রাস্তাসমূহ মেরামত করা প্রয়োজন। যদি আমীরুল মু'মিনীন কিছু অর্থ মঞ্জুর করেন তাহলে আমরা মেরামতের ব্যবস্থা করতে পারি। তিনি উত্তরে লিখেন, এই পত্র পাঠ মাত্র তোমরা নিজ নিজ শহরে ন্যায়বিচারের দুর্গ নির্মাণ কর এবং রাস্তাসমূহ থেকে জুলুম-অত্যাচার দূর কর। এটাই হচ্ছে আসল মেরামত।

ইবরাহীম সুকূনী বলেন, হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) বলতেন, যখন থেকে আমি জানতে পেরেছি, মিথ্যা বলা দূষণীয় তখন থেকে আমি কখনো মিথ্যা বলি নি। ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন মুনাব্বিহ্ বলেছেন, এই উম্মতে কেউ মাহ্‌দী হয়ে থাকলে তিনি হচ্ছেন হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র)।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ফাদালা বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয এক রাহিবের (ইহুদী আলিম) নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। ঐ রাহিব একটি দ্বীপে বাস করতেন। তিনি আবদুল্লাহ্‌কে দেখামাত্র তার কাছে চলে এলেন। অথচ তিনি কখনো কারো কাছে আসতেন না। যা হোক তিনি আবদুল্লাহ্‌র কাছে এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি জান কি কারণে আমি তোমার কাছে এসেছি ? আবদুল্লাহ্ বলেন, না, আমি জানি না। রাহিব বলেন, শুধু এইজন্য যে, তুমি হচ্ছ একজন ইমামে আদিল (ন্যায়পরায়ণ শাসক)-এর সন্তান।

মালিক ইব্‌ন দীনার বলেন, উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয খলীফা হলে রাখালেরা বিস্মিত হয়ে বলতে থাকে, কে এই ব্যক্তি, যিনি খলীফা হওয়ার পর বাঘেরা আমাদের বকরীর কোন ক্ষতি করছে না ? মূসা ইব্‌ন আইউন বলেন, আমরা তখন কিরমানে বকরী চরাতাম। বাঘেরা আমাদের বকরী পালের সাথে চলাফেরা করত, অথচ বকরীর কোন ক্ষতি করত না। একদা একটি বাঘ একটি বকরী ধরে নিয়ে গেল। আমি ঐ দিন বলে দিলাম, আজ নিশ্চয়ই কোন পুণ্যবান খলীফা ইনতিকাল করেছেন। এরপর খোঁজ নিয়ে দেখা গেল, ঐ দিনই হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) ইনতিকাল করেছেন।

ওয়ালীদ ইব্‌ন মুসলিম বলেন, খুরাসানের জনৈক অধিবাসী স্বপ্নে দেখল, কেউ একজন তাকে বলছে, যখন মুখে দাগযুক্ত বনূ উমাইয়ার কোন ব্যক্তি খলীফা হবে তখন তুমি অনতিবিলম্বে তাঁর হাতে গিয়ে বায়আত করবে। তখন থেকে ঐ ব্যক্তি প্রত্যেক খলীফার চেহারার গঠন সম্পর্কে মানুষকে জিজ্ঞেস করতে থাকে। যখন হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) খলীফা হন তখন ঐ ব্যক্তি একাধারে তিন রাত স্বপ্ন দেখল, ঐ লোকটি তাকে

বলছে, যাও এখন গিয়ে বায়আত কর। অতএব সে খুরাসান থেকে দামিশকে এসে উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের হাতে বায়আত হয়।

হাবীর ইব্‌ন হিন্দ আসলামী বলেন, সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়িব (র) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, খলীফা হচ্ছে তিন জন ঃ আবূ বকর (রা), উমর (রা) ও উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র)। আমি বলি, প্রথম দু'জনকে তো চিনি। কিন্তু এই তৃতীয় জন কে ? তিনি উত্তরে বলেন, যদি তুমি জীবিত থাক তাহলে জানতে পারবে। আর যদি মারা যাও তাহলে তিনি তোমাদের পরবর্তী সময়ে আসবেন। হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের খিলাফত প্রাপ্তির পূর্বেই ইব্‌নুল মুসাইয়িব ইনতিকাল করেন।

মালিক ইব্‌ন দীনার বলেন, যদি কোন ব্যক্তি যাহিদ (সাধক) হতে পারেন তাহলে তিনি হচ্ছেন উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয। দুনিয়া তাঁর কাছে আসল, কিন্তু তিনি তা ত্যাগ করলেন। ইউনুস ইব্‌ন আলী শাবীব বলেন, আমি উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযকে তাঁর খিলাফত লাভের পূর্বে দেখেছি। তখন তিনি এত হৃষ্টপুষ্ট ছিলেন যে, পাজামার ফিতা তার পেটের মধ্যে ঢুকে যেত। কিন্তু খলীফা হওয়ার পর তিনি এতই শীর্ণ হয়ে পড়েন যে, একটি একটি করে তাঁর দেহের সবগুলো হাড় গণনা করা যেত। উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের পুত্র বলেন, আমাকে আবূ জা'ফর মানসুর জিজ্ঞেস করলেন, তোমার পিতা যখন ইন্তিকাল করেন তখন তাঁর কি পরিমাণ সম্পদ ছিল ? তিনি উত্তর দেন, সর্বমোট চারশ দীনার। যদি তিনি আরো কিছুদিন জীবিত থাকতেন তাহলে আয়ের পরিমাণ আরো হ্রাস পেত।

মাসলামা ইব্‌ন আবদুল মালিক বলেন, আমি রোগাক্রান্ত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযকে দেখতে যাই। দেখি যে, তিনি একটি ময়লা জামা পরে আছেন। আমি আমার বোন অর্থাৎ উমরের স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি তাঁর জামাটি ধুয়ে দাও না কেন? তিনি বলেন, তাঁর কাছে দ্বিতীয় কোন জামা নেই যে, গায়েরটি খুলে সেটি পরবেন। উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের ক্রীতদাস আবূ উমাইয়া বলেন, আমি একদিন আমার মনিবের খেদমতে নিবেদন করলাম, হুযূর! মসুর ডাল খেতে খেতে আমার দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। তিনি উত্তর দিলেন, এটা তো তোমার মনিবেরও নিত্য দিনের খাবার।

একদা তিনি তাঁর স্ত্রীকে বলেন, আমার আংগুর খেতে ইচ্ছে হচ্ছে। যদি তোমার কাছে কিছু অর্থ থাকে তো দাও। তাঁর স্ত্রী বলেন, আমার কাছে তো একটি কানাকড়িও নেই। আর আপনি নিজে আমীরুল মু'মিনীন হওয়া সত্ত্বেও আপনার কাছেও আংগুর কিনে খাবার মত অর্থ নেই। তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন আমাকে শিকলে বেঁধে জাহান্নামের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়ার তুলনায় আংগুরের কামনা অন্তরে নিয়ে মরে যাওয়া অনেক ভালো।

তাঁর স্ত্রী বলেন, খিলাফতের দিনগুলোতে তাঁর অবস্থা এই ছিল যে, বাইরে থেকে এসে তিনি সিজদায় পড়ে কাঁদতে থাকতেন এবং এই অবস্থায়ই ঘুমিয়ে যেতেন। যখন চোখ খুলতেন তখন পুনরায় কাঁদতে থাকতেন। ওয়ালীদ ইব্‌ন আবু সাইব বলেন, আমি উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের চাইতে অধিক আল্লাহ্-ভীতি আর কারো মধ্যে দেখিনি।

সাঈদ ইব্ন সুওয়ায়দ বলেন, উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র) মসজিদে নামায পড়তে এলেন। তখন দেখা গেল, তাঁর জামার সামনে ও পিছনে তালি লাগানো রয়েছে। জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহ্ তা'আলা তো আপনাকে সব কিছু দান করেছেন। অতএব আপনি নতুন জামা-কাপড় তৈরি করছেন না কেন? তিনি অল্পক্ষণ মাথা নিচু করে কিছু একটা যেন ভাবলেন। এরপর বললেন, প্রাচুর্যের মধ্যে মধ্যপন্থা অবলম্বন এবং ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কাউকে মার্জনা করা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ বস্তু।

একদা উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র) বলেন, আমি যদি পঞ্চাশ বছরও তোমাদের মধ্যে থাকি তবু আদল ও ন্যায় বিচারের মর্যাদাকে পূর্ণতায় পৌঁছাতে পারব না। আমি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে চাই এবং তোমাদের অন্তর থেকে পার্থিব আশা-আকাঙ্ক্ষা বের করে দিতে চাই। কিন্তু দেখতে পাই যে, তোমাদের অন্তর তা বরদাশ্ত করতে সক্ষম নয়। ইবরাহীম ইব্ন মায়সারা তাউসকে বলেন, উমর ইব্ন আবদুল আযীয হচ্ছেন মাহ্দী। তাউস বলেন, শুধু মাহ্দী নন, বরং পূর্ণ ন্যায়বিচারকও। উমর ইব্ন আবদুল আযীযের মৃত্যুকালে লোকেরা অনেক মালসম্পদ নিয়ে তাঁর খিদমতে হাযির হয়। তিনি তখন বলেন, এসব তোমরা নিয়ে যাও এবং নিজেদের কাজে লাগাও। এরপর তিনি নিজের মালসম্পদও ঐসব মাল সম্পদের অন্তর্ভুক্ত করে ফেলেন। জুওয়ায়রিয়া বলেন, আমরা একদা ফাতিমা বিন্ত আলী ইব্ন আবূ তালিবের কাছে গেলাম। তিনি উমর ইব্ন আবদুল আযীযের প্রশংসা করলেন এবং বললেন, যদি তিনি জীবিত থাকতেন তাহলে আমাদের কোন জিনিসেরই অভাব থাকত না।

ইমাম আওযাঈ (র) বলেন, তিনি কোন লোককে শাস্তি দিতে চাইলে সতর্কতামূলকভাবে তাকে তিন দিন পর্যন্ত কয়েদ করে রাখতেন, যাতে রাগবশত কিংবা তাড়াহুড়ার মধ্য দিয়ে তাকে কোনরূপ শাস্তি দেওয়া না হয়। তিনি বলতেন, যখনই আমি আমার নফ্স্কে (রিপুকে) তার চাহিদা অনুযায়ী কিছু দিয়েছি তখনই সে এর চাইতে উৎকৃষ্ট জিনিসটি আমার কাছে দাবি করেছে। উমর ইব্ন মুহাজির বলেন, তাঁর দৈনিক ভাতা দু'দিরহাম নির্দিষ্ট ছিল। তিনটি কাঠ খাড়া করে তার উপর মাটি বসিয়ে তাঁর চেরাগদান তৈরি করা হয়েছিল। একদা তিনি তাঁর ভৃত্যকে পানি গরম করে আনতে বললে সে শাহী রন্ধনশালা থেকে তা গরম করে নিয়ে আসে। তা জানতে পেরে তার বিনিময়ে এক দিরহাম মূল্যের কাঠ শাহী রন্ধনশালায় পাঠিয়ে দেন। যতক্ষণ লোকেরা তাঁর কাছে বসে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করত ততক্ষণ তিনি বায়তুল মালের প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখতেন। আর যখন লোকেরা চলে যেত তখন সেই প্রদীপ নিভিয়ে দিয়ে নিজের ব্যক্তিগত প্রদীপ জ্বালিয়ে নিতেন। ইতিপূর্বে খলীফার নিরাপত্তার জন্য একশ জন চৌকিদার ও পুলিশ নিযুক্ত থাকত। তিনি খলীফা হয়ে তাদের বলেন, আমার নিরাপত্তার জন্য আমার ভাগ্যলিপিই যথেষ্ট। তোমাদের আমার কোন প্রয়োজন নেই। এতদ্‌সত্ত্বেও যদি তোমাদের কেউ আমার সাথে থাকতে চায় তাহলে সে দশ দীনার করে বেতন পাবে। আর যদি কেউ থাকতে না চায় তাহলে সে যেন আপন পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে যায়।

উমর ইব্‌ন মুহাজির বলেন, একদা উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের ডালিম খাওয়ার খুব শখ হলো। তাঁর জনৈক বন্ধু তাঁর কাছে একটি ডালিম পাঠিয়ে দিলেন। তিনি বন্ধুর খুব প্রশংসা করলেন এবং আপন ভৃত্যকে বললেন, যে ব্যক্তি এটা আমার কাছে পাঠিয়েছে তার কাছে আমার সালাম পৌঁছিয়ে দেবে এবং এই ডালিমটি তাকে ফেরত দিয়ে বলবে, তোমার হাদিয়া (উপঢৌকন) যথাস্থানে পৌঁছে গেছে। ভৃত্য বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন! এটা তো আপনার একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু পাঠিয়েছেন। অতএব তা রাখতে তো আপত্তির কিছু নেই। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ও তো হাদিয়া গ্রহণ করতেন। তিনি বলেন, এটা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য হাদিয়া ছিল, কিন্তু আমার জন্য ঘুষ। মুআবিয়া (রা) সম্পর্কে অশিষ্ট কথা বলার অপরাধে তিনি এক ব্যক্তিকে চাবুক মারেন, এছাড়া আর কাউকে বেত্রাঘাত করেন নি।

তিনি তাঁর পরিবার-পরিজনের খরচের পরিমাণ কমিয়ে দিলে তারা এ সম্পর্কে তাঁর কাছে অভিযোগ পেশ করে। তিনি উত্তরে বলেন, বর্তমানে আমার ধনসম্পদ এত প্রচুর নয় যে, পূর্বের ন্যায় তোমাদের খরচের কোটা বহাল রাখব। বাকি রইল বায়তুল মালের কথা। তাতে তোমাদেরও যে ধরনের অধিকার রয়েছে, সে ধরনের অধিকার রয়েছে একজন সাধারণ মুসলমানেরও। ইয়াহইয়া গাস্‌সানী বলেন, হযরত ইমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) আমাকে মাওসিলের গভর্নর নিয়োগ করলে আমি লক্ষ্য করি যে, সেখানে অনেক বেশি চুরির ঘটনা ঘটে। আমি তাঁকে এই অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করি এবং তাঁর কাছে জানাতে চাই, এ ধরনের মোকদ্দমার ফায়সালা আমি সাক্ষ্যের উপর করব, না ব্যক্তিগত মতের ভিত্তিতে ? তিনি নির্দেশ দেন, প্রত্যেক মোকদ্দমায়ই সাক্ষ্য গ্রহণ অপরিহার্য। যদি 'হক' (ন্যায় ও সত্য) তাদেরকে সংশোধন না করে তাহলে আল্লাহ্ তা'আলাও তাদেরকে কখনো সংশোধন করবেন না। আমি তাঁর নির্দেশ পালন করি; যার ফলে মাওসিল সর্বাধিক নিরাপদ ভূখণ্ডে পরিণত হয়।

রাজা ইব্‌ন হায়াত বলেন, একদা আমি উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের কাছে বসছিলাম, এমন সময় প্রদীপ নিভে গেল। সেখানেই তাঁর ভৃত্য শুয়েছিল। আমি চাইলাম তাকে জাগিয়ে দিতে। কিন্তু তিনি আমাকে নিষেধ করলেন। এরপর আমি নিজেই উঠে গিয়ে প্রদীপটি জ্বালিয়ে দিতে চাইলাম। কিন্তু তিনি নিজেই উঠে গিয়ে তেলের পাত্র নিয়ে এলেন এবং তা থেকে প্রদীপে তেল ভরে তা জ্বালিয়ে নিজের জায়গায় এসে বসলেন। এরপর বললেন, আমি এখনো সেই পূর্বেকারই উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয। অর্থাৎ প্রদীপ জ্বালিয়ে আনার কারণে আমার মর্যাদা এতটুকুও ক্ষুণ্ন হয়নি।

আতা বলেন, উমর ইব্‌ন আব্দুল আযীয (র) রাতের বেলা আলিমদের একত্র করতেন এবং মৃত্যু ও কিয়ামতের আলোচনা করে এত কাঁদতেন যে, মনে হতো তাঁর সামনে যেন কোন জানাযা রেখে দেওয়া হয়েছে। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন গাবরাআ বলেন, একদা উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) তাঁর খুতবায় বলেন, লোক সকল! তোমরা তোমাদের গোপন বিষয়গুলো সংশোধন করে নাও, তোমাদের বাহ্যিক বিষয়গুলো আপনা-আপনি সংশোধিত হয়ে যাবে। পরকালের জন্য কাজ কর। দুনিয়ার প্রতি সেই পরিমাণ মনোযোগ দাও, যে পরিমাণ মনোযোগ দেওয়া অপরিহার্য। স্মরণ রেখ, তোমাদের বাপ-দাদাকে মৃত্যুই গ্রাস করেছে।

তিনি বলতেন, অতীতের মহান ব্যক্তিদের (সালাফে সালেহীন) অনুসরণ কর। কেননা তাঁরা তোমাদের চাইতে অপেক্ষাকৃত ভাল এবং অধিকতর জ্ঞানী ছিলেন। তাঁর পুত্র আবদুল মালিকের মৃত্যু হলে তিনি তার প্রশংসা করতে থাকেন। মাসলামা বলেন, আপনি তার প্রশংসা করছেন কেন ? তিনি উত্তর দেন, আমি দেখতে চাচ্ছি, আমার মরহুম পুত্র শুধু আমারই দৃষ্টিতে প্রশংসাযোগ্য না, অন্যরাও তার প্রশংসা করে। কেননা পিতার দৃষ্টিতে পুত্র সব সময়ই প্রশংসাযোগ্য থাকে। তাই পিতার প্রশংসা দ্বারা পুত্রের প্রশংসার পরিমাণ নির্ধারণ করা চলে না। উসামা ইব্‌ন যায়দ (র)-এর কন্যা তাঁর দরবারে এলে তিনি তাঁকে উষ্ণ সংবর্ধনা জানান এবং একজন অতি শিষ্টজনের মত তাঁর সামনে বসে পড়েন। এরপর তিনি যা চান তাঁকে তাই দান করেন।

একদা তাঁর নিকটাত্মীয়রা বলেন, চলো আমরা হাস্যরসের কথা বলে আমীরুল মু'মিনীনকে আমাদের দিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করি। অতএব তারা কয়েকজন একত্রিত হয়ে তাঁর কাছে গেল। তাদের একজন হাস্যরসের কিছু কথা বললে অপরজন তাতে সায় দিল। উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) তখন বললেন, তোমরা একটি অত্যন্ত ঘৃণিত কথার উপর সমবেত হয়েছ, যার পরিণাম হচ্ছে শত্রুতা। তোমরা কুরআন পাঠ কর, হাদীস পাঠ কর এবং হাদীসের মানে-মতলব নিয়ে চিন্তা-গবেষণা কর, এটাই শ্রেয়।

ইয়াহ্ইয়া গাস্‌সানী বলেন, উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল মালিককে একজন খারিজী হত্যা থেকে নিবৃত্ত রাখেন এবং এই মর্মে রায় দেন যে, তাকে তখন পর্যন্ত কয়েদখানায় রাখা হবে যতক্ষণ না সে তওবা করে। তখন সুলায়মান ঐ খারিজীকে ডেকে বলেন, তুমি এবার কি বলতে চাও ? সে উত্তর দিল, হে ফাসিকের পুত্র ফাকিস! যা জিজ্ঞেস করতে চাস্ কর। সুলায়মান বলেন, আমি আবদুল আযীযের রায়ের কারণে নিরুপায়। এরপর তিনি উমরকে ডেকে বলেন, দেখ এই খারিজী কি বলে। খারিজী পুনরায় সেই শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তি করল। সুলায়মান বলেন, এবার বল তার সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নিতে হবে। উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! সে যেভাবে আপনাকে গালি দিয়েছে আপনিও সেভাবে তাকে গালি দিন। খলীফা সুলায়মান বলেন, এটা সমীচীন নয়। এরপর তিনি খারিজীকে হত্যার নির্দেশ দেন এবং তদনুযায়ী তাকে হত্যা করা হয়। উমর যখন খলীফার দরবার থেকে ফিরে আসছিলেন তখন পথিমধ্যে পুলিশপ্রধানের সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়। পুলিশপ্রধান বলেন, আপনি একটি অদ্ভুত রায় দিলেন যে, আমীরুল মু'মিনীনও খারিজীকে সেরূপ গালি দিন যেরূপ গালি সে তাঁকে দিয়েছে। আমি তো ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, না জানি আমীরুল মু'মিনীন আপনাকেই মৃত্যুদণ্ড দেন। তিনি পুলিশপ্রধানকে জিজ্ঞেস করেন, যদি আমীরুল মু'মিনীন আমার মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দিতেন তাহলে তুমি কি আমার গর্দান উড়িয়ে দিতে ? খালিদ (পুলিশপ্রধান) উত্তর দেন, হ্যাঁ, আমি তাই করতাম। তিনি খলীফা হওয়ার পর খালিদ যথারীতি নিজ পদমর্যাদা অনুযায়ী তাঁর সামনে এসে দাঁড়ায়। উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) তাকে নির্দেশ দেন, তোমার এই তরবারি রেখে দাও এবং এখন থেকে নিজেকে পদচ্যুত মনে কর। এরপর তিনি ইব্‌ন মুহাজির আনসারীকে

ডেকে তাকে পুলিশপ্রধান নিয়োগ করেন এবং বলেন, আমি তাকে (ইব্ন মুহাজিরকে) প্রায়ই কুরআন তিলাওয়াত করতে দেখেছি এবং এমন গোপন জায়গায় নামায পড়তে দেখেছি, যেখানে কেউ তাকে দেখতে পেত না। উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র) বলতেন, যে ব্যক্তি রাগ, ঝগড়াঝাটি এবং কামনা-বাসনা থেকে দূরে রইল সে মুক্তি পেয়ে গেল।

একদা জনৈক ব্যক্তি তাঁকে বলে, যদি আপনি নিজের জন্য উটনী নির্দিষ্ট করে নিতেন এবং পানাহারের ব্যাপারে সতর্ক থাকতেন তাহলে খুব ভাল হতো। তখন তিনি বলেন, হে আল্লাহ্! আমি যদি কিয়ামত ভিন্ন অন্য কোন বস্তুকে ভয় করি তাহলে আমাকে তা থেকে নিরাপদ রেখ না। একদা তিনি বলেন, লোক সকল! আল্লাহ্কে ভয় কর এবং জীবিকার সন্ধানে হন্যে হয়ে ফিরো না। তোমার ভাগ্যে যে জীবিকা নির্ধারিত আছে তা যদি পাহাড় কিংবা মাটির নিচেও থাকে তবুও তা তোমার কাছে এসে পৌঁছবে। আযহার বলেন, আমি তাঁকে খুতবা দিতে দেখেছি এমতাবস্থায় যে, তাঁর জামা ছিল তালিযুক্ত।

একদা তিনি আমর ইব্ন কায়স সুকুনীকে সায়ফার দিকে প্রেরিতব্য সেনাবাহিনীর অধিনায়ক নিয়োগ করেন এবং তাকে বিদায় দানকালে বলেন, সেখানকার পুণ্যবান লোকদের কথা শুনবে এবং খারাপ লোকদেরকে ক্ষমা করে দেবে। মধ্যম পন্থা অবলম্বন করবে, যাতে মানুষ তোমার মর্যাদা ভুলে না বসে, বরং তোমার কথা শুনতে আগ্রহী হয়।

খুরাসানের গভর্নর জার্রাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ তাঁকে লিখেন, খুরাসানবাসীরা বক্র প্রকৃতির লোক। তরবারি ছাড়া এদেরকে শায়েস্তা করা যাবে না। তিনি উত্তরে লিখেন, তুমি ভুল বলেছ যে, খুরাসানবাসীদের তরবারি ছাড়া সংশোধন করা যাবে না। অবশ্যই মনে রাখবে, ন্যায়বিচার এবং অধিকার প্রদান এমন বস্তু, যার দ্বারা মানুষ আপনা-আপনি সংশোধিত হয়ে যায়। অতএব তুমি তাদের মধ্যে এ দু'টি বস্তুর প্রসার ঘটাও।

স্যালিহ্ ইব্ন যুবায়র বলেন, কখনো কখনো এমন ঘটত যে, আমি আমীরুল মু'মিনীনকে একটি কথা বলতাম এবং তিনি সেজন্য আমার উপর অসন্তুষ্ট হতেন। একদা তাঁর সামনে উল্লেখ করা হলো যে, কোন একটি গ্রন্থে লিখিত আছে, বাদশাহ্র অসন্তুষ্টিকে ভয় কর। যখন তাঁর রাগ পড়ে যায় তখন তার সামনে যাও। তিনি একথা শুনে বললেন, হে সালিহ্! আমি তোমাকে অনুমতি দিচ্ছি, তুমি আমার ক্ষেত্রে এ আইন মেনে চলবে না।

আল্লামা যাহাবী (র) বলেন, মায়লান নামক জনৈক ব্যক্তি উমর ইব্ন আবদুল আযীযের খিলাফত আমলে তাকদীর অস্বীকার করে। তিনি তাকে ডেকে তাওবা করার নির্দেশ দেন। সে উত্তরে বলে, আমি যদি পথভ্রষ্ট হতাম তাহলে আপনার এই হিদায়াত যথার্থই ছিল। তিনি বলেন, 'হে আল্লাহ্! যদি এই ব্যক্তি সত্যবাদী হয় তাহলে তো ভাল, অন্যথায় তার হাত ও পা কেটে তাকে শূলে চড়িয়ে দাও। এই বলে তিনি তাকে ছেড়ে দেন। সে তার বিশ্বাসের উপরই কায়েম ছিল এবং তা নিয়মিত প্রচারও করত। কিন্তু পরবর্তী সময়ে খলীফা হিশাম ইব্ন আবদুল মালিক তাকে তার এই আকীদার কারণে গ্রেফতার করেন এবং তার হাত-পা কেটে তাকে শূলে চড়িয়ে দেন।

একদা মারওয়ানের সন্তানরা উমর উব্‌ন আবদুল আযীযের দরজায় সমবেত হয় এবং তাঁর পুত্রকে বলে, তুমি তোমার পিতাকে গিয়ে বল, আপনার পূর্বে বনূ উমাইয়ার যত খলীফা হয়েছেন তারা সকলেই আমাদের জন্য কিছু না কিছু উপহার এবং জায়গীর নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কিন্তু আপনি খলীফা হয়ে আমাদেরকে সব কিছু থেকে বঞ্চিত করেছেন। তার পুত্র এ পয়গাম নিয়ে তাঁর কাছে গেলে তিনি বলেন, তুমি ওদেরকে গিয়ে বল, আমার পিতা বলেন,

اِنِّىْ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّىْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ –

"আমি যদি আমার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করি তবে আমি আশংকা করি মহাদিবসের শাস্তির"- (৬ ঃ ১৫)।

খারিজী সম্প্রদায়

এই পর্যন্তকার সার্বিক পরিস্থিতির মূল্যায়ন করলে দেখা যায় যে, খারিজীদের বিশৃংখলা ও নৈরাজ্যকর তৎপরতা সব সময়ই বিদ্যমান ছিল। কোন যুগেই এর মূলোৎপাটন সম্ভব হয়নি। হ্যাঁ, যখন কোন পরাক্রমশালী খলীফা খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হতেন তখন খারিজীরা কিছু দিন ঘাপটি মেরে সুযোগের অপেক্ষা করত এবং যখনই সুযোগ আসত তখনই রণক্ষেত্রে পুনরায় ঝাঁপিয়ে পড়ত। খারিজী এবং অন্যদের গোপন ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহ ইরাক, খুরাসান প্রভৃতি জায়গায় বিকশিত ও সম্প্রসারিত হওয়ার সুযোগ পায়। মোটকথা খারিজীরা কখনো প্রকাশ্যে, আবার কখনো গোপনে হলেও, বরাবরই আন্দোলনরত থাকে। উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) যখন খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হন এবং তাঁর সৎকর্মপরায়ণতা ও পবিত্রচিত্ততার কথা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে তখন খারিজীরাও নিজ থেকেই সিদ্ধান্ত নেয়, উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের মত একজন পুণ্যবান খলীফার বিরুদ্ধে কোনরূপ বিপ্লবী কর্মসূচি গ্রহণ মোটেই সমীচীন হবে না। অতএব এই মহান ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত থাকবেন ততদিন আমরা আমাদের বিপ্লবী কর্মসূচি মুলতবি রাখব। এ কারণেই তাঁর খিলাফত আমলে কোন খারিজী বিদ্রোহ পরিলক্ষিত হয়নি।

তারা একবার শুধু খুরাসানে মাথা তুলেছিল। উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) সেখানকার শাসনকর্তাকে নির্দেশ দেন, যতক্ষণ পর্যন্ত ওরা কাউকে হত্যা না করে ততক্ষণ ওদের সাথে সংঘর্ষে যাবে না। তবে ওদের গতিবিধির উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবে। এরপর তিনি খারিজীদের নেতার কাছে একটি পত্র লিখেন। তাতে তিনি বলেন, আমরা জানতে পেরেছি, তোমরা আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রাসূলের খাতিরে বিদ্রোহ করেছ। কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা তোমাদের চাইতে অধিক হকদার। তোমরা আমাদের কাছে চলে এসো এবং এ ব্যাপারে একটা বিতর্ক অনুষ্ঠিত হোক। আমরা যদি সত্যের উপর থাকি তাহলে তোমরা আমাদের সহযোগিতা করবে। আর যদি তোমরা সত্যের উপর থাক তাহলে আমরা তোমাদের কথা মেনে নেব। এই চিঠি পড়ে খারিজীদের নেতা নিজের পক্ষ থেকে দু'জন বিচক্ষণ ব্যক্তিকে বিতর্কের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করে। ঐ দুই ব্যক্তি এসে উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়। খারিজীরা তাঁকে বলছিল, তোমাদের মহান ব্যক্তিরা অর্থাৎ খুলাফায়ে বনূ উমাইয়া কাফির ছিল। তাদের উপর

অভিশাপ বর্ষণ করা অত্যাবশ্যক। আর তিনি বলেছিলেন, তোমরা তো কখনো ফিরআউনের উপরও অভিশাপ বর্ষণ করনি, অথচ সে নিশ্চিতভাবেই কাফির ছিল। অতএব তোমরা যখন ফিরআউনের উপর অভিশাপ বর্ষণ করাকে জরুরী মনে করছ না, তখন কী করে তোমরা ঐ সমস্ত লোককে কাফির আখ্যা দিতে পার, যারা তাওহীদ ও রিসালাতের প্রতি ঈমান রাখতেন এবং ইসলামের যাবতীয় হুকুম-আহকামও পালন করতেন ? বিতর্কের ফলশ্রুতি এই দাঁড়ায় যে, ঐ দুই খারিজীর একজন নিজের দল ছেড়ে সাধারণ মুসলমানদের দলে ভিড়ে যায়। অন্য খারিজীরাও দীর্ঘদিন পর্যন্ত একদম নীরব থাকে।

উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র)-এর ইনতিকাল

ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, উমাইয়া গোষ্ঠী উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের কর্মনীতির প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিল। কেননা তিনি তাদের কাছ থেকে ঐ সমস্ত জায়গীর, সহায়-সম্পদ ও মাল-সামগ্রী ছিনিয়ে নিয়েছিলেন যেগুলোর উপর তারা অন্যায়ভাবে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিল। রাষ্ট্রের কাছ থেকে তাদের সুবিধা আদায়ের অন্যান্য পথও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তারা তাদের এই ক্ষতি বরদাশ্‌ত করে নিতে পারেনি, তাই তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। আর তাকে হত্যা করা কোন কঠিন কাজ ছিল না। কেননা তিনি তাঁর ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য যেমন কোন পাহারাদার নিয়োগ করতেন না, তেমনি পানাহারের ক্ষেত্রেও কোন সাবধানতা অবলম্বন করতেন না। বনূ উমাইয়ার লোকেরা তাঁকে হত্যার জন্য সবচেয়ে সহজ মাধ্যম তথা তাঁর খাদ্যে বিষপ্রয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়। তারা তাঁর ক্রীতদাসকে লোভ দেখিয়ে নিজেদের দলে ভিড়ায় এবং তার মাধ্যমে উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের খাদ্যে বিষপ্রয়োগ করে। যখন তাঁকে বিষপ্রয়োগ করা হয় তখন তিনি তা জেনে ফেলেন। বিষক্রিয়া ক্রমশ বাড়তে থাকলে লোকেরা তাঁকে বলে, আপনি চিকিৎসা করছেন না কেন ? তিনি উত্তর দেন, যখন আমাকে বিষপ্রয়োগ করা হয় তখন যদি কেউ বলত, এখন তুমি তোমার কানের লতি স্পর্শ করলে অনায়াসে আরোগ্য লাভ করতে পারবে– তাহলেও আমি আমার কানের লতি স্পর্শ করতাম না।

মুজাহিদ বলেন, উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'জনসাধারণ আমার সম্পর্কে কি বলে ? আমি বললাম, তাদের ধারণা এই যে, আপনাকে 'জাদু' করা হয়েছে। তিনি উত্তর দিলেন, না, আমি জাদুগ্রস্ত নই, বরং যখনই আমাকে বিষপ্রয়োগ করা হয় তখনই আমি তা জানতে পারি। এরপর তিনি ঐ ক্রীতদাসকে ডেকে পাঠান, যে তার খাদ্যে বিষপ্রয়োগ করেছিল। তিনি তাকে বলেন, আক্ষেপের বিষয় তুমি আমাকে বিষপ্রয়োগ করেছ। শেষ পর্যন্ত কোন্ প্রলোভনে তুমি এই কাজ করতে উদ্যত হলে? সে উত্তর দেয়, আমাকে এক হাজার দীনার এবং মুক্তিদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, ঐ দীনারগুলো আমার কাছে নিয়ে এস। সে তা নিয়ে এল। তিনি তখনই ঐ এক হাজার দীনার বায়তুলমালে জমা দেন এবং ক্রীতদাসকে বলেন, তুমি এখনই এখান থেকে বের হয়ে যেদিকে ইচ্ছা পালিয়ে যাও। কেউ যেন তোমার চেহারা আর দেখতে না পায়।

উবায়দ ইব্‌ন হাস্‌সান বলেন, তাঁর অন্তিম সময় উপনীত হলে এবং মৃত্যুকষ্ট শুরু হলে তিনি লোকদেরকে বলেন, আমাকে একা থাকতে দাও। অতএব সকলেই বাইরে চলে গেল।

কিন্তু মাসলামা ইব্‌ন আবদুল মালিক এবং তার স্ত্রী ফাতিমা বিন্‌ত আবদুল মালিক দরজায় দাঁড়িয়ে রইলেন। তারা সেখান থেকে শুনতে পেলেন, তিনি বলছেন, বিসমিল্লাহ্, এবার আসুন। এই আকৃতি না মানুষের, আর না জিনের। এরপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ –

"এটা আখিরাতর সেই আবাস, যা আমি নির্ধারণ করি তাদের জন্য যারা এই পৃথিবীতে উদ্ধত হতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না। শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য" (২৮ ঃ ৮৩)।

হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) হিজরী ১০১ সনের ২৫শে রজব (৭২০ খ্রি-এর ফেব্রুয়ারীতে) ইন্তিকাল করেন। তিনি মোট দু'বছর পাঁচ মাস চার দিন খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। হিম্‌স এলাকার 'দাহরে মাআন' নামক স্থানে তিনি ইন্তিকাল করেন। হাসান বসরী (র) তাঁর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে বলে উঠেন, আজ সবচেয়ে ভাল মানুষটি চলে গেলেন। কাতাদা বলেন, তিনি তাঁর পরবর্তী খলীফা ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল মালিকের উদ্দেশ্যে একটি চিঠি লিখেন ঃ

"দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে। ঐ পত্রটি আল্লাহ্‌র বান্দা উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের পক্ষ থেকে। আস্‌সালামু আলায়কুম।

"হে ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল মালিক! জেনে রেখ, আমি সেই আল্লাহ্‌র প্রশংসা করছি, যিনি ব্যতীত আর কোন প্রভু নেই। আমি আমার অন্তিম অবস্থায় তোমার কাছে এ চিঠি লিখছি। আমি জানি যে, আমাকে আমার শাসনামল সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আর সেই জিজ্ঞাসাবাদকারী হচ্ছেন দুনিয়া ও আখিরাতের মালিক। এটা কোন মতেই সম্ভব নয় যে, আমি তাঁর নিকটে আমার কোন কাজ গোপন রাখতে পারব। যদি তিনি আমার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান তাহলে আমি মুক্তি পেয়ে যাব, অন্যথায় আমার ধ্বংস অনিবার্য। আমি দু'আ করি, যেন তিনি তাঁর অপার করুণাগুণে আমাকে মার্জনা করেন, জাহান্নামের শাস্তি থেকে রেহাই দেন এবং আমার উপর সন্তুষ্ট হয়ে আমাকে জান্নাতে দাখিল করেন। তোমার উচিত, আল্লাহ্ সম্পর্কে সদা-সতর্ক থাকা এবং জনসাধারণের সুযোগ-সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখা। আমার পর তুমিও বেশি দিন দুনিয়ায় থাকবে না।"

ইউসুফ ইব্‌ন মালিক বলেন, আমরা তাঁকে কবরে শুইয়ে মাটি দিয়ে ঢাকছিলাম, এমন সময় আসমান থেকে একটি কাগজ এসে পড়ল। তাতে লেখা ছিল ঃ আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযকে জাহান্নামের আগুন থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছে।

স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি

হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের তিনজন স্ত্রী ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি এগারজন পুত্র সন্তান রেখে যান। তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে ফাতিমা বিন্‌ত আবদুল মালিক ছিলেন ঠিক তাঁর মতই পবিত্রচেতা ও আল্লাহ্‌ভীরু। ফাতিমা ছিলেন একাধারে খলীফার নাতনী, খলীফার কন্যা,

খলীফাদের বোন ও খলীফার স্ত্রী। এতদসত্ত্বেও তিনি অত্যন্ত সরল জীবন যাপন করতেন। তাঁর পুত্রদের মধ্যে ইসহাক, ইয়াকূব, মূসা, আবদুল্লাহ্, বকর ও ইবরাহীম স্ত্রীদের গর্ভে এবং অবশিষ্টরা দাসীদের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। অবশিষ্টদের নাম আবদুল মালিক, ওয়ালীদ, আসিম, ইয়াযীদ, আবদুল্লাহ্, আবদুল আযীয ও রাইয়ান। তাঁর পুত্র আবদুল মালিক অবিকল পিতার মত ছিলেন। উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) প্রায়ই বলতেন, আমি আমার পুত্র আবদুল মালিকের কারণে পুণ্যকাজে ও ইবাদত-বন্দেগীতে প্রেরণা পাই। কিন্তু আবদুল মালিক তাঁর জীবিতাবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করেন।

তিনি মৃত্যুকালে যে অর্থ-সম্পদ রেখে যান তার পরিমাণ ছিল ২১ দীনার। তা থেকে কয়েক দীনার কাফন-দাফনে খরচ হয় এবং অবশিষ্ট অর্থ পুত্র-কন্যাদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। আবদুর রহমান ইব্‌ন কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর বলেন, উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয ১১ জন পুত্র রেখে যান, অনুরূপভাবে হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিকও ১১জন পুত্র রেখে যান। লক্ষণীয় যে, উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের পুত্ররা তাদের পিতার সম্পত্তি থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে জন প্রতি প্রায় এক দীনার পান। অথচ হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিকের পুত্ররা মাথা প্রতি প্রায় দশ লক্ষ দিরহাম পান। আমি উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের এক পুত্রকে দেখেছি যে, তিনি একদিন জিহাদের জন্য একশ ঘোড়া দান করেছেন, অথচ হিশামের এক পুত্রকে দেখেছি যে, তিনি অভাবের তাড়নায় মানুষের কাছ থেকে যাকাত গ্রহণ করছেন।

এক নজরে উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র)-এর খিলাফতকাল

হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র)-এর খিলাফতকাল হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর খিলাফতকালের ন্যায় অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। কিন্তু সিদ্দিকী খিলাফতকাল যেমন ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান তেমনি উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের খিলাফতকালও ছিল মুসলিম বিশ্বের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান ও তাৎপর্যপূর্ণ। বনূ উমাইয়ার শাসনকাল ধীরে ধীরে মানুষের মনে সংসার পূজা, ধন-সম্পদের আসক্তি ও আখিরাত সম্পর্কে ঔদাসীন্য সৃষ্টি করে। উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের সংক্ষিপ্ত খিলাফতকাল কিছু দিনের জন্য হলেও ঐসব অসৎ মনোবৃত্তি দূর করে মুসলমানদেরকে পুনরায় রূহানিয়াত ও পুণ্যের দিকে চালিত করে। সবচেয়ে বড় কীর্তি এই যে,. তিনি রাজতান্ত্রিক খিলাফতকে খিলাফতে রাশিদার আদর্শে প্রতিষ্ঠিত করে বিশ্বে পুনরায় সিদ্দিকী ও ফারূকী যুগের আবির্ভাব ঘটান।

হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) বনূ উমাইয়ার খলীফাদের অত্যাচার, উৎপীড়ন এবং বাড়াবাড়িকে অত্যন্ত ঘৃণা করতেন। তিনি চাইতেন বিশ্বে শান্তি ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার মানবিক অধিকার থেকে উপকৃত হওয়ার সুযোগ দান করতে। তিনি একজন নাস্তিকের উপরও কোনরূপ জবরদস্তি করতে চাইতেন না। তিনি খারিজীদেরকেও তাদের মতবাদ প্রকাশের সুযোগ দিয়েছিলেন। তিনি খলীফাতুল মুসলিমীনের মর্যাদা এই পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত করতে চাচ্ছিলেন যে, যদি কোন অপরাধী খলীফাকে গালি দেয় তাহলে খলীফাও প্রতিশোধস্বরূপ ঐ ব্যক্তিকে সেরূপ গালিই দিতে পারবেন, এর বেশি কিছু করতে পারবেন না।

তিনি তাঁর অধীনস্থদের কাছ থেকে চাইতেন না যে, তারা তাঁর প্রত্যেকটি ন্যায়-অন্যায় কাজে সহায়তা ও সমর্থন প্রদান করুক। তিনি খলীফাকে মুসলমানদের বাদশাহ ও শাসক মনে করতেন না, বরং তাদের একজন হৃদয়বান পিতা বলেই মনে করতেন। মোটকথা সিদ্দীকে আকবর ও ফারূকে আযমের মধ্যে যে সব গুণ আমরা দেখেছি তার যাবতীয় নমুনা উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের মধ্যেও বিদ্যমান ছিল। তাই একথা অত্যন্ত যুক্তিসংগত যে, উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের মৃত্যুর সাথে সাথে খিলাফতে রাশিদারও পরিসমাপ্তি ঘটে। তাঁর যুগে এক বিরাট সংখ্যক লোক স্বেচ্ছায় ও সন্তুষ্টচিত্তে ইসলাম গ্রহণ করে। অন্য কোন খলীফার যুগে ইসলাম গ্রহণের এরূপ জোয়ার পরিলক্ষিত হয়নি। অথচ তাঁর যুগে যুদ্ধবিগ্রহ হয়েছে খুবই কম। তাঁর রাষ্ট্রের সীমা সিন্ধু, পাঞ্জাব, বুখারা, তুর্কিস্তান ও চীন থেকে শুরু করে মরক্কো, স্পেন ও ফ্রান্স পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এত বড় রাষ্ট্রের সর্বত্র শান্তি ও নিরাপত্তা বিদ্যমান ছিল।

তাঁর শাসনামলে বহু রাস্তা নির্মিত হয়েছে। প্রত্যেক প্রদেশেই মাদ্‌রাসা ও দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করা হয়েছে। তাঁর সময়কার আদল ও ন্যায় বিচারের নমুনা আজ পর্যন্ত দুনিয়ার কোথাও কেউ প্রত্যক্ষ করেনি। এ কারণেই তাঁর মৃত্যুতে শুধু মুসলমানদের ঘরেই ক্রন্দন রোল ওঠেনি, বরং খ্রিস্টান ও ইহুদীদেরকেও মাতম করতে দেখা গেছে। রাহিবরা তাঁর মৃত্যু সংবাদ শুনে তাদের গির্জা ও উপাসনালয়ে এই বলে রোদন করতে থাকে যে, আজ দুনিয়া থেকে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাকারী এবং তা রক্ষাকারী বিদায় গ্রহণ করেছেন।

হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) শিয়া, সুন্নী, খারিজী প্রভৃতি ফিরকার সমগ্র বিরোধ মিটিয়ে ফেলেন। আজ পর্যন্ত দুনিয়ায় এমন একটি লোকও দৃষ্টিগোচর হয় না, যে তার অন্তরে হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের প্রতি সামান্য বিদ্বেষও পোষণ করে। এখানে প্রতিটি বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য একথা চিন্তা করে দেখার সুযোগ রয়েছে যে, যে ব্যক্তিই ইসলামের অধিকতর অনুসারী সে বিশ্ববাসীর কাছে সর্বাধিক প্রিয়। এটা নিঃসন্দেহে ইসলামের সৌন্দর্যের একটি উল্লেখযোগ্য দিক। সিদ্দীকে আকবর, ফারূকে আযম, উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয, নূরুদ্দীন জঙ্গী ও সালাহ্‌উদ্দীন আইয়ুবীকে ইউরোপবাসীরা অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখে। সাথে সাথে তাদের এটাও দেখা উচিত যে, এই সব ব্যক্তি ইসলামের প্রতি কতই না অনুগত ছিলেন। তাঁদের যাবতীয় সৌন্দর্য এই একটি কথার মধ্যেই নিহিত ছিল যে, তাঁরা ছিলেন সত্যিকার মুসলমান এবং তাঁরা তাঁদের জীবনকে ইসলামী আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখতে সদাসচেষ্ট ছিলেন। একদিকে যেমন আমরা দেখি যে, হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) ছিলেন সবচেয়ে বড় শাহানশাহ্ এবং অন্যদিকে যখন আবার দেখি যে, তিনি তালিযুক্ত জামা গায়ে দিয়ে মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছেন তখন আমাদের বিস্ময়ের সীমা থাকে না। এর চাইতে উচ্চ পর্যায়ের দায়িত্বানুভূতি আর কি হতে পারে যে, হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের জীবন অত্যন্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ভেতর দিয়ে অতিবাহিত হয়েছিল। কিন্তু খলীফা হওয়ার পর আড়াই বছর সময়কালে তিনি এতটা শীর্ণকায় হয়ে গিয়েছিলেন যে, তাঁর দেহের হাড়গুলো একটি একটি করে গণনা করা যেত।

ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল মালিক

আবূ খালিদ ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান আপন ভাই সুলায়মান ইব্ন আবদুল মালিকের ওসীয়ত অনুযায়ী হযরত উমর ইব্ন আবদুল আযীযের পর খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হন। খলীফা হওয়ার পর তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্ তা'আলার যতটুকু মুখাপেক্ষী, ততটুকু হযরত উমর ইব্ন আবদুল আযীযও ছিলেন না। তিনি হযরত উমর ইব্ন আবদুল আযীযের পদাংক অনুসরণ করতে থাকেন। উমাইয়া বংশের লোকেরা যখন দেখল, উমর ইব্ন আবদুল আযীযের পরও তাদের স্বার্থোদ্ধারের কোন সুরাহা হচ্ছে না তখন তারা ইয়াযীদ ইব্ন আব্দুল মালিককে নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী চালাবার চেষ্টা শুরু করে। তাদের এ ধরনের সব চেষ্টাই উমর ইব্ন আবদুল আযীযের সামনে ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল মালিক তো উমর ইব্ন আবদুল আযীয ছিলেন না। তাই তিনি এদের ষড়যন্ত্রের কাছে নতি স্বীকার করেন। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, চল্লিশজন শুভ্রকেশী লোক ইয়াযীদের সামনে হাযির হয়ে সাক্ষ্য দেয় যে, যুগের খলীফা যা কিছু করবেন তার হিসাব তার থেকে নেওয়া হবে না এবং এজন্য তাকে কোন শাস্তিও দেওয়া হবে না। এরূপ কৌশল অবলম্বনে সন্তোষজনক ফল পাওয়া গেল এবং ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল মালিকের মূর্খতা তাকে ধীরে ধীরে প্রথম ইয়াযীদের মত পাপাচারের দিকে ঠেলে দিল, এমন কি তিনি মদ্যপানও করতে শুরু করলেন। তিনিই হচ্ছেন প্রথম খলীফা, যিনি প্রকাশ্যে মদ্যপান করতেন এবং গান-বাজনার মধ্যে নিজের মূল্যবান সময় কাটিয়ে দিতেন। এবার উমাইয়া বংশের লোকেরা সুবর্ণ সুযোগ পেলেন। তারা দরবারে খিলাফতের উপর নিজের আধিপত্য বিস্তার করে হযরত উমর ইব্ন আবদুল আযীযের যুগের যাবতীয় সংস্কারমূলক কাজকর্ম বন্ধ করে দিল। তারা পূর্বের ন্যায় অন্যায়ভাবে রাষ্ট্রীয় ধন-সম্পদ ও জায়গীরসমূহের উপর নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করল এবং এই অন্যায় আচরণ পূর্বের চাইতেও অধিক এগিয়ে গেল। উমর ইব্ন আবদুল আযীযের পর থেকে উমাইয়া খিলাফতের পতনের যুগ শুরু হয়েছে মনে করতে হবে। এই সময়েই বনূ আব্বাস এবং হাশিমীরা বনূ উমাইয়ার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ষড়যন্ত্র পাকাতে থাকে এবং তাতে কিছুটা সাফল্যও লাভ করে।

হাজ্জাজ ইব্ন ইউসূফ সাকাফীর ভাই মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ তার শাসন আমলে ইয়ামানবাসীদের উপর এক ধরনের নতুন কর ধার্য করেছিল। উমর ইব্ন আবদুল আযীয খলীফা হওয়ার পর ঐ কর রহিত করে তার পরিবর্তে 'উশর' (উৎপাদিত শস্যের এক-দশমাংশ) ধার্য করেন এবং বলেন, এই নতুন কর ধার্য করার চাইতে, ইয়ামান থেকে সামান্য পরিমাণ কর না আসাটা আমার কাছে অধিক পছন্দনীয়। কিন্তু ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল মালিক খলীফা হয়ে ইয়ামানবাসীদের কাছ থেকে পুনরায় ঐ কর আদায়ের নির্দেশ দেন। এক্ষেত্রে তিনি সেখানকার জনসাধারণের মতামতের কোন তোয়াক্কাই করেন নি। তার চাচা মুহাম্মদ

ইব্ন মারওয়ান, যিনি জাযীরা ও আযারবায়জানের গভর্নর ছিলেন, ঐ সময়েই মৃত্যুবরণ করেন। ইয়াযীদ তার জায়গায় অপর চাচা মাসলামাকে সেখানকার গভর্নর নিয়োগ করেন।

উপরে উল্লিখিত হয়েছে যে, উমর ইব্ন আবদুল আযীয জুরজানের কর আদায় না করার কারণে ইয়াযীদ ইব্ন মুহাল্লাবকে বন্দী করেছিলেন। তিনি তখন পর্যন্ত বন্দী অবস্থায়ই ছিলেন। যখন তিনি শুনতে পান যে, উমর ইব্ন আবদুল আযীযকে বনূ উমাইয়ার লোকেরা বিষপ্রয়োগ করেছে এবং তিনি হয়ত আর বাঁচবেন না, তখন তিনি (ইয়াযীদ ইব্ন মুহাল্লাব) কয়েদখানা থেকে পালিয়ে বসরায় চলে যান। ইয়াযীদ ইব্ন মুহাল্লাব এবং ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল মালিকের মধ্যে সুলায়মান ইব্ন আবদুল মালিকের যুগ থেকে মনোমালিন্য চলে আসছিল। যখন ইয়াযীদ ইব্ন মুহাল্লাব জানতে পারেন যে, উমর ইব্ন আবদুল আযীযের জীবন সংকটাপন্ন এবং তারপরে ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল মালিক খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হচ্ছেন তখন তিনি প্রহরীদেরকে বিরাট অংকের ঘুষ দিয়ে কয়েদখানা থেকে পালিয়ে যান, যাতে ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল মালিক তার উপর বাড়াবাড়ি করার কোন সুযোগ না পান। অবশ্য যাবার সময় তিনি একটি চিঠি লিখে তা উমর ইব্ন আবদুল আযীযের কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। তিনি তাতে লিখেছিলেন, যদি আমার এই বিশ্বাস থাকত যে, আপনি পুনরায় সেরে উঠবেন তাহলে আমি কখনো কয়েদখানা থেকে পালিয়ে যেতাম না। কিন্তু এই আশংকা করে আমি পালিয়ে যাচ্ছি যে, আপনার পর ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল মালিক আমাকে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করবেন। এই চিঠি যখন তাঁর কাছে পৌঁছে তখন তাঁর অন্তিম সময় ঘনিয়ে এসেছিল। তিনি চিঠি পড়ে বললেন, হে প্রভু! যদি ইয়াযীদ ইব্ন মুহাল্লাব মুসলমানদের সাথে দুর্ব্যবহার করার জন্য পালিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তুমি তাকে শাস্তি প্রদান কর। কেননা সে আমাকে ধোঁকা দিয়েছে। ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল মালিক খলীফা হয়ে বসরার প্রশাসক আদী ইব্ন আরতাতকে ইয়াযীদের পালিয়ে যাওয়ার সংবাদ দিতে গিয়ে লিখেন, তুমি তার পরিবার-পরিজনকে গ্রেফতার কর। তদনুযায়ী আদী মুহাল্লাবের দুই পুত্র মুফায্যল ও মারওয়ানকে বন্দী করেন। ইতিমধ্যে ইয়াযীদ ইব্ন মুহাল্লাব বসরায় গিয়ে পৌঁছেন। বসরাবাসীরা তার পক্ষ নেয়। ফলে আদী ইব্ন আরতাত বসরা থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। ইয়াযীদ ইব্ন মুহাল্লাব বসরা থেকে আহওয়ায পর্যন্ত নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন এবং একটি পৃথক রাষ্ট্র স্থাপন করে একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনীও গঠন করেন। তিনি ইরাকবাসীদেরকে এই বলে ইয়াযীদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলেন যে, তুর্কী ও রোমানদের চাইতে সিরীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা শ্রেষ্ঠতর। হাসান বসরী (র) তার বিরোধিতা করেন। কিন্তু জনসাধারণ এই ভয়ে হাসানকে চুপ থাকতে বাধ্য করে যে, একথা শুনতে পেলে হয়ত ইয়াযীদ ইব্ন মুহাল্লাব তাঁকে হত্যা করবেন। ইয়াযীদ নিজ বাহিনী নিয়ে কূফার দিকে রওয়ানা হন। সেখানে এক ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। উভয় পক্ষই বীরত্ব প্রদর্শন করে। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্রেই ইয়াযীদ ও তার ভাই হাবীব মারা যান। মাসলামা ইব্ন আবদুল মালিক জয়লাভ করেন। মুহাল্লাবের পরিবারের বাকি লোকেরা ইয়াযীদ ও হাবীবের বাহিনীর পরাজয় ও তাদের মৃত্যু সংবাদ শুনতে পেয়ে নৌকাযোগে বসরা থেকে পালিয়ে পূর্বদিকে চলে যায়। তাদের পশ্চাদ্ধাবনের জন্য একটি বাহিনী প্রেরণ করা হয়। কান্দাবীল

নামক স্থানে উভয়পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয় এবং তাতে শুধু আবূ উতবা ইব্ন মুহাল্লাব ও উছমান ইব্ন মুফায্যাল ইব্ন মুহাল্লাব ও দু'টি শিশু ছাড়া মুহাল্লাব পরিবারের সকলেই নিহত হন।

এই বিজয় লাভের পর ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল মালিক মাসলামাকে ইরাকের গভর্নর নিয়োগ করেন। কিছুদিন পর আমর ইব্ন হুরায়রাকে মাসলামার জায়গায় ইরাকের গভর্নর নিয়োগ করা হয়। সাগাদ ও সমরকন্দবাসীরা বিদ্রোহ করলে আমর ইব্ন হুরায়রা সাঈদ হারশীকে খুরাসানের শাসনকর্তা নিয়োগ করে তাকে নিজ বাহিনীসহ তথায় প্রেরণ করেন এবং সেখানে পৌঁছে সাগাদ ও সমরকন্দবাসীদেরকে যথোপযুক্ত শায়েস্তা করেন।

খাযার ও আর্মেনিয়ায় বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং সেখানকার অধিবাসীরা কিবচাকের সাহায্য নিয়ে মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালায় এবং সেখানকার ইসলামী বাহিনীর প্রায় অধিকাংশ সৈন্য হত্যা করে। যারা কোনমতে প্রাণে রক্ষা পায় তারা দামিশকে ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল মালিকের কাছে পালিয়ে আসে। ইয়াযীদ জার্রাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ হাকীমকে একটি বাহিনীসহ প্রেরণ করেন। জার্রাহ্ সেখানে পৌঁছেই যুদ্ধ শুরু করে দেন। এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর খাযারবাসীরা মুসলমানদের কাছে পরাজিত হয়। এরপর জার্রাহ্ অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখেন। শেষ পর্যন্ত সেখানকার বাদশাহ ও শাসকরা তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে এবং সমগ্র এলাকা মুসলমানদের অধিকারে চলে আসে।

আবদুর রহমান ইব্ন দাহ্হাক হযরত উমর ইব্ন আবদুল আযীযের যুগ থেকে হিজাযের গভর্নর নিয়োজিত ছিলেন। তিন বছর পর্যন্ত এই পদে দায়িত্ব পালনের পর তার মনে হযরত হুসাইনের নাতনীকে বিবাহ করার সাধ জাগে। এই উদ্দেশ্যে তিনি ফাতিমা বিন্ত হুসাইন অর্থাৎ কন্যার মায়ের কাছে পয়গাম পাঠান। কিন্তু কন্যার মা তাঁর অসম্মতি প্রকাশ করেন। তখন আবদুর রহমান ইব্ন দাহ্হাক তাঁকে এই বলে ধমক দেন যে, যদি তুমি সম্মত না হও তাহলে আমি তোমার ছেলের উপর মদ্যপানের অভিযোগ উত্থাপন করে তাকে বেত্রদণ্ড প্রদান করব। তখন ফাতিমা বিন্ত হুসাইন ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল মালিককে বিষয়টি লিখিতভাবে জানান। ইয়াযীদ এতে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং আবদুল ওয়াহিদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ কাসরীকে স্বহস্তে একটি পত্র লিখেন। তাতে তিনি বলেন, আমি তোমাকে মদীনার গভর্নর নিযুক্ত করলাম। এই পত্র পাঠমাত্র তুমি দাহ্হাকের কাছে যাও, তাকে পদচ্যুত কর এবং তার থেকে চল্লিশ হাজার দীনার জরিমানা আদায় কর। এরপর তাকে এমনভাবে নির্যাতন কর যে, তার আর্ত চীৎকার যেন আমি আমার এই শয্যা থেকে শুনতে পাই। দূত পত্রটি নিয়ে আবদুল ওয়াহিদকে দিল। তিনি মদীনার গভর্নরের দায়িত্ব গ্রহণ করে ইব্ন দাহ্হাককে নানাভাবে নির্যাতন করেন। জনসাধারণও তার প্রতি সন্তুষ্ট ছিল না। তাই তিনি পদচ্যুত হওয়ার পর তার সম্পর্কে অনেক ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করা হয়। আবদুল ওয়াহিদ মদীনার আনসারদের সাথে অত্যন্ত ভদ্র আচরণ করতেন। তাই সব লোকই তার প্রতি সন্তুষ্ট ছিল। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমরের দুই পুত্র কাসিম ও সালিম সব কাজেই তার উপদেষ্টা ছিলেন। হিজরী ১০৪ সনের শাওয়াল (৭২৩ খ্রি এপ্রিল) মাসে ইব্ন দাহ্হাক পদচ্যুত হন এবং তার স্থলে আবদুল ওয়াহিদ নিযুক্তি লাভ করেন।

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সাঈদ হুরায়শী ছিলেন খুরাসানের গভর্নর। কিছুদিন পর ইব্‌ন হুরায়রা হুরায়শীকে পদচ্যুত করে তার স্থলে মুসলিম ইব্‌ন সাঈদ কিলাবীকে খুরাসানের গভর্নর নিয়োগ করেন। ইব্‌ন হুরায়রা ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল মালিকের খিলাফতের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ইরাকের গভর্নর ছিলেন।

ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল মালিক নিজের পরবর্তী খলীফা হিসাবে হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিককে এবং হিশামের পরবর্তী খলীফা হিসাবে নিজ পুত্র ওয়ালীদ ইব্‌ন ইয়াযীদকে মনোনীত করেছিলেন। চার বছর এক মাস রাজত্ব করার পর হিজরী ১০৫ সনের ২৫শে শাবান (৭২৪ খ্রি-এর জানুয়ারী) ৩৮ বছর বয়সে বালকা নামক স্থানে তিনি ইনতিকাল করেন। এরপর তাঁর ওসীয়ত অনুযায়ী হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিক খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হন।

হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিক

আবুল ওয়ালীদ হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিক হিজরী ৭২ সনে (৬৯১-৯২ খ্রি) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মাতার নাম ছিল আইশা বিন্‌ত হিশাম ইব্‌ন ইসমাঈল মাখযূমী। ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল মালিকের মৃত্যুর সময় হিশাম হিম্‌সে অবস্থান করছিলেন। একজন দূত ইয়াযীদের মৃত্যু সংবাদ, তাঁর লাঠি এবং অঙ্গুরী নিয়ে সেখানেই তাঁর কাছে হাযির হয়। হিশাম হিম্‌স থেকে দামিশ্‌কে চলে আসেন এবং জনসাধারণের কাছ থেকে নিজ খিলাফতের বায়আত নেন।

হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিক খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর ইব্‌ন হুরায়রাকে পদচ্যুত করে তার স্থলে খালিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ কাসরীকে ইরাকের গভর্নর পদে নিয়োগ করেন। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুসলিম ইব্‌ন সাঈদ খুরাসানের হাকিম নিযুক্ত হয়েছিলেন। মুসলিম একটি বাহিনী নিয়ে তুর্কীদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করেন এবং হিজরী ১০৫ সনের (৭২৪ খ্রি) শেষভাগ পর্যন্ত যুদ্ধ করে বেশির ভাগ তুর্কী সরদারকে পরাজিত করেন এবং তাদের কাছ থেকে খারাজ ও জিয্‌য়া আদায় করেন।

খুরাসানের ঘটনাবলী

হিজরী ১০৬ সনে (৭২৪-২৫ খ্রি) মুসলিম ইব্‌ন সাঈদ জিহাদের উদ্দেশ্যে একটি বিরাট বাহিনী সংগ্রহ করেন। তিনি বুখারা ও ফারগানার দিকে যান এবং সেখানকার বিদ্রোহীদেরকে দমন করেন। চীনের খাকান (বাদশাহ) ফারগানাবাসীদেরকে সাহায্য করেছিলেন। তাই তার সাথে মুসলমানদের বেশ কয়েকটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। শেষ পর্যন্ত খাকান পরাজিত হন এবং তুর্কীদের অনেক বড় বড় সরদার মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। এই বছরই খলীফা হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিক খালিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌কে লিখেন ঃ তুমি মুসলিম ইব্‌ন সাঈদকে পদচ্যুত করে তার স্থলে তোমার ভাই আসাদকে খুরাসানের গভর্নর নিয়োগ কর। নির্দেশ অনুযায়ী তিনি আপন ভাই আসাদকে নিয়োগ করে খুরাসানে পাঠান। মুসলিম ইব্‌ন সাঈদ সন্তুষ্টচিত্তে খুরাসানের শাসনভার তার হাতে অর্পণ করেন। খালিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ যখন আসাদকে খুরাসানে পাঠান তখন আবদুর রহমান ইব্‌ন নাঈমকে তার সহকারী নিয়োগ করেন।

আসাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ খুরাসানের শাসনভার গ্রহণ করেই হিরাত পর্বতমালা অর্থাৎ ঘূর প্রভৃতি অঞ্চলের উপর হামলা পরিচালনা করেন। সেখান থেকে মুসলমানরা প্রচুর পরিমাণ মালে গনীমত লাভ করে। ঐ সমস্ত যুদ্ধে নাস্‌র ইব্ন সাইয়ার এবং মুসলিম ইব্ন আহ্ওয়ায অত্যন্ত সুনাম অর্জন করেন। কিন্তু আসাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ কয়েক দিনের মধ্যেই জনসাধারণের সাথে এমন আচরণ শুরু করেন যে, তারা তার সম্পর্কে ভীতিগ্রস্ত হয়ে ওঠে। তিনি নাস্‌র ইব্ন সাইয়ারকে একশ বেত্রাঘাত করেন, আবদুর রহীম ইব্ন নাঈমের মাথা ন্যাড়া করে দেন এবং তাদের উভয়কে আপন ভাই খালিদের কাছে এই বলে পাঠিয়ে দেন যে, এরা তাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে শরীক ছিল।

তিনি খুরাসানবাসীদেরকেও অকথ্য গালিগালাজ করতেন এবং তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করতেন। হিশাম ইব্ন আবদুল মালিক তা জানতে পেরে দামিশ্‌ক থেকে খালিদ ইব্ন আবদুল্লাহ্‌কে লিখেন ঃ আসাদকে খুরাসানের শাসনকর্তার পদ থেকে অপসারণ কর। এরপর তিনি সরাসরি নিজে থেকে আশরাস ইব্ন আবদুল্লাহ্ সালামীকে খুরাসানের গভর্নর নিয়োগ করে পাঠান এবং খালিদকে এ সম্পর্কে অবহিত করেন। আশরাস খুরাসানে পৌঁছে নিজের মার্জিত ব্যবহার এবং পুণ্য আচরণ দ্বারা সকলকে আপন করে নেন। আশরাস হিজরী ১১০ সনে (৭২৮-২৯ খ্রি) আবূ সায়দা, সালিহ্ ইব্ন যারীফ এবং রাবী ইব্ন ইমরান তামীমীকে সমরকন্দ ও মাওরাউন নাহ্‌রের দিকে প্রেরণ করেন, যাতে তারা সেখানে গিয়ে জনসাধারণের সামনে ইসলামের সৌন্দর্য ও শিরকের কদর্যতা তুলে ধরে তাদেরকে সিরাতুল মুসতাকীম তথা সরল পথে নিয়ে আসেন। ঐ সমস্ত এলাকায় প্রায়ই বিদ্রোহ দেখা দিত। তাই বলতে গেলে, তরবারির জোরেই সেখানে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই প্রেক্ষিতে আশরাস সেখানকার জনসাধারণের সামনে ইসলামের সৌন্দর্য যথাযথভাবে পেশ করে তাদেরকে ইসলামে দীক্ষিত করার পরিকল্পনা নেন। আর এরূপ করা হলে তাদের মধ্যে যে দোষত্রুটি রয়েছে তা আপনা-আপনি দূর হয়ে যাবে। এরপর ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য আশংকার আর কোন কারণ থাকবে না। যাহোক অনুরূপভাবে ইসলামের দাওয়াত পেশ করার ফলে দলে দলে লোক ইসলাম গ্রহণ করতে লাগল। তখন সমরকন্দ এলাকার বায়তুলমাল বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অফিসার ছিলেন হাসান ইব্ন উমর তাহা আল-কিনদী।

লোকেরা ব্যাপক হারে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকলে স্বাভাবিকভাবেই জিয্‌য়ার আমদানী (যা যিম্মীদের কাছ থেকে গ্রহণ করা হতো) হ্রাস পায়। যিম্মীরা মুসলমান হওয়ার কারণেই যে এই আমদানী হ্রাস পাচ্ছে সে কথা হাসান ইব্ন উমর খুরাসানের গভর্নর আশরাসকে কিছুটা অভিযোগের সুরে লিখে জানান। তিনি উত্তর দেন, হয়ত অনেক লোক শুধু জিয্‌য়ার কারণে মুসলমান হয়েছে এবং আর ইসলাম গ্রহণ করেনি। অতএব তোমরা লক্ষ্য করে দেখ, যে ব্যক্তি নিজের খাতনা করিয়েছে এবং নামাযও পড়ে তার জিয্‌য়া মাফ করে দাও। এছাড়া অন্য কেউ মুসলমান দাবি করলেও তার কাছ থেকে নিয়মিত জিয্‌য়া আদায় কর। আশরাস যদিও এটা পছন্দ করতেন না, কিন্তু খালিদ ও হিশামের ইচ্ছা ছিল নওমুসলিমদের কাছ থেকে কড়াকড়ি হিসাব নেওয়া এবং তাদের সাথে কঠোর ব্যবহার করা। আশরাসের জবাব পেয়ে হাসান ইব্ন

উমর ঐ হুকুম কার্যকরী করার ক্ষেত্রে ইতস্তত করতে থাকেন। কেননা এটা ইসলামী শরীয়তসম্মত ছিল না। তাই তিনি হাসান ইব্‌ন উমরকে বায়তুলমাল বিভাগ থেকে অপসারণ করে তার স্থলে হানী ইব্‌ন হানীকে নিয়োগ করেন। অবশ্য হাসানকে তিনি সমরকন্দের প্রশাসনিক ও সামরিক বিভাগে বহাল রাখেন। হানী তার পদে যোগদান করেই নওমুসলিমদের কাছ থেকে জিয্‌য়া আদায় শুরু করেন। আবূ সায়দা নওমুসলিমদেরকে জিয্‌য়া দিতে এবং হানীকে জিয্‌য়া আদায় করতে নিষেধ করে দেন। এবার হানী আশরাসের কাছে লিখেন, এই সব লোক ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং ইতিমধ্যে অনেক মসজিদও নির্মাণ করে ফেলেছে। অতএব তাদের কাছ থেকে কি করে জিয্‌য়া আদায় করা যেতে পারে? এর উত্তরে হানীর কাছে নির্দেশ আসে, তুমি যাদের কাছ থেকে জিয্‌য়া আদায় করতে তাদের কাছ থেকে তা আদায় অব্যাহত রাখ, চাই তারা ইসলাম গ্রহণ করুক বা না করুক।

এই অবস্থা দেখে আবূ সায়দা নয় হাজার নওমুসলিমের একটি বাহিনী নিয়ে সমরকন্দ থেকে কয়েক ফারসাং দূরে অবস্থান নেন এবং মুকাবিলার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকেন। যেহেতু আবূ সায়দার বিরোধিতার যুক্তিসংগত কারণ ছিল, তাই অনেক নেতৃস্থানীয় মুসলমান সমরকন্দের শাসনকর্তার বাহিনী থেকে বের হয়ে নওমুসলিমদের পক্ষে যোগ দেন। আশরাস এই অবস্থা লক্ষ্য করে হাসান ইব্‌ন উমরকে পদচ্যুত করে তার স্থলে মাহ্‌শার ইব্‌ন মুযাহিম সুলামীকে নিয়োগ করেন। মাহ্‌শার সমরকন্দে পৌঁছে সন্ধি স্থাপনের বাহানায় আবূ সায়দা ও তার নেতৃস্থানীয় সঙ্গীদেরকে প্রতারণার মাধ্যমে বন্দী করে আশরাসের কাছে পাঠিয়ে দেন। তখন নওমুসলিমরা আবূ ফাতিমাকে তাদের নেতা মনোনীত করে। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে এই সমস্ত নওমুসলিমকে জিয্‌য়া থেকে অব্যাহতি দানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। এরপর তাদের মধ্যকার ঐক্য বিনষ্ট হতে থাকলে ধীরে ধীরে তাদের উপর পুনরায় বাড়াবাড়ি শুরু হয় এবং তারা নানাভাবে লাঞ্ছিত হতে থাকে। ফলে যারা ইতোমধ্যে মুসলমান হয়েছিল তারা মুরতাদ হয়ে পুনরায় মুসলমানদের মুকাবিলায় উদ্যত হয়। এজন্য তারা খাকানের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। খাকান একটি দুর্ধর্ষ বাহিনী নিয়ে তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন এবং মুসলমানদের সাথে পুনরায় এক দীর্ঘকালীন যুদ্ধের সূচনা হয়। আশরাস স্বয়ং মুকাবিলা করতে যান। যুদ্ধে উভয় পক্ষই অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করে এবং অনেক মুসলমান ও তুর্কী নিহত হয়। শেষ পর্যন্ত সন্ধি স্থাপনের মধ্য দিয়ে এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে।

যারা বলে থাকেন, ইসলাম তরবারির জোরে বিস্তার লাভ করেছে, তাদের জন্য এই ঘটনার মধ্যে চিন্তাভাবনার যথেষ্ট উপাদান রয়েছে। প্রকৃত পক্ষে তরবারির জোরে ইসলামের প্রসার লাভ ঘটেনি। বরং এমন ঘটনাও ঘটেছে যে, কোন কোন মুসলিম প্রশাসক তরবারির জোরে ইসলাম প্রসারের পথ রুদ্ধ করারও চেষ্টা করেছেন।

হিজরী ১১১ সনে (৭২৯-৩০ খ্রি) হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিক আশরাস ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌কে তুর্কী ও সমরকন্দীদের সাথে যুদ্ধরত থাকা অবস্থায় পদচ্যুত করে তার স্থলে জুনায়দ ইব্‌ন আবদুর রহমান মুরয়ীকে খুরাসানের গভর্নর নিয়োগ করেন। জুনায়দ খুরাসানের রাজধানী মার্ভে পৌঁছে সেখানে আশরাসের পরিবর্তে তার সহকারী খাত্তাব ইব্‌ন মুহরিয

সালামীকে পান। তিনি সেখানে একদিন অবস্থান করে মাওরাউন নাহরের দিকে রওয়ানা হন। তিনি নিজের পক্ষ থেকে মাহ্শার ইব্ন মুযাহিম সালামীকে মার্ভে রেখে যান এবং খাত্তাবকে সঙ্গে নিয়ে রওয়ানা হন। সেখানে পৌঁছে তিনি আশরাসের সাথে সাথে খাকান ও বুখারাবাসীদের উপরও জয়লাভ করে হিজরী ১১১ সনের (৭২৯-৩০ খ্রি) দিকে মার্ভে ফিরে আসেন এবং কাত্তান ইব্ন কুতায়বা ইব্ন মুসলিমকে বুখারার ওয়ালীদ ইব্ন কা'কা' আবসীকে হিরাতের এবং মুসলিম ইব্ন আবদুর রহমান বাহিলীকে বল্খের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। কিন্তু কিছু দিন পরই মুসলিম ইব্ন আবদুর রহমানকে পদচ্যুত করে তার স্থলে ইয়াহ্ইয়া ইব্ন যাবীআকে বল্খের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন।

জুনায়দ হিজরী ১১২ সনে (৭৩০-৩১ খ্রি) তুখারিস্তানের বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করার জন্য আঠার হাজার সৈন্যের একটি বাহিনীসহ এক দিকে উমারা ইব্ন মারয়ামকে এবং দশ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনীসহ অপর দিকে ইবরাহীম ইব্ন বাস্সামকে প্রেরণ করেন। তিনি নিজেও সেদিকে রওয়ানা হওয়ার প্রস্তুতি নেন। তুর্কীরা এই সংবাদ পেয়ে খাকানকে নিজেদের সেনাপতি মনোনীত করে একটি বিরাট বাহিনীসহ সমরকন্দের উপর চড়াও হয়। ঐ সময়ে সূরাহ্ ইব্নুল জাবার ছিলেন সমরকন্দের শাসনকর্তা। তিনি জুনায়দের কাছে লিখেন, খাকান একটি বিরাট বাহিনী নিয়ে সমরকন্দ আক্রমণ করেছে। আপনি আমার সাহায্যার্থে অবিলম্বে সৈন্য পাঠান। মাহ্শার ইব্ন মুযাহিম এবং অন্যরা জুনায়দকে পরামর্শ দেন, কমপক্ষে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নিয়ে আপনার সমরকন্দের দিকে যাওয়া উচিত। কেননা তুর্কীদের মুকাবিলা করা সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু আজকাল সমগ্র বাহিনী চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে এবং আপনার কাছে খুব কম সৈন্যই রয়েছে। এমতাবস্থায় সমরকন্দের দিকে রওয়ানা হওয়া আপনার জন্য যুক্তিসংগত নয়। জুনায়দ বলেন, এটা কি করে সম্ভব যে, আমার ভাই সূরাহ্ ইব্নুল জাবার সেখানে বিপন্ন অবস্থায় থাকবে, আর আমি এখানে পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের বাহিনী সংগৃহীত হওয়ার অপেক্ষায় বসে থাকব? এই বলে তিনি সমরকন্দের দিকে রওয়ানা হন। খাকান এবং তুর্কীদের কাছে যখন এই সংবাদ পৌঁছে যে, স্বয়ং জুনায়দ সমরকন্দের দিকে আসছেন তখন তারা অল্প সংখ্যক সৈন্য সমরকন্দ অবরোধে রেখে বাকি সৈন্য নিয়ে জুনায়দকে প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। পথিমধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। সংখ্যায় অল্প হলেও সেই যুদ্ধে জুনায়দ ও তার সঙ্গীরা যে অপরিসীম বীরত্ব ও অসমসাহসিকতার পরিচয় দেন তাতে তুর্কীদের মধ্যে ভয়ানক ত্রাসের সৃষ্টি হয়। মুসলমানদের মধ্য থেকেও অনেক নামকরা বীরসেনা নিহত হন। আর তুর্কীদের ওখানে তো লাশের স্তূপ জমে যায়। তুর্কী ও খাকান বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল অনেক। জুনায়দ একটি পাহাড়কে পিছনে রেখে যুদ্ধ করতে থাকেন। তিনি খাকান ও তার বাহিনীকে বেশ কয়েকবারই পশ্চাদপসরণে বাধ্য করেন এবং তুর্কী বাহিনীকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তাড়িয়ে দেন। শেষ পর্যন্ত তিনি তার অধিনায়কদের পরামর্শ অনুযায়ী সূরাহ্ ইব্ন জাবারের কাছে সমরকন্দে এই মর্মে বার্তা পাঠান ঃ আমরা তোমাদের থেকে শুধু দু'মনযিল দূরত্বে যুদ্ধরত অবস্থায় আছি। তোমরা সাহস করে সমরকন্দ থেকে বেরিয়ে পড়, নদীর তীর ধরে আমাদের দিকে এগিয়ে এস এবং উল্টা দিক দিয়ে তুর্কীদের উপর হামলা কর। সূরাহ্

সমরকন্দ থেকে রওয়ানা হন। কিন্তু যে রাস্তা ধরে তাকে এগিয়ে আসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তিনি তাঁর পরিবর্তে অন্য রাস্তা ধরে আসেন। ফলে নিকটে পৌঁছেও তিনি তুর্কী বাহিনীর ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে যান। ফলে তার বাহিনীর অনেক সৈন্য নিহত হয় এবং তিনি জুনায়দকে কোন সাহায্যই করতে পারেন নি। শেষ পর্যন্ত মুসলিম মুজাহিদরা প্রাণবাজি রেখে এমন ভয়ানক আক্রমণ চালায় যে, খাকান ও তুর্কীরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয় এবং মুসলমানরা সমরকন্দে প্রবেশ করে।

জুনায়দ সেখান থেকে এক দ্রুতগামী দূত মারফত খলীফা হিশামকে যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করেন। হিশাম কূফা ও বসরা থেকে দশ দশ হাজার সৈন্য পাঠাবার জন্য সংশ্লিষ্ট গভর্নরদের নির্দেশ দেন এবং জুনায়দকে লিখেন, তুমি যুদ্ধ করে যাও, আমি তোমার সাহায্যার্থে কূফা ও বসরা থেকে শীঘ্রই বিশ হাজার সৈন্য, ত্রিশ হাজার বর্শা এবং ত্রিশ হাজার তরবারি পাঠাচ্ছি। খলীফার এই পয়গাম জুনায়দের কাছে সমরকন্দে গিয়ে পৌঁছে। তিনি সেখানেই অবস্থান করতে থাকেন। কিন্তু কিছু দিন পর সংবাদ পান যে, খাকান এখান থেকে পালিয়ে গিয়ে পুনরায় তার সেনাবাহিনী সংগঠিত করেছে এবং বুখারা আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। বুখারার শাসনকর্তা ছিলেন কাতান ইব্ন কুতায়বা। জুনায়দ আশংকা করেন যে, হয়ত কাতানও বুখারায় সেই অবস্থার সম্মুখীন হবেন, যে অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলেন সূরাহ্ সমরকন্দে। তিনি উসমান ইব্ন আবদুল্লাহ্কে চারশ অশ্বারোহী সৈন্যসহ সমরকন্দে মোতায়েন করেন এবং তাদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ রসদের ব্যবস্থা করে দিয়ে স্বয়ং মহিলা, শিশু এবং প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও রসদ সামগ্রীসহ সমরকন্দ থেকে বুখারা অভিমুখে রওয়ানা হন। হিজরী ১১২ সনে (৭৩০ খ্রি) তাওয়াবীসের নিকটবর্তী মীনীয়া নামক স্থানে খাকানের সাথে তাঁর মুকাবিলা হয় এবং তাতে খাকান পরাজিত হন। এবার জুনায়দ সম্মুখের রাস্তা একেবারে পরিষ্কার পেয়ে বুখারার দিকে অগ্রসর হন। পথিমধ্যে তুর্কীরা আর একবার তার সাথে মুকাবিলা করে। তাতেও মুসলমানরা জয়ী হয়। এরপর জুনায়দ বুখারায় প্রবেশ করেন। সেখানে কূফা ও বুখারার সেনাবাহিনীও তাঁর সাথে এসে মিলিত হয়।

জুনায়দ তুর্কীদেরকে বার বার পরাজিত ও পর্যুদস্ত করে খুরাসানে সর্বত্র শান্তি-শৃংখলা কায়েম করেন। তিনি খুরাসানের দিক থেকে স্বস্তি লাভ করে হিজরী ১১৬ সনে (৭৩৪ খ্রি.) ফাদিলা বিন্ত ইয়াযীদ ইব্ন মুহাল্লাবকে বিয়ে করেন। হিশাম ইব্ন আবদুল মালিক মুহাল্লাব-পরিবারের প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন ছিলেন। তাই তিনি উপরোক্ত বিবাহের সংবাদ পেয়ে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং জুনায়দকে পদচ্যুত করে তার স্থলে আসিম ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াযীদ হিলালীকে খুরাসানের গভর্নর নিয়োগ করেন। কিন্তু আসিম যেদিন তার দায়িত্ব গ্রহণের জন্য খুরাসানের রাজধানী মার্ভে পৌঁছেন ঠিক সেদিনই জুনায়দ ইনতিকাল করেন। তাই আসিম জীবিত জুনায়দের সাক্ষাত পান নি। তিনি খুরাসানে পৌঁছে জুনায়দের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে পদচ্যুত করে তাদের স্থলে নিজের পছন্দমত লোক নিয়োগ করেন।

হার্স ইব্ন শুরায়হ্

হিজরী ১০০ সনে (৭১৮-১৯ খ্রি.) যখন উমর ইব্ন আব্দুল আযীয (র) খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত, ঠিক তখন থেকেই বনু আব্বাস নিজেদের খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য গোপনে গোপনে প্রচেষ্টা চালাতে থাকে এবং এ উদ্দেশ্যে নানা ধরনের ষড়যন্ত্র আঁটতে থাকে। অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা ও সতর্কতার সাথে এই কর্মতৎপরতা অব্যাহত রাখা হয়। এ উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কিছু সংখ্যক হাদীস বিশেষভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়। নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বনূ আব্বাসের লোকেরা কিছু সংখ্যক জাল হাদীস নিজে থেকেও গড়ে নেয়। কোন কোন হাদীসের মধ্যে তারা কিছু বাড়তি কথাও জুড়ে দেয়। এসব কিছুর উদ্দেশ্য হলো, জনসাধারণকে এই মর্মে পরিপূর্ণ নিশ্চয়তা প্রদান করা যে, খিলাফতে ইসলামিয়া একদিন অবশ্যই বনূ আব্বাসের হাতে আসবে এবং শ্রীঘই আসবে। ইতিমধ্যে বনূ হাশিমের খিলাফতের অধিকারী হওয়া এবং বনূ উমাইয়ার অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলের ব্যাপারটি বিভিন্ন বিপ্লবী দল কর্তৃক একটি মারাত্মক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। বনূ আব্বাসও সেটাকে অত্যন্ত নৈপুণ্যের সাথে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করছিল এবং তা দ্বারা বহুলভাবে উপকৃতও হচ্ছিল। বিশেষভাবে দক্ষ ও লোভ-লালসাহীন কিছু লোক সব সময়ই একাজে নিয়োজিত থাকত। কিন্তু বনূ উমাইয়ারা তাদের শাসনামলে এ ব্যাপারটিকে মোটেই গুরুত্ব দেয়নি। তাই তারা এটা প্রতিরোধের ব্যাপারে কোন চিন্তা-ভাবনাও করেনি। সত্যিকথা বলতে গেলে, তারা এ ধরনের গোপন ষড়যন্ত্রের গ্রন্থি উন্মোচনের পিছনে লেগে থাকাটা আদৌ পছন্দই করত না।

আব্বাসীদের সাথে সাথে ফাতিমী এবং আলাবীরাও এ ধরনের চেষ্টা ও ষড়যন্ত্র প্রথম থেকেই যথারীতি অব্যাহত রেখেছিল এবং খুরাসানই ছিল তাদের এই যাবতীয় তৎপরতার ক্ষেত্র। কেননা সেখানকার পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা ছিল এ জাতীয় তৎপরতার জন্য অধিকতর অনুকূল। খুরাসানে বিখ্যাত আয্দ গোত্রের নেতা হার্স ইব্ন শুরায়হ ছিলেন আলাবী ও ফাতিমীদের বিশেষ ভক্ত। তিনি হিজরী ১১৬ সনে (৭৩৪ খ্রি.) কৃষ্ণবস্ত্র পরিধান করেন এবং জনসাধারণকে কিতাব ও সুন্নাহ্র অনুসরণ এবং ইমাম রিদার হাতে বায়আত হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি ফিরইয়াবে পৌছে এ কাজ শুরু করেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রায় চার হাজার উৎসর্গকারী মুজাহিদ তার কাছে এসে ভিড় জমায়। তিনি তাদেরকে নিয়ে বল্খ অভিমুখে রওয়ানা হন। তখন নাস্র ইব্ন সাইয়ার ছিলেন বলখের শাসনকর্তা। তিনি দশ হাজার সৈন্য নিয়ে হারসের মুকাবিলা করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরাজিত হন। হার্স ইব্ন শুরায়হ্ বলখের উপর আপন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে সুলায়মান ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাযিমকে সেখানকার শাসক নিয়োগ করেন এবং স্বয়ং জুরজানের দিকে অগ্রসর হন। তিনি অতি সহজেই জুরজানের উপর নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখান থেকে মার্ভের দিকে রওয়ানা হন। মার্ভের শাসনকর্তা আসিম ইব্ন আব্দুল্লাহ্ জনসাধারণকে হার্স ইব্ন মুরায়হের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার চেষ্টা করেন, কিন্তু জনসাধারণের কাছ থেকে আশানুরূপ সাড়া পাননি। এর কারণ, হারস পূর্ব থেকেই সেখানকার জনসাধারণের সাথে পত্র যোগাযোগ শুরু করে দিয়েছিলেন।

হার্‌স ইব্‌ন শুরায়হের সৈন্য সংখ্যা ষাট হাজারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। আয্‌দ ও তামীম গোত্রের অনেক নামকরা সরদার এবং ফিরইয়াব ও তালিকানের জমিদাররাও তার বাহিনীতে যোগদান করেছিল। অপর দিকে আসিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ও হারসের মুকাবিলার জন্য যথাসাধ্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। হার্‌স ইব্‌ন শুরায়হ্ অত্যন্ত দুঃসাহসিকতার সাথে মার্ভের উপর আক্রমণ চালান। কিন্তু ঠিক মুকাবিলার মুহূর্তে আয্‌দ ও তামীম গোত্রের চার হাজার যোদ্ধা তার বাহিনী ত্যাগ করে এবং আসিমের সাথে যোগ দেয়। ফলে হার্‌স ইব্‌ন শুরায়হের সঙ্গীদের সাহস ও উদ্দীপনা কিছুটা ম্লান হয়ে পড়ে। এতদসত্ত্বেও ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। শেষ পর্যন্ত হার্‌স পরাজিত হয়ে পশ্চাদপসরণ করেন। তবে আসিম তার পশ্চাদ্ধাবন করেন নি। এবার আসিম 'মানাযিলে রুহ্‌বান'-এর নিকটে পৌঁছে সেখানেই তাঁবু স্থাপন করেন। তার কাছে তিন হাজার অশ্বারোহী এসে সমবেত হয়। এরপর হার্‌স ইব্‌ন শুরায়হও নিজের অবস্থা পুনর্গঠিত করে তুলেন। তিনি তার দখলীকৃত খুরাসানের দ্রুত উন্নতি বিধান করতে থাকেন।

খুরাসানের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিক আসিমের কাছে তার কৈফিয়ত তলব করেন। আসিম উত্তরে লিখেন, খুরাসান যেহেতু সরাসরি দামিশক তথা কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত, তাই সেখান থেকে কেন্দ্রে খবর পাঠাতে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সাহায্য পেতে কিছুটা বিলম্ব হয়। এমতাবস্থায় খুরাসান প্রদেশের প্রশাসনের দায়িত্ব পূর্বের ন্যায় ইরাক প্রদেশের হাতেই ন্যস্ত করা বাঞ্ছনীয়। এতে বসরা ও কূফা থেকে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই খুরাসানে সাহায্য এসে পৌঁছবে। হিশাম তাঁর এই পরামর্শ গ্রহণ করেন, তবে তাকে খুরাসানের গভর্নরের পদ থেকে অপসারণ করেন। এরপর তিনি ইরাকের গভর্নর খালিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ কাসরীকে লিখেন, তুমি তোমার ভাই আসাদকে পুনরায় খুরাসানের শাসনকর্তা নিয়োগ করে অবিলম্বে সেখানে পাঠিয়ে দাও।

আসিম তার এই পদচ্যুতির সংবাদ পেয়ে হার্‌স ইব্‌ন শুরায়হের সাথে এই মর্মে সন্ধি করেন ঃ চলো, আমরা উভয়ে হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিকের কাছে একটি তাবলিগী পত্র লিখি এবং তাঁকে কিতাব ও সুন্নাহ্‌র উপর আমল করার আহ্বান জানাই। যদি তিনি অস্বীকার করেন তাহলে আমরা সম্মিলিতভাবে তাঁর বিরোধিতায় আত্মনিয়োগ করব। কিন্তু তাদের এই সন্ধি বেশি দিন টিকেনি। কোন একটি ব্যাপারে দ্বিমত দেখা দেওয়ায় তাদের মধ্যে মনোমালিন্য, এমনকি সংঘর্ষ দেখা দেয়।

ঐ সংঘর্ষে হার্‌স পরাজিত হন এবং আসিম তার অধিকাংশ সঙ্গীকে বন্দী করে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেন। আসিম তার এই বিজয়কে খলীফা হিশামের মন-জয়ের একটি মাধ্যমে পরিণত করতে চান। কিন্তু ততক্ষণে আসাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ গভর্নরের সনদ নিয়ে খুরাসানের নিকটে এসে পৌঁছেছেন। তিনি সেখানে পৌঁছেই আসিমকে বন্দী করেন। এটা হচ্ছে হিজরী ১১৭ সনের (৭৩৫ খ্রি.) ঘটনা। আসাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ খুরাসানের শাসনকর্তৃত্ব গ্রহণ করার সাথে সাথে হার্‌স ইব্‌ন শুরায়হ্ এবং তুর্কীদের বিরুদ্ধে অবিরত যুদ্ধ করতে থাকেন। তখন হারসের অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তিনি তার গুটি কয়েক বন্ধুবান্ধব নিয়ে এখানে সেখানে আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। হিজরী ১১৯ সনে (৭৩৭ খ্রি.)

খাকান ও বদ্‌র তুরখান ইসলামী বাহিনীর হাতে নিহত হন। ঐ সময়ে আবদুল্লাহ্‌র বিজয় অভিযান তুর্কিস্তান ছাড়িয়ে পশ্চিম চীন পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।

হিজরী ১২০ সনের রবিউল আউয়াল (৭৩৮ খ্রি-এর মার্চ) মাসে আসাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ কাসরী বলখে ইনতিকাল করেন। মৃত্যুকালে তিনি জা'ফর ইব্ন হানযালা নাহ্‌রাওয়ানীকে তার স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করেন। জা'ফর মোট চার মাস শাসন কর্তৃত্বে ছিলেন। এরপর রজব মাসে নাসর ইব্ন সাইয়ার খুরাসানের গভর্নর নিযুক্ত হন। ঐ বছর অর্থাৎ হিজরী ১২০ সনে (৭৩৮ খ্রি.) ইরাকের গভর্নর খালিদ ইব্ন আবদুল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে তার বিরুদ্ধবাদীরা খলীফা হিশামের দরবারে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন করে। খলীফা তখন খালিদকে পদচ্যুত করে ইউসুফ ইব্ন উমর সাকাফীকে ইরাকের গভর্নর নিয়োগ করেন। ইউসুফ একদিকে যেমন ছিলেন দুনিয়া বিমুখ দীনদার, অন্যদিকে তেমনি ছিলেন রক্তপিপাসু আহাম্মক।

নাস্‌র ইব্ন সাইয়ার খুরাসানের শাসন কর্তৃত্ব গ্রহণ করার পর নওমুসলিমদের কাছ থেকে জিয্‌য়া আদায়ের প্রথাটি কিভাবে বিলোপ করা যায় সে ব্যাপারে সর্বপ্রথম চেষ্টা করেন এবং তিনি তাতে সফলও হন। তিনি অবিলম্বে নওমুসলিমদের কাছ থেকে জিয্‌য়া আদায় বন্ধ করে দেন। ফলে তুর্কীরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে।

খাযার ও আর্মেনিয়া

হিশাম ইব্ন আবদুল মালিক জার্‌রাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ হাকামীকে আর্মেনিয়ার গভর্নর নিয়োগ করেছিলেন। জার্‌রাহ্ হাকামী হিজরী ১১১ সনে (৭২৯-৩০ খ্রি.) তিফলীসের দিকে অগ্রসর হয়ে তুর্কিস্তানে প্রবেশ করেন এবং সেখানকার বিখ্যাত শহর বায়দা জয় করে বিজয়ী বেশে ফিরে আসেন। হিজরী ১১২ সনে (৭৩০ খ্রি.) তুর্কীরা তাদের সৈনাবাহিনী পুনর্গঠন করে ঐক্যবদ্ধভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত শহরগুলোতে আক্রমণ চালায়। জার্‌রাহ্ তাদের মুকাবিলার জন্য বের হন। উভয় বাহিনীর মধ্যে মারজে আরদাবীল নামক স্থানে সংঘর্ষ হয়। মুসলমানরা সংখ্যায় ছিল খুবই কম। জার্‌রাহ্ যুদ্ধ করতে করতে শাহাদাতবরণ করেন। তাঁর শাহাদাতের কারণে তুর্কমেনীয় এবং তুর্কীদের সাহস অনেকটা বেড়ে যায় এবং তারা অগ্রসর হতে হতে মাওসিলের নিকটে এসে পৌঁছে।

এই সংবাদ রাজধানী দামিশকে পৌঁছলে খলীফা হিশাম সাঈদ হুরায়শীকে ডেকে বলেন, দেখ জার্‌রাহ তুর্কীদের কাছে পরাজিত হয়ে পলায়ন করেছে। সাঈদ বলেন, জার্‌রাহ্ আল্লাহ্‌কে এত বেশি ভয় করেন যে, তিনি কখনো আল্লাহ্‌র শত্রুদের কাছে পরাজিত হয়ে পলায়ন করতে পারেন না। তিনি তুর্কীদের কাছে পরাজিত হওয়ার অপমানও সহ্য করতে পারেন না। আমার ধারণা, তিনি শাহাদাতবরণ করেছেন। হিশাম বলেন, তাহ্‌লে এখন কি করা যায়? সাঈদ হুরায়শী বলেন, এখন আমাকে শুধু চল্লিশজন সৈন্য দিয়ে সেদিকে পাঠিয়ে দিন। এরপর প্রতিদিন চল্লিশজন করে পাঠাতে থাকেন। তাছাড়া ওদিককার সকল শাসনকর্তা ও কর্মকর্তাদের কাছেও এই মর্মে একটি সাধারণ নির্দেশ পাঠান যে, তারা যেন প্রয়োজনের সময় আমাকে সাহায্য করে।

এই প্রস্তাবটি হিশামের মনঃপূত হয়। অতএব সাঈদ চল্লিশজন সৈন্য নিয়ে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে জার্‌রাহের সঙ্গীদের সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়। ওরা অত্যন্ত নাজুক অবস্থায় ফিরে আসছিল। সাঈদ তাদেরকেও নিজের সঙ্গী করে নেন। যাওয়ার পথে যেখানেই মুসলিম বসতি পড়তো সেখানেই তিনি লোকদেরকে জিহাদের প্রতি অনুপ্রাণিত করতে থাকেন। এভাবে সব জায়গা থেকেই কিছু কিছু লোক সংগৃহীত হতে থাকে। খালাত নামক স্থানে পৌঁছার পর তুর্কীদের সাথে সাঈদের মুকাবিলা হয়। এক রক্তাক্ত যুদ্ধের পর তুর্কীরা পরাজিত হয় ও প্রচুর মালে গনীমত মুসলমানদের হাতে আসে। বিজয়ের পর সাঈদ বারযাগা নামক স্থানে অবস্থান নেন। তুর্কীরা ওরসান নামক স্থানটি অবরোধ করে রেখেছিল। সাঈদ বারযাগা থেকে ওরসানবাসীদের কাছে ইসলামী বাহিনীর আগমন সংবাদ পাঠান এবং তুর্কীদের কাছেও এই মর্মে একটি পয়গাম পাঠান ঃ তোমরা ওরসানের অবরোধ তুলে নাও, অন্যথায় আমরা তোমাদের আক্রমণ করব।

তুর্কীরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে নিজে থেকেই অবরোধ উঠিয়ে নেয়। সাঈদ ওরসানে প্রবেশ করেন। এরপর আরদাবীল পর্যন্ত এগিয়ে যান। সেখানে গিয়ে জানতে পারেন যে, মাত্র চার ফারসাং দূরে দশ হাজার তুর্কী সৈন্য অবস্থান করছে এবং তাদের হাতে পাঁচ হাজার মুসলমান বন্দী হয়ে আছে। সাঈদ রাতের বেলা আক্রমণ করেন এবং ঐ দশ হাজার তুর্কীকে হত্যা করে মুসলমান বন্দীদের মুক্ত করে নিয়ে আসেন। পরদিন তিনি বাজারদানের দিকে রওয়ানা হন। জনৈক গুপ্তচর এসে সংবাদ দেয় যে, তুর্কীদের অপর একটি বাহিনী নিকটেই অবস্থান করছে। সাঈদ সেই রাতে তাদের উপর আক্রমণ চালান এবং সকলকে হত্যা করে মুসলিম বন্দীদেরকে মুক্ত করে দেন। ঐ বন্দীদের মধ্যে জাররাহ্‌র পুত্র এবং তার পরিবার-পরিজনও ছিল। এরপর পুনরায় তুর্কীরা একত্রিত হয়ে মুসলমানদের মুকাবিলার জন্য একটি বিরাট বাহিনী গড়ে তোলে। সারান্দ নামক স্থানে উভয় বাহিনীর মুকাবিলা হয় এবং এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর তুর্কীরা মুসলমানদের হাতে পরাজিত হয়ে পলায়ন করে। এই পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তুর্কীরা পুনরায় আরেকদফা মুকাবিলার প্রস্তুতি নেয়। বহু তুর্কী মরণপণ করে বায়কান নদীর তীরে সমবেত হয়। সাঈদ হুরায়শী সেখানে পৌঁছেই যুদ্ধ শুরু করে দেন। এক ঘোরতর যুদ্ধের পর অনেক তুর্কী নিহত হয়। যারা প্রাণে রক্ষা পায় তারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাতে গিয়ে নদীতে ডুবে মরে। এই বিজয়ের পর হুরায়শী বাজারদানে ফিরে আসেন এবং সেখানেই অবস্থান গ্রহণ করেন। এরপর তিনি খলীফা হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিকের কাছে এই বিষয় সংবাদ পাঠান। সেই সাথে মালে গনীমতের এক-পঞ্চমাংশও খলীফার দরবারে পাঠানো হয়। খলীফা এরপর সাঈদ হুরায়শীকে দামিশ্‌কে ফিরিয়ে নিয়ে যান এবং আপন ভাই মাসলামাকে আর্মেনিয়া ও আযারবায়জানের গভর্নর নিয়োগ করেন।

সাঈদ হুরায়শী ফিরে আসার পর মাসলামা সেখানকার শাসন কর্তৃত্ব গ্রহণ করলে তুর্কীরা পুনরায় একতাবদ্ধ হয়ে একটি বিরাট বাহিনী গড়ে তুলে এবং প্রচুর অস্ত্রশস্ত্রসহ মুসলমানদের মুকাবিলার প্রস্তুতি নেয়। মাসলামা ইব্‌ন আবদুল মালিক একজন অভিজ্ঞ সেনাপতি ও নামকরা বীরপুরুষ ছিলেন। তিনি নিজের ভীরুতার কারণে নয়, বরং ইসলামী বাহিনীর সংখ্যাল্পতা ও শত্রুবাহিনীর সংখ্যাধিক্যের দিকটি বিবেচনা করে বিশেষ করে ঐ ভয়ংকর এলাকায় তুর্কীদের

হাতে মুসলমানদের ধন-সম্পদ লুণ্ঠিত এবং শিশু ও মহিলাদের বন্দী হওয়ার নিশ্চিত আশংকা থাকায় সেখান থেকে দারবান্দ নামক স্থানে পিছিয়ে আসেন। তিনি আর্মেনিয়ায় তার দেড়-দুই বছরের শাসনামলে তুর্কীদের সাথে অত্যন্ত নম্র সহৃদয় ব্যবহার করার কারণেও তুর্কীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার দুঃসাহস করে। মাসলামা যখন দারবান্দে ফিরে আসেন তখন মারওয়ান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মারওয়ান, যিনি মাসলামারই সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, চুপি চুপি দামেশ্‌কের দিকে পালিয়ে যান এবং খলীফার কাছে মাসলামার বিরুদ্ধে এই মর্মে অভিযোগ করেন যে, তিনি আর্মেনিয়া ও আযারবায়জানের লোকদের সাথে অত্যন্ত নম্র ব্যবহার করেন। এর ফলে তুর্কীরা বিদ্রোহ করার দুঃসাহস পায়। এরপর যখন তাদের মুকাবিলা করার সময় আসে তখন তিনি পশ্চাদপসরণ করেন এবং ঐ এলাকা ছেড়ে দারবান্দে ফিরে আসেন। তিনি হিমাশকে বলেন, আপনি আমাকে এক লক্ষ বিশ হাজার লড়াকু সৈন্য দিয়ে আর্মেনিয়ায় প্রেরণ করলে আমি তুর্কীদের আচ্ছামত শায়েস্তা করে ছাড়ব।

খলীফা হিশাম মারওয়ানকে এক লক্ষ বিশ হাজার সৈন্য দিয়ে বালানজার তথা আর্মেনিয়া অঞ্চলে প্রেরণ করেন। ইতিমধ্যে মাসলামা রোগাক্রান্ত হয়ে দারবান্দে মারা যান। মারওয়ানের সাথে এই বিরাট বাহিনী দেখে তুর্কীরা হতভম্ব হয়ে পড়ে এবং শর্তহীনভাবে মুসলমানদের আনুগত্য স্বীকার করে। মারওয়ান যেমন বলেছিলেন, ঠিক তেমনি তুর্কীদের আচ্ছামত শায়েস্তা করে ছাড়েন। ফলে আর্মেনিয়া ও সংশ্লিষ্ট সমগ্র এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিক মারওয়ানকে হিজরী ১১৪ সনে (৭৩২ খ্রি.) আর্মেনিয়ায় প্রেরণ করেছিলেন।

কায়সারে রূম (বায়যান্টাইন সম্রাট)

হিশাম আবদুল মালিকের খিলাফত আমলে মুসলমানরা বার বার কায়সারে রূমের বাহিনীকেও পরাজিত করে। আমীরে মুআবিয়া (রা)-এর যুগ থেকেই শীত ও গ্রীষ্ম মওসুমে উত্তরাঞ্চলীয় দেশসমূহে হামলাকারী বাহিনী মোতায়েন ছিল। ঐ শীত-গ্রীষ্মকালীন বাহিনী কনসটান্টিনোপল ও রোমান এলাকাসমূহে হামলা চালাত। ফলে রোমানদের উপর মুসলমানদের অসাধারণ প্রভাব বিদ্যমান ছিল। হিশামের খিলাফত আমলে মুআবিয়া ইব্‌ন হিশাম, সাঈদ ইব্‌ন হিশাম, সুলায়মান ইব্‌ন হিশাম, মাসলামা ইব্‌ন আবদুল মালিক, মারওয়ান ইব্‌ন মুহাম্মদ, আব্বাস, ওয়ালীদ প্রমুখ রাজকুমার ঐসব বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত হয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে হামলা পরিচালনা করতেন। রাজকুমারদের সাথে আবদুল্লাহ্ বাত্তাল, আবদুল ওয়াহ্‌হাব ইব্‌ন বাখ্‌ত প্রমুখ বিখ্যাত অশ্বারোহীকেও অধিনায়ক নিয়োগ করা হতো। তাদের বীরত্ব ও সাহসিকতার কথা রূম দেশে (খ্রিস্টান বায়যান্টাইন রাজ্যে) প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছিল। হিশামের যুগে মুসলমানদের হাতে রোমানদের অপরিসীম ক্ষতি সহ্য করতে হয়েছিল। তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে একটিবারও বিজয় অর্জন করতে পারে নি।

স্পেনেও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উকবার দুর্বার বিজয় অভিযান ইউরোপের খ্রিস্টান জনসাধারণ ও রাজা-বাদশাহদেরকে ভীতিগ্রস্ত করে তোলা এবং মুসলমানদের নাম শোনামাত্র তাদের দেহে কম্পনের সৃষ্টি হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। তখন হিজায, ইয়ামান প্রভৃতি অঞ্চলেও শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত ছিল।

যায়দ ইব্‌ন আলী (র)

হুসাইন ইব্‌ন আলী (রা) ইব্‌ন আবী তালিবের সাথে কারবালা এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের সাথে মক্কায় বনূ ইমাইয়া সরকারের পক্ষ থেকে যে আচরণ করা হয়েছিল, এরপর হাজ্জাজ প্রমুখ হিজায ও ইরাকে যে নিষ্ঠুর কর্মপন্থা গ্রহণ করেছিলেন তা প্রথম দিকে হিজায ও ইরাকের আরব সম্প্রদায়গুলোকে ভীতসন্ত্রস্ত করে একেবারে নিশ্চুপ করে দিয়েছিল। এরপর সোনাদানা ও ধন-দওলতের যথেষ্ট ব্যবহার মানুষের মনে বনূ উমাইয়ার প্রতি হিংসা-বিদ্বেষের সৃষ্টি করে। তাদের উপর থেকে জনসাধারণের আন্তরিক আকর্ষণ ও সহানুভূতিও হ্রাস পেতে থাকে। হিশামের শাসনামলে মুসলিম রাষ্ট্রে বাহ্যত শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত ছিল। তখন ইরাক ও হিজাযে হাজ্জাজ, ইব্‌ন যিয়াদ প্রমুখের মত পাষাণহৃদয় ও অত্যাচারী কোন শাসকের অস্তিত্ব ছিল না। তখন বনূ হাশিমের অন্তরে নিজেদের পতন ও বনূ উমাইয়ার উত্থানের দৃশ্যটি ভেসে উঠত। যারা সরাসরি তৎকালীন সরকারের কাছ থেকে অস্বাভাবিক ধরনের কোন ফায়দা লুটছিল না, তাদেরকে তার নিজেদের (বনূ হাশিমের) প্রতি সহানুভূতিশীল বলেই মনে করত। তখন ভীতি ও সন্ত্রাসের জগদ্দল পাথরও তাদের বুকের উপর থেকে নেমে গিয়েছিল। এই প্রেক্ষাপটে বনূ হাশিম বনূ উমাইয়াদের উচ্ছেদ করে নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করে। হযরত উসমান (রা) ও হযরত আলী (রা)-এর যুগ থেকে তারা এ অভিজ্ঞতাই সঞ্চয় করেছিল যে, কোন রাষ্ট্র ব্যবস্থা বা শাসকগোষ্ঠীর উচ্ছেদ সাধনে শক্তির চাইতে কৌশলই অধিক ফলদায়ক। অতএব অত্যন্ত জোরেশোরে ও নেহাত দক্ষতার সাথে গোপন ষড়যন্ত্রজাল বিস্তারের কাজ শুরু হয়। বনূ হাশিমের দু'টি গোত্র তথা আলী ইব্‌ন আবী তালিব এবং আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিবের বংশধররা পৃথক পৃথকভাবে এবং নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে একাজ শুরু করে। আব্বাসীয়দের প্রচেষ্টা সম্পর্কে সামনে আলোচনা করা হবে। এখানে আমরা আলাবী তথা ফাতিমীদের একটি প্রচেষ্টার উল্লেখ করতে চাই। উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, ইউসুফ ইব্‌ন উমর সাকাফীকে হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিক ইরাকের গভর্নর নিয়োগ করেছিলেন। তাঁর শাসনামলে অর্থাৎ হিজরী ১২২ সনে (৭৪০ খ্রি) যায়দ ইব্‌ন আলী জনসাধারণের কাছ থেকে বায়আত গ্রহণ শুরু করেন। উল্লিখিত কারণসমূহের প্রেক্ষাপটে যেহেতু উমাইয়াদের গ্রহণযোগ্যতা এতই হ্রাস পেয়েছিল যে, যায়দ ইব্‌ন আলী (র) তাঁর বায়আত গ্রহণ প্রচেষ্টায় সাফল্য লাভ করেন। একমাত্র কূফা শহরে তাঁর হাতে প্রায় পনের হাজার লোক বায়আত করে।

ইমাম আবূ হানীফা (র)ও যায়দের সমর্থক ছিলেন। যে সমস্ত লোক অতীতের অবস্থার উপর নজর রাখতেন তারা যায়দকে বিদ্রোহ থেকে বিরত রাখার এবং আরো কিছু দিন অপেক্ষার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তাদের ঐ পরামর্শ গ্রহণ না করে কূফায় বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ইউসুফ ইব্‌ন উমর সাকাফী তা দমনের চেষ্টা করেন। পরিস্থিতি সংঘর্ষের রূপ নেয়। কূফীরা যেভাবে হুসাইন ইব্‌ন আলী (রা) এবং মুসআব ইব্‌ন যুবায়রকে ধোঁকা দিয়েছিল সেভাবে যায়দ ইব্‌ন আলীকেও ধোঁকা দেয়। যখন অসির চালনা ও বীরত্ব প্রদর্শনের সময় উপস্থিত হয় তখন তারা জ্ঞানার্জনে উদাসীন ছাত্রদের ন্যায় তার সামনে নানা ধরনের অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন উত্থাপন করতে থাকে। তারা তাকে বলে, আপনি প্রথমে বলুন, সিদ্দীকে

আকবর ও উমর ফারূককে আপনি কি ধরনের লোক মনে করেন ? তিনি উত্তর দেন, আমি আমার বংশের কোন লোককে এই দুই মহান ব্যক্তি সম্পর্কে কোন খারাপ মন্তব্য করতে শুনিনি। কূফীরা বলে, যখন খিলাফতের প্রকৃত হকদার আপনারই বংশের লোক ছিল এবং যখন এই দুই ব্যক্তি খিলাফতের উপর নিজেদের দখল প্রতিষ্ঠার পরও আপনার বংশের লোকেরা অসন্তুষ্ট হয়নি তাহলে এখন আপনার পরিবর্তে বনূ উমাইয়ার লোকেরা খিলাফতের উপর নিজেদের দখল প্রতিষ্ঠা করায় আপনি তাদের খারাপ বলছেন কেন বা তাদের বিরুদ্ধে লড়ছেন কেন ? একথা বলে তারা তাদের বায়আত প্রত্যাহার করে নেয়। এখন যায়দ ইব্‌ন আলী তাদেরকে 'রাফিযী' (নেতা পরিত্যাগকারী) উপাধি প্রদান করেন।

শেষ পর্যন্ত মাত্র দুশ বিশজন লোক তাঁর সাথে থাকে। এই সামান্য সংখ্যক লোক নিয়ে তিনি ইউসুফ সাকাফীর কয়েক হাজার লোকের সাথে মুকাবিলা করেন। তিনি কূফার অলিগলিতে প্রত্যেকটি লোকের ঘরে যান এবং বায়আতের অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদের সাহায্য কামনা করেন; কিন্তু কেউই তাঁর আহ্বানে সাড়া দেয়নি। শেষ পর্যন্ত বেশ কয়েকবার ইরাকের গভর্নরের বাহিনীকে পরাজিত করার পর যায়দ ইব্‌ন আলী (র) নিহত হন। তাঁর কপালে একটি তীর বিদ্ধ হয় এবং তাতেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। ইউসুফ ইব্‌ন উমর সাকাফী দেহ থেকে তাঁর মস্তক ছিন্ন করে তা হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিকের কাছে দামিশ্‌কে পাঠিয়ে দেন। যায়দ ইব্‌ন আলীর পুত্র ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন যায়দ পিতার মৃত্যুর পর প্রথমে নীনিওয়ার দিকে চলে যান এবং সেখানে কিছুদিন আত্মগোপন করে থাকেন। এরপর সুযোগ বুঝে খুরাসানের দিকে চলে যান। যায়দের প্রচেষ্টা তাড়াহুড়া ও অদূরদর্শিতার কারণে ব্যর্থ হয়। কিন্তু আব্বাসীরা এ থেকে যথেষ্ট লাভবান হয়। তারা এই শিক্ষা লাভ করে যে, এসব ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতা ও দূরদর্শিতার সাথে প্রত্যেকটি পদক্ষেপ নিতে হবে। তাছাড়া এই ঘটনার পূর্বে বনূ উমাইয়ার বর্তমান প্রভাব ও ক্ষমতা সম্পর্কে তাদের সঠিক কোন ধারণাই ছিল না। যায়দ ইব্‌ন আলীর মৃত্যুতে আরো বেশি লোক বনূ হাশিমের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে। কেননা হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিক একদিকে যেমন যায়দের কর্তিত মস্তক দামিশকের সদর দরজায় রেখেছিলেন, অন্যদিকে ইউসুফ সাকাফী কূফার শূলীতে ঝুলিয়ে রেখেছিল তাঁর সঙ্গীদের লাশ। ঐ লাশগুলো বছরের পর বছর ঝুলন্ত অবস্থায় থেকে জনসাধারণকে বনূ উমাইয়ার প্রতি ঘৃণা পোষণকারী এবং বনূ হাশিমের প্রতি সহানুভূতিশীল করে তুলেছিল।

আব্বাসীয়দের ষড়যন্ত্র

আবু হাশিম আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ হানাফিয়া ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবূ তালিবকে সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল মালিক প্রমুখ বনূ উমাইয়ার খলীফাগণ খুবই সম্মান এবং সমীহ করতেন। কিন্তু হাশিমী হওয়ার কারণে বনূ উমাইয়ার প্রতি তিনিও শত্রুভাবাপন্ন ছিলেন। তিনি তাদের উচ্ছেদ ও বনূ হাশিমের প্রতিষ্ঠা লাভ অন্তর দিয়ে কামনা করতেন। তাঁর এই চেষ্টা শুধু তাঁর বন্ধু অনুরক্তদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাদের মধ্যে যাকে তিনি বিশ্বস্ত মনে করতেন শুধু তার কাছেই এই গোপন ইচ্ছা ব্যক্ত করতেন। আর এ ধরনের লোকের সংখ্যা কম ছিল না, বরং অনেক বেশিই ছিল। তারা ইরাকেও বাস করত, আবার খুরাসান এবং হিজাযেও।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ মুত্তালিব ও বনূ উমাইয়াকে উচ্ছেদ করে বনূ আব্বাসকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করার ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করছিলেন। সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল মালিকের খিলাফতকালে একদা আবূ হাশিম আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ তার কাছে দামিশ্‌কে যান। সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে বালকার হামীমাহ নামক স্থানে মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাসের সাথে অবস্থান করতে থাকেন। ঘটনাক্রমে তিনি মুহাম্মদকে ওসীয়ত করেন ঃ তুমি খিলাফত লাভের চেষ্টা চালাবে। এই ওসীয়ত মুহাম্মদ ইব্‌ন আলীকে বহুলভাবে উপকৃত করে। অর্থাৎ যেসব লোক আবূ হাশিম আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদের ভক্ত ছিল তারা সকলেই গোপনে মুহাম্মদ ইব্‌ন আলীর হাতে বায়আত হয়। এরপর হিজরী ১০০ সনে (৭১৮-১৯ খ্রি) যখন হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তখন মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী আব্বাসী ইরাক, খুরাসান, হিজায, ইয়ামান, মিসর প্রভৃতি মুসলিম দেশগুলোতে অত্যন্ত সংগোপনে নিজস্ব দূত প্রেরণ করেন। বনূ উমাইয়ার প্রতি মানুষের যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ছিল, হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) যদিও তা অনেকাংশে দূর করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তবুও মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী বালকা অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে সেখান থেকে মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র আপন আন্দোলনকে ছড়িয়ে দেন। কিছু দিন পর তিনি তাঁর বারজন নকীব (প্রতিনিধি) নিয়োগ করে তাদেরকে ইসলামী বিশ্বের চতুর্দিকে পাঠিয়ে দেন। ঐ সব নকীব প্রত্যেক জায়গায়ই সাফল্য লাভ করে।

হিজরী ১০২ সনে (৭২০-২১ খ্রি) অন্য বর্ণনা অনুযায়ী ১০৪ সনে (৭২২-২৩ খ্রি) আবূ মুহাম্মদ সাদিক খুরাসানী সেখানকার দাওয়াত গ্রহণকারী কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে মুহাম্মদ ইব্‌ন আলীর সাথে সাক্ষাত করেন। তখন মুহাম্মদ তাঁর ১৫ দিনের নবজাত পুত্র সন্তানকে কোলে করে নিয়ে আসেন এবং ঐ লোকদেরকে সম্বোধন করে বলেন, এ-ই হবে তোমাদের নেতা (ঐ শিশুই ছিল পরবর্তীকালে আবদুল্লাহ্ সাফ্‌ফাহ্)। এরপর জুনায়দের সাথে সিন্ধুতে অবস্থানকারী বুকায়র ইব্‌ন মাহান সেখান থেকে কূফায় আসেন এবং আবূ মুহাম্মদ সাদিকের সাথে দেখা করেন। তিনি বুকায়রকে দাওয়াত দেন এবং তিনি সঙ্গে সঙ্গে তা কবূল করেন।

এটা হচ্ছে হিজরী ১০৫ সনের (৭২৩-২৪ খ্রি) ঘটনা। হিজরী ১০৭ সনে (৭২৫-২৬ খ্রি) বুকায়র ইব্‌ন মাহান, যিনি কূফায় মুহাম্মদ ইব্‌ন আলীর পক্ষ থেকে ইরাক ও খুরাসান অঞ্চলের দাওয়াতী কাজ পরিচালনার জন্য ভারপ্রাপ্ত ছিলেন, আবূ ইকরামা, আবূ মুহাম্মদ সাদিক, মুহাম্মদ খুনায়ন, আম্মার ইবাদী প্রমুখ ব্যক্তিকে খুরাসান অঞ্চলে খিলাফতে আব্বাসীয়ার দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য বিভিন্ন জায়গায় প্রেরণ করেন। তখন খুরাসানের গভর্নর ছিলেন আসাদ কাসরী। ঘটনাক্রমে তিনি জানতে পারেন যে, কিছু লোক খিলাফতে আব্বাসীয়ার জন্য জনসাধারণকে দাওয়াত দিচ্ছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাদের সবাইকে বন্দী করে হত্যা করেন। শুধু আম্মার নামীয় জনৈক ব্যক্তি প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এবার সে বুকায়র ইব্‌ন মাহানকে ঐ দুঃখজনক ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করে। বুকায়র এ সংবাদই মুহাম্মদ ইব্‌ন আলীকে লিখিতভাবে জানান। তিনি উত্তরে লিখেন, আল্লাহ্‌র শোকর যে, তোমাদের প্রচেষ্টা

ফলপ্রসূ হয়েছে। এখন তুমি নিজেকেও মৃত্যুর জন্য তৈরি রাখ। হিজরী ১১৮ সনে (৭৩৭ খ্রি) তিনি আম্মার ইব্‌ন যায়দকে বনূ আব্বাসের সমর্থকদের নেতা নিয়োগ করে খুরাসানে প্রেরণ করেন। সেখানে গিয়ে তিনি নিজেকে খার্‌রাশ (মট্‌কা বিক্রেতা) নামে পরিচয় দেন। খাররাশ বনূ আব্বাস প্রীতিকে নামায-রোযার উপরও প্রাধান্য দিতেন। তিনি লোকদের বলতেন, তোমরা বনূ আব্বাসের খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা কর এবং বিষয়টি যাতে ফাঁস্‌ হয়ে না যায় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখ। মনে রেখ, এ কাজটি নামায-রোযার চাইতেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ। মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী এই সংবাদ শুনে খার্‌রাশের প্রতি তাঁর অসন্তোষ প্রকাশ করেন। খুরাসানের গভর্নর আসাদ কাসরী খার্‌রাশের আন্দোলন সম্পর্কে অবহিত হয়ে তাকে গ্রেফতার করে হত্যা করেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের কারণে খুরাসানবাসীদের উপর অসন্তুষ্ট হন। তাই খুরাসানের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের একটি প্রতিনিধিদল তাঁর খিদমতে হাযির হয়ে নিজেদের অপরাধের জন্য তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী স্বয়ং নকীব নিয়োগ করে বিভিন্ন জায়গায় পাঠান। তিনি নকীবদের জন্য নিজেদের কাছ থেকে কয়েকটি (লাঠি) প্রদান করেন, যেগুলোকে নকীবী বা প্রতিনিধিত্বের চিহ্ন বলে মনে করা হতো। হিজরী ১২৪ সনে (৭৪২ খ্রি) মুহাম্মদ বন্দী অবস্থায় ইনতিকাল করেন। মৃত্যুকালে আপন পুত্র ইবরাহীমকে তিনি তাঁর স্থলাভিষিক্ত (খলীফা) নিয়োগ করে যান। তিনি তাঁর নকীব ও অনুসারীদের ওসীয়ত করেন, আমার পরে তোমরা সবাই ইবরাহীমকে তোমাদের ইমাম মানবে এবং সর্বদা তাঁর অনুগত থাকবে। বুকায়র ইব্‌ন মাহান ইবরাহীমের সাথে সাক্ষাত করেন এবং তাঁর কাছ থেকে প্রয়োজনীয় হিদায়াত নিয়ে খুরাসান অভিমুখে রওয়ানা হন। সেখানে গিয়ে তিনি নিজের সমমনা লোকদের মুহাম্মদ ইব্‌ন আলীর ইনতিকাল এবং তাঁর পুত্র ইবরাহীমের ইমাম নিযুক্ত হওয়ার সংবাদ দেন এবং যাবতীয় নির্দেশ সম্পর্কে তাদেরকে ওয়াকিফহাল করেন। এবার বনূ আব্বাসের ভক্ত-অনুরক্তরা যা কিছু অর্থকড়ি তাদের হাতে ছিল তা একত্র করে। এরপর বুকায়র সেই অর্থ নিয়ে ইমাম ইবরাহীমের খিদমতে হাযির হলো। হিজরী ১২৪ সনে (৭৪২ খ্রি) ইবরাহীম আবূ মুসলিমকে খুরাসানে প্রেরণ করেন। আবূ মুসলিম, ইমাম ইবরাহীম ও এই আন্দোলন সম্পর্কে সামনে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিকের খিলাফতকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল মালিকের ওসীয়ত অনুযায়ী হিশামের পর অলীআহ্‌দ ছিলেন ওয়ালীদ ইব্‌ন ইয়াযীদ। কিন্তু হিশামের ইচ্ছা ছিল, তিনি ওয়ালীদকে বঞ্চিত করে তার স্থলে আপন পুত্রকে অলীআহ্‌দ নিয়োগ করবেন। কিন্তু রাজদরবারের আমীর ও সভাসদগণ তাতে রাযী হননি। ফলে তাঁর ঐ ইচ্ছা পূরণ হতে পারেনি। কিন্তু এই তৎপরতার ফলে হিশাম ও ওয়ালীদের মধ্যে মন-কষাকষির সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত হিজরী ১২৫ সনের ৬ই রবিউস সানী (৭৪৩ খ্রি ফেব্রুয়ারী) সাড়ে উনিশ বছর খিলাফত পরিচালনার পর হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিক মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ওয়ালীদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল মালিক

আবুল আব্বাস ওয়ালীদ ইব্ন ইয়াযীদ আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান ইবনুল হাকাম হিজরী ৯০ সনে (৭০৯ খ্রি) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মাতা ছিলেন হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফ সাকাফীর ভাতিজী এবং মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফের কন্যা। ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল মালিকের মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল অল্প। শুরু থেকেই তাঁর আচার-আচরণ সুবিধাজনক ছিল না। নানা পাপাচারে লিপ্ত থাকার দরুন তার দেহ ছিল দুর্বল ও শীর্ণ। এই প্রেক্ষিতে হিশাম ইব্ন আবদুল মালিক কর্তৃক তাকে অলীআহ্দী থেকে বঞ্চিত করার উদ্যোগ খুব একটা আপত্তিকর ছিল না। কিন্তু অদূরদর্শী আমীর ও সভাসদদের বিরোধিতার কারণে হিশামের সেই উদ্যোগ সফল হয়নি। হিশাম ইব্ন আবদুল মালিকের পর ওয়ালীদ ইব্ন ইয়াযীদ খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হন। ওয়ালীদের খিলাফত আমল প্রকৃতপক্ষে খিলাফতে বনূ উমাইয়ার পতনের দ্বার উন্মুক্ত করে।

ওয়ালীদ ইব্ন ইয়াযীদ খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হতেই যে সমস্ত লোককে তিনি তার বিরোধী মনে করতেন তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ শুরু করেন। তিনি কারো ভাতা বন্ধ করে দেন, কাউকে বন্দী করেন, আবার কাউকে হত্যা করেন। তিনি আপন চাচাত ভাই সুলায়মান ইব্ন হিশামকেও ধরে এনে বেত্রাঘাত করেন। এরপর তার দাড়ি মুণ্ডন করে বিভিন্ন অলিগলি প্রদক্ষিণ করিয়ে তাকে অপমান করেন। তিনি ইয়াযীদ ইব্ন হিশাম এবং ওয়ালীদ ইব্ন আবদুল মালিকের কয়েকজন পুত্রকেও বন্দী করে রাখেন। মোটকথা খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েই তিনি সর্বপ্রথম নিজের পরিবারের অধিকাংশ লোককে, মদীনার গভর্নর হিশাম ইব্ন ইসমাঈল মাখযূমীর পুত্রদেরকে এবং ইরাকের প্রাক্তন গভর্নর খালিদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ কাসরীকে গ্রেফতার করে ইরাকের শাসনকর্তা ইউসুফ ইব্ন উমরের হাতে সোপর্দ করেন। ইউসুফ ঐ সমস্ত গণ্যমান্য ব্যক্তির উপর অমানুষিক নির্যাতন চালান। ফলে তাঁরা মৃত্যুমুখে পতিত হন।

আপন খিলাফতের প্রথম বছরেই অর্থাৎ হিজরী ১২৫ সনে (৭৪৩ খ্রি) ওয়ালীদ আপন পুত্রদের (উসমান ও হাকাম) যদিও জনসাধারণের কাছ থেকে অলীআহ্দীর বায়আত নেন, যদিও পূর্ব থেকে অলীআহদের প্রচলন হয়ে গিয়েছিল এবং জনসাধারণও এ ধরনের বায়আতে অভ্যস্ত ছিল, তবু কেউই খোলা মনে এই ছেলেদের জন্য বায়আত করেনি।

ওয়ালীদ শুধু উপরোক্ত ভুলত্রুটিই করেন নি, বরং সেই সাথে আপন বাতিল আকাইদ ও চিন্তাধারার কথাও প্রকাশ্যে প্রচার করে জনসাধারণকে দারুণভাবে ক্ষেপিয়ে তোলেন। মদ্যপান এবং ব্যভিচারেও তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। এই সমস্ত কথা প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথে বিভিন্ন প্রদেশ ও অঞ্চলের গভর্নর ও কর্মকর্তাগণ তার সম্পর্কে নিরাশ হয়ে পড়েন। ক্রমে ক্রমে খিলাফতে বনূ উমাইয়ার প্রতি সাধারণ মানুষও তাদের যাবতীয় আকর্ষণ ও সহানুভূতি হারিয়ে ফেলে।

হিজরী ১২৫ সনে (৭৪৩ খ্রি) অর্থাৎ আপন খিলাফতের প্রথম বছরেই ওয়ালীদ খুরাসান প্রদেশকে ইরানের অন্তর্ভুক্ত করে খুরাসানের গভর্নর নাস্র ইব্ন সাইয়ারকে পদচ্যুত করেন।

নাস্‌রের কাছে একদিকে ওয়ালীদের এবং অপর দিকে ইরাকের গভর্নর ইউসুফ ইব্‌ন উমরের কাছে এই মর্মে একটি নির্দেশ গিয়ে পৌঁছে ঃ তোমাকে পদচ্যুত করা হলো। তুমি অবিলম্বে রাজধানী দামিশকে এসে তোমার হিসাব-নিকাশ বুঝিয়ে দাও।

উমাইয়া শাসনামলে প্রদেশসমূহের বিভক্তি

বনূ উমাইয়ার যুগে ইসলামী রাষ্ট্র বেশ কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক প্রদেশের জন্য একজন আমীর (ভাইসরয় বা গভর্নর) নিযুক্ত হতেন। প্রত্যেক গভর্নর আপন অধীনস্থ প্রদেশে সম্পূর্ণ রাজকীয় ক্ষমতার অধিকারী হতেন। তিনি নিজের পক্ষ থেকেই তার অধীনস্থ রাজ্যসমূহের হাকিম নিয়োগ করতেন। হিজায, ইরাক, জাযীরা, আর্মেনিয়া, সিরিয়া, মিসর, আফ্রিকা, স্পেন, খুরাসান প্রভৃতি ছিল বৃহৎ প্রদেশগুলোর অন্যতম। মক্কা, মদীনা, তাইফ ও ইয়ামান অঞ্চলকে হিজায প্রদেশ থেকে আলাদা করে একটি পৃথক প্রদেশ গঠন করা হয়। সেখানকার হাকিম দারুল খুলাফা তথা কেন্দ্র কর্তৃক সরাসরি নিযুক্ত হতেন। জর্দান, হিম্‌স, দামিশ্‌ক ও কিন্‌নাসরীন রাজ্য বা অঞ্চল সিরিয়া প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আফ্রিকাকে কখনো মিসরের অন্তর্ভুক্ত করা হতো, আবার কখনো পৃথক একটি প্রদেশ ঘোষণা করে সরাসরি কেন্দ্র থেকে কায়রাওয়ানের গভর্নর নিয়োগ করা হতো। অনুরূপভাবে স্পেনকে কখনো পৃথক প্রদেশ ঘোষণা করা হতো এবং সেখানকার হাকিম, কেন্দ্র তথা সরাসরি খলীফা কর্তৃক নিযুক্ত হতেন। আবার কখনো সেটাকে কায়রাওয়ানের আমীরের অধীনস্থ করে আফ্রিকা প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করা হতো। এমতাবস্থায় কায়রাওয়ানের আমীর আপন ইচ্ছানুযায়ী কাউকে স্পেনের হাকিম নিযুক্ত করতেন। ইরাক এবং খুরাসানেরও একই অবস্থা ছিল। কখনো খুরাসান একটি পৃথক প্রদেশ হিসাবে গণ্য হতো এবং সেখানকার গভর্নর বা আমীর সরাসরি কেন্দ্র থেকে নিযুক্ত হতেন। আবার কখনো খুরাসানকে হাকিম ইরাকের গভর্নরের পক্ষ থেকে নিযুক্ত হতেন। প্রদেশের আমীর এবং রাজ্য বা অঞ্চলসমূহের শাসনকর্তা আপন অধীনস্থ ভূখণ্ডের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হতেন। আবার কখনো কখনো এমনও হতো যে, রাজস্ব বিভাগের কর্তৃত্ব অর্থাৎ খারাজ ও জিয্‌য়া আদায় করার দায়িত্ব কেন্দ্রের পক্ষ থেকে কোন পৃথক ব্যক্তির উপর অর্পণ করা হতো। কেন্দ্র থেকে নিযুক্ত রাজস্ব অফিসারকে প্রদেশ কিংবা রাজ্যের হাকিমের অধীনস্থ মনে করা হতো না। তবে সেনাবাহিনীর অধিনায়কত্ব এবং দেশের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব সব সময়ই সংশ্লিষ্ট প্রদেশের শাসনকর্তার হাতে থাকত। রাজস্ব অফিসারের ন্যায় কখনো কখনো প্রদেশের 'আমীরে শরীআত' কিংবা প্রধান বিচারপতিও সরাসরি কেন্দ্র থেকে নিযুক্ত হতেন। তবে সংশ্লিষ্ট আমীর নামাযসমূহের ইমামতি করতেন। অর্থাৎ নামাযসমূহের ইমামতি ও সেনাবাহিনীর অধিনায়কত্ব– এ দু'টি দায়িত্ব আমীরের উপর ন্যস্ত থাকত। পরবর্তীকালে নামাযের ইমামতি এবং প্রদেশের প্রশাসনও পরস্পর থেকে পৃথক করা হয়। এতদ্‌সত্ত্বেও জুমুআর খুতবা প্রদানের দায়িত্ব প্রদেশের গভর্নর এবং প্রধান সেনাপতির উপরই ন্যস্ত থাকে।

নাস্‌র ইব্‌ন সাইয়ারের কাছে তার পদচ্যুতির নির্দেশ পৌঁছলে প্রথম প্রথম তিনি তা মেনে নিলেও পরে নানা দিক চিন্তা করে খুরাসানের কর্তৃত্ব পরিত্যাগ না করারই সংকল্প নেন এবং

নিজেকে স্বাধীন শাসক ঘোষণা করেন। পূর্বাপর ঘটনাবলীর মধ্যে ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করা প্রয়োজন। তা এই যে, যখন নাস্র ইব্ন সাইয়ারের কাছে তার পদচ্যুতির নির্দেশ পৌঁছেনি এবং যখন তিনি ওয়ালীদ ইব্ন ইয়াযীদকে খলীফা মানতেন ঠিক তখনি তার কাছে অপর একটি নির্দেশ পৌঁছেছিল। তাতে বলা হয়েছিল, তুমি ইয়াহ্ইয়া ইব্ন যায়দ আলাবীকে যিনি নিজ পিতার নিহত হওয়ার পর খুরাসানের অন্তর্গত বল্খ নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন—অবিলম্বে গ্রেফতার করে দামিশকে পাঠিয়ে দাও। নাস্র ইব্ন সাইয়ার ইয়াহ্ইয়া ইব্ন যায়দকে ডেকে এনে গ্রেফতার করেন এবং ওয়ালীদ ইব্ন ইয়াযীদকে লিখেন, আমি ইয়াহ্ইয়াকে বন্দী করে ফেলেছি। নাস্র তখন ইয়াহ্ইয়াকে ছেড়ে দিয়ে বলেন, তুমি দামিশকে খলীফার কাছে যাও। ইয়াহ্ইয়া সেখান থেকে দামিশক অভিমুখে রওয়ানা হলেও রাস্তা থেকে পুনরায় খুরাসানে ফিরে যান। সেখানে তার সাথে ভক্ত-অনুরক্তদের একটি দল জুটে যায়। তখন নাস্র তার মুকাবিলার জন্য সেনাবাহিনী পাঠান। এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে ইয়াহ্ইয়ার সব সঙ্গী মারা যায়। তার কপালেও একটি তীর বিদ্ধ হয় এবং তাতে তিনিও মারা যান। এই ঘটনা ১২৫ হিজরীতে (৭৪৩ খ্রি) জুরজান নামক স্থানে সংঘটিত হয়। ইয়াহ্ইয়ার ছিন্ন মস্তক ওয়ালীদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আর তার লাশটি ঝুলিয়ে দেওয়া হয় একটি শূলীতে, যা দীর্ঘ সাত বছর পর্যন্ত সেখানে ঝুলতে থাকে। অবশেষে আবূ মুসলিম খুরাসানী তা শূলী থেকে নামিয়ে তার দাফনের ব্যবস্থা করেন।

ওয়ালীদ ইব্ন ইয়াযীদের জুলুম-অত্যাচারের কারণে জনসাধারণ তার প্রতি একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। তিনি যখন তার চাচাত ভাইদের উপরও নির্যাতন চালান তখন তারা শুধু তার প্রতি অতিষ্ঠই হয়ে উঠেনি, বরং তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের ষড়যন্ত্র পাকাতে থাকে। তার চাচাত ভাই ইয়াযীদ এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। শাহী পরিবারে ইয়াযীদ ইব্ন ওয়ালীদকে অধিকতর পুণ্যবান ও আল্লাহ্ওয়ালা মনে করা হতো। তাই স্বাভাবিকভাবেই তিনি ওয়ালীদ ইব্ন ইয়াযীদের বিরুদ্ধে তার শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগ উত্থাপন করেন এবং সাধারণ্যেও তা প্রকাশ করে দেন। এতে অনেক লোক তাঁর সমর্থক হয়ে দাঁড়ায়। এক্ষেত্রে ইয়াযীদের পিছনে শুধু সামরিক অধিনায়ক বা আমীর-উমারার সমর্থন ছিল না, বরং শাহী পরিবারের সদস্যদেরও পৃষ্ঠপোষকতা ছিল। শেষ পর্যন্ত সবাই গোপনে ইয়াযীদ ইব্ন ওয়ালীদের হাতে বায়আত করে এবং সিরীয় বাহিনীর একটি বিরাট অংশও তাঁকে সমর্থন দিতে থাকে। এরপর তিনি দামিশ্‌ক থেকে চলে যান এবং কিছুটা দূরবর্তী একটি গ্রামে অবস্থান করতে থাকেন। সেখান থেকেই তিনি তাঁর প্রতিনিধিদেরকে ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করেন, যাতে তারা জনসাধারণের কাছে ওয়ালীদ ইব্ন ইয়াযীদের শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপের বিবরণ তুলে ধরে এবং ক্রমে ক্রমে সমগ্র মুসলিম বিশ্বের জনমত তার বিরুদ্ধে ও ইয়াযীদের অনুকূলে চলে আসে। বনূ উমাইয়া বিশেষ করে রাজপরিবারের মধ্যে এই প্রথমবারের মত এমন ভয়ানক মতানৈক্য সৃষ্টি হয় যে, একদল অন্য দলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র রচনা, এমনকি প্রচারণামূলক তৎপরতাও শুরু করে দেয়। ফলে অল্প দিনের মধ্যেই সমগ্র পরিস্থিতি ওয়ালীদের বিরুদ্ধে এবং ইয়াযীদের পক্ষে চলে যায়। ইয়াযীদের ভাই আব্বাস যদিও ওয়ালীদের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিলেন এবং তার দ্বারা কিছুটা নির্যাতিতও হয়েছিলেন তবু তিনি আপন ভাই ইয়াযীদকে এই বিদ্রোহাত্মক তৎপরতা থেকে নিরস্ত রাখার চেষ্টা করেন। এই

বিরোধিতার কারণেই ইয়াযীদ বিরক্ত হয়ে দামিশ্‌ক ছেড়ে একটি পৃথক জায়গায় গিয়ে বসবাস করতে থাকেন। ইয়াযীদ সব দিক দিয়ে আশ্বস্ত হওয়ার পর ১২৬ হিজরীর ২৭ শে জমাদিউস্ সানী (৭৪৪ খ্রি-এর এপ্রিল) শুক্রবার বিদ্রোহ ঘোষণার তারিখ নির্ধারণ করেন। ইশার নামাযান্তে দামিশকে প্রবেশ করে প্রথমে তিনি পুলিশ প্রধানকে গ্রেফতার করেন, এরপর সরকারী অস্ত্রাগারের উপর নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। ওয়ালীদ ইব্‌ন ইয়াযীদ ইতিপূর্বে এই সমস্ত ষড়যন্ত্র ও তৎপরতা সম্পর্কে কিছুই জানতে পারেন নি। তাই এই অবস্থা দেখে তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন এবং রাজপ্রাসাদের দরজা বন্ধ করে বসে থাকেন। এবার দামিশ্‌ক ও তার আশেপাশের লোকেরা দল বেঁধে এসে ইয়াযীদ ইব্‌ন ওয়ালীদের হাতে বায়আত করতে থাকে। ওয়ালীদ ইব্‌ন ইয়াযীদ দামিশক থেকে হিম্‌সের দিকে যেতে চান। শেষ পর্যন্ত কাসরে নু'মানী নামক স্থানে ইয়াযীদ ওয়ালীদকে ঘেরাও করে ফেলেন। ওয়ালীদের সঙ্গীরা প্রাণপণ যুদ্ধ করে। আব্বাস ইব্‌ন ওয়ালীদ অর্থাৎ ইয়াযীদের সহোদর আপন সঙ্গীদের নিয়ে ওয়ালীদকে সাহায্য করেন এবং ইয়াযীদের মুকাবিলার জন্য দামিশ্‌ক থেকে বেরিয়ে পড়েন। কিন্তু পথিমধ্যে মানসূর ইব্‌ন জামহুর তাকে গ্রেফতার করে ইয়াযীদ ইব্‌ন ওয়ালীদের সামনে নিয়ে হাযির করে। ওয়ালীদ ইব্‌ন ইয়াযীদ যখন বুঝতে পারেন যে, এখন আর রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় নেই তখন এই বলে পবিত্র কুরআন পড়তে বসে যান যে, হযরত উসমান (রা)-এর উপর যেইদিন এসেছিল আজ সেইদিন আমার উপরও এসেছে। ইয়াযীদের লোকেরা রাজপ্রাসাদের প্রাচীর ডিঙিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে এবং ওয়ালীদ ইব্‌ন ইয়াযীদের দেহ থেকে তার মস্তক বিচ্ছিন্ন করে নেয়। মানসূর ইব্‌ন জামহুর সেই মস্তক ইয়াযীদ ইব্‌ন ওয়ালীদের সামনে পেশ করেন। ইয়াযীদ নির্দেশ দেন, এটাকে ভালভাবে প্রদর্শনের পর ওয়ালীদের ভাই সুলায়মানকে দিয়ে দাও। নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করা হয়। এক বছর তিন মাস খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত থাকার পর ১২৬ হিজরীর ২৮শে জমাদিউস্ সানী (৭৪৪ খ্রি-এর এপ্রিল) ওয়ালীদ ইব্‌ন ইয়াযীদ নিহত হন। ঐ দিনই ইয়াযীদ ইব্‌ন ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুল মালিক খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হন। বনূ উমাইয়ার মধ্যে অন্তর্বিরোধ এমনি অবস্থার সৃষ্টি করে যে, তারা দিনের পর দিন অধঃপতনের দিকে যেতে থাকে এবং পুনরায় শক্তি অর্জন করা তাদের পক্ষে আর সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

ইয়াযীদ ইব্‌ন ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুল মালিক

আবূ খালিদ ইয়াযীদ ইব্‌ন ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান ইব্‌নুল হাকামকে 'ইয়াযীদে ছালিছ' (তৃতীয় ইয়াযীদ) এবং ইয়াযীদুন্ নাকিস (অধম ইয়াযীদ)-ও বলা হয়। ইয়াযীদুন্ নাকিস এজন্য বলা হয় যে, তিনি সৈন্যদের ভাতা কমিয়ে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ ওয়ালীদ খলীফা হওয়ার পর সৈন্যদের ভাতা মাথাপিছু যে দশ দিরহাম বাড়িয়ে দিয়েছিলেন তিনি তা কমিয়ে পুনরায় পূর্বের ভাতাই নির্ধারণ করেন। তিনি তাদের বলেন, "ইয়াযীদের আকীদা-বিশ্বাস ও কার্যকলাপ ভাল ছিল না। তাই সে নিহত হয়েছে। আমি এখন তোমাদের সাথে ভাল ব্যবহার করব। তোমরা তোমাদের বেতনাদি নির্দিষ্ট সময়ে অবশ্যই পেয়ে যাবে। আমি যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত রেখা মজবুত ও সুদৃঢ় এবং প্রতিটি শহরকে আদল ও ন্যায় বিচারে পরিপূর্ণ করে না তুলব ততক্ষণ পর্যন্ত বিনা প্রয়োজনে তোমাদের কাউকে কোন

জায়গীর দেওয়া হবে না। আমার দরজায় কোন প্রহরী রাখব না। যাতে প্রতিটি লোক আমার সাথে সহজেই সাক্ষাত করতে পারে। যদি আমি ভ্রান্ত পথ অনুসরণ করি তাহলে আমাকে পদচ্যুত করার ইখতিয়ার তোমাদের রয়েছে।" এরপর ইয়াযীদ ইব্‌ন ওয়ালীদ জনসাধারণের কাছ থেকে যথাক্রমে ইবরাহীম ইব্‌ন ওয়ালীদ এবং আবদুল আযীয ইব্‌ন হাজ্জাজ ইব্‌ন আবদুল মালিকের অলীআহ্‌দীর বায়আত গ্রহণ করেন।

হিম্‌সবাসীরা ওয়ালীদ ইব্‌ন ইয়াযীদের হত্যার খবর জানতে পেরে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং ওয়ালীদ হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে ইয়াযীদ ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন মুআবিয়াকে নিজেদের নেতা নিয়োগ করে দামিশকের দিকে অগ্রসর হয়। ইয়াযীদ ইব্‌ন ওয়ালীদ সুলায়মান ইব্‌ন হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিককে একটি বাহিনী দিয়ে তাদের মুকাবিলায় প্রেরণ করেন। প্রথমে হিম্‌সবাসীদের সামনে সন্ধির প্রস্তাব পেশ করা হয়। কিন্তু এই প্রস্তাব তারা গ্রহণ না করলে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। শেষ পর্যন্ত ইয়াযীদ ইব্‌ন খালিদ নিহত হন, হিম্‌সবাসীদের অনেকেই মারা যায় এবং বাকিরা প্রাণ নিয়ে পলায়ন করে।

এই সংবাদ শুনে ফিলিস্তীনবাসীরাও বিদ্রোহ করে এবং ইয়াযীদ ইব্‌ন সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল মালিককে নিজেদের নেতা মনোনীত করে। জর্দানবাসীরা যখন এই সংবাদ পায় তখন তারা মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল মালিককে নিজেদের বাদশাহ্‌ মনোনীত করে এবং ফিলিস্তীন-বাসীদের সাথে জোটবদ্ধ হয়। এরপর উভয় বাহিনী একত্রিত হয়ে দামিশকের দিকে রওয়ানা হয়। এই সমস্ত অঞ্চলের লোকদেরকে ইতিপূর্বে ইয়াযীদ ইব্‌ন ওয়ালীদ নিজের সমর্থক করে নিয়েছিলেন। কিন্তু তখন খলীফা-হত্যার ঘটনা ঘটেনি। যখন খলীফাকে হত্যা করা হয় তখন আপনা-আপনি ঐ সমস্ত লোকের অন্তরে নিহত খলীফার প্রতি সহানুভূতি ও বর্তমান খলীফার প্রতি ঘৃণার উদ্রেক হয়। আর এটা কোন অস্বাভাবিক ব্যাপারও ছিল না। আমরা সচরাচর দেখি যে, যখন একজন হত্যাকারী ডাকাতকে ফাঁসির সাজা দেওয়া হয় তখন ন্যায়ত প্রতিটি লোকই তাকে ফাঁসির যোগ্য বলে বিশ্বাস করে। কিন্তু যখন তারা ঐ ডাকাতকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলতে দেখে তখন তার প্রতি স্বাভাবিকভাবেই সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে এবং তার সম্পর্কে ইতিপূর্বে তাদের মনে যে ঘৃণার উদ্রেক হয়েছিল তা হঠাৎ যেন দূর হয়ে যায়। যা হোক, ঐ বাহিনীর আগমন সংবাদ শুনে ইয়াযীদ তাদের প্রতিরোধের জন্য সুলায়মান ইব্‌ন হিশামের নেতৃত্বে একটি বিরাট বাহিনী প্রেরণ করেন এবং তিনি তাদের পরাজিত করে খলীফার আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য করেন।

সিরিয়ার উল্লিখিত গণ্ডগোল প্রশমনের পর ইয়াযীদ ইউসুফ ইব্‌ন উমরকে পদচ্যুত করে তার স্থলে মানসূর ইব্‌ন জামহুরকে ইরাক ও খুরাসানের গভর্নর নিয়োগ করেন। ইউসূফ মানসূরকে যথারীতি গভর্নরের দায়িত্ব বুঝিয়ে না দিয়ে গোপনে ইরাক থেকে দামিশ্‌ক অভিমুখে রওয়ানা হন। কিন্তু দামিশকের নিকটবর্তী হতেই ইয়াযীদ তাকে বন্দী করেন এবং ঐ অবস্থায়ই তিনি নিহত হন। মানসূর ইব্‌ন জামহুর কূফায় পৌঁছে ইউসুফের সময়কার বন্দীদেরকে মুক্ত করেন এবং নিজের পক্ষ থেকে আপন ভাইকে খুরাসানের গভর্নর নিয়োগ করেন। কিন্তু নাসর ইব্‌ন সাইয়ার তাকে খুরাসানে প্রবেশ করতে দেননি। তখনও এই ঝগড়ার কোন মীমাংসা

হয়নি এবং মানসূর মাত্র দু'মাস হয় কূফায় এসেছেন, এমনি সময়ে ইয়াযীদ ইব্ন ওয়ালীদ মানসূরকে পদচ্যুত করে তার স্থলে উমর ইব্ন আবদুল আযীযকে ইরাকের গভর্নর নিয়োগ করেন। মানসূর ইরাকের গভর্নরের দায়িত্ব আবদুল্লাহকে বুঝিয়ে দিয়ে সিরিয়া অভিমুখে রওয়ানা হন। আবদুল্লাহ্ নাস্র ইব্ন সাইয়ারকে যথারীতি খুরাসানের হাকিম নিয়োগ করেন। ঐ সময়ে ইয়ামামাও ইরাক প্রদেশের শাসনাধীন ছিল। ইয়ামামাকে কখনো হিজাযের অন্তর্ভুক্ত করা হতো, আবার কখনো ইরাকের। ইউসুফ ইব্ন উমরের যুগেই ইয়ামামাবাসীরা সেখানকার হাকিম আলী ইব্ন মুহাজিরকে বের করে দিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল এবং তখন পর্যন্ত সেখানে ঐ অবস্থাই চলছিল।

আবদুল্লাহ্ ইরাকের শাসনকর্তৃত্ব গ্রহণ করে যখন নাসর ইব্ন সাইয়ারকে নিজের পক্ষ থেকে খুরাসানের হাকিম নিয়োগ করেন তখন সেখানে জুদায় ইব্ন কিরমানী আযদী নাস্র ইব্ন সাইয়ারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। জুদায় আসলে আযদী ছিলেন। কিন্তু যেহেতু তিনি কিরমানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাই কিরমানী নামেই পরিচিত হন। তিনি যখন দেখেন যে, নাস্র ইব্ন সাইয়ার, যিনি ইতিপূর্বে খুরাসানের স্বাধীন শাসনকর্তা ছিলেন, এখন কূফার গভর্নর পদ লাভ করে কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছেন, তখন খুবই দুঃখিত হন। তিনি তার বন্ধুদের বলেন, এই লোকটি ফিতনায় পড়ে গেছে। তোমরা তোমাদের কার্য সম্পাদনের অন্য কাউকে আমিল নির্বাচন কর। নাসর ইব্ন সাইয়ার এবং কিরমানীর মধ্যে প্রথম থেকেই মনোমালিন্য ছিল এবং কিরমানী এই নতুন ফিতনা সৃষ্টি করায় নাসর তাকে বন্দী করেন। এটা হচ্ছে ১২৬ হিজরীর ২৭শে রমযানের (৭৪৪ খ্রি. জুলাই) ঘটনা। কিরমানী কিছুদিন বন্দী অবস্থায় থাকেন। এরপর বন্দীশালার দেওয়াল ডিংগিয়ে বেরিয়ে আসেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তিন হাজার সৈন্যের একটি বাহিনীও গড়ে তোলেন। অপরদিকে নাস্রও তাকে দমন করার জন্য একজন অধিনায়ক নিয়োগ করেন। কিন্তু লোকেরা মধ্যস্থতা করে তাদের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের চেষ্টা করে। এর ফলে কিরমানী নাস্রের কাছে চলে আসেন। তখন নাস্র ইব্ন সাইয়ার তাকে নির্জন জীবনযাপনের পরামর্শ দেন। কিন্তু কিছুদিন পরই কিরমানী পুনরায় বিদ্রোহের সংকল্প নেন। মোটকথা, এভাবে বেশ কয়েকবারই যুদ্ধ প্রস্তুতি চলে এবং পুনরায় সন্ধি স্থাপিত হয়। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, কিরমানী খুরাসান ছেড়ে জুরজানে চলে যাবেন। এই সিদ্ধান্ত সঙ্গে সঙ্গে কার্যকরও হয়।

যে দিনগুলোতে নাসর ও কিরমানীর মধ্যে বার বার মতবিরোধের সৃষ্টি হচ্ছিল এবং সমগ্র পরিস্থিতি ভয়ানক আকার ধারণ করছিল তখন নাসরের এই আশংকা হয় যে, কিরমানী হয়ত তুর্কিস্তান থেকে হারস ইব্ন শুরায়হ্‌কে ডেকে এনে নিজের শক্তি বৃদ্ধি করবেন। হারস ইব্ন শুরায়হ্ সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। তিনি বার-তের বছর যাবত তুর্কিস্তানে অবস্থান করছিলেন। যাহোক, পূর্বাপর পরিস্থিতি বিবেচনা করে নাসর মুকাতিল ইব্ন হাইয়ানী নাবাতীকে হারিসের কাছে পাঠান এবং তাকে (নাসরের) কাছে ডেকে নিয়ে আসার নির্দেশ দেন। অপর দিকে তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর ইব্ন আবদুল আযীযের কাছে কূফায় এবং ইয়াযীদ ইব্ন ওয়ালীদের কাছে দামিশকে পত্র প্রেরণ করেন। তাতে হারস ইব্ন শুরায়হ সম্পর্কে যে আশংকা রয়েছে তার উল্লেখ করে সুপারিশ করা হয়, যেন তাকে নিরাপত্তা প্রদান

করে ডেকে নিয়ে আসার অনুমতি প্রদান করা হয়। উভয় স্থান থেকেই আমাননামা (নিরাপত্তা পত্র) চলে আসে। এদিকে হারস ইব্ন শুরায়হ্ও তুর্কিস্তান থেকে খুরাসানে চলে আসেন। নাসর তার প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করেন এবং তার দৈনিক ভাতা পঞ্চাশ দিরহাম নির্ধারণ করে দেন। তিনি তাকে এও বলেন, আপনি যে শহরেরই শাসনক্ষমতা চান সেখানেই আপনাকে শাসনকর্তা নিয়োগ করা হবে। হারস বলেন, আমি শাসনক্ষমতা বা ধন-দৌলতের প্রত্যাশী নই, বরং কুরআন-সুন্নাহ্ নিয়েই পড়ে থাকতে চাই। জুলুম-অত্যাচার ও বাড়াবাড়ি বরদাশ্ত করতে না পেরে আমি এই সমস্ত শহর ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম। বার-তের বছর পর তুমি পুনরায় আমাকে ডেকে নিয়ে এসেছ। একথা শুনে নাসর নীরব হয়ে যান। এরপর হারস কিরমানীর কাছে বলে পাঠান, যদি নাসর ইব্ন সাইয়ার কিতাব ও সুন্নাহর উপর আমল করেন তাহলে আমি তার পক্ষ অবলম্বন করব এবং তার শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়ব। আর যদি তিনি কিতাব ও সুন্নাহর উপর আমল না করেন তাহলে আমি পুনরায় তোমার সাথে যোগ দেব। কেননা তুমি কিতাব ও সুন্নাহর উপর আমল করার অঙ্গীকার করেছ। এরপর হারস বনূ তামীম ও অন্যান্য গোত্রের লোকদের প্রতি তার শাসন কর্তৃত্ব মেনে নেবার আহ্বান জানান। কিছু দিনের মধ্যেই তিন হাজার লোক তার হাতে বায়আত করে।

খুরাসানের পরিস্থিতি তো এই ছিল, যা উপরে বর্ণনা করা হলো। তখন মারওয়ান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মারওয়ান আর্মেনিয়ার এবং আবদুহ্ ইব্ন রাইয়াহ্ গাস্সানী ছিলেন জাযীরার গভর্নর। যখন ওয়ালীদ ইব্ন ইয়াযীদ নিহত হন তখন আবদুহ্ গাস্সানী জাযীরা থেকে সিরিয়ায় চলে যান। মারওয়ান ইবন মুহাম্মদের পুত্র আবদুল মালিক যখন দেখলেন যে, জাযীরা প্রদেশ একেবারে শূন্য তখন তিনি সেখানে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন এবং আপন পিতা মারওয়ান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মারওয়ানকে লিখেন, এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ। আপনি ওয়ালীদ-হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য দাঁড়িয়ে যান। এদিকে ইয়াযীদ ইব্ন ওয়ালীদ হিম্স, জর্দান ও ফিলিস্তীনের বিদ্রোহ পুরোপুরি দমন করে উঠতে পারেন নি এমন সময় সংবাদ পান যে, মারওয়ান ইব্ন মুহাম্মদও বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। ইয়াযীদের জন্য এটি ছিল নিঃসন্দেহে একটি নাজুক মুহূর্ত। তিনি বায়আতের আহ্বান জানিয়ে মারওয়ানকে লিখেন, যদি তুমি আমার হাতে বায়আত কর তাহলে তোমাকে সমগ্র জাযীরা, আযারবায়জান, আর্মেনিয়া ও মাওসিল প্রদেশের শাসন কর্তৃত্ব প্রদান করা হবে। তখন মারওয়ান ইব্ন মুহাম্মদ ইয়াযীদের হাতে বায়আত করেন এবং ইয়াযীদ নিজের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাকে উপরোক্ত প্রদেশসমূহের গভর্নর নিয়োগ করেন। এভাবে রাস্তা থেকেই মারওয়ান ফিরে যান এবং উল্লিখিত প্রদেশসমূহ শাসন করতে থাকেন। পূর্বে তিনি শুধু আর্মেনিয়ার শাসনকর্তা ছিলেন। এবার মাওসিল পর্যন্ত সমগ্র এলাকা তার কর্তৃত্বাধীনে চলে আসে।

'ইয়াযীদুন্ নাকিস' খ্যাত ইয়াযীদ ইব্ন ওয়ালীদ আপন স্বভাব-চরিত্র ও যোগ্যতার দিক দিয়ে খারাপ ছিলেন না। তবে তাঁর আয়ু ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত। ১২৬ হিজরীর ২০ যিলহজ্জ (৭৪৪ খ্রি.-এর অক্টোবর) মাত্র ছয় মাসের মত খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত থাকার পর পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে তিনি প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান।

ইবরাহীম ইব্ন ওয়ালীদ ইব্ন আবদুল মালিক

'ইয়াযীদুন্ নাকিস'-এর মৃত্যুর পর তাঁর ওসীয়ত অনুযায়ী তাঁর ভাই আবূ ইসহাক ইবরাহীম ইব্ন ওয়ালীদ ইব্ন আবদুল মালিক খলীফা হন। ইবরাহীমের হাতে সাধারণভাবে বায়আত করা হয়নি। আর যারা বায়আত করেছিল তাদের মধ্যে কিছু লোক নিজ নিজ বায়আত প্রত্যাহার করে নেয়। আর্মেনিয়ার গভর্নর মারওয়ান ইব্ন মুহাম্মদ ইয়াযীদের মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে সেনাবাহিনী নিয়ে দামেশ্ক অভিমুখে রওয়ানা হন। প্রথমে তিনি কিন্নাসরীনে পৌঁছেন এবং তা জয় করে হিম্সের দিকে রওয়ানা হন। হিম্সবাসীরা ইবরাহীমের হাতে বায়আত করেনি। তাই আবদুল আযীয ইব্ন হাজ্জাজ ইব্ন আবদুল মালিকের নেতৃত্বে দামেশ্ক থেকে প্রেরিত ইবরাহীমের সেনাবাহিনী হিম্স অবরোধ করে রেখেছিল। যখন খবর পাওয়া গেল যে, মারওয়ান ইব্ন মুহাম্মদ ধারেকাছে এসে পৌঁছেছেন তখন আবদুল আযীয দামেশকের দিকে চলে যান। এরপর মারওয়ান হিম্সে পৌঁছলে সেখানকার লোকেরা বিনাদ্বিধায় তার হাতে বায়আত করে। ইবরাহীম এই সমস্ত বিষয়ে অধিনায়কত্বে এক লক্ষ বিশ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী মারওয়ানের মুকাবিলায় প্রেরণ করেন। মারওয়ানের কাছে মোট আশি হাজার সৈন্য ছিল। তিনি যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে এই মর্মে পয়গাম পাঠান : আমি ওয়ালীদ ইব্ন ইয়াযীদের রক্তের দাবি ত্যাগ করছি। তুমি তার দুই পুত্র হাকাম ও উসমানকে মুক্তি দাও, যাদেরকে ওয়ালীদ 'অলীআহদ' নিয়োগ করেছিলেন। সুলায়মান ইব্ন হিশাম সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ শুরু হয় এবং তাতে সুলায়মান পরাজিত হন। এই যুদ্ধে তার সতর হাজার সৈন্য নিহত হয়। এরপর মারওয়ান ওয়ালীদ ইব্ন ইয়াযীদের দুই পুত্র হাকাম ও উসমানের পক্ষে বায়আত গ্রহণ করে দামিশকের দিকে অগ্রসর হন। দামিশকে ইবরাহীম এবং তার উপদেষ্টারা পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত নেন যে, হাকাম এবং উসমান উভয়কেই হত্যা করে ফেলা উচিত। শেষ পর্যন্ত বন্দী অবস্থায়ই দু'জনকে হত্যা করা হয়। মারওয়ান বিজয়ী বেশে দামেশকে প্রবেশ করেন। অপর দিকে ইবরাহীম, সুলায়মান প্রমুখ দামেশক থেকে তাদাম্মুরের দিকে পালিয়ে যান। মারওয়ান হাকাম ও উসমানের লাশ দেখে অত্যন্ত ব্যথিত হন এবং জানাযার নামায পড়ে দাফনের ব্যবস্থা করেন। এরপর তিনি উপস্থিত জনতাকে প্রশ্ন করেন, এবার তোমরা কাকে নিজেদের খলীফা বানাতে চাও ? সকলেই সর্বসম্মতিক্রমে তাঁকে খলীফা মনোনীত করে এবং তাঁর হাতে বায়আত করে। এটা হচ্ছে হিজরী ১২৭ সনের ২৪শে সফর (৭৪৪ খ্রি.-এর ডিসেম্বর) রোজ সোমবারের ঘটনা। মারওয়ান ইবরাহীমকে নিরাপত্তা প্রদান করেন এবং ইবরাহীমও সন্তুষ্টচিত্তে মারওয়ানের পক্ষে নিজের খিলাফতের দাবি প্রত্যাহার করে নেন। ইবরাহীম ইব্ন ওয়ালীদের খিলাফত সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ তাঁকে খলীফা মনে করেন, আবার কেউ মনে করেন না। কেননা তাঁর খিলাফত সমগ্র ইসলামী বিশ্বে স্বীকৃতি লাভ করার পূর্বেই তিনি তা থেকে ইস্তফা দেন। আর তাঁকে খলীফা বলে সবাই স্বীকার করলেও তাঁর খিলাফতকাল মাত্র দু'মাস কয়েক দিনের বেশি ছিল না।

মারওয়ান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মারওয়ান ইবনুল হাকাম

মারওয়ান ইব্ন মুহাম্মদ হচ্ছেন উমাইয়া বংশের সর্বশেষ খলীফা। তাঁকে লোকেরা 'মারওয়ানুল হিমার' (গর্দভ মারওয়ান) নামে অভিহিত করত। ধৈর্যশীল প্রাণী হিসাবে আরবরা গাধার খুব প্রশংসা করত। এই প্রেক্ষিতে কষ্টসহিষ্ণু ব্যক্তিকে তারা কখনো কখনো 'গাধা' উপাধি দিত। মারওয়ানকে গাধা উপাধি দেওয়ার কারণ ছিল, তিনি তাঁর সমগ্র খিলাফতকাল যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্য দিয়েই অতিবাহিত করেন এবং বরাবরই ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দেন। তিনি তাঁর রাজধানী দামিশক থেকে হাররানে স্থানান্তরিত করেন। তাদাম্মুর থেকে তিনি ইবরাহীমকে (বরখাস্তকৃত খলীফাকে) নিজের কাছে ডেকে নিয়ে আসেন এবং তাঁর জন্য ভাতা নির্ধারণ করেন। ১লা শাওয়াল মারওয়ানের কাছে এই মর্মে একটি সংবাদ পৌঁছে যে, হিম্‌সবাসীরা ইতিমধ্যে পুরোপুরি প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে এবং শীঘ্রই বিদ্রোহ ঘোষণা করবে। তাছাড়া চতুর্দিক থেকে আরবের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরাও তাদের কাছে এসে সমবেত হয়েছে। তিনি এই সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে সেনাবাহিনী নিয়ে রওয়ানা হন এবং ৩০শে শাওয়াল হিম্‌সের নিকটে গিয়ে পৌঁছেন। সেখানে তিনি দেখতে পান যে, হিম্‌সবাসীরা শহরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। মারওয়ানের ঘোষক তাদের ডেকে বলে, তোমরা আমীরুল মু'মিনীনের বায়আত প্রত্যাহার করেছ কেন ? শহরবাসীরা উত্তর দেয়, আমরা বায়আত প্রত্যাহার করিনি, বরং আমীরুল মু'মিনীনের অনুগত রয়েছি এবং নিজেদের বায়আতের উপরও অটল আছি। এরপর তারা শহরের দরজা খুলে দেয়। কিন্তু মারওয়ানের সঙ্গীরা শহরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার সাথে সাথে শহরবাসী এবং তাদের বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। এই অবস্থা দেখে মারওয়ান শহরের দরজা ডিংগিয়ে বিরুদ্ধবাদীদের মুকাবিলা করেন এবং তাদেরকে পরাজিত ও পর্যুদস্ত করেন। এরপর আনুমানিক তিনশ' গজ পর্যন্ত শহর প্রাচীর ভেঙে দিয়ে তিনি শহরবাসীদের কাছ থেকে নিজের জন্য বায়আত গ্রহণ করেন।

মারওয়ান তখন হিম্‌সেই ছিলেন, এমন সময় সংবাদ পৌঁছে যে, গূতাবাসী ইয়াযীদ ইব্ন খালিদ কাসরীর নেতৃত্বে দামিশকের উপর হামলা করে সেখানকার শাসনকর্তাকে অবরোধ করে রেখেছে। তিনি দামিশকের শাসনকর্তার সাহায্যার্থে দশ হাজার সৈন্য প্রেরণ করেন। এরা দামিশকে পৌঁছে বাইরে থেকে এবং দামিশকবাসীরা ভিতর থেকে প্রতিপক্ষের মুকাবিলা করে। শেষ পর্যন্ত গূতাবাসীরা পরাজিত হয় এবং ইয়াযীদ ইব্ন খালিদ নিহত হন। তার দেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করে মারওয়ানের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এই ফিতনা প্রশমিত হতে না হতেই সাবিত ইব্ন কায়স ফিলিস্তীনবাসীদেরকে একত্র করে তাবারিয়া অবরোধ করেন। তখন তাবারিয়ার শাসনকর্তা ছিলেন ওয়ালীদ ইব্ন মুআবিয়া ইব্ন মারওয়ান ইব্নুল হাকাম। মারওয়ান ইব্ন মুহাম্মদ এই সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে ঐ বিদ্রোহ দমনের জন্য সেনাপতি আবুল ওয়ারদকে প্রেরণ করেন। আবুল ওয়ারদ সেখানে পৌঁছতেই তাবারিয়াবাসীরা শহর থেকে বের হয়ে অবরোধকারীদের মুকাবিলা করে। শেষ পর্যন্ত ফিলিস্তীনবাসীরা শোচনীয় পরাজয়বরণ করে। আবুল ওয়ারদ সাবিত ইব্ন নাঈমের তিন পুত্রকে বন্দী করে মারওয়ানের কাছে পাঠিয়ে দেন। মারওয়ান হাসান ইব্ন আবদুল আযীয কেনানীকে ফিলিস্তীনের শাসনকর্তা

নিয়োগ করেন। তিনি হাসান ইব্‌ন সাবিতকে খুঁজে বের করেন এবং গ্রেফতার করে মারওয়ানের কাছে পাঠিয়ে দেন। মারওয়ান সাবিত এবং তার তিন পুত্রের হাত-পা কেটে তাদেরকে শূলে চড়িয়ে দেন। এই সমস্ত কাজ শেষ করে তিনি 'দায়রে আইয়ুব' নামক স্থানে আপন দুই পুত্র আবদুল্লাহ্ ও উবায়দুল্লাহর অলীআহ্‌দীর বায়আত নেন এবং তাদের সাথে হিশামের দুই মেয়ের বিবাহ দেন। এরপর তিনি তাদাম্মুরের দিকে সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। কেননা তখন পর্যন্ত তাদাম্মুরবাসীরা তাদের স্বাধীনতার দাবির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। শেষ পর্যন্ত তাদেরকে মারওয়ানের হাতে বায়আত করতে বাধ্য করা হয়।

এরপর তিনি খারিজী নেতা দাহ্‌হাক শায়বানীকে দমনের জন্য ইয়াযীদ ইব্‌ন হুবায়রাকে ইরাকের দিকে প্রেরণ করেন। কেননা শায়বানী কূফায় নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে দামেশকের জন্য এক মারাত্মক হুমকির সৃষ্টি করেছিলেন। মারওয়ান ইয়াযীদ ইব্‌ন হুবায়রাকে নির্দেশ দেন ঃ তুমি শায়বানীকে অবিলম্বে কূফা থেকে বের করে দাও। এরপর তিনি হুবায়রার জন্য সাহায্যকারী বাহিনী পাঠাবার উদ্দেশ্যে খোদ কিরকিসায় তাকে বিদ্রোহ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু হারস তার সংকল্পে ছিলেন অটল। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মার্ভ শহরের অলিতে-গলিতে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। এদিকে কিরমানীও কিরমানে যথেষ্ট শক্তি অর্জন করেছিলেন। নাসর ইব্‌ন সাইয়ার কিরমানীকে তার কাছে আসার আহ্বান জানান। কিন্তু তার অন্তর পরিষ্কার না থাকায় তিনিও প্রকাশ্য বিরোধিতার পথ বেছে নেন। মোটকথা, মার্ভে কিরমানী, হারস ও নাসর– এই তিন ব্যক্তি একত্রিত হন। তিনজনই সমান ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন এবং পৃথক পৃথক লক্ষ্য সামনে রেখে কাজ করে যাচ্ছিলেন। তারা একে অপরের সহযোগী বা সমব্যথী ছিলেন না। শেষ পর্যন্ত হারস ও কিরমানী একজোট হয়ে নাসর ইব্‌ন সাইয়ারকে লাঞ্ছিত করে মার্ভ থেকে বের করে দেন। এরপর একে অন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হন। এই যুদ্ধে হারস ইব্‌ন শুরায়হ নিহত হন। এরপর নাসর তার বাহিনীকে সংগঠিত করে ক্রমান্বয়ে কিরমানীর মুকাবিলায় পাঠাতে থাকেন। অনেকগুলো যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং প্রায় প্রত্যেক যুদ্ধে নাসরের অধিনায়করা কিরমানীর কাছে পরাজিত হন। শেষ পর্যন্ত নাসর ইব্‌ন সাইয়ার একটি বিরাট বাহিনী নিয়ে স্বয়ং মার্ভে গিয়ে পৌঁছেন। উভয় বাহিনী সুবিধামত জায়গায় অবস্থান নেয় এবং একটির পর একটি যুদ্ধ সংঘটিত হতে থাকে। কোন পক্ষই জয়ী বা পরাজিত হয়নি– এমনি পরিস্থিতিতে সুযোগ সন্ধানী আবূ মুসলিম খুরাসানী (পরে তার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে) একদিকে নাসরের সাথে পত্রালাপ শুরু করেন এবং অন্যদিকে কিরমানীকেও লিখেন ঃ ইমাম ইবরাহীম তোমার সম্পর্কে আমার কাছে কিছু নির্দেশ পাঠিয়েছেন। আমি মনে করি, এর দ্বারা তোমার অনেক উপকার হবে। বিশ্বাস কর, আমি তোমার প্রতি খুবই সহানুভূতিশীল। ইমাম ইবরাহীম আমার কাছে নির্দেশ পাঠিয়েছেন, যেন আমি প্রয়োজনের সময় তোমার সাহায্যে এগিয়ে যাই। এই সব চিঠি যে সব দূতের মাধ্যমে তিনি প্রেরণ করতেন তাদেরকে নির্দেশ দিতেন, রাস্তায় যে সব গোত্র পড়ে তাদের মধ্যে যারা নাসরের প্রতি সহানুভূতিশীল, তাদেরকে নাসরের নামে লিখিত পত্রটি আর যারা কিরমানীর প্রতি সহানুভূতিশীল তাদেরকে কিরমানীর নামে লিখিত পত্রটি দেখাতে দেখাতে যাবে। লক্ষ্য ছিল, যেন এভাবে সব গোত্রেরই সহানুভূতি লাভ করা সম্ভব হয়। এভাবে

আবূ মুসলিম নানা কৌশল অবলম্বন করে খারিজীদের সমর্থন ও সহানুভূতি আদায় করতে সক্ষম হন। এরপর তিনি তার বাহিনী নিয়ে কিরমানী ও নাসর ইব্‌ন সাইয়ারের অবস্থান স্থলের ঠিক মধ্যখানে অবস্থান নেন। উভয় পক্ষের কেউই অনুমান করতে পারছিল না আবূ মুসলিম তাদের কার পক্ষ নেবে এবং কার বিরোধিতা করবে। এবার আবূ মুসলিম কিরমানীকে বলে পাঠান, আমি তোমাদের পক্ষ থেকে নাসরের মুকাবিলা করব। একথা শুনে কিরমানী খুবই আনন্দিত হন। নাসর এই সংবাদ পেয়ে কিরমানীকে লিখেন, আবূ মুসলিম প্রতারণা করে তোমার ক্ষতি করতে চাচ্ছে। অতএব তুমি তার প্রতারণায় পড়ো না বরং এই মুহূর্তে আমাদের উভয়ের উচিত, পারস্পরিক মতবিরোধ ভুলে যাওয়া। কিরমানী নাসরের এই অভিমত পছন্দ করেন এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, পরদিন তারা পরস্পরের সাথে মিলিত হবেন। কিরমানী দুশ লোক সঙ্গে নিয়ে নাসরের সাথে সাক্ষাত করার জন্য বের হন। এবার নাসরের লোকেরা সুযোগ পেয়ে কিরমানী এবং তার সঙ্গীদেরকে হত্যা করে ফেলে। কিরমানীর পুত্র আলী পলায়ন করে আবূ মুসলিমের কাছে আসেন। এবার কিরমানীর বাহিনী ও আবূ মুসলিমের বাহিনী একত্রে মিলে আবূ মুসলিম ও আলী ইব্‌ন কিরমানীর নেতৃত্বে নাসর ইব্‌ন সাইয়ারের উপর আক্রমণ পরিচালনা করে এবং তাতে নাসর ইব্‌ন সাইয়ার পরাজিত হন এবং পালিয়ে গিয়ে একটি সাধারণ লোকের ঘরে আশ্রয় নেন। আবূ মুসলিম ও আলী মার্ভ দখল করে নেন। এবার আলী ইবন কিরমানী আবূ মুসলিমের হাতে বায়আত করতে চাইলে তিনি বলেন, তুমি এখন যে অবস্থায় আছ সে অবস্থায়ই থাক। ইমামের কাছ থেকে নির্দেশ আসার পর যা সঙ্গত মনে হবে তাই করা যাবে। নাসর ইব্‌ন সাইয়ার মার্ভ থেকে বেরিয়ে গিয়ে পুনরায় সৈন্য সংগ্রহ করতে শুরু করেন। এদিকে আবূ মুসলিম খারিজীদের নেতা শায়বান খারিজীকেও আপন করে নেন। কেননা নাসর ইবন সাইয়ার খারিজীদের নেতাকে এই মর্মে একটি পয়গাম পাঠিয়ে আবূ মুসলিম থেকে পৃথক করে নিতে চাচ্ছিলেন যে, সে (আবূ মুসলিম) হচ্ছে শীআনে আলী। মোটকথা, আবূ মুসলিম থেকে কখনো শায়বান খারিজী পৃথক হয়ে গেছেন, আবার কখনো পৃথক হয়ে গেছেন ইব্‌ন কিরমানী। এই চার ব্যক্তি অর্থাৎ আবূ মুসলিম, শায়বান খারিজী, ইব্‌ন কিরমানী, নাসর ইব্‌ন সাইয়ার সমগ্র খুরাসান অঞ্চল ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। তারা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই একে অপরের সাথে সম্পর্ক জুড়ে নিতেন, আবার মুহূর্তের মধ্যেই একে অন্য থেকে পৃথক হয়ে যেতেন। এই চার ব্যক্তির মধ্যে নাসর ইব্‌ন সাইয়ার এবং আবূ মুসলিম খুরাসানী ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ ও দূরদর্শী। যার ফলে আবূ মুসলিম খুরাসানী সুযোগ বুঝে একের পর এক শায়বান খারিজী এবং ইব্‌ন কিরমানীকে হিজরী ১৩০ সনে (৭৪৮ খ্রি.) হত্যা করেন এবং হিজরী ১৩১ সনে (৭৪৮-৪৯ খ্রি.) নাসর ইব্‌ন সাইয়ার রোগাক্রান্ত হয়ে 'রায়'-এর নিকটবর্তী একটি স্থানে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেন। শেষ পর্যন্ত সমগ্র খুরাসানে আবূ মুসলিমের কোন প্রতিদ্বন্দ্বীই আর অবশিষ্ট ছিল না।

খারিজী সম্প্রদায়

খুরাসানের অবস্থা সম্পর্কে ইতিপূর্বে সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, খারিজীরা ইসলামী রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে গৃহযুদ্ধ এবং অন্যান্য অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলা লক্ষ্য করে

বিদ্রোহ ঘোষণার প্রয়াস পায়। খুরাসানের খারিজীরা একজোট হয়ে দাহ্‌হাক ইব্‌ন কায়স শায়বানীকে তাদের নেতা মনোনীত করে। দাহ্‌হাক কূফার উপর হামলা চালিয়ে তা দখল করে নেন। ফলে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন আব্দুল আযীযকে কূফা ছেড়ে ওয়াসিতে চলে আসতে হয়। সুলায়মান ইব্‌ন হিশাম মারওয়ান ইব্‌ন মুহাম্মদের কাছে পরাজিত হয়ে দাহ্‌হাকের সাথে এসে মিলিত হন। এভাবে তার ক্ষমতা আরো বেড়ে যায় এবং তিনি মাওসিলের উপর চড়াও হন। মারওয়ান ইব্‌ন মুহাম্মদের পুত্র আবদুল্লাহ্ তার মুকাবিলা করেন। কিন্তু তার সাথে ছিল মাত্র সাত হাজার সৈন্য এবং দাহ্‌হাকের সাথে ছিল প্রায় এক লক্ষ সৈন্য। দাহ্‌হাক আবদুল্লাহকে অবরোধ করে ফেলেন।

মারওয়ান ইব্‌ন মুহাম্মদ এই খবর শুনে বিষয়টির উপর খুব গুরুত্ব দেন। উভয়ের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ হয় এবং তাতে দাহ্‌হাক নিহত হন। এবার খারিজীরা সাঈদ ইব্‌ন বাহদালকে নিজেদের নেতা মনোনীত করে। তিনিও নিহত হন। এরপর শায়বান ইব্‌ন আবদুল আযীয খারিজীদের নেতা মনোনীত হন। মারওয়ান ইয়াযীদ ইব্‌ন হুবায়রাকে কূফায় প্রেরণ করেন। তিনি সেখান থেকে খারিজীদের বের করে দেন। এদিকে শায়বান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ সমগ্র খারিজীদের নিয়ে পারস্যে চলে যান। সেখানে পৌঁছে তিনি আবূ মুসলিমের সাথে যোগ দেন, যেমন উপরে বর্ণিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত ১৩০ হিজরীতে (৭৪৭-৪৮ খ্রি.) আবূ মুসলিম নিহত হন।

হিজায, ইয়ামান এবং হাদরামাওতেও বিদ্রোহ দেখা দেয়। আবূ হামযা মুখতার ইব্‌ন আওফ আযদী বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। হাদরামাওতের রঈস (গোত্র প্রধান) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়াও তার সাথে যোগ দেন। আবূ হামযা প্রথমে মদীনা দখল করেন। এরপর সিরিয়ার দিকে অগ্রসর হন। মারওয়ান ইব্‌ন মুহাম্মদ, ইব্‌ন আতিয়া সা'দীকে তার মুকাবিলায় প্রেরণ করেন। ওয়াদিল কুরায় যুদ্ধ হয়। তাতে আবূ হামযা নিহত হন। এরপর ইব্‌ন আতিয়া ইয়ামানের দিকে অগ্রসর হন। সেখানে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া তার মুকাবিলার জন্য তৈরি ছিলেন। উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ হয়। তাতে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া নিহত হন। ইব্‌ন আতিয়া তার দেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করে মারওয়ানের কাছে পাঠিয়ে দেন।

যখন মারওয়ান ইব্‌ন মুহাম্মদ মাওসিলের সন্নিকটে দাহ্‌হাকের সাথে যুদ্ধরত ছিলেন তখন ইমাম ইবরাহীমের লেখা একটি চিঠি, যা আবূ মুসলিম খুরাসানীর নামে লেখা হয়েছিল, ধরা পড়ে এবং তার সামনে পেশ করা হয়। ঐ চিঠিতে ইমাম ইবরাহীম আবূ মুসলিমকে কতিপয় নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাতে এও লেখা ছিল, খুরাসানে কোন আরব বংশোদ্ভূত বা আরব লোককে জীবিত রাখবে না। খুরাসানের মূল মুসলিম বাসিন্দারা আমাদের অনেক কাজে আসবে। অতএব তাদের উপরই অধিকতর আস্থা রাখা উচিত। ঐ চিঠি থেকে এ রহস্যও উদ্‌ঘাটিত হয় যে, আব্বাসীয়রা উমাইয়াদের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন থেকে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে চলেছে। আর ইমাম ইবরাহীম হচ্ছেন এই ষড়যন্ত্রের হোতা এবং তিনি বালকা এলাকার হামীমা নামক স্থানে বসবাস করছেন।

মারওয়ান ইব্‌ন মুহাম্মদ এই চিঠি পড়ে বালকায় নিযুক্ত আপন কর্মকর্তাকে লিখেন, ইবরাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদকে হামীমা থেকে গ্রেফতার করে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। অতএব ইবরাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ এবং তার পরিবারের আরো কিছু লোককে বন্দীদের করে মারওয়ানের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। মারওয়ান তাদেরকে হাররান নামক স্থানে বন্দী করে রাখেন। ইমাম ইবরাহীমের সাথে সাঈদ ইব্‌ন হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিক, তার দুই পুত্র উসমান ও মারওয়ান, আব্বাস ইব্‌ন ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুল মালিক, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয এবং মুহাম্মদ সাইয়ানীকেও বন্দী করা হয়েছিল। কিছুদিন পর হাররানে মহামারী দেখা দেয় এবং তাতে বন্দী অবস্থায়ই ইমাম ইবরাহীম, আব্বাস ইব্‌ন ওয়ালীদ এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয মৃত্যুবরণ করেন।

সাঈদ ইব্‌ন হিশাম অন্যান্য কয়েদীকে সাথে নিয়ে জেলখানার দারোগাকে হত্যা করেন এবং জেলখানা ভেঙে পালিয়ে যান। হাররানবাসীরা এই পলায়নপর বন্দীদের পাকড়াও করে হত্যা করে। শুধু আবূ মুহাম্মদ সুফ্য়ানী কয়েদখানা থেকে বের হননি। তাকে মারওয়ান ইব্‌ন মুহাম্মদ পরাজিত অবস্থায় ফিরে এসে মুক্ত করেন। ইমাম ইবরাহীম আপন বন্দীত্বের মুহূর্তে ওসীয়ত করেছিলেন ঃ আমার পরে আমার স্থলাভিষিক্ত হবে আমার ভাই আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ ওরফে আবুল আব্বাস সাফ্ফাহ। সেই সাথে তিনি এই ওসীয়তও করেছিলেন ঃ এখন আবুল আব্বাস সাফ্ফাহের বালকা এলাকায় নয়, বরং কূফায় এসে যেন বসবাস করতে থাকেন। ইমাম ইবরাহীম বন্দী হওয়ার পূর্বে আবুল আব্বাসকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, 'তুমি আবূ মুসলিম খুরাসানীকে আপন অধিনায়ক মেনে নিয়ে তার হুকুম পালন করবে। এরপর তিনি কাহ্তাবা ইব্‌ন শাবীবকে একটি কৃষ্ণ পতাকা দিয়ে আবূ মুসলিমের কাছে এই বলে পাঠিয়েছিলেন, 'তুমি এই পতাকা উর্ধ্বে তুলে ধরে খুরাসানে বিদ্রোহ ঘোষণা কর, তারপর এলাকার পর এলাকা জয় করে এগিয়ে যাও।'

আবূ মুসলিম হিজরী ১৩০ থেকে ১৩১ হিজরী (৭৪৭ থেকে ৭৪৮ খ্রি) পর্যন্ত সমগ্র খুরাসান প্রদেশ দখল করে নেন। এরপর কাহতাবাকে কূফা দখলের জন্য প্রেরণ করেন। এই সংবাদ শুনে মারওয়ান এক লক্ষ বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে হার্‌রান থেকে কূফা অভিমুখে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে যাব নদীর তীরে সাফ্ফাহের বাহিনীর সাথে– যার অধিনায়ক ছিলেন সাফ্ফাহ্র চাচা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আলী, তার মুকাবিলা হয়। মারওয়ানের বাহিনী ঠিক মত যুদ্ধ করলে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আলীর বাহিনীকে অতি সহজেই পরাস্ত করতে পারত। কিন্তু মারওয়ান যেই মুহূর্তে আবদুল্লাহ্র বাহিনীর বেশির ভাগ সৈন্যকে পরাজিত করে তাড়িয়ে দিচ্ছিলেন এবং তার বিজয় লাভের পথে কোন প্রতিবন্ধকতাই বাকি ছিল না তখন তার বাহিনীর বেশির ভাগ সৈন্য যুদ্ধ করতে অস্বীকার করে যেন মারওয়ানকে পরাজিত করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আলী নিজেকে পরাজিত দেখে নিজের বিশিষ্ট সঙ্গীদের নিয়ে প্রতিপক্ষের উপর মরণপণ হামলা চালান। কিন্তু তা প্রতিরোধের জন্য মারওয়ানের পক্ষ থেকে কোন সেনানায়ক এগিয়ে আসেননি। মারওয়ান তাদেরকে সম্মান ও প্রতিপত্তির লোভ দেখান, কিন্তু

তাতেও কোন কাজ হয়নি। তারপর যে অর্থভাণ্ডার তার সাথে ছিল তা মাঠের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে বলেন, আক্রমণ চালাও এবং দুর্বল শত্রুকে পরাজিত করে অর্থ ভাণ্ডার নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নাও। এতে সৈন্যরা ভাণ্ডার লুণ্ঠনে ব্যাপৃত হয়ে পড়ে। যারা তখন পর্যন্ত লড়ছিল তারাও লড়াই ছেড়ে দিয়ে অর্থ ভাণ্ডারের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। এই বিশৃঙ্খলা লক্ষ্য করে মারওয়ান নিজ পুত্র আবদুল্লাহকে বলেন, তুমি এগিয়ে গিয়ে লোকদেরকে এই বিশৃঙ্খলা নিরস্ত কর। আবদুল্লাহ্ সেখানে পৌঁছতেই সব লোক যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালাতে থাকে। শেষ পর্যন্ত মারওয়ান তার বাহিনীর এই বিশ্বাসঘাতকতার কারণে নিজেও বাধ্য হয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পালিয়ে মাওসিলে চলে যান, কিন্তু সেখানে অবস্থান করা সুবিধাজনক মনে না হওয়ায় হার্‌রানের দিকে চলে আসেন। হার্‌রানের শাসনকর্তা ছিলেন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র আবান ইব্‌ন ইয়াযীদ। মারওয়ান যাব নদীর তীরে ১৩১ হিজরীর ১১ই জমাদিউস্ সানী (৭৪৮ খ্রি.-এর ফেব্রুয়ারী) শনিবার দিন পরাজয়বরণ করেছিলেন।

তিনি হার্‌রানে এসে মাত্র বিশ দিন অবস্থান করার পর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আলীর আগমন-সংবাদ পান। আবদুল্লাহ্ হার্‌রানের সন্নিকটে পৌঁছলে তথাকার শাসনকর্তা আবান কালো কাপড় পরে এবং কালো ঝাণ্ডা নিয়ে তাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের জন্য বের হন এবং তার হাতে সাফ্‌ফাহ্‌র জন্য খিলাফতের বায়আত করেন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আলী তাকে নিরাপত্তা প্রদান করেন। মারওয়ান হিম্‌সে গিয়ে পৌঁছলে সেখানকার লোকেরা প্রথম প্রথম তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করলেও তাঁর সঙ্গী-সাথীর সংখ্যা খুবই কম দেখে তারা শুধু তাঁর অবাধ্যই হয়নি, বরং তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধেরও প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। অতএব মারওয়ান তিনদিন পরই সেখান থেকে চলে যান। কিন্তু হিম্‌সবাসীরা তাঁর ধন-সম্পদ লুট করার সংকল্প নেয়। তিনি প্রথমে তাদেরকে বুঝান। তাতে কাজ না হলে তিনি আক্রমণ করে তাদেরকে উড়িয়ে দেন।

মারওয়ান হিম্‌স থেকে দামিশকে গিয়ে পৌঁছেন। সেখানকার কর্মকর্তা ছিলেন তাঁর চাচাত ভাই ওয়ালীদ ইব্‌ন মুআবিয়া ইব্‌ন মারওয়ান। সেখানেও অবস্থান করা সুবিধাজনক মনে না হওয়ায় তিনি ওয়ালীদকে উমাইয়া বংশের বিরুদ্ধবাদীদের মুকাবিলা করার অনুপ্রেরণা দিয়ে ফিলিস্তীনের দিকে চলে যান এবং সেখানে নির্জন ও গণসম্পর্কহীন জীবন যাপনের ইচ্ছা নিয়ে কোন এক জায়গায় তাঁবু স্থাপন করেন।

এদিকে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আলী হার্‌রানের সেই কয়েদখানা ধ্বংস করে ফেলেন, যেখানে ইবরাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। এরপর তিনি দামিশকের দিকে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে আপন ভাই আবদুস সামাদের সাথে তার সাক্ষাত হয়। সাফ্‌ফাহ্ তাকে আট হাজার সৈন্যসহ আবদুল্লাহ্‌রই সাহায্যার্থে পাঠিয়েছিলেন। এরপর আবদুল্লাহ্ ইবন আলী কিন্‌নাসরীন ও বালাবাক হয়ে জনসাধারণের কাছ থেকে বায়আত নিতে নিতে দামিশকে এসে পৌঁছেন। তিনি দামিশক অবরোধ করেন। এরপর ১৩২ হিজরীর ৫ই রমযান (৭৫০ খ্রি-এর এপ্রিল) বুধবার তরবারির জোরে দামিশকের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন এবং রক্তবন্যায় দামিশকের অলিগলি ভাসিয়ে দেন। ঐ সংঘর্ষে দামিশকের শাসনকর্তা ওয়ালীদ ইব্‌ন মুআবিয়া

নিহত হন। এই বিজয় ও পাইকারী হত্যার পর আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলী পনের দিন দামিশকে অবস্থান করেন। এরপর ফিলিস্তীন অভিমুখে রওয়ানা হন। তিনি নিজ বাহিনী নিয়ে সবেমাত্র ফিলিস্তীন সীমান্তে পৌঁছেছেন এমন সময় তার কাছে আবদুল্লাহ্ সাফ্ফাহ্র এই মর্মে একটি ফরমান পৌঁছে ঃ তুমি তোমার ভাই সালিহ্কে মারওয়ানের পশ্চাদ্ধাবনে নিয়োজিত কর। এই ফরমান ১৩২ হিজরীর যিলকদ (৭৫০ খ্রির জুন) মাসে এসে পৌঁছে। সালিহ্ ইব্ন আলী সংবাদ পেয়ে ফিলিস্তীন থেকে আরীশে চলে যান। সেখান থেকে পুনরায় নীল নদ হয়ে সাঈদের দিকে যাত্রা করেন। সালিহ্ ইব্ন আলী সামনে অগ্রসর হয়ে ফুসতাতে গিয়ে অবস্থান নেন এবং মারওয়ানের পশ্চাদ্ধাবন ও তাঁকে খুঁজে বের করার জন্য বিভিন্ন দিকে খণ্ডবাহিনী প্রেরণ করেন। ঘটনাচক্রে মারওয়ানের অশ্বারোহীরা সালিহের বাহিনীর মুখোমুখি হয়ে পড়ে।

মারওয়ানের অশ্বারোহীরা প্রথম থেকেই নিরাশ ও মনঃক্ষুণ্ন ছিল। তারা সালিহের বাহিনীর সাথে মুকাবিলা না করে পালিয়ে যায়। তাদের কয়েকজনকে বন্দী করা হয়। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা যায় যে, মারওয়ান বূসীরে অবস্থান করছেন। সালিহ্র বাহিনীর অধিনায়ক আবূ আওন রাতের বেলা মারওয়ানের উপর হামলা পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেন। কেননা তিনি জানতেন তাঁর সাথে প্রকাশ্যে মুকাবিলা করা সহজ নয়। যাহোক, মারওয়ানের উপর অতর্কিত হামলা চালানো হয়। তিনি ভয় পেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন। প্রথম থেকেই এই সুযোগের অপেক্ষারত জনৈক ব্যক্তি তাঁর উপর বর্শা নিক্ষেপ করে। এতে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। তখন তাঁর জনৈক সঙ্গী চিৎকার দিয়ে বলে উঠে, হায় হায়! আমাদের আমীরুল মু'মিনীন নিহত হয়েছেন। তখন আবূ আওন ও তার সঙ্গীরা সেদিকে দ্রুত ছুটে যান এবং মারওয়ানের দেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করে তা আবূ আবদুল্লাহ্ সাফফাহ্র কাছে পাঠিয়ে দেন।

এই ঘটনা ২৮শে যিলহজ্জ, ১৩২ হিজরী (৫ই আগস্ট, ৭৫০ খ্রি) সংঘটিত হয়। এখান থেকেই খিলাফতে বনূ উমাইয়ার পরিসমাপ্তি এবং খিলাফতে বনূ আব্বাসের সূচনা। মারওয়ানের নিহত হওয়ার পর তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ্ ও উবায়দুল্লাহ্ আবিসিনিয়ায় পালিয়ে যান। আবিসিনীয়রা তাদেরকে নিরাপত্তা দান করেনি। উবায়দুল্লাহ্ আবিসিনীয়দের হাতেই নিহত হন এবং আবদুল্লাহ্ ফিলিস্তীন গিয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে বসবাস করতে থাকেন। এরপর মাহ্দীর খিলাফত আমলে ফিলিস্তীনের শাসনকর্তা তাকে গ্রেফতার করে মাহ্দীর কাছে পাঠিয়ে দেন এবং তিনি তাকে বন্দী করে রাখেন।

মারওয়ান ইব্ন মুহাম্মদের খিলাফত আমল

যেহেতু মারওয়ান ইব্ন মুহাম্মদ হচ্ছেন উমাইয়া বংশের সর্বশেষ খলীফা, তাই সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, তিনিই খিলাফতে বনূ উমাইয়ার ধ্বংস ও পতনের জন্য মূলত দায়ী। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, বনূ উমাইয়ার ধ্বংসের যাবতীয় উপাদান, তার খিলাফতের পূর্বেই, অন্যান্য খলীফার আলস্য ও অসতর্কতার কারণে সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। মারওয়ান মোটামুটি ছয় বছর খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে একটি দিনও তিনি বিশ্রাম গ্রহণের সুযোগ পাননি।

তিনি তার সমগ্র খিলাফত আমল ঘোড়ার পিঠেই কাটান। তাঁর উদ্দীপনা, বীরত্ব ও দৃঢ় মনোবলের পরিমাপ করা সম্ভব হয়নি এজন্য যে, তাঁর হাতে এমন একটি সাম্রাজ্য অর্পিত হয়েছিল যা ছিল দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত। তিনি আরো কিছুদিন পূর্বে খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হতে পারলে নিশ্চিতভাবে উমাইয়া সাম্রাজ্যের পতনকে আরো বেশ কিছুদিন হয়ত ঠেকিয়ে রাখতে পারতেন। কিন্তু তিনি সমকালীন গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা এবং আব্বাসীয়দের ষড়যন্ত্রসমূহ কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। মারওয়ান এমন কোন অসাধারণ বিচক্ষণ বা বুদ্ধিমান ছিলেন না যে, মৃতপ্রায় একটি সাম্রাজ্যকে সঞ্জীবিত করে তুলতে সক্ষম হবেন। তাছাড়া তাঁর গোটা শাসনকাল যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যেই কাটে। তখন মুসলিম বিশ্বের সর্বত্রই চলছিল বিশৃঙ্খলা ও সংঘর্ষ; কোথাও শান্তি বা স্বস্তি ছিল না। কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার তো কোন সুযোগই ছিল না। এই যুগে মুসলমানদের হাতে খোদ মুসলমানদের যে রক্ত ঝরেছে, মুসলিম বিশ্বের ইতিহাসে তার তুলনা মেলা ভার।

মারওয়ান ৭০ অথবা ৭২ হিজরীতে (৬৮৯ অথবা ৬৯১ খ্রি) জন্মগ্রহণ করেন। তখন তাঁর পিতা মুহাম্মদ ইব্‌ন মারওয়ান ছিলেন জাযীরার গভর্নর। তাঁর মা ছিলেন কুর্দিস্তানের একজন ক্রীতদাসী। তাঁর প্রথম মালিক ছিলেন ইবরাহীম আশতার। ইবরাহীম আশতার নিহত হওয়ার পর মুহাম্মদ ইব্‌ন মারওয়ান তার মালিক হন। আর তারই গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন উমাইয়া বংশের শেষ খলীফা মারওয়ান।

একনজরে বনূ উমাইয়ার খিলাফত

১. হযরত উসমান (রা)-এর খিলাফতের শেষার্ধ থেকে যে গোপন অভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্র ও সংঘাতের সূচনা হয় তার প্রথম অংকের যবনিকাপাত হয় আমীরে মুআবিয়া (রা)-এর খলীফা এবং উমাইয়া বংশের খিলাফতের ভিত্তি স্থাপনের মাধ্যমে। খিলাফতে বনূ উমাইয়া প্রথম স্তরেই এর পতনের এবং মুসলিম জাহানের দুর্ভাগ্যের ধ্বংসাত্মক বীজ-এর প্রতিষ্ঠাতা হযরত মুআবিয়া (রা) বপন করেন নিজ পুত্র ইয়াযীদ-এর অলীআহ্‌দ নিয়োগের মাধ্যমে। সেই অলীআহদীর মহামারীর যে সূচনা হলো তা আজ পর্যন্তও মুসলমানদের পিছু ছাড়েনি। আমীরে মুআবিয়ার কারণেই, ইসলাম মানবজাতির সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের জন্য গণতন্ত্রের যে রীতি প্রবর্তন করেছিল তা বিলুপ্ত হয়ে তার স্থলে বংশগত রাজতন্ত্রের সেই অভিশপ্ত রীতি পুনঃপ্রবর্তিত হয়, ইসলামের হাতে যার সার্থক বিলুপ্তি ঘটেছিল। উমাইয়া বংশের মধ্যে আমীরে মুআবিয়া, আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান, ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুল মালিক– এই তিনজন খলীফা দেশ জয় ও প্রশাসনিক যোগ্যতার ক্ষেত্রে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁদের পর হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) ছিলেন উমাইয়া বংশের একজন অনন্য ব্যতিক্রমধর্মী খলীফা। তাঁর খিলাফত-আমল ছিল খিলাফতে রাশিদার প্রথমাংশের অবিকল প্রতিচ্ছবি। উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের মধ্যে ছিল ধর্মপ্রবণতা, ছিল পার্থিব অনাসক্তি। তাই বনূ উমাইয়ার দুনিয়াদার খলীফাদের সাথে তাঁর কোন তুলনাই চলে না। যদিও তাঁর খিলাফতকাল ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত, কিন্তু তাতে ঘটেছিল ন্যায়বিচার ও ইসলামী আদর্শের প্রতিফলন। তাঁর শাসনামল শুধু নিজেকে নয়, বরং বলতে

গেলে গোটা উমাইয়া আমলকে গৌরবান্বিত করে রেখেছে। তাঁর পরে হিশাম ইব্ন আবদুল মালিকও এমন একজন খলীফা ছিলেন যাকে প্রথমোক্ত তিনজন খলীফার তালিকায় স্থান দেওয়া যেতে পারে। হিশামের পর দশ বছরও অতিবাহিত না হতেই খিলাফতে বনূ উমাইয়ার বিরাট প্রাসাদ বিধ্বস্ত হয়ে একেবারে মাটির সাথে মিশে যায়। এরপর তার ভিত্তিসমূহও উপড়ে ফেলা হয়। উপরে যে পাঁচজন খলীফার নাম উল্লেখ করা হয়েছে তাঁদের ছাড়া বাকি সকলেই ছিলেন আরামপ্রিয়, কাপুরুষ এবং অদূরদর্শী। ইসলাম যে মদ্যপান ও গানবাদ্যের মূলোৎপাটন করেছিল; বনূ উমাইয়ার খলীফারা সেই অপবিত্র ও ক্ষতিকর বস্তুর পুনঃপ্রচলন করেন যা আজ পর্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে।

২. বনূ উমাইয়ার অপরাধ-তালিকায় এ অপরাধটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, ইসলাম জাতি, বংশ ও গোত্রের মধ্যকার ভেদ-বৈষম্য দূর করে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিশ্বের সমগ্র সম্প্রদায়কে একই সম্প্রদায়ে পরিণত করে। আর বনূ উমাইয়ারা সেই সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বিলোপ সাধন করে পুনরায় জাহিলী যুগের সেই নীতিকে পুনরুজ্জীবিত করে। ফলে মুসলমানরা গোত্রগত সম্পর্ককে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের উপর প্রাধান্য দিতে থাকে। বনূ উমাইয়ারা গোত্রগত পক্ষপাতিত্বের যে বিষবৃক্ষ রোপণ করেছিল তার ফল শেষ পর্যন্ত তাদেরকেই ভোগ করতে হয়। আর এটাই হয় তাদের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ। কেননা আলাভী ও আব্বাসীরা এই বংশগত বা গোত্রগত পক্ষপাতিত্বকে ভিত্তি করেই বনূ উমাইয়ার ধ্বংস সাধনে আত্মনিয়োগ করে।

৩. বনূ উমাইয়ারা নিজেদের রাজত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য মানুষকে জুলুম-নির্যাতন বা হত্যা করতে মোটেও দ্বিধা করত না। বনূ উমাইয়ার শাসকগণের সব চাইতে প্রশংসাভাজন গভর্নর তারাই হতেন যারা মানুষকে অনায়াসে হত্যা করতে বা তাদের উপর অকথ্য জুলুম-নির্যাতন চালাতে পারতেন। অবশ্য নিজেদের হুকুমত টিকিয়ে রাখার জন্য বনূ উমাইয়াকে বাধ্য হয়ে এধরনের জুলুম-নির্যাতন চালাতে হয়েছিল; কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই কর্মধারাই তাদের ধ্বংসের কারণে পরিণত হয়। কেননা অনবরত ভয়ভীতির মধ্যে বসবাস করার দরুন শেষ পর্যন্ত সাধারণ মানুষের অন্তরে তাদের প্রতি কোন প্রকার সহানুভূতি ও ভালবাসা আর অবশিষ্ট ছিল না।

৪. এতে কোন সন্দেহ নেই যে, বনূ উমাইয়া ছিল কুরায়শ ও আরবের গোত্রসমূহের মধ্যে একটি বিখ্যাত ও নেতৃস্থানীয় গোত্র। এই গোত্রে বেশির ভাগ সময় এমন সব ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করতে থাকেন, যাঁরা বুদ্ধি-বিবেচনা ও দূরদর্শিতার দিক দিয়ে সমকালীন লোকদের চাইতে অগ্রণী এবং হুকুমত ও রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে অধিকতর দক্ষতার অধিকারী ছিলেন। এই গোত্রটি জাহিলী যুগেও এই সব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল। কিন্তু তার অর্থ তো এই নয় যে, উমাইয়া গোত্রে কোন অযোগ্য লোক জন্মগ্রহণ করতেই পারে না। যদি উমাইয়া গোত্রে অলীআহ্‌দীর রীতি প্রচলিত না হতো এবং খলীফা নির্বাচন শুধু উমাইয়া গোত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত, অর্থাৎ মুসলমানরা নিজেদের সম্মতি ও সংখ্যাগরিষ্ঠতা দ্বারা উমাইয়া গোত্রের কোন যোগ্যতম ব্যক্তিকে খলীফা পদের জন্য নির্বাচন করত (যদিও এই নীতি অন্যায় ও

অবিচারমূলক) তাহলেও খিলাফতে বনূ উমাইয়ার এই করুণ পরিণতি হতো না এবং মুসলিম বিশ্বকেও এত বড় ক্ষতির সম্মুখীন হতে হতো না। অনুরূপ ব্যবস্থা গৃহীত হলে সম্ভবত খিলাফতে বনূ উমাইয়ার আয়ূ আরো দীর্ঘ হতো এবং তাদের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ উত্থাপন করা হয় তা আদৌ উত্থাপিত হতো না।

৫. গোপন চেষ্টা-তদবীর, ষড়যন্ত্র এবং চালাকি-চাতুর্যের ক্ষেত্রে বনূ উমাইয়া ছিল আরবের অন্যান্য গোত্রের চাইতে বিশেষ দক্ষতার অধিকারী। এই সব জিনিসের সাহায্যেই তারা নিজেদের খিলাফত প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, হাশিমীরাও ঐ সমস্ত জিনিসের মাধ্যমেই তাদের পরাজিত ও পর্যুদস্ত করে। অথচ এই সব ব্যাপারে হাশিমীরা ছিল তাদের শিষ্যতুল্য। এর একমাত্র কারণ এই ছিল যে, ধন-দৌলত ও হুকুমতের নেশা তাদেরকে মূর্খ ও উদাসীন করে তুলেছিল এবং অলীআহ্‌দীর কুরীতি সেই মূর্খতা ও উদাসীনতাকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল।

৬. উপরোক্ত বিষয়াদি ছাড়াও বনূ উমাইয়া খিলাফতের মধ্যে এমন অনেক সৌন্দর্য ছিল যা তাদের পরবর্তী যুগে খুব কমই পরিলক্ষিত হয়েছে। যেমন, খিলাফতে বনূ উমাইয়া খিলাফতে রাশিদার বিজয় অভিযানকে আরো ব্যাপক ও বিস্তৃত করে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দূর-দূরান্তে বিজয় পতাকা উড্ডীন করে। পূর্বে চীন এবং পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ড তাদের সময়েই বিজিত হয়। তাদেরই যুগে দূর সমুদ্রের দ্বীপসমূহে, আফ্রিকা মহাদেশের মরু এলাকায় এবং হিন্দুস্তানের প্রত্যন্ত এলাকায় ইসলাম বিস্তার লাভ করে। খিলাফতে বনূ উমাইয়ার যুগে ইসলামী হুকুমতের একটি মাত্র কেন্দ্র ছিল। বনূ উমাইয়ার পরে মুসলমানরা নতুনভাবে দেশ জয়ের সুযোগ খুব কমই পেয়েছে। এক কথায় বলতে গেলে, বনূ উমাইয়াদের হাতেই যেন দিগ্বিজয়ের পরিসমাপ্তি ঘটে। এরপর বাকি থাকে শুধু দেশ শাসনের পালা। বনূ উমাইয়াদের পর ইসলামী হুকুমতেরও একক কোন কেন্দ্র থাকেনি বরং দিনের পর দিন এক থেকে একাধিক পৃথক হুকুমত বা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। অবশ্য সেগুলোর মধ্যে খিলাফতে আব্বাসীয়াই ছিল সর্ববৃহৎ হুকুমত।

৭. বনূ উমাইয়ার খিলাফত আমলে আরবরা একটি দিগ্বিজয়ী জাতি হিসাবে পরিচিত ছিল। সর্বত্রই ছিল আরবী আচার-ব্যবহার, আরবী ভাষা, আরবী সভ্যতা ও আরবী রীতি-নীতির অপ্রতিহত প্রভাব। কিন্তু বনূ উমাইয়ার পর অনারব এবং অন্যান্য বিজিত জাতিও আরবদেরকে রাষ্ট্র পরিচালনা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রভাবিত করতে শুরু করে।

৮. বনূ উমাইয়ার যুগে যদিও খারিজী, শিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল, তবে সকল মতবাদ ও আকীদা-বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি ছিল শুধু কুরআন ও হাদীস। কুরআন-সুন্নাহ্ ব্যতীত অন্য কিছুকেই দলীল হিসাবে গ্রহণ করা হতো না। কিন্তু পরবর্তীকালে মুসলমানদের মধ্যে এমন সব ফিরকারও উদ্ভব হয়, যারা কুরআন-সুন্নাহকে পিছনে ফেলে রেখে তথাকথিত পীর-মুরশিদ, ইমাম ও স্বমতাবলম্বী আলিমদের আদেশ-নির্দেশকেই তাদের পথ প্রদর্শনের জন্য

যথেষ্ট মনে করে। একারণেই খিলাফতে বনূ উমাইয়ার যুগে মুসলমানদের সার্বিক দৃষ্টি কুরআন-সুন্নাহ্‌র প্রতিই নিবদ্ধ থাকে। এরপর কুরআনের প্রতি মুসলমানরা যেন উদাসীন হয়ে ওঠে। এই ধ্বংসাত্মক মনোবৃত্তি দিনের পর দিন শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে আজ এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে, এ যুগের একজন ওয়ায়েয (ধর্মীয় বক্তা) বা শেষ স্তর পর্যন্ত দীনী কিতাব পড়ুয়া মওলভীর জন্য এ জিনিসটি জরুরী মনে করা হয় না যে, তিনি চিন্তা ও গভীর মনোনিবেশ সহকারে কুরআন পড়বেন এবং তার অর্থও যথারীতি হৃদয়ঙ্গম করবেন।

৯. খিলাফতে রাশিদার যুগে সবচেয়ে বড় সাফল্য এটাকেই মনে করা হতো যে, লোক শির্‌ক ও পথভ্রষ্টতা থেকে মুক্তি লাভ করে আল্লাহ্‌র দিকে ঝুঁকে পড়া এবং ইসলাম মানুষের দৈনন্দিন জীবনব্যবস্থায় পরিণত হোক। তখন ধন-দৌলত ও বৈষয়িক শান-শওকতের কোন গুরুত্ব বা মর্যাদা ছিল না। কিন্তু বনূ উমাইয়ার খিলাফত আমলে ধন-দৌলত এবং জাগতিক সম্মান-মর্যাদাকে মানবজীবনের সাফল্যের মাপকাঠি মনে করা হতে থাকে এবং বায়তুল মালের অর্থ ঐ সমস্ত লোকের জন্য ব্যয়িত হতে থাকে, যারা খিলাফত ও সালতানাত তথা উমাইয়া গোত্রের স্বার্থোদ্ধারের কাজে লাগতে পারে। যাদের কাছ থেকে উমাইয়া গোত্রের জন্য কোন সাহায্য-সহায়তা পাবার সম্ভাবনা ছিল না কিংবা বনূ উমাইয়ার লোকেরা যাদেরকে সন্তুষ্ট রাখার কোন প্রয়োজনবোধ করত না তাদের প্রতি বরাবরই অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হতো এবং তারা সব সময় নিজেদের অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকত। এই কুরীতি পরবর্তী খিলাফত আমলসমূহে আরো বিস্তার লাভ করে। এ কারণেই সাধারণভাবে মুসলমানদের মধ্যে স্বার্থান্ধতা ও পরস্পর শত্রুতা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

১০. ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে এবং খিলাফতে রাশিদার আমলে মুসলমানদের জীবন ছিল অত্যন্ত সহজ-সরল ও আড়ম্বরহীন। তাই তাদের জীবনের চাহিদাও ছিল অত্যন্ত সীমিত। বনূ উমাইয়ার যুগে আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসিতার আসবাবসামগ্রী ব্যবহৃত হতে শুরু করে। ফলে সিপাহীসুলভ মনোবৃত্তি, যা প্রথমে মুসলমানদের কাছে একটি গর্বের বস্তু ছিল, ক্রমান্বয়ে লোপ পেতে পেতে একেবার অদৃশ্য হয়ে যায় এবং মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনে সুন্দর পোশাক-পরিচ্ছদ, জাঁকজমকপূর্ণ ঘরবাড়ি ও আসবাব-সামগ্রীর অনুপ্রবেশ ঘটে। এ কারণেই তখন মুসলমানদের মধ্যে সিদ্দীক, ফারূক, খালীফা প্রমুখের নমুনা খুব কমই দৃষ্টিগোচর হতো।

বনূ উমাইয়ার প্রতিদ্বন্দ্বীদের তৎপরতা

উসমান-হত্যার পর হাশিমী ও উমাবীদের মধ্যে যে শত্রুতার সৃষ্টি হয় বাহ্যত তার ফলশ্রুতিতে হযরত আলী (রা)-এর পর হযরত ইমাম হাসানের খিলাফত ত্যাগের মধ্য দিয়ে বনূ উমাইয়া বনূ হাশিমের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে এবং বাজিতে জিতে যায়। জামাল, সিফ্‌ফীন এবং খারিজীদের সাথে যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পর বনূ উমাইয়ার হাতে খিলাফত চলে যাওয়াটা বনূ হাশিমের জন্য ছিল এমন এক ব্যর্থতা যে, তারা তখন থেকে পুনরায় খিলাফত লাভের ব্যাপারটি সুকঠিন মনে করতে থাকে। এ ব্যাপারে দ্রুত কোন উদ্যোগ গ্রহণও তাদের

পক্ষে আর সম্ভব ছিল না। কিন্তু আমীরে মুআবিয়ার পর ইয়াযীদের খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হওয়া এবং এ উদ্দেশ্যে অলীআহ্‌দীর মত কুরীতির প্রবর্তন বনূ উমাইয়ার জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়। প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল তাদের দুর্বলতারও কারণ। এই প্রেক্ষিতে ইমাম হুসাইন (রা) একটি দুঃসাহসী পদক্ষেপ নেন। কিন্তু যারা ছিল তাঁর সত্যিকার শুভাকাঙ্ক্ষী তিনি তাঁদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ না করায় কারবালার দুঃখজনক ঘটনা ঘটে।

আমীরে মুআবিয়ার দুর্বল উত্তরাধিকারী ইয়াযীদ এবং ইয়াযীদের অপরিণামদর্শী কর্মকর্তা ইব্‌ন যিয়াদ নিজেদের অন্যায় ব্যবহার ও নির্দয় আচরণ দ্বারা বনূ হাশিমকে সাময়িকভাবে পর্যুদস্ত করলেও তাতে বনূ উমাইয়ার জনপ্রিয়তার উপর আসে এক বিরাট আঘাত। মানুষ তাদের বিরোধিতায় ক্রমে ক্রমে দুঃসাহসী হয়ে ওঠে। এর ফলেই ইব্‌ন যুবায়রের ঘটনা ঘটে। কিন্তু এই ঘটনা যখন ঘটে তখন খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন উমাইয়া বংশের একজন অতি পরাক্রমশালী ব্যক্তি। তিনি উমাইয়া বংশের তখনকার দুর্বলতাকে দূর করে হুকুমতকে শুধু শক্তিশালীই করেননি, বরং জনসাধারণকে উমাইয়া শাসকদের সম্পর্কে আরো আতংকিত ও ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলেন। ফলে হাশিমীদের সশস্ত্র বিদ্রোহের বা ক্ষমতা প্রকাশের কোন সুযোগ তখন আর বাকি থাকেনি। অতএব তারা তাদের প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থ করার জন্য অন্য পথ অবলম্বন করে। এক্ষেত্রে তারা ঐ সমস্ত কর্মতৎপরতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে, যা ইব্‌ন সাবা ও তার অনুসারীরা অবলম্বন করেছিল এবং যেগুলোর কারণে হাশিমীরা সিফ্‌ফীন ও আযরাজে বিফলকাম হয়েছিল। হাশিমী গোত্রের শুধু দু'টি পরিবারের মধ্যেই নেতৃত্বের যোগ্যতা ছিল। একটি হচ্ছে হযরত আলী (রা)-এর পরিবার এবং অন্যটি হচ্ছে হযরত আব্বাস (রা) ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিবের পরিবার। হযরত আলী (রা) ছিলেন একাধারে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চাচাত ভাই এবং জামাতা আর হযরত আব্বাস (রা) ছিলেন তাঁর চাচা। এ দুই পরিবারই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আহলে বায়তের মধ্যে পরিগণিত হতেন। তাই তাঁদের মর্যাদা ও নেতৃত্ব ছিল সর্বজন স্বীকৃত। হযরত আলী (রা) যেহেতু সরাসরি বনূ উমাইয়ার মুকাবিলা করেছিলেন এবং এজন্য তাঁকে অনেক প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তাই আব্বাসীদের অনুপাতে আলাবীরা ছিল অধিকতর সাহসী ও উদ্যমশীল। আবার হযরত ইমাম হুসাইনের শাহাদতের কারণে আলাবীদের চাইতে ফাতিমীরা ছিল অধিকতর সুঃসাহসী ও উৎসর্গীকৃত প্রাণ। প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্রে তারা ছিল অধিকতর দৃঢ়প্রত্যয়ী। আলাবীদের মধ্যে আবার ছিল দু'টি দল। এক দল ইমাম হুসাইনের বংশধরকে খিলাফতের যোগ্য মনে করত। অপর দলটি মনে করত যে, মুহাম্মদ ইব্‌নুল হানাফিয়া হচ্ছেন খিলাফতের জন্য সর্বাধিক যোগ্য। তৃতীয় দলটি ছিল আব্বাসীদের। উপরোক্ত দলগুলোর মধ্যে ফাতিমী বা হুসাইনীরা ছিল সর্বাধিক ক্ষমতাশালী। কেননা কারবালার ঘটনার কারণে জনসাধারণ তাঁদের প্রতি ছিল অধিকতর সহানুভূতিসম্পন্ন। দ্বিতীয়ত হযরত ফাতিমা (রা)-এর বংশধর হওয়ার কারণে তাঁরা ছিল অধিকতর সম্মানিত ও জনপ্রিয়।

মর্যাদার দিক দিয়ে মুহাম্মদ ইব্নুল হানাফিয়ার দলটি ছিল দ্বিতীয় আর আব্বাসীরা ছিল তৃতীয়। পরবর্তীকালে ফাতিমীরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এক দল ছিল যায়দ ইব্ন আলী ইব্ন হুসাইন-এর সমর্থক। তাদেরকে যায়দী বলা হতো। দ্বিতীয় দল ইসমাঈল ইব্ন জা'ফর সাদিকের হাতে বায়আত করেছিল। তাদেরকে বলা হতো ইসমাঈলী। যায়দ ইব্ন আলী এবং তাঁর পুত্র ইয়াহ্ইয়ার নিহত হওয়ার ঘটনা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। মুহাম্মদ ইব্নুল হানাফিয়ার প্রচেষ্টা এবং কূফায় মুখতারের তৎপরতা সম্পর্কেও ইতিপূর্বে আলোচনা কর হয়েছে। আলাবীরা যখনই সামান্য সুযোগ পেয়েছে তখনই উমাইয়াদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদেরকে বিফলকাম হতে হয়েছে। আলাবীদের এইসব তৎপরতা এবং তার পরিণাম থেকে আব্বাসীরা শিক্ষা গ্রহণ করে। তাই তারা অত্যন্ত সতর্কতা ও দূরদর্শিতার সাথে বনূ উমাইয়ার বিরুদ্ধে তাদের তৎপরতা অব্যাহত রাখে। এই তিনটি দলের প্রত্যেকটিই নিজেদের জন্য একই ধরনের কর্মপন্থা গ্রহণ করেছিল। আর তা হলো, উমাইয়াদের মুকাবিলা করার মত শক্তি অর্জনের জন্য গোপনে জনসাধারণকে নিজেদের সমমনা করে তোলা এবং তাদের কাছ থেকে নিজেদের পক্ষে বায়আত আদায় করা। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য তারা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নিজেদের প্রতিনিধি প্রেরণ করে। ঐ প্রতিনিধিরা জনসাধারণের কাছে সুকৌশলে ও বিচক্ষণতার সাথে আহলে বায়তের প্রতি প্রেম-ভালবাসার সম্পর্ক সুদৃঢ় রাখার ওয়ায করত, বনূ উমাইয়ার হুকুমতের দোষ-ত্রুটি ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বর্ণনা করত এবং 'আহলে বায়তকেই খিলাফত ও হুকুমতের একমাত্র হকদার প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করত। এই গোপন প্রচারকার্য অত্যন্ত সতর্কতা, বিচক্ষণতা এবং আস্থা ও দৃঢ়তার সাথে পরিচালনা করা হয়। কাজটি প্রথম শুরু করা হয় আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ানের খিলাফত আমলে। হাশিমী গোত্রের তিনটি দলই একে অন্যের তৎপরতা সম্পর্কে অবহিত ছিল। কিন্তু যেহেতু তিন দলেরই শত্রু ছিল এক, তাই তাদের মধ্যে আপোসে কোন শত্রুতা ছিল না বরং একে অপরের রহস্য সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর তা গোপন রাখারই চেষ্টা করত। প্রত্যেকটি দলের কর্মকর্তা বা প্রতিনিধি পৃথক পৃথক থাকলেও প্রচারকার্য চালাবার সময় তাদেরকে এমন সব শব্দ ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া হতো, যেগুলো দ্বারা অপর দলের সাথে কোনরূপ সংঘর্ষের সৃষ্টি না হয়। যেমন আব্বাস কিংবা মুহাম্মদ ইব্নুল হানাফিয়া কিংবা ইমাম যায়নুল আবিদীনের একচেটিয়া ফযীলত বর্ণনার পরিবর্তে শুধু আহলে বায়তের ফযীলত বর্ণনা করা হতো এবং তারাই যে খিলাফতের একমাত্র হকদার তা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা হতো। তারা পরস্পরের বিরোধিতা তো করতই না, বরং বনূ উমাইয়ার বিরোধিতার খাতিরে খারিজীদের সাথেও সৌজন্যমূলক ও সহানুভূতিশীল আচরণ করত। কেননা খারিজীরাও প্রথম থেকেই বনূ উমাইয়াকে কাফির ফতওয়া দিত এবং সব সময়ই তাদের বিরুদ্ধাচরণ করত। এই গোপন প্রচার অভিযানে আলাবীরা প্রায়ই তাড়াহুড়া শুরু করে দিত। ফলে খুলাফায়ে বনূ উমাইয়া আলাবীদের তৎপরতা ও ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবহিত হয়ে যেত এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগও লাভ করত। কিন্তু আব্বাসীদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে খুলাফায়ে বনূ

উমাইয়া শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত একেবারে বে-খবর থাকে। আর এ কারণেই আব্বাসীরা আলাবীদেরকে পশ্চাতে ফেলে নিজেদের লক্ষ্য অর্জনে সফল হয়।

উপরোক্ত কার্যক্রম ছাড়াও আব্বাসীরা আর একটি সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। তারা নিজেদের কর্মতৎপরতা গোপন রাখার উদ্দেশ্যে মদীনা, মক্কা, কূফা, বসরা, দামিশ্‌ক প্রভৃতি বড় বড় শহরের পরিবর্তে হামীমাহ্‌ নামক একটি অখ্যাত স্থানকেই নিজেদের কেন্দ্র হিসাবে বেছে নেয়। হামীমাহ্‌ ছিল বনূ উমাইয়া প্রদত্ত একটি জায়গীর। তার অবস্থান ছিল দামিশ্‌ক ও মদীনার মধ্যস্থলে। দামিশকের অপেক্ষাকৃত নিকটে থাকা সত্ত্বেও কোন দিক দিয়েই গুরুত্বপূর্ণ নয় বলে তার উপর বনূ উমাইয়ার কোন খলীফা বা গভর্নরের দৃষ্টি পড়ত না। তাই আব্বাসীরা সেটাকেই নিজেদের যাবতীয় তৎপরতার কেন্দ্রস্থলে পরিণত করে। আলাবীদের তৎপরতা যেহেতু বার বার ফাঁস হয়ে যাচ্ছিল তাই বার বার তাদের উপর হত্যাকাণ্ডও চালানো হয়েছিল। কিন্তু বনূ আব্বাসকে কখনো এ ধরনের ক্ষতি স্বীকার করতে হয়নি। তাদের কর্মতৎপরতা মধ্যমগতির হলেও তা সব সময়ই অব্যাহত থাকে। শেষদিকে বনূ আব্বাসের উন্নতির গতি অনেক বেশি বৃদ্ধি পায়। এজন্য যে, মুহাম্মদ ইব্‌নুল হানাফিয়ার দলও সামগ্রিকভাবে বনূ আব্বাসের দলে মিশে একাকার হয়ে যায়। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, আবূ হাশিম ইব্‌ন মুহাম্মদ হামীমায় মৃত্যুবরণকালে তার যাবতীয় অধিকার মুহাম্মদ ইবন আলী আব্বাসীর হাতে অর্পণ করেন এবং যারা আবূ হাশিমের খিলাফতের জন্য চেষ্টা করছিল তাদেরকে আদেশ দেন, যেন তারা আগামীতে মুহাম্মদ ইব্‌ন আলীর নির্দেশ মতে তৎপরতা চালিয়ে যায় এবং তাকেই নিজেদের ইমাম (নেতা) মান্য করে। আলাবীদের একটি বিরাট দল আব্বাসীদের সাথে যোগ দিলে শেষোক্তরা পূর্বের চাইতে অধিকতর সাহস ও প্রেরণা নিয়ে তাদের আন্দোলন চালিয়ে যেতে লাগল। ফলে ষড়যন্ত্রকারীদের প্রায় সমগ্র শক্তি আব্বাসীদের হাতে এসে গেল। মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ছিলেন ষড়যন্ত্রকারীদের একটি বিরাট দলের নেতা। ১২৪ হিজরীতে (৭৪১ খ্রি) তিনি ইনতিকাল করলে তাঁর পুত্র ইবরাহীম তার স্থলাভিষিক্ত হন। ইমাম ইবরাহীম এই আন্দোলনকে পূর্বের চাইতেও অধিক সুদৃঢ় ও সুবিন্যস্ত করে প্রত্যেক এলাকার জন্য পৃথক পৃথক 'দাঈ' (আহ্বানকারী) নিয়োগ করেন। তারা সকলেই ছিলেন অভিজ্ঞ ও সুদক্ষ। তারা ইরাক, খুরাসান, পারস্য, সিরিয়া, হিজায প্রভৃতি অঞ্চলে তাদের আন্দোলনের জাল বিস্তার করেন। ঐ সময়ে ইমাম ইবরাহীম সৌভাগ্যক্রমে এমন এক ব্যক্তিকে পেয়ে যান, যিনি পরবর্তী সময়ে ঐ আন্দোলনকে সাফল্যের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর ব্যাপারে অগ্রণীর ভূমিকা পালন করেন। তিনি হচ্ছেন আবূ মুসলিম খুরাসানী।

ইমাম ইবরাহীম আবূ মুসলিম খুরাসানীকে ইরাক ও খুরাসানের দাঈদের নেতা নিযুক্ত করে সংশ্লিষ্ট সকলকে তার অধীনে কাজ করার এবং তার প্রতিটি হুকুম মেনে চলার নির্দেশ দেন। ইমাম ইবরাহীম চিঠিপত্রের মাধ্যমে আবূ মুসলিমের সাথে সরাসরি যোগাযোগ রাখতেন এবং নিজের প্রতিটি ইচ্ছা ও সংকল্প সম্পর্কেও তাকে অবহিত রাখতেন। এতে একটি উপকার ছিল

এই যে, স্বয়ং ইমাম ইবরাহীমকে প্রত্যেক 'দাঈর' কাছে চিঠিপত্র লেখার প্রয়োজন হতো না। ইমাম ইবরাহীমের মৃত্যুর পর তাঁর ভাই আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাফ্ফাহ্ ইমাম নিযুক্ত হন। তিনি ইমাম ইবরাহীমের মতই বিচক্ষণ ছিলেন। আবূ মুসলিমের যোগ্যতা ও দক্ষতা তখন সার্বিক আন্দোলনকে সাফল্যের একেবারে শেষ সীমান্তে পৌঁছিয়ে দিয়েছিল। তিনি অত্যন্ত দ্রুততার সাথে খুরাসানে নিজের আধিপত্য বিস্তার করতে থাকেন। বনূ উমাইয়া যখন এই আব্বাসী আন্দোলন সম্পর্কে অবহিত হয় তখন আবূ মুসলিম মোটামুটিভাবে সমগ্র খুরাসানের উপর আধিপত্য বিস্তার করে ফেলেছেন এবং তার আন্দোলন ফাঁস করে দেওয়ার উপযুক্ত সময়ও এসে গেছে। এ কারণেই আব্বাসীরা তাদের আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে কোনরূপ ব্যর্থতা বা ক্ষতির সম্মুখীন হয়নি।

ইমাম ইবরাহীমের মৃত্যুর পর আবূ মুসলিম যখন খুরাসানে নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করছিলেন এবং বনূ উমাইয়ার খিলাফত ধ্বংস হয়ে যাওয়ার যাবতীয় আলামত প্রকাশিত হচ্ছিল তখন বনূ আব্বাস ও আলাবীদের শুভাকাঙ্ক্ষী এবং ঐ ষড়যন্ত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট লোকেরা ১৩০ হিজরীর যিলহজ্জ (৭৪৭ খ্রি আগস্ট) মাসে হজ্জ উপলক্ষে মক্কায় আগত তাদের বিশেষ বিশেষ 'দাঈ' ও প্রতিনিধিদেরকে একটি ঘরে একত্র করে। সেখানে এ বিষয়টি উত্থাপিত হয় যে, যেহেতু বনূ উমাইয়ারা অচিরেই ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তাদের হাত থেকে খিলাফত ছিনিয়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্রসমূহও শীঘ্রই ফলপ্রসূ হবে, তাই এ বিষয়টিরও একটি চূড়ান্ত ফায়সালা হওয়া উচিত যে, এরপর কাকে খলীফা নিয়োগ করা হবে। ঐ বৈঠকে আবুল আব্বাস আবদুল্লাহ্ সাফ্ফাহর ভাই আবূ জা'ফর মানসূর এবং হযরত আলীর বংশধরদের মধ্যেও কয়েক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন তখন আবূ জা'ফর মানসূর নির্দ্বিধায় বলে উঠেন, এমতাবস্থায় হযরত আলীর বংশধরদের মধ্য থেকে কাউকে খলীফা নির্বাচিত করা উচিত। উপস্থিত সকলেই এ প্রস্তাব সমর্থন করেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাসান ইব্ন আলী ওরফে 'নাফসে যাকিয়্যাকে খলীফা নির্বাচিত করা হয়। ঐ মুহূর্তটি ছিল খুবই নাজুক। কেননা বনূ উমাইয়ার হুকুমত ধ্বংস করা এবং খুরাসানের উপর আবূ মুসলিমের আধিপত্য বিস্তারের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছিল তা হলো, শীআনে আলী ও শীআনে বনূ আব্বাস একযোগে ও সম্মিলিতভাবে কাজ করে যাচ্ছিল। যদি ঐ বৈঠকে বনূ আব্বাস ও আলাবীদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিত তাহলে মক্কা থেকে শুরু করে খুরাসানের শেষ পর্যন্ত সমগ্র এলাকায় অত্যন্ত দ্রুততার সাথে মতানৈক্যের এমন একটি স্রোত বয়ে যেত, যা পরবর্তীকালে নিয়ন্ত্রণ করা, আব্বাসী বা আলাবী কারো পক্ষেই সম্ভব হতো না এবং খিলাফতে বনূ উমাইয়া, যা অনবরত মৃত্যুর প্রহর গুণছিল, পুনরায় প্রাণবন্ত হয়ে উঠত। কিন্তু আবূ জা'ফর মানসূরের বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার ফলে অতি সহজে ঐ বাধা অতিক্রম করা সম্ভব হয় এবং শীআনে আলী পূর্বের চাইতেও অধিক উদ্যম ও অনুপ্রেরণা নিয়ে আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করে। আর তাদের ঐ অপূর্ব কর্মতৎপরতা আব্বাসীদের জন্য তখনকার মত খুবই মঙ্গলজনক প্রমাণিত হয়।

আবূ মুসলিম খুরাসানী

ইরানী বংশোদ্ভূত আবূ মুসলিম খুরাসানীর প্রকৃত নাম ইবরাহীম ইব্‌ন উছমান ইব্‌ন বাশ্‌শার। তিনি ইরানের শাহানশাহ্‌ নওশেরওয়ার মন্ত্রী 'বুযুরচে মিহিরের বংশধর ছিলেন বলে প্রকাশ। তাঁর জন্ম ইসফাহানে। তার পিতামাতা কূফা সংলগ্ন একটি পল্লীতে এসে বসতি স্থাপন করেন। পিতা উছমানের মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স ছিল সাত বছর। পিতা মৃত্যুকালে ওসীয়ত করে গিয়েছিলেন, যেন ঈসা ইব্‌ন মূসা সাররাজ তাঁর প্রতিপালন ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। ঈসা তাঁকে নিয়ে কূফায় আসেন। আবূ মুসলিম ঈসার কাছে জিন তৈরির কাজ শিখেন এবং তার সাথেই থাকতেন। ঈসা তার তৈরি জিন বিক্রির উদ্দেশ্যে খুরাসান, জাযীরা এবং মাওসিলের বিভিন্ন এলাকায় যেতেন। এই উপলক্ষে প্রায়ই সফরে থাকতেন এবং বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের সাথে মেলামেশা করতেন। সাধারণভাবে ধারণা করা হতো যে, তিনিও বনূ হাশিম ও আলাবীদের একজন নকীব বা প্রতিনিধি। এভাবে তার পরিবারের অন্যান্য লোক সম্পর্কেও সন্দেহ করা হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত কূফার গভর্নর ইউসূফ ইব্‌ন উমর ঈসা ইব্‌ন মূসা ও তার চাচাত ভাই ইদরীস ইব্‌ন মাকিল এবং তাদের উভয়ের চাচা আসিম ইব্‌ন ইউনূস আজালীকে গ্রেফতার করে কয়েদখানায় আটকে রাখেন। এই কয়েদখানায় খালিদ কাসরীর গ্রেফতারকৃত কর্মচারীরাও আটক ছিল।

আবূ মুসলিম ঈসা ইব্‌ন মূসার কারণে প্রায়ই কয়েদখানায় যেতেন। সেখানকার সমগ্র কয়েদীই বনূ উমাইয়ার প্রতি ঘৃণা পোষণ করত। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক কয়েদী প্রকৃতপক্ষে বনূ আব্বাস বা বনূ ফাতিমার নকীব (প্রতিনিধি) ছিল। অতএব ওদের কথা শুনে আবূ মুসলিম খুবই প্রভাবিত হন। তিনি তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখান এবং শীঘ্রই তাদের অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হন। ঘটনাচক্রে কাহ্‌তাবা ইব্‌ন শাবীব– যিনি ইমাম ইবরাহীমের পক্ষ থেকে খুরাসানে কাজ করতেন এবং জনসাধারণকে খিলাফতে আব্বাসিয়ার প্রতি আহ্বান জানাতেন, খুরাসান থেকে হামীমার দিকে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে তিনি কূফার ঐ কয়েদীদের সাথে সাক্ষাত করতে গিয়ে জানতে পারেন যে, ঈসা ও আসিমের খাদিম আবূ মুসলিম একজন অতি বিচক্ষণ ও গুণগ্রাহী যুবক। একথা শুনে তিনি তাঁকে ঈসার কাছ থেকে চেয়ে নেন এবং তাঁকে সঙ্গে নিয়ে হামীমা অভিমুখে যাত্রা করেন। সেখানে ইমাম ইবরাহীমের খিদমতে আবূ মুসলিমকে পেশ করা হয়। তিনি আবূ মুসলিমের নাম জিজ্ঞেস করেন। তিনি উত্তর দেন, আমার নাম ইবরাহীম ইব্‌ন উছমান ইব্‌ন বাশ্‌শার। ইবরাহীম বলেন, না, তোমার নাম আবদুর রহমান। তাই ঐদিন থেকেই তাঁর নাম আবদুর রহমান হয়ে যায়। ইমাম ইবরাহীমই তাঁর ডাকনাম আবূ মুসলিম রাখেন এবং কাহতাবা ইব্‌ন শাবীবের কাছ থেকে চেয়ে নেন।

কিছুদিন পর্যন্ত আবূ মুসলিম ইমাম ইবরাহীমের সাথে অবস্থান করেন। আর তখনই তিনি আবূ মুসলিমের অসাধারণ বিচক্ষণতা ও কর্মদক্ষতার পরিচয় পান এবং নিজের একজন বিখ্যাত নকীব আবূ নাজ্‌ম ইমরান ইব্‌ন ইসমাঈলের কন্যার সাথে তাঁকে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করেন। আবূ নাজ্‌ম ছিলেন ঐ সমস্ত ব্যক্তির অন্যতম, যারা আলীর বংশধরকে খিলাফতের আসনে

অধিষ্ঠিত করতে চাইতেন। অতএব ঐ বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল, আবূ মুসলিম যেন শীআনে আলীর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন এবং কখনো যেন নিজেকে দুর্বল মনে না করেন। এই ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোগ-আয়োজনের পর ইমাম ইবরাহীম আবূ মুসলিমকে খুরাসানে প্রেরণ করেন এবং সমগ্র 'দাঈ' ও নকীবকে জানিয়ে দেন ঃ আমি আবূ মুসলিমকে সমগ্র খুরাসান এলাকার মুহতামিম (তত্ত্বাবধায়ক) নিয়োগ করে পাঠালাম। তোমরা দাওয়াতী কর্মকাণ্ডে অবশ্যই তাঁর কথা মেনে চলবে। খুরাসানের বিখ্যাত ও অভিজ্ঞ নকীব, যারা মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী আব্বাসী অর্থাৎ ইবরাহীমের পিতার যুগ থেকে কাজ করে আসছিলেন, তারা হলেন যথাক্রমে সুলায়মান ইব্‌ন কাসীর, মালিক ইব্‌ন হায়সাম, যিয়াদ ইব্‌ন সালিহ্ তালহা ইব্‌ন যুরায়ক ও উমর ইব্‌ন জাবীন। এই পাঁচ ব্যক্তি ছিলেন খুযাআ গোত্রের লোক। বিখ্যাত নকীব কাহতাবা ইব্‌ন শাবীব ছিলেন তাঈ গোত্রের। আবূ উয়ায়না, মূসা ইব্‌ন কা'ব, কাসিম ইব্‌ন মুজাশি, আসলাম ইব্‌ন সালাম—এই চার ব্যক্তি ছিলেন তামীম গোত্রের। আরো যারা এক্ষেত্রে বিখ্যাত ছিলেন তারা হলেন আবূ দাউদ খালিদ ইব্‌ন ইবরাহীম শায়বানী, আবূ আলী হারাবী ওরফে শিবল ইব্‌ন তাহমান, আবূ নাজ্‌ম ইমরান ইব্‌ন ইসমাঈল প্রমুখ। আবূ মুসলিম খুরাসানে গিয়ে পৌঁছলে অল্প বয়স্ক হওয়ার কারণে সুলায়মান ইব্‌ন কাসীর তাঁকে হামীমায় ফেরত পাঠিয়ে দেন। এরা সবাই ছিলেন বয়োবৃদ্ধ ও অভিজ্ঞ। তাই স্বাভাবিকভাবেই তারা আবূ মুসলিমের মত একজন অল্প বয়স্ক যুবককে তাদের যাবতীয় কর্মতৎপরতার কর্মাধ্যক্ষ হিসাবে মেনে নিতে রাযী ছিলেন না।

যখন আবূ মুসলিম খুরাসানে গিয়ে পৌঁছেন তখন আবূ দাউদ খালিদ ইব্‌ন ইবরাহীম শায়বানী কোন একটি দরকারী কাজে মাওরাউন নাহ্‌রে ছিলেন। যখন তিনি মার্ভে ফিরে আসেন এবং ইমাম ইবরাহীমের পত্র পাঠ করেন তখন আপন বন্ধু-বান্ধবকে আবূ মুসলিমের অবস্থান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তারা উত্তরে বলেন, অল্প বয়স্ক হওয়ার কারণে সুলায়মান ইব্‌ন কাসীর তাঁকে হামীমায় ফেরত পাঠিয়েছেন। কেননা তাঁর দ্বারা কোন কাজ হবে না বরং সে আমাদের সকলকে এবং ঐ সমস্ত লোককেও যাদেরকে দাওয়াত দেওয়া হয়েছে, বিপদের মধ্যে ফেলবে। আবূ দাউদ তখন সকল নকীবকে একত্র করে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের সম্পর্কে জ্ঞানদান করেছেন। আহলে বায়তের লোকেরা হচ্ছেন তাঁর জ্ঞানের উত্তরাধিকারী। তাঁরা হচ্ছেন যাবতীয় জ্ঞানের আধার, সর্বোপরি রাসূলের উত্তরাধিকারী। তোমাদের কি এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ আছে ? উপস্থিত সকলেই উত্তর দেন 'না'। আবূ দাউদ বলেন, তাহলে তোমরা এ ব্যাপারে সন্দেহের বশবর্তী হচ্ছ কেন ? ইমাম ইবরাহীম নিশ্চয়ই এই ব্যক্তিকে (আবূ মুসলিমকে) তাঁর যোগ্যতা ও দক্ষতা যাচাই করে এবং সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে তোমাদের কাছে পাঠিয়ে থাকবেন। এই বক্তৃতা শুনে আবূ মুসলিমকে ফেরত পাঠানোর জন্য সকলকেই আক্ষেপ করতে দেখা যায় এবং অবিলম্বে লোক পাঠিয়ে তাঁকে রাস্তা থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এরপর আবূ মুসলিমের হাতেই তারা তাদের যাবতীয় কাজের দায়িত্ব অর্পণ করে তাঁকে নেতা হিসাবে মেনে চলতে থাকে। যেহেতু প্রথমে সুলায়মান ইব্‌ন কাসীর তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, তাই আবূ

মুসলিম সুলায়মানের প্রতি সব সময়ই কিছুটা মনঃক্ষুণ্ন থাকতেন বলে মনে হতো। যাহোক তিনি নকীবদেরকে বিভিন্ন শহরে প্রেরণ করেন ও সমগ্র খুরাসানে দাওয়াতী আন্দোলন সার্থক সফল করে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

১২৯ হিজরীতে (৭৪৬-৪৭ খ্রি.) ইমাম ইবরাহীম আবূ মুসলিমকে লিখেন ঃ এ বছর হজ্জ মওসুমে তুমি আমার সাথে সাক্ষাত করবে, যাতে দাওয়াতী কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে তোমাকে কিছু প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পারি। তিনি এও লিখেন, কাহতাবা ইব্ন শাবীবকে এবং যে পরিমাণ ধন-সম্পদ তার কাছে সংগৃহীত হয়েছে তাও সঙ্গে করে নিয়ে এস। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই সমস্ত গোপন ষড়যন্ত্রের জন্য হজ্জের মওসুমই ছিল সবচেয়ে সুবিধাজনক সময়। তখন হজ্জের জন্য বিশ্বের সর্বপ্রান্ত থেকে লোকেরা মক্কায় এসে জড় হতো। তাই বিশেষ কোন ব্যক্তির আগমনের উপর অন্য কারো সন্দেহ করার সুযোগ ছিল না। অতএব ষড়যন্ত্রকারীরা যে কোন জায়গায় বসে আপোসে যে কোন ধরনের আলাপ-আলোচনা করতে পারত। তাই পারতপক্ষে কেউই হজ্জের এই সুযোগ নষ্ট হতে দিত না। যাহোক, আবূ মুসলিম কাহতাবা ও অন্যান্য নকীবকে সঙ্গে নিয়ে ইমামের সাথে সাক্ষাত করার উদ্দেশ্যে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হন। কূমিস নামক স্থানে পৌঁছার পর তিনি ইমাম ইবরাহীমের একটি পত্র পান। তাতে তিনি লিখেছিলেন, তুমি অবিলম্বে খুরাসানের দিকে ফিরে যাও। আর যদি খুরাসান থেকে রওয়ানা না হয়ে থাক তাহলে সেখানেই অবস্থান কর এবং এখন থেকে দাওয়াতী কাজ গোপনে নয় বরং প্রকাশ্যে শুরু করে দাও। এই পত্র পাঠ মাত্র আবূ মুসলিম মার্ভের দিকে ফিরে যান এবং কাহতাবা যাবতীয় ধন-সম্পদ সঙ্গে নিয়ে ইমাম ইবরাহীমের উদ্দেশে রওয়ানা হন। কাহতাবা জুরজানের রাস্তা ধরে রওয়ানা হয়েছিলেন। জুরজান এলাকায় পৌছে তিনি খালিদ ইব্ন বারমাক এবং আবূ আওনকে তলব করেন। ওরা ধন-সম্পদ নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তার খিদমতে হাযির হয় এবং তিনি ঐ সমস্ত ধন-সম্পদও সঙ্গে নিয়ে ইমামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন।

আবূ মুসলিমকে যখন প্রকাশ্যে দাওয়াত ও শক্তি প্রয়োগের অনুমতি দেওয়া হয় ঠিক তখন খুরাসানে কিরমানী ও নাসর ইব্ন সাইয়ারের মধ্যে অবিরাম লড়াই চলছিল। আবূ মুসলিম তাঁর দলের লোকদের নিয়ে সেদিকে যান এবং কিরমানী ও নাসর ইব্ন সাইয়ারের ঠিক মাঝখানে নিজেদের তাঁবু স্থাপন করেন। শেষ পর্যন্ত কিরমানী নিহত হন এবং তার পুত্র আলী আবূ মুসলিমের কাছে চলে আসেন। আবূ মুসলিম নাসরকে মার্ভ থেকে বের করে দিয়ে সেখানে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। মার্ভে কিছুদিন অবস্থানের পর তিনি মাহ্ওয়ানের দিকে চলে যান। নাসর ইব্ন সাইয়ার দামিশকে খলীফা মারওয়ান ইব্ন মুহাম্মদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন। ঐ সময়ে মারওয়ান দাহ্হাক ইব্ন কায়স খারিজীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন বলে নাস্রের কাছে কোন সাহায্য পাঠাতে পারেননি। যে সময়ে নাসরের আবেদন পত্র মারওয়ানের কাছে পৌঁছে ঠিক তখনি আবূ মুসলিমের নামে লেখা ইমাম ইবরাহীমের একটি পত্র ধরা পড়ে। ইমাম ইবরাহীম তাতে লিখেছিলেন ঃ খুরাসানে যেসব আরবী ভাষী রয়েছে তাদের কাউকেই জীবিত রাখবে না এবং নাস্র ও কিরমানীকেও খতম করে ফেলবে। যাহোক পত্রটি মারওয়ানুল হিমারের খিদমতে পেশ করা হয় এবং এর মাধ্যমেই বনূ উমাইয়ারা প্রথম

বারের মত আব্বাসীদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবহিত হয়। মারওয়ান বালকা এলাকার শাসককে লিখেন ঃ তুমি হামীমায় গিয়ে ইবরাহীমকে গ্রেফতার কর। অতএব ইমাম ইবরাহীমকে গ্রেফতার করা হয় এবং মারওয়ান তাঁকে কয়েদখানায় আটকে রাখেন, যেমন আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। আবূ মুসলিম যখন খুরাসানে প্রকাশ্যে দাওয়াতের কাজ শুরু করেন তখন সেখানকার লোক দলে দলে তাঁর কাছে আসতে থাকে।

১৩০ হিজরীর (৭৪৭ খ্রি. সেপ্টেম্বর) শুরু হতেই আবূ মুসলিম কিতাবুল্লাহ্ ও সুন্নাতে রাসূলের অনুসরণ এবং আহলে বায়তে নববীর আনুগত্যের উপর জনসাধারণের কাছ থেকে বায়আত গ্রহণ করতে শুরু করেন। কিরমানী, শায়বানী খারিজী ও নাস্‌র ইব্‌ন সাইয়ার— তিনজনই আবূ মুসলিমের এই বায়আত গ্রহণ এবং লোকদের সংগঠিত করার ব্যাপারে অসন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু তারা এমনভাবে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন যে, তাঁর এই কাজে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। কিরমানী নিহত হওয়ার পর আলী ইব্‌ন কিরমানী আপন পিতার দলের নেতা নির্বাচিত হন। এদিকে আবূ মুসলিম যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করেন। নাস্‌র ইব্‌ন সাইয়ার এবং শায়বান খারিজীও অনুরূপ শক্তির অধিকারী ছিলেন। অতএব দেখা যাচ্ছে, তখন খুরাসানে একই সময়ে একই পর্যায়ের চারটি শক্তি বিরাজ করছিল।

আবূ মুসলিম শায়বান খারিজীকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার উদ্যোগ নেন এবং এ উদ্দেশ্যে ইব্‌ন কিরমানীকে তাঁর কাছে চলে আসতে উদ্বুদ্ধ করেন। আলী ইব্‌ন কিরমানী শায়বান খারিজীর কাছে চলে যান। নাসর ইব্‌ন সাইয়ারও শায়বান খারিজীর সাথে সন্ধি স্থাপনের উদ্যোগ নেন যাতে তার দিক থেকে কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে আবূ মুসলিমকে এক হাত দেখিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু আবূ মুসলিম আলী ইব্‌ন কিরমানীর মাধ্যমে এমন কৌশল অবলম্বন করেন, যার ফলে তাদের মধ্যে কোন সন্ধি স্থাপিত হতে পারে নি। এই সুযোগে আবূ মুসলিম নাসর ইব্‌ন নাঈমকে একটি বাহিনীসহ হিরাতের দিকে প্রেরণ করেন। নাস্‌র হিরাতে পৌঁছে বলতে গেলে, সকলের অগোচরেই সেখানে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন এবং নাসর ইব্‌ন সাইয়ারের কর্মকর্তা ঈসা ইব্‌ন আকীলকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেন। ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন নাঈম ইব্‌ন হুরায়রা শায়বানী এই সংবাদ শুনে ইব্‌ন কিরমানীর কাছে আসেন এবং বলেন ঃ তুমি নাসরের সাথে সন্ধি করে ফেল। তাহলে আবূ মুসলিম সঙ্গে সঙ্গে নাসরের মুকাবিলায় এগিয়ে যাবে এবং স্বাভাবিকভাবেই তোমার সাথে তাঁর আর কোন সংঘর্ষ বাঁধবে না। আর যদি তুমি নাসরের সাথে সন্ধি কর তাহলে আবূ মুসলিম নাসরের সাথে সন্ধি করে অবশ্যই তোমার মুকাবিলায় এগিয়ে আসবে। শায়বানী সঙ্গে সঙ্গে নাসরকে লিখেন ঃ আমি তোমার সাথে সন্ধি করতে চাই। নাসর সঙ্গে সঙ্গে রাযী হয়ে যান। কেননা তিনিও মনে মনে এই ইচ্ছা পোষণ করছিলেন।

আবূ মুসলিম সঙ্গে সঙ্গে শায়বান খারিজীর সহযোগী আলী ইব্‌ন কিরমানীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন ঃ মনে রেখ, নাসর ইব্‌ন সাইয়ার হচ্ছে তোমার পিতার হত্যাকারী। আলী একথা

শোনামাত্র শায়বান খারিজী থেকে পৃথক হয়ে যান এবং তার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন। আবূ মুসলিম ইব্ন কিরমানীর সাহায্যে এগিয়ে যান। অপর দিকে নাসর ইব্ন সাইয়ার শায়বান খারিজীর পক্ষাবলম্বন করেন। লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, তখন একই সময়ে একই জায়গায় চারটি দল ছিল এবং তারা প্রত্যেকেই পৃথক মত পোষণ করত। কিন্তু সময় ও সুযোগের প্রেক্ষিতে তারা একে অপরকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে তৃতীয় পক্ষকে শেষ করে ফেলার ফন্দী আঁটত। খুরাসানে প্রথম থেকেই প্রচুর সংখ্যক 'শীআনে আলী' ছিল এবং তারা সকলেই ছিল আবূ মুসলিমের সহযোগী।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুআবিয়া ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফর ইব্ন আবূ তালিবও কূফায় জনসাধারণের কাছ থেকে বায়আত গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর ইব্ন আবদুল আযীয প্রতাপশালী হয়ে ওঠায় তিনি মাদায়েনে চলে যান। তার সাথে কূফার কিছু লোকও এসেছিল। তিনি পার্বত্য এলাকার দিকে রওয়ানা হন এবং তা দখল করে হুলওয়ান, কূমিস, ইসফাহান ও রায়-এর উপর নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর ইসফাহানে অবস্থান করতে থাকেন। তিনি ১২৮ হিজরীতে (৭৪৫-৪৬ খ্রি.) শীরায দখল করে নেন। ইয়াযীদ ইব্ন উমর ইব্ন হুবায়রা ইরাকের গভর্নর নিযুক্ত হয়ে এসে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুআবিয়ার বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী পাঠান। ইসতাখরের সন্নিকটে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তাতে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুআবিয়া পরাজিত হন। তার অনেক সঙ্গী নিহত হয় এবং মানসূর ইব্ন জামহূর সিন্ধুর দিকে পালিয়ে যান। তার পশ্চাদ্ধাবন করা হয়, কিন্তু তাকে পাকড়াও করা সম্ভব হয়নি। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুআবিয়ার সঙ্গীদের মধ্যে যারা বন্দী হয় তাদের মধ্যে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলী আব্বাসী ছিলেন অন্যতম। কূফার গভর্নর ইয়াযীদ ইব্ন উমর তাকে মুক্ত করে দেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুআবিয়া আবূ মুসলিমের কাছে পালিয়ে যান। কেননা তিনি আহলে বায়তের শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন বলে আবূ মুসলিমের কাছ থেকে সাহায্য প্রাপ্তির আশা ছিল। কিন্তু তিনি শীরায থেকে কিরমান যান এবং সেখান থেকে হিরাতে গিয়ে পৌঁছেন। আবূ মুসলিম কর্তৃক নিযুক্ত হিরাতের কর্মকর্তা নাসর ইব্ন নাঈম তাকে সেখানে থামিয়ে আবূ মুসলিমকে তার আগমন সংবাদ জানান। আবূ মুসলিম লিখে পাঠান ঃ আবদুল্লাহ্ ইবন্ মুআবিয়াকে হত্যা কর এবং তার দুই ভাই হাসান ও ইয়াযীদকে মুক্ত করে দাও। নাসর ইব্ন সাইয়ার যথাযথভাবে সে নির্দেশ পালন করেন।

হিজরী ১৩০ সন (৭৪৭-৪৮ খ্রি.) শুরু হতেই উল্লিখিত চারটি শক্তি খুরাসানে একে অন্যের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। শেষ পর্যন্ত আলী ইব্ন কিরমানী ও আবূ মুসলিম নাসর ইব্ন সাইয়ার ও শায়বান খারিজীকে পরাজিত করে মার্ভের উপর নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। আবূ মুসলিম মার্ভের সরকারী প্রাসাদে গিয়ে জনসাধারণের কাছ থেকে বায়আত গ্রহণ করেন এবং একটি ভাষণও দেন। নাসর মার্ভ থেকে পরাজিত হয়ে সারাখস্ এবং তূস হয়ে নিশাপুরে এসে অবস্থান নেন। আর ইব্ন কিরমানী আবূ মুসলিমের সাথে থেকে তাঁর সব কথায়ই হ্যাঁ মিলাতে থাকেন। আবূ মুসলিম শায়বান খারিজীর কাছে (যিনি পরাজিত হয়ে মার্ভের সন্নিকটে

অবস্থান করছিলেন) বায়আত করার আহ্বান জানিয়ে একটি পয়গাম পাঠান। শায়বান উত্তরে বলেন, তুমিই বরং আমার কাছে বায়আত কর। এরপর শায়বান খারিজী সারাখ্সের দিকে চলে যান এবং বকর ইব্ন ওয়ায়েলের কিছু লোককে নিজের কাছে জড় করে নেন। এই সংবাদে আবূ মুসলিম সারাখ্সের দিকে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। সেখানে যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং শায়বান খারিজী নিহত হন। এরপর আবূ মুসলিম তাঁর নকীব মূসা ইব্ন কা'বকে আবীওয়ারদের দিকে এবং আবূ দাঊদ খালিদ ইব্ন ইবরাহীমকে বলখের দিকে প্রেরণ করেন। তারা উভয়েই জয়লাভ করেন। আবীওয়ারদ ও বলখের উপর যখন অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তখন আবূ মুসলিম আবূ দাঊদকে সেখান থেকে ডেকে পাঠান এবং ইয়াহইয়া ইব্ন নাঈমকে বলখের হাকিম (শাসক) নিয়োগ করেন। যিয়াদ ইব্ন আবদুর রহমান কাসরী, যিনি হুকুমতে বনূ উমাইয়ার পক্ষ থেকে বলখের শাসক ছিলেন এবং আবূ দাঊদের কাছে পরাজিত হয়ে তিরমিয চলে গিয়েছিলেন, ইয়াহইয়া ইব্ন নাঈমের সাথে পত্রালাপ করে তাকে নিজের সমমনা করে নেন। এরপর মুসলিম ইব্ন আবদুর রহমান বাহিলী, ঈসা ইব্ন যুরআ সালামী, তাখারিস্তান, মাওরাউন নাহর ও বলখের রাজন্যবর্গ, তিরমিযবাসী এবং ইয়াহইয়া ইব্ন নাঈমকে তার বাহিনীসহ সঙ্গে নিয়ে আবূ মুসলিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য রওয়ানা হন। তারা সবাই এক জোট হয়ে কালো পতাকাধারী (বনূ আব্বাসের দাঈ)-দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার শপথ নেন। মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান নাবাতীকে সম্মিলিত বাহিনীর অধিনায়ক নিয়োগ করা হয়।

আবূ মুসলিম এই সংবাদ শুনে আবূ দাঊদকে পুনরায় বল্খের দিকে প্রেরণ করেন। বল্খ থেকে সামান্য দূরে, একটি নদীর ধারে উভয় পক্ষের মুকাবিলা হয়। আবূ সাঈদ কুরাশী ছিলেন মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান নাবাতীর সাকা'হ্ (কমাণ্ডো) বাহিনীর অধিনায়ক। গোটা বাহিনীর পশ্চাৎভাগে যে সেনাদল থাকে তাদেরকে সাকা'হ বাহিনী বলা হয়। এই বাহিনীকে খুব ভালভাবে অস্ত্র সজ্জিত করে রাখা হয়েছিল, যাতে প্রতিপক্ষ ধোঁকা দিয়ে পিছন দিক থেকে হামলা চালিয়ে কোন ক্ষতি করতে না পারে। যখন ঘোরতর যুদ্ধ শুরু হয় তখন আবূ সাঈদও তার পশ্চাৎবর্তী বাহিনী নিয়ে শত্রুদের মুকাবিলা করার প্রয়োজন বোধ করেন। ঘটনাচক্রে আবূ সাঈদের পতাকার রংও ছিল কালো। যখন তিনি তার বাহিনী নিয়ে সম্মুখ দিকে অগ্রসর হন তখন দুর্ভাগ্যক্রমে সম্মুখবর্তী বাহিনীর যোদ্ধারা ভুলে গেল যে, তাদের পশ্চাৎবর্তী বাহিনীর পতাকার রংও কালো। অতএব তারা আবূ সাঈদের পতাকা দেখেই ধরে নিল, শত্রু বাহিনী পিছন দিক থেকেও তাদের উপর হামলা চালিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ওটা ছিল তাদেরই বাহিনী, যারা বিজয়ী বেশে বুক ফুলিয়ে সম্মুখপানে অগ্রসর হচ্ছিল। যা হোক এই ভুল বোঝাবুঝির কারণে মুকাতিলের সম্মুখ-বাহিনীর মধ্যে আতংকের সৃষ্টি হয় এবং তারা পালাতে শুরু করে। তাদের অনেকেই নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং সেখানেই তাদের সলীল সমাধি হয়। শেষ পর্যন্ত যিয়াদ ও ইয়াহইয়া তিরমিযের দিকে চলে যান এবং আবূ দাঊদ বল্খের উপর নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।

এই বিজয় লাভের পর আবূ মুসলিম দঊদকে বল্‌খ থেকে ফিরিয়ে আনেন এবং নাসর ইব্‌ন সাবীহ্ মুযানীকে সেখানকার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। আলী ইব্‌ন কিরমানী এবং তার ভাই উছমান আবূ মুসলিমের সাথেই থাকতেন। আবূ দাঊদ আবূ মুসলিমকে পরামর্শ দিলেন, এই দুই ভাইকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করা প্রয়োজন। আবূ মুসলিম এই পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং উছমান ইব্‌ন কিরমানীকে বল্‌খের হাকিম (শাসক) নিয়োগ করে সেখানে পাঠিয়ে দেন। উছমান বল্‌খে পৌঁছে ফারাফিদা ইব্‌ন যুহায়রকে নিজের সহকারী নিয়োগ করেন এবং নাসর ইব্‌ন সাবীহকে নিয়ে নিজে মার্ভ আররূফে চলে যান। এই সংবাদ শুনে মুসলিম ইব্‌ন আবদুর রহমান বাহিলী তিরমিয থেকে মিসরীদেরকে সঙ্গে নিয়ে বল্‌খ আক্রমণ করেন এবং অস্ত্র বলে তা দখল করে নেন। উছমান ও নাসর এই সংবাদ পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে বল্‌খ অভিমুখে রওয়ানা হন। তাদের আগমন সংবাদ শুনে আবদুর রহমানের সঙ্গীরা রাতের অন্ধকারে পালিয়ে যায়। নাসর একদিক থেকে এবং উসমান অন্যদিক থেকে বলখের উপর হামলা চালান। নাসরের সঙ্গীরা পলায়নকারীদের সাথে কোনরূপ সংঘর্ষে যায়নি। কিন্তু উছমান ইব্‌ন কিরমানী পলায়নকারীদের সাথে যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেন এবং নিজেই পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন। তার অনেক সঙ্গী নিহত হয় এবং তখনকার মত বল্‌খের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করা তার পক্ষে আর সম্ভব হয়নি। এই সংবাদ শোনার পর আবূ মুসলিম এবং আবূ দাঊদ বিষয়টি নিয়ে পরস্পর পরামর্শ করেন। এরপর আবূ মুসলিম নিশাপুরে রওয়ানা হন এবং আবূ দাঊদ পুনরায় বল্‌খে আসেন। আবূ মুসলিমের সঙ্গে ছিলেন আলী ইব্‌ন কিরমানী। আবূ মুসলিম নিশাপুরের পথে আলী ইব্‌ন কিরমানীকে হত্যা করেন এবং আবূ দাঊদের পরামর্শ অনুযায়ী বল্‌খ দখল করে আবদুর রহমানকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেন। এরপর তিনি উছমান ইব্‌ন কিরমানীকেও হত্যা করেন। এভাবেই তিনি কিরমানী ভ্রাতৃদ্বয়ের ঝামেলা চিরতরে মিটিয়ে ফেলেন।

ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, ইমাম ইবরাহীম আবূ মুসলিমকে প্রথমে ডেকেছিলেন। এরপর তাঁকে আসতে নিষেধ করে খুরাসানে প্রকাশ্যে দাওয়াতকার্য পরিচালনার নির্দেশ দেন। আবূ মুসলিম কাহতাবা ইব্‌ন শাবীবকে ধন-সম্পদসহ ইমাম ইবরাহীমের উদ্দেশে পাঠিয়েছিলেন। কাহ্‌তাবা ইমাম ইবরাহীমের সাথে সাক্ষাত করে যাবতীয় ধনসম্পদ তাঁর সমক্ষে পেশ করেন। ইমাম ইবরাহীম কাহ্‌তাবার হাতে একটি পতাকা তুলে দেন এবং তাকে মক্কা থেকে খুরাসানের দিকে পাঠিয়ে স্বয়ং হামীমায় চলে আসেন। হামীমায় পৌঁছতেই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। কাহ্‌তাবা ঐ পতাকা নিয়ে আবূ মুসলিমের কাছে আসেন। আবূ মুসলিম তা অগ্রবর্তী বাহিনীর জন্য নির্দিষ্ট করেন এবং কাহতাবাকে অগ্রবর্তী বাহিনীর অধিনায়ক নিয়োগ করেন। ১৩০ হিজরী (৭৪৭-৪৮ খ্রি.) শেষ হতে না হতেই আবূ মুসলিম খুরাসানের একটি বিরাট অংশের উপর নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে সেখানকার প্রত্যেকটি শত্রুকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দেন। আলী ইব্‌ন কিরমানীকে হত্যা করার পর আবূ মুসলিম ফিরে আসেন এবং আবূ আওন আবদুল মালিক ইব্‌ন ইয়াযীদ, খালিদ ইব্‌ন বারমাক, উছমান ইব্‌ন নাহীক, খাযিম ইব্‌ন খুযায়মা প্রমুখ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে কাহতাবাকে তূসের দিকে পাঠিয়ে দেন। তূসবাসীরা তাদের মুকাবিলা করে পরাজিত হয়। কাহতাবা নির্দয় পাষাণের মত তাদেরকে

পাইকারীহারে হত্যা করেন। এরপর কাহ্তাবা সুযকানে অবস্থানকারী তামীম ইব্ন নাসরের উপর হামলা পরিচালনার উদ্যোগ নেন। তাতে তামীম তার তিন হাজার সঙ্গীসহ নিহত হন। কাহতাবা শহরে প্রবেশ করে পাইকারী হত্যা চালান এবং খালিদ ইব্ন বারমাককে মালে গনীমত সংগ্রহ করার কাজে নিয়োগ করেন।

এরপর কাহ্তাবা নিশাপুরের উদ্দেশে রওয়ানা হন। সেখানে নাসর ইব্ন সাইয়ার অবস্থান করছিলেন। তিনি নিশাপুর থেকে কূমিসে পালিয়ে আসেন। কাহতাবা ১৩০ হিজরীর রমযান (৭৪৭ খ্রি এপ্রিল) মাসের শুরুতে নিশাপুর দখল করেন এবং শাওয়াল মাসের শেষ পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন। (কূফার গভর্নর ইয়াযীদ ইব্ন উমর ইব্ন হুবায়রা নাসর ইব্ন সাইয়ারের সাহায্যার্থে নাবাতা ইব্ন হানযালার নেতৃত্বে কূফা থেকে একটি সেনাবাহিনী পাঠিয়েছিলেন। নাসর ইব্ন সাইয়ার কূমিসেও বেশিদিন অবস্থান করেন নি। সেখান থেকে জুরজানে চলে আসেন। সেখানেই নাবাতা তার বাহিনীসহ নাসরের সাথে মিলিত হন। কাহতাবা যিলকদ মাসের প্রথম দিকে নিশাপুর থেকে জুরজানের দিকে রওয়ানা হন।

কাহতাবার সঙ্গীরা নাবাতার একটি বিরাট সিরীয় বাহিনীসহ সিরিয়া থেকে জুরজানে এসে পৌঁছার সংবাদে অত্যন্ত ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কাহতাবা তখন তাদের উদ্দেশে একটি জ্বালাময়ী ভাষণ দেন তাতে তিনি বলেন ঃ ইমাম ইবরাহীম ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, তুমি একটি বিরাট বাহিনীর মুকাবিলা করে জয়লাভ করবে। এতে সৈন্যদের মনে সাহসের সঞ্চার হয়। শেষ পর্যন্ত উভয় পক্ষের মধ্যে এক রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তাতে কাহতাবা জয়লাভ করেন। তিনি নাবাতার দেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করে তা আবূ মুসলিমের কাছে পাঠিয়ে দেন। এই যুদ্ধ ১৪৭ হিজরীর যিলহজ্জ (৭৬৫ খ্রি মার্চ) মাসের প্রথম দিকে সংঘটিত হয়। কাহতাবা জুরজান দখল করে ত্রিশ হাজার জুরজানবাসীকে হত্যা করেন। জুরজানে পরাজিত হওয়ার পর নাসর ইব্ন সাইয়ার 'খাওয়ারূর রায়'-এর দিকে চলে আসেন। সেখানকার আমীর ছিলেন আবূ বকর উকায়লী। ইয়াযীদ ইব্ন উমর ইব্ন হুবায়রা যখন এই পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হন তখন ইব্ন গালীফের অধিনায়কত্বে একটি বিরাট বাহিনী নাসরের সাহায্যার্থে প্রেরণ করেন।

কাহতাবা জুরজান থেকে আপন পুত্র হাসানকে 'খাওয়ারূর-রায়'-এ প্রেরণ করেন। পিছন থেকে একটি বাহিনী আবুল কামিল ও আবুল আব্বাস মারূযীর অধিনায়কত্বে হাসানের সাহায্যার্থে পাঠানো হয়। কিন্তু যখন তারা হাসানের বাহিনীর নিকটে গিয়ে পৌঁছেন তখন আবুল কামিল নিজ সঙ্গীদের নিয়ে সোজা নাসরের সাথে গিয়ে মিলিত হন। তিনি নাসরকে হাসানের সেনাবাহিনীর গতিবিধি সম্পর্কেও অবহিত করেন। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ হয় এবং হাসান ইবন কাহতাবার শোচনীয় পরাজয় ঘটে। বনূ নাসর মালে গনীমত এবং বিজয়ের সুসংবাদ নিয়ে যাচ্ছিল এবং অন্যদিকে ইব্ন গালীফ সাহায্যকারী বাহিনী নিয়ে আসছিলেন। রায় নামক স্থানে উভয়ের সাক্ষাত হয়। ইব্ন গালীফ চিঠি এবং মালে গনীমত গ্রহণ করেন এবং রায়-এ অবস্থান নেন।

নাসর এই সংবাদ শুনে অত্যন্ত ব্যথিত হন। যখন নাসর খুদরের উদ্দেশে রওয়ানা হন তখন গালীফ তার বাহিনী নিয়ে প্রথমে হামাদান, এরপর সেখান থেকে ইসফাহানে চলে যান।

নাসর দু'দিন পর্যন্ত রায়-এ অবস্থান করেন। তৃতীয় দিন অসুস্থ হয়ে পড়ার সাথে সাথে রায় ছেড়ে চলে যান। তিনি হিজরী ১৩১ সনের (৭৪৮খ্রি. নভেম্বর) ১২ই রবিউল আউয়াল সাদাহ্ নামক স্থানে পৌঁছে মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুর পর তার সঙ্গীরা হামাদানে চলে যায়। রায়-এর শাসক ছিলেন হাবীব ইব্‌ন ইয়াযীদ। নাসরের মৃত্যুর পর যখন কাহতাবা জুরজান থেকে নিজ বাহিনী নিয়ে রায়-এর দিকে আসেন তখন হাবীব ইব্‌ন ইয়াযীদ এবং তার সাথে যে সব সিরীয় ছিল, কোনরূপ মুকাবিলা ছাড়াই রায় ত্যাগ করে চলে যায়। কাহতাবা রায় দখল করে এখানকার অধিবাসীদের যাবতীয় মাল-আসবাব আটক করে ফেলেন। এখানকার বেশির ভাগ পলায়নকারী হামাদানে চলে যায়। কাহতাবা রায় থেকে আপন পুত্র হাসানকে হামাদানের দিকে প্রেরণ করেন। কিন্তু ঐ সমস্ত লোক হামাদান ছেড়ে নিহাওয়ান্দে চলে যায়। হাসান নিহাওয়ান্দে পৌঁছে শহর অবরোধ করে ফেলেন।

ইয়াযীদ ইব্‌ন উমর হুবায়রা হিজরী ১২৯ সনে (৭৪৬-৪৭ খ্রি.) আপন পুত্র দাউদ ইব্‌ন ইয়াযীদকে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুআবিয়ার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলেন এবং দাউদ ইব্‌ন ইয়াযীদ তার পশ্চাদ্ধাবন করতে করতে কিরমান পর্যন্ত চলে গিয়েছিলেন। দাউদের সাথে আমির ইব্‌ন সাবারাহও ছিলেন। ওরা দু'জন পশ্চাশ হাজার সৈন্য নিয়ে কিরমানে অবস্থান করছিলেন।

ইয়াযীদ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন হুবায়রা নাবাতা ইব্‌ন হানযালার নিহত হওয়ার সংবাদ পেয়ে দাউদ ইব্‌ন সাবারাহকে লিখেন ঃ তুমি কাহতাবার মুকাবিলার জন্য এগিয়ে যাও। তারা দু'জন পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নিয়ে কিরমান থেকে রওয়ানা হয় এবং ইসফাহানে গিয়ে পৌঁছে। কাহতাবা তাঁদের মুকাবিলার জন্য মুকাতিল ইব্‌ন হাকীমকে নির্দেশ দেন। হাসান ইব্‌ন কাহতাবা নিহাওয়ান্দ অবরোধ করে রেখেছেন জানতে পেরে ইব্‌ন সাবারাহ নিহাওয়ান্দ রক্ষার সংকল্প নেন এবং সেদিকে রওয়ানা হন। উভয় বাহিনী মুখোমুখি হলে কাহতাবার সঙ্গীরা এমন প্রাণপণে হামলা করে যে, খোদ ইব্‌ন সাবারাহ্ নিহত হন এবং তার বাহিনী পরাজিত হয়।

এটা হচ্ছে ১৩১ হিজরীর রজব (৭৪৯ খ্রি. এর মার্চ) মাসের ঘটনা। কাহতাবা এই বিজয় সংবাদ আপন পুত্র হাসানের কাছে পাঠান এবং স্বয়ং ইসফাহানে বিশদিন অবস্থান করেন। এরপর হাসানের কাছে এসে অবরোধ-কর্মসূচিতে যোগ দেন। তিন মাস পর্যন্ত নিহাওয়ান্দবাসীরা অবরুদ্ধ থাকে। শেষ পর্যন্ত তা বিজিত হয় এবং সেখানকার অনেক লোক নিহত হয়। এরপর কাহতাবা হাসনকে হুলওয়ান প্রেরণ করেন এবং তা অতি সহজেই বিজিত হয়। এরপর কাহতাবা আবূ আওন ইব্‌ন আবদুল মালিক ইব্‌ন ইয়াযীদ খুরাসানীকে শাহরিযুর আক্রমণের জন্য পাঠান। সেখানকার হাকিম ছিলেন উছমান ইব্‌ন সুফইয়ান। তার অগ্রবর্তী বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মারওয়ান ইব্‌ন মুহাম্মদ। আবূ আওন ও উছমানের মধ্যে শেষ যিলহজ্জ পর্যন্ত যুদ্ধ চলে। শেষ পর্যন্ত উছমান নিহত হন এবং তার বাহিনী পরাজিত হয়। আবূ আওন মাওসিল শহর দখল করে নেন।

আমির ইব্‌ন সাবারাহ্ নিহত হলে দাউদ ইব্‌ন ইয়াযীদ নিজ পিতার কাছে পালিয়ে আসেন। দাউদ যখন ইয়াযীদ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন হুবায়রার এই পরাজয়ের সংবাদ পান তখন

একটি বিরাট বাহিনী নিয়ে রওয়ানা হন। খলীফা মারওয়ান ইব্ন মুহাম্মদ ও হাওসারাহ্ ইব্ন সুহায়ল বাহিলীকে একটি বাহিনী দিয়ে তার সাহায্যে প্রেরণ করন। ইয়াযীদ ইব্ন উমর ইব্ন হাওসারাহ্ ইব্ন সুহায়ল হুলওয়ানে পৌঁছেন। কাহতাবাও এই সংবাদ পেয়ে হুলওয়ানের দিকে রওয়ানা হন এবং আনবারের দিক থেকে দজলা অতিক্রম করেন। ইয়াযীদ ইব্ন উমরও কূফায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং হাওসারাকে পনর হাজার সৈন্য দিয়ে কূফার দিকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেন। কাহতাবা আনবার থেকে ১৩২ হিজরীর ৮ই মুহাররম (৭৪৯ খ্রি.-এর ২৮শে আগস্ট) ফুরাত নদী অতিক্রম করেন। ঐ সময়ে হুবায়রা সেখান থেকে ২৩ ফারাসাং দূরে ফুরাত উপকূলে অবস্থান করছিলেন। সঙ্গীরা তাকে পরামর্শ দিল, 'আপনি কূফা পরিত্যাগ করে খুরাসানে চলে যান। তাহলে কাহতাবা বাধ্য হয়ে কূফার সংকল্প ত্যাগ করে আমাদের পশ্চাদ্ধাবন করতে আসবে। ইয়াযীদ ইব্ন উমর তাদের ঐ পরামর্শ উপেক্ষা করে মাদায়েনের দিক থেকে দজলা অতিক্রম করেন এবং উভয় বাহিনী কূফার উদ্দেশে ফুরাতের উভয় তীর ধরে এগিয়ে যেতে থাকে। হেঁটে পার হওয়া যায় এমন এক স্থান দিয়ে কাহতাবা নদী অতিক্রম করেন। উভয় পক্ষের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। ইয়াযীদ ইব্ন উমর ইব্ন হুবায়রার বাহিনী পরাজিত হয়। কিন্তু কাহতাবা নিহত হন। কাহতাবা মৃত্যুকালে অন্তিম উপদেশ দেন, কূফায়ই শীআনে আলীর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং আবূ সালিমাকেই আমীর মনোনীত করতে হবে। হাওসারাহ, ইয়াযীদ ইব্ন উমর ইব্ন হুবায়রা এবং ইব্ন নাবাতা ইব্ন হানযালা ওয়াসিতের দিকে পলায়ন করেন। কাহতাবার বাহিনী হাসান ইব্ন কাহতাবাকে তাদের নেতা মনোনীত করে। এ ঘটনার সংবাদ যখন কূফায় পৌঁছে তখন মুহাম্মদ্ বিন খালিদ কাসরী 'শীআনে আলী'কে (আলী ভক্তদেরকে) একত্র করে ১৩২ হিজরী (৭৪৯ খ্রি.-এর আগস্ট মাসে) আশুরার রাতে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং সরকারী প্রাসাদ দখল করে নেন।

এই ঘটনার সংবাদ শুনে হাওসারা ওয়াসিত থেকে কূফায় প্রত্যাবর্তন করেন। মুহাম্মদ ইব্ন খালিদ সরকারী প্রাসাদে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। কিন্তু হাওসারার সঙ্গীরা আব্বাসী দাওয়াত গ্রহণ করে তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে শুরু করে। ফলে বাধ্য হয়ে তিনিও ওয়াসিতে ফিরে যান। মুহাম্মদ ইব্ন খালিদ এই ঘটনা এবং সরকারী প্রাসাদে নিজের অবরুদ্ধ হওয়ার সংবাদ ইব্ন কাহতাবাকে দেন। হাসান ইব্ন কাহতাবা কূফায় প্রবেশ করেন এবং মুহাম্মদ ইব্ন খালিদকে সঙ্গে নিয়ে আবূ সালিমার কাছে যান। তিনি আবূ সালিমাকে আমীর মনোনীত করেন এবং তার হাতে বায়আতও করেন। আবূ সালিমা হাসান ইব্ন কাহতাবাকে ইব্ন হুবায়রার মুকাবিলার জন্য ওয়াসিতে প্রেরণ করেন এবং মুহাম্মদ ইব্ন খালিদকে কূফার গভর্নর নিয়োগ করেন। এরপর আবূ সালিমা হুমায়দ ইব্ন কাহতাবাকে মাদায়েনের দিকে প্রেরণ করেন। আহওয়াযের আমীর ছিলেন আবদুর রহমান ইব্ন হুবায়রা। তার ও বাসসামের সাথে হুমায়দের যুদ্ধ হয় এবং তিনি পরাজিত হয়ে বসরার দিকে পলায়ন করেন। বসরার শাসনকর্তা ছিলেন মুসলিম ইব্ন কায়কাবাহ্ বাহিলী। বাসসাম আবদুর রহমানকে পরাজিত করে সুফইয়ান ইব্ন মুআবিয়া ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন মুহাল্লাবের হাতে বসরার শাসনভার ন্যস্ত করেন। ১৩২ হিজরীর

সফর (৭৪৯ খ্রি. সেপ্টেম্বর) মাসে যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং মুসলিম তাতে জয়লাভ করেন। তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত বসরাকে নিজের দখলে রাখেন, যতক্ষণ না তার কাছে ইয়াযীদ ইব্ন উমরের নিহত হওয়ার সংবাদ এসে পৌঁছে। এই সংবাদ শুনে তিনি বসরা থেকে বেরিয়ে পড়েন এবং এই সুযোগে মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসরা দখল করে নেন। কয়েকদিন পর আবূ মালিক আবদুল্লাহ্ ইব্ন উসায়দ খুযায়ী আবূ মুসলিমের পক্ষ থেকে বসরায় এসে উপস্থিত হন। আবুল আব্বাস সাফ্ফাহ্ তার খিলাফতের বায়আত গ্রহণ করার পর সুফইয়ান ইব্ন মুআবিয়াকে বসরার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন।

ইমাম ইবরাহীমের মৃত্যুকালে হামীমায় তার পরিবারের নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন ঃ আব্বাস আবদুল্লাহ্ সাফ্ফাহ্, আবূ জা'ফর মানসূর, আবদুল ওহ্হাব (এই তিনজন ছিলেন ইমাম ইবরাহীমের ভাই), মুহাম্মদ ইব্ন ইবরাহীম, ঈসা ইব্ন মূসা, দাউদ, ঈসা, সালিহ্, ইসমাঈল, আবদুল্লাহ্ ও আবদুস সামাদ। শেষোক্ত ব্যক্তি ছিলেন ইমাম ইবরাহীমের চাচা। ইমাম ইবরাহীম গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে আপন ভাই আবুল আব্বাস আবদুল্লাহ্ সাফ্ফাহকে নিজের স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করেছিলেন এবং মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তাকে ওসীয়ত করেছিলেন যেন তিনি কূফায় গিয়ে বসবাস করেন। ঐ ওসীয়ত অনুযায়ী আবুল আব্বাস সাফফাহ্ তাঁর পরিবারের উল্লিখিত ব্যক্তিদেরকে সঙ্গে নিয়ে হামীমা থেকে কূফায় চলে আসেন। আবুল আব্বাস যখন কূফায় পৌঁছেন তখন সেখানে আবূ সালিমা কূফায় ইমাম ইবরাহীমের প্রতিনিধি এবং কূফা কেন্দ্রে দাওয়াতী আন্দোলন পরিচালনার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। কিন্তু তখন তার সমগ্র প্রচেষ্টা হযরত আলীর বংশধরকে খলীফা নিয়োগের ব্যাপারে নিয়োজিত ছিল। কাহতাবা ইব্ন শাবীবও তাই চাইতেন। কিন্তু যেহেতু আবূ হাশিম ইব্ন মুহাম্মদ ওসীয়ত করে গিয়েছিলেন যে, মুহাম্মদ ইব্ন আলী আব্বাসকে যেন তার দলের সকল লোক নিজেদের নেতা বলে স্বীকার করে, অতএব তিনি এ ব্যাপারে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারছিলেন না।

যখন সংবাদ পাওয়া যায় যে, আবুল আব্বাস কূফার নিকটে এসে পৌঁছেছেন তখন আবূ সালিমাহ্ শীআনে আলীসহ তাঁকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের জন্য 'হাম্মামে আইউন' পর্যন্ত আসেন এবং আবুল আব্বাসকে ওয়ালীদ ইব্ন সা'দের ঘরে নিয়ে তোলেন। তিনি সমগ্র শীআনে আলী এবং বাহিনী অধিনায়কদের কাছে চল্লিশদিন পর্যন্ত এই রহস্য গোপন রাখেন। আবূ সালিমাহ্ চান, আবূ তালিবের পরিবারের কোন ব্যক্তিকে খলীফা নির্বাচিত করে তাঁর হাতেই বায়আত করা হোক। কিন্তু আবূ জাহ্ম, যিনি শীআনে আলীরই অন্যতম নেতা ছিলেন। উপরোক্ত মতের বিরোধিতা করে বলেন, এরূপ করলে আবূ তালিবের পরিবারের লোকেরা হয়ত খিলাফত থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে এবং জনসাধারণ আবুল আব্বাসকেই খলীফা বলে স্বীকার করে নেবে। যদি আবুল আব্বাস ইমাম ইবরাহীমের ওসীয়ত অনুযায়ী কূফায় না আসতেন তাহলে এটা সম্ভব ছিল যে, আবূ সালিমাহ্ আবূ তালিবের পরিবারেরই কোন না কোন ব্যক্তিকে খলীফা নির্বাচন করতে সক্ষম হতেন। আবূ সালিমাহ্ চাচ্ছিলেন না যে, লোকেরা আবুল আব্বাসের আগমন সম্পর্কে অবহিত হোক এবং তার দিকে ঝুঁকে পড়ুক। আবূ সালিমাহ্ ঐ সময়কালের মধ্যে

ইমাম জা'ফর সাদিককে লিখেন, আপনি কূফায় আসুন এবং খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হোন। কিন্তু ইমাম জা'ফর সাদিক তাতে সম্মত হননি। এদিকে ক্রমে ক্রমে লোকেরা কূফায় আবুল আব্বাস সাফ্ফাহের আগমন সংবাদ জেনে ফেলে।

তখন কূফায় দুই শ্রেণীর লোক ছিল। এক শ্রেণীর লোক আব্বাস পরিবারকে এবং অপর শ্রেণীর লোক আবূ তালিব পরিবারকে খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত করতে চাইত। আব্বাসী পক্ষের লোকেরা আবুল আব্বাসের আগমন সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে তাঁর কাছে আসা-যাওয়া শুরু করে। জনসাধারণ যখন একথা জানতে পারে যে, কূফার গভর্নর আবূ সালিমাহ্ (যিনি 'ওয়াযীরে আহলে বায়ত' উপাধিতে বিখ্যাত ছিলেন) আবুল আব্বাস আবদুল্লাহ্ সাফ্ফাহর প্রতি আতিথ্য প্রদর্শনের ক্ষেত্রে উপেক্ষার ভাব দেখিয়েছেন তখন 'শীআনে আলী'র অনেক লোকও সাফ্ফাহের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে। এভাবে কূফায় আবুল আব্বাস আবদুল্লাহ্ সাফ্ফাহের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে। এভাবে কূফায় আবুল আব্বাস আবদুল্লাহ্ সাফ্ফাহের উপস্থিতি সাধারণভাবে তার প্রতি মানুষের সহানুভূতি ও সমর্থন কুড়াতে সক্ষম হয়।

শেষ পর্যন্ত ১৩২ হিজরীর ১২ রবিউল আউয়াল (৭৪৯ খ্রি. ৩০শে অক্টোবর) রোজ শুক্রবার জনসাধারণ একত্রিত হয়ে আবুল আব্বাস আবদুল্লাহ্ সাফ্ফাহকে তাঁর বাসস্থান থেকে সরকারী প্রাসাদে নিয়ে তোলে। আবদুল্লাহ্ সাফ্ফাহ্ সরকারী প্রাসাদ থেকে জামে মসজিদে আসেন। এরপর খুতবা দেন এবং জুমুআর নামায পড়ান। নামাযের পর পুনরায় তিনি মিম্বরে আরোহণ করেন এবং একটি ভাষণ দেন। তাঁর ঐ ভাষণ ছিল অত্যন্ত সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী। তাতে তিনি নিজেকে খিলাফতের যোগ্য বলে প্রমাণ করেন, জনসাধাণের ভাতা বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দেন এবং কূফাবাসীদের প্রশংসা করেন। এরপর তার চাচা দাউদ মিম্বরে আরোহণ করে বক্তৃতা দেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় বনূ আব্বাসের খিলাফতের সাথে মানানসই শব্দাবলী ব্যবহার করেন এবং বনূ উমাইয়ার নিন্দা করেন। তিনি শ্রোতাদের উদ্দেশে বলেন ঃ আজ আমীরুল মু'মিনীন আবদুল্লাহ্ সাফ্ফাহ্ জ্বর ও ব্যথায় কিছুটা আক্রান্ত; তাই আপনাদের সামনে বেশি কিছু বলতে পারেননি। আপনারা সবাই তাঁর জন্য দু'আ করুন। এরপর আবুল আব্বাস আবদুল্লাহ্ সাফ্ফাহ্ সরকারী প্রাসাদে চলে যান এবং তাঁর ভাই আবূ জা'ফর মানসূর মসজিদে বসে রাত পর্যন্ত জনসাধারণের কাছ থেকে বায়আত গ্রহণ করতে থাকেন। আবুল আব্বাস আবদুল্লাহ্ সাফফাহ্ খিলাফতের বায়আত গ্রহণ করার জন্য প্রথমে সরকারী প্রাসাদে যান। এরপর সেখান থেকে আবূ সালামার তাঁবুতে গিয়ে তার সাথে সাক্ষাত করেন। আবূ সালিমা বায়আত করেছিলেন বটে, তবে অন্তর দিয়ে এই বায়আত এবং আব্বাসীদের খিলাফত সমর্থন করেননি। আবদুল্লাহ্ সাফ্ফাহ্ কূফার আশেপাশের এলাকার প্রতিনিধিত্ব আপন চাচা দাউদকে প্রদান করেন এবং আপন অপর চাচা আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলীকে আবূ আওন ইব্ন ইয়াযীদের সাহায্যার্থে প্রেরণ করেন। তিনি আপন ভাতিজা ঈসা ইব্ন মূসাকে কাহতাবার সাহায্যার্থে প্রেরণ করেন, যিনি ওয়াসিত অবরোধ করে রেখেছিলেন। ইয়ামীমী ইবন জা'ফর ইব্ন তামাম ইব্ন আব্বাসকে হুমায়দ ইব্ন কাহ্তাবার সাহায্যার্থে মাদায়েনে প্রেরণ করা হয়। অনুরূপভাবে

সব দিকেই অধিনায়কদের নিয়োগ ও মুতায়েন করা হয়। আবূ মুসলিম খুরাসানেই ছিলেন এবং খুরাসানকে দ্রুত শত্রুমুক্ত করেছিলেন। আবদুল্লাহ্ সাফ্ফাহ্ খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারেই আবূ মুসলিমের পরামর্শ চাইতেন এবং তিনি যে পরামর্শ দিতেন তা-ই নির্দ্বিধায় মেনে নিতেন।

সমগ্র ইসলামী বিশ্বে ঐ যুগ ছিল অত্যন্ত নাজুক ও ভয়ংকর যুগ। প্রতিটি প্রদেশের এখানে সেখানে লড়াই ও বিশৃঙ্খলা চলছিল। ওয়াসিতে ইব্‌ন হুবায়রাকে পরাজিত করা সহজ ছিল না। এদিকে উমাবী খলীফা মারওয়ান ইব্‌ন মুহাম্মদ সিরিয়ায় বিদ্যমান ছিলেন। হিজাযেও নৈরাজ্য চলছিল। মিসরের অবস্থাও ছিল শোচনীয়। স্পেনে তখন পর্যন্ত আব্বাসী আন্দোলনের কোন প্রভাবই পড়েনি। জাযীরা ও আর্মেনিয়ায় উমাবী শাসকগণ বিদ্যমান ছিলেন এবং তারা আব্বাসীদের মুকাবিলার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিও গ্রহণ করেছিলেন। খুরাসানেও পুরোপুরি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বসরায়ও আব্বাসী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হতে পারছিল না। হাদরামাওত, ইয়ামামা ও ইয়ামনের অবস্থাও ছিল তথৈবচ। আবদুল্লাহ্ সাফ্ফাহ্ খলীফা হওয়ার পর আলে 'আবূ তালিব' বা আলাবীদের মধ্যে এক ধরনের হতাশা ছড়িয়ে পড়ে। তাঁরা ঐ সিদ্ধান্তকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। কেননা তাঁরা নিজেদেরই খিলাফত কামনা করছিল। আব্বাসীদের এই সাফল্যের মূলে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে মুহাম্মদ ইব্‌নুল হানাফিয়ার পুত্র আবূ হিশাম আবদুল্লাহর সেই ওসীয়ত যা তিনি মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাসের উদ্দেশে প্রদান করেছিলেন। ঐ ওসীয়তের কারণে শিয়াদের 'কায়সায়া' ফিরকার এই আকীদা প্রতিষ্ঠিত হয় যে, হযরত আলী (রা)-এর পর যথাক্রমে মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়া, আবূ হিশাম আবদুল্লাহ্, মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী আব্বাসী, ইবরাহীম ও আবদুল্লাহ্ সাফফাহ্ মুসলমানদের ইমাম হয়েছেন। এভাবে শিয়াদের একটি বিরাট দল মূল শিয়াদের থেকে পৃথক হয়ে আব্বাসীদের পক্ষে চলে যায়। ফলে আলাবী কিংবা ফাতিমীরা আব্বাসীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার কোন সুযোগ পায়নি, ভিতরে ভিতরে শুধু হাহুতাশই করতে থাকে।

শেষ উমাবী খলীফা মারওয়ান ইব্‌ন মুহাম্মদ নিহত হলে বালাকার শাসনকর্তা হাবীব ইব্‌ন মুররা আবদুল্লাহ্ সাফ্ফাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন, অথচ ইতিপূর্বে তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আলী আব্বাসীর হাতে বায়আত করেছিলেন। হিম্‌সবাসীরাও তার সাথে যোগ দেয়। অপর দিকে আর্মেনিয়ার গভর্নর ইসহাক ইব্‌ন মুসলিম উকায়লীও আব্বাসীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এই সমস্ত বিদ্রোহ দমনের জন্য আবদুল্লাহ্ সাফ্ফাহ্ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এবং নিজের আত্মীয়-স্বজনদের প্রেরণ করেন এবং তাতে ক্রমশ সাফল্য অর্জিত হয়। কিন্তু ইয়াযীদ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন হুবায়রা তখন পর্যন্ত ওয়াসিত এলাকা নিজ দখলে রেখেছিলেন এবং কোন অধিনায়কই তাকে পরাজিত করতে পারছিলেন না। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে আবূ জা'ফর মানসূর ও আবদুল্লাহ্ সাফ্ফাহ্ তার সাথে সন্ধি করেন এবং তিনি বায়আত করতে রাযী হন। কিন্তু আবূ মুসলিম খুরাসান থেকে আবদুল্লাহ্ সাফ্ফাহকে লিখেন ঃ ইয়াযীদ ইব্‌ন উমরের অস্তিত্ব

অত্যন্ত ভয়ংকর। তাকে অবিলম্বে হত্যা করুন। অতএব প্রতারণার মাধ্যমে মানসূর আব্বাসী ইয়াযীদকে হত্যা করে উপরোক্ত আশংকা থেকে মুক্তি লাভ করেন।

এবার কূফায় আবূ সালামা অবশিষ্ট ছিলেন। বাহ্যত তাকে হত্যা করার পিছনে কোন কারণ পাওয়া যাচ্ছিল না। কেননা আব্বাসীরা তাদের খিলাফতের এই সূচনাকালে প্রকাশ্যে শীআনে আলীর বিরোধিতা করতে চাচ্ছিল না। আবূ সালামার যাবতীয় অবস্থা লিপিবদ্ধ করে তা আবূ মুসলিমের কাছে খুরাসানে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং এ ব্যাপারে তার পরামর্শ তলব করা হয়। আবূ মুসলিম লিখেন, আবূ সালামাকে অবিলম্বে হত্যা করা উচিত। এর উত্তরে আবদুল্লাহ্ সাফ্ফাহ্ আপন চাচা দাঊদ ইব্ন আলীর পরামর্শ নিয়ে আবূ মুসলিমকে লিখেন ঃ যদি আমরা তাকে হত্যা করি তাহলে তার সমর্থকবৃন্দ এবং শীআনে আলীর পক্ষ থেকে প্রকাশ্য বিরোধিতা ও বিদ্রোহের আশংকা রয়েছে। অতএব আবূ সালামাকে হত্যা করার জন্য তুমি ওখান থেকে কোন লোক পাঠিয়ে দাও। আবূ মুসলিম এ কাজের জন্য মুরাদ ইব্ন আনাসকে পাঠিয়ে দেন। মুরাদ কূফায় আসে এবং একদা আবূ সালামা কোন এক গলিপথে হেঁটে যাওয়ার সময় সে তাকে তরবারির আঘাতে হত্যা করে। মুরাদ ইব্ন আনাস অকুস্থল থেকে দ্রুত পালিয়ে যায় এবং সাধারণ্যে প্রচারিত হয়ে পড়ে যে, জনৈক খারিজী আবূ সালামাকে হত্যা করেছে। এরপর আবূ মুসলিম সুলায়মান ইব্ন কাসীরকেও অনুরূপভাবে হত্যা করেন। ইনি হচ্ছেন সেই সুলায়মান যিনি আবূ মুসলিমকে প্রথমে খুরাসান থেকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন এবং আবূ দাঊদ তাকে রাস্তা থেকে পুনরায় ডেকে নিয়ে এসেছিলেন। মোটকথা, যাদের পক্ষ থেকেই আবূ মুসলিমের বিরোধিতা হওয়ার সম্ভাবনা ছিল তিনি তাদের সকলকেই বেছে বেছে হত্যা করান।

আব্বাসীয়দের হাতে উমাইয়াদের পাইকারী হত্যা

'খিলাফতে ইসলামিয়াকে' যে সম্প্রদায় বা পরিবার নিজেদের অধিকার মনে করে তারা অত্যন্ত বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে। বনূ উমাইয়ার ইসলামী হুকুমতকে তাদের গোত্র ও পরিবারের মধ্যে সীমিত রাখার চেষ্টা ছিল তাদের একটি ভুল। বনূ আব্বাস এবং বনূ হাশিমও যদি খিলাফতে ইসলামিয়াকে নিজেদের গোত্রগত অধিকার বলে মনে করে থাকেন তাহলে এটাও ছিল তাদের একটি ভ্রান্তি এবং অন্যায় ও অবিচারমূলক মনোবৃত্তি। কিন্তু পৃথিবীতে যেহেতু সাধারণভাবে মানুষ এই ভ্রান্তির শিকার যে, হুকুমত বা সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রেও উত্তরাধিকারিত্ব চলে এবং তাতে অন্যায়ের কিছু নেই– তাই যখন কোন ব্যক্তি নিজের হারানো সাম্রাজ্য কোন লুণ্ঠনকারীর কাছ থেকে ফিরিয়ে আনতে চায় তখন বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাকে হত্যাকাণ্ড চালাতে হয়। বনূ আব্বাস বনূ উমাইয়াকে যেরূপ পাইকারীভাবে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে এবং তাদের সাথে যেরূপ নির্মম আচরণ করেছে তার দৃষ্টান্ত মানব-ইতিহাসে বিরল। অবশ্য প্রাগৈতিহাসিক যুগে এর কিছু কিছু নযীর পাওয়া যায়। যেমন, বখ্তে নসর বনী ইসরাঈলকে অত্যন্ত নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল। সে চেয়েছিল ভূ-পৃষ্ঠ থেক বনী ইসরাঈলের অস্তিত্ব

চিরতরে মুছে ফেলতে। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি, বনী ইসরাঈল এখনো দুনিয়ায় টিকে আছে। হিন্দুস্থানে আর্যরা অনার্যদের উপর এর চাইতেও অধিক জুলুম-নির্যাতন চালিয়েছিল। কিন্তু হিমালয় পর্বত, বিন্ধ্যাচলের অরণ্য ভূমি এবং রাজপুতানার মরু অঞ্চলে অনার্যরা টিকে আছে। আজ তারা শূদ্র ও হরিজন আকারে ভারতের একটি উল্লেখযোগ্য জনগোষ্ঠী। হিন্দুস্থানের আর্যরাও মূলত ইরান ও খুরাসানের লোক ছিল। আব্বাসীদের খুরাসানী বংশোদ্ভূত সেনাপতিও বনূ উমাইয়াদের হত্যা ও লুণ্ঠনের ক্ষেত্রে আব্বাসীদের এমন সব জুলুম-অত্যাচার ও বাড়াবাড়িতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, যার তুলনায় হিন্দুস্থানের মজলুম অনার্যদের জুলুম-অত্যাচারের কাহিনী একটি মামুলী ব্যাপার বলেই মনে হয়। বিশ্বের অনেক গুপ্ত প্রতিষ্ঠানের অবস্থা অধ্যয়ন করলে বোঝা যায়, তারা তাদের গোপন ষড়যন্ত্র বা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে কত বিপুল সংখ্যক মানুষকেই না হত্যা করেছে এবং নারী-পুরুষ ও আবাল-বৃদ্ধবনিতা নির্বিশেষে মানব জাতির উপর কত অকথ্য জুলুম-নির্যাতন চালিয়েছে। মুসলিম ইতিহাসেও এ ধরনের অনেক দৃষ্টান্ত আছে। উমাইয়া পরিবারের হাত থেকে ইসলামী খিলাফত ছিনিয়ে নেওয়ার মধ্যে অপরাধের কিছু ছিল না। তবে উমাইয়াদের মত আর একটি পরিবারের কাছে তা (ইসলামী খিলাফত) হস্তান্তরিত হওয়ার মধ্যে সৌন্দর্যের বা প্রশংসারও কিছু ছিল না। কেননা, এই হস্তান্তরের পিছনে ইসলামী ও ইসলামী বিশ্বের কল্যাণ সাধনের কোন উদ্দেশ্য নিহিত ছিল না।

আবূ মুসলিম, কাহতাবা ইব্ন হাবীব এবং আহলে বায়তের অন্যান্য নকীব খুরাসানের বিভিন্ন শহরে অত্যন্ত নৃশংসভাবে যে হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিল সে সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে কিছুটা আলোচনা করেছি। খোদ ইমাম ইবরাহীম আবূ মুসলিমকে তার শেষ পত্রে কড়া নির্দেশ দিয়েছিলেন ঃ খুরাসানে কোন আরবী ভাষীকে জীবিত রাখবে না। এর দ্বারা তিনি বনূ উমাইয়ার সমস্ত লোকদের বুঝাতে চেয়েছিলেন যারা ছিল আরব বংশোদ্ভূত এবং যারা বিজয়ী বেশে খুরাসানে নিজেদের বসতি গড়ে তুলেছিল। কেননা এদেরকে উৎখাত করতে পারলে খুরাসানে যে সব নওমুসলিম রয়েছে তারা অনায়াসেই আব্বাসীদের দাওয়াত কবুল করে নেবে। যাহোক আবূ মুসলিম সে নির্দেশ অনুযায়ী আরবী ভাষীদের নির্দ্বিধায় হত্যা করেন। আর এর ফলে আরবী ভাষা ও সংস্কৃতির যে চর্চা সেখানকার অনারবদের মধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছিল তা হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায় এবং ইরানী ভাষা, সংস্কৃতি ও আচার-আচরণ মরতে মরতেই যেন পুনরুজ্জীবিত হয়ে ওঠে। ঐ আরবী ভাষীদেরকে হত্যা করা না হলে আজ ইরান ও খুরাসান ফারসী ভাষী দেশ না হয়ে আরবী ভাষী দেশ হতো। আবূ মুসলিম স্বয়ং ছিলেন খুরাসানী ও ইরানী বংশোদ্ভূত। অতএব তার কাছে আরবদের হত্যা করার চাইতে আকর্ষণীয় কাজ আর কিছুই হতে পারত না। গোত্র ও সম্প্রদায়গত বিদ্বেষ ও শত্রুতা, ইসলাম যার মূলোৎপাটন করেছিল, বনূ উমাইয়ার যুগে পুনরায় তা সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে। আর এ কারণেই বনূ উমাইয়া বনূ হাশিমের উপর অমানুষিক জুলুম-নির্যাতন চালাতে থাকে। অবস্থা শেষ পর্যন্ত এই পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে যে, তারা যখনই কোন ব্যক্তি সম্পর্কে জানতে পারত যে, সে উমাইয়া গোত্রের, তখন

আপনা-আপনি তাদের অন্তরে এক নিদারুণ আতংকের সৃষ্টি হতো। অতএব যখনই তারা সুযোগ পেত তখনই ঐ ভয় ও আতংক থেকে রেহাই পাওয়ার জন তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করত। আর ঐ আতংক দূর করার মোক্ষম পন্থা হলো, বনূ উমাইয়াদের অস্তিত্ব ভূ-পৃষ্ঠ থেকে চিরদিনের জন্য মুছে ফেলা।

আবদুল্লাহ্ সাফ্ফাহ্র চাচা আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলী ১৩২ হিজরী ৫ই রমযান (৭৫০ খ্রি. মার্চ) মাসে দামেশকে প্রবেশ করে সেখানে পাইকারীভাবে হত্যাকাণ্ড চালাবার নির্দেশ দেন। যখন সর্বশেষ উমাবী খলীফা মারওয়ান ইব্ন মুহাম্মদ বূসীরে নিহত হন তখন আব্বাসীদের কাছে সব চাইতে প্রয়োজনীয় কাজ ছিল উমাইয়াদের মূলোৎপাটন। অবশ্য বনূ উমাইয়ার সুউচ্চ প্রাসাদ ধ্বংস করার কাজে কিছু সংখ্যক বনূ উমাইয়াও আব্বাসীদের সাথে সহযোগিতা করে এবং এই অবাঞ্ছিত খিদমতের জন্যই তারা আব্বাসীদের পক্ষপুটে সসম্মানে বসবাস করার সুযোগ পায়। অতএব বনূ উমাইয়ার লোকদের একেবারে নির্মূল করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু আবূ মুসলিম ছিলেন সেজন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তিনি আবদুল্লাহ্ সাফ্ফাহ্ ও অন্যান্য নেতৃস্থানীয় আব্বাসীকে বার বার লিখেন ঃ বনূ উমাইয়ার কোন লোককে, চাই সে বনূ আব্বাসের প্রতি সহানুভূতিশীল হোক অথবা না হোক, কোনমতেই জীবিত রাখা চলবে না। তার এই পরামর্শ যথাযথভাবে কার্যকরও হয়। কিন্তু বনূ উমাইয়ার মধ্যে কিছু সংখ্যক ব্যক্তি এমনও ছিলেন, যারা বিরাট বিরাট বাহিনীসহ অত্যন্ত নাজুক ও সংকটময় মুহূর্তে উমাবী খলীফাদের বিরোধিতা করে আব্বাসীদের সাহায্য করেছিলেন। ওদের হত্যা করা ছিল সৌজন্য ও মানবতাবিরোধী। যে সব কবি ও সভাসদ আব্বাসী খলীফা ও আব্বাসী সেনাপতিদের দরবারে ওঠাবসা করতেন, আবূ মুসলিম তাদেরকে প্রচুর ঘুষ দিয়ে ঐসব দরবারে এমন সব কবিতা আবৃত্তি ও এমন সব কথা বলতে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করতেন যে সব কবিতা বা কথা শুনলে উমাইয়াদের সম্পর্কে আব্বাসীদের মনে ক্রোধের সঞ্চার হয় এবং তা প্রশমন করতে গিয়ে তারা বনূ উমাইয়াকে হত্যা করার জন্য অস্থির হয়ে ওঠে। আবূ মুসলিমের ঐ চেষ্টার ফলে আব্বাসীরা উমাইয়াদেরকে বেছে বেছে হত্যা করে। উল্লিখিত ধরনের একটি উত্তেজনাকর কবিতা শুনে সাফ্ফাহ্ সুলায়মান ইব্ন হিশাম ইব্ন আবদুল মালিককে প্রকাশ্য দরবারে একেবারে নির্দ্বিধায় হত্যা করেন। অথচ তিনি আবদুল্লাহ্ সাফ্ফাহর সাথে থাকতেন এবং তার প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ছিলেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলী ফিলিস্তীনে অবস্থানকালে একদা নদীর তীরে দস্তরখান বিছিয়ে পানাহার করছিলেন। বনূ উমাইয়ার আশি-নব্বই জন লোকও তার সাথে ঐ পানাহারে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তখন শিবল ইব্ন আবদুল্লাহ্ সেখানে আসে এবং এমন সব কবিতা আবৃত্তি করতে শুরু করে যেগুলোর মধ্যে বনূ উমাইয়ার নিন্দাবাদ এবং ইমাম ইবরাহীমের বন্দী হওয়ার ঘটনাবলীর উল্লেখ ছিল এবং তা দ্বারা বনূ উমাইয়াকে হত্যা করার জন্য জনসাধারণকে দারুণভাবে উত্তেজিত করা হয়েছিল। ঐ কবিতা শোনার সাথে সাথে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলী তথা আবদুল্লাহ্ সাফ্ফাহের চাচা নির্দেশ দেন ঃ এখানে যে সব উমাইয়া আছে তাদেরকে অবিলম্বে হত্যা কর। সঙ্গে সঙ্গে তার ভৃত্যরা ঐ নিরীহ-নিরস্ত্র উমাইয়াদের

উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ফলে তাদের অনেকেই সঙ্গে সঙ্গে নিহত হয় এবং কেউ কেউ ভীষণভাবে আহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে; তবে তাদের দেহে তখনো প্রাণ ছিল। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আলী ঐ আহত ও নিহতদের সারিবদ্ধভাবে শুইয়ে তাদের উপর দস্তরখানা বিছিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। তদনুযায়ী দস্তরখান বিছানো হয়। এরপর তার উপর সাজিয়ে রাখা হয় হরেক রকমের খাবার। এবার আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আলী ঐ দস্তরখানের উপর বসে আহার গ্রহণে মনোনিবেশ করেন। তারা আহার্য গ্রহণ করছিলেন। আর তাদের দস্তরখানের নিচে ঐ সমস্ত মৃতপ্রায় লোক করুণ সুরে গোঙাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত ধীরে-সুস্থে যখন পানাহার পর্ব শেষ হলো তখন ঐ সব বেচারার ধড়ে আর প্রাণ ছিল না। ঐ সব নিহতের মধ্যে ছিলেন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান, মুইয্য ইব্‌ন ইয়াযীদ, আবদুল ওয়াহিদ ইব্‌ন সুলায়মান, আবূ উবায়দা ইব্‌ন ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুল মালিক প্রমুখ। কারো কারো মতে, পদচ্যুত খলীফা ইবরাহীমও ছিলেন তাঁদের অন্যতম। এরপর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস বনূ উমাইয়ার খলীফাদের কবরসমূহ খোঁড়ার নির্দেশ দেন। আবদুল মালিকের কবর থেকে তাঁর মাথার খুলি বেরিয়ে আসে। আমীরে মুআবিয়ার কবরে কিছুই পাওয়া যায়নি। কোন কোন কবরে কিছু ছিন্ন-ভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পাওয়া যায়। হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিকের কবরে তাঁর সম্পূর্ণ লাশ অক্ষত অবস্থায় পাওয়া যায়। শুধু তাঁর নাকের উপরাংশে কিছুটা পচন ধরেছিল। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আলী ঐ লাশে বেত্রাঘাত করে কিছুদিন তা শূলিতে ঝুলিয়ে রাখেন। এরপর পুড়িয়ে ছাই করে বাতাসে উড়িয়ে দেন। আবদুল্লাহ ইব্‌ন আলীর ভাই সুলায়মান আব্বাসী বসরায় বনূ উমাইয়ার একটি দলকে হত্যা করে লাশগুলো শুধু রাস্তার উপর ফেলেই রাখেন নি, সেগুলোর কাফন দাফনের উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। ফলে দীর্ঘদিন পর্যন্ত কুকুরের দল ঐ লাশগুলো টানা-হেঁচড়া করে। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আলীর অপর ভাই অর্থাৎ সাফ্ফাহের চাচা দাউদ ইব্‌ন আলী মক্কা, মদীনা, হিজায ও ইয়ামানে এক এক করে উমাবীদেরকে খুঁজে বের করেন এবং অত্যন্ত নৃশংসভাবে হত্যা করেন। শেষ পর্যন্ত ঐ সমস্ত এলাকা থেকে বনূ উমাইয়ারা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। মোটকথা, রাষ্ট্রের সর্বত্র এই সাধারণ নির্দেশ জারি করা হয় যে, যেখানেই বনূ উমাইয়ার কোন লোক দৃষ্টিগোচর হবে, সঙ্গে সঙ্গেই তাকে যেন হত্যা করা হয়। রাজ্যসমূহের শাসনকর্তা এবং শহরসমূহের হাকিমরা সাধারণভাবে আব্বাসী বংশেরই লোক ছিলেন। উমাইয়াদের খুঁজে বের করে হত্যা করাই ছিল তাদের প্রধান দায়িত্ব। এমন কি কোন হিংস্র জন্তু শিকার করার জন্য যেমন লোকেরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঘর থেকে বের হয় তেমনি বনূ উমাইয়াকে শিকার করার জন্যও লোকেরা প্রতিদিন ঘর থেকে বের হতো। কোন ঘর, কোন পল্লী, কোন গ্রাম বা কোন শহরে বনূ উমাইয়াদের নিরাপত্তা ছিল না। বছরের পর বছর ধরে আব্বাসীরা তাদেরকে খুঁজে বের করে হত্যা করতে থাকে। খুরাসানে আবূ মুসলিম এই কাজ আরো ব্যাপকভাবে এবং আরো গুরুত্বের সাথে আনজাম দিয়েছিলেন। তিনি শুধু বনূ উমাইয়াকে নয়, বরং যে সমস্ত লোক কোন না কোন সময়ে এবং কোন না কোন ভাবে বনূ উমাইয়ার পক্ষ সমর্থন করেছিল কিংবা তাদের কোন খিদমত আনজাম দিয়েছিল তাদেরকেও

নৃশংসভাবে হত্যা করেন। এই পাইকারী হত্যা থেকে যারা রক্ষা পেয়েছিল তারা নিজেদের বেশভূষা পরিবর্তন করে এবং নিজের ও নিজের গোত্রের নাম বদল করে সীমান্তের দিকে যাত্রা করে। খুরাসানের প্রদেশ ও রাজ্যসমূহে যেহেতু এই পাইকারী হত্যা ছিল অত্যন্ত ব্যাপক ও নৃশংস, তাই এখানে বনূ উমাইয়া গোত্রের যে লোক ছিল তারা সিন্ধু, সুলায়মান পর্বত এবং কাশ্মীরের দিকে পালিয়ে যায়। যে সব লোক তাদের গোত্রের নাম বদলে ফেলেছিল তারাও ধীরে ধীরে ইসলামী রাষ্ট্রের আওতার বাইরে চলে আসে। কেননা আব্বাসী সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে তাদের শান্তি ও স্বস্তি লাভের কোন উপায় ছিল না। ঐ সব গর্বিত আরব গোত্র যারা সিন্ধু, কাশ্মীর, পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলে পালিয়ে এসেছিল তাদের বংশধর আজ পর্যন্ত পাক-ভারতে বিদ্যমান আছে বলে মনে করা হয়। তবে নিজেদের পরিবর্তিত নাম ও পেশার কারণে তারা যে আরব-বংশোদ্ভূত সে কথা বিস্মৃত হয়ে গেছে। উমাইয়া গোত্রের আবদুর রহমান ইব্‌ন মুআবিয়া ইব্‌ন হিশাম আব্বাসীদের জালে আটকা পড়তে পড়তে বেঁচে যান এবং পালাতে পালাতে মিসর ও কায়রাওয়ান হয়ে স্পেনে গিয়ে পৌঁছেন। স্পেন যেহেতু আব্বাসী দাওয়াতের প্রভাব থেকে তুলনামূলকভাবে মুক্ত ছিল এবং সেখানে বনূ উমাইয়ার অনেক শুভাকাঙ্ক্ষীও বিদ্যমান ছিল, তাই তিনি সেখানে পৌঁছেই ঐ দেশটি দখল করে নেন এবং সেখানে এমন একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন যার দিকে আব্বাসী খলীফারা সব সময় ঈর্ষার দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন কিন্তু তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারতেন না, করার সুযোগ পেতেন না।

তৃতীয় অধ্যায়

আব্বাসীয় খিলাফত

আবুল আব্বাস আবদুল্লাহ্ সাফ্ফাহ্

আবুল আব্বাস আবদুল্লাহ্ সাফ্ফাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব ইব্ন হাশিম ১০৪ হিজরীতে (৭২২-২৩ খ্রি.) বালকা এলাকার হামীমাহ্ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সেখানেই প্রতিপালিত হন এবং পরবর্তীকালে আপন ভাই ইমাম ইবরাহীমের স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি তাঁর অপর ভাই মানসূরের চাইতে বয়সে ছোট ছিলেন। ইব্ন জারীর তাবারী (র) বলেন, যে দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আপন চাচা আব্বাসকে বলেছিলেন, তোমার বংশধররা একদিন খিলাফতের অধিকারী হবে, সেদিন থেকেই আব্বাসের বংশধররা খিলাফত লাভের আশা পোষণ করে আসছিল।

আবদুল্লাহ্ সাফ্ফাহ্ একাধারে নরহত্যা, বদান্যতা, উপস্থিত বুদ্ধি ও বিচক্ষণতায় ছিলেন অনন্য। তাঁর কর্মকর্তারাও ছিল হত্যাকাণ্ডে যারপরনাই অভ্যস্ত। সাফ্ফাহ্ আপন চাচা দাউদকে প্রথমে কূফার, এরপর হিজায, ইয়ামান ও ইয়ামামার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। আর কূফার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন আপন ভাতিজা ঈসা ইব্ন মূসা ইব্ন মুহাম্মদকে।

১৩৩ হিজরীতে (৭৫০-৫১ খ্রি.) যখন দাউদের মৃত্যু হয় তখন সাফ্ফাহ্ আপন মামা ইয়াযীদ ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল মিদ্দান হারিসীকে হিজায ও ইয়ামামার এবং মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল মিদ্দানকে ইয়ামানের গভর্নর নিয়োগ করেন। ১৩২ হিজরীতে (৭৪৯-৫০ খ্রি.) তিনি সুফ্য়ান ইব্ন উয়াইনা বালাবীকে বসরার শাসক নিয়োগ করেন। এরপর ১৩৩ হিজরীতে (৭৫০-৫১ খ্রি.) তাকে পদচ্যুত করে আপন চাচা সুলায়মান ইব্ন আলীকে একাধারে বসরা, বাহরাইন ও আম্মানের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। ১৩২ হিজরীতে (৭৪৯-৫০ খি.) সাফ্ফাহ্র এক চাচা ইসমাঈল ইব্ন আলী আহ্ওয়াযের, অপর চাচা আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলী সিরিয়ার এবং আবূ আওন আবদুল মালিক ইব্ন ইয়াযীদ মিসরের এবং আবূ মুসলিম খুরাসানী খুরাসান ও জাবালের গভর্নর ছিলেন। আর খালিদ ইব্ন বারমাক ছিলেন 'দীওয়ানুল খারাজ' তথা অর্থ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অফিসার। ১৩৩ হিজরীতে (৭৫০-৫১ খ্রি.) আবূ মুসলিম, মুহাম্মদ ইব্ন আশআছকে নিজের পক্ষ থেকে গভর্নর নিয়োগ করে পারস্যে প্রেরণ করেন। ঠিক ঐ সময়ে সাফ্ফাহ্ও আপন চাচা ঈসা ইব্ন আলীকে পারস্যের গভর্নর নিয়োগ করে সেখানে পাঠান। মুহাম্মদ ইব্ন আশআছ প্রথমে সেখানে গিয়ে পৌঁছেন। ঈসা ইব্ন আলী সেখানে পৌঁছলে মুহাম্মদ ইব্ন আশআছ প্রথম প্রথম তার হাতে পারস্যের শাসনভার তুলে দিতে অস্বীকার করেন। এরপর এই স্বীকারোক্তি নিয়ে তাকে দায়িত্বভার

বুঝিয়ে দেন যে, তিনি কখনো মিম্বরের উপর খুতবা দেবেন না এবং জিহাদ ব্যতীত কখনো তরবারি হাতে নিবেন না। মোটকথা তিনি ঈসা ইব্‌ন আলীর হাতে পারস্যের শাসনভার অর্পণ করেন সত্য, কিন্তু প্রকৃত অর্থে তিনিই শাসনকর্তা থেকে যান। যখন মুহাম্মদ ইব্‌ন আশআছ ইনতিকাল করেন তখন সাফ্‌ফাহ্ আপন চাচা ইসমাঈল ইব্‌ন আলীকে পারস্যের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। আর মুহাম্মদ ইব্‌ন সূলকে মাওসিলের শাসনকর্তা নিয়োগ করে পাঠান। কিন্তু মাওসিলবাসীরা মুহাম্মদকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয়।

ঐ সমস্ত লোক বনূ আব্বাসের বিরুদ্ধে ছিল। সাফ্‌ফাহ্ তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে আপন ভাই ইয়াহ্ইয়াকে বার হাজার সৈন্যসহ মাওসিলে পাঠান। তিনি মাওসিলে পৌঁছে সরকারী প্রাসাদে অবস্থান নেন এবং বারজন নেতৃস্থানীয় মাওসিলবাসীকে প্রতারণার মাধ্যমে ডেকে এনে হত্যা করেন। এতে মাওসিলবাসীরা অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। ইয়াহ্ইয়া এই অবস্থা দেখে ঘোষণা দেন, যে ব্যক্তি জামে মসজিদে চলে আসবে তাকে নিরাপত্তা প্রদান করা হবে। এই ঘোষণা শুনে লোকেরা দ্রুত জামে মসজিদের দিকে ছুটতে থাকে।

ইয়াহ্ইয়া জামে মসজিদের দরজায় লোক মোতায়েন করে রেখেছিলেন। যে কেউ মসজিদে প্রবেশ করত তাকেই সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করা হতো। এভাবে এগার হাজার লোককে হত্যা করা হয়। এরপর শহরে অবাধে হত্যাকাণ্ড চলে। রাতের বেলা ইয়াহ্ইয়ার কানে ঐ সমস্ত স্ত্রীলোকের কান্নার রোল ভেসে আসে যাদের স্বামী, পিতা, ভাই এবং পুত্রকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছিল। ভোর হতেই ইয়াহ্ইয়া ঐ সমস্ত স্ত্রীলোক এবং শিশুদের হত্যা করার নির্দেশ দেন। সেনাবাহিনীর জন্য তিনদিন পর্যন্ত শহরবাসীকে অবাধে হত্যা করার অনুমতি দেওয়া হয়। ফলে সমগ্র শহরে রাতদিন নির্মম হত্যাকাণ্ড চলে এবং তিনদিন পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে।

ইয়াহ্ইয়ার বাহিনীতে চার হাজার যঙ্গী ছিল। যঙ্গীরা মহিলাদের সম্ভ্রম নষ্ট করার ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র সংকোচবোধ করেনি। তারা হাজার হাজার স্ত্রীলোককে ধরে নিয়ে যায়। চতুর্থ দিন ইয়াহ্ইয়া ঘোড়ায় চড়ে শহর পরিক্রমায় বের হন। জনৈক স্ত্রীলোক সাহস করে তার ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে বলে ঃ তুমি কি বনূ হাশিম নও ? তুমি কি রাসূলুল্লাহর চাচার সন্তান নও ? তুমি কি এই খবর রাখ না, যঙ্গীরা মু'মিন ও মুসলিম মহিলাদের জবরদস্তিমূলক ভাবে বিবাহ করছে?

ইয়াহইয়া তার কোন উত্তর না দিয়ে চলে যান। পর দিন তিনি ভাতা বণ্টনের বাহানায় যঙ্গীদেরকে ডেকে পাঠান। যঙ্গীরা যখন তার দরবারে এসে হাযির হয় তখন তিনি তাদের সকলকে হত্যা করার নির্দেশ দেন।

সাফ্‌ফাহ্ যখন এই সমস্ত সংবাদ পান তখন ইয়াহ্ইয়াকে বদলী করে ইসমাঈল ইব্‌ন আলীকে মাওসিলের গভর্নর নিয়োগ করেন।

১৩৩ হিজরীতে (৭৫০-৫১ খ্রি.) রোমান সম্রাট মুসলমানদের কাছ থেকে লামতিয়া ও কালীকালা অস্ত্র বলে ছিনিয়ে নেয়। ঐ সনেই ইয়াযীদ ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল মিদ্দান,

ইবরাহীম ইব্‌ন হিব্বান সালামীকে একটি বাহিনী দিয়ে ইয়ামামায় প্রেরণ করেন। সেখানে মুসান্না ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন হুবায়রা তার পিতার যুগ থেকে হাকিম ছিলেন। তিনি ইবরাহীমের মুকাবিলা করেন এবং তাতে নিহত হন। ঐ সনেই শারীক ইব্‌ন শায়খ মাহরী বুখারায় আবূ মুসলিমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং এজন্য ত্রিশ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী গঠন করেন। আবূ মুসলিম যিয়াদ ইব্‌ন সালিহ্ খুযায়ীকে শারীকের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। শারীক তার মুকাবিলা করেন এবং তাতে নিজেই নিহত হন। আবূ মুসলিম ১৩৩ হিজরীতে (৭৫০-৫১খ্রি.) আবূ দাউদ খালিদ ইব্‌ন ইবরাহীমকে খাতাল এলাকা আক্রমণের জন্য প্রেরণ করেন। যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং তাতে খাতালের বাদশাহ্ হাবাশ ইব্‌ন শিবল্ পরাজিত হন। তিনি সেখান থেকে পালিয়ে ফারগানা হয়ে চীন দেশে চলে যান। ঐ সময়ে ইখশীদ, ফারগানা ও শাশের বাদশাহদের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। চীনের বাদশাহ্ তাতে হস্তক্ষেপ করেন এবং শাশ ও ফারগানার বাদশাহদের বিরুদ্ধে একলক্ষ সৈন্য প্রেরণ করেন। আবূ মুসলিম যিয়াদ ইব্‌ন সালিহকে সেদিকে প্রেরণ করেন। তারায নদীর তীরে যিয়াদ চীনা বাহিনীর মুকাবিলা করেন। তাতে মুসলমানদের হাতে পঞ্চাশ হাজার চীনা সৈন্য নিহত এবং বিশ হাজার বন্দী হয়।

১৩৪ হিজরীতে (৭৫১-৫২ খ্রি.) খুরাসানের প্রখ্যাত সেনাপতি বাসসাম ইব্‌ন ইবরাহীম বিদ্রোহ ঘোষণা করে মাদায়েন দখল করে নেন। সাফ্‌ফাহ্ খাযিম ইব্‌ন খুযায়মাকে বাস্‌সামের মুকাবিলায় প্রেরণ করেন। খাযিম বাস্‌সামকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। এরপর সাফ্‌ফাহ্ খারিজীদের মুকাবিলা করার জন্য খাযিমকে ওমানে প্রেরণ করেন। তিনি সেখানে গিয়ে খারিজীদের পর্যুদস্ত এবং তাদের নেতাকে হত্যা করেন। ঐ বছরই আবূ দাউদ খালিদ ইব্‌ন ইবরাহীম কুশবাসীদের উপর হামলা চালান এবং তথাকার বাদশাহকে (যিনি যিম্মী ছিলেন) হত্যা করে তার ছিন্ন মস্তক আবূ মুসলিমের কাছে সমরকন্দে পাঠিয়ে দেন। এরপর নিহত বাদশাহর ভাই তাযানকে সিংহাসনে বসিয়ে বল্‌খে ফিরে আসেন। ঐ সময়ে আবূ মুসলিম সাগাদ ও বসরাবাসীদের উপর পাইকারী হত্যাকাণ্ড চালান। এরপর হাকিম ইব্‌ন যিয়াদ ইব্‌ন সালিহকে বুখারা ও সমরকন্দের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন এবং তাকে সমরকন্দের নগর-প্রাচীর নির্মাণের নির্দেশ দিয়ে মার্ভে ফিরে আসেন। এই সমস্ত ঘটনার পর সাফ্‌ফাহর কাছে সংবাদ পৌঁছে যে, মানসূর ইব্‌ন জামহূর তার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে সিন্ধুতে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। ইনি হচ্ছেন সেই মানসূর যিনি ইয়াযীদুন নাকিসের আমলে দু'মাস ইরাক ও খুরাসানের গভর্নর এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুআবিয়া ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জা'ফরের অন্যতম সহচর ছিলেন। ইসতাখরের নিকটে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুআবিয়া যখন দাউদ ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন হুবায়রা এবং মাআন ইব্‌ন যায়েদার হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন তখন মানসূর ইব্‌ন জামহূর সিন্ধুর দিকে পালিয়ে আসেন এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুআবিয়া হিরাত পৌঁছেন। তখন আবূ মুসলিমের নির্দেশ অনুযায়ী হিরাতের শাসনকর্তা মালিক ইব্‌ন হায়সাম খুযায়ী তাকে হত্যা করে সাফ্‌ফাহ্ আপন পুলিশ অফিসার মূসা ইব্‌ন কা'বকে সিন্ধুর দিকে প্রেরণ করেন এবং তার স্থলে মুসায়্যাব ইব্‌ন যুহায়রকে পুলিশ অফিসার নিয়োগ করেন। হিন্দ-সীমান্তে মূসার সাথে মানসূরের সংঘর্ষ হয়। মানসূরের সাথে বার হাজার সৈন্য ছিল।

এতদসত্ত্বেও তিনি মূসার কাছে পরাজিত হয়ে পালাতে পালাতে এক দুর্গম মরুভূমিতে পৌঁছেন এবং পানীয়ের অভাবে সেখানে মারা যান। মানসূরের গভর্নর, যিনি সিন্ধুতে ছিলেন, এই সংবাদ পেয়ে পরিবার-পরিজন এবং সহায়-সম্পদসহ খাযার এলাকার দিকে চলে যান। এই বছরই অর্থাৎ ১৩৪ হিজরীতে (৭৫১-৫২ খ্রি.) সাফ্‌ফাহ্ আনবারে আসেন এবং তাকে 'দারুল খুলাফা' বা রাজধানী ঘোষণা করেন।

১৩৫ হিজরীতে (৭৫২-৫৩ খ্রি.) যিয়াদ ইব্‌ন সালিহ্, যিনি আবূ মুসলিমের পক্ষে সমরকন্দ ও বুখারার শাসক ছিলেন, বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। আবূ মুসলিম এই সংবাদ পেয়ে মার্ভ থেকে রওয়ানা হন। আর আবূ দাউদ খালিদ ইব্‌ন ইবরাহীম যিয়াদের বিদ্রোহের সংবাদ শুনে তাকে শায়েস্তা করার জন্য নাসর ইব্‌ন রাশিদকে তিরমিযের দিকে প্রেরণ করেন। কিন্তু নাসর ইব্‌ন রাশিদ তিরমিযে পৌঁছতেই কিছু লোক তালিকান থেকে বের হয়ে তাকে হত্যা করে। এই সংবাদ পেয়ে আবূ দাউদ ঈসা ইব্‌ন হাসানকে নাসরের হত্যাকারীদের পিছু ধাওয়া করতে পাঠান এবং তারা তাকে হত্যা করেন। ইতিমধ্যে আবূ মুসলিম আমিদ নামক স্থানে এসে পৌঁছেন। তার সাথে সাবা ইব্‌ন নু'মান আযদীও ছিলেন। সাফ্‌ফাহ্ যিয়াদ ইব্‌ন সালিহ্ এবং সাবা ইব্‌ন নু'মান আযদীকে এই বলে আবূ মুসলিমের কাছে পাঠিয়েছিলেন ঃ 'যদি সুযোগ পাও তাহলে তাকে (আবূ মুসলিমকে) হত্যা করে ফেলবে।'

আমিদে পৌঁছতেই আবূ মুসলিম কোন একটি সূত্রে ঐ ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পারেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে সাবাকে আমিদে বন্দী করেন এবং তাকে হত্যা করার জন্য সেখানকার কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেন। আবূ মুসলিম আমিদ থেকে বুখারার দিকে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে তিনি যিয়াদ ইব্‌ন সালিহর কয়েকজন অধিনায়কের সাক্ষাত পান, যারা যিয়াদকে পরিত্যাগ করে তার (আবূ মুসলিমের) কাছে আসছিল। আবূ মুসলিম বুখারা পৌঁছতেই যিয়াদ একজন কৃষকের ঘরে আশ্রয় নেন। কিন্তু ঐ কৃষক যিয়াদকে হত্যা করে তার লাশটি আবূ মুসলিমের সামনে এনে পেশ করে। আবূ মুসলিম আবূ দাউদের কাছে যিয়াদ হত্যার সংবাদ পাঠান। আবূ দাউদ তালিকান অভিযান সম্পন্ন করে কুশে ফিরে আসেন এবং ঈসা ইব্‌ন হাসানকে বাস্‌সামের দিকে প্রেরণ করেন, কিন্তু সেখানে কোন সাফল্য অর্জন করতে পারেন নি। ঐ সময়ে ঈসা ইব্‌ন হাসান আবূ মুসলিমের ঐ সমস্ত চিঠি সংগ্রহ করে আবূ দাউদের কাছে পাঠিয়ে দেন। ঈসা আবূ দাউদকে খুব মারধর করে বন্দী করে রাখেন। কিছুদিন পর তাকে মুক্তি দেওয়া হলে সেনাবাহিনীর লোকেরা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাকে হত্যা করে। এই অভিযান সম্পন্ন হওয়ার পর আবূ মুসলিম প্রত্যাবর্তন করেন।

১৩৬ হিজরীতে (৭৫৩-৫৪ খ্রি.) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আলী সাফ্‌ফাহর দরবারে হাযির হন। সাফ্‌ফাহ্ তাকে সিরীয় বাহিনী ও ইরানী বাহিনীর সাথে রোমানদের মুকাবিলায় প্রেরণ করেন। সাফ্‌ফাহর ভাই আবূ জা'ফর মানসূর জাযীরার শাসক ছিলেন। তিনি ঐ বছর সাফ্‌ফাহর ইঙ্গিতেই হজ্জ পালনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং সেজন্য তাঁর অনুমতিও প্রার্থনা করেন। সাফ্‌ফাহ্ তাকে লিখেন ঃ তুমি আমার কাছে চলে এস। আমি তোমাকে 'আমীরে হজ্জ' করে পাঠাব। অতএব মানসূর আনবারে চলে আসেন। হাররানের শাসনভার মুকাতিল ইব্‌ন হাকিমের উপর ন্যস্ত করা হয়। আসল ব্যাপার এই যে, আবূ মুসলিমও ঐ বছর সাফ্‌ফাহর

কাছে হজ্জের অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন। তাই সাফ্ফাহ্ নিজে থেকেই গোপনে আপন ভাই মানসূরকে বলে পাঠান ঃ তুমি অবিলম্বে হজ্জের জন্য তৈরি হয়ে যাও এবং সেজন্য আমার কাছে অনুমতি প্রার্থনা কর। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, আব্বাসীয় আন্দোলনকে সফল ও সার্থক করে তোলার ক্ষেত্রে আবূ মুসলিম সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন, যেমন ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। সাফ্ফাহ্ যখন খলীফা হন এবং আব্বাসী হুকুমত স্থিতিশীল হয়ে ওঠে তখন আবূ মুসলিমকে খুরাসানের গভর্নর নিয়োগ করা হয় এবং সাফ্ফাহ্ তার নামে যথারীতি নিয়োগপত্রও প্রেরণ করেন। কিন্তু আবূ মুসলিম স্বয়ং দরবারে খিলাফতে হাযির হয়ে বায়আত করেন নি। তিনি সেই শুরু থেকে, যখন ইমাম ইবরাহীম তাকে খুরাসানে পাঠিয়েছিলেন, আগাগোড়া সেখানেই অবস্থান করেন। তিনিই খুরাসান দখল করেন। এরপর সেখানে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে সেখানকার সর্বময় কর্তা হন। যখন এক এক করে সকল শত্রুকে খতম করে দেওয়া হলো তখন আবদুল্লাহ্ সাফ্ফাহ্ চিন্তা করে দেখলেন, আবূ মুসলিমের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেমন তাকে কোন প্রদেশের গভর্নর পদে বদলী করা হচ্ছে না, তেমনি তার শক্তি ও প্রভাব-প্রতিপত্তি বিন্দুমাত্র খাটো করা সম্ভব হচ্ছে না।

আবূ মুসলিম নিজেকে খিলাফতে আব্বাসীয়ার প্রতিষ্ঠাতা এবং সাফ্ফাহর পৃষ্ঠপোষক মনে করতেন। তিনি সাফ্ফাহকে যে পরামর্শ দিতেন তিনি তা নির্দ্বিধায় মেনে নিতেন। কিন্তু খুরাসানের ব্যাপারে আবূ মুসলিম তাঁর অনুমতি বা পরামর্শ গ্রহণ জরুরী মনে করতেন না। উসমান ইব্ন কাসীর ছিলেন আব্বাসীদের প্রখ্যাত ও সর্বপ্রাচীন নকীবদের অন্যতম। আবূ মুসলিম ব্যক্তিগত শত্রুতাবশত তাকে হত্যা করেন, অথচ সাফ্ফাহ্ সে সম্পর্কে তার কাছে কোন কৈফিয়ত তলব করতে পারেন নি। শুধু তিনিই নন, বরং তাঁর চাচা এবং ভাইও আবূ মুসলিমের এই স্বেচ্ছাচারিতা বরদাশত করতে পারছিলেন না।

সাফ্ফাহ্ যখন আপন ভাই আবূ জা'ফর মানসূরকে বায়আত গ্রহণের জন্য খুরাসানে পাঠান এবং তারই হাতে আবূ মুসলিমের নামে গভর্নর পদের নিয়োগপত্র প্রেরণ করেন তখন তিনি আবূ জা'ফর মানসূরের সাথেও সৌজন্যমূলক আচরণ করেন নি বরং আবূ জা'ফরের চোখে তার প্রতিটি আচরণে ও প্রতিটি অঙ্গ-ভঙ্গিতে দাম্ভিকতা ও স্বেচ্ছাচারিতার লক্ষণ ফুটে উঠেছিল। তখনই আবূ মুসলিম ও আবূ জা'ফরের মধ্যে মনকষাকষির সৃষ্টি হয়। তিনি এই সমস্ত কথা সাফ্ফাহর কাছে ব্যক্ত করলে তাঁর চিন্তা আরো বেড়ে যায়। আবূ মুসলিমের এই অসাধারণ ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি হ্রাস করতে গিয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত তাকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেন এবং এর দায়িত্ব, যেমন ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে, যিয়াদ ইব্ন সালিহ্ এবং সাবা ইব্ন নু'মান আযদীর উপর ন্যস্ত করেন। শেষ পর্যন্ত সাফ্ফাহ্ ও আবূ মুসলিম পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়ে ওঠেন।

আবূ মুসলিম যেহেতু একজন ক্ষমতা লিপ্সু ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন, তাই তিনি শুধু খুরাসানেই আপন প্রভাব-প্রতিপত্তি বহাল রাখাকে যথেষ্ট মনে করেননি, বরং হিজায এবং ইরাকেও আপন প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেন, যাতে প্রয়োজন দেখা দিলে আব্বাসীদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া যেতে পারে। এমন এক ব্যক্তি যে আব্বাসীদের 'দাওয়াত কর্মসূচিকে' সাফল্যের চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে পৌঁছিয়েছেন তিনি যদি গোপনে হিজায, ইরাক এবং সমগ্র মুসলিম বিশ্বে

নিজের গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা বাড়াবার চেষ্টা চালান তবে অবাক হওয়ার কিছু নেই। তবে একথা তার মনে রাখা উচিত ছিল যে, তার বিরুদ্ধে এমন একটি পরিবার রয়েছে, যেখানে মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী এবং ইবরাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদের মত ব্যক্তির জন্ম হয়েছে এবং তারা বনূ উমাইয়াকে ধ্বংস করে সবেমাত্র তাদের হাত থেকে খিলাফত ছিনিয়ে এনেছেন। আবূ মুসলিম এক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন, তবে একথা তার ভুলে গেলে চলবে কি করে যে, এ কাজে তিনি আব্বাসীদের শিষ্য এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একজন ব্যক্তি ছাড়া কিছুই ছিলেন না ?

যাহোক আবূ মুসলিম সাফ্‌ফাহর কাছে হজ্জের অনুমতি প্রার্থনা করেন। সাফ্‌ফাহ্ তাকে অনুমতি দেন, তবে পূর্বাহ্নেই লিখে জানান ঃ আসার সময় তোমার সাথে ৫০০-এর বেশি লোক আনবে না। আবূ মুসলিম উত্তরে লিখেন ঃ মানুষের সাথে আমার শত্রুতা রয়েছে। অতএব অল্প লোক নিয়ে সফর করা যুক্তিসংগত হবে না। সাফ্‌ফাহ্ উত্তরে লিখেন, সর্বাধিক এক হাজার লোকই যথেষ্ট। তার চাইতে বেশি আনলে অসুবিধা হবে। কেননা মক্কা সফরকালে রসদসামগ্রী সংগ্রহ করা খুবই কঠিন। আবূ মুসলিম এক হাজার সৈন্য নিয়ে মার্ভ থেকে রওয়ানা হন এবং যখন খুরাসান-সীমান্তে পৌঁছেন তখন সীমান্ত অঞ্চলেরই বিভিন্ন জায়গায় সাত হাজার সৈন্য রেখে যান এবং মাত্র এক হাজার সৈন্য নিয়ে রাজধানী আনবারের দিকে অগ্রসর হন। সাফ্‌ফাহ্ আবূ মুসলিমকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের জন্য তাঁর নামকরা অধিনায়কদের প্রেরণ করেন। যখন আবূ মুসলিম খলীফার দরবারে এসে পৌঁছেন তখন স্বয়ং খলীফাও তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন এবং বলেন ঃ যদি এ বছর আমার ভাই আবূ জা'ফর মানসূর হজ্জের সংকল্প না করতেন তাহলে আমি তোমাকেই 'আমীরে হজ্জ' নিয়োগ করতাম। অতএব আবূ মুসলিমের আমীরে হজ্জ হওয়ার বাসনা আর পূর্ণ হলো না। যাহোক আবূ জা'ফর মানসূর এবং আবূ মুসলিম উভয়েই একসাথে হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। আবূ মুসলিম খুরাসান থেকে একটি বিরাট অর্থ ভাণ্ডার সাথে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি মানসূরের সাহচর্য পছন্দ করছিলেন না। কেননা মানসূর সঙ্গে থাকলে স্বাধীনভাবে ও মুক্ত মনে কোন কাজ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। এতদসত্ত্বেও তিনি মক্কার রাস্তার প্রতিটি মনযিলে কূপ খনন, সরাইখানা নির্মাণ এবং মুসাফিরদের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির কাজ শুরু করে দেন। জনসাধারণের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করেন এবং লঙ্গরখানাও প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি জনসাধারণের মধ্যে প্রচুর উপহার-সামগ্রী বণ্টন করেন এবং বিভিন্নভাবে আপন বদান্যতার এমনি নমুনা পেশ করেন যে, জনসাধারণ তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ওঠে।

মক্কায়ও আবূ মুসলিম অত্যন্ত ব্যাপকভিত্তিতে ঐ সমস্ত কাজ আনজাম দেন। সব দেশের এবং সব অঞ্চলের লোকই সেখানে এসে জড় হয়েছিল। হজ্জের সময় অতিবাহিত হওয়ার পর আবূ জা'ফর মানসূর তখনো রওয়ানা হওয়ার সংকল্প নেন নি, ইতিমধ্যে আবূ মুসলিম মক্কা থেকে রওয়ানা হয়ে যান। মক্কা থেকে দুই মনযিল অগ্রসর হয়েছেন এমন সময় রাজধানী আনবারের একজন দূতের সাথে তার সাক্ষাত হয়। ঐ দূত একাধারে সাফ্‌ফাহর মৃত্যু ও আবূ জা'ফর মানসূরের খলীফা হওয়ার সংবাদ নিয়ে মানসূরের কাছে আসছিল। আবূ মুসলিম দুইদিন পর্যন্ত এ দূতকে নিজের কাছে আটকে রাখেন। এরপর মানসূরের কাছে পাঠিয়ে দেন।

আবূ মুসলিম প্রথমে চলে যাওয়ায় মানসূর তার প্রতি কিছুটা অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। এবার আরো অসন্তুষ্ট হন এই ভেবে যে, আবূ মুসলিম সব খবর জানা সত্ত্বেও নব নির্বাচিত খলীফা হিসাবে তার কাছে কোন অভিনন্দনবার্তা পাঠালেন না, এমন কি বায়আত করার জন্যও অপেক্ষা করলেন না, অথচ সর্বাগ্রে তারই বায়আত করা উচিত ছিল। ন্যূন পক্ষে তার (মানসূর) সেখানে পৌঁছা পর্যন্ত তার (আবূ মুসলিমের) অপেক্ষা করা উচিত ছিল, যাতে তারা এক সাথে সফর করতে পারেন। যাহোক আবূ জা'ফর মানসূর ঐ সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে দ্রুত মক্কা থেকে রওয়ানা হন। কিন্তু আবূ মুসলিম তাঁর পূর্বেই আনবারে গিয়ে পৌঁছেন।

আবুল আব্বাস আবদুল্লাহ্ সাফ্ফাহ্ চার বছর আট মাস খিলাফত পরিচালনা করে ১৩৬ হিজরীর ১৩ যিলহজ্জ (৭৫৫ খ্রি.-এর জুন) মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর চাচা ঈসা জানাযার নামায পড়ান এবং আনবারেই তাঁকে দাফন করা হয়। তিনি তার মৃত্যুর পূর্বে যথাক্রমে আবূ জা'ফর মানসূর ও ঈসা ইব্ন মূসার পক্ষে অলীআহদীর অঙ্গীকারপত্র লিখে তা একটি কাপড়ে জড়িয়ে তার উপর আপন আহলে বায়তের মোহর লাগিয়ে ঈসার হাতে অর্পণ করেন। যেহেতু মানসূর রাজধানীতে উপস্থিত ছিলেন না, তাই ঈসা মানসূরের পক্ষে বায়আত গ্রহণ করেন এবং এই ঘটনা সম্পর্কে মানসূরকে ওয়াকিফহাল করার জন্য মক্কায় একজন দূত প্রেরণ করেন।

আবদুল্লাহ্ সাফ্ফাহ্ আপন খিলাফতের ভিত্তি মজবুত করতে গিয়ে ঠিক সেরূপ অকাতরে অর্থ-সম্পদ বিলিয়ে দেন, যেরূপ দিয়েছিলেন খিলাফতে বনূ উমাইয়ার প্রতিষ্ঠাতা আমীরে মুআবিয়া (রা)। আমীরে মুআবিয়া (রা) আপন বদান্যতা দ্বারা আপন বিরোধীপক্ষ তথা আলাবীদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছিলেন এবং তাদেরকে নিজের প্রতি অনেকটা সহানুভূতিশীল করে তুলতেও সক্ষম হয়েছিলেন। অনুরূপভাবে খিলাফতে আব্বাসীয়ার প্রতিষ্ঠাতা সাফ্ফাহর মুকাবিলায়ও আলাবীরা খিলাফতের দাবিদার ছিল। আব্বাসীরা তাদের সাথে একত্রিত হয়ে বনূ উমাইয়াকে ধ্বংস করেছিল সত্য, তবে এখন আব্বাসীয়া পরিবারে খিলাফত চলে যাওয়ার কারণে তারা ঠিক সেরূপ অসন্তুষ্ট হয় যেরূপ অসন্তুষ্ট হয়েছিল বনূ উমাইয়া পরিবারের খিলাফত চলে যাওয়ার কারণে। আবদুল্লাহ্ সাফ্ফাহ্ও আমীরে মুআবিয়ার মত আলাবীদেরকে প্রচুর ধন-সম্পদ দান করে একেবারে নিশ্চুপ করে রাখেন। যখন সাফ্ফাহকে কূফায় খলীফা মনোনীত করা হয় তখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাসান, মুসান্না ইব্ন আলী এবং অন্যান্য আলাবী সেখানে আসেন এবং বলেন ঃ এটা কেমন কথা যে, যে খিলাফত আমাদের প্রাপ্য ছিল তা তোমরা দখল করে নিয়েছ ? এই আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাসান মুসান্নার পুত্র মুহাম্মদকে ১৩১ হিজরীর যিলহজ্জ (৭৪৯ খ্রি-এর আগস্ট) মাসে মক্কায় অনুষ্ঠিত এক সভায় আব্বাসী, আলাবী সকলেই খলীফা হিসাবে নির্বাচিত করেছিলেন। আবূ জা'ফর মানসূরসহ উপস্থিত সকলেই তাঁর হাতে বায়আত করেছিলেন। এমতাবস্থায় সাফ্ফাহ্ কি করে খলীফা হতে পারেন ? একথা শোনার সাথে সাথে সাফ্ফাহ্ আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাসান মুসান্নার হাতে দশ লক্ষ দিরহাম তুলে দেন। এই পরিমাণ অর্থ তখন সাফ্ফাহর হাতে ছিল না। তাই ইব্ন মুকারিনের কাছ থেকে তাঁকে ঋণ গ্রহণ করতে হয়েছিল। এভাবে প্রত্যেক আলাবীকেই তাদের মর্যাদা অনুযায়ী উপহার-উপঢৌকন দিয়ে সেদিন বিদায় করা হয়। আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাসান তখনো সাফ্ফাহর কাছ থেকে বিদায় নেননি, এমনি সময় মারওয়ান ইব্ন মুহাম্মদের হত্যার সংবাদ এবং সেই সাথে

মালে গনীমত হিসাবে অনেক মূল্যবান হীরা-জহরত নিয়ে জনৈক দূত আবদুল্লাহ্ সাফ্ফাহর কাছে এসে পৌঁছে। তিনি ঐ সমস্ত হীরা-জহরত এবং অলংকারাদিও নির্দ্বিধায় আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাসান মুসান্নাকে দান করেন। সঙ্গে সঙ্গে জনৈক ব্যবসায়ী আশি হাজার দীনার দিয়ে ঐসব অলংকার আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাসানের কাছ থেকে কিনে নেয়। মোটকথা আবদুল্লাহ্ সাফ্ফাহ্ যদি অনুরূপ কৌশল অবলম্বন না করতেন তাহলে আলাবীরা প্রকাশ্যে আব্বাসীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করত। আর তখন এটাও পুরোপুরি সম্ভব ছিল যে, অনেক প্রভাবশালী নকীবও আলাবীদের পক্ষাবলম্বন করতেন। ফলে আব্বাসীদের জন্য নিজেদের খিলাফত টিকিয়ে রাখা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ত। অতএব এটাই আবদুল্লাহ্ সাফ্ফাহর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব যে, তিনি সকল আলাবীকে বেহিসাব ধন-দৌলত দিয়ে এমনভাবে নিশ্চুপ করে দিয়েছিলেন যে, তাদের কেউই তখন নিজেদের খিলাফতের দাবি উত্থাপন করেনি। অবশ্য আবদুল্লাহ্ সাফ্ফাহর মৃত্যুর পর পরই আলাবীরা বিদ্রোহ ঘোষণার প্রস্তুতি নেয়। কিন্তু তখন যে খিলাফতে আব্বাসীয়া একটি দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।

আবূ জা'ফর মানসূর

আবূ জা'ফর আবদুল্লাহ্ মানসূর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিবের মাতা সালামা একজন বার্বার ক্রীতদাসী ছিলেন। আবূ জা'ফর মানসূর ৯৫ হিজরীতে (৭১৩-১৪ খ্রি.) আপন দাদার জীবিতাবস্থায় জন্মগ্রহণ করেন। কোন কোন বর্ণনা মতে তাঁর জন্ম হয়েছিল ১০১ হিজরীতে (৭১৯-২০ খ্রি.)। তিনি বীরত্ব, ব্যক্তিত্ব, বিচক্ষণতা ও প্রভাব-পতিপত্তির অধিকারী ছিলেন। খেলাধুলার ধারেকাছেও তিনি ঘেঁষতেন না। আদব (সাহিত্য) ও ফিকাহর উপর তাঁর পরিপূর্ণ দখল ছিল। প্রধান বিচারপতি পদ গ্রহণ করতে অস্বীকার করায় তিনি ইমাম আবূ হানীফা (র)-কে বন্দী করেন এবং ঐ অবস্থায়ই তিনি ইনতিকাল করেন। কারো কারো মতে, ইমাম আবূ হানীফা (র) মানসূরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা বৈধ বলে ফতওয়া দিয়েছিলেন। তাই তাঁর খাদ্যের সাথে বিষ মিশিয়ে দেওয়া হয়। মানসূর ছিলেন অত্যন্ত অলংকারসমৃদ্ধ সুললিত ভাষার অধিকারী। তিনি একজন ভালো বক্তাও ছিলেন। অবশ্য তিনি লোভী এবং কৃপণ ছিলেন বলেও কোন কোন ঐতিহাসিকের অভিমত। আবদুর রহমান ইব্ন মুআবিয়া ইব্ন হিশাম ইব্ন আবদুল মালিক উমাবী ১৩১ হিজরীতে (৭৪৮-৪৯ খ্রি.) অর্থাৎ মানসূরের খিলাফত আমলে স্পেনে নিজের একটি পৃথক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আবদুর রহমানও একজন বার্বার মহিলার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাই লোকেরা তখন বলাবলি করত, ইসলামী হুকুমত এখন বার্বারদের মধ্যে বণ্টিত হয়ে গেছে। ইব্ন আসাকির লিখেছেন, মানসূর যখন জ্ঞানার্জনের জন্য এদিক সেদিক ঘোরাফেরা করছিলেন তখন একদা একটি সরাইখানায় অবতরণ করলে সেখানকার চৌকিদার তাঁর কাছ থেকে দুই দিরহাম ভাড়া চায় এবং বলে, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি ভাড়া না দেবে ততক্ষণ এই ঘরে অবস্থান করতে পারবে না। মানসূর বলেন, আমি বনূ হাশিমের লোক, আমাকে মাফ করে দাও। কিন্তু চৌকিদার সেকথা মানে নি। এবার মানসূর বলেন, আমি কুরআনের জ্ঞান রাখি। অতএব আমাকে মাফ করে দাও। চৌকিদার সে কথাও গ্রাহ্য করে নি। মানসূর এবার বলেন, আমি আলিম, ফকীহ্ এবং ফারায়েয বিশেষজ্ঞ। তাতেও চৌকিদার মানে নি। শেষ পর্যন্ত নিরূপায়

হয়ে মানসূরকে দুই দিরহাম ভাড়া পরিশোধ করতে হয়। সেই দিন থেকেই মানসূর ধন-সম্পদ সংগ্রহ করার সংকল্প নেন। তিনি একদা আপন পুত্র মাহদীকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন ঃ বাদশাহ প্রজাদের আনুগত্য ব্যতীত টিকে থাকতে পারে না এবং প্রজারা ন্যায়বিচার ছাড়া আনুগত্য করতে পারে না। সেই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, যে ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও মাফ করে দেয়। আর সবচেয়ে নির্বোধ হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে অন্যের উপর জুলুম করে। চিন্তা-ভাবনা না করে কোন ব্যাপারেই হুকুম দেওয়া উচিত নয়। কেননা চিন্তাভাবনা হচ্ছে এমন একটি দর্পণ, যার মধ্যে মানুষ তার দোষগুণ দেখতে পায়। দেখ, সর্বদা নিআমতের শোকর আদায় করবে এবং ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও প্রতিপক্ষকে মাফ করে দেবে। আন্তরিকতার সাথে আনুগত্য করবে এবং জয়লাভের পর নম্র ও দয়ার্দ্র আচরণ করবে।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আলীর বিদ্রোহ

মানসূরের চাচা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আলীকে আবদুল্লাহ্ সাফ্‌ফাহ্ তার মৃত্যুর পূর্বে খুরাসানী ও সিরীয় বাহিনীর সাথে সায়েফার দিকে প্রেরণ করেছিলেন। ১৩৫ হিজরীতে (৭৫২-৫৩ খ্রি.) মানসূর আনবারে পৌঁছে খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হন। ঈসা ইব্‌ন মূসা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আলীকেও সাফ্‌ফাহর মৃত্যু সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন এবং এও লিখেছিলেন ঃ সাফ্‌ফাহ্ তাঁর পরবর্তী খলীফা হিসাবে মানসূরকে মনোনীত করেছেন এবং এই মর্মে ওসীয়তও করে গেছেন। তখন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আলী লোকদেরকে সমবেত করে বলেন ঃ আবদুল্লাহ্ সাফ্‌ফাহ্ যখন হাররান অভিযানে সেনাবাহিনী প্রেরণ করতে চেয়েছিলেন তখন সেদিকে যাওয়ার সাহস কারো হয়নি। সাফ্‌ফাহ্ তখন বলেছিলেন, যে ব্যক্তি এই অভিযানে নেতৃত্ব দেবে সে আমার পর খলীফা হবে। আমিই ঐ অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছিলাম এবং আমিই মারওয়ান ইব্‌ন মুহাম্মদ ও অন্যান্য উমাবী অধিনায়কদের পরাজিত করে, ঐ অভিযানকে সার্থক করেছিলাম। উপস্থিত সকলেই আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আলীর এই কথাকে সত্যায়িত করে এবং তার হাতে বায়আত করে। এবার আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আলী 'দালূক' থেকে প্রত্যাবর্তন করে হাররানে গিয়ে মুকাতিল ইব্‌ন হাকীমকে অবরোধ করেন এবং চল্লিশ দিন পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। অবরোধ চলাকালীন সন্দেহবশত তিনি খুরাসানের অনেক অধিবাসীকে হত্যা করেন। এরপর তিনি হুমায়দ ইব্‌ন কাহতাবাকে হলবের শাসনকর্তা নিয়োগ করে তথাকার বর্তমান গভর্নর যুফার ইব্‌ন আসিমের নামে লিখিত একটি পত্রসহ সেখানে প্রেরণ করেন। ঐ পত্রে লেখা ছিল, হুমায়দ সেখানে পৌঁছতেই তাকে হত্যা করবে। তিনি পথিমধ্যে সেই চিঠি খুলে পড়েন এবং হলবের পরিবর্তে ইরাকের দিকে যাত্রা করেন। এদিকে মানসূর আনবারে গিয়ে দেখেন, আবূ মুসলিম তাঁর পূর্বেই সেখানে পৌঁছে গেছেন। তিনি মানসূরের হাতে বায়আত করেন। মানসূর তার প্রতি সম্মান দেখান এবং তার সাথে অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ আচরণ করেন। এরই মধ্যে সংবাদ পৌঁছে যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আলী বিদ্রোহী হয়ে উঠেছেন। মানসূর আবূ মুসলিমকে বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আলীর দিক থেকে আমি খুবই শংকিত। আবূ মুসলিম তো মনে মনে এ ধরনেরই একটি ঘটনার আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আলীকে শায়েস্তা করার জন্য তৈরি হয়ে যান। কেননা এভাবে তিনি মানসূরকেও নিজের কাছে ঋণী

করে রাখতে পারবেন। যা হোক আবূ মুসলিমকে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আলীর মুকাবিলায় প্রেরণ করা হয়। ইবন কাহতাবা, যিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আলীর উপর অসন্তুষ্ট হয়ে ইরাকের দিকে আসছিলেন, তিনি আবূ মুসলিমের সাথে যোগ দেন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আলী মুকাতিল ইব্‌ন হাকীমকে নিরাপত্তা দান করেন। ফলে মুকাতিল হাররানের শাসন কর্তৃত্ব আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আলীর হাতে সোপর্দ করেন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আলী একটি চিঠিসহ মুকাতিলকে রাককার হাকিম উছমান ইব্‌ন আবদুল আলীর নিকট প্রেরণ করেন। মুকাতিল সেখানে পৌঁছতেই উছমান তাকে হত্যা করেন এবং তার দুই পুত্রকে বন্দী করে রাখেন। মানসূর আবূ মুসলিমকে প্রেরণ করার পর মুহাম্মদ ইব্‌ন সাওলকে আযারবায়জান থেকে তলব করে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আলীকে ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তার কাছে প্রেরণ করেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন সাওল আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আলীর কাছে গিয়ে বলেন ঃ আমি সাফ্‌ফাহকে বলতে শুনেছি, আমার চাচা আবদুল্লাহ্ আমার পর আমার স্থলাভিষিক্ত হবেন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আলী সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠেন, 'তুমি মিথ্যাবাদী, আমি তোমার প্রতারণা ধরে ফেলেছি। এই বলে তিনি তার গর্দান উড়িয়ে দেন। এরপর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আলী হাররান থেকে নিসীবীনে এসে অবস্থান গ্রহণ করেন এবং পরিখা খনন করে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। মানসূর আবূ মুসলিমকে প্রেরণ করার পূর্বে আর্মেনিয়ার শাসনকর্তা হাসান ইব্‌ন কাহতাবাকে লিখেছিলেন, যেন তিনি আবূ মুসলিমের সাথে এসে যোগদান করেন। অতএব হাসান ইব্‌ন কাহতাবাও আবূ মুসলিমের সাথে মাওসিলে এসে মিলিত হন। আবূ মুসলিম তার বাহিনী নিয়ে যখন নিসীবীনের নিকটবর্তী হন তখন নিসীবীনের রাস্তা ছেড়ে সিরিয়ার রাস্তার উপর ছাউনি স্থাপন করেন এবং একথা প্রচার করে দেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আলীকে নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই। আমি তো সিরিয়ার গভর্নর পদে যোগদান করার জন্য সেখানে যাচ্ছি। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আলীর সাথে সিরিয়ার যে সমস্ত লোক ছিল তারা একথা শুনে বিচলিত হয়ে ওঠে। তারা আবদুল্লাহকে বলে ঃ তাহলে আমাদের পরিবার-পরিজন নির্ঘাত আবূ মুসলিমের নির্যাতনের শিকারে পরিণত হবে।

অতএব এই মুহূর্তে আমাদের উচিত, তাকে সিরিয়ার দিকে যেতে না দেওয়া। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আলী তাদেরকে অনেক বুঝালেন যে, সে আমাদেরই মুকাবিলা করতে এসেছে। অতএব সিরিয়ায় কখনো যাবে না। কিন্তু তার এ কথায় কেউই কান দেয়নি। শেষ পর্যন্ত আবদুল্লাহ্ ঐ স্থান ত্যাগ করে সিরিয়া অভিমুখে রওয়ানা হন। অমনি আবূ মুসলিম তার ঐ চমৎকার অবস্থানটি দখল করে নেন। ফলে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আলীকে রাস্তা থেকে ফিরে এসে ঐ স্থানেই অবস্থান নিতে হয়, যেখানে ইতিপূর্বে আবূ মুসলিম ছিলেন। এভাবে আবূ মুসলিম অতি সহজেই শ্রেষ্ঠতম অবস্থানটি করায়ত্ত করে নেন। এবার উভয় বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয় এবং কয়েক মাস পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। শেষ পর্যন্ত ১৩৭ হিজরী ৭ জমাদিউস্ সানী (৭৫৪ খ্রি. ডিসেম্বর) রোজ বুধবার আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আলী পরাজিত হন। আবূ মুসলিম এ সংবাদ সঙ্গে সঙ্গে মানসূরের কাছে পাঠিয়ে দেন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আলী যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গিয়ে বসরায় আপন ভাই সুলায়মান ইব্‌ন আলীর কাছে আশ্রয় নেন এবং দীর্ঘদিন পর্যন্ত সেখানে আত্মগোপন করে থাকেন।

আবূ মুসলিমকে হত্যা

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলী পরাজিত হলে তার ছাউনি লুট করে আবূ মুসলিম প্রচুর মালে গনীমত হস্তগত করেন। মানসূর যখন এই বিজয় সংবাদ পান তখন তিনি তার ভৃত্য আবূ খাসীবকে মালে গনীমতের একটি তালিকা তৈরির জন্য সেখানে প্রেরণ করেন। আবূ মুসলিম এতে খুব অসন্তুষ্ট হন এই ভেবে যে, আমার উপর মানসূরের কোন আস্থা নেই বলেই তালিকা তৈরির জন্য নিজের একজন লোক পাঠিয়ে দিয়েছেন। মানসূর যখন আবূ মুসলিমের এই অসন্তুষ্টির কথা জানতে পারেন তখন তিনি চিন্তান্বিত হন এই ভেবে যে, আবূ মুসলিম অসন্তুষ্ট হয়ে হয়ত খুরাসানে চলে যাবে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে মিসর ও সিরিয়ার গভর্নর পদের নিযুক্তিপত্র লিখে আবূ মুসলিমের কাছে পাঠিয়ে দেন। এতে আবূ মুসলিম আরো বেশি মনঃক্ষুণ্ন হন। তিনি পরিষ্কার বুঝতে পারেন যে, মানসূর তাকে খুরাসান থেকে সরিয়ে নিয়ে দুর্বল করে ফেলার ফন্দি আঁটছেন। যাহোক তিনি জাযীরা থেকে বের হয়ে খুরাসান অভিমুখে রওয়ানা হন। এ সংবাদ শুনে মানসূর আনবার থেকে মাদায়েন অভিমুখে রওয়ানা হন এবং আবূ মুসলিমকে তার কাছে হাযির হতে বলেন। কিন্তু আবূ মুসলিম তার কাছে আসতে অস্বীকার করেন এবং লিখে পাঠান আমি দূর থেকেই আপনার আনুগত্য করব। আপনার সব শত্রুকেই আমি পরাস্ত করেছি। এখন আপনার পথের সব কাঁটাই দূর হয়ে গেছে। অতএব আমার আর কোন প্রয়োজন আপনার নেই। যদি আপনি আমাকে আমার অবস্থার উপর ছেড়ে দেন তাহলে আমি কখনো আপনার অবাধ্য হব না এবং নিজের বায়আতের উপরই অটল থাকব। কিন্তু যদি আপনি আমার পিছনে লাগেন তাহলে আমি আপনার খিলাফত অস্বীকার করে আপনার বিরুদ্ধে দাঁড়াব। এই চিঠি পেয়ে মানসূর অত্যন্ত নম্র ও স্নেহার্দ্র ভাষায় আবূ মুসলিমকে লিখেন ঃ তোমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা ও আনুগত্যের ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নেই। তুমি অত্যন্ত কর্তব্যপরায়ণ ও প্রশংসাযোগ্য ব্যক্তি। শয়তান তোমার অন্তরে কুমন্ত্রণা ঢেলে দিয়েছে। তুমি এই কুমন্ত্রণা থেকে নিজেকে রক্ষা কর এবং আমার কাছে চলে এস। এই পত্র মানসূর আপন মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস আবূ হুমায়দের মাধ্যমে প্রেরণ করেন। তিনি তাকে ভালোভাবে বুঝিয়ে বলেন, অনুরোধ-উপরোধ, কাকুতি-মিনতি যে করেই হোক, তুমি তাকে আমার কাছে আসার জন্য অনুপ্রাণিত করবে। এতেও যদি সে সম্মত না হয় তাহলে তাকে আমার ক্রোধের ভয় দেখাবে। এই চিঠি আবূ মুসলিমের কাছে পৌঁছলে তিনি মালিক ইব্ন হায়সামের সাথে এ সম্পর্কে পরামর্শ করেন। মালিক পরামর্শ দেন, তুমি কখনো মানসূরের কাছে যাবে না। সে তোমাকে পেলেই হত্যা করবে। কিন্তু মানসূর পত্র মারফত আবূ দাঊদ খালিদ ইব্ন ইবরাহীমকে খুরাসানের গভর্নর পদের লোভ দেখিয়ে একথায় রাযী করিয়ে নিয়েছিলেন যে, তিনি আবূ মুসলিমকে যেভাবে পারেন তার (মানসূরের) কাছে আসতে উদ্বুদ্ধ করবেন। আবূ দাঊদের প্ররোচনায় আবূ মুসলিম সত্যি সত্যি মানসূরের কাছে আসতে রাযী হয়ে যান; তবে সতর্কতা অবলম্বন করতে গিয়ে প্রথমে আপন উযীর আবূ ইসহাক খালিদ ইব্ন উছমানকে মানসূরের কাছে পাঠিয়ে সেখানকার অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার চেষ্টা করেন। ইসহাকের উপর আবূ মুসলিমের খুব আস্থা ছিল। তাই প্রথমে আবূ ইসহাককেই প্রেরণ করেন। আবূ ইসহাক যখন দরবারে খিলাফতের নিকটবর্তী হন তখন বনূ হাশিমের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ

এবং দরবারে খিলাফতের সভাসদবৃন্দ তাকে অভ্যর্থনা জানাতে আসেন। মানসূরও তার প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করেন এবং তাকে একজন সহৃদয় বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেন। তিনি অত্যন্ত মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে ইসহাককে নিজের দিকে আকৃষ্ট করেন এবং বলেন ঃ খুরাসানে না গিয়ে আমার এখানে আসার জন্য যদি তুমি আবূ মুসলিমকে রাযী করাতে পার তাহলে এর বিনিময়ে আমি তোমাকে খুরাসানের শাসনকর্তৃত্ব দান করব। আবূ ইসহাক এ প্রস্তাবে রাযী হয়ে যান। তিনি আবূ মুসলিমের কাছে এসে তাকে মানসূরের কাছে যাওয়ার ব্যাপারে সম্মত করান। আবূ মুসলিম তার সেনাবাহিনীকে মালিক ইব্‌ন হায়সামের অধিনায়কত্বে হুলওয়ানে রেখে মাত্র তিন হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী নিয়ে মাদায়েনের দিকে রওয়ানা হন। আবূ মুসলিম মাদায়েনের নিকটবর্তী হলে মানসূরের ইঙ্গিতে জনৈক ব্যক্তি তার সাথে সাক্ষাত করে এবং বলে ঃ আপনি অনুগ্রহপূর্বক মানসূরের কাছে আমার সম্পর্কে এই সুপারিশ করবেন যে, তিনি যেন আমাকে কসকরের শাসক নিয়োগ করেন। তাছাড়া 'ওয়াযিরুস্ সালতানাত' (মন্ত্রী) আবূ আইউবের প্রতি মানসূর আজকাল খুবই অসন্তুষ্ট আছেন। অতএব আপনি আবূ আইউবের জন্যও একটু সুপারিশ করবেন। আবূ মুসলিম একথা শুনে খুবই সন্তুষ্ট হন এবং তার মনের মধ্যে যে কিছুটা ভয়ভীতি ছিল তা সম্পূর্ণ দূর হয়ে যায়। তিনি খলীফার দরবারে অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার সাথে প্রবেশ করেন এবং সেখান থেকে সসম্মানে বিদায় নিয়ে বিশ্রাম গ্রহণের জন্য তার জন্য নির্ধারিত অতিথি ভবনে চলে যান। পরদিন মানসূর উছমান ইব্‌ন নাহীক, শাবীব ইব্‌ন রাওয়াহ্, আবূ হানীফা হারব ইব্‌ন কায়স প্রমুখকে দরবারের একটি গোপন কক্ষে বসিয়ে রাখেন এবং তাদেরকে নির্দেশ দেন, যখন আমি দু'হাতে তালি বাজাবো তখন তোমরা সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এসে আবূ মুসলিমকে হত্যা করবে। যাহোক পরদিন আবূ মুসলিম যখন দরবারে আসেন তখন মানসূর কথা প্রসঙ্গে তাকে ঐ দু'টি তরবারির কথা জিজ্ঞেস করেন, যা তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আলী থেকে পেয়েছিলেন। আবূ মুসলিম তখন কোমরে বাঁধা একটি তরবারির প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, এটি হচ্ছে ঐ দু'টির একটি। মানসূর বলেন, আমাকে একটু দেখান। আবূ মুসলিম সঙ্গে সঙ্গে তরবারিটি কোমর থেকে খুলে খলীফা মানসূরের হাতে দেন। মানসূর কিছুক্ষণ সেটি দেখতে থাকেন। এরপর নিজের উরুর নিচে চেপে রেখে আক্রমণাত্মক সুরে আবূ মুসলিমের উপর বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন করতে থাকেন। তিনি সুলায়মান ইব্‌ন কাসীরকে হত্যার উল্লেখ করে বলেন, তুমি তাকে কেন হত্যা করেছ ? তিনি তো তখন থেকেই আমাদের সহযোগী ও শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন যখন তুমি এ কাজে যোগই দাওনি। আবূ মুসলিম প্রথম প্রথম তোষামোদের ভঙ্গিতে এবং নম্র স্বরে নিজের পক্ষ থেকে ওযর পেশ করতে থাকেন। কিন্তু ক্রমান্বয়ে মানসূরের ক্রোধাগ্নি বৃদ্ধি পাচ্ছে দেখে তিনি বুঝতে পারেন, আর তার আর রক্ষা নেই। এবার তিনি বেপরোয়া হয়ে উত্তর দেন, আপনার যা ইচ্ছা তাই করুন। আমি আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে ভয় করি না। মানসূর তখন আবূ মুসলিমকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন এবং সাথে সাথে দুই হাতে তালি বাজান। অমনি উছমান ইব্‌ন নাহীক এবং তার সঙ্গীরা গোপন কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে আবূ মুসলিমের উপর হামলা চালায় এবং তাকে চিরতরে খতম করে দেয়। এটি হিজরী ১৩৭ সনের ২৫শে শাবানের (৭৫৫ খ্রি. ফেব্রুয়ারী) ঘটনা। আবূ মুসলিম নিহত হওয়ার পর 'ওয়াযিরুস্ সালতানাত' (মন্ত্রী) বাইরে এসে আবূ

মুসলিমের সঙ্গীদেরকে এই বলে সেখান থেকে বিদায় করে দেন যে, আমীর (আবূ মুসলিম) এ বেলা আমীরুল মু'মিনীনের সাথে থাকবেন। অতএব তোমরা নিজ নিজ অবস্থানে ফিরে যাও। এরপর ঈসা ইব্ন মূসা দরবারে খিলাফতে হাযির হয়ে আবূ মুসলিম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন এবং যখন জানতে পারেন যে, তাকে হত্যা করা হয়েছে তখন অলক্ষ্যেই তার মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ে, 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন'। এ বিষয়টি মানসূরের কাছে খুবই বিরক্তিকর ঠেকে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠেন, আবূ মুসলিমের চাইতে বড় শত্রু তোমার আর কেউ ছিল না। এরপর মানসূর জা'ফর ইব্ন হানযালাকে ডেকে পাঠান এবং আবূ মুসলিমকে হত্যা সম্পর্কে তার সঙ্গে পরামর্শ করেন। জা'ফর তাকে হত্যা করার পক্ষে মত দেন। তখন মানসূর বলেন, আল্লাহ্ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিন। এরপর তিনি আবূ মুসলিমের লাশের প্রতি ইঙ্গিত করেন। জা'ফর আবূ মুসলিমের লাশ দেখে বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! প্রকৃতপক্ষে আজ থেকেই আপনার খিলাফতকাল গণনা করা হবে। একথা শুনে মানসূর মুচকি হেসে নীরব হয়ে যান।

আবূ নাসর মালিক ইব্ন হায়সাম, যার হাতে আবূ মুসলিম আপন বাহিনী ও ধন-সম্পদ রেখে এসেছিলেন, হুলওয়ান থেকে খুরাসানের উদ্দেশে হামাদানের দিকে রওয়ানা হন। এরপর মানসূরের কাছে ফিরে আসেন। মানসূর তাকে দোষী সাব্যস্ত করেন এই বলে যে, তুমি আবূ মুসলিমকে কেন আমার কাছে না আসার কুপরামর্শ দিয়েছিলে? আবূ নাসর উত্তর দেন, আমি যতক্ষণ আবূ মুসলিমের কাছে ছিলাম তাকে সুপরামর্শ দিয়েছি। এখন যখন আপনার কাছে এসে গেছি তখন আপনারই মঙ্গল সাধনে ব্যাপৃত থাকব। মানসূর তাকে মাওসিলের গভর্নর নিয়োগ করে সেখানে পাঠিয়ে দেন।

সিনবাদের বিদ্রোহ ঘোষণা

আবূ মুসলিমকে হত্যা করে মানসূর বাহ্যত স্বস্তি লাভ করেছিলেন। কিন্তু এরপরও তাকে বার বার নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। আবূ মুসলিমের সঙ্গীদের মধ্যে ফিরূয নামীয় জনৈক অগ্নিউপাসক সিন্বাদ নামে পরিচিত ছিল। সে ইসলাম গ্রহণ করে আবূ মুসলিমের সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয়েছিল। তার হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য সে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। কুহিস্তানের লোকেরা তাকে সমর্থন দেয়। সিন্বাদ নিশাপুর ও রায় দখল করে ঐ সমস্ত ধন-সম্পদ হস্তগত করে, যা আবূ মুসলিম হজ্জে রওয়ানা হওয়ার সময় রায় এবং নিশাপুরে রেখে গিয়েছিলেন। উপরন্তু সিনবাদ সাধারণ লোকদের বাড়িঘরেও লুটপাট চালায় এবং তাদেরকে গ্রেফতার করে দাসদাসীতে পরিণত করে। এরপর সে মুরতাদ হয়ে ঘোষণা করে যে, সে কাবাঘর ধ্বংস করতে যাচ্ছে। নওমুসলিম ইরানীদের জন্য এ ধরনের আন্দোলন ছিল খুবই উৎসাহব্যঞ্জক। তাদের মধ্যে যে সব লোক ইসলাম সম্পর্কে কোন জ্ঞান অর্জন করেনি তারা যখন দেখল যে, তাদেরই দেশ এবং তাদেরই জাতির এক ব্যক্তি ইসলামী সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে, তখন তারাও তার সাথে যোগ দেয়। মানসূর যখন এই সংবাদ পান তখন তিনি সিন্বাদকে পরাস্ত করার জন্য জামহূর ইব্ন মুরার আজালীকে প্রেরণ করেন। হামাদান ও রায়-এর মধ্যবর্তী একটি স্থানে যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং তাতে সিনবাদ পরাজিত হন। তার প্রায় সাত

হাজার সঙ্গী রণক্ষেত্রেই প্রাণ হারায়। সিনবাদ পলায়ন করে তাবারিস্তানে গিয়ে আশ্রয় নেন। সেখানে তাবারিস্তানের কর্মকর্তার জনৈক ভৃত্য তাকে হত্যা করে। মানসূর এই সংবাদ শুনে তাবারিস্তানের আমিলকে (কর্মকর্তাকে) নির্দেশ দেন, সিনবাদের যাবতীয় ধন-সম্পদ আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। কিন্তু আমিল সে নির্দেশ অমান্য করেন। এবার মানসূর তাবারিস্তানের ঐ কর্মকর্তাকে শায়েস্তা করার জন্য একটি সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। এ সংবাদ পেয়ে তাবারিস্তানের কর্মকর্তা পলায়ন করেন। এদিকে জামহূর সিনবাদকে পরাস্ত করায় প্রায় সমগ্র ভাণ্ডারই তার হস্তগত হয়। জামহূর এই ধন-ভাণ্ডার এবং আরো অনেক মাল-সম্পদ মানসূরের কাছে প্রেরণ করেন এবং রায়-এ গিয়ে ভালোভাবে সেখানকার দুর্গ মেরামত করে মানসূরের খিলাফতের বায়আত প্রত্যাহার এবং তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। মানসূর মুহাম্মদ ইব্ন আশ্আছের নেতৃত্বে জামহূরের মুকাবিলায় একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। তিনি এই খবর পেয়ে রায় থেকে ইসফাহানের দিকে চলে যান। জামহূর ইসফাহানের উপর এবং মুহাম্মদ ইব্ন আশআছ রায়-এর উপর নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর মুহাম্মদ ইসফাহান আক্রমণ করেন। একটি রক্তাক্ত যুদ্ধের পর জামহূর পরাজিত হয়ে আযারবায়জানের দিকে পলায়ন করেন। সেখানে জামহূরেরই জনৈক সঙ্গী তাকে হত্যা করে এবং তার ছিন্ন মস্তক মানসূরের কাছে পাঠিয়ে দেয়। এটি হচ্ছে ১৩৮ হিজরীর (৭৫৫-৫৬ খ্রি.) ঘটনা।

১৩৯ হিজরীতে (৭৫৬-৫৭ খ্রি.) মানসূর আপন চাচা সুলায়মানকে বসরার গভর্নর পদ থেকে অপসারণ করে নিজের কাছে ডেকে পাঠান। তিনি তাকে এও লিখেন ঃ তুমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলীকে প্রাণের নিরাপত্তাদান কর এবং আমার কাছে আসার সময় তাকেও সঙ্গে নিয়ে আস। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলী আবূ মুসলিমের কাছে পরাজিত হয়ে বসরায় আপন ভাই সুলায়মানের কাছে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সুলায়মান আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলীকে নিয়ে মানসূরের দরবারে হাযির হলে তিনি তাকে বন্দী করেন (পরবর্তীতে তাকেও হত্যা করা হয়)।

রাওয়ান্দিয়া ফিরকা

রাওয়ান্দিয়া ফিরকাকে শিয়াদেরই একটি ফিরকা মনে করা হয়। প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল ইরান ও খুরাসানের মূর্খ লোকদের একটি দল বা ফিরকা। ওরা রাওয়ান্দ এলাকার অধিবাসী ছিল বলে এই ফিরকাকে রাওয়ান্দিয়া ফিরকা বলা হয়। আবূ মুসলিম খুরাসানী এই ফিরকাকে নিজের সহযোগী করে নিয়েছিলেন। কেননা তিনি যে দল গঠন করেছিলেন প্রকৃতপক্ষে ধর্মের সাথে তার কোন সম্পর্ক ছিল না। শুধু রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যই তিনি বিভিন্ন মত ও বিভিন্ন পথের লোককে একই প্লাটফর্মে জড় করেছিলেন। রাওয়ান্দিয়া ফিরকার লোকেরা 'তানাসুখ' (জন্মান্তরবাদ) ও 'হুলুল' (অবতারবাদ)-এ বিশ্বাসী ছিল। তাদের আকীদা ছিল আল্লাহ্ তা'আলা মানসূরের রূপ ধারণ করেছেন। তাই তারা মানসূরকে খোদা মনে করে তাকে দর্শন করতে আসত এবং এটাকেই ইবাদত মনে করত। তারা এও বিশ্বাস করত যে, আদম-আত্মা উছমান ইব্ন নাহীকের এবং জিবরীল হায়সাম ইব্ন মুআবিয়ার রূপ ধারণ করেছেন। এইসব লোক রাজধানীতে এসে তাদের এই বাতিল আকীদার কথা প্রচার করতে থাকলে মানসূর তাদের মধ্য থেকে দুশ ব্যক্তিকে বন্দী করেন। তাদের লোকসংখ্যা ছিল প্রায় পাঁচশ। যারা বাইরে ছিল তারা বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে। এমন কি কয়েদখানার উপর আক্রমণ

চালিয়ে তাদের সঙ্গীদেরকে মুক্ত করে নেয়। এরপর তারা মানসূরের প্রাসাদ ঘেরাও করে ফেলে। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, যারা মানসূরকে 'খোদা' বলে বিশ্বাস করত তারাই তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এখানে উল্লেখ্য যে, মাআন ইব্‌ন যায়দাহ্ ছিল ইব্‌ন হুবায়রার অন্যতম সঙ্গী। যখন ইব্‌ন হুবায়রা আব্বাসীদের সাথে যুদ্ধ করেন তখন মাআন ছিলেন তার অন্যতম সমর্থক। ইব্‌ন হুবায়রার পর মাআন ইব্‌ন যায়দাহ্ দারুল খুলাফা হাশিমিয়ায় এসে আত্মগোপন করে থাকেন। অবশ্য মানসূর তাকে হত্যা অথবা বন্দী করার জন্য অনুসন্ধান চালিয়ে যান। যাহোক রাওয়ান্দিয়ারা যখন মানসূরের প্রাসাদ ঘেরাও করে তখন তিনি একেবারে খালি পায়ে প্রাসাদ থেকে বের হন এবং বিক্ষোভকারীদেরকে মেরে ভাগাতে থাকেন। মানসূরের সাথে তখন লোক ছিল অতি অল্পই। আর প্রকৃত ব্যাপার এই যে, তখন রাজধানীতে এই বিক্ষোভকারীদের মুকাবিলা করার মত কোন সেনাবাহিনীও ছিল না। মানসূরের জন্য ঐ মুহূর্তটি ছিল খুবই নাজুক। কেননা তখন রাওয়ান্দীরা তাকে হত্যা করে তার রাজধানী দখল করে নিতে পারত। এই ভয়ংকর অবস্থা থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য মাআন ইব্‌ন যায়দাহ্ সঙ্গে সঙ্গে মানসূরের পাশে গিয়ে দাঁড়ান এবং বিক্ষোভকারীদেরকে আক্রমণ করে তাড়াতে থাকেন। তার আক্রমণ এতই জোরদার ছিল যে, মানসূর বিস্ময়াভিভূত ও সপ্রশংস দৃষ্টিতে এই অচেনা লোকটির অনন্য বীরত্ব প্রত্যক্ষ করছিলেন। শেষ পর্যন্ত মাআনকে এই যুদ্ধে অধিনায়কেরই ভূমিকা পালন করতে দেখা যায় এবং তার কাছে বিক্ষোভকারীরা শোচনীয়ভাবে পরাজয়বরণ করে। ইতিমধ্যে শহরবাসীরা বেরিয়ে আসে এবং একে একে প্রত্যেকটি বিক্ষোভকারীকেই হত্যা করে। এভাবে যখন সংঘর্ষের পরিসমাপ্তি ঘটে তখন মানসূর জিজ্ঞেস করেন, কে এই ব্যক্তিটি যার বীরত্ব ও পরাক্রম এই বিদ্রোহ দমনের ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে ? যখন তিনি জানতে পারেন যে, সে মাআন ইব্‌ন যায়দাহ ছাড়া আর কেউ নয় তখন তাকে নিরাপত্তা প্রদান করেন এবং তার পূর্ববর্তী সব অপরাধ মাফ করে দেন। উপরন্তু তিনি তার সম্মান ও মর্যাদাও বৃদ্ধি করেন।

আবূ দাউদ খালিদ ইব্‌ন ইবরাহীম যাহ্‌লী তখন খুরাসানের গভর্নর ছিলেন। ঐ সময়ে অর্থাৎ ১৪০ হিজরী (৭৫৭-৫৮ খ্রি.) তার সেনাবাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং তারা তার বাসভবন ঘেরাও করে ফেলে। আবূ দাউদ বিদ্রোহীদের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য তার বাসভবনের ছাদে উঠেন এবং দুর্ভাগ্যবশত পা পিছলে সেখান থেকে পড়ে মারা যান। এরপর তার সেনাপতি হুসাম ঐ বিদ্রোহ দমন করেন এবং খুরাসানের শাসন কর্তৃত্ব নিজের হাতে নিয়ে সে সম্পর্কে মানসূরকে অবহিত করেন। মানসূর আবদুল জাব্বার ইব্‌ন আবদুর রহমানকে পরবর্তী গভর্নর নিয়োগ করে খুরাসানে পাঠিয়ে দেন।

আবদুল জাব্বারের বিদ্রোহ ও মৃত্যু

আবদুল জাব্বার খুরাসানের শাসনকর্তৃত্বের অধিকারী হওয়ার সাথে সাথে আবূ দাউদের কর্মকর্তাদেরকে হয় পদচ্যুত, না হয় লাঞ্ছিত, না হয় হত্যা করেন। সামান্যমাত্র সন্দেহের বশবর্তী হয়ে অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিকে হত্যা করে তিনি সমগ্র দেশে এক মহাসন্ত্রাসের সৃষ্টি করেন। যখন মানসূরের কাছে এ সংবাদ পৌঁছে তখন তিনি তাকে কিভাবে সহজ পদ্ধতিতে খুরাসান থেকে অপসারণ করতে পারেন সে ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করতে থাকেন। তিনি

আশংকা করছিলেন, এ ব্যাপারে তাড়াহুড়া করলে আবদুল জাব্বার হয়ত প্রকাশ্য বিদ্রোহ করে বসবেন। শেষ পর্যন্ত মানসূর তাকে লিখেন, তুমি খুরাসান বাহিনীর একটি বড় অংশকে রোমান যুদ্ধে পাঠিয়ে দাও। তার পরিকল্পনা খুরাসান বাহিনীর বড় অংশ সেখান থেকে চলে এলে আবদুল জাব্বারকে পদচ্যুত করে তার স্থলে নতুন কোন গভর্নর পাঠানো সহজ হবে। আবদুল জাব্বার উত্তরে লিখেন, তুর্কীরা সৈন্য প্রেরণ করতে শুরু করেছে। এমতাবস্থায় যদি আপনি খুরাসানের বাহিনীকে অন্য কোন দিকে স্থানান্তরিত করেন তাহলে হয়ত খুরাসানই আমাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে। এই জবাব পেয়ে মানসূর আবদুল জাব্বারকে লিখেন, খুরাসান আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় ভূখণ্ড এবং এটাকে রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরী বলে মনে করি। যদি তুর্কীরা এরিমধ্যে সৈন্য পাঠাতে শুরু করে তাহলে আমি খুরাসান রক্ষার জন্য একটি বিরাট বাহিনী পাঠাচ্ছি। তুমি এ ব্যাপারে কোন চিন্তা করো না। এই চিঠি পড়ে আবদুল জাব্বার সঙ্গে সঙ্গে মানসূরকে লিখেন, খুরাসানের যা আয় তাতে এই বিরাট বাহিনীর খরচের বোঝা বহন করা সম্ভব হবে না। অতএব আপনি কোন বিরাট বাহিনী পাঠাবেন না। এই উত্তর পেয়ে মানসূরের নিশ্চিন্ত বিশ্বাস হয় যে, আবদুল জাব্বার বিদ্রোহের জন্য তৈরি হয়ে গেছেন। অতএব তিনি সঙ্গে সঙ্গে আপন পুত্র মাহ্দীর অধিনায়কত্বে একটি বিশাল বাহিনী প্রেরণ করেন। মাহ্দী রায়-এ পৌঁছে সেখানেই অবস্থান নেন এবং খাযিম ইব্ন খুযায়মাকে আবদুল জাব্বারের মুকাবিলায় অগ্রে প্রেরণ করেন। উভয় পক্ষের মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। শেষ পর্যন্ত আবদুল জাব্বার পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন। কিন্তু মাহশার ইব্ন মুযাহিম তাকে বন্দী করতে সক্ষম হন এবং খাযিম ইব্ন খুযায়মার খিদমতে নিয়ে হাযির করেন। খাযিম ইব্ন খুযায়মা তাকে চুলের একটি জুব্বা পরিয়ে এবং পশ্চাৎমুখী করে উটের পিঠে বসিয়ে খুব হৈ-হল্লা করেন। এরপর তার অন্যান্য সঙ্গী-সাথীসহ মানসূরের কাছে পাঠিয়ে দেন। মানসূর তাদের সবাইকে বন্দী করেন। এরপর ১৪২ হিজরীতে (৭৫৯ খ্রি) আবদুল জাব্বারের দেহ থেকে হাত-পা বিচ্ছিন্ন করে তাকে নির্মমভাবে হত্যা করেন। আবদুল জাব্বারের উপর জয়লাভ করার পর মাহদী খুরাসানের শাসনকর্তৃত্ব নিজের হাতে তুলে নেন। ১৪৯ হিজরী (৭৬৬ খ্রি) পর্যন্ত তিনি খুরাসানের গভর্নর ছিলেন।

উয়ায়না ইব্ন মূসা ইব্ন কা'ব

মূসা ইব্ন কা'ব সিন্ধুর কর্মকর্তা ছিলেন। তার পরে তার পুত্র উয়ায়না সিন্ধুর কর্মকর্তা নিযুক্ত হন। তিনি সিন্ধুতে মানসূরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। মানসূর এই সংবাদ পেয়ে রাজধানী থেকে বসরায় আসেন এবং সেখান থেকেই আমর ইব্ন হাফ্স ইব্ন আবূ সাফওয়া আতাকীকে সিন্ধু ও হিন্দের গভর্নর নিয়োগ করে তাকে উয়ায়নার মুকাবিলায় প্রেরণ করেন। আমর ইব্ন হাফ্স সিন্ধুতে পৌঁছে উয়ায়নার সাথে যুদ্ধ শুরু করেন এবং শেষ পর্যন্ত সিন্ধু দখল করে নেন। এটা হচ্ছে ১৪১ হিজরীর (৭৫৮-৫৯ খ্রি.) ঘটনা। ঐ সময়ে তাবারিস্তানের শাসনকর্তাও বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তখন খাযিম ইব্ন খুযায়মা এবং রাওহ্ ইব্ন হাতিমকে তাবারিস্তানে প্রেরণ করা হয়। তারা তাবারিস্তান দখল করে নেন এবং সেখানকার গভর্নর, যিনি ইরানী বংশোদ্ভূত ছিলেন, পরাজয়ের গ্লানি সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেন।

আলাবীদের উপর জুলুম-নির্যাতন

উপরে উল্লিখিত হয়েছে যে, বনূ উমাইয়ার শাসন আমলের একেবারে শেষ পর্যন্ত মক্কায় উমাইয়া বিরোধীদের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং তাতে খলীফা নির্বাচনের বিষয়টিও ওঠে। মানসূরও ঐ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। তিনি খলীফা পদের জন্য মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাসান মুসান্না ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন আলীর নাম প্রস্তাব করেন। উপস্থিত সকলেই সর্বসম্মতিক্রমে তার সেই প্রস্তাব সমর্থন করেন এবং ঐ বৈঠকেই আবদুল্লাহর হাতে বায়আত করা হয়। মানসূরও ঐ বায়আতে অংশগ্রহণ করেন। অর্থাৎ তিনিও মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহকে খলীফা স্বীকার করে নেন। সাফ্‌ফাহ্ তাঁর খিলাফত আমলে প্রচুর অর্থ-সম্পদ বিলিয়ে এবং অনেক সম্মান প্রদর্শন করে আলাবীদেরকে নিশ্চুপ করে রেখেছিলেন। ফলে তাঁর আমলে আলাবীরা কোন বিদ্রোহ করেনি। মানসূর খলীফা হয়ে সাফ্‌ফাহর যুগের সেই বদান্যতাকে বহাল রাখেন নি। যেমন ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহর পিতা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাসান সাফ্‌ফাহর কাছে এসেছিলেন এবং সাফ্‌ফাহ্ তাঁকে প্রচুর ধন-সম্পদ দিয়ে তুষ্ট করে বিদায় দিয়েছিলেন। মানসূর খলীফা হলে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাসান আপন পুত্র মুহাম্মদ এবং ইবরাহীমকে এই ভেবে লুকিয়ে রেখেছিলেন যে, হয়ত মানসূর তাদেরকে হত্যা করে ফেলবেন। এই মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ যাঁর হাতে মানসূর বায়আত করেছিলেন, মুহাম্মদ মাহ্‌দী নামে পরিচিত ছিলেন না। অতএব আমরা আগামীতে মুহাম্মদ মাহদী নামেই তাঁর উল্লেখ করব। ১৩৬ হিজরীতে (৭৫৩ খ্রি) যখন মানসূর হজ্জ করতে মক্কায় যান এবং সেখানে শুনতে পান যে, সাফ্‌ফাহ্ ইনতিকাল করেছেন তখন তিনি সর্বপ্রথম মুহাম্মদ মাহ্‌দীর সন্ধান নেন। তখন মাহ্‌দী সেখানে ছিলেন না। কিন্তু তাতে মানসূরের মনে সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে যায়। আর সে কারণেই মুহাম্মদ মাহ্‌দী আত্মগোপন করে থাকেন।

মনসুর খলীফা হওয়ার পর সব সময়ই যার-তার কাছে তাঁর ঠিকানা জানতে চাইতেন। তিনি এ ব্যাপারে এত বেশি আগ্রহ দেখান যে, প্রত্যেক লোকই জেনে যায়, মানসূর মুহাম্মদ মাহ্‌দীকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাসান মুসান্নার উপর যখন মানসূরের দিক থেকে তাঁর ছেলেকে হাযির করার জন্য অত্যধিক চাপ প্রয়োগ করা হয় তখন তিনি মানসূরের চাচা সুলায়মান ইব্‌ন আলীর সাথে এ ব্যাপারে পরামর্শ করেন। সুলায়মান বলেন, মানসূর যদি ক্ষমা করার লোক হতো তাহলে আপন চাচাকে ক্ষমা করত। অর্থাৎ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আলীর উপর বাড়াবাড়ি করত না। একথা শুনে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাসান আপন পুত্রদেরকে গোপন করে রাখার ব্যাপারে আরো বেশি সতর্ক হয়ে যান। শেষ পর্যন্ত মানসূর হিজাযের প্রান্তে প্রান্তে আপন গুপ্তচর বাহিনী ছড়িয়ে দেন এবং বানাওয়াট পত্রাদি লিখিয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাসানের কাছে পাঠাতে থাকেন, যাতে কোন না কোনভাবে মুহাম্মদ মাহ্‌দীর সন্ধান বেরিয়ে আসে। মুহাম্মদ মাহ্‌দী এবং তাঁর ভাই ইবরাহীম অত্যন্ত সন্তর্পণে আত্মগোপন করে থাকেন। এরপর শুধু তাঁদের সন্ধান বের করার জন্য স্বয়ং মানসূর হজ্জের বাহানায় মক্কায় গিয়ে পৌঁছেন। এবার দুইভাই হিজায থেকে বসরায় এসে বনূ রাহিব ও বনূ মুররা গোত্রে অবস্থান করতে থাকেন। মানসূর এই সন্ধান পেয়ে সোজা বসরায় চলে আসেন। কিন্তু তাঁর আসার পূর্বেই মুহাম্মদ মাহ্‌দী এবং ইবরাহীম বসরা ছেড়ে আদনে চলে গিয়েছিলেন।

এবার মানসূর বসরা থেকে রাজধানী অভিমুখে রওয়ানা হন। যখন দুই ভাই আদনেও স্বস্তি পেলেন না তখন সোজা সিন্ধুতে চলে যান এবং কিছুদিন সেখানে কাটিয়ে পুনরায় কূফায় এসে আত্মগোপন করে থাকেন। এরপর তথা থেকে মদীনায় চলে যান। ইবরাহীম মানসূরকে খতম করার সংকল্প নেন। কিন্তু তা থেকে মুহাম্মদ মাহদী তাঁকে বিরত রাখেন। মানসূর এবারও তাঁদের কোন সন্ধান পান নি। তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাসান মুসান্নাকে ডেকে পাঠিয়ে উভয় পুত্রকে হাযির করার জন্য পুনরায় চাপ সৃষ্টি করেন। তিনি এ ব্যাপারে তাঁর অজ্ঞতার কথা জানালে মানসূর তাঁকে বন্দী করতে চান। কিন্তু মদীনার কর্মকর্তা যিয়াদ জামিন হওয়ায় আবদুল্লাহ্ তখনকার মত মুক্তি পান। যেহেতু মদীনার কর্মকর্তা আবদুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদ আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাসানের জন্য জামিন হয়েছিলেন তাই মানসূরের মনে তার সম্পর্কেও ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়। তিনি রাজধানীতে ফিরে এসে মুহাম্মদ ইব্ন খালিদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ কাসীরকে মদীনার কর্মকর্তা নিয়োগ করে পাঠান এবং যিয়াদ ও তার বন্ধু-বান্ধবকে রাজধানীতে ডেকে পাঠিয়ে বন্দী করে রাখেন। মুহাম্মদ ইব্ন খালিদ মদীনার কর্মকর্তা নিযুক্ত হয়ে মুহাম্মদ মাহ্দীকে খুঁজে বের করার সর্বাত্মক চেষ্টা চালান। শুধু এ কাজের জন্যই তিনি মদীনাস্থ বায়তুল মালের সব অর্থ খরচ করে ফেলেন। মানসূর তার এই অপব্যয় ও বিফলতার জন্য তাকে পদচ্যুত করেন এবং রাবাহ্ ইব্ন উছমান ইব্ন হাইয়ানকে মদীনার কর্মকর্তা নিয়োগ করেন। রাবাহ মদীনায় পৌঁছে আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাসানকে একেবারে অতিষ্ঠ করে তুলেন। এজন্য সমগ্র মদীনায় এক মহাচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। তিনি নিম্নলিখিত আলাবীদের গ্রেফতার করে বন্দী করে রাখেন।

১. আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাসান মুসান্না ইব্ন আলী (মুহাম্মদ মাহ্দীর পিতা)।
২. ইবরাহীম ইব্ন হাসান ইব্ন মুসান্না ইব্ন হাসান ইব্ন আলী (মুহাম্মদ মাহ্দীর চাচা)।
৩. জা'ফর ইব্ন হাসান মুসান্না ইব্ন হাসান আলী (মুহাম্মদ মাহ্দীর চাচা)।
৪. সুলায়মান ইব্ন দাঊদ ইব্ন হাসান মুসান্না ইব্ন আলী (মুহাম্মদ মাহ্দীর চাচাত ভাই)।
৫. আবদুল্লাহ্ ইব্ন দাঊদ ইব্ন হাসান ইব্ন হাসান ইব্ন আলী (মুহাম্মদ মাহ্দীর চাচাত ভাই)।
৬. মুহাম্মদ ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন হাসান ইব্ন হাসান ইব্ন আলী (মুহাম্মদ মাহ্দীর চাচাত ভাই)।
৭. ইসমাঈল ইব্ন ইবরাহীম ইবন হাসান ইব্ন হাসান ইব্ন আলী (মুহাম্মদ মাহ্দীর চাচাত ভাই)।
৮. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন হাসান ইব্ন আলী (মুহাম্মদ মাহ্দীর চাচাত ভাই)।
৯. আব্বাস ইব্ন হাসান ইব্ন হাসান ইব্ন আলী (মুহাম্মদ মাহ্দীর চাচা)।
১০. মূসা ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাসান ইব্ন হাসান ইব্ন আলী (মুহাম্মদ মাহ্দীর আপন চাচা)
১১. আলী ইব্ন হাসান ইব্ন হাসান ইব্ন আলী (মুহাম্মদ মাহ্দীর চাচা)।

এই সকল ব্যক্তিকে গ্রেফতার করার সংবাদ মানসূরের কাছে পাঠানো হলে তিনি লিখেন, এদের সাথে মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্ন উসমান ইব্ন আফ্‌ফানকেও বন্দী কর। কেননা সে এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাসান আলীর একই মা অর্থাৎ ফাতিমা বিন্ত হুসাইনের সন্তান। রাবাহ্ মানসূরের এ নির্দেশও পালন করেন। ঐ সময়েই মিসরের গভর্নর আলী ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাসান ইব্ন হাসান ইব্ন আলী, মুহাম্মদ মাহ্দীর পুত্রকে গ্রেফতার করে মানসূরের কাছে পাঠান এবং তিনি তাঁকে বন্দী করে রাখেন। আলী ইব্ন মুহাম্মদ তাঁর পিতার পক্ষ থেকে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে মিসরে গিয়েছিলেন।

বাগদাদ নগরীর নির্মাণ এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা

সাফ্‌ফাহ্ আন্‌বারে আপন রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। কিছুদিন পর আনবার সংলগ্ন একটি জায়গায় নিজের প্রাসাদ এবং রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের বাসস্থানও নির্মাণ করেছিলেন। ফলে সেখানে একটি ক্ষুদ্র বসতি গড়ে ওঠে এবং তার নাম রাখা হয় হাশিমিয়া। মানসূর হাশিমিয়ায়ই ছিলেন এমন সময় খুরাসানে দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি হয়। ১৪০ হিজরী (৭৫৭-৫৮ খ্রি.) কিংবা ১৪১ হিজরী (৭৫৮-৫৯ খ্রি.)-তে মানসূর নিজের একটি পৃথক রাজধানী প্রতিষ্ঠা করতে চান এবং এ উদ্দেশ্যে বাগদাদ শহরের ভিত্তি স্থাপন করেন। বাগদাদ নগরী নির্মাণের কাজ নয়-দশ বছর পর্যন্ত চলে এবং ১৪৯ হিজরীতে (৭৬৬ খ্রি) তা সমাপ্ত হয়। সেদিন থেকে বনূ আব্বাসের রাজধানী বাগদাদে স্থানান্তরিত হয়। এই সময়ে উলামায়ে ইসলাম দীনী জ্ঞানের চর্চা এবং তা প্রণয়ন ও সংকলনের কাজ শুরু করেন।

মক্কায় ইব্ন জুরায়জ, মদীনায় মালিক, সিরিয়ায় আওযাঈ, বসরায় হাম্মাদ ইব্ন সালমা প্রমুখ, ইয়ামানে মা'মার এবং কূফায় সুফিয়ান সাওরী হাদীস গ্রন্থ প্রণয়নের কাজ শুরু করেন। ইব্ন ইস্‌হাক 'মাগাযী' (যুদ্ধ-সংক্রান্ত ইতিহাস) এবং আবূ হানীফা 'ফিকাহ্' (ইসলামী আইন শাস্ত্র)-এর উপর গ্রন্থাদি রচনা করেন। ইতিপূর্বে শুধু মুখে মুখে এসব বিষয়ের চর্চা হতো। গ্রন্থনা ও রচনার এই ধারা ক্রমশ উন্নতি লাভ করতে থাকে। এরপর বাগদাদ ও রাজদরবারে গ্রন্থকারদের খুবই উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করা হয়। হাদীস গ্রন্থাদি প্রণয়ন এবং স্মৃতিশক্তির বোঝা কাগজ ও লেখনীর উপর উঠিয়ে দেওয়ার এটাই ছিল উপযুক্ত সময় এবং সব চাইতে জরুরী মুহূর্ত। তবে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করার জায়গা এটা নয়।

আলাবী নেতৃবৃন্দকে হত্যা

রাবাহ যে সমস্ত সম্মানিত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছিলেন তাঁরা ১৪৪ হিজরীর (৬৬১-৬২ খ্রি) শেষ দিন পর্যন্ত মদীনায় বন্দী অবস্থায়ই কাটান। মানসূর সব সময়ই মুহাম্মদ মাহ্দী এবং তাঁর ভাই ইবরাহীমকে অনুসন্ধান করতে থাকেন। এই সময়ে ঐ দুই ভাই হিজাযের বিভিন্ন গোত্রের জনবসতিতে এবং অখ্যাত স্থানসমূহে আত্মগোপন করে থাকেন। তাঁরা ঘন ঘন তাদের ঠিকানা পরিবর্তন করতেন। মোটকথা, এই সময়ে হযরত হাসান ইব্ন আলীর সন্তানদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি ছিলেন না, যাঁকে বন্দী করা হয়নি বা যিনি নিজের প্রাণ রক্ষার জন্য দেশের কোথাও না কোথাও আত্মগোপন করে থাকেন নি। ১৪৪ হিজরীর যিলহজ্জ (৭৬২ খ্রি. মার্চ)

মাসে মানসূর হজ্জ করতে যান। তিনি তখন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইমরান ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন তালহা এবং মালিক ইব্‌ন আনাসকে হাসানের সন্তানদের কয়েদখানায় পাঠান। তারা তাদেরকে গিয়ে বলেন, তোমরা মুহাম্মদ ও ইবরাহীমকে আমাদের হাতে সমর্পণ কর। তাঁদের পিতা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাসান মুসান্না ইব্‌ন হাসান বলেন, আমি তো ওদের দু'জনের কোন খবরই জানি না। তোমরা বরং আমাকে স্বয়ং মানসূরের সাথে সাক্ষাত করার অনুমতি দাও। কিন্তু মানসূর বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি তাঁর দুই পুত্রকে হাযির না করবেন ততক্ষণ আমি তাঁর সাথে সাক্ষাত করব না। মানসূর হজ্জ করে যখন ইরাকের দিকে আসছিলেন তখন রাবাহ্‌কে নির্দেশ দেন, এই কয়েদীদেরকে আমার কাছে ইরাকে পাঠিয়ে দাও। রাবাহ্ তাঁদের সকলকে কয়েদখানা থেকে বের করে হাতে, গলায় ও পায়ে শিকল পরিয়ে, শিবিকা ছাড়াই উটের উপর চড়িয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে ইরাকে প্রেরণ করেন। পথিমধ্যে মুহাম্মদ ও ইবরাহীম উভয় ভাই বেদুঈন বেশে তাঁদের পিতা আবদুল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাত করেন এবং তাঁর কাছে বিদ্রোহ ঘোষণার অনুমতি চান। কিন্তু আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাসান তাঁদেরকে তাড়াহুড়া না করে ধৈর্য ধারণ করার উপদেশ দেন। ঐ কয়েদীরা মানসূরের কাছে পৌঁছলে তিনি মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন উছমানকে তাঁর সামনে ডেকে নিয়ে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন এবং তাঁর পিঠে দেড়শ বেত্রাঘাত করেন। মানসূর, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন উছমানের শত্রু ছিলেন এ জন্য যে, সিরিয়াবাসীরা তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী ছিল এবং সেখানে তাঁর বেশ প্রভাবও ছিল।

এই কয়েদীদেরকে ইরাকে স্থানান্তরিত করার পর মুহাম্মদ মাহ্‌দী আপন ভাই ইবরাহীমকে ইরাক ও খুরাসানের দিকে প্রেরণ করেন এবং নির্দেশ দেন, তুমি সেখানে গিয়ে জনসাধারণকে দাওয়াত দাও এবং তাদেরকে আব্বাসীদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোল। মুহাম্মদ মাহ্‌দী হিজাযেই থাকেন। মানসূরের যখন এই বিশ্বাস হলো যে, মুহাম্মদ মাহ্‌দী হিজাযেই রয়েছেন তখন তিনি তাঁকে প্রতারিত করা, সর্বোপরি তাঁর ঠিকানা বের করার উদ্দেশ্যে যে সব কৌশল অবলম্বন করেছিলেন তার মধ্যে একটি ছিল এই যে, তিনি বিভিন্ন শহরের লোকের পক্ষ থেকে মুহাম্মদ মাহ্‌দীর নামে লিখিত পত্রাদি মক্কা-মদীনার ঐ সমস্ত লোকের কাছে অনবরত পাঠাবার ব্যবস্থা করেন, যাদের সম্পর্কে সন্দেহ ছিল যে, তারা মুহাম্মদ মাহ্‌দীর অনুরাগী এবং তাঁর অবস্থাদি সম্পর্কেও খোঁজ-খবর রাখেন। ঐ সমস্ত পত্রে জনসাধারণের পক্ষ থেকে মুহাম্মদ মাহ্‌দীর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হতো, মানসূরের নিন্দা করা হতো এবং তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য সকলকে উদ্বুদ্ধ করা হতো। মানসূরের উদ্দেশ্য ছিল, এভাবে কোন গুপ্তচর হয়ত মাহ্‌দী পর্যন্ত পৌঁছাতে এবং তাঁকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হবে। কিন্তু মানসূরের এই উদ্দেশ্য সফল হয়নি। তবে একটি কাজ অবশ্যই হয়েছিল যে, মুহাম্মদ মাহ্‌দী তাঁর বন্ধুদের মাধ্যমে উপরোক্ত পত্রাদির কথা জানতে পারেন এবং ঐ সমস্ত পত্রাদি তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী ও ভক্তরাই লিখেছে বলে কিছুটা বিভ্রান্তির মধ্যে পতিত হন। অর্থাৎ তিনি তাঁর দলের ক্ষমতা বাস্তবের চাইতে বেশি বলেই অনুমান করেন। অপর দিকে তাঁর ভাই ইবরাহীম বসরা, কিরমান, ইসফাহান, খুরাসান, মাওসিল, সিরিয়া প্রভৃতি অঞ্চল সফর করে এখানে সেখানে অনেক 'দাঈ' ও সহযোগী নিয়োগ করেন এবং মানসূরের রাজধানীতে এসে একবার খোদ মানসূরের দস্তরখানে বসে পানাহারও করে যান, অথচ মানসূর ঘুণাক্ষরেও তা জানতে পারেন নি। দ্বিতীয়বার যখন মানসূর

বাগদাদের নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করতে আসেন তখনও তিনি মানসূরের লোকদের সাথে মিলেমিশে সেখানেই অবস্থান করছিলেন। গুপ্তচররা মানসূরকে অবহিত করে যে, ইবরাহীম বাগদাদেই রয়েছেন। কিন্তু এবারও মানসূর তাঁকে গ্রেফতার করতে পারেননি। অনুরূপভাবে রাবাহ্ হিজাযে অনেক অনুসন্ধান চালিয়েও মুহাম্মদ মাহ্দীকে বের করতে পারেন নি। শেষ পর্যন্ত হিজরী ১৪৫ সনে (৭৬২ খ্রি) খুরাসানের কর্মকর্তা আবূ আওন মানসূরের কাছে লিখিতভাবে জানান যে, খুরাসানে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে গোপন ষড়যন্ত্র চলছে এবং সমগ্র খুরাসানবাসী মুহাম্মদ মাহ্দীর বিদ্রোহ ঘোষণার অপেক্ষা করছে। মানসূর এই পত্র পাঠমাত্র মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্ন উছমানকে কয়েদখানা থেকে ডেকে এনে জল্লাদের হাতে সমর্পণ করেন এবং তাঁর দেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করে তা খুরাসানে পাঠিয়ে দেন। ঐ মস্তকের সাথে এমন কিছু লোককেও পাঠানো হয়, যারা খুরাসানে গিয়ে কসম খেয়ে সাক্ষ্য প্রদান করে যে, এই মস্তক মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্র এবং তার দাদীর নাম ছিল ফাতিমা বিন্ত রাসূলুল্লাহ্। এভাবে খুরাসানবাসীকে ধোঁকা দেওয়া হলো যে, মুহাম্মদ মাহ্দী নিহত হয়েছেন। এরপর মানসূর মুহাম্মদ ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন হাসান, আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাসান ইব্ন হাসান ইব্ন আলী, আলী ইব্ন হাসান ইব্ন হাসান ইব্ন আলী, ইবরাহীম ইব্ন হাসান ইব্ন আলী, আব্বাস ইব্ন হাসান ইব্ন আলী প্রমুখের উপর বিভিন্নভাবে অমানুষিক নির্যাতন চালান। যার ফলে তাঁরা একে একে দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। মানসূরের এই বর্বরতা ও পাষাণ হৃদয়তা যে কোন মানুষকে বিস্মিত ও শোকাহত না করে পারে না। বনূ উমাইয়ারা আলাবীদের শত্রু ছিল এবং আব্বাসীরা তখন পর্যন্ত আলাবীদের সাথে মিলেমিশে জীবন যাপন করছিল এবং সব ব্যাপারেই তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। আলাবীদের সাথে বনূ উমাইয়ার আত্মীয়তার কোন নিকট-সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু আব্বাসীরা ছিল আলাবীদের অত্যন্ত নিকট-আত্মীয়। আলাবীরা বনূ উমাইয়াদের প্রবল বিরোধিতা করে এবং বার বার তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। কিন্তু বনূ আব্বাসের বিরুদ্ধে তাঁরা তখন পর্যন্ত কোন লড়াই-ঝগড়া করেনি। এসব কথা মনে রেখে চিন্তা করলে দেখা যাবে, বনূ ইমাইয়া কোন আলাবীকে শুধু সন্দেহের বশবর্তী হয়ে গ্রেফতার করে হত্যা করেনি। তাদের হাতে যে সমস্ত আলাবী নিহত হয়েছে তারা যুদ্ধক্ষেত্রে লড়তে লড়তেই নিহত হয়েছে। কিন্তু মানসূর একেবারে নিরপরাধ ও নিষ্পাপ হাসান সন্তানদেরকে কত নির্দয়ভাবেই না হত্যা করেছেন। মানসূর কর্তৃক আলাবী নেতৃবৃন্দের এই হত্যাকাণ্ড, অপরাধের দিক দিয়ে ইয়াযীদ ইব্ন মুআবিয়া কর্তৃক ইমাম হুসাইন (রা)-এর হত্যাকাণ্ডের চাইতেও জঘন্য মনে হয়। সম্ভবত এরই নাম দুনিয়া, যাকে লাভ করতে গিয়ে মানুষ অন্ধ হয়ে যায় এবং এ ধরনের পাশবিক ও জঘন্য কাজে লিপ্ত হয়।

মুহাম্মদ মাহ্দী 'নাফসে যাকিয়্যার বিদ্রোহ ঘোষণা

মানসূর যখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাসান এবং হাসান পরিবারের অন্যান্য সদস্যকে হত্যা করেন তখন ইমাম মাহ্দী আর বেশি দিন অপেক্ষা করা সমীচীন মনে করেন নি। কিভাবে যেন তাঁর অন্তরে এ বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল যে, জনসাধারণ তাঁদেরকে সমর্থন দান এবং মানসূরের 'বায়আতে খিলাফত' প্রত্যাহার করার জন্য সর্বত্রই উদগ্রীব হয়ে আছে। তিনি তাঁর মদীনার

বন্ধুদের সাথে বিদ্রোহ ঘোষণার ব্যাপারে পরামর্শ করেন। ঘটনাচক্রে মদীনার শাসনকর্তা রাবাহ্ গুপ্তচরদের মাধ্যমে জানতে পারেন যে, মুহাম্মদ মাহদী আজই বিদ্রোহ ঘোষণা করবেন। তিনি তখন জা'ফর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন হুসাইন, হুসাইন ইব্‌ন আলী ইব্‌ন হুসাইন এবং আরো কয়েক কুরায়শী নেতাকে ডেকে পাঠিয়ে বলেন, যদি মুহাম্মদ মাহ্‌দী বিদ্রোহ করেন তাহলে আমি তোমাদের হত্যা করব। তখনও এসব কথা হচ্ছিল, এমন সময় তাকবীরের আওয়াজ শোনা গেল এবং জানা গেল যে, মুহাম্মদ মাহদী বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। প্রথমে তাঁর সাথে মাত্র দেড়শ লোক ছিল। তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করে সর্বপ্রথম কয়েদখানার দিকে যান এবং সেখান থেকে মুহাম্মদ ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ কাসরী, তাঁর ভাতিজা এবং অন্যান্য বন্দীকে মুক্ত করে দেন। এরপর সরকারী প্রাসাদ ঘেরাও করে রাবাহ্, তার ভাতিজা আব্বাস এবং ইব্‌ন মুসলিম ইব্‌ন উকবাকে বন্দী করেন। এরপর মসজিদে এসে একটি ভাষণ দেন। তাতে তিনি মানসূরের বদস্বভাব, বদ-আচরণ এবং অত্যাচারমূলক কার্যকলাপের বর্ণনা দেন এবং নিজে জনসাধারণের সাথে সুবিচারমূলক আচরণ করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। এরপর তিনি সকলের সাহায্য ও সমর্থন কামনা করেন। তিনি উছমান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন যুহায়রকে মদীনার প্রধান বিচারপতি, আবদুল আযীয ইব্‌ন মুত্তালিব ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ মাখযূমীকে অস্ত্রাগারের ব্যবস্থাপক এবং উছমান ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন খাত্তাবকে পুলিশ প্রধান নিয়োগ করেন। তিনি মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আযীযের কাছে একটি পয়গাম পাঠান। তাতে তিনি ধমকের সুরে বলেন; তুমি কেন ঘরের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছ ? তখন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আযীয তাঁকে সহায়তা দানের প্রতিশ্রুতি দেন। ইসমাঈল ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জা'ফর মুহাম্মদ ইব্‌ন মাহ্‌দীর হাতে বায়আত করেননি। অনুরূপভাবে আরো কয়েকজন বায়আতের ব্যাপারটি এড়িয়ে যান। মুহাম্মদ মাহ্‌দীর বিদ্রোহ ঘোষণা এবং রাবাহর বন্দী হওয়ার সংবাদ প্রায় নয়দিন পর মানসূরের কানে পৌঁছে। এতে তিনি বিচলিত হয়ে পড়েন এবং সঙ্গে সঙ্গে কূফায় এসে মুহাম্মদ মাহ্‌দীর নামে আমাননামা (নিরাপত্তা পত্র) হিসাবে একটি পত্র লিখে পাঠান। তাতে তিনি লিখেছিলেন ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْٓا اَوْتُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْيُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ط ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ—

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

"যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কার্য করে বেড়ায় তাদের শাস্তি এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক হতে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ হতে নির্বাসিত করা হবে। দুনিয়ায় এটাই তাদের লাঞ্ছনা ও পরকালে তাদের জন্য মহাশাস্তি রয়েছে (৫ ঃ ৩৩)।"

"আমি আমার ও তোমার মধ্যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে যিম্মা রেখে অঙ্গীকার করছি এবং প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, আমি তোমার, তোমার সমগ্র পরিবারের এবং তোমার অনুসারীদের জানমালের নিরাপত্তা প্রদান করব। তুমি এ যাবত যত লোককে হত্যা করেছ কিংবা অন্যের যত মাল ছিনিয়ে নিয়েছ তাও মাফ করে দেব। এই সাথে আমি তোমাকে আরো এক লক্ষ দিরহাম দান করব। এছাড়া তোমার অন্য কোন প্রয়োজন বা চাহিদা থাকলে তাও পূরণ করব। তুমি যেখানেই চাইবে সেখানেই তোমার বসবাসের ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। তোমার যারা সহযোগী রয়েছে তাদেরকে নিরাপত্তা প্রদানের পর আর কখনো পাকড়াও করা হবে না। যদি তুমি এই সমস্ত ব্যাপারে আরো নিশ্চিত হতে চাও তাহলে তোমার একজন প্রতিনিধি পাঠিয়ে আমার কাছ থেকে অঙ্গীকারপত্র লিখিয়ে নিয়ে যাও, যাতে এ ব্যাপারে আর কোন সন্দেহ না থাকে।"

মুহাম্মদ মাহ্দী উত্তরে লিখেন ঃ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

طٰسٓمّٓ — تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ — نَتْلُوْا عَلَيْكَ مِنْ نَّبَاِ مُوْسٰى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ — اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِى الْاَرْضِ وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا يَّسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ اَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْيِ نِسَآءَهُمْ ط اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ — وَنُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِى الْاَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَّنَجْعَلَهُمُ الْوٰرِثِيْنَ — وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِى الْاَرْضِ وَنُرِىَ فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَجُنُوْدَهُمَا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَحْذَرُوْنَ —

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

"ত্বা-সীন-মীম। এই আয়াতগুলো স্পষ্ট কিতাবের। আমি তোমার কাছে মূসা ও ফিরআউনের কিছু বৃত্তান্ত যথাযথভাবে বিবৃত করছি, মু'মিন সম্প্রদায়ের উদ্দেশে। ফিরআউন দেশে পরাক্রমশালী হয়েছিল এবং তথাকার অধিবাসীবৃন্দকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে ওদের একটি শ্রেণীকে সে হীনবল করেছিল, ওদের পুত্রদেরকে সে হত্যা করত এবং নারীদেরকে জীবিত রাখত। সে তো ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। আমি ইচ্ছা করলাম, সে দেশে যাদেরকে হীনবল করা হয়েছিল, তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে, তাদেরকে নেতৃত্ব দান করতে ও দেশের অধিকারী করতে; এবং তাদেরকে দেশে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করতে, আর ফিরআউন, হামান ও তাদের বাহিনীকে তা দেখিয়ে দিতে, যা ওদের নিকট তারা আশংকা করত" (২৮ ঃ ১-৬)।

"আমি তোমার জন্য সেরূপ নিরাপত্তা দান করছি, যেরূপ তুমি আমার জন্য করেছ। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, হুকুমত আমাদেরই হক (অধিকার)। তুমি আমাদের কারণে এর দাবিদার হয়েছ এবং আমাদেরই গোষ্ঠীর লোক হয়ে হুকুমত লাভের প্রয়াস পেয়েছ এবং সে জন্য সাফল্যও লাভ করেছ। আমার পিতা আলী 'ওয়াসী' (ওসীয়তপ্রাপ্ত) ও ইমাম ছিলেন। তুমি কি

করে তাঁর বেলায়েতের উত্তরাধিকারী হয়ে গেলে এমতাবস্থায় যে, তাঁর সন্তান-সন্ততি বিদ্যমান রয়েছে। তুমি এ কথাও জান যে, আমাদের মত খাঁটি বংশের ভদ্র লোকেরা হুকুমত লাভের আকাঙ্খা করেনি। আমরা মালউন ও মারদূদের (অভিশপ্তদের) সন্তান নই। বনূ হাশিমের কোন ব্যক্তি আত্মীয়তা, অগ্রগণ্যতা ও প্রকৃষ্টতার ক্ষেত্রে আমাদের সমতুল্য নয়। জাহিলিয়া যুগে আমরা ফাতিমা বিন্‌ত আমরের বংশধর ছিলাম এবং ইসলামী যুগে হচ্ছি ফাতিমা বিন্‌ত রাসূলের বংশধর। আল্লাহ্ তা'আল আমাদেরকে তোমাদের চাইতে উৎকৃষ্টতর করে সৃষ্টি করেছেন। আমাদের পিতা মুহাম্মদ (সা) হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। পরবর্তীতে আমার পিতা হচ্ছেন আলী, যিনি সবার আগে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আর রাসূলের সহধর্মিণীদের মধ্যে খাদীজাতুল কুবরা সবার আগে কিবলামুখী হয়ে নামায পড়েছেন। তার মেয়েদের মধ্যে ফাতিমা বিন্‌ত রাসূলুল্লাহ্ (সা) হচ্ছেন সমগ্র জাহানের মেয়েদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট। হাসান ও হুসাইন হচ্ছেন তাঁর দুই সন্তান, যাঁরা হবেন জান্নাতবাসীদের নেতা। হাশিমের সাথে আলীর আত্মীয়তার ভিন্ন আরেকটি লাইন রয়েছে। এদিক দিয়ে দ্বিগুণ লাইনে হাসান আবদুল মুত্তালিবের নিকটাত্মীয়। বংশ তালিকার দিক দিয়ে আমি হচ্ছি শ্রেষ্ঠতম বনূ হাশিম। আমার পিতা বনূ হাশিমের বিখ্যাত ব্যক্তিদের অন্যতম। আমার মধ্যে না কোন অনারবের মিশ্রণ রয়েছে, আর না রয়েছে কোন দাসী-বাঁদীর প্রভাব। আমি আমার ও তোমার মধ্যে আল্লাহ্‌কে সাক্ষী রেখে বলছি, যদি তুমি আমার আনুগত্য স্বীকার কর তাহলে আমি তোমাকে তোমার জান ও মালের নিরাপত্তাদান করব এবং তুমি যে কোন ধরনেরই ভুল করে থাক না কেন, তা মাফ করে দেব। তবে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত কোন শাস্তি যদি তোমার প্রাপ্য থাকে কিংবা তোমার উপর কোন মুসলমানের হক বা অঙ্গীকার থাকে তাহলে আমি সে দায়িত্ব গ্রহণ করব না। কেননা এ ব্যাপারে যেমন তোমার অজানা থাকার কথা নয় আমি অসহায়। আমি নিশ্চিতভাবে তোমার চাইতে খিলাফতের অধিকযোগ্য এবং তোমার চাইতে অধিকতর প্রতিশ্রুতি পূরণকারী। তুমি আমার পূর্বেও কিছু লোককে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দান করেছিলে। এবার আমাকে কি ধরনের নিরাপত্তা দান করছ ? এটা কি ইব্‌ন হুবায়রাকে অথবা তোমার আপন চাচা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আলীকে অথবা আবূ মুসলিমকে প্রদত্ত নিরাপত্তার অনুরূপ ?"

মানসূরের কাছে যখন এই চিঠি পৌছল তখন তিনি একেবারে অস্থির হয়ে উঠেন এবং নিম্নোক্ত চিঠি লিখে মুহাম্মদ মাহ্দীর কাছে প্রেরণ করেন ঃ

"আমি তোমার চিঠি পড়েছি। মহিলাদের সাথে আত্মীয়তা-বন্ধনের উপর তোমার গৌরব-গরিমা নির্ভরশীল। এর দ্বারা একমাত্র মূর্খ ও বাজে লোকেরাই প্রতারিত হতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলা মহিলাদেরকে চাচা, বাবা তথা পুরুষ অভিভাবকদের মত করে সৃষ্টি করেননি। আল্লাহ্ তা'আলা চাচাকে বাবার স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং আল্লাহ্‌র কিতাবে তাকে নিকটতম আত্মীয়, মায়ের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। যদি আল্লাহ্ তা'আলা মহিলাদের আত্মীয়তা-বন্ধনকে খুব একটা গুরুত্ব দিতেন তাহলে আমিনা (রাসূলুল্লাহর মা) জান্নাতে প্রবেশকারী মহিলাদের নেত্রী হতেন। আল্লাহ্ তা'আলা আপন মর্জি মুতাবিক যাকে চেয়েছেন সম্মানিত করেছেন। তুমি গর্বভরে আবূ তালিবের মা ফাতিমার উল্লেখ করেছ। কিন্তু তার অবস্থা তো এই যে, তার কোন পুত্র বা কন্যার ইসলাম্ গ্রহণের সৌভাগ্য হয়নি। যদি আল্লাহ্ তা'আলা কোন পুরুষকে

আত্মীয়তা-বন্ধনের কারণে সম্মানিত করতেন তাহলে নিশ্চয়ই আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল মুত্তালিবকেই করতেন। তিনি নিঃসন্দেহে সব দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর ধর্মের জন্য যাঁকে ইচ্ছা তাকেই মনোনীত করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন :

اِنَّكَ لاَ تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ-

"তুমি যাকে ভালোবাস ইচ্ছা করলেই তাকে সৎপথে আনতে পারবে না। তবে আল্লাহ্ই যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনয়ন করেন এবং তিনিই ভালো জানেন সৎপথ অনুসারীদেরকে" (২৮ : ৫৬)।

আর যখন আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রেরণ করেন তখন তাঁর চাচা বিদ্যমান। অতএব আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতটি নাযিল করেন :

وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ —

"তোমার নিকট-আত্মীয়দের সতর্ক করে দাও" (২৬ : ২১৪)।

"অতএব রাসূলুল্লাহ্ (সা) সবাইকে আল্লাহ্র শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করে দেন এবং 'দীনে হক'-এর দিকে আহ্বান জানান। তখন ওদের চারজনের দু'জন দীনে হক তথা খাঁটি ও সত্য ধর্ম গ্রহণ করেন। আর তাঁদের মধ্যে আমার পিতা ছিলেন অন্যতম। আর দু'জন দীনে হক গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। আর তাদের মধ্যে তোমার পিতা (আবূ তালিব) ছিলেন অন্যতম। অতএব আল্লাহ্ তা'আলা এই দুইজনের অভিভাবকত্বের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ থেকে ছিন্ন করে দিয়েছেন এবং তারাও এই দু'জনের মধ্যে মিত্রতার বা উত্তরাধিকারিত্বের কোন সম্পর্ক স্থাপন করেননি। তুমি লিখেছ, আবদুল মুত্তালিবের সাথে হাসানের দু'ধারী সম্পর্ক রয়েছে। এরপর তোমার সাথে রাসূলুল্লাহ্র দু'ধারী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর উত্তর এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হচ্ছেন পূর্ববর্তী-পরবর্তী সকলের চাইতে শ্রেষ্ঠ। হাশিম ও আবদুল মুত্তালিবের সাথে তাঁর একটা পৈতৃক সম্পর্ক ছিল মাত্র। তোমার ধারণা যে, তুমি বনূ হাশিমের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি, তোমার পিতামাতা তাদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন এবং অনারব ও দাসী-বাঁদীদের সাথে তোমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি দেখতে পাচ্ছি, তুমি নিজেকে সমগ্র বনূ হাশিম থেকে অধিকতর গর্বিত প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করছ। আক্ষেপ তোমার জন্য। একটু চিন্তা করে দেখ, কাল আল্লাহ্র দরবারে তুমি এর কি জবাব দেবে? তুমি এ ক্ষেত্রে সীমালংঘন করেছ। তুমি ঐ ব্যক্তি থেকে তোমাকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছ, যিনি সত্তাগত ও পুণ্যগতভাবে তোমার চাইতে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ ইবরাহীম ইব্ন রাসূলুল্লাহ্ (সা)। বিশেষ করে বাঁদীর সন্তান ছাড়া তোমার পিতার বংশধরদের মধ্যে কোন শ্রেষ্ঠ প্রকৃষ্ট ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যায় না। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাতের পর তোমাদের মধ্যে আলী ইব্ন হুসাইন অর্থাৎ ইমাম যায়নুল আবেদীনের চাইতে শ্রেষ্ঠ কোন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেনি। আর তিনি ছিলেন বাঁদীর সন্তান এবং নিঃসন্দেহে তোমার হাসান ইব্ন হাসানের চাইতে শ্রেষ্ঠ। এরপর তোমাদের মধ্যে মুহাম্মদ ইব্ন আলীর তুল্য কোন ব্যক্তির জন্ম হয়নি। অথচ তাঁর দাদী বাঁদী

ছিলেন এবং তোমার পিতার চাইতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁর পুত্র জা'ফর তোমার চাইতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং তাঁর দাদী একজন বাঁদীই ছিলেন। 'আমি মুহাম্মদ (সা)-এর পুত্র' তোমার এ কথা বলা ভুল। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পবিত্র গ্রন্থে ঘোষণা করেছেন ঃ

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍمِّنْ رِّجَالِكُمْ–

"মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নন।"

"তবে হ্যাঁ, তুমি হচ্ছো তাঁর মেয়ের ছেলে। আর এ সম্পর্ক নিকটাত্মীয়তার হলেও এর দ্বারা কেউ মীরাছ (পরিত্যক্ত সম্পত্তি) বা বেলায়েত (অভিভাবকত্ব)-এর অধিকারী হতে পারে না এবং ইমামতও তার জন্য বৈধ নয়। অতএব এই আত্মীয়তার মাধ্যমে তুমি কি করে তাঁর প্রকৃত উত্তরাধিকারী হতে পার? তোমার পিতা (আলী) ইমামতের আকাঙ্ক্ষী ছিলেন। তিনি দিনের বেলা ফাতিমাকে ঘর থেকে বের করেছেন, তাঁর রোগ গোপন রেখেছেন এবং রাতের বেলা তাঁকে দাফন করেছেন। কিন্তু জনসাধারণ 'শায়খায়ন' (আবূ বকর ও উমর) ছাড়া অন্য কাউকে গ্রহণ করেনি। সমগ্র মুসলমান এ সম্পর্কে একমত যে, নানা, মামা ও খালা উত্তরাধিকারী হতে পারে না। তুমি গর্ব প্রকাশ করেছ এই বলে যে, আলী সর্বাগ্রে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এর উত্তর এই যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর ওফাতের অব্যবহিত পূর্বে অন্যকে নামাযের ইমামতি করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এরপর জনসাধারণ একের পর এক ইমাম নির্বাচন করতে থাকে। কিন্তু আলীকে নির্বাচন করেনি। তিনিও হযরত উমর (রা) কর্তৃক প্রস্তাবিত ঐ ছয় ব্যক্তির মধ্যে ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত লোকেরা তাঁকে ঐ পদের জন্য যোগ্য বিবেচনা করেনি বা তাঁকে এর হকদারও মনে করেনি। আবদুর রহমান তাঁর উপর উসমানকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন এবং এ জন্য তাঁর দুর্নামও করা হয়। তালহা ও যুবায়র (রা) তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। সা'দ (রা) তাঁর বায়আত অস্বীকার করেন, এরপর মুআবিয়ার হাতেই বায়আত করেন। এরপরও তোমার পিতা খিলাফতের আশা ছাড়েননি এবং যুদ্ধে লিপ্ত হন। তখন তাঁর সঙ্গীরা তাঁর থেকে পৃথক হয়ে যায় এবং মধ্যস্থতাকারী নিয়োগের পূর্বে তাঁর ভক্তরা তাঁর যোগ্যতা সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে ওঠে। এরপর তিনি সন্তুষ্টচিত্তে দু'ব্যক্তিকে হাকিম (মধ্যস্থতাকারী) নিয়োগ করেন, কিন্তু ঐ দুই ব্যক্তিই তাঁর পদচ্যুতির ব্যাপারে একমত হন। এরপর হাসান খলীফা হন। তিনি শেষ পর্যন্ত কিছু কাপড়চোপড় ও দিরহামের বিনিময়ে মুআবিয়ার হাতে তাঁর খিলাফত বিক্রি করে ফেলেন এবং তাঁর সমর্থকদের মুআবিয়ার হাতে সমর্পণ করেন। অতএব যদি খিলাফতের মধ্যে তোমাদের কোন হক বা অধিকার থেকে থাকে তাহলে তোমরা সেটাকে বিক্রি করে ফেলেছ এবং তার মূল্য আদায় করে নিয়েছ। এরপর তোমার চাচা হুসাইন (রা) ইব্ন মারজানাহ্ (ইব্ন যিয়াদ)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। কিন্তু জনসাধারণ তোমার চাচার বিরুদ্ধে ইব্ন মারজানারই পক্ষাবলম্বন করে এবং শেষ পর্যন্ত তোমার চাচাকে হত্যা করে এবং তাঁর দেহ থেকে মস্তক ছিন্ন করে ইব্ন মারজানার হাতেই তা তুলে দেয়। এরপর তোমরা বনূ উমাইয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলে। যার কারণে তারা তোমাদেরকে পাইকারীহারে হত্যা করে, ফাঁস লাগিয়ে খেজুরের ডালে ঝুলিয়ে রাখে, আগুন দিয়ে পোড়ায় এবং দেশ ছাড়া করে। তারা ইয়াহ্ইয়া ইব্ন যায়দকে খুরাসানে হত্যা করে। সেই সাথে তোমাদের আরো অনেক পুরুষকে হত্যা করে এবং তোমাদের শিশু-

সন্তান ও মহিলাদেরকে বন্দী করে পর্দা ছাড়াই উটের পিঠে তুলে ক্রীতদাসীদের মত সিরিয়ায় প্রেরণ করে। শেষ পর্যন্ত আমরা উমাইয়াদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলাম এবং তাদের থেকে তোমাদের বদলা নিতে চাইলাম। শেষ পর্যন্ত তোমাদের রক্তের প্রতিশোধ আমরা নিয়েছি। এবং তোমাদেরকে তাদের জমি ও ধন-সম্পদের মালিক বানিয়েছি। আমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছি এবং তাদেরকে সম্মানিত করেছি। তুমি কি এ জন্য আমাদেরকে অপরাধী ঠাওরাতে চাও ? সম্ভবত তুমি প্রতারিত হয়েছ এই ভেবে যে, হামযা, আব্বাস ও জা'ফরের উপর শ্রেষ্ঠত্বের কারণে আমরা সর্বাগ্রে তোমার পিতার উল্লেখ করতাম। কিন্তু তুমি যা ভেবেছ আসল ব্যাপার তা নয়। ওরা তো দুনিয়া থেকে এমন পরিষ্কার ও নিষ্কলুষ অবস্থায় বিদায় নিয়েছেন যে, সব লোকই তাঁদের অনুগত ছিল এবং তারা এক বাক্যে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করত। কিন্তু তোমার পিতা যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হন। বনূ উমাইয়া তাঁর উপর ঠিক সেভাবে অভিশাপ বর্ষণ করত, যেভাবে ফরয নামাযসমূহে কাফিরদের উপর করা হয়। অতএব আমরা এ ক্ষেত্রে বিতর্কের সৃষ্টি করি, তাঁর ফযীলত ও গুণাবলী বর্ণনা করি, বনূ উমাইয়ার উপর চড়াও হই এবং তাদের শাস্তি প্রদান করি। তুমি এ কথা নিশ্চয়ই জান যে, হাজীদের পানি সরবরাহের দায়িত্ব পালন করার কারণে জাহিলিয়া যুগে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিলাম। আর এই শ্রেষ্ঠত্ব সব ভাইয়ের মধ্যে শুধু আব্বাসই অর্জন করেছিলেন। তোমাদের পিতা এ বিষয়টিকে কেন্দ্র করে আমাদের সাথে ঝগড়া বাধালে উমর ফারূক (রা) আমাদের পক্ষেই রায় দেন। অতএব জাহিলিয়া ও ইসলামী উভয় যুগেই আমরা পানি সরবরাহের অধিকারী ছিলাম এবং আছি। তখন খলীফা উমর ফারূক (রা) তাঁর প্রভুর কাছে পানি প্রার্থনা করার সময় আমাদেরই পিতার 'ওয়াসীলা' ধরেছিলেন এবং তাঁর প্রভু (আল্লাহ্ তা'আলা) তখন বৃষ্টিও বর্ষণ করেছিলেন। অথচ তোমার পিতাও তখন বিদ্যমান ছিলেন। কিন্তু তাঁকে 'ওয়াসীলা' ধরা হয়নি। তুমি অবশ্যই জান যে, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাত হয় তখন আবদুল মুত্তালিব বংশে আব্বাস ছাড়া রাসূলুল্লাহর উত্তরাধিকারী হওয়ার মত অন্য কোন পুরুষ জীবিত ছিলেন না। অতএব স্বাভাবিকভাবেই রাসূলুল্লাহ্র উত্তরাধিকারিত্ব তাঁর চাচার দিকে স্থানান্তরিত হয়ে গেছে এবং তাঁর বংশধরেরা খিলাফতের অধিকারী হয়ে গেছে। অতএব দুনিয়া ও আখিরাত এবং জাহিলিয়াত ও ইসলামের এমন কোন বিরাট মর্যাদা বাকি থাকেনি, যার উত্তরাধিকারিত্ব আব্বাস লাভ করেননি। যখন ইসলাম প্রচারিত হয় তখন আব্বাস, আবূ তালিব ও তার সন্তানদের অভিভাবক ছিলেন এবং দুর্ভিক্ষাবস্থায় তাদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন। যদি বদর যুদ্ধে আব্বাসকে জবরদস্তিমূলক বের করা না হতো তাহলে (খাদ্যের অভাবে) আবূ তালিব-এর সন্তান আকীল মৃত্যুর মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াতেন এবং উতবা ও শায়বার থালা তাঁদেরকে চাটতে হতো। কিন্তু আব্বাস তাঁদের খাদ্যপানীয়ের ব্যবস্থা করতে থাকেন। তিনিই তোমাদের সম্মান রক্ষা করেন এবং দাসত্ব ও গোলামি থেকে তোমাদেরকে বাঁচান। এরপর বদরযুদ্ধে 'ফিদয়া' (মুক্তিমূল্য) পরিশোধ করে আকীলকে তিনিই ছাড়িয়ে আনেন। অতএব তুমি আমাদের সামনে কিসের বড়াই কর। আমরা কুফরী যুগেও তোমাদের পরিবার-পরিজনের খোঁজ-খবর নিয়েছি, তোমাদের 'ফিদয়া' পরিশোধ করেছি। তোমাদের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মুখ রক্ষা করেছি এবং সবশেষে আমরাই আইনত শেষ নবীর উত্তরাধিকারী হয়েছি। তোমাদের উপর বনূ উমাইয়া যে অমানুষিক অত্যাচার করেছিল আমরা তার প্রতিশোধ নিয়েছি এবং যা

করতে তোমরা অপারগ ছিলে এবং যা অর্জন করা তোমাদের সাধ্যের অতীত ছিল আমরা তা করে দেখিয়েছি। আমার সালাম নিও।"

বংশ নিয়ে বড়াই করার ব্যাপারটি নিঃসন্দেহে মুহাম্মদ মাহ্দীর দিক থেকে শুরু হয়েছিল। মানসূর তার জবাব দিয়েছিলেন মাত্র। কিন্তু তিনি তার জবাবে বার বার সীমালংঘন করেছেন। মুহাম্মদ মাহ্দী হযরত আব্বাস (রা) সম্পর্কে কিছুই লিখেননি। মানসূর বিনা কারণে হযরত আলী (রা) সম্পর্কে দুর্মুখের মত অনেক কথা বলেছেন। মানসূর হযরত আলী (রা) সম্পর্কে এই মর্মেও একটি গুরুতর অপবাদ রটিয়েছেন যে, তিনি (আলী) খিলাফত লাভ করার জন্য হযরত ফাতিমাকে দিনের বেলা ঘর থেকে বের করেছিলেন। ইমাম হাসান সম্পর্কেও মানসূর অত্যন্ত মানহানিকর কথা বলেছেন। ইমাম হাসান (রা) কারো কাছে খিলাফত বিক্রি করেননি, বরং মুসলমানদের যে দু'টি দল আপোসে লড়ছিল তিনি তাদের মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতি স্থাপন করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একটি ভবিষ্যদ্বাণীকেই বাস্তবে রূপ দান করেছেন। হযরত আব্বাস (রা) অবশ্যই আবূ তালিবকে সাহায্য করেছেন এবং আকীলকেও নিজের কাছে রেখে প্রতিপালন করেছেন। কিন্তু এসব কথা মুখে আনা এবং এগুলোর মাধ্যমে অন্যের মানহানি করা নিঃসন্দেহে কোন মু'মিনের কাজ নয়। মানসূর এইসব কথা মুখে এনে নিঃসন্দেহে তাঁর হীনম্মন্যতারই পরিচয় দিয়েছেন। মুহাম্মদ মাহ্দী মদীনার ব্যবস্থাপনা শেষ করে মুহাম্মদ ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন মুআবিয়া ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জা'ফরকে মক্কার দিকে প্রেরণ করেন। তিনি কাসিম ইব্‌ন ইসহাককে ইয়ামানের এবং মূসা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌কে সিরিয়ার গভর্নর নিয়োগ করে তাদেরকে স্ব স্ব কর্মস্থলে পাঠিয়ে দেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন হাসান এবং কাসিম ইব্‌ন ইসহাক উভয়েই মদীনা থেকে এক সাথে রওয়ানা হন। মক্কার গভর্নর তাদের সাথে মুকাবিলা করে পরাজিত হন এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন হাসান মক্কায় তাঁর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন।

মানসূর উপরোক্ত চিঠি প্রেরণ করার পর মুহাম্মদ মাহ্দীর সাথে মুকাবিলা করার জন্য একটি বিরাট বাহিনীসহ ঈসা ইব্‌ন মূসাকে প্রেরণ করেন। ঈসার সাথে মুহাম্মদ ইব্‌ন সাফফাহ্, কাসীর ইব্‌ন হুসাইন আবদী এবং হুমায়দ ইব্‌ন কাহ্তাবাকেও প্রেরণ করা হয়। রওয়ানা হওয়ার সময় ঈসা ইব্‌ন মূসা এবং অন্যান্য নেতাকে বলে দেওয়া হয় ঃ যদি তোমরা মুহাম্মদ মাহ্দীর উপর জয়ী হও তাহলে তাকে নিরাপত্তা দান করবে এবং হত্যা করবে না। আর যদি তিনি আত্মগোপন করেন তাহলে মদীনাবাসীদেরকে গ্রেফতার করবে। কেননা ওরা তাঁর অবস্থাদি সম্পর্কে ভালোভাবেই অবহিত আছে। আবূ তালিব বংশের যেসব লোক তোমাদের সাথে সাক্ষাত করতে আসবে তোমরা তাদের নাম লিখে আমার কাছে পাঠিয়ে দিবে। আর যে সমস্ত লোকের সন্ধান তোমরা না পাও তাদের মাল-আসবাব বাজেয়াপ্ত করবে। ঈসা ইব্‌ন মূসা যখন 'ফায়দ' নামক স্থানে গিয়ে পৌছেন তখন সেখান থেকে চিঠি পাঠিয়ে মদীনার কয়েক ব্যক্তিকে নিজের কাছে তলব করেন। তার চিঠি পেয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব, তাঁর ভাই উমর এবং আবূ আকীল মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আকীল মদীনা থেকে ঈসার দিকে রওয়ানা হন। মুহাম্মদ মাহ্দীর কাছে যখন ঈসার আগমন সংবাদ পৌছে তখন তিনি তার উপদেষ্টাদের কাছে পরামর্শ চান, মদীনা থেকে বের হয়ে আমরা শত্রুর মুকাবিলা করব, না মদীনায় অবস্থান করেই তাদের আক্রমণ প্রতিরোধ

করব? বিষয়টি নিয়ে উপদেষ্টাদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিলে মুহাম্মদ মাহ্‌দী রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর রণকৌশল অনুসরণ করার সদিচ্ছা নিয়ে পরিখা খননের নির্দেশ দেন, যেমন রাসূলুল্লাহ (সা) আহ্‌যাব যুদ্ধে করেছিলেন। ইতিমধ্যে ঈসা ইব্‌ন মূসা 'আহ্‌ওয়ায' নামক স্থানে পৌঁছে শিবির স্থাপন করেন। মুহাম্মদ মাহ্‌দী মদীনাবাসীদেরকে বাইরে বের হয়ে প্রতিপক্ষের মুকাবিলা করতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। তাই কেউ মদীনা থেকে বের হতে পারছিল না। কিন্তু ঈসা ইব্‌ন মূসা যখন নিকটে এসে পৌঁছেন তখন তিনি মদীনা থেকে বের হওয়ার অনুমতি প্রদান করেন। মুহাম্মদ মাহ্‌দী এভাবে তার নিষেধাজ্ঞা রহিত করে মস্ত বড় ভুল করে বসেন। কেননা এই সুযোগে মদীনার বিরাট সংখ্যক লোক নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে নিজেদের পরিবার-পরিজন নিয়ে পাহাড়ের দিকে চলে যায়। ফলে মদীনার অভ্যন্তরে মুহাম্মদ মাহ্‌দীর সাথে অতি অল্প সংখ্যক লোক অবস্থান করে। আর তখনি তিনি তার ভুল বুঝতে পারেন এবং ঐ সমস্ত লোককে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন, কিন্তু তারা ফিরে আসেনি। ঈসা 'আহ্‌ওয়ায' থেকে অগ্রসর হয়ে মদীনা থেকে চার মাইল দূরত্বে অবস্থান নেন এবং একটি খণ্ড বাহিনীকে মক্কার রাস্তায় মোতায়েন করে রাখেন, যাতে পরাজিত হলে মুহাম্মদ মাহ্‌দী মক্কার দিকে পালিয়ে যেতে না পারেন। এরপর তিনি মুহাম্মদ মাহ্‌দীর কাছে পয়গাম পাঠান ঃ খলীফা মানসূর তোমাকে নিরাপত্তা প্রদান করেছেন, কিতাব ও সুন্নাহ্‌র ফায়সালার দিকে আহ্বান করেছেন এবং বিদ্রোহের পরিণাম সম্পর্কে সাবধান করে দিচ্ছেন। মুহাম্মদ মাহ্‌দী উত্তরে বলেন, আমি এমন এক ব্যক্তি যে নিহত হওয়ার ভয়ে কখনো পলায়ন করিনি। হিজরী ১৪৫ সনের ১২ই রমযান (৭৬২ খ্রি ডিসেম্বর) ঈসা ইব্‌ন মূসা আগে বেড়ে 'জায়াফ' নামক স্থানে তাঁবু স্থাপন করেন। ১৪ই রমযান তিনি একটি উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে উচ্চৈঃস্বরে বলেন, হে মদীনাবাসী! আমি তোমাদেরকে নিরাপত্তা দান করছি এই শর্তে যে, তোমরা আমার এবং মুহাম্মদ মাহ্‌দীর মাঝখান থেকে সরে যাও এবং নিরপেক্ষতা অবলম্বন কর। মদীনাবাসীরা এই আওয়ায শুনে ঈসাকে গালিগালাজ করতে থাকে। ঈসা তার তাঁবুতে ফিরে যান। তিনি পরদিন পুনরায় যুদ্ধের সংকল্প নিয়ে ঐ জায়গায় আসেন এবং আপন অধিনায়কদেরকে মদীনার চতুর্দিকে মোতায়েন করেন। মুহাম্মদ মাহ্‌দীও মুকাবিলার জন্য ময়দানে বের হন। তাঁর পতাকা উছমান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন যুবায়রের হাতে ছিল এবং তাঁর 'শিআর (যুদ্ধ ক্ষেত্রে আপন লোককে আহ্বান করার সাংকেতিক শব্দ) ছিল 'আহাদ' 'আহাদ'। মুহাম্মদ মাহ্‌দীর পক্ষ থেকে সর্বপ্রথম আবূ গালমাশ যুদ্ধক্ষেত্রে এগিয়ে যান এবং তার সাথে দ্বন্দ্ব যুদ্ধের জন্য প্রতিপক্ষকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান জানান। ঈসার পক্ষ থেকে একের পর এক বেশ কয়েকজন বীর যোদ্ধা মোকাবিলা করার জন্য এগিয়ে আসেন, কিন্তু তারা সকলেই আবূ গালমাশের কাছে পরাজিত ও নিহত হন। এরপর উভয় বাহিনীর মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ শুরু হয়। উভয় পক্ষই বিস্ময়কর বীরত্ব প্রদর্শন করে। দুই বাহিনীর অধিনায়করাও ব্যক্তিগত পর্যায়ে অতুলনীয় বীরত্ব প্রদর্শন করেন। এরপর ঈসার নির্দেশে হুমায়দ ইব্‌ন কাহতাবা পদাতিক বাহিনী নিয়ে পরিখার নিকটবর্তী প্রাচীরের দিকে এগিয়ে যান। মুহাম্মদ মাহ্‌দীর সঙ্গীরা তীর বর্ষণ করে তাদেরকে বাধা দিতে চায়। কিন্তু হুমায়দ এই অবস্থায়ও দৃঢ়তার সাথে এগিয়ে যেতে থাকেন এবং অনেক কষ্টসৃষ্টে প্রাচীর পর্যন্ত পৌঁছে তা ধসিয়ে দেন এবং পরিখাও অতিক্রম করেন। এরপর তিনি

মুহাম্মদ মাহ্দীর বাহিনীর সাথে হাতাহাতি যুদ্ধ শুরু করে দেন। এবার ঈসা সুযোগ পেয়ে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে পরিখার কয়েক জায়গা ভরাট করে রাস্তা বানিয়ে ফেলেন এবং তার অশ্বারোহীরা পরিখা অতিক্রম করে মুহাম্মদ মাহ্দীর বাহিনীর উপর হামলা চালায়। ঘোরতর যুদ্ধ শুরু হয়। মুহাম্মদ মাহ্দীর বাহিনীর লোকসংখ্যা ছিল খুবই কম। অপর দিকে হামলাকারী বাহিনীর লোকসংখ্যা ছিল তার চেয়ে কয়েকগুণ বেশি এবং তারা সকলেই অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা সুসজ্জিত ছিল। ভোর থেকে আসর পর্যন্ত অবিরাম যুদ্ধ চলতে থাকে। মুহাম্মদ মাহ্দী তাঁর সঙ্গীদেরকে এই মর্মে সাধারণ অনুমতি প্রদান করেন যে, কেউ ইচ্ছা করলে নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য যুদ্ধক্ষেত্র থেকে চলে যেতে পারবে। মুহাম্মদ মাহ্দীর সঙ্গীরা বার বার তাঁকে অনুরোধ করে এই মুহূর্তে আপনি আপনার প্রাণ বাঁচিয়ে মক্কা অথবা বসরার দিকে চলে যান। এরপর অস্ত্রশস্ত্র ও সেনাবাহিনী সংগ্রহ করে পুনরায় শত্রুবাহিনীর মুকাবিলা করুন। কিন্তু মুহাম্মদ মাহ্দী উত্তরে বলেন, যদি তোমরা নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে চাও তাহলে চলে যেতে পার। আমি দুশমনদের ভয়ে পিছপা হতে পারব না। শেষ পর্যন্ত মুহাম্মদ মাহ্দীর সাথে সর্বমোট তিনশ লোক থাকে। তখন তাঁর অন্যতম সঙ্গী ঈসা ইব্ন খাদীর সেই রেজিস্টার পুড়িয়ে ফেলেন, যাতে বায়আতকারীদের নাম লিপিবদ্ধ ছিল। এরপর তিনি কয়েদখানায় গিয়ে রাবাহ ইব্ন উছমান এবং তার ভাইদেরকে হত্যা করেন। মুহাম্মদ ইব্ন কাসরী নিজের কক্ষের দরজা বন্ধ করে ফেলায় সে যাত্রা রক্ষা পান। এই সব কাজ শেষ করে ঈসা ইব্ন খাদীর মুহাম্মদ মাহ্দীর পাশে দাঁড়িয়ে পুনরায় যুদ্ধ করতে থাকেন। এবার মুহাম্মদ মাহ্দীর সঙ্গীরা তাদের ঘোড়ার পা কেটে ফেলে, তরবারির খাপ ভেঙে ফেলে এবং মরা অথবা মরার কসম খেয়ে শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই হামলা এতই জোরদার ও ভয়ংকর ছিল যে, ঈসার বাহিনী পরাজিত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে। কিন্তু তাদের কিছু লোক কোন মতে পাহাড় ডিঙিয়ে মদীনার অভ্যন্তরে চলে আসে এবং জনৈক আব্বাসী মহিলার কাছ থেকে একটি ওড়না নিয়ে তা পতাকার ন্যায় মসজিদের মিনারে উড়িয়ে দেয়। এই অবস্থা দেখে মুহাম্মদ মাহ্দীর সঙ্গীরা হতভম্ব হয়ে যায় এই ভেবে যে, ঈসার বাহিনী মদীনা দখল করে নিয়েছে। অতএব তারা পশ্চাদপসরণ করতে থাকে। এতে ঈসার পলায়নপর সৈন্যরা সাহস ফিরে পায়। তারা নিজেদের সামলে নিয়ে পুনরায় মাহ্দী বাহিনীর মুকাবিলা করতে শুরু করে। ঈসার একটি খণ্ড বাহিনী বনূ গিফারের মহল্লার দিক থেকে মদীনায় প্রবেশ করে সেদিক থেকে মুহাম্মদ মাহ্দীর উপর হামলা করে। এই সব ব্যাপার ছিল একেবারে আকস্মিক। মুহাম্মদ মাহ্দী এটা কখনো চিন্তা করেন নি যে, বনূ গিফার শত্রুদেরকে এভাবে রাস্তা ছেড়ে দেবে। এই অবস্থা দেখে মুহাম্মদ মাহ্দী সামনে অগ্রসর হয়ে হুমায়দ ইব্ন কাহতাবাকে মুকাবিলার জন্য আহবান করেন। কিন্তু হুমায়দ তাঁর মুকাবিলায় আসেন নি। মুহাম্মদ মাহ্দীর সঙ্গীরা পুনরায় শত্রুদের উপর হামলা চালায়। ঈসা ইব্ন খাদীর অত্যন্ত বীরত্ব ও দুঃসাহসিকতার সাথে লড়ে যাচ্ছিলেন। ঈসা ইব্ন মূসা সামনে এগিয়ে এসে তাঁকে সম্বোধন করে বলেন, আমি তোমাকে নিরাপত্তা দান করছি, তুমি যুদ্ধ বন্ধ কর। কিন্তু ঈসা ইব্ন খাদীর তার কথায় মোটেই কর্ণপাত করেন নি। তিনি বরাবর লড়ে যেতে থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত আঘাতে আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। অপর দিকে মুহাম্মদ মাহ্দীকে ঈসা ইব্ন মূসার বাহিনী চতুর্দিক

থেকে ঘিরে ফেলে। তিনি অত্যন্ত বীরত্বের সাথে হামলাকারীদের মুকাবিলা করে তাদেরকে পিছু হটিয়ে দিচ্ছিলেন। মুহাম্মদ মাহ্দী তখন আপন বীরত্বের সেই অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন, যার ফলে ঈসা ইব্ন মূসার বাহিনীর কোন লোকই তাঁর সামনে টিকতে পারছিল না। শেষ পর্যন্ত জনৈক ব্যক্তি পিছন থেকে হঠাৎ এগিয়ে এসে তার কোমরে বর্শা নিক্ষেপ করে। সেই আঘাত সামলাতে গিয়ে যেই তিনি কিছুটা সামনের দিকে ঝুঁকেন অমনি হুমায়দ ইব্ন কাহ্তাবা ক্ষিপ্রতার সাথে আগে বেড়ে তাঁর বুকের উপর বর্শা নিক্ষেপ করে। সামনে ও পিছন থেকে দু'টি বর্শা এসে যখন তাঁর দেহ ভেদ করে এপার ওপার হয়ে যায় তখন তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। কাহ্তাবা সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া থেকে নেমে তাঁর দেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করে তা ঈসা ইব্ন মূসার কাছে নিয়ে আসে। এই বীরকে হত্যা করার সাথে সাথে মদীনা ঈসা ইব্ন মূসার দখলে চলে যায়। ঈসা ইব্ন মূসা মুহাম্মদ মাহ্দীর মস্তক এবং বিজয়ের সুসংবাদ মুহাম্মদ ইব্ন আবিল কিরাম ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফর এবং কাসিম ইব্ন হাসান ইব্ন যায়দ ইব্ন হাসান ইব্ন আলী ইব্ন আবূ তালিবের মাধ্যমে মানসূরের কাছে প্রেরণ করেন। এই ঘটনা ১৪৫ হিজরীর ১৫ই রমযান (৭৬২ খ্রি ডিসেম্বর) সোমবার আসর ও মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়ে ঘটে। ঈসা ইব্ন মূসা মুহাম্মদ মাহ্দীর লাশ মদীনা ও 'সানিয়াতুল বিদা'-এর মধ্যবর্তী স্থানে শূলীতে ঝুলিয়ে রাখেন। এরপর তাঁর বোন যায়নাব ঈসার অনুমতি নিয়ে তা জান্নাতুল বাকীতে দাফন করেন। এই যুদ্ধে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, এতে হাশিমী ও আলাবীরা ভাগাভাগি হয়ে গিয়েছিল। এমনও দেখা গেছে যে, পিতা একপক্ষে লড়ছেন তো পুত্র লড়ছে অন্য পক্ষে। সম্ভবত বনূ উমাইয়াদের পাইকারী হত্যা ও ধ্বংসলীলা প্রত্যক্ষ করে অনেক আলাবী দমে গিয়েছিল। যেমন আলী ইব্ন হুসাইন (যায়নুল আবিদীন) কারবালার মর্মান্তিক ঘটনায় এতটা প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলেন যে, জীবনে তিনি কখনো বনূ উমাইয়ার কোনরূপ বিরোধিতায় অংশগ্রহণ করেন নি বরং সব সময়ই তাদের অনুকূলে কথা বলতেন। অনুরূপভাবে আলাবীদের অধিকাংশ গণ্যমান্য ব্যক্তি বনূ আব্বাসের বিরোধিতাকে নিজেদের ধ্বংসের কারণ বিবেচনা করতেন। মুহাম্মদ মাহ্দীর পরাজয় ও বিফলতার জন্য তাঁর খান্দানের লোকেরাই দায়ী। কেননা তাদের অনেকেই তাঁর পক্ষাবলম্বন করেন নি এবং তাদের দেখাদেখি অন্যান্য গোত্রের অনেক লোকও তাঁর থেকে দূরে সরে থাকে। যখন মুহাম্মদ মাহ্দী মদীনায় জনসাধারণের কাছ থেকে বায়আত নেন এবং রাবাহ্ ইব্ন উছমানকে বন্দী করে নিজেদের খিলাফতের ঘোষণা দেন তখন তিনি ইসমাঈল ইব্ন আব্দুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফরকেও, যিনি একজন প্রবীণ লোক ছিলেন, বায়আত করার জন্য আহ্বান জানান। কিন্তু তিনি উত্তরে বলে পাঠান, তোমাকে তো হত্যা করা হবে; অতএব আমি কি করে তোমার হাতে বায়আত করতে পারি? ইসমাঈল ইব্ন আবদুল্লাহর এই উত্তর শুনে কোন কোন বায়আতকারীও নিজেদের বায়আত প্রত্যাহার করে নেয়। তখন হামাদাহ্ বিনত মুআবিয়া ইসমাঈল ইব্ন আবদুল্লাহর কাছে এসে বলেন, আপনার ঐ কথায় অনেক লোক মুহাম্মদ মাহ্দী থেকে পৃথক হয়ে গেছে; কিন্তু আমার ভাই এখনো তাঁর সাথে রয়েছে। আমার ভয় হচ্ছে, শেষ পর্যন্ত সেও আবার মারা পড়ে কিনা। মোটকথা, নিজের আত্মীয়-স্বজন ও পরিবারের লোকেরা পৃথক হয়ে যাওয়ার দরুন ইমাম মাহ্দী তেমন শক্তি অর্জন করতে

পারেননি। অন্যথায় ইসলামী খিলাফত পুনরায় হাসান (রা)-এর বংশে চলে আসার সম্ভাবনা ছিল। যদি মুহাম্মদ মাহ্দী ঐ সময়ে মদীনা থেকে বেরিয়ে যেতেন কিংবা বিদ্রোহ ঘোষণার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া না করতেন এবং আপন ভাই ইবরাহীমের বিদ্রোহ ঘোষণার অপেক্ষায় থেকে দুই ভাই একই সাথে বিদ্রোহ ঘোষণা করতেন তাহলে তাঁর সাফল্য ছিল অনিবার্য। এটা মানসূর এবং আব্বাসী বংশের সৌভাগ্য যে, আব্বাসী বাহিনীকে মুহাম্মদ এবং ইবরাহীমের মুকাবিলা একের পর এক করতে হয়েছিল। ফলে তাঁদের সামরিক শক্তিকে একই সময়ে দু'ভাগে বিভক্ত করতে হয়নি।

ইবরাহীম ইব্‌ন আবদুল্লাহর বিদ্রোহ

মানসূর যখন বাগদাদের নির্মাণ কাজ দেখতে আসেন তখন মুহাম্মদ মাহ্দীর ভাই ছদ্মবেশে তার সাথেই ছিলেন। পরে তিনি একইভাবে সকলের চোখে ফাঁকি দিয়ে সেখান থেকে কূফায় চলে আসেন। এরপর মানসূর তাঁকে গ্রেফতার করার জন্য প্রত্যেকটি শহরেই শত শত গুপ্তচর ছড়িয়ে দেন। মানসূর যখন জানতে পারেন যে, ইবরাহীম বসরায় অবস্থান করছেন তখন তিনি বসরার প্রত্যেকটি ঘরের জন্য এক একজন গুপ্তচর নিয়োগ করেন। প্রকৃতপক্ষে ইবরাহীম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ তখন কূফায় সুফ্য়ান ইব্‌ন হিব্বানের ঘরে অবস্থান করছিলেন। একথাও সবার জানা ছিল যে, সুফ্য়ান হচ্ছেন ইবরাহীমের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। গুপ্তচরদের ঘোরাঘুরি লক্ষ্য করে সুফ্য়ান ইবরাহীমের পরিণাম সম্পর্কে ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এ পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তিনি চমৎকার একটি ফন্দি আঁটেন। তিনি সোজা মানসূরের দরবারে গিয়ে হাযির হন এবং বলেন ঃ আপনি আমার ও আমার ভৃত্যদের জন্য তহশীলদারের চাকরি প্রদান করুন এবং আমার সাথে একদল সৈন্য দিন। ইবরাহীম যেখানে থাকুন না কেন, আমি তাঁকে গ্রেফতার করে আপনার দরবারে এনে হাযির করব। মানসূর সঙ্গে সঙ্গে তহশীলদারের নিয়োগপত্র লিখে দেন এবং একটি ক্ষুদ্র বাহিনীও সুফ্য়ানের সাথে প্রেরণ করেন। সুফ্য়ান নিজের বাড়িতে ফিরে আসেন এবং ঘরের ভিতরে গিয়ে ইবরাহীমকে নিজের ভৃত্যদের পোশাক পরান। এরপর নিজের কয়েকজন ভৃত্যসহ তাঁকে সাথে নিয়ে কূফা থেকে বসরা অভিমুখে রওয়ানা হন। মজার ব্যাপার এই যে, তখন তার সাথে ইবরাহীম প্রদত্ত ঐ বাহিনীও ছিল। যা হোক বসরায় পৌঁছে তিনি প্রত্যেক বাড়িতে দু-চারজন করে সৈন্য মোতায়েন করেন। এভাবে বাহিনীর সব লোক যখন পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল এবং শুধু সুফ্য়ান ও ইবরাহীম একসাথে রয়ে গেলেন তখন সুফ্য়ান তাঁকে আহ্ওয়াযের দিকে পাঠিয়ে দেন এবং নিজেও আত্মগোপন করে থাকেন। ঐ সময়ে বসরার আমীর ছিলেন সুফ্য়ান ইব্‌ন মুআবিয়া। তিনি যখন এই পরিস্থিতির কথা জানতে পারেন তখন সৈন্যদেরকে, যারা বিক্ষিপ্ত অবস্থায় এখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিল, একত্র করেন এবং ইবরাহীম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ও সুফ্য়ান ইব্‌ন হিব্বানকে খোঁজাখুঁজি করতে থাকেন। কিন্তু তাঁদের কারোরই পাত্তা পাননি। আহ্ওয়াযের আমীর ছিলেন মুহাম্মদ ইব্‌ন হুসাইন। ইবরাহীম আহ্ওয়াযে পৌঁছে হুসাইন ইব্‌ন হাবীবের ঘরে আশ্রয় নেন। আহওয়াযের গভর্নর গুপ্তচরদের মাধ্যমে জানতে পারেন যে, ইবরাহীম বর্তমানে আহ্ওয়াযে আছেন। অতএব তিনিও ইবরাহীমকে অনুসন্ধান করতে

থাকেন। ইবরাহীম দীর্ঘদিন পর্যন্ত হুসাইনের ঘরে লুকিয়ে থাকেন এবং এই সময়ে অনেক লোককে আপন দাওয়াতের সাথেও শরীক করে নেন। ১৪৫ হিজরীতে (৭৬২-৬৩ খ্রি.) ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন যিয়াদ ইব্‌ন হাইয়ান নাবাতী ইবরাহীমকে বসরায় ডেকে নিয়ে আসেন এবং অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে জনসাধারণকে মুহাম্মদ মাহ্‌দীর বায়আতের দিকে আহ্বান জানাতে শুরু করেন। তখন জ্ঞানীগুণী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদেরও একটি বিরাট দল ইবরাহীমের হাতে বায়আত করে। বায়আতকারীদের রেজিস্টারে চার হাজার বসরাবাসীর নাম লিপিবদ্ধ করা হয়। ঐ সময় মুহাম্মদ মাহ্‌দী মদীনায় বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং ইবরাহীমকে লিখেন, তুমি বসরায় বিদ্রোহ ঘোষণা কর। মানসূর সাবধানতা অবলম্বন করতে গিয়ে কয়েকজন অধিনায়ককে বসরায় পাঠিয়ে দেন, যাতে সেখানে বিদ্রোহের কোন আশংকা দেখা দিলে তারা সুফইয়ান ইব্‌ন মুআবিয়াকে সাহায্য করতে পারেন। যদি মুহাম্মদ মাহ্‌দীর পরামর্শ অনুযায়ী ইবরাহীম সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহ ঘোষণা করতেন তাহলে নিশ্চিতভাবেই মানসূরের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ত এবং ইবরাহীম ও মুহাম্মদ বিপুল ক্ষমতার অধিকারী হয়ে যেতেন। কিন্তু ইবরাহীম তখন বসরায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফলে বিদ্রোহ ঘোষণার ব্যাপারে তিনি ইতস্তত করতে থাকেন। মানসূর ইমাম মাহ্‌দীর মুকাবিলায় সৈন্য প্রেরণ করার পর অর্থাৎ ১৩৫ হিজরীর ১লা রমযান (৭৫৩ খ্রি. মার্চ) ইবরাহীম বসরায় বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং সুফইয়ান ইব্‌ন মুআবিয়া এবং তার সাহায্যে আগত অধিনায়কদেরকে বন্দী করেন। সুলায়মান ইব্‌ন আলীর পুত্র তথা মানসূরের চাচাত ভাই জা'ফর ও মুহাম্মদ ছয়শ সৈন্য নিয়ে বসরার বাইরে অপেক্ষা করছিলেন। ওদেরকেও মানসূরই পাঠিয়েছিলেন। এই দুই ভাই ইবরাহীমের বিদ্রোহের সংবাদ শুনতেই তাঁর উপর হামলা করে বসেন। ইবরাহীম এই ছয়শ লোকের মুকাবিলায় মাত্র পঞ্চাশ জন লোক পাঠান এবং আশ্চর্যের ব্যাপার যে, এই পঞ্চাশজনই উল্লেখিত ছয়শ জনকে পরাজিত করে একেবারে উর্ধ্বমুখে পালিয়ে যেতে বাধ্য করে। ইবরাহীম সমগ্র বসরা দখল করে জনসাধারণের কাছ থেকে বায়আত গ্রহণ করেন এবং সকলের নিরাপত্তার কথাও ঘোষণা করেন। এরপর বায়তুলমাল থেকে বিশ লক্ষ দিরহাম বের করে এনে আপন সঙ্গীদের মধ্যে মাথাপিছু পঞ্চাশ দিরহাম করে বন্টন করে দেন। এরপর মুগীরাকে একশ পদাতিক সৈন্যসহ আহ্‌ওয়াযের দিকে প্রেরণ করেন। আহ্‌ওয়াযের শাসনকর্তা মুহাম্মদ ইব্‌ন হুসাইন চার হাজার সৈন্যসহ মুকাবিলায় বের হন। কিন্তু ঐ একশ পদাতিক সৈন্য এই চার হাজার সৈন্যকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। মুগীরা আহ্‌ওয়ায দখল করে নেন। ইবরাহীম, আমর ইব্‌ন শাদ্দাদকে পারস্যের দিকে প্রেরণ করেন। সেখানকার গভর্নর ইসমাঈল ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব এবং তার ভাই আবদুস সামাদ আমর ইব্‌ন শাদ্দাদের মুকাবিলা করেন এবং তাতে পরাজিত হন। অতএব আমর ইব্‌ন শাদ্দাদ পারস্য দখল করে নেন। ইবরাহীম হারূন ইব্‌ন শাম্‌স আজলীকে ওয়াসিতের দিকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেন। হারূন মানসূরের গভর্নর হারূন ইব্‌ন হুমায়দকে পরাজিত করে ওয়াসিত দখল করে নেন। মোটকথা যেদিন মদীনায় মুহাম্মদ মাহ্‌দী এবং ঈসা ইব্‌ন মূসার বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং মুহাম্মদ মাহ্‌দী শহীদ হন সেদিন পর্যন্ত বসরা, পারস্য, ওয়াসিত এবং ইরাকের এক বিরাট অংশ মানসূরের কবজা থেকে বের হয়ে গেছে। সিরিয়াও তাঁর কবজা থেকে বের হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। কূফাবাসীরাও ইবরাহীমের অপেক্ষায় ছিল।

এমতাবস্থায় মানসূরের হুকুমত টিকে থাকার মত অবস্থায় ছিল না। ইবরাহীম ১লা রমযান বসরায় বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং শেষ রমযান পর্যন্ত তাঁর জয়জয়কার অবস্থা অব্যাহত থাকে। রমযান শেষ হতেই ইবরাহীমের কাছে খবর আসে যে, মুহাম্মদ মাহ্দী নিহত হয়েছেন। ইবরাহীম ঈদুল ফিতরের নামায আদায় করে ঈদের মাঠে এই সংবাদ ঘোষণা করেন। সংবাদটি ঐ সমস্ত ব্যক্তির কাছে গিয়েও পৌঁছে, যারা বিভিন্ন অঞ্চলে মানসূরের শাসনকর্তাদেরকে পরাজিত ও বিতাড়িত করার কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। এই সংবাদ পৌঁছার সাথে সাথে মানসূরের অধিনায়ক ও শাসনকর্তাদের মধ্যে এক নতুন ভীতির সঞ্চার হয়। বসরাবাসী এই সংবাদ পেয়ে মুহাম্মদ মাহ্দীর স্থলে ইবরাহীমকে, যিনি তাঁদেরই সাথে ছিলেন, খলীফা বলে স্বীকার করে নেয় এবং পূর্বের চাইতে অধিক উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে তাঁর পক্ষে কাজ করতে থাকে। বসরায় ইবরাহীমের সাথে অনেক কূফাবাসী ছিল। বসরাবাসীদের এই অভিমত ছিল যে, বসরাকেই রাজধানী ঘোষণা করে এখান থেকে বিভিন্ন দিকে সেনাবাহিনী প্রেরণের ব্যবস্থা করা হোক। কিন্তু কূফীরা এতে দ্বিমত পোষণ করে। তাদের অভিমত ছিল, সেনাবাহিনী সঙ্গে নিয়ে খোদ ইবরাহীমের কূফা আক্রমণ করা উচিত। কেননা কূফাবাসীরা তাঁর পথ চেয়ে বসে আছে। ইবরাহীম কূফীদের সাথে একমত হন এবং আপন পুত্র হাসানকে বসরায় নিজের স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করে কূফার দিকে রওয়ানা হওয়ার সংকল্প নেন। কূফায় মানসূরের কাছে এই সংবাদ পৌঁছলে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন এবং সঙ্গে সঙ্গে ঈসা ইব্ন মূসাকে একজন দ্রুতগামী দূত মারফত বলে পাঠান ঃ তুমি যত শীঘ্র সম্ভব কূফায় চলে আস। সেই সাথে তিনি খুরাসানে মাহ্দীর কাছে লিখে পাঠান ঃ তুমি অবিলম্বে পারস্য আক্রমণ কর। অনুরূপভাবে যে সমস্ত কর্মকর্তা কোন দিক দিয়েই কোনরূপ আশংকার মধ্যে ছিলেন না তাদেরকেও সেনাবাহিনীসহ কূফায় আসার নির্দেশ দেওয়া হয়। আর যে সমস্ত কর্মকর্তার ধারে কাছে ইবরাহীমের কোন অধিনায়ক ছিলেন তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়, যেন তারা সাহসিকতার সাথে তাঁর মুকাবিলা করেন। যা হোক সব দিক থেকেই অত্যন্ত দ্রুততার সাথে সৈন্যরা মানসূরের নিকট আসতে থাকে এবং দেখতে দেখতে প্রায় এক লক্ষ সৈন্য কূফায় এসে সমবেত হয়। ইবরাহীমের হামলার খবর শুনে মানসূর পঞ্চাশ দিন পর্যন্ত নিজের পরিধেয় বস্ত্র বদল করেন নি। তখন বেশির ভাগ সময়ই তিনি জায়নামাযে বসে থাকতেন। এদিকে ইবরাহীম ইব্ন আবদুল্লাহ্ এক লক্ষ সৈন্য নিয়ে রওয়ানা হন এবং কূফা থেকে ত্রিশ-চল্লিশ মাইল দূরে একটি জায়গায় এসে তাঁবু খাটান। অপর দিকে ঈসা ইব্ন মূসা আপন সঙ্গীদের নিয়ে কূফায় এসে উপনীত হন। মানসূর তাকে ইবরাহীমের মুকাবিলায় প্রেরণ করেন এবং হুমায়দ ইব্ন কাহ্তাবাকে 'মুকাদ্দিমাতুল জায়শ' (অগ্রবর্তী বাহিনী)-এর অধিনায়ক নিয়োগ করেন। ইবরাহীমকে পরামর্শ দেওয়া হয়, যেন তিনি তাঁর ছাউনির আশেপাশে পরিখা খনন করেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গীরা বলে, আমরা বিজিত নই; বরং বিজয়ী। অতএব পরিখা খননের কোন প্রয়োজন নেই। তারা ইবরাহীমকে পরামর্শ দেয়, শত্রুর মুকাবিলায় খণ্ড খণ্ড বাহিনী পাঠানো উচিত, যাতে একটি বাহিনী পরাজিত হলে অপর একটি সজীব বাহিনীকে তাদের সাহায্যার্থে পাঠানো সম্ভব হয়। কিন্তু ইবরাহীম তাদের এই পরামর্শ অগ্রাহ্য করেন এবং ইসলামী রীতি অনুযায়ী সকলকে সারিবদ্ধ হয়ে শত্রুর মুকাবিলা করার নির্দেশ দেন। যুদ্ধ শুরু হয়। হামীদ ইব্ন কাহতাবা পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন। ঈসা শপথ করে তাকে ফিরিয়ে

রাখতে চান, কিন্তু তিনি বিরত হন নি। ঈসাও তার বাহিনী নিয়ে যুদ্ধে ব্যাপৃত হন। তবে তার বেশিরভাগ লোক টিকতে না পেরে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে। ঈসা তখন পর্যন্ত শত্রুর মুকাবিলা করে যাচ্ছিলেন, যদিও তার পরাজয়ের আলামত ফুটে উঠেছিল— ঠিক সেই মুহূর্তে সুলায়মান ইব্‌ন আলীর দুই পুত্র জা'ফর ও মুহাম্মদ একটি বাহিনী নিয়ে সেখানে এসে পৌঁছে এবং ইবরাহীমের বাহিনীর ঠিক পিছন দিক দিয়ে হামলা চালায়। ইবরাহীমের বাহিনী এই আকস্মিক হামলায় ঘাবড়ে গিয়ে ঐ পশ্চাৎবর্তী বাহিনীর দিকেই মুখ ঘুরিয়ে নেন। এবার ঈসা তার বাহিনীকে সামলে নিয়ে শত্রুর উপর জোর হামলা চালান। এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করে তার বাহিনীর যে সমস্ত লোক ইতিমধ্যে পালিয়ে যাচ্ছিল তারাও ফিরে আসে। হুমায়দ ইব্‌ন কাহ্‌তাবাও তার সঙ্গীদের নিয়ে নব উদ্যমে হামলা চালান। ফলে ইবরাহীমের বাহিনী চতুর্দিক থেকে শত্রু বেষ্টিত হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় তাঁর অনেক সৈন্য ভালোভাবে শত্রুর মুকাবিলা করার সুযোগও পায়নি। শেষ পর্যন্ত তারা ছিন্নভিন্ন অবস্থায় শত্রু বেষ্টনী থেকে বের হয়ে পালাতে শুরু করে। ফলে ইবরাহীমের সাথে শুধু চারশ সৈন্য অবশিষ্ট থাকে। কিন্তু তাদেরকে ঈসা, হুমায়দ, মুহাম্মদ, জা'ফর এই চারজন অধিনায়ক চারদিক থেকে ঘিরে ধরে। শেষ পর্যন্ত ইবরাহীমের গলায় একটি তীর বিদ্ধ হয়, যার আঘাত ছিল খুবই গুরুতর। সঙ্গীরা তাঁকে ঘোড়া থেকে নামায় এবং সারিবদ্ধভাবে তাঁকে বেষ্টন করে দাঁড়ায়। এই অবস্থায়ই তারা শত্রুরও মুকাবিলা করতে থাকে। হুমায়দ ইব্‌ন কাহ্‌তাবা তার বাহিনীকে জোর হামলা চালানোর নির্দেশ দেন। ইবরাহীমের সঙ্গীরা পরাজিত ও পর্যুদস্ত হয়। এরপর হুমায়দ ইবরাহীমের দেহ থেকে তাঁর মস্তক ছিন্ন করে ঈসাকে উপহার দেন। ঈসা সঙ্গে সঙ্গে তা মানসূরের কাছে পাঠিয়ে দেন। এটা ১৪৫ হিজরীর ২৫শে যিলকাদার (৭৬৩ খ্রি. এর ফেব্রুয়ারী) ঘটনা। এরপর ঈসা হাসান ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন আবদুল্লাহকে বসরা থেকে বন্দী করেন। সেই সাথে ইয়াকূব ইব্‌ন দাউদকেও বন্দী করা হয়।

বিভিন্ন ঘটনা

মুহাম্মদ মাহ্‌দী এবং তাঁর ভাইকে হত্যা করার পর মানসূর সালিম ইব্‌ন কুতায়বা বাহিলীকে বসরার গভর্নর নিয়োগ করেন। আর মাওসিলের গভর্নর নিয়োগ করেন আপন পুত্র জা'ফরকে। তবে হারস ইব্‌ন আবদুল্লাহর হাতে মাওসিলের সেনাবাহিনীর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

মদীনায় ইমাম মালিক (র) মুহাম্মদ মাহ্‌দীর হাতে বায়আত করার জন্য জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। তাই তাঁকে বেত্রাঘাত করা হয়। ইরাকে ইমাম আবু হানীফা (র) ইবরাহীম ইব্‌ন আবদুল্লাহর পক্ষে ফতওয়া দিয়েছিলেন। তাই মানসূর তাঁকে গ্রেফতার করে নির্মীয়মাণ বাগদাদ শহরে নিয়ে যান এবং সেখানে বন্দী করে রাখেন। বন্দী অবস্থায় শাস্তি স্বরূপ তাঁকে দিয়ে নির্মীয়মাণ দালানসমূহের ইট গণনার কাজ করানো হতো। একটি বর্ণনায় আছে, মানসূর ইমাম আবূ হানীফাকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সেই পদ গ্রহণে অস্বীকৃত হলে তাঁর উপর ইট গণনার কাজ ন্যস্ত করা হয়। ১৫০ হিজরীতে (৭৬৭ খ্রি) এই বন্দী অবস্থায়ই ইমাম আবু হানীফা (র) ইন্তিকাল করেন। এদের

ছাড়াও ইব্‌ন আজলান, আবদুল হামীদ ইব্‌ন জা'ফর প্রমুখ উলামা মুহাম্মদ মাহ্‌দী ও তাঁর ভাই ইবরাহীমের বায়আতের পক্ষে ফতওয়া দিয়েছিলেন। তাই তাঁদেরকেও বিভিন্ন ধরনের শাস্তি প্রদান করা হয়।

১৪৬ হিজরীতে (৭৬৩-৬৪ খ্রি.) খাযার এলাকায় তুর্কীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তারা 'বাবুল আবওয়াব' থেকে আর্মেনিয়া পর্যন্ত সমগ্র এলাকায় মুসলমানদের উপর হত্যাকাণ্ড ও লুটপাট চালায়। ঐ বছর মুসলমানরা সাইপ্রাস দ্বীপের উপর নৌ-হামলা চালায়। সীসতান এলাকায় খারিজীরা গণ্ডগোল আরম্ভ করলে মানসূর মাআন ইব্‌ন যায়েদাকে ইয়ামানের গভর্নর পদ থেকে বদলী করে সীসতানের গভর্নর নিয়োগ করেন। মাআন সেখানে পৌঁছে সব রকম বিদ্রোহ ও গণ্ডগোল দমন করেন। তিনি হিজরী ১৫১ সন (৭৬৮ খ্রি.) পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন। শেষ পর্যন্ত খারিজীরা ধোঁকা দিয়ে তাকে হত্যা করে।

আবদুল্লাহ্ আশতার ইব্‌ন মুহাম্মদ মাহ্‌দী

মুহাম্মদ মাহ্‌দীর বিদ্রোহকালে মানসূরের পক্ষ থেকে সিন্ধুর গভর্নর ছিলেন উমর ইব্‌ন হাফ্‌স ইব্‌ন উছমান ইব্‌ন কাবীসাহ্ ইব্‌ন আবূ সুফরাহ্ ওরফে 'হাযার মর্দ'। মুহাম্মদ মাহ্‌দী বিদ্রোহ ঘোষণা করে আপন পুত্র আবদুল্লাহ্ ওরফে আশতারকে তাঁর চাচা ইবরাহীমের কাছে বসরায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সেখানে পৌঁছে আবদুল্লাহ্ আশতার একটি দ্রুতগামী উষ্ট্রী নিয়ে সিন্ধুর উদ্দেশে রওয়ানা হন। কেননা সিন্ধুর হাকিম উমর ইব্‌ন হাফসের কাছ থেকে তার সাহায্য-সহানুভূতি পাবার আশা ছিল। আবদুল্লাহ্ আশতার সিন্ধুতে পৌঁছে উমর ইব্‌ন হাফ্‌সকে দাওয়াত দিলে তিনি মুহাম্মদ মাহ্‌দীর খিলাফত স্বীকার করে নেন। আব্বাসীদের পোশাক ও ইউনিফর্ম ছিঁড়ে ফেলেন এবং খুতবায় আব্বাসী খলীফার জায়গায় মুহাম্মদ মাহ্‌দীর নাম উল্লেখ করতে থাকেন। ঐ সময় উমর ইব্‌ন হাফ্‌সের কাছে মুহাম্মদ মাহ্‌দীর নিহত হওয়ার সংবাদ পৌঁছে। তিনি আবদুল্লাহ্ আশতারকে এই দুর্ঘটনার সংবাদ দেন এবং তার প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। আবদুল্লাহ্ আশতার তখন বলেন, 'আমার তো প্রাণের আশংকা দেখা দিয়েছে। এখন আমি কোথায় যাব বা কি করব? তখন সিন্ধুর অবস্থা এরূপ ছিল যে, খলীফা উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র)-এর যুগে সেখানকার অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজা ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং তখন থেকে তারা নিজেরাই নিজেদের রাজ্য শাসন করে আসছিল। তবে তারা বর্তমান খলীফার আধিপত্য স্বীকার করত এবং যাবতীয় ইসলামী নিয়ম-কানুনও মেনে চলত। উমর ইব্‌ন হাফ্‌স আবদুল্লাহ্ আশতারকে পরামর্শ দেন ঃ তুমি সিন্ধুর অমুক রাজার রাজ্যে চলে যাও। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নামে উৎসর্গীকৃত প্রাণ। অঙ্গীকার পালনের ক্ষেত্রেও তাঁর খুব সুনাম আছে। আমার বিশ্বাস, তিনি তোমার সাথে অত্যন্ত সম্মানজনক ও ভদ্রোচিত ব্যবহার করবেন। আবদুল্লাহ্ আশতার তাতে সম্মত হন। এরপর উমর ইব্‌ন হাফ্‌স ঐ রাজার সাথে পত্রালাপ করে তার কাছ থেকে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আশতার সম্পর্কিত একটি অঙ্গীকারনামা লিখিয়ে আনেন। এরপর আবদুল্লাহকে তার কাছে পাঠিয়ে দেন। সিন্ধুর ঐ রাজা আবদুল্লাহ্ আশতারের কাছে আপন মেয়ের বিবাহ দেন এবং হিজরী ১৫১ সন (৭৬৮ খ্রি.) পর্যন্ত

আবদুল্লাহ্ আশতার সেখানেই অবস্থান করেন। ঐ সময়ে প্রায় চারশ আরব, দেশের বিভিন্ন এলাকা ও বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আবদুল্লাহ্ আশতারকে খুঁজতে খুঁজতে সেখানে গিয়ে পৌঁছে। ঘটনাচক্রে মানসূর জানতে পারেন যে, আবদুল্লাহ্ আশতার সিন্ধুর জনৈক রাজার কাছে অবস্থান করছেন এবং কিছু আরব তাঁর সাথে রয়েছে। ১৫১ হিজরীতে (৭৬৮ খ্রি.) তিনি উমর ইব্ন হাফ্সকে সিন্ধুর গভর্নর পদ থেকে মিসরের গভর্নর পদে বদলী করেন এবং হিশাম ইব্ন আমর তাগলিবীকে সিন্ধুর গভর্নর পদে নিয়োগ করে সেখানে পাঠিয়ে দেন। হিশাম সিন্ধু অভিমুখে রওয়ানা হওয়ার সময় মানসূর তাকে কড়া নির্দেশ দেন, তুমি সেখানে পৌঁছে যেভাবে পারো আবদুল্লাহ্ আশতারকে গ্রেফতার করবে। যদি সিন্ধুর রাজা তাঁকে তোমার হাতে সমর্পণ করতে অস্বীকার করে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তুমি তাকে আক্রমণ করবে। হিশাম অনেক বুঝানো সত্ত্বেও সিন্ধুর রাজা আবদুল্লাহ্ আশতারকে তার হাতে সমর্পণ করতে অস্বীকার করেন। শেষ পর্যন্ত উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধপ্রস্তুতি চলতে থাকে। আবদুল্লাহ্ আশতার রাজ্যের যে অংশে অবস্থান করছিলেন হিশাম ইব্ন আমরের ভাই সাফীহ্ সে দিকেই সৈন্য সমাবেশ ঘটান। একদিন আবদুল্লাহ্ আশতার শুধু দশজন অশ্বারোহী সঙ্গে নিয়ে সিন্ধু নদের তীর ধরে ভ্রমণ করতে করতে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিলেন। ঘটনাচক্রে সাফীহ্র বাহিনীর সাথে সেখানে তাঁর সাক্ষাত ঘটে। তখন সাফীহ্ আবদুল্লাহকে গ্রেফতার করতে চাইলে আবদুল্লাহ্ ও তাঁর সঙ্গীরা সাফীহের বাহিনীর মুকাবিলা করে এবং এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর আবদুল্লাহ্ আশতার ও তাঁর সকল সঙ্গী নিহত হন। হিশাম মানসূরের কাছে সংবাদ প্রেরণ করেন। মানসূর উত্তরে লিখলেন, ঐ রাজার রাজ্যকে একেবারে শেষ করে দাও। অতএব যুদ্ধ শুরু হয় এবং হিশাম সমগ্র রাজ্যটি দখল করে নেন। আবদুল্লাহ্ আশতারের স্ত্রী আপন পুত্রসহ বন্দী হয়ে মানসূরের কাছে প্রেরিত হন। তিনি আবদুল্লাহ্ আশতারের স্ত্রী ও পুত্রকে মদীনায় তাঁর পরিবারের অন্যান্য লোকের কাছে পাঠিয়ে দেন।

মাহ্দী ইব্ন মানসূরের অলীআহ্দী (যৌবরাজ্য)

আবদুল্লাহ্ সাফ্ফাহ্ মৃত্যুকালে মানসূরকে তাঁর প্রথম অলীআহদ নিয়োগ করেছিলেন। আর মানসূরের পরবর্তী অলীআহদ নিয়োগ করেছিলেন ঈসা ইব্ন মূসাকে। ঐ ওসীয়ত অনুযায়ী মানসূরের পর ঈসার খলীফা হওয়ার কথা। মানসূর যখন মুহাম্মদ মাহ্দী ও ইবরাহীমের হুমকি থেকে স্বস্তি লাভ করেন এবং ঈসার সাহায্যের তাঁর খুব একটা প্রয়োজনও বাকি থাকেনি তখন তিনি তাঁর পরিবর্তে আপন পুত্র মাহ্দীকে অলীআহ্দ নিয়োগ করার সংকল্প নেন। প্রথমে তিনি ঈসার সাথে এ সম্পর্কে আলোচনা করেন। কিন্তু ঈসা তাতে সম্মত হননি। এবার মানসূর, খালিদ বারমাক এবং অন্যান্য অনারব সর্দার ও সভাসদদেরকে নিজের দলে ভিড়িয়ে প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে ১৪৭ হিজরীতে (৭৬৪ খ্রি.) ঈসা ইব্ন মূসাকে (যিনি সাফ্ফাহ্র যুগ থেকে কূফার গভর্নরের দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন) পদচ্যুত করে তাঁর স্থলে মুহাম্মদ ইব্ন সুলায়মানকে তথাকার গভর্নর নিয়োগ করেন। কূফার গভর্নর পদ থেকে অপসারিত হওয়ার পর ঈসার সমগ্র ক্ষমতা শূন্যে মিলিয়ে যায় এবং মানসূরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মত প্রকাশের অশুভ পরিণতি তার দৃষ্টিগোচর হতে থাকে। মোটকথা, ঈসাকে অসহায় ও

নিরুপায় করে মানসূর ধোঁকাবাজি, প্রতারণা ও কপটতার আশ্রয় নিয়ে জনসাধারণের কাছ থেকে মাহ্‌দীর জন্য অলীআহ্‌দীর বায়আত গ্রহণ করেন এবং ঈসাকে স্রেফ বাহ্যিক সান্ত্বনা দানের জন্য মাহ্‌দীর পরবর্তী অলীআহ্‌দ হিসাবে তার নাম ঘোষণা করেন। খালিদ ইব্‌ন বারমাক একথা প্রচার করে দেন যে, ঈসা আমার সামনে তার অলীআহ্‌দী পরিত্যাগের ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন। তাই আমীরুল মু'মিনীন আপন পুত্র মাহ্‌দীকে অলীআহ্‌দ নিয়োগ করেছেন। এই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য মানসূর প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। জনসাধারণের মধ্যে প্রচুর উপহার-উপঢৌকন বিতরণ করা হয়। মানসূরের হুকুমত প্রতিষ্ঠা ও সুদৃঢ়করণের ক্ষেত্রে ঈসা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনিই মুহাম্মদ, মাহ্‌দী এবং ইবরাহীমকে পরাজিত করেন এবং তাঁদেরকে হত্যা করে মানসূরকে এক মহাবিপদ থেকে রক্ষা করেন। এই অমূল্য অবদানের যে পুরস্কার (!) তিনি পান, তা উপরে উল্লিখিত হলো। গভর্নর পদ থেকে অপসারিত হওয়ার পর ঈসা কূফার অন্তর্গত রাহবা নামক পল্লীতে নীরব ও নিভৃত জীবন যাপন করতে থাকেন।

ধীরে ধীরে মানসূরের পথ থেকে যাবতীয় প্রতিবন্ধকতা দূর হয়ে যায়। শুধু স্পেন ছাড়া সমগ্র ইসলামী দেশের উপর হিজরী ১৪৮ সনের (৭৬৫ খ্রি.) মধ্যেই তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৪৯ হিজরীতে (৭৬৬ খ্রি) বাগদাদ নগরীর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়। উল্লিখিত ঘটনাসমূহের কারণে মুসলমানরা এতদিন রোমানদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার সুযোগ পায়নি। ১৪৯ হিজরীতে আব্বাস ইব্‌ন মুহাম্মদ, হাসান ইব্‌ন কাহতাবা ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আশআছ রোমানদের উপর হামলা পরিচালনা করেন এবং তাদেরকে তাড়িয়ে অনেক দূর পর্যন্ত নিয়ে যান।

উস্তাদাসীদের বিদ্রোহ ঘোষণা

১৫০ হিজরীতে (৭৬৭ খ্রি.) উস্তাদাসীস নামীয় জনৈক ব্যক্তি খুরাসানে নবুয়তের দাবি করে এবং সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার হাজার হাজার লোক তাকে নবী বলে স্বীকার করে। হিরাত, বাদগীস, সীস্তান প্রভৃতি অঞ্চলের লোকও তার পতাকাতলে সমবেত হয় এবং খুরাসানের বেশির ভাগ অংশ সে দখল করে নেয়। এই সংবাদ শুনে মানসূর অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েন। প্রথমে মার্বরূদের হাকিম জাসাম তার সম্পূর্ণ বাহিনী নিয়ে উস্তাদাসীসের উপর হামলা চালান, কিন্তু নিজেই পরাজিত ও নিহত হন। এরপর খাযিম ইব্‌ন খুযায়মা সামরিক কূটকৌশলের আশ্রয় নিয়ে উস্তাদাসীসের বাহিনীর উপর একই সাথে দু'দিক থেকে হামলা চালান। এতে উস্তাদাসীসের সত্তর হাজার সঙ্গী যুদ্ধক্ষেত্রেই নিহত হয়। বাকি চৌদ্দ হাজার সঙ্গী উস্তাদাসীসসহ একটি পাহাড়ের মধ্যে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। দীর্ঘদিন এই অবরোধ চলার পর উস্তাদাসীস তার সকল সঙ্গীকে নিয়ে খাযিমের কাছে আত্মসমর্পণ করে। খাযিম এ সম্পর্কে মানসূরকে অবহিত করেন।

রুসাফা নির্মাণ

উস্তাদাসীসের বিদ্রোহকালে মাহ্‌দী ছিলেন খুরাসানের গভর্নর। তিনি মার্ভে থাকতেন। খাযিম ইব্‌ন খুযায়মা তাঁর কাছেই ছিলেন এবং মানসূরের নির্দেশ অনুযায়ী তিনিই উস্তাদাসীসের

উপর আক্রমণ পরিচালনা করেছিলেন। এই বিদ্রোহ দমনের পর মাহ্দী মানসূরের খিদমতে হাযির হন। তখন পর্যন্ত সেনাবাহিনীর বেশির ভাগ লোক আরব-গোত্রেরই ছিল এবং তাদেরই বীরত্ব ও সমর নৈপুণ্যের কারণে সবক'টি বিজয়ই অর্জিত হয়েছিল। অনারব এবং খুরাসানীরা নিজেদেরকে আরবদের সমতুল্য মনে করত না। তাই আরবগোত্রগুলো সম্পর্কে আব্বাসীদের সব সময়ই এই আশংকা থাকত যে, যদি তারা বিরোধিতার উপর ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায় তাহলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাদের (আব্বাসীদের) হুকুমতকে ওলট-পালট করে দেবে। এ বিষয়টি অনুধাবন করেই ইমাম ইবরাহীম অনারবদেরকে শক্তিশালী করা এবং তাদের কাছ থেকে রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম আদায় করার পলিসি বেশ আগেভাগেই গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর উত্তরসূরিরাও এই কর্মধারা বহাল রাখে। তাই দেখা যায়, আবদুল্লাহ্ সাফ্ফাহ্ আবূ সালামাকে হত্যা করে বল্খের 'নওবাহার' অগ্নিকুণ্ডের অগ্নি পূজারীর সন্তান এবং আবূ মুসলিমের সামরিক অধিনায়ক নওমুসলিম খালিদ বারমাককে নিজের মন্ত্রী নিয়োগ করেন। কিছুদিন পর খালিদ বারমাককে কোন একটি রাজ্যের শাসনকর্তা নিয়োগ করা হয় এবং তার স্থলে আবূ আইয়ূব মন্ত্রী হন। মানসূর পুনরায় খালিদ বারমাককে মন্ত্রীত্ব দান করেন। তখন সামরিক অধিনায়ক এবং প্রাদেশিক গভর্নর পদেও অগ্নিপূজারী বংশোদ্ভূত অনেক লোককে নিয়োগ করা হয়। ফলে ধীরে ধীরে ওদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিন্তু তখন পর্যন্ত আরব বংশোদ্ভুত লোকদেরই প্রাধান্য ছিল। প্রসঙ্গক্রমে এখানে বাদশাহ আকবর কর্তৃক গৃহীত হিন্দুস্থানের একটি রাষ্ট্রীয় নীতির উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনিও হিন্দুস্থানের শক্তিশালী পাঠানজাতির পাঞ্জা থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য এবং তাদের দিক থেকে হস্তক্ষেপের যে আশংকা ছিল তা স্থায়িভাবে দূর করার উদ্দেশ্যে জরুরী ভিত্তিতে মৃতপ্রায় হিন্দু জাতিকে পুনরায় জীবিত ও শক্তিশালী করে তোলার পরিকল্পনা নেন। তিনি হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানসিংহকে হিন্দুস্থানের প্রধান সেনাপতি নিয়োগ করেন এবং পাঠানদেরকে সর্বক্ষেত্রে দুর্বল ও নির্জীব করে রাখার প্রচেষ্টা চালান। আব্বাসীরাও আরবদের শক্তি খর্ব করে তাদের জায়গায় মাজূসী ও ইরানী বংশোদ্ভূত লোকদের শক্তিশালী করে তোলার পরিকল্পনা নেন, যাতে আরব বংশোদ্ভূত কোন গোত্র বা গোত্রসমূহের সাহায্য নিয়ে কোন আলাবী বিদ্রোহ সংঘটিত করতে না পারে। মাহ্দী খুরাসান থেকে ফিরে এসে যখন মানসূরের খিদমতে হাযির হন, ঠিক সেই মুহূর্তে সৈন্যরা মানসূরের কাছে উপহার চাইতে গিয়ে যে বাড়াবাড়িমূলক আচরণ করে তাতে তাদের স্বাধীনতা ও বেপরোয়া মনোবৃত্তি যেভাবে প্রকাশ পায়, তা কোন রাষ্ট্রপ্রধান কখনো সহজভাবে মেনে নিতে পারেন না। ঐ সৈন্যদের সকলেই ছিল আরব-বংশোদ্ভূত। তারা অগ্নি উপাসকদের মত বাদশাহ্ বা খলীফাকে প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্মান বা ভক্তি প্রদর্শনে অভ্যস্ত ছিল না। তাদের এই মানসিকতা বা চরিত্র বৈশিষ্ট্য আব্বাসীদের সব সময় শংকিত করে রাখত।

যাহোক আরব সৈন্যদের এই অবস্থা লক্ষ্য করে কাসাম ইব্ন আব্বাস ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে আরবের প্রধান দুই গোত্র রাবীআ ও মুদারের মধ্যে পরস্পর শত্রুতার সৃষ্টি করেন এবং মানসূরকে পরামর্শ দেন; যেহেতু মুদার ও রাবীআর মধ্যে শত্রুতার সৃষ্টি হয়েছে তাই এখন সমগ্র সেনাবাহিনীকে দু'ভাগে বিভক্ত করা মুদার গোত্রের সৈন্যদেরকে মাহ্দীর অধীনে রাখাই সমীচীন। কেননা খুরাসানবাসীরা মুদার গোত্রের প্রতি

সহানুভূতিশীল। আর রাবীআ গোত্রের সৈন্যদেরকে আপনার অধীনে রাখুন। কেননা সমগ্র ইয়ামানীরা তাদের শুভাকাঙ্ক্ষী। এভাবে দেশের দু'টি প্রান্তে সামরিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। আর তখন যেহেতু তারা একে অন্যকে ভয় করবে, তাই দেশে কোন প্রকার বিদ্রোহ সফল হতে পারবে না। মানসূর এই অভিমতকে যথার্থ বিবেচনা করে আপনপুত্র মাহ্দীর অবস্থানের জন্য ১৫১ হিজরীতে (৭৬৮ খ্রি.) বাগদাদের পূর্ব দিকে রাসাফা শহর নির্মাণের নির্দেশ দেন। ঐ বছরই অর্থাৎ ১৫১ হিজরীতে (৭৬৮ খ্রি.) মুহাম্মদ আশআছ রোম (এশিয়া মাইনর) থেকে প্রত্যাবর্তনকালে পথিমধ্যে ইনতিকাল করেন।

১৫৩ হিজরীতে (৭৭০ খ্রি.) মানসূর একটি অভিনব নির্দেশ জারি করেন। তা হলো, এখন থেকে আমার সব প্রজা বাঁশ ও পাতার তৈরি লম্বা টুপি পরিধান করবে। এই টুপি তখনকার যুগে একমাত্র হাবশীরাই পরিধান করত। ১৫৪ হিজরীতে (৭৭১ খ্রি.) যুফার ইব্ন আসিম বায়যান্টাইন সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন। মুসলমানদের নিত্যদিনের আক্রমণে বীতশ্রদ্ধ হয়ে ১৫৫ হিজরী সনে (৭৭২ খ্রি.) 'কায়সারে রুম' মানসূরের কাছে সন্ধি প্রস্তাব পেশ করেন এবং তাঁকে জিযয়া প্রদানে সম্মত হন।

মানসূরের মৃত্যু

১৫৮ হিজরীতে (৭৭৫ খ্রি.) মানসূর মক্কার শাসনকর্তাকে লিখেন ঃ তুমি সুফ্য়ান ছাওরী আব্বাদ ইব্ন কাসীরকে বন্দী করে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। জনসাধারণ আশংকা করেছিল, মানসূর হয়ত এ দু'জনকে হত্যা করবেন। হজ্জের দিন ঘনিয়ে আসছিল। এ বছর খোদ মানসূরও হজ্জ পালনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এতে মক্কাবাসীরা আরো বিচলিত হয়ে পড়ে এই ভেবে যে, মানসূর এখানে এসে না জানি আর কত লোককে বন্দী অথবা হত্যা করেন। কিন্তু মক্কাবাসীদের অন্তরের এই আহাজারী আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে কবূল হয়ে যায়। তাই মানসূর মক্কা পর্যন্ত পৌছার আগেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, মানসূর ১৫৮ হিজরীর যিলকদ মাসে (৭৭৪ খ্রি. সেপ্টেম্বর) হজ্জের উদ্দেশ্যে বাগদাদ থেকে রওয়ানা হন। বাগদাদ থেকে বিদায় গ্রহণকালে তিনি আপনপুত্র মাহ্দীকে সেখানে নিজের স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করেন এবং তাঁকে ওসীয়ত করতে গিয়ে বলেন ঃ

"যে ছোট সিন্দুকের মধ্যে আমার নোটবুকগুলো রয়েছে সেই সিন্দুকের খুব যত্ন নেবে এবং প্রয়োজনকালে নিজের সমস্যাদি সমাধানের উপায় ঐ নোটগুলোতেই তালাশ করবে। বাগদাদ নগরীর খুব হিফাযত করবে এবং আমার পরে কখনো রাজধানী অন্য কোন জায়গায় স্থানান্তরিত করবে না। আমি ইতিমধ্যে যে অর্থ ভাণ্ডার সংগ্রহ করেছি, দশ বছর পর্যন্ত যদি খারাজ হিসাবে একটি পয়সাও কোষাগারে না আসে তবু সৈন্যদের বেতন-ভাতা এবং রাষ্ট্রের অন্যান্য ব্যয় নির্বাহের জন্য তা তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। তুমি তোমার গোত্রের লোকদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে, তাদের সম্মান বৃদ্ধি করবে এবং তাদেরকে বড় বড় রাষ্ট্রীয় পদে অধিষ্ঠিত করবে। তুমি অবশ্যই খুরাসানীদের সাথে সদয় ব্যবহার করবে। কেননা এক কথায় এরা হচ্ছে তোমার বাহুশক্তি। এরা তোমার বংশের হুকুমত প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেদের জানমাল সবকিছু লুটিয়ে দিয়েছে। আমার বিশ্বাস, খুরাসানীদের অন্তর থেকে তোমাদের ভালোবাসা কখনো মুছে

যাবে না। তাদের ভুলত্রুটি ক্ষমা করবে এবং কৃতিত্বপূর্ণ কাজের বিনিময়ে তাদেরকে পুরস্কৃত ও সম্মানিত করবে। সাবধান! বনূ সালামার কোন লোকের কাছে কখনো কোন সাহায্য চাইবে না। রাষ্ট্রীয় কাজে মহিলাদেরকে কখনো হস্তক্ষেপ করার সুযোগ দেবে না। উম্মতে রাসূলের হিফাযত করবে। অযথা রক্তপাত করবে না। আল্লাহ্-নির্ধারিত সীমারেখা মেনে চলবে, বিধর্মীদের উপর আক্রমণ চালাবে, বিদআতসমূহ নির্মূল করবে, মধ্যপন্থা পরিত্যাগ করবে না এবং গনীমতের মাল সৈন্যদের মধ্যে বণ্টন করে দেবে। কেননা আমি তোমার জন্য কোষাগারে যথেষ্ট ধন-সম্পদ রেখে যাচ্ছি। সীমান্তের পরিপূর্ণ হিফাযত করবে, রাস্তাঘাটের নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করবে, জনসাধারণের ধন-সম্পদের হিফাযত করবে, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনমতকে উপেক্ষা করবে না, অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী যে পরিমাণ সম্ভব তৈরি রাখবে, আজকের কাজ আগামীকালের জন্য তুলে রাখবে না, যখন বিভিন্নমুখী বিপদ আসে তখন স্থির ও অবিচল থাকবে। আলস্য পরিহার করবে। মানুষ যাতে সহজে তোমার সাথে দেখা করতে পারে সে রকম পরিবেশ বজায় রাখবে এবং প্রহরীদের প্রতি সতর্ক থাকবে, যেন তারা জনসাধারণের সাথে কোনরূপ দুর্ব্যবহার না করে।"

মানসূর বাগদাদ থেকে রওয়ানা হয়ে কূফায় আসেন, হজ্জ ও উমরার জন্য ইহরাম বাঁধেন এবং কুরবানীর জন্তুসমূহ পূর্বাহ্নেই মক্কায় পাঠিয়ে দেন। কূফা থেকে দুই মানযিল অতিক্রম না করতেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থাবস্থায় তিনি তাঁর মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস রাবী' (যে তার দ্বাররক্ষী ও দেহরক্ষী ছিল)-কে বেশির ভাগ সময় নিজের কাছে রাখতেন। ১৫৮ হিজরীর ৬ই যিলহজ্জ (৭৭৫ খ্রি. অক্টোবর) যখন তিনি মক্কা থেকে তিন-চার মাইল দূরবর্তী 'বাতন' নামক স্থানে পৌঁছেন ঠিক তখনই মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুর মুহূর্তে বিশেষ খাদিমবৃন্দ এবং 'রাবী' ছাড়া অন্য কেউ তাঁর পাশে ছিল না। 'রাবী' ঐ দিন মানসূরের মৃত্যু সংবাদ গোপন রাখেন। পরদিন ঈসা ইব্ন আলী, ঈসা ইব্ন মূসা ইব্ন মুহাম্মদ (দ্বিতীয় অলীআহদ), আব্বাস ইব্ন মুহাম্মদ, মুহাম্মদ ইব্ন সুলায়মান, ইবরাহীম ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, কাসিম ইব্ন মানসূর, হাসান ইব্ন যায়দ আলাবী, মূসা ইব্ন মাহ্দী ইব্ন মানসূর, আলী ইব্ন ঈসা ইব্ন হাসান প্রমুখকে, যারা ঐ সফরে মানসূরের সাথে ছিলেন, দরবারে ডেকে পাঠানো হয়। রাবী' তখন খলীফার মৃত্যু সম্পর্কে সকলকে অবহিত করেন এবং মানসূরের লেখা একটি লিপিও তাদেরকে পড়ে শুনান। তাতে মানসূর লিখেছিলেন ঃ

"দয়ালু, পরম করুণাময় আল্লাহ্র নামে। এই লিপিটি আবদুল্লাহ্ মানসূরের পক্ষ থেকে বনূ হাশিমের উত্তরসূরি খুরাসানবাসী এবং সাধারণ মুসলমানদের উদ্দেশে লিখিত। পর সমাচার এই যে, আমি এই লিপিটি আমার জীবনের তথা দুনিয়ার শেষ দিনে এবং আখিরাতের প্রথম দিনে লিখছি। আমি তোমাদের জন্য আমার সালাম পেশ করছি এবং আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে নিবেদন করছি, তিনি যেন তোমাদেরকে ফিতনার মধ্যে না ফেলেন, আমার পরে তোমাদেরকে যেন বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত না করেন এবং তোমাদেরকে যেন গৃহযুদ্ধের স্বাদ আস্বাদন না করান। তোমরা আমার পুত্র মাহ্দীর আনুগত্যের যে স্বীকৃতি দিয়েছ তার উপর অটল থাকবে এবং কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করবে না।"

রাবী' এই কাগজ পড়ে শুনিয়ে মূসা ইব্‌ন মাহ্‌দী ইব্‌ন মানসূরের প্রতি ইংগিত করেন, যেন তিনি আপন পিতা মাহ্‌দীর পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্বমূলক বায়আত গ্রহণ করেন। রাবী' সর্বপ্রথম হাসান ইব্‌ন যায়দের হাত ধরে বলেন, উঠুন, বায়আত করুন। হাসান ইব্‌ন যায়দ বায়আত করেন। এরপর একের পর এক সকলেই বায়আত করেন। কিন্তু ঈসা ইব্‌ন মূসা বায়আত করতে অস্বীকার করেন। একথা শুনে আলী ইব্‌ন ঈসা ইব্‌ন হাসান বলেন, যদি তুমি বায়আত না কর তাহলে এই তরবারির আঘাতে তোমার গর্দান উড়িয়ে দেব। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে ঈসা ইব্‌ন মূসাও বায়আত করেন। এরপর বাহিনীর অধিনায়কবৃন্দ এবং সাধারণ লোকেরাও বায়আত করে। এরপর আব্বাস ইব্‌ন মুহাম্মদ এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন সুলায়মান মক্কায় যান এবং রুকন ও মাকামের মধ্যবর্তীস্থানে জনসাধারণের কাছ থেকে মাহ্‌দীর খিলাফতের বায়আত গ্রহণ করেন। এরপর ঈসা ইব্‌ন মূসা জানাযার নামায পড়ান। এরপর হাজূন ও বি'-রে মায়মূনের মধ্যবর্তী মাকবারা-ই মুআল্লাত'-এ মানসূরের লাশ দাফন করা হয়। এরপর রাবী মানসূরের মৃত্যু সংবাদ এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চাদর, লাঠি ও খতমে খিলাফত (খিলাফতের মোহর) মাহ্‌দীর কাছে প্রেরণ করেন। ১৫৮ হিজরীর ১৫ই যিলহজ্জ (৭৭৫ খ্রি. অক্টোবর) এই সংবাদ মাহ্‌দীর কাছে বাগদাদে গিয়ে পৌঁছে। বাগদাদবাসীরাও দরবারে খিলাফতে হাযির হয়ে মাহ্‌দীর হাতে বায়আত করে। মানসূর এক সপ্তাহ কম ২২ বছর খিলাফত পরিচালনা করেন। মৃত্যুকালে তিনি সাতপুত্র ও এক কন্যা রেখে যান। তাঁর পুত্রদের নাম হলো– মুহাম্মদ মাহ্‌দী, জা'ফর আকবর, জা'ফর আসগর, সুলায়মান, ঈসা, ইয়াকূব ও সালিম। তাঁর কন্যার নাম ছিল আলিয়া। ইসহাক ইব্‌ন সুলায়মান ইব্‌ন আলীর সাথে তাঁর বিবাহ হয়।

খলীফা মানসূরকে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করে, আপনার কি এমন কোন আকাঙ্ক্ষা আছে যা এখনো পূর্ণ হয়নি ? মানসূর উত্তর দেন, হ্যাঁ, শুধু একটি আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রয়ে গেছে। তা হলো, আমি কিছুটা উঁচু একটি জায়গায় বসব, আর হাদীসবেত্তারা বসবে আমার চারপাশে। পরদিন যখন মন্ত্রীবর্গ বিভিন্ন কাগজপত্র, ফাইল নথি ও দোয়াত-কলম নিয়ে তাঁর খিদমতে হাযির হয় তখন গতকালকের ঐ প্রশ্নকারী সভাসদও সেখানে উপস্থিত ছিল। সে বলে উঠল, তাহলে এবার আপনার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হলো। মানসূর উত্তরে বলেন, আমি যাঁদের আকাঙ্ক্ষা করি, এরা সেই লোক নন। আমার কাঙ্ক্ষিত লোকদের পোশাক হয় জীর্ণ পুরাতন, পা হয় খালি, চুল হয় উস্কখুস্ক এবং তাঁরা সর্বদা হাদীস চর্চায় ব্যাপৃত থাকেন।

মানসূর ইমাম মালিককে মুওয়াত্তা সংকলনে উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি তাঁকে সম্বোধন করে বলেন, "হে আবূ আবদুল্লাহ! তুমি জান যে, এখন তোমার ও আমার চাইতে শরীয়তের অধিক জ্ঞান রাখে এমন কোন ব্যক্তি আর বেঁচে নেই। আমি তো খিলাফত ও সালতানাতের ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছি। কিন্তু তোমার অবসর আছে। অতএব তুমি মানুষের জন্য এমন একটি গ্রন্থ রচনা কর যার দ্বারা তারা উপকৃত হয়। তাতে ইব্‌ন আব্বাসের (উদার) বৈধতা এবং ইব্‌ন উমরের কাঠিন্য ও (সীমাহীন) সতর্কতাকে স্থান দিও না। এভাবে তুমি মানুষের জন্য গ্রন্থনা ও সংকলনের একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন কর।" ইমাম মালিক বলেন, আল্লাহর কসম! এগুলো শুধু কথার কথা ছিল না, বরং এর দ্বারা মানসূর আমার সামনে গ্রন্থনার একটি সুন্দর রেখাচিত্র তুলে ধরেছিলেন।

আবদুস সামাদ ইব্ন মুহাম্মদ একদা মানসূরকে বলেন, আপনি শাস্তি প্রদানের ব্যাপারে এমন কঠোর যে, আপনি মাফ করতে জানেন একথা কেউ আর বিশ্বাস করতে চায় না। মানসূর উত্তরে বলেন, আলে-মারওয়ান যে রক্তবন্যা বইয়েছে তা এখনো শুকায় নি। উপরন্তু আবূ তালিবের পরিবারের তরবারিসমূহ এখনো খাপমুক্ত রয়েছে। এই যুগ এমনি যে, এখন পর্যন্ত খলীফাদের ভাবমূর্তি জনসাধারণের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আর তখন পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হবেও না, যতক্ষণ তারা ক্ষমার অর্থ ভুলে না যায় এবং শাস্তি ভোগের জন্য সব সময় তৈরি থাকে। যিয়াদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ হারিসী মানসূরের কাছে আবেদন করেন, আমার জায়গীর ও ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি করুন। তিনি তার এ আবেদনপত্রে সুন্দর ও প্রাঞ্জল ভাষার যত মারপ্যাঁচ থাকতে পারে তার সবটাই প্রয়োগ করেন। মানসূর উত্তরে লিখেন, যখন কোন ব্যক্তি সুখে থাকে এবং ভাষার মারপ্যাঁচও আত্মস্থ করে ফেলে তখন স্বাভাবিকভাবেই সে আত্মকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে। তোমার সম্পর্কে আমার মনে এই আশংকাই সৃষ্টি হয়েছে। অতএব তোমার উচিত ভাষার মারপ্যাঁচ ত্যাগ করা। আবদুর রহমান যিয়াদ আফ্রিকী ছাত্রাবস্থায় মানসূরের বন্ধু ছিলেন। মানসূরের খিলাফত আমলে তিনি একবার তাঁর সাথে দেখা করতে আসেন। মানসূর তাকে জিজ্ঞেস করেন, বনূ উমাইয়াদের মুকাবিলায় আমার খিলাফত তোমার কাছে কেমন লাগছে ? আবদুর রহমান উত্তর দেন, তোমার যুগে যেরূপ জুলুম-অত্যাচার চলছে সেরূপ জুলুম-অত্যাচার বনূ উমাইয়া যুগে ছিল না। মানসূর বলেন, কি করব, আমি তো সাহায্যকারী পাই না। আবদুর রহমান বলেন, উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র) বলেছেন, যদি বাদশাহ পুণ্যবান হয় তাহলে পুণ্যবানরা তাঁর চারপাশে এসে ভিড় জমায়, আর বাদশাহ যদি পাপী হন তাহলে তার কাছে পাপীরাই আসে। একদা এক ঝাঁক মাছি মানসূরকে বিরক্ত করে। তিনি তখন মুকাতিল ইব্ন সুলায়মানকে ডেকে পাঠান এবং বলেন, এই মাছিগুলোকে আল্লাহ্ তা'আলা কেন সৃষ্টি করেছেন ? মুকাতিল উত্তর দেন, জালিমদেরকে লাঞ্ছিত করার জন্য।

মানসূরের যুগে বিভিন্ন অনারব ভাষার গ্রন্থাদি আরবী ভাষায় অনূদিত হতে থাকে। উলকাদিজা' ও কালীলা দিমনা'-এর অনুবাদ তাঁর যুগেই সম্পন্ন হয়। মানসূরই সর্ব প্রথম জ্যোতিষীদেরকে তাঁর দরবারে সম্মান ও মর্যাদা দান করেন। তাঁর যুগেই আব্বাসী ও আলাবীদের পরস্পরের মধ্যে রক্তপাত শুরু হয়। অন্যথায় তাঁর পূর্বে আলাবী ও আব্বাসীরা পরস্পর ঐক্য বন্ধনে আবদ্ধ ছিল।

স্বভাব-চরিত্র, আচার-আচরণ এবং বিভিন্ন কৃতিত্বপূর্ণ কার্যাদি সম্পাদনের ক্ষেত্রে মানসূর আব্বাসীর সাথে আবদুল মালিক উমুবীর অনেক মিল দেখা যায়। আবদুল মালিক এবং মানসূর যথাক্রমে উমাইয়া ও আব্বাসী খান্দানের দ্বিতীয় খলীফা ছিলেন। আবদুল মালিক যেমন উমাইয়া খিলাফতকে হাবুডুবু অবস্থা থেকে রক্ষা করেছিলেন, তেমনি মুহাম্মদ ও ইবরাহীমের হাতে আব্বাসী খিলাফত ডুবতে ডুবতে শেষ পর্যন্ত মানসূরের মাধ্যমে রক্ষা পায়। আবদুল মালিক এবং মানসূর উভয়ই আলিম, ফকীহ্ ও মুহাদ্দিস ছিলেন। তাঁরা উভয়েই মিতব্যয়িতা ও কার্পণ্যের অভিযোগে অভিযুক্ত ছিলেন। উভয়ের খিলাফত-আমলও ছিল প্রায় সমান। তাদের উভয়ের মধ্যে একটি পার্থক্য শুধু এই ছিল যে, মানসূর মানুষকে নিরাপত্তা দান করার পরও হত্যা করেন এবং অঙ্গীকার ভঙ্গের অভিযোগে অভিযুক্ত হন। কিন্তু আবদুল মালিকের এ ধরনের কোন দুর্নাম ছিল না।

মাহ্দী ইব্‌ন মানসূর

মুহাম্মদ আল-মাহ্দী মানসূরের পৈতৃক নাম ছিল আবূ আবদুল্লাহ্। তিনি হিজরী ১২৬ সনে (৭৪৩ খ্রি) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মাতার নাম ছিল উম্মে মূসা আরদা বিন্‌ত মানসূর হিময়ারী। মাহ্দী অত্যন্ত দানশীল, জনপ্রিয়, প্রজাবৎসল, দৃঢ়প্রত্যয়ী ও সুন্দর চেহারার অধিকারী ছিলেন। মাহ্দীর বয়স যখন পনর বছর তখন মানসূর তাকে আবদুল জব্বার ইব্‌ন আবদুর রহমানের বিদ্রোহ দমনের জন্য ১৪১ হিজরীতে (৭৫৮ খ্রি) খুরাসানে প্রেরণ করেন। ১৪৪ হিজরীতে (৭৬১ খ্রি) তিনি খুরাসান থেকে ফিরে এলে মানসূর তাকে সাফ্‌ফাহর কন্যা তথা আপন ভাতিজীর সাথে বিবাহ দেন এবং আপন অলীআহদ (প্রথম) নিয়োগ করেন। ঐ বছরই তাঁকে খুরাসানের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের শাসনকর্তা নিয়োগ করে রায়-এ পাঠানো হয়। ১৫২ হিজরীতে (৭৬৯ খ্রি) মানসূর তাঁকে আমীরে হজ্জ মনোনীত করেন। ১৫৮ হিজরীতে (৭৭৪ খ্রি) পিতার মৃত্যুর পর তিনি বাগদাদ খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হন। বাগদাদের জনসাধারণ তাঁর হাতে বায়আত করার পর তিনি মিম্বরে দাঁড়িয়ে নিম্নোক্ত ভাষণ দেন ঃ

"তোমরা যাকে আমীরুল মু'মিনীন বল তিনি আল্লাহর একজন বান্দা মাত্র। কেউ তাঁকে আহ্বান করলে তিনি সেই আহ্বানে সাড়া দেন। আর কেউ তাঁকে কোন হুকুম করলে তিনি সেই হুকুম পালন করেন। একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই আমীরুল মু'মিনীনের রক্ষাকর্তা। মুসলমানদের খিলাফতের দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য আমি আল্লাহ্ তা'আলারই সাহায্য প্রার্থনা করছি। তোমরা মুখে যেমন আমার আনুগত্য প্রকাশ করেছ, তেমনি অন্তরেও আমাকে মান্য করবে। তাহলেই দুনিয়া আখিরাতের কল্যাণের অধিকারী হতে পারবে। যে ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে 'আদল' ও ন্যায় বিচারের কথা বলে তোমরা তার বিরোধিতা করো না। আমি তোমাদের উপর থেকে সবরকম জোর-জবরদস্তি প্রত্যাহার করে নেব এবং আমার সমগ্র জীবন তোমাদের কল্যাণ সাধনে এবং তোমাদের মধ্যে যারা অপরাধী তাদের শাস্তি বিধানে নিয়োজিত রাখব।"

মাহ্দী খলীফা হওয়ার সাথে সাথে মানসূরের কয়েদখানায় যে সমস্ত কয়েদী ছিল তাদের সকলকেই ছেড়ে দেন। ঐ সমস্ত কয়েদীকে আটকে রাখা হয়, যারা বিদ্রোহী, ডাকাত অথবা খুনী ছিল। ইয়াকূব ইব্‌ন দাঊদ ছিলেন মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েদীদের অন্যতম। আর যেসব কয়েদীকে মুক্তি দেওয়া হয়নি, হাসান ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন ছিলেন তাদের অন্যতম। হাসান এবং ইয়াকুব উভয়কে ইবরাহীম হত্যার পর বসরা থেকে বন্দী করে আনা হয়েছিল, যেমন ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। ইয়াকূবের পিতা দাঊদ ছিলেন বনূ সুলায়ম গোত্রের মুক্তদাস। তিনি খুরাসানের নাসর ইব্‌ন সাইয়ারের মীর মুন্সী ছিলেন। ইয়াকূব ও আলী হচ্ছেন দাঊদের দুই পুত্র। এরা উভয়েই অত্যন্ত বিদ্বান, জ্ঞানী, বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী ছিলেন। বনূ আব্বাসের হুকুমত যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন বনূ সুলায়মের মর্যাদা হ্রাস পায়। ফলে বনূ সুলায়মের সাথে সম্বন্ধযুক্ত ইয়াকূব ও আলীর প্রতি কেউ আর সম্মান দেখাত না অথচ যোগ্যতার দিক দিয়ে তারা সত্যিকার অর্থে সম্মান ও মর্যাদা পাওয়ার অধিকারী ছিলেন। যখন মুহাম্মদ মাহ্দী ও ইবরাহীম বনূ আব্বাসের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে দাওয়াত দিতে শুরু করেন তখন ইয়াকূব সেই দাওয়াতে শরীক হন এবং জনসাধারণের দৃষ্টি মুহাম্মদ মাহ্দী ও

ইবরাহীমের দিকে আকৃষ্ট করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত হুসায়ন ইব্‌ন ইবরাহীমের সাথে তাকে বন্দী করা হয়। কয়েদখানা থেকে মুক্তি পেয়ে ইয়াকূব জানতে পারেন যে, হাসান ইব্‌ন ইবরাহীম কয়েদখানা থেকে পালাবার চেষ্টা করেছেন। তিনি এ সম্পর্কে মাহ্‌দীকে অবহিত করেন। মাহ্‌দী সঙ্গে সঙ্গে হাসানকে অন্য কয়েদখানায় স্থানান্তর করেন। কিন্তু হাসান সেখান থেকে পালিয়ে যান। মাহদী ইয়াকূবকে ডেকে পাঠিয়ে হাসান সম্পর্কে পরামর্শ করেন। ইয়াকূব বলেন, আপনি যদি হাসানকে নিরাপত্তা দান করেন তাহলে আমি তাকে আপনার খিদমতে হাযির করতে পারি। মাহ্‌দী হাসানকে নিরাপত্তা দান করলে তিনি তাকে মাহ্‌দীর দরবারে এনে হাযির করেন এবং তাঁর কাছ থেকে এই অনুমতিও আদায় করেন যে, হাসান মাঝেমধ্যে খলীফার দরবারে আসা-যাওয়া করতে পারবে। অতএব হাসান তাঁর দরবারে আসা-যাওয়া করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত এমন একদিন আসে, যখন মাহ্‌দী হাসানকে আপন দীনী ভাই বলে ঘোষণা করেন এবং সেই সাথে তাঁকে এক লক্ষ দিরহামও দান করেন। কিছুদিন পর মাহ্‌দী আবূ আবদুল্লাহকে পদচ্যুত করে (যিনি তার অলীআহদীর যুগ থেকে মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন) তার স্থলে ইয়াকূব ইব্‌ন দাউদকে মন্ত্রীপদে নিয়োগ করেন। ইয়াকূব ও হাসানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে মাহ্‌দী আপন ন্যায়ানুবর্তিতা ও গুণগ্রাহিতারই পরিচয় দেন। এতে তিনি তাঁর শত্রুদের অন্তর জয় করতেও সক্ষম হন। মুহাম্মদ মাহ্‌দী ও ইবরাহীমের অনুসারীবৃন্দ, যারা ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন যায়দের দলের সাথে মিশে বনূ আব্বাসকে উৎখাত করতে চাচ্ছিল, তারাই ছিল খিলাফতে আব্বাসীয়ার আশংকার সবচেয়ে বড় কারণ। মাহ্‌দী ইয়াকুবকে মন্ত্রী নিয়োগ করায় এই সব আশংকা দূর হয়ে যায়। কেননা ঐ দুই দলের লোকের সাথে ইয়াকূবের যোগাযোগ ছিল। ইয়াকূব তাদের অনেককে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় পদে নিয়োগ করে মাহ্‌দীর বিরোধিতা থেকে বিরত রাখেন। আর এভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর ধীরে ধীরে তাদের বিরোধিতার উচ্ছ্বাস-উন্মাদনাও হ্রাস পায়।

হাকীম মুকান্নার আত্মপ্রকাশ

মাহ্‌দীর খিলাফতের প্রথম বছরেই অর্থাৎ ১৫৯ হিজরীতে (৭৭৫-৭৬ খ্রি.) হাকীম মুকান্না নামীয় মার্ভের জনৈক অধিবাসী (যে সোনার একটি মুখোশ সব সময় নিজের মুখে লাগিয়ে রাখত) নিজেকে খোদা বলে দাবি করে। তার আকীদা (ধর্ম-বিশ্বাস) ছিল এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা আদমকে সৃষ্টি করে খোদ আদমের রূপ ধারণ করেন। এরপর রূপ ধারণ করেন আবূ মুসলিম ও হাশিমের। 'তানাসুখ' বা জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী মুকান্না বলত, আমার ভিতরেও খোদার আত্মা রয়েছে। অর্থাৎ আমাতেও আল্লাহ্ রূপান্তরিত হয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে তার এই আকীদা ছিল রাওয়ান্দ এলাকার সেই অধিবাসীদের আকীদারই অনুরূপ যারা মানসূরের যুগে হাশিমিয়ার অভ্যন্তরে গোলযোগের সৃষ্টি করেছিল। এরা সবাই ছিল আবূ মুসলিমের দলের লোক। আবূ মুসলিমের দাওয়াতের একটি বিস্ময়কর দিক ছিল এই যে, তিনি যে পরিবেশের লোকের সাথে মিশতেন তাদের পরিবেশ বা আকীদা-বিশ্বাসের সাথে খাপ খাইয়ে আহলে বায়তের দাওয়াতও পেশ করতেন। এভাবে বিভিন্ন পথভ্রষ্ট ফিরকা কর্তৃক আহলে বায়তের

দাওয়াত বিভিন্ন ছাঁচে ঢালাই হওয়ার কারণে সেই দাওয়াতের ফলও বিভিন্নমুখী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। হাকীম মুকান্নার একটি আকীদা এও ছিল যে, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন যায়দ নিহত হন নি, বরং আত্মগোপন করে আছেন। কোন এক সময়ে তিনি আত্মপ্রকাশ করবেন এবং শত্রুদের থেকে তার প্রতি কৃত অপরাধের বদলা নেবেন। মুকান্নার আবির্ভাবের সাথে সাথে বহু লোক তার অনুসারীতে পরিণত হয়। মুকান্না মাওরাউন নাহ্র এলাকার বাস্সাম দুর্গে অবস্থান নেয়। বুখারাবাসী, সাগাদবাসী ও তুর্কীরা আব্বাসীদের বিরুদ্ধে মুকান্নাকে সমর্থন করে। তারা তার নেতৃত্বে মুসলমানদেরকে অবাধে হত্যা করতে শুরু করে। ঐ অঞ্চলের কর্মকর্তারা (আবূ নু'মান, জুনায়দ ও লায়ছ ইব্ন নাস্র ইব্ন সাইয়ার) তার মুকাবিলা করেন। লায়ছের ভাই মুহাম্মদ এবং ভ্রাতুষ্পুত্র হাস্সান ইব্ন তামীম ঐ সংঘর্ষে নিহত হন। মাহ্দীর কাছে যখন এই সংবাদ পৌঁছে তখন তিনি জিবরাঈল ইব্ন ইয়াহ্ইয়াকে ওদের সাহায্যের জন্য প্রেরণ করেন। তিনি জিবরাঈলের ভাই ইয়াযীদকে বুখারা ও সাগাদের বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করার নির্দেশ দেন। প্রথমে বুখারা ও সাগাদবাসীদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করা হয়। চারমাস যুদ্ধ চলার পর মুসলমানরা বুখারা ও অন্যান্য অঞ্চলের দুর্গসমূহ দখল করে। সাতশ বিদ্রোহী মারা যায়। অন্যরা মুকান্নার কাছে পালিয়ে যায়। কিছুদিন পর মাহ্দী আবূ আওনকে মুকান্নার সাথে যুদ্ধ করার জন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু আবূ আওন মুকান্নাকে পরাজিত করতে না পারায় মুআয ইবন মুসলিমকে প্রেরণ করা হয়। মুআযের অগ্রবর্তী বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন সাঈদ হুরায়শী। এরপর উকবা ইব্ন মুসলিমকেও ঐ বাহিনীর সাথে যোগদানের নির্দেশ দেওয়া হয়। তারা মুকান্নার উপর এক জোরদার হামলা চালিয়ে তাকে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেন এবং বাস্সাম দুর্গ অবরোধ করেন। যুদ্ধ চলাকালীন মুআয ও সাঈদের মধ্যে কিছুটা মতপার্থক্য ও মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। তাই সাঈদ মাহ্দীর কাছে পত্র লিখে মুকান্নাকে শায়েস্তা করার দায়িত্ব তার একার হাতে তুলে নেওয়ার অনুমতি লাভ করেন। মুকান্না বত্রিশ হাজার লোকসহ অবরুদ্ধ হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত অবরুদ্ধ লোকেরা সাঈদ হুরায়শীর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করে। সাঈদ তাদের প্রার্থনা মনজুর করেন। তখন ত্রিশ হাজার লোক দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসে। স্রেফ দু'হাজার লোক মুকান্নার সাথে থেকে যায়। মুকান্নার চোখে যখন তার নিশ্চিত পরাজয়ের আলামত ফুটে ওঠে তখন সে অগ্নিকুণ্ড তৈরি করে তার মধ্যে প্রথমে নিজের সমস্ত পরিবার-পরিজনকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। এরপর নিজেও তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মুসলমানরা দুর্গে প্রবেশ করে মুকান্নার লাশ আগুন থেকে টেনে বের করে। এরপর তার দেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করে তা মাহ্দীর কাছে পাঠিয়ে দেয়।

কর্মকর্তাদের পদচ্যুতি, রদবদল ও নিয়োগ

১৫৫ হিজরীতে (৭৭১ খ্রি.) মাহ্দী আপন চাচা ইসমাঈলকে পদচ্যুত করে তাঁর স্থলে ইসহাক ইব্ন সাবাহ কিনদী আশাআসীকে কূফার গভর্নর নিয়োগ করেন। তিনি বসরার শাসনকর্তার পদ থেকে সাঈদ ও উবায়দুল্লাহ ইব্ন হাসানকে অপসারণ করে তাঁদের স্থলে আবদুল মালিক ইব্ন যুবয়ান নুখায়রীকে, কাছাম ইব্ন আব্বাসকে ইয়ামামার শাসনকর্তার পদ

থেকে অপসারণ করে তার স্থলে ফাদল ইব্ন সালিহ্‌কে, মাতার (মানসূরের মুক্তিপ্রাপ্ত দাস)-কে মিসরের শাসনকর্তার পদ থেকে অপসারণ করে তার স্থলে আবূ হামযাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন সুলায়মানকে এবং আবদুস সামাদ ইব্ন আলীকে মদীনার শাসনকর্তার পদ থেকে অপসারণ করে তার স্থলে যুফার ইব্ন আসিম বিলালীকে নিয়োগ করেন। এই বছরই তিনি মা'বাদ ইব্ন খলীলকে সিন্ধুর গভর্নর নিয়োগ করে সেখানে পাঠান। হুমায়দ ইব্ন কাহতাবা ছিলেন খুরাসানের গভর্নর। হিজরী ১৫৯ সনে (৭৭৫ খ্রি) তাঁর মৃত্যু হলে আবূ আওন আবদুল মালিক ইব্ন ইয়াযীদকে খুরাসানের গভর্নর নিয়োগ করা হয়। এই বছরের শেষের দিকে সাঈদ ইব্ন খলীলের মৃত্যু হলে তাঁর স্থলে রাওহ্ ইব্ন হাতিমকে সিন্ধুর গভর্নর নিয়োগ করা হয়।

১৬০ হিজরীতে (৭৭৬-৭৭ খ্রি.) আবূ আওন, আবদুল মালিক মাহ্দীর রোষানলে পতিত হন এবং তার স্থলে মুআয ইব্ন মুসলিমকে খুরাসানের গভর্নর নিয়োগ করা হয়। ঐ বছরই হামযা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ও জিবরাঈল ইব্ন ইয়াহ্ইয়াকে গভর্নর নিয়োগ করে যথাক্রমে সীস্তান ও সমরকন্দে প্রেরণ করা হয়। জিবরাঈল তাঁর শাসনামলে সমরকন্দের দুর্গ ও নগর প্রাচীর মেরামত করান। ঐ বছর সিন্ধুর শাসনকর্তার পদে বিসতাম ইবন আমরকে প্রেরণ করা হয়। হিজরী ১৬১ সনে (৭৭৭-৭৮ খ্রি.) মাহ্দী নাসর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আশআছকে সিন্ধুর গভর্নর নিয়োগ করেন। ঐ বছর আবদুস সামাদ ইব্ন আলীকে জাযীরার, ঈসা ইব্ন লুকমানকে মিসরের এবং বিসতাম ইব্ন আমর তাগলবীকে সিন্ধুর গভর্নরের পদ থেকে বদলী করে আযারবায়জানের গভর্নর নিয়োগ করা হয়। ঐ বছর মাহ্দী ইয়াহ্ইয়া ইব্ন খালিদ বারমাককে আপন পুত্র হারূনের আতালীক (গৃহশিক্ষক) এবং সুলায়মান ইব্ন রাজাকে মুহাম্মদ ইব্ন সুলায়মানের স্থলে মিসরের গভর্নর নিয়োগ করেন।

বারবদ অভিযান

খলীফা মাহ্দী তাঁর খিলাফতের প্রথম বছরেই হিন্দুস্থানের একটি নৌবাহিনী প্রেরণ করেন। আবদুল মালিক ইব্ন শিহাব সাময়ী' সামুদ্রিক জাহাজে আরোহণ করে একটি বাহিনী নিয়ে সিন্ধু উপকূলের দিকে রওয়ানা হন। তারা বারবদ নামক বন্দরে অবতরণ করে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এতে বহু সংখ্যক বারবদবাসী নিহত হয়। মুসলমানদের নিহত হয় মাত্র বিশজন। কিন্তু যুদ্ধের পরপরই মুসলমানদের মধ্যে মহামারী ছড়িয়ে পড়ে এবং তাতে প্রায় এক হাজার মুসলমান মারা যায়। আবদুল মালিক ইব্ন শিহাব সেখান থেকে জাহাজে আরোহণ করে পারস্য অভিমুখে রওয়ানা হন, কিন্তু উপকূলের নিকটবর্তী হতে না হতেই সামদ্রিক ঝড় ওঠে এবং তাতে বেশ কয়েকটি জাহাজ ডুবে যায়। ফলে সেখানেও বেশ কিছু মুসলমানের সলীল সমাধি ঘটে।

হাদী ইব্ন মাহ্দীকে অলীআহ্দ (যুবরাজ) নিয়োগ

ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, ঈসা ইব্ন মূসা কূফা সংলগ্ন রাহবা নামক পল্লীতে বসবাস করতেন। তিনি শুধু জুমুআ অথবা ঈদের দিন কূফায় এসে নামায পড়তেন এবং বাকি দিন উপরোক্ত পল্লীতে নীরবে ও নির্জনে কাটিয়ে দিতেন। আরও উল্লিখিত হয়েছে যে, সাফ্ফাহ্ ঈসাকে মানসূরের পরবর্তী অলীআহ্দ নিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু মানসূর সেই নিয়োগ ব্যবস্থা

পরিবর্তন করে আপন পুত্র মাহ্দীকে তাঁর পরবর্তী অলীআহ্দ নিয়োগ করেন। আর ঈসার অলীআহ্দী বহাল রাখা হয় এই শর্তে যে, তিনি মাহ্দীর পর খলীফা হবেন। অর্থাৎ এখন থেকে মাহ্দীর পরবর্তী অলীআহ্দ হলেন ঈসা ইব্ন মূসা। কিন্তু এক বছর গত হওয়ার পূর্বেই মাহ্দীর উপদেষ্টারা তাঁকে ঈসা ইব্ন মূসার স্থলে নিজপুত্র হাদীকে দ্বিতীয় অলীআহ্দ নিয়োগ করার পরামর্শ দেন। মাহ্দী ঈসাকে বাগদাদে তলব করেন। কিন্তু তিনি সেখানে আসতে অস্বীকার করেন। মাহ্দী কূফার গভর্নরকে কড়া নির্দেশ দেন, সে যেন ঈসাকে উত্যক্ত করে। কিন্তু তিনি যেহেতু প্রথম থেকেই নির্জনবাস গ্রহণ করেছিলেন, তাই কূফার গভর্নর তাকে বিরক্ত করার কোন সুযোগই পাননি। এরপর মাহ্দী ঈসার কাছে একটি কড়া চিঠি লিখেন। কিন্তু ঈসা তারও কোন উত্তর দেননি। এরপর মাহ্দী ঈসাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসার জন্য আপন চাচা আব্বাসকে পাঠান। কিন্তু ঈসা তাঁর সাথে যেতেও অস্বীকার করেন। এরপর মাহ্দী ঈসাকে নিয়ে আসার জন্য দু'জন সেনাপতি প্রেরণ করেন। এবার বাধ্য হয়ে ঈসা বাগদাদে আসেন এবং মুহাম্মদ ইব্ন সুলায়মানের বাড়িতে ওঠেন। তিনি সেখান থেকে মাহ্দীর দরবারে যাওয়া-আসা করতেন। কিন্তু সব সময়ই নীরব থাকতেন। এবার ঈসার উপর বিভিন্নভাবে চাপ সৃষ্টি করা হয়। অলীআহ্দী থেকে ইস্তফা দেওয়ার জন্য শেষ পর্যন্ত খোদ মুহাম্মদ ইব্ন সুলায়মানও তাঁর উপর চাপ প্রয়োগ করেন। ঈসা তখন নিজের সেই প্রতিশ্রুতি ও শপথের ওযর পেশ করেন, যা অলীআহ্দ নিয়োগকালে তাঁর কাছ থেকে নেওয়া হয়েছিল। এবার মাহ্দী ফকীহদের ডেকে পাঠান। তাঁরা এই মর্মে ফতওয়া দেন যে, ঈসা শপথের কাফ্ফারা দিয়ে অলীআহ্দী থেকে সরে দাঁড়াতে পারেন। শেষ পর্যন্ত মাহ্দী ঈসাকে দশ হাজার দিরহাম এবং যাব ও কিসকর এলাকার কয়েকটি জায়গীর প্রদান করেন এবং তার বিনিময়ে তিনি ১৬০ হিজরীর ২৬শে মুহাররম (৭৭৬ খ্রি ১৩ নভেম্বর) তাঁর অলীআহ্দীর দাবি প্রত্যাহার করেন। এরপর হাদীর অলীআহ্দীর বায়আত নেওয়া হয়। পরদিন মাহ্দী সাধারণ দরবার আহ্বান করেন। সেখানে সুলতানদের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে বায়আত নেওয়া হয়। এরপর মাহ্দী জামে মসজিদে এসে একটি ভাষণ দেন। তাতে ঈসার পদচ্যুতি এবং হাদীকে অলীআহ্দ নিয়োগের ব্যাপারে সকলকে অবহিত করা হয়। ঈসাও সেখানে আপন অলীআহ্দীর দাবি প্রত্যাহারের কথা সকলের সামনে স্বীকার করেন। এবার জনসাধারণ সর্বসম্মতিক্রমে হাদীর অলীআহ্দীর পক্ষে বায়আত করে।

মাহ্দীর হজ্জপালন

১৬০ হিজরীর যিলকদ (৭৭৭ খ্রি. সেপ্টেম্বর) মাসে মাহ্দী হজ্জ পালনের প্রস্তুতি নেন এবং আপনপুত্র হাদীকে বাগদাদে নিজের স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করেন। তিনি হাদীর মামা ইয়াযীদ ইব্ন মানসূরকে হাদীর সাথে রেখে যান। তিনি তাঁর অপর পুত্র হারূনসহ আপন পরিবারের আরও কয়েক ব্যক্তিকে হাদীর সভাসদ নিয়োগ করেন। এরপর আপন মন্ত্রী ইয়াকূব ইব্ন দাঊদ ইব্ন তাহমানসহ মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হন। মক্কায় পৌঁছে তিনি কা'বাঘরের এলোমেলো গিলাফটি খুলে ফেলে তদ্স্থলে একটি নতুন ও অতি মূল্যবান গিলাফ পরিয়ে দেন। মাহ্দী সেখানে দেড়লক্ষ দরিদ্রের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করেন, মসজিদে নববীর আয়তন বৃদ্ধি করেন এবং ফিরে আসার সময় পাঁচশ আনসার পরিবারকে সাথে করে ইরাকে নিয়ে আসেন।

ঐ সমস্ত পরিবারকে ইরাকে জায়গীর প্রদান করা হয়, তাঁদের জন্য ভাতা নির্ধারণ করা হয় এবং খলীফার প্রহরার কাজে তাঁদের নিয়োগ করা হয়। ঐ সময়ে খলীফা মাহ্দী মক্কার রাস্তাসমূহের পাশের ঘরবাড়ি নির্মাণ এবং প্রত্যেক বাড়িতে কুয়া খনন করান। তিনি এই সমস্ত কাজের দায়িত্ব ইয়াকতীন ইব্ন মূসার উপর অর্পণ করেন। মাহ্দী বসরার মসজিদ প্রশস্ত করার এবং তার মিম্বর ছোট করার নির্দেশ দেন।

স্পেনে সংঘর্ষ

মাহ্দীর পক্ষ থেকে আফ্রিকার গভর্নর ছিলেন আবদুর রহমান ইব্ন হাবীব ফিহ্রী। তিনি বার্বারদের একটি দল নিয়ে স্পেন উপকূলের মার্সিয়া বন্দরে অবতরণ করেন এবং একটি পত্র মারফত স্পেনের সারাকুস্তা (সারাগোসা) প্রদেশের গভর্নর সুলায়মান ইব্ন ইয়াকতীনকে খিলাফতে আব্বাসীয়ার দাওয়াত দেন। সুলায়মান ঐ পত্রের কোন উত্তর দেননি। তাই আবদুর রহমান ফিহরী সারাকুস্তা আক্রমণ করেন, কিন্তু সুলায়মানের কাছে পরাজিত হয়ে পিছু হটতে বাধ্য হন। ইতোমধ্যে স্পেনের শাসক আমীর আবদুর রহমান সেনাবাহিনী নিয়ে সেখানে এসে পৌঁছেন। তিনি সর্বপ্রথম সমুদ্র উপকূলে অবস্থানরত আবদুর রহমান ফিহরীর নৌযানগুলো পুড়িয়ে ফেলেন; এরপর ফিহরীর প্রতি মনোনিবেশ করেন। তিনি নিরুপায় হয়ে বালানসিয়া পাহাড়ে আরোহণ করেন। তখন আমীর আবদুর রহমান ঘোষণা দেন ঃ যে কেউ আবদুর রহমান ইব্ন ফিহরীর ছিন্ন মস্তক নিয়ে আসতে পারবে তাকে এক হাজার দীনার পুরস্কার দেওয়া হবে। ফিহরীর সঙ্গী জনৈক বার্বার এই ঘোষণার কথা জানতে পেরে কোন এক সুযোগে তার ছিন্ন মস্তক আমীর আবদুর রহমানের খিদমতে হাযির করে এবং তার কাছ থেকে প্রতিশ্রুত পুরস্কার নিয়ে চলে যায়। আমীর আবদুর রহমান আব্বাসীদের এই বাড়াবাড়ির কারণে অত্যন্ত রাগান্বিত হন এবং প্রত্যুত্তরে সিরিয়া উপকূলে হামলা চালিয়ে আব্বাসী খলীফার কাছ থেকে তার ঐ ভুলের মাশুল আদায় করার সংকল্প নেন। কিন্তু ঠিক ঐ সময়ে হুসাইন ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ ইব্ন উছমান আনসারী সারাকুস্তায় বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। অতএব আমীর আবদুর রহমান সেই বিদ্রোহ দমনে মনোনিবেশ করেন এবং সিরিয়া আক্রমণের পরিকল্পনা মুলতবি রাখেন।

খলীফা মানসূর আব্বাসীর যুগে স্পেনে উমাইয়া বংশের হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তা ইসলামী হুকুমতের অপর একটি পৃথক কেন্দ্রে পরিণত হয়। এই রাজ্যের অবস্থা সম্পর্কে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

রোমান ভূখণ্ডে হারূনের প্রথম অভিযান

মাহ্দী খুরাসান ও অন্যান্য প্রদেশ থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে রোমানদের উপর হামলা পরিচালনার উদ্দেশ্যে ১৬৩ হিজরীর ১লা রজব (৭৮০ খ্রি. মার্চ) মাসে বাগদাদ থেকে রওয়ানা হন। এর একদিন পূর্বে অর্থাৎ ৩০শে জমাদিউস্‌সানী মাহ্দীর চাচা ঈসা ইব্ন আলী ইনতিকাল করেন। মাহ্দী নিজের সহোদর হাদীকে আপন স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করেন এবং দ্বিতীয় পুত্র হারূনকে নিজের সঙ্গে নিয়ে যান। ঐ সফরে মাওসিল ও জাযীরা অতিক্রমকালে তিনি ঐ

প্রদেশের গভর্নর আবদুস সামাদ ইব্‌ন আলীকে পদচ্যুত ও বন্দী করেন এবং আপন পুত্র হারূনকে আযারবায়জান ও আর্মেনিয়াসহ সমগ্র পশ্চিম ভূখণ্ডের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালিহের হাতে জাযিরার শাসনভার ন্যস্ত করেন। ১৬২ হিজরীতে (৭৭৮-৭৯ খ্রি.) রোমানরা ইসলামী ভূখণ্ড আক্রমণ করে কয়েকটি শহর ধ্বংস করে দিয়েছিল। এই কারণে খলীফা মাহ্‌দী তাদের উপর এই আক্রমণ চালান। এই সফরে মাহ্‌দী মাসলামা ইব্‌ন আবদুল মালিকের প্রাসাদের সম্মুখে পৌঁছলে তাঁর (মাহ্‌দীর) চাচা আব্বাস ইব্‌ন আলী তাঁকে বলেন, একদা এই পথ অতিক্রমকালে মাসলামা আপনার দাদা মুহাম্মদ ইব্‌ন আলীকে দাওয়াত করেছিলেন এবং উপঢৌকনস্বরূপ তাকে এক হাজার দীনার দিয়েছিলেন। মাহ্‌দী একথা শুনতেই মাসলামার সন্তান-সন্ততি, চাকর, ভৃত্য ও অন্যান্য সম্পর্কিতকে ডেকে এনে তাদেরকে বিশ হাজার দীনার দান করেন এবং তাদের জন্য ভাতাও নির্ধারণ করে দেন। মানসূর হলবে পৌঁছে থেমে যান এবং হারূনকে সেনাবাহিনীসহ অগ্রে প্রেরণ করেন। হারূনের সাথে ঈসা ইব্‌ন মূসা, আবদুল মালিক ইব্‌ন সালিহ্, হাসান ইব্‌ন কাহতাবা, রাবী ইব্‌ন ইউনুস এবং ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন খালিদ প্রমুখ অধিনায়ক ছিলেন। কিন্তু সমগ্র বাহিনীর নেতৃত্ব এবং রসদ সামগ্রীর ব্যবস্থাপনা হারূনের হাতেই ছিল । হারূন সামনে অগ্রসর হয়ে রোমানদের দুর্গসমূহ অবরোধ করেন এবং একের পর এক বেশ কয়েকটি দুর্গ জয় করেন। ঐ সময়ে মাহ্‌দী হলবের আশেপাশের ধর্মদ্রোহীদের হত্যা করেন। ইতিমধ্যে হারূন বিজয়ী বেশে ফিরে আসেন। মাহ্‌দী হারূনকে নিয়ে বায়তুল মুকাদ্দাস পরিদর্শনে যান, মসজিদে আকসায় নামায পড়েন, এরপর বাগদাদে ফিরে আসেন। তিনি হারূনকে আযারবায়জান ও আর্মেনিয়ার গভর্নর নিয়োগকালে হাসান ইব্‌ন সাবিতকে তাঁর অর্থমন্ত্রী এবং ইয়াহ্ইয়া ইবন খালিদ বারমাককে পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিয়োগ করেছিলেন, ঐ বছর অর্থাৎ ১৬৩ হিজরীতে (৭৭৯-৮০ খ্রি.) খালিদ ইব্‌ন বারমাক ইনতিকাল করেন।

রোমান ভূখণ্ডে হারূনের দ্বিতীয় অভিযান

হিজরী ১৬৪ (৭৮০-৮১ খ্রি.) সনে আবদুল কবীর ইব্‌ন আবদুর রহমান রোমানদের বিরুদ্ধে সৈন্য সমাবেশ করেন। কিন্তু প্যাট্রিয়ক মীকাঈল ও প্যাট্রিয়ক তারাহ্ আর্মেনী নব্বই হাজার সৈন্য নিয়ে তাঁর মুকাবিলা করতে এলে আবদুল কবীর পিছু হটে চলে আসেন। এই ঘটনার কারণে এবং হিজরী ১৬৩ সনের (৭৭৯-৮০ খ্রি) হামলার ফলে রোমানদের উপর মুসলমানদের যে প্রভাব পড়েছিল তা নষ্ট হয়ে যায়। মাহ্‌দী এই সংবাদ শুনে আবদুল কবীরকে বন্দী করেন এবং হিজরী ১৬৫ সনে (৭৮১-৮২ খ্রি) আপন পুত্র হারূনকে রোমানদের মুকাবিলায় প্রেরণ করেন। অবশ্য আপন বিশ্বস্ত সংগীত ও বিশিষ্ট সভাসদ রবীকেও হারূনের সংগী করেন। হারূন আনুমানিক এক লক্ষ সৈন্য নিয়ে রোমানদের উপর হামলা চালান এবং তাদেরকে ক্রমান্বয়ে পরাজিত করে এবং একের পর এক রোমান শহর দখল করে কনসটান্টিনোপল পর্যন্ত এগিয়ে যান। ঐ সময়ে 'গান্তাহ' নাম্নী জনৈক মহিলা কনসটান্টিনোপলের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ছিলেন কায়সার আলইউকের পত্নী।

তিনি তার অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্রের পক্ষে রাজ্যশাসন করছিলেন। শেষ পর্যন্ত বার্ষিক সত্তর হাজার দীনার জিয্য়া প্রদানের প্রতিশ্রুতিতে রোমানরা তিন বছরের জন্য মুসলমানদের সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়। তারা এই শর্তও মেনে নেয় যে, মুসলমানরা কনসটান্টিনোপলের বাজারে অবাধে যাওয়া-আসা ও ব্যবসা করতে পারবে। এই সন্ধিচুক্তি সম্পাদনের পূর্বে মুসলমানরা পাঁচ হাজার ছয়শ রোমানকে গ্রেফতার এবং ছাপ্পান্ন হাজারকে হত্যা করেছিল। ঐ বছরই মাহ্দী হারূনকে সমগ্র পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের শাসনকর্তা ও ব্যবস্থাপক নিয়োগ করেন।

১৬৬ হিজরীতে (৭৮২-৮৩ খ্রি) মাহ্দী আপন পুত্র হারূনকে হাদীর পরবর্তী অলীআহ্দ নিয়োগ করেন, জনসাধারণের কাছ থেকে তাঁর অলীআহ্দীর পক্ষে বায়আত দেন এবং তাঁকে 'রশীদ' উপাধিতে ভূষিত করেন। ঐ বছর মাহ্দী বাগদাদ থেকে মক্কা, মদীনা ও ইয়ামান পর্যন্ত খচ্চর ও উটের মাধ্যমে ডাক ব্যবস্থার প্রচলন করেন, যাতে ঐ সমস্ত এলাকার দৈনন্দিন খবরাখবর পাওয়া যায় এবং সেখানেও রাষ্ট্রীয় নির্দেশাদি পৌঁছতে থাকে। ঐ বছরই মাহ্দী ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-কে বসরার বিচারক নিয়োগ করেন।

১৬৭ হিজরীতে (৭৮৩-৮৪ খ্রি) ঈসা ইব্ন মূসা কূফায় ইনতিকাল করেন। ঐ বছর ধর্মদ্রোহীরা এখানে সেখানে বিদ্রোহ করে। মাহ্দী প্রথমে তর্ক-বিতর্কের সাহায্যে তাদেরকে নিরুত্তর করার প্রয়াস চালান, এরপর হত্যার উদ্যোগ নেন। তিনি যেখানেই ধর্মদ্রোহীদের খোঁজ পেতেন সেখানেই তাদের হত্যা করতেন। ইয়ামামা ও বাহরায়নের মধ্যবর্তী বসরা এলাকায় তারা খুব শক্তিশালী হয়ে ওঠে। সেখানকার অনেক মুসলমানও নামায ত্যাগ করে, শরীয়ত নির্ধারিত হারাম-হালালের বাধ্যবাধকতা মেনে চলতে অস্বীকার করে এবং রাস্তাঘাটে লুটপাট শুরু করে দেয়। মাহ্দী যত্রতত্র তাদেরকে পাইকারীহারে হত্যা করেন। ফলে তারা একরকম নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এটি নিঃসন্দেহে মাহ্দীর কৃতিত্বপূর্ণ কার্যাবলীর অন্যতম। ঐ বছর তিনি আশেপাশের ঘরবাড়ি কিনে নিয়ে মসজিদে হারামের আয়তন বৃদ্ধি করেন।

হাদীর জুরজান আক্রমণ

১৬৭ হিজরীতে (৭৮৩-৮৪ খ্রি) সংবাদ পৌঁছে যে, তাবারিস্তানবাসীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। খলীফা তাদেরকে দমনের জন্য আপন অলীআহ্দ হাদীকে প্রেরণ করেন। হাদীর সেনাবাহিনীর পতাকা মুহাম্মদ ইব্ন জামীলের হাতে ছিল। হাদী তাবারিস্তানে, এরপর জুরজানে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন এবং বিদ্রোহীদেরকেও যথোচিত শাস্তি প্রদান করেন।

১৬৮ হিজরীতে (৭৮৪-৮৫ খ্রি) রোমানরা মুসলমানদের সাথে যে চুক্তি করেছিল, মেয়াদ শেষ হওয়ার চার মাস পূর্বেই তা ভঙ্গ করে। এই খবর পেয়ে জাযীরা ও কিন্নাসরীনের গভর্নর আলী ইব্ন সুলায়মান ইয়াযীদ ইব্ন বদর ইব্ন বাত্তালের অধিনায়কত্বে একটি বিরাট বাহিনী কনসটান্টিনোপলে প্রেরণ করেন। ইয়াযীদ সেখান থেকে প্রচুর গনীমতসহ ফিরে আসেন।

মাহ্দীর মৃত্যু

নিজস্ব অভিজ্ঞতায় মাহ্দী বুঝতে পারেন যে, রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে হাদীর অনুপাতে তাঁর দ্বিতীয় পুত্র হারূন অধিকতর যোগ্য। তাঁর এই বিশ্বাস দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হওয়ার পর ১৬৮ হিজরীতে তিনি অলীআহ্দীর ক্ষেত্রে হারূনকে হাদীর উপর অগ্রাধিকার প্রদানের সংকল্প নেন।

এ উদ্দেশ্যে তিনি হাদীর অলীআহ্দী রহিত করে হারূনকে তার স্থলে প্রথম অলীআহ্দ নিয়োগ করেন এবং এই মর্মে জনসাধারণের কাছ থেকে বায়আতও নেন। ঐ সময়ে হাদী জুরজানে অবস্থান করছিলেন। মাহ্দী দূত মারফত তাঁকে তলব করেন। কিন্তু হাদী দূতের সাথে অশিষ্ট আচরণ করেন। তিনি তাকে মারধর করে আপন দরবার থেকে তাড়িয়ে দেন। এরপর পিতার নির্দেশ পালনার্থে জুরজান থেকে বাগদাদ অভিমুখে রওয়ানা হন। এদিকে স্বয়ং মাহ্দীও হাদীর উদ্দেশ্যে বাগদাদ থেকে জুরজান অভিমুখে রওয়ানা হন। কিন্তু পথিমধ্যে বাসাবযান নামক স্থানে ১৬৯ হিজরীর ২২শে মুহাররম (৭৮৫ খ্রি-এর ৫ই আগস্ট) তিনি ইনতিকাল করেন। হারূন ঐ সফরে পিতার সাথেই ছিলেন। তিনি জানাযার নামায পড়ান এবং ভাইয়ের কাছে জুরজানে পিতার মৃত্যু সংবাদ পাঠান। হাদী সেখানে সেনাবাহিনীর কাছ থেকে আপন খিলাফতের বায়আত নেন। এদিকে হারূনুর রশীদ তাঁর বাহিনী নিয়ে বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করেন। এখানে এসে তিনি জনসাধারণের কাছ থেকে আপন ভাই হাদীর খিলাফতের বায়আত নেন এবং খলীফা মাহ্দীর মৃত্যু ও হাদীর খলীফা হওয়ার সংবাদ বিভিন্ন অঞ্চলের কর্মকর্তাদের কাছে পাঠিয়ে দেন। বিশ দিন পর হাদী জুরজান থেকে রওয়ানা হয়ে বাগদাদে এসে পৌঁছেন এবং খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে 'হাজিব' (প্রাসাদাধ্যক্ষ) রাবীকে মন্ত্রীত্ব প্রদান করেন। কিন্তু কিছুদিন পরই রাবী মৃত্যুমুখে পতিত হন।

খলীফা মাহ্দী আব্বাসীদের মধ্যে অত্যন্ত পবিত্র স্বভাব, মুত্তাকী, খোশ-মেজাযী, বীর ও পুণ্যবান খলীফা ছিলেন। তিনি তাঁর পিতার যুগে ঐ সমস্ত রক্তারক্তি প্রত্যক্ষ করেন যা আলাবীদের উপর চালানো হয়েছিল। কিন্তু তিনি এগুলোকে যুক্তিসঙ্গত মনে করতেন না। জনকল্যাণমূলক কাজের মাধ্যমে মানুষের অন্তর জয় করাকে তিনি রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতার জন্য অপরিহার্য মনে করতেন। ভীতি ও সন্ত্রাসের সৃষ্টি করা এবং মানুষের উপর জুলুম-অত্যাচার চালানোকে তিনি মনেপ্রাণে ঘৃণা করতেন। এ কারণে তিনি তাঁর উপদেষ্টা ও সভাসদদের সাথে একই মজলিসে বসতে শুরু করেন। অন্যথায় তাঁর পূর্বে মানসূরের যুগে উপদেষ্টা ও সভাসদরা এমনভাবে পর্দার আড়ালে বসতেন যে, খলীফা শুধু তাদের গলার আওয়াজ শুনতে পেতেন এবং তারাও খলীফার আওয়াজ শুনতে পেতেন, কিন্তু একে অপরকে স্বচক্ষে দেখতে পারতেন না। মাহ্দী তাঁর খিলাফত আমলে নিজের নির্দেশে কোন হাশিমীকে হত্যা করাননি। তিনি এই মর্মে শপথ করেছিলেন যে, তিনি কখনো কোন হাশিমীকে হত্যা করবেন না। প্রাণদণ্ড পাওয়ার যোগ্য এমন হাশিমীকে তিনি শুধু বন্দী করে রাখতেন। তিনি ধর্মদ্রোহীদের প্রাণের শত্রু ছিলেন। তাই কোন ধর্মদ্রোহীকে পেলে হত্যা না করে ছাড়তেন না। ইয়াকূব ইব্ন ফাদল হাশিমী ধর্মদ্রোহী হয়ে গিয়েছিল এবং সে কথা সে প্রকাশ্যে ব্যক্তও করত। কিন্তু মাহ্দী তাকে বন্দী করে রাখেন এবং আপন অলীআহ্দ হাদীকে বলেন, তুমি যখন খলীফা হবে তখন তাকে হত্যা করবে। আমি আমার শপথে অটল থাকার কারণে তাকে হত্যা করতে পারি না। অতএব হাদী খলীফা হওয়ার পর তাকে হত্যা করেন। রাসূলের সুন্নত অনুসরণের প্রতি মাহ্দীর সতর্ক দৃষ্টি ছিল। ইতিপূর্বে খলীফাদের জন্য মসজিদসমূহে যে সব বিশেষ প্রকোষ্ঠ নির্মাণ করা হয়েছিল, সুন্নতের পরিপন্থী মনে করে তিনি সেগুলো ভেঙ্গে ফেলেন। যে সমস্ত মসজিদের মিম্বর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মিম্বরের চাইতে উঁচু ছিল তিনি সেগুলোকেও নিচু করার নির্দেশ দেন। তিনি অত্যন্ত ইবাদতগুযার, ধৈর্যশীল ও মিষ্টভাষী ছিলেন। তাঁর দরবারে যে কেউ

অবাধে যাতায়াত করতে পারত। রাষ্ট্রীয় কাজকর্মে তিনি অত্যন্ত পরিশ্রমী ও বিচক্ষণ ছিলেন। তাঁর গোলাম-ভৃত্য অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি তাদেরকেও দেখতে যেতেন। কোন কোন সময় জনসাধারণ কাযীর আদালতে তাঁর বিরুদ্ধেও মোকদ্দমা দায়ের করে। তখন তিনি কাযীর নোটিশ পেয়ে একজন সাধারণ আসামীর ন্যায় কাযীর আদালতে হাযির হন এবং কাযী তাঁর সম্পর্কে যে রায় দেন তা নত মস্তকে মেনে নেন। একদা সেই যুগের বিখ্যাত আলিম শারীক তাঁর দরবারে আসেন। মাহ্দী তাঁকে বলেন, তিনটি কথার যে কোন একটি আপনাকে অবশ্যই মেনে নিতে হবে। হয় আপনি কাযীর পদ গ্রহণ করুন, অথবা আমার পুত্রকে পড়ান, অথবা আমার সাথে খাবার খান। শারীক কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলেন, এগুলোর মধ্যে খাবার খাওয়াটাই সবচেয়ে সহজ। অতএব দস্তরখানের উপর রং বেরংয়ের খাবার পরিবেশন করা হয়। শারীক খাওয়া-দাওয়া শেষ করলে রাজকীয় বাবুর্চি বলে, ব্যস, এবার আপনি ফেঁসে গেলেন। বাস্তবেও ঘটলো তাই। শারীক কাযী পদ গ্রহণ করেন এবং হাদীর পুত্রদেরকেও পড়ান। মাহ্দী কখনো বসরায় এলে জামে মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযেই ইমামতি করতেন। একদিন লোকেরা নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে যায়। এরপর এক বেদুঈন আসে কিন্তু জামাআত পায়নি। তাই সে মাহ্দীকে বলে, আমি যুহরের নামায আপনার পিছনে পড়তে চেয়েছিলাম কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। মাহ্দী তখন নির্দেশ দেন, প্রত্যেক নামাযেই এই লোকটির জন্য যেন অপেক্ষা করা হয়। পরবর্তী আসরের নামাযের সময় দেখা গেল, মাহ্দী মিহরাবে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। শেষমেষ ঐ লোকটি মসজিদে এসে না পৌঁছা পর্যন্ত তিনি সেই ওয়াক্তের নামায শুরু করার তাকবীর-এর অনুমতি দেননি। লোকেরা অবাক বিস্ময়ে তাঁর এই উদারচিত্ততা লক্ষ্য করে। মাহদী সর্বপ্রথম বসরায় আপন এক খুতবায় পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِىِّ ط يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ـــ

"আল্লাহ নবীর প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর ফেরেশতারাও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে। হে মু'মিনগণ! তোমরাও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও" (৩৩ ঃ ৫৬)।

এরপর থেকে আজ পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বের খতীবগণ তাঁদের খুতবার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসাবে এই আয়াতটি তিলাওয়াত করে আসছেন।

হাদী ইব্ন মাহ্দী

হাদী ইব্ন মাহ্দী ইব্ন মানসূর ১৪৭ হিজরীতে (৭৬৪-৬৫ খ্রি) 'রায়' নামক স্থানে খায়যুরানের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। খায়যুরান বার্বারের অধিবাসিনী একজন দাসী ছিল। মাহ্দী তাকে ক্রয় করেন এবং তারই গর্ভে তাঁর দুই পুত্র হাদী ও হারূনের জন্ম। এরপর মাহ্দী তাঁকে মুক্ত করে দেন এবং ১৫৯ হিজরীতে (৭৭৫-৭৬ খ্রি) তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিবাহও করেন। খলীফা হাদী খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে আপন পিতার ওসীয়ত অনুযায়ী ধর্মদ্রোহীদের মূলোৎপাটনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর খিলাফত আমলে নিম্নোক্ত

ব্যক্তিগণ বিভিন্ন প্রদেশ ও রাজ্যের শাসনকর্তা ছিলেন। উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয ও উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর ইবনুল খাত্তাব মদীনার, ইবরাহীম ইব্‌ন মুসলিম ইব্‌ন কুতবা ইয়ামানের, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কাছাম মক্কা ও তাইফের, সুওয়ায়দ কায়েদ খুরাসানী ইয়ামামা ও বাহরাইনের, হাসান ইব্‌ন সুলায়ম হাওয়ারী আম্মানের, মূসা ইব্‌ন ঈসা কূফার, ইব্‌ন সুলায়মান বসরার খলীফা হাদীর মুক্ত গোলাম হাজ্জাজ জুরজানের, যিয়াদ ইব্‌ন হাসান কূমিসের, সালিহ্ ইব্‌ন শায়খ ইব্‌ন উমায়রা আসাদী তাবারিস্তানের এবং হাশিম ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন খালিদ মাওসিলের শাসনকর্তা ছিলেন। হাদী হাশিমকে তার অসদাচরণের কারণে পদচ্যুত করে তার স্থলে আবদুল মালিক ইব্‌ন সালিহ্ ইব্‌ন আলী হাশিমীকে শাসনকর্তা নিয়োগ করেছিলেন।

হুসাইন ইব্‌ন আলীর বিদ্রোহ

হুসাইন ইব্‌ন আলী ইব্‌ন হাসান মুছাল্লাছ ইব্‌ন হাসান মুছান্না ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব, হাসান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাসান তাদের চাচা ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাসান এবং আবূ তালিবের পরিবারের অন্যান্য লোক একত্রে মিলে হুকুমতে আব্বাসীয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার ষড়যন্ত্র এঁটেছিলেন এবং এই মর্মে সিদ্ধান্তও নিয়েছিলেন যে, ১৫৯ হিজরীর (৭৭৬ খ্রি-এর অক্টোবর) হজ্জ মওসুমে বিদ্রোহ ঘোষণা করা হবে। কিন্তু হজ্জ মওসুমের পূর্বেই মদীনার শাসনকর্তা উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌র সাথে তাদের কিছু মন কষাকষি হয়ে যায়। ফলে তখনি তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং মদীনার শাসনকর্তার ভবন অবরোধ করে হুসাইন ইব্‌ন আলী মুছাল্লাছের হাতে বায়আত করতে শুরু করেন। মদীনাবাসীরাও এই বায়আতে অংশগ্রহণ করেন। এরই মধ্যে খালিদ ইয়াযীদী দুশ লোকের একটি বাহিনী নিয়ে সেখানে এসে পৌছেন। অপর দিকে উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযও অবরোধমুক্ত হয়ে একদল সৈন্য নিয়ে মসজিদের ঠিক সেই জায়গায় এসে পৌছেন, যেখানে হুসাইন ইব্‌ন আলীর জন্য বায়আত নেওয়া হচ্ছিল। যে সমস্ত লোক তখন মসজিদে ছিলেন তারা খালিদের মুকাবিলা করে। শেষ পর্যন্ত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাসানের পুত্রদ্বয় ইয়াহ্ইয়া ও ইদরীসের হাতে খালিদ ইয়াযীদী নিহত হন এবং নিহত হওয়ার সাথে সাথে অন্যরাও পরাজয়বরণ করে। এরপর হুসাইন ইব্‌ন আলীর দল বায়তুল মালের দরজা ভেঙ্গে গোটা সরকারী ভাণ্ডার লুট করে নিয়ে যায়। পরদিন বনূ আব্বাসের সমর্থকরা একত্রিত হয়ে পুনরায় মুকাবিলা করে। কয়েক দিন পর্যন্ত মদীনার এই সংঘর্ষ অব্যাহত থাকে। শেষ পর্যন্ত হুসাইন ইব্‌ন আলী সকলকে তাড়িয়ে দিয়ে মদীনার উপর নিজের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি একুশ দিন মদীনায় অবস্থান করার পর মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হন। মক্কায় পৌছে তিনি ঘোষণা দেন যে, যে ক্রীতদাসই আমার কাছে আসবে আমি তাকে মুক্ত করে দেব। এই ঘোষণা শুনে বেশ কয়েকজন ক্রীতদাস হুসাইন ইব্‌ন আলীর কাছে এসে জড়ো হয়। ঐ বছর সুলায়মান ইব্‌ন মানসূর, মুহাম্মদ ইব্‌ন সুলায়মান ইব্‌ন আলী, আব্বাস ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী, ঈসা ইব্‌ন মূসার পুত্রদ্বয় মূসা ও ইসমাঈল প্রমুখ আব্বাসী পরিবারের বেশ কয়েক ব্যক্তি হজ্জ করতে এসেছিলেন। তাঁদের রওয়ানা হওয়ার পর হাদীর কাছে হুসাইন ইব্‌ন আলীর বিদ্রোহ ঘোষণার খবর পৌছে। হাদী সঙ্গে সঙ্গে মুহাম্মদ ইব্‌ন সুলায়মানকে লিখেন, তুমি

তোমার সকল সঙ্গীকে নিয়ে হুসাইন ইব্ন আলীর মুকাবিলা কর। মুহাম্মদ ইব্ন সুলায়মান হজ্জে আসার সময় কিছু সৈন্যও সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি যীতুওয়া নামক স্থানে আরো কিছু লোক সংগ্রহ করে দস্তুর মত একটি সেনাবাহিনী গড়ে তোলেন। এরপর তিনি মক্কায় গিয়ে উমরা আদায় করেন। সেখানে বিভিন্ন প্রদেশ ও রাজ্য থেকে যে সমস্ত আব্বাসী হজ্জ করতে এসেছিলেন তারাও মুহাম্মদ ইব্ন সুলায়মানের সাথে যোগ দেন। শেষ পর্যন্ত তারবিয়ার দিন 'ফাখ' নামক স্থানে উভয় দলের মধ্যে সংঘর্ষ হয় এবং তাতে অনেক লোক মারা যায়। শেষ পর্যন্ত হুসাইন ইব্ন আলী পরাজিত হন এবং তার সঙ্গীরা পলায়ন করে। কিছুক্ষণ পর জনৈক ব্যক্তি হুসাইন ইব্ন আলীর ছিন্ন মস্তক নিয়ে আসে। তার সঙ্গীদেরও প্রায় একশটি মস্তক জড়ো করা হয়। সেগুলোর মধ্যে মুহাম্মদ মাহ্দীর ভাই সুলায়মানের মস্তকও ছিল। পরাজিতরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গিয়ে হাজীদের সাথে মিশে যায়। এ দিকে মুহাম্মদ ইব্ন সুলায়মান নিরাপত্তা ঘোষণা করেন এবং এই ঘোষণার পর হাসান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ বন্দী হন। তবু মূসা ইব্ন ঈসা তাকে হত্যা করেন। এতে মুহাম্মদ ইব্ন সুলায়মান মূসার প্রতি অসন্তুষ্ট হন। হাদীও যখন এই ব্যাপারটি জানতে পারেন তখন তিনি মূসার যাবতীয় মালপত্র আটক করেন। এই যুদ্ধে কোন না কোনভাবে মুহাম্মদ মাহ্দীর ভাই ইদরীসের প্রাণ রক্ষা পায় এবং তিনি পালিয়ে সোজা মিসরে গিয়ে পৌছেন। সালিহ ইব্ন মানসূরের মুক্ত দাস ওয়াযিহ্ সেখানকার ডাক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অফিসার ছিলেন। আবূ তালিব পরিবারের প্রতি তার আন্তরিক সহানুভূতি ছিল। তিনি ইদরীসকে একটি দ্রুতগামী ঘোড়ায় চড়িয়ে আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিম দিকে পাঠিয়ে দেন। ইদরীস তাঞ্জা এলাকায় দালীলাহ নামক শহরে গিয়ে পৌছেন এবং বার্বারদের কাছে আহলে বায়তের দাওয়াত পৌছাতে থাকেন। কিছুদিন পর খলীফা হাদী যখন জানতে পারেন যে, ওয়াযিহ্ ইদরীসকে পশ্চিম দিকে পাঠিয়ে দিয়েছেন তখন তিনি তাকে ও তার সঙ্গীদেরকে গ্রেফতার করে অত্যন্ত নির্মমভাবে হত্যা করেন। অপর দিকে ইদরীস ইব্ন আবদুল্লাহ্‌র অপর ভাই ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবদুল্লাহ্ 'ফাখ' থেকে পালিয়ে দায়লামে চলে গিয়েছিলেন।

হাদীর মৃত্যু

হাদী খিলাফতের আসনে বসেই আপন ভাই হারূনকে অলীআহ্দী থেকে বঞ্চিত করে তাঁর পরিবর্তে আপন পুত্র জা'ফরকে অলীআহ্দ নিয়োগ করার সংকল্প নেন। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন খালিদ ইব্ন বারমাক হারূন রশীদের শিক্ষাগুরু ও তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। তিনি অনেক বুঝিয়ে খলীফাকে উক্ত সংকল্প থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু হাদীর অন্যান্য সভাসদ বার বার তাঁর উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন, যাতে তিনি হারূনকে বাদ দিয়ে পরিবর্তে আপন পুত্র জা'ফরকে অলীআহ্দ নিয়োগ করেন। কিন্তু ইয়াহ্ইয়া হাদীকে বলেন ঃ আপনার পুত্র জা'ফর এখনো অপ্রাপ্তবয়স্ক। যদি আপনি আজ ইনতিকাল করেন তাহলে সরকারী কর্মকর্তারা এই ছোট শিশুটির খিলাফত কখনো মেনে নেবে না। ফলে দেশব্যাপী বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার সৃষ্টি হবে। আপনার পিতা হারূনকে আপনার পরবর্তী অলীআহ্দ নিয়োগ করেছিলেন। আপনিও যদি জা'ফরকে হারূনের পরবর্তী অলীআহ্দ নিয়োগ করেন তাহলে কোন দিক দিয়েই আর দুশ্চিন্তার কারণ থাকে না। আপনার জীবিতাবস্থায় জা'ফর যখন প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে যাবে এবং

আপন যোগ্যতা প্রদর্শন করবে তখন আমি হারূনকে অলীআহ্দীর অধিকার জা'ফরের পক্ষে হস্তান্তর করার ব্যাপারে রাযী করিয়ে নেব। এসব কথায় হাদীর মনে সান্ত্বনা আসে। কিন্তু যেসব সভাসদ হারূনের বিরুদ্ধে ছিল তারা হাদীকে বার বার ঐ একই ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। ফলে হাদী এ ব্যাপারে হারূনের উপর চাপ সৃষ্টি করতে শুরু করেন। ইয়াহ্ইয়া বিষয়টি জানতে পেরে হারূনকে পরামর্শ দেন ঃ তুমি মৃগয়ার বাহানায় কোথাও চলে যাও এবং হাদী থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান কর। অতএব হারূন শিকারের অনুমতি নিয়ে 'কাসরে মুকাতিল'-এ চলে যান। হাদী তাঁকে ফিরে আসতে বললে তিনি অসুখের বাহানায় ফিরে আসেননি। ঐ সময়ে আর একটি ঘটনা ঘটে। হাদী আপন মাতা খায়যুরানকে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত রাখতে শুরু করেন। মাহ্দীর যুগ থেকে খায়যুরান এ ক্ষেত্রে যে সব অধিকার ভোগ করে আসছিলেন তিনি তা সম্পূর্ণ কেড়ে নেন। মাতা-পুত্রের এই মন কষাকষি এমনি এক অবাঞ্ছিত অবস্থার সৃষ্টি করে যে, তাঁরা একে অপরের শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। ইয়াহ্ইয়ার মাধ্যমে খায়যুরান যখন জানতে পারেন যে, হাদী আপন পুত্র জা'ফরের অলীআহ্দীর জন্য হারূনের 'প্রাণের শত্রু' হয়ে দাঁড়িয়েছেন তখন তাঁর (খায়যুরানের) হৃদয়ে হারূনের স্নেহ-ভালবাসার মাত্রা কিছুটা বেশি পরিমাণেই বৃদ্ধি পায় এবং তিনি হাদীর কট্টর শত্রুতে পরিণত হন। এবার শুধু ইয়াহ্ইয়া নন, বরং খায়যুরানও হারূনের সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষক হয়ে দাঁড়ান। হারূন যখন হাদীর আহ্বানে বাগদাদে আসতে অস্বীকার করেন তখন হাদী নিজেই মাওসিলে রওয়ানা হন। সেখান থেকে ফিরে আসার সময় হারূনও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। পথিমধ্যে হাদী অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তিন দিন অসুস্থ থাকার পর ১৭০ হিজরীর ১২ই রবিউল আউয়াল (৭৮৬ খ্রি-এর ৯ই আগস্ট) রবিবার রাতে ইসাবাদ নামক স্থানে আনুমানিক সোয়া এক বছর খিলাফত পরিচালনা করে মারা যান। হাদী এভাবে হঠাৎ ইনতিকাল করায় জনসাধারণ বলাবলি করতে থাকে যে, খায়যুরান তাঁর এক দাসীর মাধ্যমে হাদীকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেছেন। কিন্তু যেহেতু হাদী অসুস্থ ছিলেন, তাই বিষ প্রয়োগের এই ঘটনা একটি বানোয়াট কাহিনী ছাড়া কিছু নয়। এই কাহিনী মতে, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন খালিদও ঐ কাজে খায়যুরানের উপদেষ্টা ও অংশীদার ছিলেন।

হাদী বাগদাদ থেকে জুরজান পর্যন্ত ডাক ব্যবস্থার প্রচলন করেছিলেন। তিনি বদান্য, সদালাপী এবং কিছুটা জুলুমপ্রিয় ছিলেন, তবে রাষ্ট্রীয় কাজে অমনোযোগী ছিলেন না। তিনি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী একজন বীরপুরুষ ছিলেন। তিনি ছিলেন স্বল্পায়ু। তাঁর খিলাফতকালও ছিল খুব সংক্ষিপ্ত। এই অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর স্বভাব-চরিত্র ও আচার-আচরণ ভালভাবে প্রকাশ লাভের সুযোগই পায়নি বলা চলে।

আবূ জা'ফর হারূনুর রশীদ ইব্ন মাহ্দী

আবূ জা'ফর হারূনুর রশীদ ইব্ন মাহ্দী ইব্ন মানসূর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস ১৪৮ হিজরীতে (৭৬৫-৬৬ খ্রি) রায় নামক স্থানে খায়যুরানের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। এর এক সপ্তাহ পূর্বে ইয়াহ্ইয়া ইব্ন খালিদের পুত্র ফাদল ইব্ন ইয়াহ্ইয়ার জন্ম হয়েছিল। হারূনের মা খায়যুরান ফযলকে এবং ফযলের মা হারূনকে স্তন্য দান করেছিলেন। হারূনুর রশীদ ১৭০ হিজরীর (৭৮৬ খ্রি অক্টোবর) ১৪ই রবিউল আউয়াল রবিবার

রাতে আপন ভ্রাতার মৃত্যুর সাথে সাথে খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হন। ঐ রাতেই তাঁর পুত্র মামূনের জন্ম হয়। এটা নিঃসন্দেহে একটি বিস্ময়কর ঘটনা যে, একই রাতে এক খলীফার মৃত্যু হলো, দ্বিতীয় খলীফা খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হলেন এবং তৃতীয় খলীফা জন্মগ্রহণ করলেন। হারূনের পৈতৃক নাম ছিল আবূ মূসা। কিন্তু পরবর্তীতে তা আবূ জা'ফর হয়ে যায়। হারূনুর রশীদ ছিলেন দীর্ঘাকৃতির ও সুন্দর চেহারার অধিকারী একজন সুপুরুষ।

হারূনুর রশীদ খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েই ইয়াহ্ইয়া ইব্ন খালিদ বারমাককে নিজের প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন এবং তাঁর হাতে মন্ত্রীত্বের সাথে সাথে 'খাতামে খিলাফত' (খলীফার মোহর) অর্পণ করে তাঁকে রাষ্ট্রের যে কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার প্রদান করেন। খায়যুরান, যিনি হাদীর যুগে রাষ্ট্রীয় কাজকর্মের সাথে সম্পর্কহীন হয়ে পড়েছিলেন, এবার ইয়াহ্ইয়া ইব্ন খালিদের সাথে মিলিত হয়ে পুনরায় রাষ্ট্রীয় কাজকর্মে অংশগ্রহণ করতে থাকেন। ইয়াহ্ইয়া এবং খায়যুরানকে প্রশাসনিক অধিকার প্রদানের অর্থ এই নয় যে, হারূনুর রশীদ স্বয়ং রাষ্ট্রীয় কাজকর্মের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করতেন। বরং এই অধিকার প্রদান দ্বারা তার উদ্দেশ্য ছিল ইয়াহ্ইয়া ও খায়যুরানের প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করা। কেননা তিনি ওদেরকে তাঁর সত্যিকার শুভাকাঙ্ক্ষী এবং ওদের প্রতিটি পরামর্শ সঠিক ও নির্ভরযোগ্য মনে করতেন। ইয়াহ্ইয়ার সাথে পরামর্শ না করে তিনি কোন কাজই করতেন না। বাইশ-তেইশ বছরের একজন তরুণ খলীফার এটা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত যোগ্যতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় যে, তিনি তাঁর প্রধানমন্ত্রীর পদে এমন এক ব্যক্তিকে নির্বাচিত করেন, যিনি ঐ যুগের জন্য নিঃসন্দেহে অত্যন্ত উপযুক্ত এবং যথার্থ যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন।

খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর তিনি সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিযুক্তি-পদচ্যুতি ও রদবদলের নিয়ম-কানুন পূর্বের চাইতে অধিকতর সুদৃঢ় ও সুবিন্যস্ত করার চেষ্টা করেন। তিনি উমর ইব্ন আবদুল আযীয উমরীকে মদীনার শাসনকর্তার পদ থেকে অপসারণ করে তার স্থলে ইসহাক ইব্ন সুলায়মানকে নিয়োগ করেন। আফ্রিকার গভর্নর পদে রাওহ্ ইব্ন হাতিমকে পাঠানো হয়। হারূন জাযীরা ও কিন্নাসরীন থেকে সীমান্ত এলাকাসমূহ আলাদা করে নিয়ে 'আওয়াসিম' নামে একটি পৃথক প্রদেশ গঠন করেন। খিলাফতের প্রথম বছরে হজ্জ মওসুমে তিনি হজ্জ করতে যান। ঐ সময়ে তিনি মক্কা মদীনার সর্বত্রই অপূর্ব বদান্যতা প্রদর্শন করেন।

১৭১ হিজরীতে (৭৮৭-৮৮ খ্রি) হারূন বনূ তাগলিবের যাকাত আদায় করার জন্য রাওহ্ ইব্ন সালিহ্ হামাদানীকে নিয়োগ করেন। কিছুদিন যেতে না যেতেই তার এবং বনূ তাগলিবের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হয়। তিনি বনূ তাগলিবকে দমনের জন্য সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। বনূ তাগলিব রাতের বেলা আকস্মিক হামলা চালিয়ে রাওহ্কে হত্যা করে।

ইদরীস ইব্ন আবদুল্লাহ্ সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। তিনি হাদীর খিলাফত আমলে 'ফাখ'-এর যুদ্ধ থেকে পালিয়ে পশ্চিম দিকে চলে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি বার্বারদের মধ্যে আপন 'ইমামত'-এর দাওয়াত দিতে শুরু করেন এবং ১৭২ হিজরীতে

(৭৮৮-৮৯ খ্রি) দালীলাহ্ শহরে বিদ্রোহ ঘোষণা করে জনসাধারণের কাছ থেকে প্রকাশ্যে বায়আত গ্রহণ করতে থাকেন। কিছুদিন পর তিনি মরক্কোয় একটি পৃথক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। এটা হচ্ছে আলাবীদের সর্বপ্রথম রাষ্ট্র, যা মরক্কোয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে মরক্কো ইসলামী বিশ্ব তথা খিলাফতে ইসলামিয়া থেকে পৃথক হয়ে যায়। হারূন এই সংবাদ পেয়ে ইদরীস ইব্ন আবদুল্লাহকে হত্যা করার সংকল্প নেন এবং এ উদ্দেশ্যে আপন গোলাম সুলায়মান ইব্ন জাবীর ওরফে শাম্মাখকে মরক্কোতে প্রেরণ করেন। শাম্মাখ সেখানে পৌঁছে ইদরীস ইব্ন আবদুল্লাহ্র হাতে বায়আত করে। সে ইদরীসের সামনে রাতদিন হারূনের বিরূপ সমালোচনা করত। ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সে ইদরীসের আপন জনে পরিণত হয়। এরপর সুযোগ পেয়ে ১৭৭ হিজরীতে (৭৯৩-৯৪ খ্রি) বিষ প্রয়োগের মাধ্যমে ইদরীসকে হত্যা করে সে বিজয়ী বেশে বাগদাদে ফিরে আসে। কিন্তু ইদরীস যে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার মৃত্যুর পর তার কোন এক দাসীর গর্ভে একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। বার্বাররা ঐ নবজাতকের নামও ইদরীস রাখে। এরপর তাকেই নিজেদের ইমাম মনোনীত করে। ইদরীসী সাম্রাজ্য সম্পর্কে আগামীতে আলোচনা করা হবে। কিছুদিন পর তিউনিসিয়া এলাকায়ও একটি পৃথক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, যার উপর খিলাফতে আব্বাসীয়ার নামমাত্র কর্তৃত্ব বাকি থাকে। এভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের পশ্চিমা দেশগুলো ধীরে ধীরে আব্বাসী আধিপত্য থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

১৭৩ হিজরীতে (৭৮৯-৯০ খ্রি) বসরার গভর্নর মুহাম্মদ ইব্ন সুলায়মানের মৃত্যু হয়। হারূন তার যাবতীয় ধনসম্পদ আটক করে বায়তুলমালে দাখিল করে নেন। তিনি ইসহাক ইব্ন সুলায়মানকে সিন্ধু ও মাকরানের শাসনকর্তা এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র) জীবিত থাকা অবস্থায় তাঁর পুত্র ইউসুফকে প্রধান বিচারপতির পদে নিয়োগ করেন।

আমীনের অলীআহ্দী (যৌবরাজ্য)

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হারূনুর রশীদের খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার মুহূর্তে হিজরী ১৭০ সনে (৭৮৬-৮৭ খ্রি) তাঁর পুত্র মামুনূর রশীদ জন্মগ্রহণ করেন। মামুনূর রশীদের জন্ম হয় মারজিল নাম্নী অগ্নিউপাসক বংশোদ্ভূত এক দাসীর গর্ভে। ঐ বছরই অর্থাৎ হিজরী ১৭০ সনে (৭৮৬-৮৭ খ্রি) হারূনের দ্বিতীয় পুত্র মুহাম্মদ আমীন বেগম যুবায়দা বিনত জা'ফর ইব্ন মানসূরের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। আমীনের শিক্ষাগুরু ছিলেন ফযল ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন খালিদ ইব্ন বারমাক, আর মামুনের শিক্ষাগুরু ছিলেন ফযলের ভাই জা'ফর ইব্ন ইয়াহ্ইয়া। ফযলের আকাঙ্ক্ষা ছিল, হারূনুর রশীদ যেন আপন পুত্র আমীনকে অলীআহ্দ নিয়োগ করেন। অপর দিকে জা'ফর চেষ্টা করেছিলেন যেন মামুনই অলীআহ্দ নিযুক্ত হন। যেহেতু আমীন হাশিমী বংশের মহিলার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং যেহেতু ফযল এবং বেগম যুবায়দাও তাকে অলীআহ্দ করার ব্যাপারে চেষ্টা চালাচ্ছিলেন এবং যেহেতু বেগম যুবায়দা ছিলেন হারূনের প্রিয়তমা মহিষী, তাই হিজরী ১৭৫ সনে (৭৯১-৯২ খ্রি) যখন আমীনের বয়স ছিল মাত্র পাঁচ বছর, হারূনুর রশীদ জনসাধারণের কাছ থেকে তাঁর (আমীনের) অলীআহ্দীর বায়আত গ্রহণ করেন।

ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবদুল্লাহর বিদ্রোহ

উপরে উল্লিখিত হয়েছে যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাসানের পুত্রদ্বয় এবং মুহাম্মদ মাহ্দী ওরফে নাফসে যাকিয়ার ভ্রাতৃদ্বয় ইদরীস ও ইয়াহ্ইয়া 'ফাখ' যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। ইদরীস পশ্চিম দিকে পালিয়ে গিয়ে এক সময় মরক্কো দখল করে নেন, যেমন ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবদুল্লাহ দায়লামে খিলাফতে আব্বাসীয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। জনসাধারণ চতুর্দিক থেকে এসে তাঁর হাতে বায়আত করতে থাকে। ফলে তিনি অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। হারূন এই সংবাদ শুনে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন এবং ফযল ইব্ন ইয়াহ্ইয়ার অধিনায়কত্বে পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের একটি বিরাট বাহিনী ইয়াহ্ইয়ার মুকাবিলায় প্রেরণ করেন। সেই সাথে তিনি ফযল ইব্ন ইয়াহ্ইয়াকে জুরজান, তাবারিস্তান, রায় প্রভৃতি অঞ্চলের গভর্নরও নিয়োগ করেন। ফযল ইব্ন ইয়াহ্ইয়া বাগদাদ থেকে রওয়ানা হয়ে তালিবানে পৌঁছেন এবং সেখান থেকে ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবদুল্লাহর নামে একটি পত্র প্রেরণ করেন। তাতে বর্তমান খলীফার মাহাত্ম্য ও শৌর্যবীর্যের বর্ণনা দিয়ে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করার জন্য তিনি ইয়াহ্ইয়াকে আহ্বান জানান এবং সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হলে তাকে পুরস্কার ও জায়গীর প্রদানের আশ্বাস দেন। উত্তরে ইয়াহ্ইয়া লিখেন, আমি এই শর্তে সন্ধি করতে রাযী আছি যে, হারূনুর রশীদ নিজ হাতে সন্ধিপত্র লিখবেন। এরপর তার উপর ফকীহ্ ও কাযীবৃন্দ এবং বনূ হাশিমের গণ্যমান্য ব্যক্তিবৃন্দ সাক্ষী হিসাবে স্বাক্ষর দান করবেন। ফযল ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আগাগোড়া পরিস্থিতি সম্পর্কে হারূনুর রশীদকে অবহিত করেন। এতে হারূন খুবই সন্তুষ্ট হন এবং নিজ হাতে সন্ধিপত্র লিখে উল্লিখিত শর্তানুযায়ী তাতে বিভিন্ন জনের দস্তখত নিয়ে বেশ কিছু উপহার-উপঢৌকনসহ ফযল ইব্ন ইয়াহ্ইয়ার মাধ্যমে তা ইয়াহ্ইয়ার কাছে পাঠিয়ে দেন। এরপর ইয়াহ্ইয়া এবং ফযল উভয়ই বাগদাদ অভিমুখে রওয়ানা হন। এই সন্ধি উপলক্ষে দায়লামের শাসনকর্তাকেও যিনি আপন দুর্গে ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবদুল্লাহকে অবস্থান করার সুযোগ দিয়েছিলেন এবং তাকে সর্বপ্রকার সাহায্য-সহযোগিতাও প্রদান করেছিলেন— দশ লক্ষ দিরহাম প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল এই শর্তে যে, তিনি ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবদুল্লাহকে সন্ধি করতে অনুপ্রাণিত করবেন। অতএব এই অর্থও (সংশ্লিষ্ট) শাসনকর্তার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ইয়াহ্ইয়া এবং ফযল বাগদাদে পৌঁছলে হারূন ইয়াহ্ইয়ার প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করেন, সহৃদয়তার সাথে তাকে গ্রহণ করেন এবং অনেক উপহারসামগ্রীসহ তাকে মূল্যবান জায়গীরও প্রদান করেন। নির্বিঘ্নে এই কাজ আনজাম দেওয়ায় খলীফার কাছে ফযল ইব্ন ইয়াহ্ইয়ার মর্যাদাও বৃদ্ধি পায়। এরপর ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবদুল্লাহর দেখাশুনার দায়িত্ব ফযল ইব্ন ইয়াহ্ইয়ার হাতে অর্পণ করা হয়। অতএব তিনি ফযল ইব্ন ইয়াহ্ইয়ার দেখাশুনায় বাগদাদেই অত্যন্ত আরাম-আয়েশের মধ্য দিয়ে জীবন যাপন করতে থাকেন।

১৭৬ হিজরীতে (৭৯২-৯৩ খ্রি) হারূনুর রশীদের কাছে সংবাদ পৌঁছে যে, মিসরের গভর্নর মূসা ইব্ন ঈসা 'আলাবী দাওয়াতে' প্রভাবিত হয়ে পড়েছেন এবং আব্বাসী খিলাফতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন। হারূন মিসরের গভর্নর পদের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব জা'ফর ইব্ন ইয়াহ্ইয়ার

হাতে অর্পণ করেন। জা'ফর মিসরের গভর্নর পদের জন্য উমর ইব্‌ন মিহ্‌রান (পৈতৃক নাম আবূ হাফসী)কে মনোনীত করেন। কিন্তু উমর এই শর্তে সে পদ গ্রহণ করেন যে, যখন তিনি মিসরের প্রশাসনিক ব্যবস্থা সংগঠিত করে ফেলবেন এবং সেখানকার যাবতীয় কর আদায় করে তা সরকারী কোষাগারে দাখিল করে নেবেন তখন সেখান থেকে ফিরে আসার সম্পূর্ণ এখতিয়ার তার থাকবে। অন্য কথায়, তিনি যখন ইচ্ছা মিসর থেকে চলে আসতে পারবেন, এজন্য পূর্বাহ্নে খলীফার অনুমতি গ্রহণের কোন প্রয়োজন হবে না। হারূনুর রশীদ এই শর্ত গ্রহণ করে উমর ইব্‌ন মিহ্‌রানকে মিসরের গভর্নর নিয়োগ করেন। উমর মিসরে পৌঁছে মূসা ইব্‌ন ঈসার কাছ থেকে গভর্নরের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং কয়েক দিনের মধ্যেই জনসাধারণের কাছ থেকে সমগ্র বকেয়া কর আদায় করে বাগদাদ ফিরে আসেন। এবার হারূন ইসহাক ইব্‌ন সুলায়মানকে গভর্নর নিয়োগ করে মিসরে প্রেরণ করেন।

সিরিয়ার বিশৃঙ্খলা দমন

সিরিয়ায় সাফ্‌ফারিয়া ও ইয়ামানিয়া এই দুই গোত্রের মধ্যে যে গৃহযুদ্ধ চলছিল তা হিজরী ১৭৬ সনে (৭৯২-৯৩ খ্রি) ভয়ানক আকার ধারণ করে। দামিশকের গভর্নর আবদুস সামাদ ইব্‌ন আলী এই গৃহযুদ্ধ দমনে ব্যর্থ হওয়ায় হারূনুর রশীদ তাকে পদচ্যুত করে তার স্থলে ইবরাহীম ইব্‌ন সালিহকে সেখানকার গভর্নর নিয়োগ করেন। তিনি গোপনে ইয়ামানিয়া গোত্রকে সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেন। এর ফলে দীর্ঘদিন পর্যন্ত ঐ বিশৃঙ্খলা প্রশমিত হয়নি এবং এই সুযোগে 'মুদার' গোত্রের লোকেরা দামিশক কবজা করে নিয়ে বেশ কয়েক বারই দামিশকের গভর্নরকে বেদখল করে। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে হারূনুর রশীদ জা'ফর ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া বারমাকীকে সিরিয়ায় প্রেরণ করেন এবং হিজরী ১৮০ সনে (৭৯৬-৯৭ খ্রি) তিনি ঐ বিশৃঙ্খলা দমন করে রাজধানী বাগদাদে ফিরে আসেন।

ঐ বছরই অর্থাৎ হিজরী ১৭৬ সনে (৭৯২-৯৩ খ্রি) 'সায়িফা' (গ্রীষ্মকালীন) বাহিনীর অধিনায়ক আবদুর রহমান ইব্‌ন আবদুল মালিক ইব্‌ন সালিহ্ রোমান শহর 'দীসা' দখল করেন এবং রোমান বাহিনীকে কয়েক দফা পরাজিত করেন।

আত্তাব ইব্‌ন সুফ্‌য়ানের বিদ্রোহ

১৭৭ হিজরীতে (৭৯৩-৯৪ খ্রি) আত্তাব ইব্‌ন সুফ্‌য়ান আযদী বিদ্রোহ ঘোষণা করে মাওসিল ও তার পার্শ্ববর্তী রাজ্যসমূহ দখল করে নেন এবং তথাকার গভর্নরকে অবরুদ্ধ অবস্থায় রেখে চার হাজার যোদ্ধা নিয়ে কর আদায় করতে থাকেন। এই অবস্থার কথা জানতে পেরে খোদ হারূন বাগদাদ থেকে সৈন্য নিয়ে মাওসিল অভিমুকে রওয়ানা হন। আত্তাব তখন আর্মেনিয়ায় পালিয়ে যান। হারূন মাওসিলের নগরপ্রাচীর ভেঙ্গে ফেলেন। এরপর যখন শুনতে পান যে, মিসর এবং খুরাসানেও বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে তখন সঙ্গে সঙ্গে বাগদাদে ফিরে আসেন। আত্তাব আর্মেনিয়া থেকে রিক্কা শহরে ফিরে আসেন এবং সেখানে অধিবাস গ্রহণ করে নিভৃতে জীবন যাপন করতে থাকেন। ঐ বছরই আবদুর রায্‌যাক ইব্‌ন হুমায়দ সালাবী রোমানদের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করেন এবং তাদেরকে ঠিকমত শায়েস্তা করে নিজের কর্মস্থলে ফিরে আসেন।

মিসরে বিদ্রোহ

১৭৭ হিজরীর (৭৯৪ খ্রিস্টাব্দের প্রথম ভাগে) শেষ দিকে বাগদাদে সংবাদ পৌঁছে যে, মিসরে কোন একটি গোত্র বিদ্রোহ ঘোষণার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তথাকার গভর্নর ইসহাক ইব্ন সুলায়মান সেই বিদ্রোহ দমনের চেষ্টা করেন। কিন্তু ১৭৮ হিজরীতে (৭৯৪-৯৫ খ্রি) এক মুখোমুখি সংঘর্ষের পর বিদ্রোহীরা ইসহাককে পরাজিত করে। ঐ সময়ে হারছামা ইব্ন আমীন ফিলিস্তীনের কর্মকর্তা ছিলেন। হারূনুর রশীদ হারছামাকে লিখেন ঃ তুমি তোমার বাহিনী নিয়ে মিসরে যাও এবং সেখানকার বিদ্রোহ দমন কর। হারছামা মিসর গিয়ে সেখানকার বিদ্রোহীদের পরাজিত ও আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য করেন। হারূনুর রশীদ তাকে মিসরের গভর্নর নিয়োগ করেন। কিন্তু মাত্র এক মাস পর তাকে বরখাস্ত করে তার স্থলে আবদুল মালিক ইব্ন সালিহ্কে সেখানকার গভর্নর নিয়োগ করেন।

খারিজীদের বিশৃঙ্খলা

যে যুগে মিসর, সিরিয়া, মাওসিল প্রভৃতি স্থানে বিদ্রোহ চলছিল তখন কায়স ইব্ন সালাবার মুক্তদাস হুসাইন খারিজীও বিদ্রোহ ঘোষণা করে খুরাসানের অভ্যন্তরে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। তথাকার গভর্নর খালিদ ইব্ন আতা কিনদী দাউদ ইব্ন ইয়াযীদকে সীস্তানের কর্মকর্তা নিয়োগ করেছিলেন। তিনি উছমান ইব্ন আম্মারাকে হুসাইন খারিজীর মুকাবিলায় প্রেরণ করেন। কিন্তু হুসাইন মাত্র ছয়শ সৈন্য নিয়ে বার হাজার সৈন্যের ঐ বাহিনীকে পরাজিত করে এবং সেখানে উপর্যুপরি অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে থাকে। বার বার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কিন্তু প্রতি যুদ্ধেই হুসাইন খুরাসানস্থ সরকারী বাহিনীকে পরাজিত করে। শেষ পর্যন্ত ১৭৮ হিজরীতে হুসাইন খারিজী নিহত হলে খুরাসানে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে আসে। ঐ বছরই অর্থাৎ ১৭৮ হিজরীতে (৭৯৪-৯৫ খ্রি) যুফার ইব্ন আসিম রোমানদের উপর হামলা চালান।

১৭৯ হিজরীর রমযান (৭৯৬ খ্রি ডিসেম্বর) মাসে খলীফা হারূনুর রশীদ উমরা পালন করেন এবং একই ইহরামে হজ্জও আদায় করেন। তিনি মক্কা থেকে আরাফা পর্যন্ত দীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটে অতিক্রম করেন। ঐ বছরের ৭ই রবিউস সানী হযরত ইমাম মালিক ইব্ন আনাস (র) ৮৪ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন এবং একই বছরে অর্থাৎ ১৭৯ হিজরী সনের যিলকদ (৭৯৬ খ্রি ফেব্রুয়ারি) মাসে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর পুত্র হাম্মাদও ইনতিকাল করেন।

১৮০ হিজরীতে (৭৯৬-৯৭ খ্রি) তুর্কী ও মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য মাওরাউন নাহরে সেনাবাহিনী প্রেরণ করা হয় এবং খুরাসানের গভর্নর পদে নিয়োগ করা হয় আলী ইব্ন ঈসা ইব্ন হাসানকে। এই নিযুক্তি হারূনুর রশীদের প্রধানমন্ত্রী ইয়াহ্ইয়া ইব্ন খালিদ বারমাকের মনঃপূত হয়নি। তিনি আলী ইব্ন ঈসার কঠোর স্বভাবের প্রতি হারূনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কিন্তু তিনি এ ক্ষেত্রে ইয়াহ্ইয়ার কোন পরামর্শ গ্রহণ না করে তাকে খুরাসানে প্রেরণ করেন। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন খালিদ স্বভাবতই এ কথা পছন্দ করছিলেন না যে, একদা তার পূর্বপুরুষদের বাসভূমি খুরাসানের অধিবাসীদের উপর কোন জুলুম-নির্যাতন চালানো হোক। অপর দিকে খুরাসানের নিত্যদিনের বিদ্রোহ হারূনকে বাধ্য করেছিল যেন তিনি কোন কঠোর স্বভাবের লোককে সেখানকার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। ঐ বছরই অর্থাৎ ১৮০ হিজরীতে (৭৯৬-৯৭ খ্রি) ভীষণ ভূমিকম্প হয়। ফলে আলেকজান্দ্রিয়ার মীনার ভেঙ্গে পড়ে। ঐ বছরই

স্পেনের সুলতান হিশাম ইব্ন আবদুল মালিকের মৃত্যু হয় এবং তার পুত্র সুলতান আল-হাকাম সিংহাসনে আরোহণ করেন। ঐ বছরই আরবী ব্যাকরণ (নাহু) শাস্ত্রের ইমাম আবূ বাশার আমর ইব্ন উছমান মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। তাঁর উপাধি ছিল সীবাওয়ায়হ। তিনি পারস্য অঞ্চলের 'বায়যা' নগরীর অধিবাসী ছিলেন।

১৮১ হিজরীতে (৭৯৭-৯৮ খ্রি) স্বয়ং খলীফা হারূনুর রশীদ রোমানদের উপর হামলা চালান এবং অস্ত্রবলে 'সাফসাফ' দুর্গ দখল করেন। ঐ বছর আবদুল মালিক ইব্ন সালিহ্ আংকারা পর্যন্ত এলাকা জয় করেন। ঐ বছরই রোমান ও মুসলমানদের মধ্যে বন্দী বিনিময়ের ব্যাপারে একটি সন্ধি হয়। এটাই ছিল রোমানদের সাথে আব্বাসী শাসকদের সর্বপ্রথম সন্ধি। তারসূস থেকে ১২ ফারাসাং দূরত্বে অবস্থিত লামস নামক স্থানে উলামা, সালতানাতের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, ত্রিশ হাজার সৈন্য এবং সেই সাথে সীমান্তের অধিবাসীবৃন্দ একত্রিত হয়। তারসূসের শাসনকর্তাও আসেন। এরপর হারূনুর রশীদের পুত্র কাসিম ওরফে মু'তামিনের ব্যবস্থাপনায় একটি জাঁকজমকপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। রোমানরা মুসলমান কয়েদীদেরকে, যাদের সংখ্যা ছিল তিন হাজার সাতশ, মজলিসে এনে হাযির করে। মু'তামিন তাদের বিনিময়ে ঈসায়ী বন্দীদেরকে ফেরত দেন। ঐ বছরই হারছামা ইব্ন আইউন আফ্রিকিয়ার গভর্নরের পদে ইস্তফা দিয়ে বাগদাদে চলে আসেন। হারূনুর রশীদ তাকে তার রাজকীয় বাহিনীর অধিনায়ক এবং মুহাম্মদ ইব্ন মুকাতিল ইব্ন হাকীমকে আফ্রিকিয়ার গভর্নর নিয়োগ করেন।

মামূনের অলীআহ্দী

উপরে উল্লিখিত হয়েছে যে, হারূনুর রশীদ ১৭৫ হিজরীতে (৭৯১-৯২ খ্রি) আপন পুত্র আমীন ইব্ন বেগম যুবায়দাকে অলীআহ্দ নিয়োগ করেন। ঐ সময় আমীন ও মামূন উভয়েরই বয়স ছিল পাঁচ বছর। ইতিপূর্বে কোন মুসলমান শাসক এত অল্প বয়স্ক কাউকে অলীআহ্দ নিয়োগ করেননি। এবার ১৮২ হিজরীতে (৭৯৮-৯৯ খ্রি) হারূন নিজের অপর পুত্র মামূন ইব্ন মারাজিলকে (যখন তাঁর বয়স বার বছর) দ্বিতীয় অলীআহ্দ নিয়োগ করেন। অর্থাৎ জনসাধারণের কাছ থেকে তিনি এই মর্মে বায়আত গ্রহণ করেন যে, আমীনের পর মামূন খিলাফতের অধিকারী হবে। মামূনের প্রকৃত নাম আবদুল্লাহ্ এবং আমীনের প্রকৃত নাম মুহাম্মদ। হারূন মুহাম্মদকে ১৭৫ হিজরীতে অলীআহ্দ নিয়োগ করাকালে তাঁর উপাধি দেন আমীন। এবার যখন আবদুল্লাহকে দ্বিতীয় অলীআহ্দ নিয়োগ করেন তখন তাঁর উপাধি দেন মামূন এবং তাঁকে খুরাসান ও এতদসংশ্লিষ্ট এলাকা তথা হামাদান পর্যন্ত সমগ্র এলাকার গভর্নর নিয়োগ করেন। এরপর হারূন খুরাসানের গভর্নর ঈসা ইব্ন আলীকে ডেকে পাঠিয়ে তাকে মামূনের পক্ষ থেকে খুরাসানের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। ঐ বছরই অর্থাৎ ১৮২ হিজরীর ২৭শে রজব (৭৯৯ খ্রি সেপ্টেম্বর) মাসে ইমাম আবূ হানীফার স্বনামধন্য শাগরিদ বাগদাদের প্রধান বিচারপতি ইয়াকূব ওরফে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ইনতিকাল করেন।

ওয়াহ্ব ইব্ন আবদুল্লাহ্ নাসাঈ ও হামযা খারিজীর বিদ্রোহ

ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, ঈসা ইব্ন আলী মামুনূর রশীদের অলীআহ্দীর অনুষ্ঠান উপলক্ষে যখন বাগদাদে আসেন তখন আবূ খাসীব ওয়াহ্ব ইব্ন আবদুল্লাহ নাসাঈ বিদ্রোহ

ঘোষণা করে খুরাসানে লুটপাট শুরু করে দেন। ঈসা ইব্ন আলী খুরাসানে ফিরে গিয়ে তার পশ্চাদ্ধাবন করলে ওয়াহ্‌ব ভীত হয়ে নিরাপত্তা প্রার্থনা করেন। শেষ পর্যন্ত তাকে নিরাপত্তা প্রদান করা হয় এবং তিনি নিভৃত জীবন যাপন করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হন। এ ঘটনার পরই সংবাদ প্রচারিত হয় যে, হামযা ইব্ন আতরাক খারিজী বাদগীস অঞ্চলে বিদ্রোহ ঘোষণা করে শহরের পর শহর দখল করে নিচ্ছে। আমরাবিয়া ইব্ন ইয়াযীদ তখন হেরাতের শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি ছয় হাজার অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে হামযার উপর আক্রমণ পরিচালনা করেন। ঐ সংঘর্ষে আমরাবিয়া পরাজিত হয়। হামযা তার অনেক অশ্বারোহীকে নির্মমভাবে হত্যা করে। ঐ সংঘর্ষে আমরাবিয়াও ঘোড়ার খুরের আঘাতে মারা যায়। এই খবর শুনে আলী ইব্ন ঈসা আপন পুত্র হাসানকে দশ হাজার সৈন্যসহ হামযার মুকাবিলায় প্রেরণ করেন। কিন্তু তিনি হামযার মুকাবিলা করেন নি। এরপর আলী আপন দ্বিতীয় পুত্র ঈসাকে প্রেরণ করেন। উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয় এবং তাতে হামযা ঈসা ইব্ন আলীকে পরাজিত করে। আলী ইব্ন ঈসা পুনরায় ঈসা ইব্ন আলীকে আর একটি সজীব বাহিনী দিয়ে হামযার মুকাবিলায় প্রেরণ করেন। নিশাপুর নামক স্থানে উভয় বাহিনীর মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং তাতে হামযা পরাজিত হয়ে কাহকিস্থানের দিকে চলে যায়। তখন ঈসা ইব্ন আলী আদাক, জবায়ন এবং ঐ সমস্ত পল্লী এলাকায় আপন সৈন্যদেরকে প্রেরণ করেন, যেখানকার লোকেরা হামযাকে সাহায্য করেছিল। সৈন্যরা অত্যন্ত নির্দয়ভাবে খারিজীদেরকে বেছে বেছে হত্যা করে এবং এতে প্রায় ত্রিশ হাজার লোক নিহত হয়। এরপর ঈসা মালে গনীমত একত্র করার জন্য আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস নাসাফীকে যারানজ নামক স্থানে রেখে স্বয়ং কাবুল ও যাবিলিস্তানের দিকে এগিয়ে যান। আবূ খাসীব ওয়াহ্‌ব ইব্ন আবদুল্লাহ, যিনি নিরাপত্তা প্রার্থনা করে নাসা শহরে নিভৃত জীবন যাপন করেছিলেন, এবার শূন্য মাঠ পেয়ে তার অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন এবং বিপুল সংখ্যক বিদ্রোহীকে সমবেত করে নাসা, তূস, আজীওয়ার্দ ও নিশাপুর দখল করে নেন। অপরদিকে হামযা আপন ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে গ্রাম-পল্লী ও রাস্তাঘাটে লুটপাট চালাতে থাকে। মোটকথা, হামযা এবং ওয়াহ্‌ব চার বছর পর্যন্ত আলী ইব্ন ঈসা এবং তার সঙ্গীদেরকে শান্তিতে থাকতে দেয়নি। ঐ সময়কালে আবূ খাসীব কখনো কখনো মার্ভও অবরোধ করেন। শেষ পর্যন্ত ১৮৬ হিজরীতে (৮০২ খ্রি) ওয়াহ্‌বকে হত্যা করার পর খুরাসানে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে আসে, তবে আলী ইব্ন ঈসা খুরাসানবাসীদের উপর বাড়াবাড়ি শুরু করে দেন।

ঐ বছরই হিজরী ১৮৬ হিজরী সনে আবদুর রহমান ইব্ন আবদুল মালিক ইব্ন সালিহ্ 'সায়েফা' বাহিনীর সাথে রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। ঐ সময়ে সম্রাট কনস্টানটাইনের মৃত্যু হলে রোমানরা তার মাতা রানী রুইবীকে 'আতশা' উপাধি দিয়ে সিংহাসনে বসায়। কনসটান্টিনোপলের রাজদরবারে হারূনুর রশীদের যে প্রভাব ইতিপূর্বে পড়েছিল তারই ফলে ঐ রোমান রানী মুসলিম অধিনায়কদের কাছে পয়গামের পর পয়গাম পাঠিয়ে তাদেরকে তার সাথে সন্ধি স্থাপনে অনুপ্রাণিত করেন। এটা ছিল সেই যুগ, যখন ফ্রান্সের সম্রাট শার্লামেন ইতালী জয় করে এবং পশ্চিম রূমের উপর নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে কনসটান্টিনোপল সাম্রাজ্যের উপর তার আগ্রাসী থাবা বিস্তার করতে চাচ্ছিলেন। তাই ঐ রোমান রানী অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে জিয্‌য়া প্রদানে সম্মত হয়ে মুসলমানদের সাথে সন্ধি করেন এবং নিজেকে পশ্চিমা হামলা মুকাবিলা করার মত যোগ্য করে তোলেন।

আর্মেনিয়া প্রদেশে বিশৃঙ্খলা

১৮৩ হিজরীতে (৭৯২-৯৩ খ্রি) খাযার-এর বাদশা খাকানের মেয়েকে ফযল ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়ার কাছে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু বারাআ নামক স্থানে পৌঁছার পর ঘটনাচক্রে মেয়েটি মারা যায়। অথচ তার সঙ্গীরা সেখান থেকে খাযায় ফিরে গিয়ে তার পিতাকে বলে, মুসলমানরা চক্রান্ত করে তাকে মেরে ফেলেছে। খাকান এ কথা শুনে একটি বিরাট বাহিনী গঠন করেন এবং ইসলামী রাষ্ট্রের উপর আক্রমণ পরিচালনার উদ্দেশ্যে 'বাবুল আবওয়ারে' বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। আর্মেনিয়া প্রদেশের কর্মকর্তা সাঈদ ইব্‌ন মুসলিম তার সাথে মুকাবিলা করতে পারেননি। খাকান আর্মেনিয়া প্রদেশে প্রায় একলক্ষ মুসলমানকে হত্যা করেন এবং স্ত্রীলোক ও শিশুসহ হাজার হাজার মুসলমানকে ধরে নিয়ে তাদের উপর এমন অমানুষিক নির্যাতন চালান, যার বিবরণ শুনলেও শরীর শিউরে ওঠে। মুসলিম বিশ্বের ইতিহাসে এটি একটি হৃদয়বিদারক ঘটনা। খলীফা হারূনুর রশীদ ইয়াযীদ ইব্‌ন সাঈদকে আর্মেনিয়া প্রদেশের গভর্নর নিয়োগ করেন। ইতিপূর্বে তিনি আযারবায়জান প্রদেশের গভর্নর ছিলেন। এবার আর্মেনিয়া প্রদেশের শাসনভারও তার উপর ন্যস্ত করা হয়। অপরদিকে খুযায়মা ইব্‌ন খাযিমকে আর্মেনিয়াবাসীদের সাহায্যের জন্য নাসিবাইনে মোতায়েন করা হয়। ইয়াযীদ ও খুযায়মার বাহিনী আর্মেনিয়া সীমান্তে প্রবেশ করতেই খাযারবাসীরা আর্মেনিয়া ছেড়ে পালিয়ে যায় এবং মুসলিম বাহিনী সেখানে পুনরায় নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে।

হারূনুর রশীদ ইমাম মূসা কাযিম ইব্‌ন ইমাম জা'ফর সাদিককে সতর্কতামূলকভাবে বাগদাদে বসবাস করতে বাধ্য করেছিলেন। আলাবীদের বিদ্রোহের ভয়ে তিনি তাঁকে বাগদাদ থেকে বের হয়ে যাবার অনুমতি দিতেন না। ঐ বছর অর্থাৎ ১৮৩ হিজরী ২৫শে রজব (৮০০ খ্রি আগস্ট) শুক্রবার ইমাম মূসা কাযিম ইনতিকাল করেন এবং বাগদাদেই সমাধিস্থ হন। শিয়ারা তাকে তাদের সপ্তম ইমাম বলে মান্য করে। বাগদাদে তাঁর এবং ইমাম মুহাম্মদ তাকীর কবর 'কাযিমায়ন' নামে খ্যাত একটি গম্বুজের নিচে রয়েছে।

ইবরাহীম ইব্‌ন আগলাব ও আব্বাসীয়া নগরী

উপরে উল্লিখিত হয়েছে যে, হারছামা ইব্‌ন আইউন ইফ্রিকিয়া প্রদেশের গভর্নর পদ থেকে ইস্তফাদানের পর হারূনুর রশীদ তার স্থলে মুহাম্মদ ইব্‌ন মুকাতিল ইব্‌ন হাকীমকে সেখানকার গভর্নর নিয়োগ করেন। তিনি ছিলেন হারূনুর রশীদের দুধ ভাই। তিনি আপন কর্মস্থলে গিয়ে ইফ্রিকিয়াবাসীদের বিদ্রোহ দমন করেন। ইফ্রিকিয়া থেকে হারছামা ইব্‌ন আইউনের চলে আসার সাথে সাথে এই বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। মুহাম্মদ ইব্‌ন মুকাতিল অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও যোগ্যতার সাথে ইফ্রিকিয়াবাসীদের আনুগত্য অর্জন করেন। প্রকৃতপক্ষে ঐ সমস্ত লোক তার শক্তি ও প্রভাব লক্ষ্য করে বাহ্যিকভাবে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করেছিল। ভিতরে ভিতরে তারা তাঁর অবাধ্য ছিল এবং তাঁর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করত। তাদের এই অবাধ্যতার একটি বিশেষ কারণ ছিল এই যে, তারা 'যার' রাজ্যের গভর্নর ইবরাহীম ইব্‌ন আগলাবের কাছ থেকে সব সময় কুপরামর্শ গ্রহণ করত। বিদ্রোহীদের নেতার সাথে ইবরাহীম ইব্‌ন আগলাবের গোপন যোগাযোগ ছিল এবং তিনি তাদেরকে বিভিন্নভাবে সাহায্যও করতেন। সব সময় বিদ্রোহ লেগে

থাকার কারণে ইফ্রিকিয়া প্রদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা এই পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, শুধু সেখানকার প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য মিসরের অর্থ ভাণ্ডার থেকে বার্ষিক একলক্ষ দিরহাম ঋণ গ্রহণ করতে হতো। অন্যথায় সেখানে ইসলামী হুকুমত টিকিয়ে রাখা সম্ভব ছিল না। অন্যকথায় বলতে গেলে, ইফ্রিকিয়া প্রদেশ থেকে বার্ষিক খারাজ পাওয়া তো দূরের কথা, অন্য এলাকার খারাজ থেকেই সেখানে বার্ষিক একলক্ষ দিরহাম ব্যয় করতে হতো। মুহাম্মদ ইব্‌ন মুকাতিল যদিও সেখানে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, কিন্তু মিসরের কোষাগার থেকে যে অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হতো তা পরবর্তীতেও যথারীতি অব্যাহত থাকে। এবার ইবরাহীম ইব্‌ন আগলাব আবেদন জানান, আমাকে ইফ্রিকিয়া প্রদেশের গভর্নর নিয়োগ করুন। তাহলে আমি বার্ষিক একলক্ষ দিরহাম মিসরের খারাজ থেকে গ্রহণ করব না, বরং খারাজ স্বরূপ সেখান থেকে বার্ষিক চার লক্ষ দিরহাম খলীফার কোষাগারে পাঠাতেও সক্ষম হব। হারূনুর রশীদ এ ব্যাপারে তার উপদেষ্টাদের সাথে পরামর্শ করেন। তখন হারছামা ইব্‌ন আইউন অভিমত প্রকাশ করেন যে, ইবরাহীমকে ইফ্রিকিয়ার গভর্নর নিয়োগের মধ্যে অসুবিধার কিছু নেই। অতএব ১৮৪ হিজরীতে (৮০০ খ্রি) হারূনুর রশীদ তার কাছে গভর্নরের নিয়োগপত্র পাঠিয়ে দেন। ইবরাহীম ইফ্রিকিয়া পৌঁছতেই সেখানকার ঐ সমস্ত বিদ্রোহী নেতাকে বেছে বেছে গ্রেফতার করেন, যাদের সাথে তার খুব জানাশোনা ও ঘনিষ্ঠতা ছিল। এরপর তাদেরকে বাগদাদে পাঠিয়ে দেন। ফলে সেখানকার গণ্ডগোল একেবারে থেমে যায়। এরপর তিনি কায়রাওয়ানের কাছে আব্বাসীয়া নামে একটি নতুন শহরের পত্তন করেন এবং সেটাকেই রাজধানী শহর ঘোষণা দেন। এরপর সেখানেই তাঁর বংশধররা দীর্ঘদিন পর্যন্ত স্বাধীনভাবে রাজত্ব করে। এ সম্পর্কে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

ঐ বছরই অর্থাৎ ১৮৪ হিজরীতে (৮০০ খ্রি) হারূনুর রশীদ হাম্মাদ বার্বারীকে ইয়ামান ও মক্কা, দাঊদ ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন হাতিমকে সিন্ধুর, ইয়াহ্ইয়া হুরায়শকে কুহিস্তানের এবং মিহরাবিয়া রাযীকে তাবারিস্তানের শাসনকর্তৃত্ব প্রদান করেন। ১৮৫ হিজরীতে (৮০১ খ্রি) তাবারিস্তানবাসীরা আক্রমণ চালিয়ে মিহরাবিয়াকে হত্যা করলে আবদুল্লাহ ইব্‌ন সাঈদ হুরায়সীকে সেখানকার গভর্নর নিয়োগ করা হয়। ঐ বছরই আযারবায়জান ও আর্মেনিয়ার গভর্নর ইনতিকাল করলে তার স্থলে তারই পুত্র আসাদকে সেখানকার গভর্নর নিয়োগ করা হয়।

১৮৬ হিজরীতে (৮০২ খ্রি) যেমন ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে, আলী ইব্‌ন ঈসা খুরাসানের যাবতীয় বিশৃঙ্খলা দূর করে সেখানে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। ঐ সময়ে ওয়াহব ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ নাসাঈ মারা যান। আলী ইব্‌ন ঈসা বেশিদিন স্বস্তিতে কাটাতে পারেননি। কেননা খুরাসানবাসীরা তার বিরুদ্ধে দরবারে খিলাফতে প্রচুর অভিযোগপত্র পাঠাতে থাকে। তিনি খুরাসানের গভর্নর পদে থাকুন, এটা ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন খালিদ পছন্দ করতেন না। এ কারণেই ইয়াহ্ইয়ার দুই পুত্র মূসা ও মুহাম্মদ (খুরাসানবাসীদের উপর যাদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল) ওয়াহ্ব ইবন আবদুল্লাহ্ এবং হামযা খারিজীকে বিদ্রোহ করার জন্য প্ররোচিত করেন এবং তাদেরই গোপন চেষ্টার ফলে খুরাসানে কয়েক বছর পর্যন্ত অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা বিরাজ করে। ঐ সময় ইয়াহ্ইয়া ও জা'ফর খলীফা হারূনুর রশীদকে পরামর্শ দেন, যেন তিনি আলী

ইব্ন ঈসাকে খুরাসান থেকে অপসারণ করেন। কিন্তু হারূনুর রশীদ তাঁদের কথায় কান দেননি। এবার যখন খুরাসানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বন্ধ হয় তখন শুরু হয় কাগজী যুদ্ধ। অর্থাৎ বারমাকীদের আন্দোলনের ফলে খুরাসানীরা আলীর বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগপত্র খলীফার দরবারে পাঠাতে শুরু করে। যখন এই সব অভিযোগপত্রের সংখ্যা সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত এ অভিযোগও আসতে থাকে যে, আলী শুধু জনসাধারণের উপর জুলুম ও বাড়াবাড়ি করছেন না, বরং খিলাফতের আসন উলটপালট করে দেওয়ার ষড়যন্ত্রেও লিপ্ত রয়েছেন– তখন হারূনুর রশীদ বাধ্য হয়ে বাগদাদ থেকে রওয়ানা হয়ে 'রায়' নামক স্থানে গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করেন। আলী ইব্ন ঈসা খলীফার আগমন-সংবাদ পেয়ে প্রচুর উপঢৌকন নিয়ে মার্ভ থেকে রায়-এ আসেন এবং খলীফার খিদমতে হাযির হয়ে তার কাছে যথারীতি স্বীয় আনুগত্য প্রকাশ করেন। হারূন সন্তুষ্ট হয়ে তাকে খুরাসানের গভর্নর নিয়োগ করেন এবং সেই সাথে রায়, তাবারিস্থানে, নিহাওয়ান, তূমাস ওহামাদানের শাসনকর্তৃত্বও তার হাতে অর্পণ করেন।

মূতামিনের অলীআহ্দী

১৮৬ হিজরী (৮০২ খ্রি) হারূনুর রশীদ আপন তৃতীয় পুত্র কাসিমকে তৃতীয় অলীআহ্দ নিয়োগ করেন। অর্থাৎ জনসাধারণের কাছ থেকে এই মর্মে বায়আত গ্রহণ করেন যে, মামূনের পর কাসিম খিলাফতের অধিকারী হবে। এই উপলক্ষে কাসিমকে মূ'তামিন উপাধি প্রদান করা হয়। তবে মুতামিনকে অলীআহ্দ নিয়োগ করার পর বায়আত গ্রহণকালে এই শর্ত আরোপ করা হয় যে, যদি অন্যথায় যোগ্য হয় তবেই মামূনের স্থলাভিষিক্ত হবে– অন্যথায় মামূনের এই অধিকার থাকবে যে, সে মূতামিনকে অলীআহদী থেকে বঞ্চিত করে আপন পছন্দ মত যে কোন লোককে তার অলীআহ্দ নিয়োগ করবে। হারূনুর রশীদ প্রথম অলীআহ্দ অর্থাৎ আমীনকে ইরাক, সিরিয়া ও আরব দেশগুলোর শাসনকর্তা, দ্বিতীয় অলীআহ্দ মামূনকে প্রাচ্যদেশসমূহের শাসনকর্তা এবং তৃতীয় অলীআহ্দ মূতামিনকে সাগূর দ্বীপ ও আওয়াসিম প্রদেশসমূহের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। এরপর তিনি আমীনের কাছ থেকে একটি অঙ্গীকারপত্র লিখিয়ে নেন। তাতে লেখা ছিল– 'আমি মামূনের সাথে আমার অঙ্গীকার পালন করব।' অনুরূপভাবে তিনি মামূনের কাছ থেকেও একটি অঙ্গীকার পত্র লিখিয়ে নেন। তাতে লেখা ছিল– 'আমি আমীনের সাথে আমার অঙ্গীকার পালন করব।' এরপর এই অঙ্গীকার পত্রগুলোর উপর প্রখ্যাত উলামা-মাশায়েখ, সেনাবাহিনীর অধিনায়কবৃন্দ, দরবারে খিলাফতের আমীর-ওমরাবৃন্দ এবং মক্কা ও মদীনার গণ্যমান্য ব্যক্তিবৃন্দের স্বাক্ষর নিয়ে তা কা'বাঘরে ঝুলিয়ে রাখা হয়। তিনি এই মর্মেও তাঁর পুত্রদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নেন, যে পুত্রকে তিনি যে এলাকা দিয়েছেন তা নিয়েই সে সন্তুষ্ট থাকবে এবং কখনো অন্য ভাইয়ের এলাকা দখল করার চেষ্টা করবে না। উল্লিখিত অঙ্গীকারপত্র অনুযায়ী প্রথমে আমীন খলীফা হবেন এবং মামূন তাঁর আনুগত্য স্বীকার করবেন। তবে আমীন মামূনকে ঐ সমস্ত প্রদেশ বা অঞ্চলের শাসনক্ষমতা থেকে অপসারণ করতে পারবেন না, যেগুলো হারূন তার জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আমীনের পর মামূন খলীফা হবেন এবং মামূনের পর মূতামিন। এইসব বিষয় উল্লিখিত অঙ্গীকার পত্রে পরিষ্কার ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হয় এবং তার উপর আমীন, মামূন, মুতামিন সকলেই স্বাক্ষর করেন এবং

তা কা'বাঘরে ঝুলিয়ে রাখা হয়। এভাবে পুত্রদের মধ্যে সাম্রাজ্য বণ্টন করে হারূনুর রশীদ ভবিষ্যতের খিলাফতকেন্দ্রিক ঝগড়াবিবাদ মিটিয়ে ফেলতে চেয়েছিলেন। তবে এটা তাঁর কোন বিজ্ঞতাসুলভ পদক্ষেপ ছিল না। খুব সম্ভবত সন্তানবাৎসল্যের কারণে তিনি এমন একটি পদক্ষেপ নিয়েছিলেন বা এমন একটি কর্মপন্থা গ্রহণ করেছিলেন, যার সাফল্য সম্পর্কে তিনি নিজেই সন্দেহমুক্ত ছিলেন না।

হারূনুর রশীদের স্মরণীয় একটি হজ্জ পালন

হারূনুর রশীদ হজ্জ পালনে খুব আগ্রহী ছিলেন। সাংঘাতিক কোন অসুবিধা দেখা না দিলে তিনি অবশ্যই হজ্জ পালন করতেন। ব্যক্তিগত পর্যায়ে তিনি একটি নিয়ম কড়াকড়িভাবে পালন করতেন। তা হলো, এক বছর কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা এবং অন্য বছর হজ্জ পালন করা। তাঁর মত কোন খলীফাই এত বেশি সংখ্যক হজ্জ পালন করেননি। তবে তাঁর ১৮৬ হিজরীর (৮০২ খ্রি) হজ্জটি হচ্ছে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কেননা এই হজ্জের সময় কা'বা ঘরের দেওয়ালে উল্লিখিত অঙ্গীকার পত্রটি ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। এই হজ্জ পালন শেষ করেই তিনি বারমাকী পরিবারের ক্ষমতা ধূলিসাৎ করে দেন। হারূনুর রশীদ হজ্জের নিয়তে আন্‌বার থেকে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হন। তাঁর সাথে তার তিন পুত্র আমীন, মামূন ও মূতামিন ছিলেন। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জা'ফর ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়াও তাঁর সাথে ছিলেন। হজ্জ পালন সমাপ্ত করে তিনি মদীনায় যান। তিনি মক্কা ও মদীনাবাসীদেরকে প্রচুর উপহার-উপঢৌকন প্রদান করেন। তিনি এবং তার পুত্রগণ মোট এক কোটি পাঁচ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা জনসাধারণের মধ্যে বিলি করেন। মদীনা থেকে ফিরে এসে তিনি আম্বর নামক স্থানে অবস্থান নেন এবং সেখানেই ১৮৭ হিজরীর মুহাররম (৮০৩ খ্রি জানুয়ারি) মাসের শেষ দিনে জা'ফর ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া বারমাকীকে হত্যা করেন।

বারমাকীদের পতন

হারূনুর রশীদের খিলাফতের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে আমরা হিজরী ১৮৭ সনে (৮০৩ খ্রি) পৌঁছে গেছি। এই বছরেরই প্রথম মাসে তিনি আপন মন্ত্রী জা'ফর বারমাকীকে হত্যা করেন এবং সেই সাথে তাঁর ভাই ফযল এবং পিতা ইয়াহ্‌ইয়াকে বন্দী করেন। বাদশাহ্ বা খলীফার হাতে কোন মন্ত্রীর নিহত হওয়া কোন অস্বাভাবিক বা আশ্চর্যজনক ঘটনা নয়। অনেক শাসকের ইতিহাসেই এ ধরনের ঘটনা পাওয়া যায়। বাদশাহদের কার্যকলাপ সাধারণত রক্তাক্ষরে লেখা হয়ে থাকে। কিন্তু বারমাকীদের পতন ও জা'ফর হত্যার মত মামুলী ঘটনাকে কেন্দ্র করে কোন কোন পণ্ডিতমূর্খ ঐতিহাসিক, জনসাধারণকে যেরূপ ভ্রান্তির মধ্যে ফেলেছেন তাতে প্রকৃত সত্য উদঘাটনের খাতিরে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মহান সম্রাট আওরঙ্গযেব আলমগীর ও মাহমুদ গাযনাবী সম্পর্কেও এ ধরনের নানা বানোয়াট কাহিনী গড়ে নিয়ে কোন কোন পণ্ডিতমূর্খ ঐতিহাসিক মুসলমান শাসকদের যে দুর্নাম রটনার প্রয়াস পেয়েছেন তাও নিঃসন্দেহে দুঃখজনক। যা হোক জা'ফর হত্যা ও বারমাকীদের পতন সম্পর্কে নিম্নে কিছুটা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হচ্ছে।

বারমাকী বংশ

ইরানীদের সর্বপ্রাচীন ধর্ম হচ্ছে 'মাহ্আবাদী'। এতে তারকা পূজা ছিল বেশি এবং অগ্নিপূজা ছিল কম। মাহ্আবাদের পর তাদের ধর্মকে সংস্কার করার জন্য একের পর এক অনেক সংস্কারক আসেন। এদের সকলের পর আবির্ভূত হন যরথুস্ত্র (Zarathustra)। যরথুস্ত্র যে শরীয়তের প্রচলন করেন, একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন তার মূল স্বরূপ কি। আজকাল অনুসন্ধান চালিয়ে এ সম্পর্কে যতটুকু জানা যায় তা হলো, যরথুস্ত্রের শরীয়তে অগ্নিপূজা ছিল বেশি এবং তারকাপূজা ছিল কম। যরথুস্ত্রের জীবনকালেই তার ধর্ম রাজকীয় ধর্মে পরিণত হয় এবং তা ইরানের অধিকাংশ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। বীরশ্রেষ্ঠ ইসফান্দইয়ারের জয়জয়কার সে যুগেই আফগানিস্তান ও পাঞ্জাব পর্যন্ত এই ধর্মের বিস্তৃতি ঘটায়। হিন্দুস্থানের তৎকালীন মহাপণ্ডিত 'সংগ্রাচাহ্' ও 'বিয়াসজী' বল্খে গিয়ে যরথুস্ত্রের হাতে বায়আত করেন এবং হিন্দুস্থানে ফিরে এসে অগ্নিপূজার পক্ষে প্রচারকার্য চালান, যার চিহ্ন এখনো হিন্দুদের 'হাভান' (বৈশ্বানর)-এর মধ্যে বিদ্যমান। বল্খই ছিল যরথুস্ত্র এবং তার একনিষ্ঠ শিষ্য সংসার ত্যাগী বাদশাহ্ লাহরাস্পের শেষ অবস্থানস্থল। বল্খের সাথে অগ্নি উপাসকদের ধর্মের ঠিক সেরূপ সম্পর্ক রয়েছে,যেরূপ সম্পর্ক রয়েছে বায়তুল মুকাদ্দাস বা জেরুজালেমের সাথে খ্রিস্ট ধর্মের কিংবা গয়াজীর (গয়া) সাথে বৌদ্ধ ধর্মের। দিগ্বিজয়ী আলেকজান্ডার ইসতাখর, সমরকন্দ, কাংড়া, করাচী ও বাবিলের মধ্যবর্তী ভূখণ্ড একেবারে চুরমার করে দিয়েছিলেন। আর এটাই ছিল কায়ানী বংশের অগ্নিপূজারী শাসকদের বিজিত ও অধীনস্থ ভূখণ্ড। এখানে অগ্নিপূজার বহুল প্রচলন ছিল। গ্রীকদের বিজয় অভিযান শুধু কায়ানীদের সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করেনি, অগ্নিপূজাকেই স্তব্ধ করে দেয়। শত শত বছর পর ইরানীরা গ্রীক শাসন থেকে মুক্তি লাভ করে এবং বাদশাহ প্রথম সাসান ইরানের খণ্ডিত রাজ্যসমূহকে একত্র করে পুনরায় বিরাট পারস্য সাম্রাজ্যের পত্তন করেন এবং সেখানে অগ্নিপূজার পুনরাবির্ভাব ঘটে। যরথুস্ত্রের জীবনকালেই চীনারা বল্খ রাজ্য ধ্বংস করে দিয়েছিল। কিন্তু কিছুদিন পরই তা পূর্বের জাঁকজমক পুনরায় ফিরে পায় এবং অগ্নি-উপাসকদের কিবলা তথা কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয়। আলেকজান্ডারের জয়যাত্রা বল্খের জাঁকজমক নষ্ট করে দিলেও তা ছিল দৃঢ় বিশ্বাসের অধিকারী যরথুস্ত্রীদের আশা-ভরসার স্থল। সাসানীদের শাসনামলে বল্খের জাঁকজমক পুনরায় বৃদ্ধি পায়। কাদিসিয়া ও নিহাওয়ান্দের যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলমানদের হাতে যখন সাসানী সাম্রাজ্যের দম বন্ধ হয়ে আসে তখন বল্খের অগ্নিকুণ্ডের তেজ দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। কেননা ইরানের পরাজিত সম্রাট এবং রাজদরবারের পলাতক সভাসদবৃন্দ দলে দলে বল্খ অভিমুখে রওয়ানা হন এবং বল্খের 'নওবাহার' নামক অগ্নিকুণ্ডে ভগবান 'যায়দা'-এর পূজায় আত্মনিয়োগ করেন। ঐ যুগে 'মাগ্-ই-আযম' বা অগ্নিপূজারীদের প্রধান পুরোহিত সমাজে অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তাই ইরান সম্রাটের পতন ও অসহায় অবস্থা প্রত্যক্ষ করে তিনি স্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন। তখন তার অন্তরে নিশ্চয়ই এই চিন্তা জেগেছিল যে, তিনি যে ধর্মের নেতা সে ধর্মই যখন ধ্বংসের সম্মুখীন তখন তার বংশ-মর্যাদা রক্ষা পাওয়ার তো কোন প্রশ্নই ওঠে না। অগ্নিকুণ্ডের নেতা বা মুতাওয়াল্লীকে 'মাগ' বলা হতো। আর যিনি এই

মাগদের নেতা এবং প্রদেশের সর্ববৃহৎ অগ্নিকুণ্ডের ব্যবস্থাপক ছিলেন তাকে বলা হতো 'বারমাগ'। ইরানের চারটি কেন্দ্রীয় অগ্নিকুণ্ডের একটি ছিল 'নওবাহার'। এই অগ্নিকুণ্ড ছিল সর্ববৃহৎ এবং সবচেয়ে বিখ্যাত। কেননা বল্‌খ ছিল লাহরাসপের বধ্যভূমি, যরথুস্ত্রের বাসভূমি এবং যরথুস্ত্রী ধর্মের প্রধান কেন্দ্র। এ কারণে নওবাহারের বারমাগ সম্মান ও মর্যাদার দিক দিয়ে নিশ্চয়ই সমগ্র ইরানীদের উর্ধ্বে ছিলেন।

৩১ হিজরীতে (৬৫১-৫২ খ্রি) মুসলমানদের জয়যাত্রা ইরানের প্রান্তরসমূহ পাড়ি দিয়ে এবং পাহাড়সমূহ ডিঙ্গিয়ে বল্‌খ পর্যন্ত গিয়ে পৌছে এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই অগ্নিকুণ্ডের আগুনও চিরতরে নির্বাপিত হয়, যার মধ্যে হাজার বছর ধরে অগ্নিশিখা দাউ দাউ করে জ্বলে আসছিল। সেই সাথে স্বাভাবিকভাবে অগ্নিপূজারীদের অস্তিত্বও লোপ পায়, লোপ পায় অগ্নিকুণ্ডের প্রয়োজন, বারমাগের সম্মান ও মর্যাদা এবং তার আয়-আমদানী ও আরাম-আয়েশের উপায়-অবলম্বন। এতদসত্ত্বেও 'বারমাগ'কে তার স্বীয় উপাধিতেই সম্বোধন করা হতো। বিজয়ী আরববাসীরা 'বারমাগ'কে 'বারমাক' বলত। এ ক্ষেত্রে এ কথা বলা সম্পূর্ণ ভুল যে, আরবরা নওবাহার অগ্নিকুণ্ডকে ধ্বংস করে দিয়ে অগ্নিপূজারীদের উপাসনার পথ রুদ্ধ করে দিয়েছিল এবং ইসলাম গ্রহণে তাদেরকে বাধ্য করেছিল। কেননা মুসলমানরা যদি জবরদস্তিমূলকভাবে অগ্নিপূজারীদেরকে মুসলমান বানাত তাহলে সর্বপ্রথম মুসলমান বানাত বারমাককেই। কিন্তু তারা বারমাকের উপর আদৌ কোন জোরজবরদস্তি চালায়নি বরং অগ্নিপূজারীরাই স্বধর্ম ত্যাগ করে দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে। আর তাদের এই ধর্ম বদলের ফলে মুসলমানরা বিস্ময়কর দ্রুততার সাথে দেশের পর দেশ জয় করে এগিয়ে যায়। মুসলমানদের বল্‌খ পর্যন্ত পৌছার অর্থ ছিল ইসলামও বল্‌খ পর্যন্ত পৌছা। তাই স্বাভাবিকভাবেই মুসলমানদের আগমনের সাথে সাথে বল্‌খের অগ্নিকুণ্ড নির্বাপিত হয়ে যায় এবং বারমাকের অবস্থাও শোচনীয় হয়ে দাঁড়ায়। বারমাক যেহেতু ধর্মীয় নেতা ছিলেন, তাই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন নি। কেননা এ দেশে ইসলামের আগমনের কারণেই তিনি সব দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। তাই ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি তিনি অত্যন্ত বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ছিলেন। মুসলমানদের আগমনের পর, চীন সীমান্তের মুঘল ও তুর্কী গোত্রসমূহ যারা ইরানী জাতি বা ইরানী ধর্মের সাথে কোন সম্পর্ক রাখত এবং ইরান সম্রাটের বল-বিক্রম প্রত্যক্ষ করে বল্‌খের উপর হামলা করার সাহস পেত না– বল্‌খের উপর আকস্মিক হামলা চালাতে থাকে এবং পরবর্তীতে মুসলমানদের কাছে জিয্‌য়া প্রদানের অঙ্গীকার করে বল্‌খের উপর নিজস্ব শাসন প্রতিষ্ঠা করে। এরাই পরবর্তীকালে শক্তি সঞ্চয় করে মুসলমানদের সামনে নানা অসুবিধার সৃষ্টি করে। এই মোঙ্গলরাই বল্‌খের অগ্নিপূজার যাবতীয় উপাদান নষ্ট করে দেয় এবং বারমাক পরিবারকে লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত করে একেবারে সাধারণ লোকদের সারিতে নিয়ে দাঁড় করায়। আরবরা প্রথমবার এখানে বেশিদিন থাকতে পারেনি। এমনকি নিজেদের অভ্যন্তরীণ বিরোধের কারণে তারা তাদের রাষ্ট্রের সীমান্তসমূহের দিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে পারেনি। ফলে বল্‌খ মুঘলদের শাসনাধীনে চলে যায়। তখন সেই বারমাক, যিনি নওবাহারের মাগ্ ছিলেন এবং একদা মা'জুসী সাম্রাজ্যের বিপুল ঐশ্বর্য ও জাঁকজমক প্রত্যক্ষ করেছিলেন, দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন এবং তার পুত্র বারমাকের আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে সেই উপাধিতেই সর্বত্র খ্যাতিলাভ করেছেন। এই দ্বিতীয় বারমাক নওবাহারের জাঁকজমকের যুগ দেখেন নি।

৮৬ হিজরীতে (৭০৫ খ্রি.) যখন খুরাসানের গভর্নর কুতায়বা ইব্ন মুসলিম বল্খ আক্রমণ করেন তখন সেখানকার কিছু সংখ্যক দাসীও তার কাছে বন্দী হয়ে আসে। দ্বিতীয় বারমাকের স্ত্রীও ছিলেন তাদের অন্যতম। তিনি কুতায়বা ইব্ন মুসলিমের ভাই আবদুল্লাহ্র ভাগে পড়েন। কিছুদিন পর বল্খবাসীদের সাথে সন্ধিচুক্তি সম্পন্ন হলে ঐ সমস্ত দাসী ও কয়েদীদেরকে বল্খে ফেরত পাঠানো হয়। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুসলিমও ঐ স্ত্রীলোকটিকে ফেরত দেন। বিদায়কালে স্ত্রী লোকটি আবদুল্লাহ্কে বলে, আমি তোমার সাথে সহবাসের ফলে ইতিমধ্যে গর্ভধারণ করেছি। যাহোক বারমাকের ওখানে পৌঁছার পর স্ত্রীলোকটি একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। আর ঐ পুত্র সন্তানটিই হচ্ছেন জা'ফর বারমাকীর দাদা খালিদ। এই কাহিনীটি মনগড়া হতে পারে। যাহোক, দ্বিতীয় বারমাকের ঘরে হিজরী ৮৬ অথবা ৮৭ সনে (৭০৫ অথবা ৭০৬ খ্রি.) খালিদের জন্ম হয়। ইমাম ইবরাহীম আব্বাসী যখন আবূ মুসলিম খুরাসানীকে খুরাসানের দাঈ' (খিলাফতে আব্বাসীয়ার দিকে আহ্বানকারী)-দের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথা ব্যবস্থাপক করে পাঠান তখন তিনি ৪০ বছর বয়স্ক খালিদ ইব্ন বারমাককেও আপনদলে টেনে নেন। আবূ মুসলিম খালিদ ইব্ন বারমাককে অত্যন্ত ভালবাসতেন। তিনি খালিদের প্রতিপালন ও প্রশিক্ষণের প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখতেন। আবূ মুসলিম যখন খুরাসানের জনৈক ব্যক্তিকে পাঠিয়ে আবূ সালিমা খালাল ওরফে ওযীর-ই আলে মুহাম্মদকে হত্যা করান তখন সাফ্ফাহকে লিখেন, আপনি খালিদ ইব্ন বারমাককে আপনার মন্ত্রী করে নিন। অতএব আব্বাসী বংশের প্রথম খলীফা আবদুল্লাহ্ সাফ্ফাহ্ খালিদ ইব্ন বারমাককে নিজের মন্ত্রী করে নেন। সাফ্ফাহর মৃত্যু পর্যন্ত খালিদ তাঁর মন্ত্রী পদে বহাল ছিলেন। এরপর মানসূর খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হলে তিনিও খালিদকে মন্ত্রীপদে নিয়োগ করেন। মানসূর তাঁর খিলাফতের প্রথম বছরেই আবূ মুসলিমকে (যিনি খালিদের পৃষ্ঠপোষক, শুভাকাঙ্ক্ষী ও সমমতাবলম্বী ছিলেন) হত্যা করেন।

কিন্তু এতে খালিদের চেহারায় বা চালচলনে কোনরূপ মালিন্য বা অসন্তুষ্টি লক্ষ্য করা যায়নি। খালিদ তা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে চাপা দিয়ে রেখেছিলেন। এতদ্সত্ত্বেও মানসূর সাবধানতা অবলম্বন করতে গিয়ে আবূ মুসলিমকে হত্যার চার-পাঁচ মাস পর কোন একটি বিদ্রোহ দমনের বাহানায় খালিদকে বাইরে পাঠিয়ে তার জায়গায় আবূ আইউবকে মন্ত্রীপদে নিয়োগ করেন। এতদ্সত্ত্বেও যখন খালিদের মধ্যে কোন অবাধ্যতা বা অঙ্গীকার ভঙ্গের আলামত লক্ষ্য করা গেল না তখন খলীফা মানসূর তার মত একজন বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও জ্ঞানীব্যক্তির উপর বিভিন্ন কাজের দায়দায়িত্ব অর্পণ করতে আর দ্বিধা করেননি। খালিদের পরবর্তী কার্যকলাপও ছিল সন্তোষজনক। যেহেতু খালিদ আবূ মুসলিমের মত একজন দুঃসাহসী, বিচক্ষণ ও দূরদর্শী ব্যক্তির সুযোগ্য শিষ্য ছিলেন এবং তার কাছ থেকে রাজনৈতিক ব্যাপারে হাতে-কলমে অনেক কিছু শিখেছিলেন, অধিকন্তু ইরানী জাতীয়তাবাদের প্রতি তিনি আকৃষ্ট ছিলেন এবং আবূ মুসলিমের দুঃখজনক পরিণতিও স্বচক্ষে দেখেছিলেন, তাই স্বাভাবিকভাবেই তিনি আবূ মুসলিমের প্রতি আরো বেশি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠেন, তবে মানসূরের মত চালবাজ ও ধূর্ত খলীফার কাছে নিজের আসল চেহারা লুকিয়ে রাখতেও তিনি পুরোপুরি সক্ষম হন। এ কারণেই তিনি পরবর্তীতে মুসলিম রাজ্যের শাসনকর্তার এবং মানসূরের পুত্র মাহ্দীর শিক্ষাগুরুর পদ লাভ করেন বেং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নিজের মর্যাদা ও ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ন রাখেন। এটা ছিল নিঃসন্দেহে তাঁর ও তাঁর পরিবারের জন্য আশীর্বাদতুল্য। এমনও হতে পারে যে, মাহ্দীর শিক্ষাগুরু নিযুক্ত হওয়ার জন্য তিনি নিজ থেকে চেষ্টাও করেছিলেন। মাহ্দীর খিলাফত লাভ এবং মানসূরের মৃত্যুর পরও খালিদ জীবিত

ছিলেন। তখন তার মান-মর্যাদাও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। মাহ্দীর খিলাফতকালে অর্থাৎ ১৬৩ হিজরী (৭৭৯-৮০ খ্রি.) সনে আনুমানিক ৭৭ বছর বয়সে খালিদ ইনতিকাল করেন। তার জীবনের শেষার্ধ বিভিন্ন রাষ্ট্রের ভাঙা-গড়ার দৃশ্য অবলোকন করেই কেটেছে।

তিনিও বিভিন্ন সাম্রাজ্যের ধ্বংস সাধনে ও নতুন সাম্রাজ্য গঠনে বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন পরিস্থিতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন। তার মৃত্যুকালে তার পুত্র ইয়াহ্ইয়ার বয়স ছিল ৪৫ অথবা ৫০ বছর। ইয়াহ্ইয়াও ছোটবেলা থেকে এই সব বিচিত্র কর্মকাণ্ড লক্ষ্য করে আসছিলেন। তিনি আপন পিতা থেকে তাঁর সমগ্র ধ্যান-ধারণা, আকাঙ্ক্ষা, বাসনা ও সতর্কতা-সাবধানতা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিলেন। তিনি তাঁর পূর্বপুরুষদের ইতিহাস, তাদের সম্মান-মর্যাদা এবং সেই সাথে ইরানী সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের কাহিনীও ইতিমধ্যে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে আপন পিতার কাছ থেকে শুনে নিয়েছিলেন। তিনি মনে মনে নিজেকে ইরানী জাতির প্রতিনিধি এবং নেতা বলেই ভাবতেন। অবশ্য এটাও তিনি ভালভাবে জানতেন যে, যদি তার চলার পথে সামান্য মাত্র পদস্খলন ঘটে তাহলে ইসলামী রাষ্ট্রে তিনি যে সম্মান-মর্যাদা ভোগ করছেন তা নিমিষের মধ্যে হারিয়ে যাবে এবং তিনি এক সর্বহারায় পরিণত হবেন। অপর দিকে তাঁর ও তাঁর পিতার আব্বাসী পরিবারের অভ্যন্তরীণ, এমন কি পারিবারিক ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করার সুযোগ ছিল। উপরন্তু দীর্ঘদিন পর্যন্ত আব্বাসী পরিবারের সাথে বসবাস করার ফলে সাম্রাজ্যের যে কোন বোঝা কাঁধে তুলে নেওয়ার ব্যাপারেও তাদের মনে কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব বা ভয়ভীতি ছিল না। খালিদ ইব্ন বারমাক সর্ববৃহৎ এবং সব চাইতে গভীর যে কৌশলটি অবলম্বন করেছিলেন তা হলো, তিনি হিজরী ১৬১ সনে (৭৭৭-৭৮ খ্রি.) মাহ্দীকে পরামর্শ দেন, যেন তিনি ইয়াহ্ইয়াকে হারূনুর রশীদের আতালীক তথা শিক্ষাগুরু নিয়োগ করেন। যেহেতু খালিদ মাহ্দীর আতালীক ছিলেন, তাই তিনি সানন্দে খালিদের পুত্র ইয়াহ্ইয়াকে আপন পুত্র হারূনুর রশীদের আতালীক নিয়োগ করেন। এরও অনেক পূর্বে 'রৌহ' নামক স্থানে, হারূনুর রশীদ যখন খায়যুরানের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন তখন খালিদ মাহ্দীর সাথেই বসবাস করেছিলেন। খালিদই হারূনুর রশীদকে ইয়াহ্ইয়ার স্ত্রীর এবং আপন নাতি অর্থাৎ ইয়াহ্ইয়ার পুত্র ফযলকে খায়যুরানের স্তনের দুধ পান করিয়ে ফযল এবং হারূন —এ দু'জনের মধ্যে পরস্পর দুধ ভাইয়ের সম্পর্ক পাতিয়ে দিয়েছিলেন। খালিদের এই সমস্ত কূটকৌশলের দিকে যদি সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকানো যায় তাহলে অনায়াসে বোঝা যাবে যে, খালিদ অত্যন্ত চাতুর্যের সাথে আপন পরিবারের ভবিষ্যৎ স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি এটা করছিলেন একটা বিরাট উদ্দেশ্য সামনে রেখে। আর তা হলো, আবূ মুসলিমের রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণ করে ইরানীদের হৃত গৌরব পুনরায় ফিরিয়ে আনা।

ইয়াহ্ইয়া ইব্ন খালিদের উপর হারূনের শিক্ষাগুরু ও প্রশিক্ষণের দায়িত্বও ছিল। আর এ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তিনি হারূনের উপর এত বেশি প্রভাব বিস্তার করেন যে, তিনি খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পরও তাকে 'মহান পিতা' বলে সম্বোধন করতেন এবং তার সামনে খোলামেলা কথাবার্তা বলতেও লজ্জাবোধ করতেন। খলীফা হাদীর খিলাফতকাল কোন দিক দিয়েই বারমাকী পরিবারের পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের অনুকূল ছিল না এবং হাদীর উপর ইয়াহ্ইয়ার কোন প্রভাবও খাটত না। তাই ইয়াহ্ইয়া এমন কূটকৌশল অবলম্বন করেন, যার ফলে হাদীর মা খায়যুরান তার কট্টর শত্রুতে পরিণত হন। এরপর ইয়াহ্ইয়া ও খায়যুরান উভয়ে মিলে কিছুদিনের মধ্যেই হাদীকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেন। ফলে হাদী খলীফা হিসাবে এক বছরের বেশি জীবিত থাকতে পারেননি। ইয়াহ্ইয়া নিজের স্বার্থেই যতশীঘ্র

সম্ভব হারূনকে খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ করে দেন। তাই তো দেখা যায়, হারূন খলীফা হওয়ার সাথে সাথে ইয়াহ্ইয়া ইব্ন খালিদকে আপন প্রধানমন্ত্রী এবং যাবতীয় বিষয়ের ব্যবস্থাপক নিয়োগ করেন। হারূনের মা খায়যুরানকে কোন ব্যাপারে অসন্তুষ্ট রাখবেন, ইয়াহ্ইয়া তেমন নির্বোধ ছিলেন না। তিনি প্রতিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সর্ব প্রথম খায়যুরানের পরামর্শ চাইতেন। কিছুদিন পর খায়যুরানের মৃত্যু হয়। তাই ইয়াহ্ইয়া স্বাভাবিকভাবেই খায়যুরানের ঝামেলা থেকে নিস্কৃতি পান। ইয়াহ্ইয়া প্রত্যেকটি রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত অত্যন্ত চিন্তাভাবনার পর গ্রহণ করতেন বলে হারূনের চোখে তার সম্মান প্রতিপত্তি ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ইয়াহ্ইয়াও সর্বদা সতর্ক থাকতেন, যাতে হারূন আকারে-ইঙ্গিতেও বুঝতে না পারেন যে, তিনি (ইয়াহ্ইয়া) তাঁর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেছেন বা তাঁর মনের বাসনা পূরণে বাদ সাধছেন। তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হতো, হারূনের ইচ্ছা ও মনের বাসনা পূরণ করাই যেন 'তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।' কিন্তু এসব কিছুরই আড়ালে ইয়াহ্ইয়া প্রকৃতপক্ষে নিজের মনের বাসনাই পূরণ করতে চাচ্ছিলেন। তিনি আপন পরিবারের লোকদেরকে আপন ভাই-ভাতিজা ও সমমনা লোকদেরকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য বা প্রদেশের শাসনকর্তা, সেনাবাহিনীর অধিনায়ক এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তার পদে নিয়োগ করতে শুরু করেন। ফযল, জা'ফর প্রমুখ আপন পুত্রদেরকে তিনি হারূনুর রশীদের ভাই বানিয়ে দিয়েছিলেন। হারূনও ইয়াহ্ইয়ার পুত্রদেরকে ভাই বলেই সম্বোধন করতেন এবং তাদের সাথে একান্ত আপনজনের মত ব্যবহার করতেন। হারূন ফযল ও জা'ফরকে আপন পুত্রদের আতালীক বা শিক্ষাগুরু নিয়োগ করেছিলেন। হিজরী ১৭৪ সালে (৭৯০ খ্রি) ইয়াহ্ইয়া বৃদ্ধ ও দুর্বল হয়ে পড়লে হারূন তার স্থলে তার পুত্র ফযলকে মন্ত্রীপদে নিয়োগ করেন।

১৭৬ হিজরী (৭৯২-৯৩ খ্রি.) যখন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবদুল্লাহ্ দায়লামে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন তখন ফযলই ঐ সমস্যার একটি সন্তোষজনক সমাধান করেছিলেন। তিনি ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবদুল্লাহর জন্য খলীফার পক্ষ থেকে জায়গীর বরাদ্দের ব্যবস্থা করেছিলেন। কিছুদি পর হারূন, 'ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবদুল্লাহকে জা'ফর ইব্ন ইয়াহ্ইয়ার হাতে সোপর্দ করে বলেন, তুমি একে তোমার কাছে নজরবন্দী করে রাখ। হারূন ১৭৮ হিজরীতে (৭৯৪-৯৫ খ্রি.) ফযলকে খুরাসান, তাবারিস্তান, রায় ও হামদানের গভর্নর নিয়োগ করেছিলেন এবং আপন পুত্র হারূনের 'আতালীক' বা গৃহশিক্ষক নিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু মাত্র এক বছর পরই গৃহশিক্ষক ১৭৯ হিজরীতে (৭৯৫-৯৬ খ্রি.) হারূন ফযলকে খুরাসান থেকে ডেকে পাঠিয়ে প্রধানমন্ত্রীর পদে নিয়োগ করেন। ইয়াহ্ইয়ার অপর পুত্র জা'ফর হারূনের বন্ধু এবং বিশিষ্ট সভাসদ ছিলেন। হারূন সব সময় তাঁকে নিজের সঙ্গে রাখতেন। জা'ফর অত্যন্ত খোশমেজাজী, সদালাপী ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। ১৭৬ হিজরীতে (৭৯২-৯৩ খ্রি.) জা'ফরকে অন্যান্য দায়িত্বের সাথে মিসরের শাসনকর্তার দায়িত্বও দেওয়া হয়। জা'ফর নিজের পক্ষ থেকে ইমরান ইব্ন মিহরানকে মিসরের শাসনকর্তা নিয়োগ করে পাঠান এবং নিজে হারূনের সান্নিধ্যে থাকেন। হিজরী ১৮০ সনে (৭৯৬-৯৭ খ্রি.) দামিশ্ক ও সিরিয়ায় বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে জা'ফর স্বয়ং সেখানে যান এবং ঐ বিশৃঙ্খলা দমন করেন। এরপর হারূন জা'ফরকে খুরাসানের গভর্নর পদ দান করেন। কিন্তু মাসেক দিন অতিবাহিত হতে না হতেই তাকে বাগদাদের প্রশাসক ও পুলিশ প্রধান নিয়োগ করেন। জা'ফর এই কাজ হারছামা ইব্ন আইউনের হাতে সোপর্দ করেন এবং নিজে হারূনের সভাসদই থাকেন। হারূনুর রশীদ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন খালিদকে ডেকে এনে বলেন, আপনি ফযলকে বলে দিন, যেন তিনি মন্ত্রীত্বের দায়-দায়িত্ব জা'ফরকে বুঝিয়ে দেন। কেননা

আমি ফযলকে একথা বলতে লজ্জবোধ করছি। ইয়াহ্‌ইয়া ফযলের কাছে হারূনের এই ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করেন। ফলে জা'ফর প্রধানমন্ত্রীত্ব লাভ করেন। এর দ্বারা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, হারূনের উপর বারমাকী পরিবারের প্রভাব ছিল অপরিসীম।

জা'ফর ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া মন্ত্রী থাকাকালে রাষ্ট্রের সমগ্র পদ ও সমগ্র বিভাগের উপর এমনভাবে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন যে, প্রকৃতপক্ষে তিনিই রাষ্ট্রের হর্তাকর্তায় পরিণত হন। বাগদাদের সমগ্র পুলিশ ও বড় বড় প্রাসাদসমূহের দায়দায়িত্ব তাঁরই কর্তৃত্বাধীনে চলে আসে। রাজ্যসমূহের কর্মকর্তা, প্রদেশসমূহের গভর্নর, সেনাবাহিনীর অধিনায়ক সকলেই ছিলেন তাঁর হাতের মুঠোয়। তিনি ছিলেন রাজকোষের মালিক ও ব্যবস্থাপক। এমন কি প্রয়োজনকালে অর্থের জন্য হারূনুর রশীদকেও জা'ফরের কাছে ধর্ণা দিতে হতো। ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন খালিদের আরো কয়েকজন পুত্র ছিলেন এবং তারা ছিলেন সকলেই এক একটি বিরাট সেনাবাহিনীর অধিনায়ক। নিজেদের ঐ সব ক্ষমতা ও এখতিয়ারের সাহায্যে ইয়াহ্‌ইয়া ও তার পুত্ররা অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে ফায়দা লোটে। অর্থাৎ তাঁরা বড় বড় জায়গীর ও ভাতা বণ্টন ছাড়াও সাম্রাজ্যের রাজকোষের অর্থও বেদেরেগ খরচ করে ও দান-দক্ষিণায় ব্যয় করে। ফলে তাদের বদান্যতা হাতেমতাঈর বদান্যতার মত বিখ্যাত হয়ে ওঠে। তখন এমন একটি লোকও পাওয়া যেত না, যে বারমাক পরিবারের বদান্যতা ও আভিজাত্যের প্রশংসা করে না। শুধু খুরাসান বা ইরাকে নয়, সিরিয়া, মিসর, ইয়ামান ও দূরদূরান্তের দেশসমূহেও বারমাক পরিবারের বদান্যতার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তাদের প্রশংসায় কবিরা বহু কবিতা রচনা করে। এক কথায় বলতে গেলে, সম্মান, মর্যাদা, জনপ্রিয়তা, ক্ষমতা, ঐশ্বর্য তথা প্রতিটি ক্ষেত্রে বারমাকী পরিবার উন্নতির শীর্ষে আরোহণ করে। শুধু খিলাফতের আসনটি ছাড়া আর সবকিছুই তারা নিজেদের করায়ত্ত করে নেয়। এতদসত্ত্বেও তারা হারূনুর রশীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করত না। তাই হারূনের কোন শুভাকাঙ্ক্ষীরও সুযোগ ছিল না যে, তিনি বারমাকীদের ঐ অধিকার ও ক্ষমতাকে সন্দেহের চোখে দেখবেন। কিন্তু ঐ শক্তি ও প্রভাব-প্রতিপত্তির নিচে যদি কোন বদ-নিয়ত কিংবা বিদ্রোহ চাপা থাকে তাহলে তো হারূনুর রশীদের জন্য এর চাইতে বড় বিপদ আর কিছুই হতে পারে না। ১৮৭ হিজরী সনে (৮০৩ খ্রি.) হঠাৎ দেখা গেল, হারূনুর রশীদ বারমাকী পরিবারের সাথে সেই ব্যবহার করছেন, যা শুধু কোন কট্টর শত্রুর সাথেই করা হয়ে থাকে।

অতএব এখন আমাদেরকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ভেবে দেখতে হবে, বারমাকীরা প্রকৃতই হারূনুর রশীদের সাম্রাজ্যের স্বার্থবিরোধী কোন ষড়যন্ত্র শুরু করে দিয়েছিল কিনা এবং তিনি তাদের ঐ ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবগত হয়ে তাদের সাথে কঠোর ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছিলেন কিনা। প্রকৃতপক্ষে বারমাকীরা যদি আব্বাসী খিলাফতের বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র করে থাকে তাহলে হারূন তাদের সাথে সর্বশেষ যে আচরণ করেছেন তা ছিল সম্পূর্ণ বৈধ এবং সব দিক দিয়েই যুক্তিসঙ্গত। আর যদি বারমাকীদের ভিতর ও বাহির এক হয়ে থাকে এবং তারা বিশুদ্ধচিত্তে হারূনের অনুগত হয়ে থাকে তাহলে হারূনের চাইতে অকৃতজ্ঞ ও জালিম আর কেউ হতে পারে না। যারা কোন কোন বিষয়কে ভাসা ভাসা দৃষ্টিতে বিচার করেন তাদের কাছে বারমাকীদের পতন ও ধ্বংস এমন একটি অমীমাংসিত বিষয়ে পরিণত হয়েছে, যার সমাধান করতে গিয়ে তারা অনেক ভিত্তিহীন গালগল্পের আশ্রয় নিয়েছেন এবং সেগুলোকেই বাস্তব ঘটনা বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন।

ভারতবর্ষে নাদির শাহ্

নাদির শাহ্ ইরানী ভারতবর্ষে আসলে ভারতবর্ষের বাদশাহ তাঁকে সম্মানিত মেহমানরূপে অত্যন্ত সৌহার্দ্যের সাথে দিল্লীতে গ্রহণ করলেন সেই সময় কোন এক পানশালায় একব্যক্তি নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বলে উঠলো ঃ

"واہ محمد شاہ کیا کام کیاھے قزلباش کو
قلعه میں لا کر قلماقیئوں کے ہاتھ سے قتل کرا دیا"

"বাহ্! মুহাম্মদ শাহ্ কী কাণ্ডই না করলেন! শী'আ সম্রাটকে কেল্লায় নিয়ে এসে গায়িকা-নর্তকীদের দিয়ে হত্যা করালেন।" এ গুজব ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে গোটা দিল্লীতে ইরানীদের হত্যাযজ্ঞ শুরু হয়ে গেল। অগত্যা নাদির শাহ্ ইরানীকে একটি গণহত্যার ফরমান জারি করতে হলা। এমন গণহত্যা যা ইতিপূর্বে দিল্লীতে কোনদিন সংঘটিত হয়নি। এটা ঠিক জা'ফর বারমাকীর হত্যার কারণের মত যা কোন এক ব্যক্তি রটনা করে প্রচার করেছিল।

বাদশাহ্ হারূনুর রশীদের সহোদরা এবং মাহ্দীর কন্যা ছিলেন আবাসা। হারূন তাঁর সে বোনকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। অনুরূপভাবে তাঁর প্রধানমন্ত্রী জা'ফর ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ছিলেন তাঁর অত্যন্ত প্রিয় সহচর। অহরহ তিনি বাদশাহ্র সাথে অবস্থান করতেন। হারূন জা'ফর ও আবাসার সাথে একত্রে উপবেশন করে মদ্যপান করতেন। তিনি তাঁর মদের জলসায় যেভাবে সহোদরা আবাসার সঙ্গসুখ ভোগ করতেন, তেমনি তাঁর প্রধানমন্ত্রী জা'ফরকেও সে মজলিসে অবশ্যই শরীক রাখতে চাইতেন। তাই তিনি তাদের দু'জনের দেখা-সাক্ষাৎ বৈধ করার উদ্দেশ্যে উভয়ের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়ে দেন। কিন্তু সাথে সাথে তিনি তাদের দু'জনকে কঠোরভাবে স্বামী-স্ত্রীর মত দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ করে দেন। কিন্তু তারা তাঁর সে নিষেধাজ্ঞার গণ্ডির মধ্যে থাকতে সমর্থ হলেন না। হারূন যখন তা জানতে পারেন তখন ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে জা'ফরকে সবংশে নিপাত করেন।

মদ্যশালায় এ গল্প যখন আমাদের এ যুগের উপন্যাস রচয়িতা এবং লেখাপড়া জানা মূর্খদের হাতে এসে পড়লো তখন তারা সে মিথ্যার বহ্নিতে ঘৃত সংযোগ করে এমনি লেলিহান বহ্নির রূপ দিলেন যে, আজকাল উর্দুভাষী মাত্রকেই এ মিথ্যা কাহিনীর প্রতি কুরআন-হাদীসের চাইতে অধিকতর বিশ্বাসী বলে প্রতীতি হয়। তারা এর বিরুদ্ধে কোন কথাও শুনতে নারাজ।

জা'ফরকে হত্যার একশ বছর পর এ গুজব সৃষ্টি হয় এবং তাবারী তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে এর উল্লেখ করেন। আর যায় কোথায়? ঘটনাটি যেহেতু অদ্ভুত ও রূপকথার আমেজপূর্ণ ছিল, তাই বৈচিত্র্য প্রিয় পাঠকরা সেদিকে বেশিমাত্রায় ঝুঁকে পড়তে থাকে। ফলে হারূনুর রশীদের জীবন কথা আলোচনাকারী প্রায় প্রত্যেকেই এ গুজব উদ্ধৃত করেছেন। আর আজ আমাকেও সে অনুল্লেখ্য কাহিনী উদ্ধৃত করতে হলো। তাবারী প্রমুখ ঐতিহাসিক জা'ফর হত্যার অন্যান্য অনেক কারণও বর্ণনা করেছেন, কিন্তু সেগুলো সত্য-মিথ্যা যাচাই করার জন্যে বিদ্যাবুদ্ধি প্রয়োগ ও কার্যকারণ নির্ণয়ের প্রয়াস খুব কম লোকই পেয়েছে।

১. হারূনুর রশীদ হচ্ছেন আব্বাসীয় বংশের পঞ্চম খলীফা। আব্বাসীয়দের বংশগরিমার অহমিকা ছিল। আরবদের মধ্যে তাঁরা যে অত্যন্ত অভিজাত বংশের অধিকারী এ অহংকার তাঁদের ছিল। গোটা আরব সমাজ তাঁদের নেতৃত্ব ও মর্যাদা স্বীকার করতো। তাঁদের সে বংশকৌলীন্যের বলেই তাঁরা উমাইয়াদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণায় উৎসাহিত হন এবং শেষ পর্যন্ত সে প্রচেষ্টায় সফলও হন। প্রায় গোটা মুসলিম জাহানের শাসনক্ষমতা কুক্ষিগত হওয়ায় পরবর্তীকালে তাঁদের সে আভিজাত্যবোধ আরো শানিত হয়ে ওঠে। আরবদের স্বভাবজাত গোষ্ঠীপ্রীতি এবং কৌলীন্যবোধও পূর্ণমাত্রায় তাঁদের মধ্যে বিরাজমান ছিল। এমতাবস্থায় এটা কি করে সম্ভব হতে পারে যে, হারূনুর রশীদের মতো একজন প্রবল প্রতাপান্বিত বাদশাহ্ এমন একটি লোককে তাঁর সহোদরার পাণি গ্রহণ করতে দেবেন যাকে তিনি বংশগত দিক থেকে দাসবংশ জাত, অগ্নিউপাসক বংশের লোক এবং অজ্ঞাত কুলশীল বলে জানতেন ? এটা মেনে নিলাম যে, তিনি জা'ফরকে ভাই বলে সম্বোধন করতেন এবং তাঁর পিতাকে আপন গৃহশিক্ষকরূপে পিতা বলে সম্বোধন করতেন। কিন্তু তাই বলে আপন সহোদরার বিবাহকালে তিনি তাঁর বংশমর্যাদা ও কৌলীন্যের কথা বিস্মৃত হয়ে যাবেন এমনটি আশা করা যায় না। আর যদি একান্তই হারূনুর রশীদ এ যুগের লোকদের মতো অত্যন্ত স্বাধীনচেতা বা মুক্তবুদ্ধির অধিকারীও হয়ে যেতেন তবুও তাঁর বংশের লোকদের জন্যে তা চোখ বুঁজে মেনে নেয়াটা ছিল অসম্ভব ব্যাপার। তাঁরা এরূপ অসম বিবাহকে তাঁদের বংশের জন্য মর্যাদাহানিকর বলে কোনমতেই তা মেনে নিতে পারতেন না।

২. হারূনুর রশীদের মতো ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব– যিনি এক বছর হজ্জ আর অন্য বছর জিহাদ করতেন আর যিনি ছিলেন মুসলিম জাহানের নেতা ও খলীফা, তাঁর পক্ষে পানশালায় মজলিসের শোভাবর্ধন কোনমতেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। বনূ উমাইয়ার কোন খলীফা যদি কোনদিন শরাব বা তাড়ি পান করে থাকেন তবে তা মশহূর হয়ে যায় এবং আজ পর্যন্ত ঐতিহাসিকরা সে কুকর্মের কথা বর্ণনা করতে থাকেন, অথচ হারূনুর রশীদের মতো ধার্মিক এবং আলিম-উলামা ও পীর-দরবেশদের খিদমতে সবিনয়ে দীনবেশে উপবেশনকারী এবং তাঁদের ওয়ায-নসীহত ও উপদেশ শ্রবণ করে শিশুর মতো রোদনকারী ব্যক্তি কি করে শরাব তথা পেশাবের মত নাপাক বস্তু পান করতে পারেন ? ফুযায়ল ইব্ন আয়ায, ইব্ন সাম্মাক এবং সুফিয়ান সওরীর মতো যুগশ্রেষ্ঠ বুযুর্গ মনীষীগণ যার বন্ধু এবং সহচর, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত যিনি অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে আদায় করেন বিশেষত ফজরের সালাত যিনি একান্তই আউয়াল ওয়াক্তে আদায়ে অভ্যস্ত, উপরন্তু পাঁচ ওয়াক্ত ফরয ছাড়াও একশ রাকাআত নফল সালাত যাঁর নিত্যদিনের কর্মসূচি, এমন ফেরেশতা চরিত্রের লোককে মদ্যপ বলে অভিহিত করা যে তাঁর প্রতি কতবড় অবিচার ও লজ্জাহীনতা তা বলাই বাহুল্য। যে ব্যক্তি রাত কাটায় পানশালার আসরে, ফজরের জামাআতে সে কী করে হাযির হবে ? এছাড়া মদ্যপানে অভ্যস্ত ব্যক্তিরা কি কোন দিন সালাতে মনোনিবেশ করতে পারে ?

৩. ইরাকের আলিম সমাজ নবীয (ফলের তরল রূপ) পান বৈধ বলে ফতওয়া দিয়ে ছিলেন। তাই আমীর-উমারা শ্রেণীর কেউ কেউ তা সেবন করতেন। মদ্যপানের নেশায়

বিভোর হওয়ার সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। হারূনুর রশীদের নবীয পান সম্পর্কেও তো নিশ্চিতভাবে কিছুই জানা যায় না– যার বর্ণনা উপরিউক্ত বিবরণে পাওয়া যায়। তাঁর যুগ পর্যন্ত আরবদের সেই সরল অনাড়ম্বর ও সৈনিকসুলভ জীবন তাদের মধ্যে অক্ষুণ্ন ছিল। সেখানে মদ্যপানের প্রবেশাধিকার ছিল না। হারূনুর রশীদ যে আরব কৌলীন্যের সবচেয়ে বড় প্রবক্তা ছিলেন তাতে সর্বদাই মদ্যপান ছিল অত্যন্ত নিন্দিত ও গর্হিত কাজ। এমন কি জাহিলিয়াতের যুগেও আরবের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ মদ্যপান করতেন না। তাঁরা এটাকে ভদ্রজনোচিত কাজ বলে বিবেচনা করতেন না। এ জন্যেই আমাদের নবী করীম (সা) ও হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর মতো অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি জাহিলিয়াতের যুগেও এহেন নোংরামির ধারেকাছেও ঘেঁষেন নি। এহেন নোংরা কাজ যদি ইসলামী বিধি-বিধানের পরিপন্থী নাও হতো তবুও হারূনুর রশীদ তা পছন্দ করতেন না।

৪. এ বেদীনী ও আত্মমর্যাদাবোধের অভাবের যুগেও যখন হিন্দুস্থানে ইসলামী হুকুমত কায়েম নেই, বর্তমান সরকারের পক্ষ থেকে কোন সরকারী বাধা-নিষেধ নেই, কোন আত্মমর্যাদাবোধহীন ব্যক্তি সে নিজে যতই প্রকাশ্যে মদ্যপানে অভ্যস্ত হোক, কখনো পছন্দ করবে না যে, তার সহোদরাও মদ্যশালায় তার পানসঙ্গিনী হোক। আমাদের দেশে চর্মকার ও মেথর শ্রেণীর লোকই সর্বাধিক মদ্যপ হয়ে থাকে। সম্ভবত তাদের দ্বারাও এহেন জঘন্য কাজ হবে না যে, সে তার পানশালার বন্ধু-বান্ধবদের সাথে একত্রে তার বোনকেও মদ্যপানের সঙ্গিনী করবে। এই যেখানে অবস্থা সেখানে হারূনুর রশীদের মতো ধর্মপ্রাণ শাসকের– যাঁর দরবারে তাবিঈ ও তাবে-তাবিঈরা উপস্থিত থাকতেন– তাঁর পক্ষে এহেন নির্লজ্জ কার্যকলাপ চালিয়ে যাওয়া কী করে সম্ভব হতো?

৫. যে সব লোক ব্যভিচার, চৌর্যবৃত্তি ও মদ্যপানে অভ্যস্ত থাকে, তারা সাধারণত তাদের পরিবার-পরিজনকে এসব দুষ্কর্ম থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে। হারূনুর রশীদ নিজে যদি এরূপ নোংরামিতে অভ্যস্ত হয়েও থাকতেন তবুও তো আপন সহোদরাকে এহেন জঘন্য অভ্যাসে অভ্যস্ত হতে দিতেন না। তাঁর প্রিয়তমা মহিষী যুবায়দাই বরং তাঁর পানসঙ্গিনী হতেন। কিন্তু কোন ঐতিহাসিকই এরূপ কোন আভাস দেননি। তাঁর পূত-পবিত্র জীবনে এরূপ কলংকের ছিঁটে-ফোঁটা পর্যন্ত লাগেনি। কী তাজ্জবের কথা! যুবায়দার প্রাসাদে তো অহরহ কুরআন তিলাওয়াত চলছে আর তাঁর প্রেমিক স্বামী জা'ফর ও আব্বাসাকে নিয়ে পানশালায় পানমত্ত!

৬. ঐতিহাসিকগণ নির্ভরযোগ্য এ ঘটনা উদ্ধৃত করেছেন যে, জনৈক ইহুদী চিকিৎসক জিবরাঈল সর্বদা হারূনুর রশীদের দরবারে থাকতেন। তিনি সর্বদা খলীফার আহারসঙ্গীরূপে থাকতেন এবং খলীফাকে কোন অনিষ্টকর বস্তু খেতে দেখলে বারণ করতেন। একদা খলীফার দস্তরখানে মাছ আসলে তিনি খলীফাকে তা খেতে বারণ করলেন এবং খানসামাকে তা উঠিয়ে নিতে বললেন। তারপর ঘটনাচক্রে খলীফার জনৈক খাদেম দেখতে পেল যে, হেকীম প্রবর ঐ মাছটি তাঁর নিজ ঘরে নিয়ে গিয়ে নির্দ্বিধায় গলাধঃকরণ করছেন। তখন আর বুঝতে কারো

বাকি রইল না যে, চিকিৎসক প্রবর নিজে খাওয়ার জন্যে চালাকি করে সুস্বাদু মাছটি খেতে খলীফাকে বারণ করেছিলেন। উক্ত ভৃত্য খলীফাকে তা জানিয়ে দেয়। খলীফা মৃদুহাস্য ছাড়া চিকিৎসককে এ ব্যাপারে আর কিছুই বললেন না। কিন্তু হেকীম প্রবর যখন জানতে পারলেন যে, খলীফা এ ব্যাপারটা জেনে ফেলেছেন তখন তিনি মাছের তিনটি টুকরো তিনটি ভিন্ন ভিন্ন পেয়ালায় রাখলেন। একটি পেয়ালায় তিনি গোশত এবং ঐ সমস্ত খাদ্যদ্রব্য রাখলেন যা হারূনুর রশীদ ঐ সময় খেয়েছিলেন। দ্বিতীয় পেয়ালায় মাছের টুকরোর উপর বরফের পানি ঢেলে দিলেন আর তৃতীয় পেয়ালায় ঢাললেন মদ। এবার পেয়ালা তিনটি খলীফার খিদমতে হাযির করে বললেন, প্রথম দু'টি পেয়ালায় আপনার খাওয়ার দ্রব্যগুলো রক্ষিত আছে আর তৃতীয় পেয়ালায় রক্ষিত আছে আমার খাদ্য। কয়েকঘণ্টা পর দেখা গেল যে, প্রথমোক্ত দু'টি পেয়ালায় রক্ষিত খাদ্যদ্রব্যগুলো পচে গিয়ে দুর্গন্ধময় হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে তৃতীয় পেয়ালায় রক্ষিত মাছ মদের মধ্যে গলে গিয়ে শোরবায় পরিণত হয়েছে। এভাবে চিকিৎসক খলীফাকে বুঝিয়ে দিলেন যে, তিনি নিজে যেহেতু মদ্যপানে অভ্যস্ত তাই ঐ খাদ্যদ্রব্য তার জন্যে ক্ষতিকর ছিল না, পক্ষান্তরে খলীফা যেহেতু মদ্যপানে অভ্যস্ত নন, তাই এটা তাঁর জন্যে নিশ্চিতভাবেই ছিল ক্ষতিকর। আর এ জন্যেই তাঁকে মাছ খাওয়া থেকে বিরত রাখা হয়েছিল। এভাবে চিকিৎসক তাঁর লজ্জা ঢাকতে প্রয়াস পান। এ ঘটনা থেকেও প্রতীয়মান হয় যে, খলীফা হারূনুর রশীদ মদ্যপানে অভ্যস্ত ছিলেন না।

৭. প্রকৃত কথা হলো, সহোদরা আবাসাকে খলীফা হারূনুর রশীদ বিয়ে দেন মুহাম্মদ ইব্‌ন সুলায়মানের সাথে। এই স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি তাঁকে বিয়ে দেন ইবরাহীম ইব্‌ন সালিহ্ ইব্‌ন আলীর সাথে। দ্বিতীয় স্বামী ছিলেন খলীফার আত্মীয় এবং আব্বাস বংশীয়। এমন একটি পুণ্যবতী মহিলা সম্পর্কে এহেন মিথ্যাচার চরম নীচতার পরিচায়ক। একান্ত নীচতার চরিত্রের লোক ছাড়া অন্য কেউ এরূপ মিথ্যা রচনা করতে পারে না। সর্বোপরি এঘটনা রটনার আশ্চর্য ব্যাপার হলো, জা'ফর ও আবাসার পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাতকে শরীয়ত-সম্মত ও জাইয করার জন্যে তো খলীফা হারূনুর রশীদকে খুবই ব্যস্ত-সমস্ত ও অধীর দেখানো হয়েছে, অথচ শরীয়তের সম্পূর্ণ পরিপন্থী মদ্যপানের ব্যাপারে তিনি শরীয়তের সে পাবন্দীর কথা বেমালুম ভুলে যাচ্ছেন। এটাও কি সম্ভব ?

বারমাকীদের মূলোৎপাটনের আসল তত্ত্ব

হুকুমত ও সালতানাত এমনি এক মোহনীয় বস্তু যার জন্যে ভাই ভাইয়ের এবং পিতা পুত্রের শত্রুতে পরিণত হয়। সালতানাতসমূহের ইতিহাসই তার সাক্ষী। আব্বাসীয়রাও যাকে বা যাদেরকেই তাদের রাজত্বের জন্য ক্ষতিকর বিবেচনা করেছেন নির্দ্বিধায় তাদেরকে হত্যা করেছেন। খলীফা মানসূর যখন লক্ষ্য করলেন যে, আবূ মুসলিম গোটা রাজত্বকে তার হাতের মুঠোয় নেয়ার প্রয়াস পাচ্ছে তখন তিনি তাকে উৎখাত করেন। রাজা-বাদশাহদের এই বিশেষ প্রবণতার সুযোগ নিয়ে তাদের মোসাহেব-অমাত্যরাও অনেক সময় ফায়দা লুটে থাকেন। তারা বাদশাহর দ্বারা যারই ক্ষতিসাধনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন তাকেই বিদ্রোহী বলে

প্রতিপন্ন করার প্রয়াস পেয়েছেন। মানসূরের[১] দেহরক্ষী রাবী ইব্‌ন ইউনুস ছিলেন হযরত উসমান গনী (রা)-এর গোলাম ফায়সালের বংশধর। তিনি ছিলেন মানসূরের সবচাইতে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য পারিষদ। মানসূর তাঁকে তাঁর উযির বানিয়ে রেখেছিলেন। মানসূরের শাসনামলে তাঁর অপ্রতিহত প্রতিপত্তি ছিল। খলীফাকে তিনিই আবূ মুসলিমকে হত্যার পরামর্শ দিয়েছিলেন বলে মনে করা হয়ে থাকে। খালিদ বারমাকীর স্থলে খলীফা আবূ আইউবকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। কিন্তু ১৫৩ হিজরী (৭৭০ খ্রি.) সালে তিনি উক্ত রাবী ইব্‌ন ইউনুসকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। কিন্তু তখনো তিনি দেহরক্ষীর পরিচয়েই পরিচিত ছিলেন। মানসূর তাঁর মৃত্যুকালে মাহ্‌দীর হাতে খিলাফতের বায়আতের ব্যবস্থা সম্পন্ন করেন। মাহদীর আমলেও রাবী' উযির পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। কিন্তু যেহেতু তিনি দেহরক্ষী রূপে মশহুর ছিলেন তাই মাহ্‌দী তাঁর পাশাপাশি আবূ আবদুল্লাহ্ মুআবিয়া ইব্‌ন ইয়াসারকেও উযীর নিযুক্ত করে রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহ তাঁরই হাতে অর্পণ করেন। কিছুদিন পরেই রাবী আবূ আবদুল্লাহকে পদচ্যুত করে ও খলীফার কোপানলে ফেলে গ্রেফতার করিয়ে ফেলেন। তারপর মাহ্‌দী আবূ আবদুল্লাহর স্থলে ইয়াকূব ইব্‌ন দাউদকে মন্ত্রী পদে বরণ করেন। ইয়াকূব ইব্‌ন দাউদও কিছু দিন যেতে না যেতেই খলীফার কোপানলে পড়েন এবং পদচ্যুত হন। এবার মাহ্‌দী নিশাপুরের একটি খ্রিস্টান পরিবারের সাথে সম্পৃক্ত কায়য ইব্‌ন আবূ সালিহকে মন্ত্রী পদে বরণ করেন। মোটকথা মাহ্‌দীর আমলে রাবী ইব্‌ন ইউনুস কাউকেই শান্তিপূর্ণভাবে ও সাফল্যের সাথে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করতে দেননি। প্রকৃত ক্ষমতা ছিল তাঁরই হাতে। মাহ্‌দীর পর হাদী খলীফারূপে বরিত হলে রাবীর ক্ষমতার দাপট আরো বৃদ্ধি পায়। কেননা, হাদী সমস্ত ক্ষমতা তারই হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন। খযযুরানকে ক্ষমতাচ্যুত করার পিছনেও রাবীই সক্রিয় ছিলেন। হাদী এবং রাবী স্বল্প সময়ের ব্যবধানে মৃত্যুমুখে পতিত হন। রাবীর পুত্র ফযল ইব্‌ন রাবীর প্রত্যাশা ছিল যে, তিনি নিশ্চয়ই কোন গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় পদ লাভ করবেন, কিন্তু সিংহাসনে আরোহণ করেই হারূন সাম্রাজ্যের সকল ক্ষমতা ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন খালিদের হাতে তুলে দিলেন। উপরেই বলা হয়েছে যে, ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন খালিদ ছিলেন আবূ মুসলিমের সম্প্রদায়ের লোক। রাবী ইব্‌ন ইউনুসের প্রতি তিনি অত্যন্ত বিদ্বিষ্ট ছিলেন। কেননা একদিকে এই রাবী যেমন ছিলেন আবূ মুসলিমকে হত্যার উসকানিদাতা, তেমনি তিনি ছিলেন ইয়াহ্ইয়ার পিতা খালিদ ইব্‌ন বারমাকীদের প্রতি বিদ্বিষ্ট আর তিনিই খালিদকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে বরখাস্ত করিয়ে তাঁর বন্ধু আবূ আইউবকে ঐ পদে আসীন করিয়েছিলেন। ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন খালিদ ফযল ইব্‌ন রাবীকে কোন পদে আসীন হতে দিলেন না। তিনি তাঁকে হাযিবের পদে বহাল রেখে তাঁর সমস্ত ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে তাঁকে দন্তনখর বিহীন অথর্বে পরিণত করলেন। এবার আশা করি পাঠকের আর বুঝতে বাকি নেই যে, বারমাক পরিবার এবং ফযল ইব্‌ন রাবীর এই রেষারেষি ছিল অত্যন্ত পুরনো এবং দীর্ঘস্থায়ী। বারমাকীদের উন্নতি ও উত্থানের সাথে সাথে ফযল ইব্‌ন রাবীর বৈরিতাও দিন দিন বেড়েই চলে। কিন্তু হারূনুর রশীদ এ

---

১. হাযিব শব্দের প্রতিশব্দরূপে উর্দু লেখক আকবর শাহ্ নজীবাবাদী বডিগার্ড অফিসার লিখলেও আমাদের বর্তমান যুগের পরিভাষায় একে মিলিটারী সেক্রেটারী বা সামরিক সচিব বলা যেতে পারে। —অনুবাদক।

পরিবারের প্রতি অত্যন্ত প্রীত ও আস্থাবান থাকায় তিনি তাদের কোন অনিষ্টসাধনে সমর্থ হচ্ছিলেন না। এমতাবস্থায় ফযল ইব্ন রাবীর হাতে বারমাকী খানদানের অবিশ্বস্ততা ও রাজদ্রোহী হওয়ার প্রমাণ খুঁজে বেড়ানো ছাড়া করার মত আর কোন কাজই ছিল না। এমন কোন প্রমাণ খুঁজে পাওয়া গেলে খলীফাকে তা অবহিত করে তাদের প্রতি সন্দিহান ও রুষ্ট করার মাধ্যমেই কেবল তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারতো। বারমাকীরা যেহেতু অত্যন্ত অভিজ্ঞ, সতর্ক ও প্রখর দৃষ্টির অধিকারী ছিলেন তাই তাঁরা এদের কোন অবকাশ রাখছিলেন না যাতে ফযল ইব্ন রাবীর জন্য সে সুযোগ এসে যায়। এতদসত্ত্বেও ফযল সদা সুযোগের অপেক্ষায় থাকতেন এবং বারমাকীদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করে চলতেন। বারমাকীরা তাদের বদান্যতা দ্বারা এত অধিক সংখ্যক শুভাকাঙ্ক্ষী ও সমর্থক সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিলেন যে, ফযল ইব্ন রাবী কোন পথই খুঁজে পাচ্ছিলেন না। হারূনুর রশীদ পুরনো পারিবারিক সম্পর্কের ভিত্তিতে তাঁকে কোন একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ দানের কথা চিন্তা করতেন, কিন্তু তাঁর মাতা খায়যুরান যেহেতু ফযল এবং তার পিতা রাবীর প্রতি বিমুখ ছিলেন আর এ ব্যাপারে ইয়াহ্ইয়াও তাঁর সাথী ছিলেন তাই খায়যুরান তাঁর পুত্র হারূনুর রশীদকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। ১৭৪ হিজরীতে (৭৯০ খ্রি) খায়যুরানের মৃত্যু হলে হারূনুর রশীদ ফযলকে হিসাব বিভাগের অধ্যক্ষ পদে আসীন করেন। এবার ফযল রাবী পূর্বের তুলনায় অনেকটা ক্ষমতা ও প্রতিপত্তিশালী হয়ে ওঠেন।

ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবদুল্লাহ্ যখন দায়লম থেকে ফযল ইব্ন জা'ফরের সাথে আসেন তখন হারূনুর রশীদ তাঁকে অঙ্গীকারনামা লিখে দেয়া সত্ত্বেও তাঁকে গ্রেফতার করতে উদ্যত হন। এ ব্যাপারে তিনি সর্বপ্রথম কোন কোন ফকীহ্-এর নিকট থেকে ফাতাওয়া হাসিল করেন এবং এ সংবাদ জ্ঞাত হয়ে বারমাকীরা ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবদুল্লাহর স্বপক্ষে তৎপর হন এবং তাঁরা খলীফার কাছে সুপারিশ করেন। যেহেতু তিনি (ইয়াহ্ইয়া) আবূ মুসলিম খুরাসানীর আকীদা-বিশ্বাসে বিশ্বাসী ছিলেন এবং ভেতরে ভেতরে আহলে বায়তের সমর্থক ছিলেন তাই হারূনুর রশীদ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবদুল্লাহকে জা'ফর ইব্ন ইয়াহ্ইয়ার দায়িত্বে ছেড়ে দেন এবং তাকে বলে দেন যে, তুমিই তাকে নিজ দায়িত্বে রেখ। জা'ফর অত্যন্ত মর্যাদার সাথে ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবদুল্লাহকে নিজের কাছে রাখেন।

১৮০ হিজরীতে (৭৯৬-৯৭ খ্রি.) যখন হারূনুর রশীদ আলী ইব্ন ঈসাকে খুরাসানের গভর্নর নিয়োগ করে পাঠান তখন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন খালিদ তার এ নিয়োগের বিরোধিতা করেন যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। সম্ভবত ইয়াহ্ইয়া ইব্ন খালিদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এটাই ছিল হারূনুর রশীদের প্রথম সিদ্ধান্ত। ইয়াহ্ইয়া তাঁর পুত্ররা এবং আত্মীয়-স্বজন যেহেতু গোটা দেশের উপর ছেয়েছিল তাই বারমাকীরা আলী ইব্ন ঈসাকে খুরাসানে শান্তিতে বসতে দেননি। ইয়াহ্ইয়ার পুত্র মূসা তাঁর সকল শক্তি নিয়োগ করে উপর্যুপরি তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংঘটিত করতে লাগল। ঘটনাচক্রে আলী ইব্ন ঈসা খুরাসানের এসব বিদ্রোহের উসকানিদাতা সম্পর্কে অবহিত হন। তিনি হারূনুর রশীদের দরবারে ইয়াহ্ইয়া পুত্র মূসার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ প্রেরণ করেন। এ অভিযোগ এবং উপরে উল্লিখিত আলী ইব্ন ঈসাকে নিয়োগের ব্যাপারে

ইয়াহ্ইয়ার বিরোধিতা মিলে হারুনুর রশীদের মনে একটি সন্দেহের জন্ম দেয়। ফলে বারমাকীদের পক্ষ থেকে যখন সুপরিকল্পিতভাবে রাজধানীতে এ গুজব রটানো হচ্ছিল যে, খুরাসানে আলী ইব্ন ঈসা বিদ্রোহ ঘোষণা করতে উদ্যত হচ্ছেন, তিনি খলীফার বিরুদ্ধে সর্বতোভাবে বিদ্রোহের প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন, তখন হারুনুর রশীদ কোন আমীর বা সিপাহ-সালারকে সে সম্ভাব্য বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ না করে নিজেই সসৈন্যে খুরাসানের দিকে অগ্রসর হন। তিনি রে-তে পৌঁছে সেখানে শিবির স্থাপন করেন। এটা ১৮৬ হিজরীর (৮০২ খ্রি.) ঘটনা। এ পর্যন্ত হারুনুর রশীদের মনে কেবল নানারূপ সন্দেহই ছিল। তিনি বারমাকীদের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ পোষণ করতেন না। তাঁর কেবল এতটুকুই জানা ছিল যে, আলী ইব্ন ঈসার খুরাসানে অবস্থান বারমাকীরা সুনজরে দেখে না। আলী ইব্ন ঈসা যখন মূসা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া এবং ইয়াহ্ইয়ার অন্যান্য পুত্রের ও তাঁর নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে এমর্মে লিখিত অভিযোগ খলীফার কাছে প্রেরণ করেন যে, এরাই খুরাসানে অশান্তির ইন্ধন যোগাচ্ছে, তখন খলীফা বিশেষভাবে খুরাসানের পরিস্থিতির প্রতি মনোনিবেশ করলেন। কিন্তু তিনি বারমাকীদের কাছে তা অত্যন্ত গোপন রাখলেন। তারা ঘুণাক্ষরেও টের পেল না যে, খলীফা তাদের প্রতি তীক্ষ্ণ নযর রাখছেন। তাই তারা আলীর বিরুদ্ধে অভিযোগ লিখিয়ে খলীফার কাছে পাঠাতে থাকে। যদি তাদের জানা থাকত যে খলীফা তাদেরকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখছেন, তাহলে তারা কস্মিনকালেও আলীর বিরুদ্ধে অভিযোগ পত্রাদি খলীফার দরবারে প্রেরণ করতো না এবং তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অভিযোগও উত্থাপন করতো না। এখন যখন স্বয়ং খলীফা রে-তে উপস্থিত হলেন এবং আলী ইব্ন ঈসা পূর্ণ আনুগত্যের সাথে খলীফার দরবারে উপস্থিত হয়ে খুরাসানে সংঘটিত ঘটনাসমূহ একান্তে খলীফার কাছে নিবেদন করলেন এবং তাঁকে অবহিত করলেন যে, খুরাসান এবং পার্শ্ববর্তী প্রদেশসমূহ প্রকৃতপক্ষে বারমাকীদের হাতের মুঠোয় এবং তারা অত্যন্ত আঁটঘাট বেঁধে আবূ মুসলিম খুরাসানীদের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে, তখন যে হারুনুর রশীদের মনে কি তুমুল ঝড় বয়ে যায় তা পাঠক মাত্রই অনুভব করতে পারেন। তিনি দিব্যি দেখতে পাচ্ছিলেন যে তাঁর পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে। বারমাকীদের দুর্দান্ত প্রতাপ ও দাপট তাঁর চোখের সম্মুখেই ছিল। এদিকে নিজের কানে তাদের প্রস্তুতির কথা শুনলেন। আলী ইব্ন ঈসাকে সমর্থন ও সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে তিনি তাকে মার্ভের উদ্দেশে পাঠিয়ে দিলেন এবং নিজ মনোভাব একান্তই গোপন রেখে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করলেন।

আলী ইব্ন ঈসার রওয়ানা হওয়ার পর এবার ফযল ইব্ন রাবী মওকা বুঝে খলীফাকে জা'ফর বারমাকী কর্তৃক ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবদুল্লাহকে মুক্ত করে দেয়ার ভয়ংকর সংবাদটি অবহিত করলেন। সাথে সাথে তিনি তাঁকে একথাও অবহিত করলেন যে, ইয়াহ্ইয়া এখন বিদ্রোহের প্রস্তুতি সম্পন্ন করার জন্য বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। হারুন কথা প্রসঙ্গে জা'ফরের সম্মুখে ইয়াহ্ইয়ার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে জিজ্ঞেস করলেন যে, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবদুল্লাহ্ এখন কোথায় অবস্থান করছে ? জবাবে জা'ফর জানালেন যে, সে পূর্বের মতই আমার হাতে নজরবন্দী আছে। হারুন জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি আমার কাছে হলফ করে একথা বলতে

পারবে? এতে জা'ফর প্রমাদ গুনলেন এবং তার বুঝতে বাকি রইল না যে, এ সম্পর্কিত গোপন সংবাদ ফাঁস হয়ে গেছে। তিনি কোনক্রমে আত্মসংবরণ করে বললেন, ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ সুদীর্ঘকালতো আমার দায়িত্বে নজরবন্দীরূপে কাটালেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রতি আমার আর কোন সন্দেহ অবশিষ্ট না থাকায় তাকে মুক্তিদানের তেমন কোন অসুবিধা আছে বলে আমার মনে হয়নি। হারূনের জন্য এটাই ছিল অত্যন্ত নাজুক সময়। তিনি যদি এ সময় আত্মসংবরণে ব্যর্থ হতেন, তা হলে আর কোন মতেই তিনি বারমাকীদেরকে কাবু করতে সমর্থ হতেন না। তারা তখন তাৎক্ষণিকভাবে নিজেদের আত্মরক্ষার্থে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বনে তৎপর হতো যা এতকাল ধরে তারা সঞ্চয় করে রেখেছিল। হারূনের পক্ষে বারমাকীদের মুকাবিলা করা সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না। হয়তো তখন হারূনকে তারা নিঃশ্বাস ফেলার বা উহ্ শব্দটি উচ্চারণ করারও সুযোগ দিতো না। কেননা ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন খালিদের পুত্র ও পৌত্রদের পঁচিশ জন শক্তিমান ব্যক্তি যারা অসি ও মসির বলে বলীয়ান ছিলেন– স্বয়ং হারূনের রাজপ্রাসাদে নানা কাজের বাহানায় অহরহ অবস্থান করছিলেন। গোটা দেশের শাসনতন্ত্রের চাবিকাঠি বারমাকীদের করায়ত্ত ছিল। সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে নিয়োজিত অফিসারদের প্রায় সকলেই ছিলেন তাদেরই নিয়োজিত এবং সমর্থক। গোটা দেশের গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যবস্থাপনার চাবিকাঠিও ছিল বারমাকীদের হাতে। আলিম-উলামা, ফকীহ্, সামরিক বাহিনীর তারাও সবাই ছিল তাদের গুণগ্রাহী ও অনুগত। শাস্ত্রবিদগণের সকলেই ছিলেন তাদের আনুকূল্যপ্রাপ্ত ও অনুগত। কেননা তাঁরা সর্বদা এসব জ্ঞানীগুণীর খিদমত করতেন। কবি-সাহিত্যিকদের সকলেই ছিলেন তাদের প্রশংসায় মুখর। প্রজাসাধারণের মধ্যেও তাঁদের বদান্যতার সুনাম ছিল আর এজন্যে রাজ্যের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত সকল মহলেই তাঁরা অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। এ ছিল তাদের এমনি এক প্রস্তুতি যে, তারা ময়দানে অবতীর্ণ হলে এক হারূন কেন কয়েকজন হারূনের পক্ষেও তাদের সাথে এঁটে ওঠা ছিল প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু হারূন অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে নিজেকে সামলিয়ে নেন এবং জা'ফরের কাছে ইয়াহ্ইয়ার মুক্তির কথা শুনে সুর পাল্টে অত্যন্ত স্বাভাবিক কণ্ঠে বলেন, আমি এমনিতেই তোমাকে ইয়াহ্ইয়ার কথা জিজ্ঞেস করেছি। তাকে মুক্তি দিয়ে আসলে তুমি ভালই করেছ। আমি নিজেই তোমাকে বলতে যাচ্ছিলাম যে, বেচারাকে এবার ছেড়ে দাও!

এটা যে কেউ অনুধাবন করতে পারে যে, ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আবদুল্লাহর মুক্ত হওয়া হারূনুর রশীদের জন্য বজ্রাঘাতের চাইতে কোন অংশে কম ছিল না। উলুভী (আলীপন্থী)-দের বিদ্রোহের কারণে আব্বাসীগণ এখনো দুশ্চিন্তামুক্ত ছিলেন না। আর ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ কোন সাধারণ ব্যক্তি ছিলেন না যে, তাঁর মুক্তিকে হারূন একটা মামুলী ঘটনা বলে হালকাভাবে নেবেন। কিন্তু আপন মনোভাব গোপন রাখতে সমর্থ হয়ে হারূন এ যাত্রা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হলেন।

ঠিক এ সময়কালেই ঘটনাচক্রে একদা জা'ফরের এখানে কোন একটা উৎসব উপলক্ষে রাষ্ট্রের প্রায় সকল ঊর্ধ্বতন অফিসারবর্গ এবং ইরানী বংশোদ্ভূত সর্দারগণ উপস্থিত ছিলেন। সেখানে কেউ একজন বলে উঠলো ঃ আবূ মুসলিম কী দক্ষতার সাথেই না এক বংশ থেকে আরেক বংশের হাতে রাজত্ব হস্তান্তর করেছেন! একথা শুনে জা'ফর মন্তব্য করলেন, এটা আর

তেমন দক্ষতার ব্যাপার কী হলো ? এ কাজটি করতে আবূ মুসলিমকে ছয় লাখ লোক হত্যা করতে হয়েছে! দক্ষতা হতো তখন যদি এক বংশ থেকে রাজত্ব এমনিভাবে হস্তান্তরিত হতো যে, কেউ ঘুণাক্ষরেও ব্যাপারটি টের পেত না। এ মজলিসে এমন এক ব্যক্তিও উপস্থিত ছিল যে, ব্যাপারটি আনুমানিক হারূনুর রশীদের কর্ণগোচর করলো। হারূন এবার নিশ্চিত হলেন যে, আসলে জা'ফর ঠিক তা-ই করতে যাচ্ছেন। তারপর তিনি বারমাকীদেরকে গাফেল রাখার উদ্দেশ্যে আপন পুত্রকে অলীআহ্‌দ (পরবর্তী বাদশাহ্‌ বলে মনোনীত) করার এবং তিন পুত্রের মধ্যে রাজ্য ভাগ করার দলীল-দস্তাবেজ প্রণয়নে এমনভাবে ব্যস্ততা শুরু করলেন যে, কোন ব্যক্তি তার বিরুদ্ধে আসন্ন বিদ্রোহের মুখোমুখি পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে নিশ্চিন্তে এমনটি করতে পারে না। বারমাকীদেরকে তিনি সবচাইতে বেশি প্রতারণা জালে ফেললেন এই চালটি চেলে। এ কাজে তাঁর বেশি কালক্ষেপণ করার অবকাশ যেমন ছিল না, তেমনি তিনি বেশিদিন পর্যন্ত বারমাকীদেরকে গাফেল রাখতে পারতেন না। তাই ১৮৬ হিজরীর (৮০২ খ্রি.) শেষ দিকে তিনি 'রে' থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন। মূতামিনকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে তার স্বপক্ষে বায়আত নিলেন এবং বণ্টনপত্র লিখলেন। আমীন ও মামূনের দ্বারা প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিয়ে তাদের সই করালেন। তারপর হজ্জে গেলেন। কা'বাগৃহে এ প্রতিজ্ঞাপত্র লটকিয়ে রাখলেন। লোকজনের মধ্যে দান-খয়রাত করলেন। মদীনা মুনাওয়ারা গিয়ে হাদিয়া-তুহ্‌ফা ও খয়রাত বণ্টন করলেন। তারপর প্রত্যাবর্তনকালে আম্বার নামক স্থানে উপনীত হয়ে ১৮৭ হিজরীর মুহাররম (৮০৩ খ্রি. জানুয়ারী) মাসের শেষ তারিখে গভীর রাতে আকস্মিকভাবে জা'ফরকে হত্যা করালেন এবং তাঁর পিতা ও ভাইদেরকে বন্দী করলেন। কারো কিছু একটা করার সুযোগমাত্র তিনি দিলেন না।

আম্বার নামক স্থানে উপনীত হয়ে হারূনুর রশীদ একদিন রাতের বেলা তাঁর দেহরক্ষী মাসরূরকে ডেকে এমর্মে নির্দেশ দিলেন যে, সশস্ত্র সৈন্যের একটি বিশ্বস্ত দল নিয়ে এক্ষুণি জা'ফরের তাঁবুতে যাও এবং তার শিরশ্ছেদ করে তার খণ্ডিত শিরটি নিয়ে এসো। মাসরূর প্রথমে এ আদেশ শুনে ঘাবড়ে যায় তারপর যখন হারূনুর রশীদ বললেন আমার এ নির্দেশ কালবিলম্ব না করে এক্ষুণি কার্যকরী কর তখন মাসরূর আর কালক্ষেপণ না করে খলীফার আদেশ কার্যকরী করে এবং তার খণ্ডিত শির এনে খলীফার সামনে উপস্থিত করে। ঐ রাতে খলীফা জা'ফরের ভাই ফযল এবং তার পিতা ইয়াহ্‌ইয়াকেও গ্রেফতার করেন এবং এক ফরমান বলে তাৎক্ষণিকভাবে জা'ফর ও ইয়াহ্‌ইয়ার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন।[১] তারপর বারমাকী খান্দানের প্রত্যেকটি লোককে বন্দী করা হলো। তাদের নিয়োজিত গভর্নরবর্গ এবং উচ্চপদে আসীন অফিসারদেরকে পদচ্যুত করা হলো।[২] এভাবে হারূনুর রশীদ একই রাতের মধ্যে বারমাকীদের সংকট কাটিয়ে উঠে স্বস্তির নিঃশ্বাস নিলেন। এ কাজটি তিনি এতই দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করলেন যে, কেউ কান নাড়বার পর্যন্ত সময় পেল না। ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন খালিদের ভাই মুহাম্মদ ইব্‌ন খালিদের বারমাকীর আনুগত্যের প্রতি হারূনুর রশীদের আস্থা

---

১. এ বাজেয়াপ্তকৃত সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ৩০,৬৭৬,০০০ দীনার। –অনুবাদক।

২. ইব্‌ন খালদূনের মতে, হারূনের খিলাফতে কমপক্ষে ২৫০ জন পদস্থ বারমাকী উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ছিলেন। –অনুবাদক।

ছিল। সম্ভবত তিনিই হারূনুর রশীদকে অনেক গোপন তথ্য সরবরাহ করেছিলেন। তাই হারূনুর রশীদ তাকে গ্রেফতার বা বন্দী করেন নি। এদিকে স্বয়ং হারূনুর রশীদের পরিবারের জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আবদুল মালিক ইব্‌ন সালিহ্‌ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আব্বাস– যিনি সম্পর্কে তাঁর দাদা ছিলেন– বারমাকীদের সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। বারমাকীরা তাঁকে খলীফা পদে অধিষ্ঠিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। বারমাকীদেরকে গ্রেফতার করার পর হারূনুর রশীদ তাকেও গ্রেফতার করেন। আবদুল মালিক ইব্‌ন সালিহ্‌-এর পুত্র আবদুর রহমান আপন পিতার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়েছিলেন। আবদুল মালিক মামুনুর রশীদের যুগ পর্যন্ত বন্দী অবস্থায় জীবন যাপন করেন। অবশেষে মামূন তাঁকে মুক্তিদান করেন।[১] ইবরাহীম ইব্‌ন উছমান ইব্‌ন নাহীকও বারমাকীদের সাথে ষড়যন্ত্রে শামিল ছিলেন। এজন্যে তাকেও হত্যা করা হয়। ইয়াহ্‌ইয়া বারমাকী ১৯০ হিজরীতে (৮০৬ খ্রি.) এবং ফযল বারমাকী ১৯৩ হিজরীতে (৮০৮-৯ খ্রি.) বন্দী অবস্থায় কারাগারে মৃত্যুমুখে পতিত হন।[২]

বারমাকীরা যেহেতু অকাতরে দান-দক্ষিণা করতেন এবং কবি-সাহিত্যিকদের সমাদর করতেন, তাই তাদের পতনের পর প্রকৃত ব্যাপার সম্পর্কে অনবহিত জনসাধারণ অত্যন্ত ব্যথিত ও মর্মাহত হয়। তারা একে হারূনুর রশীদের একটা নিষ্ঠুর কার্যরূপে বিবেচনা করে। কবিরা এ নিয়ে মর্সিয়াগাথা রচনা করেন। কাহিনীকাররা অতিরঞ্জিত করে তাদের দান-দক্ষিণার কাহিনী রচনা করেন। হারূনুর রশীদ বারমাকীদের প্রকৃত তথ্য ফাঁস হতে দেননি। তিনি অত্যন্ত কঠোরভাবে বারমাকীদের নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করা আইনত নিষিদ্ধ করে দেন। যদ্দরুন স্বয়ং হারূনুর রশীদের যুগের সাধারণ লোকেরাও বারমাকীদের মূলোৎপাটনের সঠিক কারণ সম্পর্কে অবগত ছিল না। যদি বারমাকীদের ষড়যন্ত্রমূলক তৎপরতা সম্পর্কে জনসাধারণ জানতে পারতো তা হলে এতে হারূনুর রশীদ তথা আব্বাসীয়া সালতানাতের ভাবমূর্তি নষ্ট হওয়ার এবং নতুন নতুন ষড়যন্ত্রের উদ্ভব হওয়ার দৃঢ় আশংকা ছিল। এটা হারূনুর রশীদের দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার পরিচায়ক যে, বারমাকীদের ব্যাপারে তিনি কোন বিবরণ প্রকাশ করেননি। এভাবে হারূনুর রশীদের প্রতাপ এবং তাঁর ব্যাপারে লোকের বিস্ময় বিমূঢ়ভাব পূর্ববৎ বজায় থাকে। আব্বাসী সালতানাতের জন্যে এটা দরকার ছিল। বারমাকীদের উৎখাতের ব্যাপারে যদি সাধারণভাবে জনসাধারণকে মুখ খোলার ও মতামত প্রকাশের অধিকার দেয়া হতো তা হলে বলাই বাহুল্য, সর্বত্র বারমাকীদের গুণগ্রাহী, শুভাকাঙ্ক্ষী ও অনুরাগীদের প্রাচুর্য ছিল। তাদের মুখ খুললে আব্বাসীয়া খিলাফতের বিরুদ্ধে অবশ্যই আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠতো। এ সময় হারূনুর রশীদের গৃহীত কর্মপন্থার কোন উপাদেয় বিকল্প ব্যবস্থা ছিল না।

বারমাকীরা যেহেতু আহলে বায়ত এবং আবূ তালিবের বংশধরদের শুভাকাঙ্ক্ষী বলে নিজেদেরকে দাবি করতো, তাই তাদের সর্বনাশকে আবূ তালিব বংশের লোকজন নিজেদের এক চরম ক্ষতি বলেই বিবেচনা করলো। আজ পর্যন্ত আলী ও হোসেন সমর্থক শিয়াদেরকে বারমাকীদের পতনের জন্য শোক প্রকাশ করতে দেখা যায়। তাদের বিদ্যোৎসাহিতা ও

---

১. History of the saracens-এ সৈয়দ আমীর আলী লিখেছেন যে, আমীন তাঁকে মুক্তি দিয়ে সিরিয়ার শাসক নিয়োগ করেছিলেন। –অনুবাদক।

২. এ বছর দু'টি খ্রিস্টাব্দ ৮০৬ ও ৮০৯ সন। –অনুবাদক।

জ্ঞানীগুণীদের সমাদরের কথা অত্যন্ত বাড়িয়ে বলা হয়ে থাকে। অথচ এই মজুসী বংশোদ্ভূত খান্দানটি দীন ইসলাম এবং মুসলিম উম্মাহ্‌র কোন অসাধারণ খিদমত আঞ্জাম দেয়নি। তাদের নিধন ও ধ্বংসের কারণ দিবালোকের মতই স্পষ্ট। এতে সংশয় সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। আপন রাজত্ব রক্ষার স্বার্থেই হারূনুর রশীদ বারমাকীদেরকে উচ্ছেদে বাধ্য হন। আপন রাজত্ব রক্ষার জন্য প্রত্যেক সম্রাটই এরূপ করে থাকেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি যেখানে বারমাকীদেরকে কারাগারে নিক্ষেপ করেছেন, তেমনটি কারাগারে তিনি নিক্ষেপ করেছেন তাঁর স্ববংশীয় দাদাকেও। কেননা তাঁরও ঐ একই অপরাধ ছিল। এমন স্পষ্ট কথার সাথে অবাস্তব ও অসংলগ্ন কথাবার্তা জুড়ে দেওয়ার কোনই প্রয়োজন করে না।

হারূনের আমলের আরো কিছু বিবরণ

হারূনুর রশীদের যুগের বিবরণ দিতে গিয়ে এবং ঐ আমলের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী বিবৃত করতে গিয়ে আমরা ১৮৭ হিজরী (৮০৩ খ্রি.) পর্যন্ত উপনীত হয়েছি। ঐ বছর খলীফা তাঁর পুত্র মুতামিনকে 'আসিম' প্রদেশের দিকে রওয়ানা করেন। মুতামিন রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সেনা অভিযান চালাতে শুরু করেন এবং আব্বাস ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন আশআছকে সেনান দুর্গ অবরোধের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। রোমানরা আক্রমণ ঠেকাতে ব্যর্থ হয়ে ৩২০ জন মুসলিম বন্দীকে ফেরত দিয়ে মুসলমানদের সাথে সন্ধি করে। ঐ সময়ে রোমানরা তাদের সম্রাজ্ঞী আইরীনকে পদচ্যুত করে তাঁর স্থলে নিসীফোরাস বা নিকফূর নামক জনৈক সর্দারকে তাদের সম্রাট পদে অভিষিক্ত করে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, রোমানরা ফ্রান্সের সম্রাট শার্লিমেনের ইতালী বিজয়ে প্রভাবান্বিত হয়ে হারূনুর রশীদের কাছে অনেকটা নতি স্বীকার করে সন্ধি করেছিল। এবার নিকফূর সিংহাসনে বসেই সর্বপ্রথম শার্লিমেনের সাথে আপোস-রফা করেন এবং সেদিকের সীমান্ত নির্ধারণ করে তথা সীমান্ত বিরোধ চুকিয়ে নিয়ে হারূনুর রশীদকে একটি পত্র লিখেন ঃ

> "সম্রাজ্ঞী তার নারীসুলভ দুর্বলতার দরুন তোমার সাথে নতি স্বীকার করে সন্ধি করেছিলেন এবং তোমাকে খারাজ (কর) প্রদান করে আসছিলেন। কিন্তু এটা ছিল তার অজ্ঞতাপ্রসূত সিদ্ধান্ত। এবার তুমি এ যাবত আমাদের সাম্রাজ্য থেকে গৃহীত সমুদয় কর ফেরত দাও এবং জরিমানাস্বরূপ আমাদেরকে কর প্রদান করো। অন্যথায় তরবারি দ্বারা তোমাদের সমুচিত শাস্তি দেয়া হবে।"

পত্রটি হারূনুর রশীদের হস্তগত হতেই তিনি ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। তাঁর মুখমণ্ডলে ক্রোধের লক্ষণ দেখে আমীর-উমারা ও মন্ত্রীবর্গ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে দরবার থেকে চুপি চুপি কেটে পড়লেন। হারূন তৎক্ষণাৎ দোয়াত-কলম নিয়ে ঐ পত্রেরই অপর পিঠে লিখলেন ঃ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আমীরুল মু'মিনীন হারূনুর রশীদের পক্ষ থেকে রোমের কুকুরের প্রতি। হে কাফিরের বাচ্চা! আমি তোর পত্র পাঠ করেছি। তার জবাব তুই নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করবি, শোনবার দরকার হবে না।–ইতি

এ জবাব লিখে তিনি পত্রটি পাঠিয়ে দিলেন এবং ঐ দিনই সসৈন্যে বাগদাদ থেকে রোম অভিমুখে যাত্রা করলেন। সেখানে উপস্থিত হয়েই তিনি রাজধানী হারকেলা অবরোধ করে

বসলেন। দিশাহারা হয়ে নিকফূর হারূনুর রশীদের খিদমতে উপস্থিত হয়ে ক্ষমাভিক্ষা করেন এবং তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে জিযিয়া দানের অঙ্গীকার করেন। হারূন নিকফূরকে পরাস্ত করে পূর্বের তুলনায় অধিক জিযিয়া দানের অঙ্গীকারে আবদ্ধ করে সেখান থেকে চলে আসেন। প্রত্যাবর্তন পথে রিক্কা পৌঁছেই তিনি সংবাদ পেলেন যে, নিকফূর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে আবার বিদ্রোহ করতে উদ্যত। তার নিশ্চিত ধারণা ছিল যে, শীতের তীব্রতার মধ্যে মুসলিম সৈন্যরা সহসা আর আক্রমণ করতে সমর্থ হবে না। কিন্তু হারূনুর রশীদ এ সংবাদ পাওয়া মাত্র রিক্কা থেকে আবার হারকেলা অভিমুখে রওয়ানা হলেন। এবার তিনি রোমানদের অনেক দুর্গ জয় ও ধ্বংস করে নিকফূরের অবস্থানস্থল পর্যন্ত গিয়ে উপস্থিত হলেন। এবারও নিকফূর বিনয়ের সাথে ক্ষমা ভিক্ষা করলেন। হারূন তার নিকট থেকে জিযিয়ার অর্থ কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করে ঐ রাজ্যের অধিকাংশে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে প্রত্যাবর্তন করেন। ঐ বছরই অর্থাৎ ১৮৭ হিজরীতে হযরত ইবরাহীম ইব্ন আদহাম ইন্তিকাল করেন।

১৮৮ হিজরীতে (৮০৪ খ্রি.) পুনরায় রোম সম্রাট নিকফূরের মধ্যে বিদ্রোহের লক্ষণ দেখা গেল। তাই ইবরাহীম ইব্ন জিবরাঈল সাফসাফ সীমান্ত দিয়ে রোমান সাম্রাজ্যের উপর আক্রমণ চালালেন। রোম সম্রাট নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েও সুবিধা করতে পারলেন না। চল্লিশ হাজার রোমান সৈন্যকে হত্যা করিয়ে ভীষণ পরাজয়বরণ করে তিনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করলেন। মুসলিম বাহিনী রোমানদেরকে পরাস্ত করে প্রত্যাবর্তন করে।

১৮৯ হিজরীতে (৮০৫ খ্রি.) খলীফা হারূনুর রশীদ রে-তে আগমন করেন এবং খুরাসানের দিকের প্রদেশগুলোর শাসনকর্তাদের পদে রদবদল করে শাসন পুনর্বিন্যাস করেন। ঐ সময় তিনি দায় লামের শাসকদের অভয়পত্র দিয়ে তার মন জয়ের চেষ্টা করেন। সীমান্ত এলাকার রঈস ও শাসকগণ তাঁর দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁর কাছে বশ্যতা স্বীকার এবং আনুগত্যের নিশ্চয়তা প্রদান করেন। হারূন এ সময় তারাবিস্তান, রে-, কোমস, হামদান প্রভৃতি এলাকার শাসনক্ষমতা আবদুল মালিক ইব্ন মালিককে অর্পণ করেন। এ বছর রোমান এবং মুসলমানদের মধ্যে বন্দী বিনিময় হয়। এ বছরই ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর শাগরিদ ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন হাসান শায়বানী রে-র নিকটবর্তী যাম্বইয়া পল্লীতে ইন্তিকাল করেন। ঐ একই দিন আরবী ব্যাকরণবিদ কাসাঈও ইন্তিকাল করেন। এরা দু'জনেই হারূনুর রশীদের সফরসঙ্গী ছিলেন। হারূনুর রশীদ উভয়েরই জানাযায় অংশগ্রহণ করেন। কবরস্তান থেকে ফিরে এসে হারূন মন্তব্য করেন যে, আজ ফিকাহ্ ও ব্যাকরণ দুটোকেই আমরা সমাধিস্থ করে আসলাম।

১৯০ হিজরীতে (৮০৬ খ্রি.) হারূনুর রশীদ তাঁর পুত্র মামূনকে তাঁর সহকারীরূপে রিক্কায় প্রতিষ্ঠিত করেন এবং রাষ্ট্রের যাবতীয় ক্ষমতা তাঁর হাতে অর্পণ করে রোম সম্রাট নিকফূরের বিশ্বাসভঙ্গের শাস্তি বিধানের উদ্দেশ্যে এক লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার সৈন্যসহ রোম সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন। তিনি হারকেলা শহর অবরোধ করেন এবং ত্রিশ দিনের অবরোধের পর তা জয় করে রোমানদেরকে হত্যা ও বন্দী করেন। তারপর দাউদ ইব্ন ঈসা ইব্ন মূসাকে সত্তর হাজার সৈন্যসহ রোমান সাম্রাজ্যের অন্যান্য দুর্গ জয়ের জন্যে প্রেরণ করেন। এ বাহিনী রোমান সাম্রাজ্যের ভিতরে নাড়া দেয়। ঐ সময় শারজীল ইব্ন মাআন ইব্ন যাইদা সাকালিয়া, বিস্‌সা ও অপরাপর দুর্গ জয় করেন। ইয়াজীদ ইব্ন মুখাল্লাদ কাওনিয়া জয় করেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন

মালিক জয় করেন বিখ্যাত যিলকিলা দুর্গ। আমীরুল বাহর হুমায়দ ইব্ন সায়ূফ মিসর ও সিরিয়া উপকূলের জাহাজসমূহের মেরামত করে সাইপ্রাস আক্রমণ করেন এবং সাইপ্রাসবাদীদেরকে পরাস্ত করে গোটা দ্বীপ জয় করে সতের হাজার লোককে বন্দী করে নিয়ে আসেন। তারপর হারূন তাওয়ানা অবরোধ করেন। মোদ্দাকথা গোটা রোমান সাম্রাজ্যকে তোলপাড় করে মুসলমানরা এবার নিত্যকার ঝগড়া চিরতরে অবসান করতে সংকল্প করেন। এবারও নিকফূর অত্যন্ত বিনীতভাবে বশ্যতা স্বীকার করে পঞ্চাশ হাজার দীনার জিযিয়া কর প্রেরণ করে। এর মধ্যে তার নিজের জিযিয়া হিসাবে চার দীনার এবং তার পুত্র প্যাট্রিয়কের জিযিয়া হিসাবে দুই দীনার সে প্রদান করে। সাথে সাথে খলীফা হারূনুর রশীদের কাছে আর্জি পেশ করেন যে, হারকেলার বন্দীদের মধ্যকার অমুক রমণীকে জাঁহাপনা যেন দয়া করে ফেরত পাঠিয়ে দিতে মর্জি করেন। কেননা তার সাথে আমার পুত্রের বিবাহ স্থির হয়েছে। খলীফা তার সে দরখাস্ত মঞ্জুর করেন এবং সত্যি সত্যি ঐ বন্দিনীকে ফেরত পাঠিয়ে দেন। নিকফূরের কাকুতি-মিনতির প্রেক্ষিতে বার্ষিক তিন লক্ষ দীনার জিযিয়া কর নির্ধারণ করে হারূনুর রশীদ প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু তাঁর প্রত্যাবর্তনের সাথে সাথে আবার রোমানরা বিদ্রোহ করে বসে। ঐ বছরই অর্থাৎ ১৯০ হিজরীতে (৮০৬ খ্রি.) মুসেলের গভর্নর পদে খলীফা খালিদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন হাতিমকে নিয়োগ করেন। ঐ বছরই তিনি হারছামা ইব্ন আয়ূনকে তারতূস দুর্গ নির্মাণের নির্দেশ দেন। খুরাসানের তিন হাজার এবং মাসীসা ও এন্টিয়কের এক হাজার সৈন্য তারতূস কেল্লা নির্মাণের কাজে নিয়োজিত থাকে। ১৯২ হিজরীতে (৮০৮ খ্রি.) কেল্লা নির্মাণ সমাপ্ত হয়। ঐ বছরই আযারবায়জানের খারমিয়া বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করে। তাকে দমনের জন্য আবদুল্লাহ্ ইব্ন মালিক দশ হাজার সৈন্যসহ প্রেরিত হন। আবদুল্লাহ্ বিদ্রোহীদেরকে পরাস্ত করে তাদেরকে বধ করেন। এভাবে এ ফিতনা নির্মূল হয়। ঐ বছরই অর্থাৎ ১৯০ হিজরীতে (৮০৫ খ্রি. ২৯শে নভেম্বর) ৩রা মুহাররম তারিখে বৃদ্ধ ইয়াহ্ইয়া বারমাকী ৭০ বছর বয়সে বন্দী অবস্থায় রিক্কায় ইন্তিকাল করেন। তাঁর পুত্র ফযল ইব্ন ইয়াহ্ইয়া জানাযার নামাযে ইমামতি করেন।

১৯১ হিজরীতে (৮০৬ খ্রি.) খলীফা মুহাম্মদ ইব্ন ফযল ইব্ন সুলায়মানকে মুসেলের গভর্ণর নিয়োগ করেন এবং ফযল ইব্ন আব্বাসকে মক্কার আমীর মনোনীত করেন।

খুরাসানে বিদ্রোহ

উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, আলী ইব্ন ঈসা খুরাসানের গভর্নর নিযুক্ত করায় বারমাকীরা ওহাব ইব্ন আবদুল্লাহ্ এবং হামযা ইব্ন আতরুককে দিয়ে বিদ্রোহ করিয়ে দেয়। ওহাব নিহত হয় কিন্তু হামযাকে কোন মতেই কাবু করা যায়নি। তখনো সে যত্রতত্র লুটপাট করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। খুরাসানের আমীর আলী ইব্ন ঈসা সমরকন্দও মাওরাউন্ নাহর অঞ্চলে ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আশআছকে শাসক নিযুক্ত করে রেখেছিলেন। মাওরাউন্ নাহরের সৈন্যবাহিনীতে রাফি ইব্ন লায়ছ ইব্ন নসর ইব্ন সাইয়ার ছিলেন একজন মশহুর সর্দার। এই রাফি ছিলেন বারমাকীদের সমর্থক এবং আলী ইব্ন ঈসা ও খলীফা হারূনুর রশীদের প্রতি বিদ্বিষ্ট মনোভাবের লোক। ঘটনাক্রমে ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আশআছ এক মহিলাকে বিবাহ করলে উক্ত রাফি ইব্ন

লায়ছ উক্ত মহিলাকে তার সাথে বিবাহ বসার জন্যে প্ররোচিত করে। মহিলা তখন ইয়াহ্ইয়ার নিকট থেকে বিচ্ছেদ প্রার্থনা করে কিন্তু ইয়াহ্ইয়া তাকে তালাক প্রদানে সম্মত হয় না। রাফি তখন তাকে কৌশল শিকিয়ে দিল যে, মহিলাটি যদি নিজের ধর্মত্যাগের কথা ঘোষণা করে এবং ধর্মচ্যুতির দু'জন সাক্ষীও রেখে দেয় তা হলে ইয়াহ্ইয়ার সাথে তার বিবাহ আইনত ভঙ্গ হয়ে যাবে। তারপর আবার তুমি ইসলাম গ্রহণ করে নেবে এবং তখন আমি তোমাকে বিবাহ করে নেবো। মহিলা উক্ত কৌশল অবলম্বন করে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে রাফির সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলো। সম্ভবত বিবাহ বিচ্ছেদের এ কৌশল সর্ব প্রথম রাফিই আবিষ্কার করেছিল। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আশআছ এ বিবরণ আনুপূর্বিক লিখে খলীফা হারূনুর রশীদকে তা অবহিত করলেন। হারূনুর রশীদ খুরাসানের গভর্নর আলী ইব্ন ঈসাকে লিখলেন যে, রাফি ও উক্ত মহিলাকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাফির উপর শরীয়তের বিধান অনুসারে দণ্ডাদেশ কার্যকরী কর এবং তাকে গাধার পিঠে চড়িয়ে সমরকন্দ শহর ঘুরিয়ে এর ঢোল-শহরত কর। সত্যি-সত্যি এ আদেশ কার্যকরী করতে গিয়ে রাফিকে উক্ত মহিলা থেকে বিচ্ছিন্ন করে সমরকন্দের কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। সুযোগ বুঝে কোন এক ফাঁকে রাফি সমরকন্দের কারগার থেকে পালিয়ে গিয়ে বল্খে গিয়ে খুরাসানের গভর্নর আলী ইব্ন ঈসার দরবারে উপস্থিত হয়। আলী ইব্ন ঈসা তাকে হত্যা করতে উদ্যত হন কিন্তু তার পুত্র ঈসা ইব্ন আলী তার সপক্ষে সুপারিশ করে বসেন। অগত্যা আলী ইব্ন ঈসা তাকে সমরকন্দ গিয়ে ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আশআছের সাথে দেখা করতে বলেন। রাফি সমরকন্দে পৌঁছে সেখানকার শাসক ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আশআছকে হত্যা করে সমরকন্দের দখল নিজ হাতে তুলে নেয়। এ সংবাদ পেয়ে আলী ইব্ন ঈসা তার পুত্র ঈসা ইব্ন আলীকে সৈন্যবাহিনীসহ সমরকন্দে প্রেরণ করেন। রাফির সাথে যুদ্ধে আলী পুত্র ঈসা নিহত হলেন। এ সংবাদ পেয়ে রাফি মার্ভ দখল করে ফেলতে পারে এ আশংকায় আলী ইব্ন ঈসা সৈন্যবাহিনী নিয়ে বল্খ থেকে মার্ভের দিকে রওয়ানা হয়ে যান। এটা ছিল ১৯১ হিজরীর (৮০৬ খ্রি) ঘটনা। খলীফা হারূনুর রশীদ রাফির এ দৌরাত্ম্যের সংবাদ অবগত হয়ে খুরাসানের শাসন-শৃংখলা রক্ষার্থে তাড়াতাড়ি তথায় এ সৈন্য বাহিনী পাঠিয়েছিলেন। আসল ব্যাপার হলো, খুরাসানের সৈন্যবাহিনীর সকল বড় বড় সর্দার এবং বারমাকী সমর্থকগণ সকলেই রাফির দলে ভিড়ে গিয়েছিল। হারছামা ইব্ন আইউন সমরকন্দে পৌঁছে রাফি ইব্ন লায়ছকে অবরোধ করেন। রাফি সমরকন্দে অবরুদ্ধ অবস্থায় দীর্ঘকাল অতিবাহিত করে।

হারূনের মৃত্যু

রোমানদেরকে দমন এবং নিকফূরকে পরাস্ত করে তাঁর কাছ থেকে জিযিয়া আদায় করার পর হারূনুর রশীদ রিক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন। এখানে এসে তিনি রাফির দৌরাত্ম্যের এবং খুরাসানের কোন কোন আমীরের বিদ্রোহী মনোভাবের সংবাদ অবহিত হন। তিনি স্বয়ং খুরাসানে যেতে মনস্থ করেন এবং সৈন্য সংগ্রহ করে ১৯২ হিজরীর (৮০৭ খ্রি) শাবান মাসে রিক্কা থেকে বাগদাদে এবং এরপর খুরাসানের দিকে রওয়ানা হয়ে পড়েন। যাত্রার সময় তিনি রিক্কায় মুতামিনকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে খুযায়মা ইব্ন খায়েমকে তাঁর কাছে রেখে যান।

বাগদাদে তিনি তাঁর পুত্র আমীনকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করেন এবং মামূনকেও বাগদাদে আমীনের কাছে অবস্থানের নির্দেশ দেন। মামূনের সেক্রেটারী তাঁকে বাগদাদে আমীনের কাছে অবস্থানের পরিবর্তে খলীফার সহগামী হওয়ার পরামর্শ দেন। সে অনুসারে মামূন খলীফার সহগামী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন এবং হারুনও তাঁর আকাঙ্ক্ষা মঞ্জুর করে নিয়ে তাঁকে সাথে নিয়ে নেন। বাগদাদ থেকে তাঁর যাত্রা শুরুর প্রাক্কালে রিক্কায় ফযল ইব্ন ইয়াহ্ইয়া বারমাকী ১৯৩ হিজরীর মুহাররম (৮০৮ খ্রি অক্টোবর) মাসে বন্দী অবস্থায় প্রাণত্যাগ করেন। বাগদাদ থেকে যাত্রা করে উক্ত বছরের সফর মাসে খলীফা জুরজানে উপনীত হন। জুরজানে পৌঁছে খলীফার অসুস্থতা বৃদ্ধি পায়। রোমান সাম্রাজ্যের দুর্গ ধ্বংসের সময় সর্বপ্রথম তাঁর এ পীড়ার সূত্রপাত হয়। এই পীড়া নিয়েই তিনি রিক্কায় আসেন এবং সেখান থেকে পীড়িত অবস্থায়ই বাগদাদে আসেন। এই পীড়া নিয়েই তিনি সসৈন্যে খুরাসান অভিযানে যান। খলীফা জুরজানে সমস্ত সর্দারের উপস্থিতিতে সেনাপতিদের সম্মুখে ঘোষণা করেন, এ অভিযানে শামিল সমস্ত সৈন্য-সামন্ত ও যুদ্ধাস্ত্র ইত্যাদি রয়েছে তা সবই থাকবে খুরাসানে এবং মামূনের আয়ত্তে। এ বাহিনী ও সর্দার সেনাপতি সকলেই মামূনের প্রতি অনুগত থাকবে। এভাবে মামূনকে রাজ্যলাভের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত করে তিনি তাঁকে মার্ভের দিকে রওয়ানা করে দিলেন এবং তাঁর সাথে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মালিক, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুআদ, আসাদ ইব্ন খুযায়মা, আব্বাস ইব্ন জা'ফর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আশআছ এবং নঈম ইব্ন হাযিম প্রমুখ সেনাপতিকেও প্রেরণ করলেন। মামূনকে মার্ভের দিকে রওয়ানা করে দিয়ে তিনি নিজে জুরজান থেকে রওয়ানা হয়ে তূসে গিয়ে উপনীত হন। এ সময় তাঁর সাথে ফযল ইব্ন রাবী, ইসমাঈল ইব্ন সাবীহ, মাসরূর, হাজিব, হুসাইন, জিবরাঈল ইব্ন বখতীশু প্রমুখ সেনাপতি ও অমাত্যরা ছিলেন। তূসে পৌঁছে পীড়া এতই বৃদ্ধি পায় যে, খলীফা শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। হারছামা ইব্ন আইউন এবং রাফি' ইব্ন লায়ছের মুকাবিলার কথা উপরে বর্ণিত হয়েছে। হারছামা তখনো রাফিকে কাবু করতে পারেননি। তবে বুখারী বিজিত হয় এবং রাফির সহোদর বশীর ইব্ন লায়ছ তখন বন্দী হয়ে গেছেন। হারছামা বশীরকে খলীফার সদনে প্রেরণ করেন। তূসে হারূনুর রশীদের রোগ শয্যার সম্মুখে বশীর নীত হন এবং খলীফার নির্দেশে নির্দয়ভাবে নিহত হন। বশীরকে হত্যার নির্দেশ দিয়েই খলীফা সংজ্ঞা হারান। সংজ্ঞা ফিরে আসার পর তিনি তখন যে গৃহে অবস্থান করছিলেন সে গৃহের এক কোণে কবর খননের নির্দেশ দিলেন। কবর খনন সমাপ্ত হলে কয়েকজন হাফিয কবরে অবতরণ করে কুরআন খতম করেন। হারূন তাঁর খাট কবরের পাশে বিছিয়ে খাট থেকেই শুয়ে শুয়ে কবর অবলোকন করতে থাকেন। এই অবস্থায়ই ৩রা জুমাদাস সানী ১৯৩ হিঃ মুতাবিক ৮০৮ খ্রস্টাব্দের ২৪শে মার্চ তারিখে রাতের বেলা খলীফা হারূনুর রশীদ ইন্তিকাল করেন। তাঁর পুত্র সালিহ্ জানাযার নামাযে ইমামতি করেন। এভাবে তাঁর ২৩ বছর আড়াই মাস কালব্যাপী শাসন আমলের অবসান ঘটে। তূসে তাঁর কবর রয়েছে।

হারূনুর রশীদের বিবাহ হয়েছিল মানসূর তনয় জা'ফরের কন্যা যুবায়দার সাথে। যুবায়দার কুনিয়ত বা উপনাম ছিল উম্মে জা'ফর। মুহাম্মদ আমীন তাঁরই গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হন। আলী, আবদুল্লাহ্, মামুন, কাসিম, মু'তামিন, মুহাম্মাদ মু'তাসিম, সালিহ্, মুহাম্মদ আবূ মূসা, মুহাম্মদ

আবূ ইয়াকূব, আবুল আব্বাস, আবূ সুলায়মান, আবূ আলী, আবূ আহ্মদ তাঁর এসব সন্তানেরই জন্ম দাসী মাতাদের গর্ভে। হারূনুর রশীদের উক্ত সন্তানদের মধ্যে আমীন, মামূন, মুতামিন ও মু'তাসিম এই চারজন সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন। মু'তাসিমের তেমন লেখাপড়া ছিল না। এজন্যে হারূন তাঁকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করার যোগ্য বিবেচনা করেননি, কিন্তু কালক্রমে তিনি খলীফা হন এবং তাঁরই বংশধরদের মধ্যে অনেক আব্বাসীয় খলীফার জন্ম হয় এবং তাঁরই মাধ্যমে হারূনুর রশীদের বংশধারা অব্যাহত থাকে। পুত্রদের মত মৃত্যুকালে হারূনুর রশীদ অনেক কন্যা সন্তানও রেখে যান– যাদের সকলেরই জন্ম হয় দাসী মাতাদের গর্ভে।

হারূনুর রশীদ আব্বাসী খলীফাদের মধ্যে বংশের সূর্য বলে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য। তাঁরই আমলে আব্বাসী বংশের খিলাফত সংহত হয় এবং উন্নতির শিখরে আরোহণ করে। হারূনুর রশীদের খিলাফত আমলে আবূ তালিব বংশীয় ও অন্যান্য ষড়যন্ত্রকারী মহলের সাহসে ভাটা পড়ে। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিদ্যানুরাগী। ধর্মীয় অনুশাসনের প্রতি তাঁর বিশেষ খেয়াল ছিল। যিন্দীক ও ধর্মদ্রোহীদের উৎখাতের কার্যটি তিনি পূর্ণোদ্যমে সম্পন্ন করেন। বিশাল রোমান গ্রীক ঈসায়ী সাম্রাজ্য ছিল তাঁর পদানত ও করদরাজ্য। মৃত্যুকালে তিনি রাজকোষে নব্বই কোটি স্বর্ণমুদ্রা রেখে যান। স্পেন ও মরক্কো ছাড়া গোটা মুসলিম জাহানের তিনি ছিলেন খলীফা। মানসূরের যুগেই পুস্তকাদি সংকলনের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল। হারূনুর রশীদের যুগে বাগদাদ-দরবারে ইহুদী ও ঈসায়ী পণ্ডিতদেরও অত্যন্ত সমাদর ছিল। ঈসায়ীদেরকে হারূন সামরিক নেতৃত্বভারও অর্পণ করতেন এবং তাদেরকে অমাত্যরূপ দরবারেও স্থান দিতেন। তাঁর শাসনামলে সিন্ধুর গভর্নরের মাধ্যমে এবং সরাসরি নিজের অনেক ভারতীয় পণ্ডিত বাগদাদে গিয়ে উপস্থিত হন। সেখানে তাঁদের খুব সমাদর হয়। হিব্রু ভাষায় অনেক গ্রন্থের আরবী অনুবাদ হয়। নানা শাস্ত্রের গ্রন্থাদি প্রণয়নের ধারার সূচনা ঘটে। বাগদাদের অধিবাসীদের সুখ-শান্তি ও ঐশ্বর্য ছিল। এজন্যে বাগদাদে কাব্য, সাহিত্য ও সঙ্গীতের চর্চাও বিদ্যমান ছিল। কাহিনীকাররা তাঁর জীবনী সম্পর্কে অনেক কাহিনী ও রূপকথার জন্ম দেয় এবং সে সব রূপকথা বিশ্বময় প্রচারিত হয়। এজন্যে এই খলীফা সম্পর্কে অনেক ভ্রান্তধারণারও উদ্ভব হয়। হারূনুর রশীদ অত্যন্ত সাহসী ও সামরিকমনা ব্যক্তিত্ব ছিলেন। অম্লান বদনে তিনি ঘোড়ার জিনে বসে মাসের পর মাস এমনকি বছরও কাটিয়ে দিতেন। কিন্তু যখন তিনি সূফী-সাধকের মজলিসে বসতেন তখন তাঁকে এক সংসারত্যাগী দরবেশ বলে মনে হতো। ফকীহ্দের দরবারে যখন তিনি উপবেশন করতেন তখন তাঁকে একজন উঁচুদরের ফকীহ্ এবং মুহাদ্দিসের মজলিসে উপবেশন করলে একজন উঁচুদরের মুহাদ্দিস বলে বিশ্বাস জন্মাতো। কেবল একটি শ্রেণীর তিনি জাতশত্রু ছিলেন; তারা হলো যিন্দীক ও ধর্মদ্রোহীর দল। অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি তিনি অত্যন্ত সহনশীল ছিলেন এবং তাদের সাথে অত্যন্ত ভদ্র আচরণ করতেন। হজ্জ, জিহাদ ও দান-খয়রাত তিন কাজেই তাঁর সমান উৎসাহ ছিল। তিনি অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। কেউ যখন তাঁকে উপদেশ দিতেন এবং দোযখের ভয় প্রদর্শন করতেন, তখন তিনি অঝোরে ক্রন্দন করতেন।

একদা ইব্ন সাম্মাক হারূনের দরবারে উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় হারূনের খুব তৃষ্ণা পেল। হারূন পানি পান করতে যাচ্ছেন এমনি সময় ইব্ন সাম্মাক বলে উঠলেন, আমীরুল মু'মিনীন, একটু থামুন! হারূনুর রশীদ তক্ষুণি থেমে গিয়ে বললেন ঃ জী বলুন!

দরবেশ বললেন, আচ্ছা বলুন দেখি, তীব্র পিপাসার সময় যদি পানি একান্তই দুর্লভ হয় তখন এক পেয়ালা পানির জন্যে আপনি কতটা মূল্য দিতে সম্মত হবেন ?

জবাবে হারূনুর রশীদ বললেন ঃ এজন্যে প্রয়োজন হলে অর্ধেক সাম্রাজ্য দান করব। তখন ইব্ন সাম্মাক বললেন ঃ আচ্ছা আপনি পানি পান করে নিন!

খলীফার পানি পান করা শেষ হলে দরবেশ আবার তাকে প্রশ্ন করলেন ঃ আচ্ছা আমীরুল মু'মিনীন, বলুন দেখি, সে পানি যদি আপনার পেটেই রয়ে যায়, বের না হয় তা হলে কী পরিমাণ অর্থ আপনি এটা বের করার জন্য ব্যয় করতে সম্মত আছেন ?

জবাবে হারূনুর রশীদ বললেন, এ জন্যে প্রয়োজন হলে অর্ধেক রাজত্ব দিয়ে দেব। এবার দরবেশ বলে উঠলেন, এবার বুঝে নিন, আপনার এ গোটা রাজত্বের মূল্য হচ্ছে এক পেয়ালা পানি এবং একটু পেশাব। এজন্যে আপনার গর্বিত হওয়া সাজে না। দরবেশের এ উপদেশ বাক্য শুনে হারূনুর রশীদ কেঁদে ফেললেন এবং দীর্ঘক্ষণ ধরে তাঁর এ কান্নাকাটি অব্যাহত ছিল।

একদা হারূনুর রশীদ জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তিকে বললেন ঃ আমাকে উপদেশ দিন! তিনি বললেন, আপনার কোন মোসাহেব যদি আপনাকে ভীতি প্রদর্শন করে আর তার ফল ভাল হয় তবে ঐ মোসাহেবটি ঐ মোসাহেবের তুলনায় উত্তম যে আপনাকে ভয়মুক্ত করে দেয় অথচ তার পরিণাম মন্দ।

হারূনুর রশীদ বললেন ঃ ব্যাপারটি একটু খুলেই বলুন যাতে তা উত্তমরূপে হৃদয়ংগম করতে পারি। দরবেশ বললেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি আপনাকে বলে যে, কিয়ামতের দিন আপনাকে প্রজাদের ব্যাপারে আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে, সুতরাং আপনি আল্লাহ্কে ভয় করুন! তবে সে ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির চাইতে উত্তম যে আপনাকে বলে যে, আপনি নবী পরিবারের নিকটাত্মীয়, নবী করীম (সা)-এর সাথে বংশগত নৈকট্যের দরুন আপনার সকল গোনাহ্ই মাফ হয়ে গেছে। একথা শুনে হারূন এমনিভাবে অশ্রুপাত করলেন যে, দর্শকমাত্রেরই তাঁর প্রতি করুণার উদ্রেক হলো।

কাযী ফাযিলী বলেন, দুইজন বাদশাহ ছাড়া তৃতীয় এমন কেউ নেই যিনি জ্ঞানান্বেষণ নিমিত্ত সফর করেছেন। তাঁদের একজন হচ্ছেন হারূনুর রশীদ। তিনি তাঁর পুত্রদ্বয় আমীন ও মামূনকে নিয়ে ইমাম মালিকের খিদমতে তাঁর মুয়াত্তার জ্ঞানার্জনের জন্যে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি মুয়াত্তার যে কপিটি থেকে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন তা মিসরের বাদশাহদের কাছে সংরক্ষিত থাকতো। অপর ভাগ্যবান বাদশাহ হচ্ছেন সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ূবী—যিনি মুয়াত্তারই শিক্ষা লাভের মানসে আলেকজান্দ্রিয়া সফর করেছিলেন।

হারূনুর রশীদের পোলো খেলার এবং তীর-ধনুকের মাধ্যমে লক্ষ্যভেদের অভ্যাস ছিল। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর। তাঁর চিকিৎসার ব্যাপারে হেকীম জিবরাঈলের ভুলের দরুন তাঁর মৃত্যু ত্বরান্বিত হয়। হারূনুর রশীদের সফর সঙ্গীদের মধ্যে এই হেকীম ছিলেন তাঁর পুত্র আমীনের সমর্থক। অপর দিকে হাজিব মাসরূর ছিল মামূনের সমর্থক। হারূনুর রশীদ যখন সফরে ছিলেন এবং তাঁর রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েই চলেছিল তখন

খলীফা তনয় আমীন বকর ইব্ন মুতামির-এর মাধ্যমে হারূনের সফরসঙ্গীদেরকে এমন কিছু চিঠিপত্র পাঠিয়েছিলেন– যাতে খলীফাকে মৃত্যু ধরে নিয়ে তাঁর নিজের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের আহ্বান ছিল। একটি পত্রে আমীন তাঁর ভাই সালিহ্‌কে লিখেন যে, লোক-লশকর, যুদ্ধাস্ত্র ও অর্থ-সম্পদ নিয়ে ফযল ইব্ন রাবীর সাথে পরামর্শক্রমে কালবিলম্ব না করে রাজধানীতে চলে এসো। এ মর্মে পত্র খলীফার অন্য অনেক সফর সঙ্গীকেও লিখিত হয়। একটি পত্র ফযল ইব্ন রাবীর নামেও ছিল। এরূপ পত্রে আমীন সকলকে তাদের নিজ নিজ পদে বহাল রাখার অঙ্গীকারও করেছিলেন। ঘটনাক্রমে হারূনুর রশীদ বকর ইবনুল মুতামিরের বাগদাদ থেকে আগমনের সংবাদ অবগত হন। তিনি বকরকে কাছে ডেকে তার আগমনের হেতু কি জিজ্ঞেস করেন। সে কোন সঙ্গত জবাব দিতে না পারায় খলীফা তাকে গ্রেফতার করার নির্দেশ দেন এবং তার অব্যবহিত পরেই তাঁর ইন্তিকাল হয়ে যায়। ফযল ইব্ন রাবী বকরকে কারামুক্ত করেন। তখন বকর আমীনের লিখিত পত্রগুলো হস্তান্তরিত করে। সর্দাররা এ নিয়ে সলা-পরামর্শ করেন। যেহেতু সকলেই বাগদাদে প্রত্যাবর্তনের জন্য ব্যগ্র ছিলেন এজন্যে লোক-লশকর ও ধন-সম্পদ নিয়ে ফযল ইব্ন রাবী বাগদাদ অভিমুখে রওয়ানা হয়ে পড়লেন। হারূনের অন্তিম উপদেশ এবং মামূনের ব্যাপারে তা ওসীয়তের কথা কেউ আর স্মরণ রাখল না।

আমীনুর রশীদ ইব্ন হারূনুর রশীদ

মুহাম্মাদ আমীন ইব্ন হারূন ইব্ন মাহদী ইব্ন মানসূর আব্বাসীর জন্ম হয় যুবায়দা খাতুনের গর্ভে। আমীন ও মামূন দু'জনই ছিলেন সমবয়স্ক। হারূনুর রশীদের আমীনকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করেন, কিন্তু সাথে সাথে মামূনকে খুরাসান প্রভৃতি পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যের স্বতন্ত্র শাসক মনোনীত করে আমীনকে ওসীয়ত করেন যে, মামূনকে যেন খুরাসানের শাসক পদ থেকে অপসারিত করা না হয়। সাথে সাথে মামূনকেও তিনি আমীনের নেতৃত্ব কর্তৃত্ব অস্বীকার করতে বারণ করে যান। তূসে যখন হারূনুর রশীদের ইন্তিকাল হয় মামূন তখন মার্ভে এবং আমীন বাগদাদে। সালিহ্ পিতার সাথে তূসেই ছিলেন। হারূনের মৃত্যুর পরদিন অর্থাৎ ৪ঠা জুমাদাস সানী ১৯৩ হিজরীতে (৮০৯ খ্রি ফেব্রুয়ারী) হারূনের সেনাপতি সর্দার ও অমাত্যরা আমীনের সপক্ষে সালিহ্-এর হাতে খিলাফতের বায়আত করেন। ডাক বিভাগের অধ্যক্ষ হাম্মুভীয়া সাথে সাথে বাগদাদে অবস্থিত তাঁর নায়েবকে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করেন। নায়েব কালবিলম্ব না করে যথাসময়ে আমীনকে হারূনের মৃত্যু এবং তাঁকে খলীফা বলে অমাত্যদের স্বীকার করে নেয়ার সংবাদ অবহিত করেন। হারূন পুত্র সালিহ্ও এ সংবাদটি তাঁর নিজের পক্ষ থেকে আমীনকে পত্র মারফত অবহিত করে তাঁকে মুবারকবাদ জ্ঞাপন করেন। সাথে সাথে তিনি খলীফার সীলমোহর, রাজদণ্ড ও আঙ্গুরীয় অগ্রজ আমীনের খিদমতে পাঠিয়ে দেন। এসময় হারূন মহিষী ও আমীনের গর্ভধারিণী বেগম যুবায়দা খাতুন রিক্কায় অবস্থান করছিলেন। রাজকোষ তখন তাঁরই হাতে ছিল। আমীন এ সংবাদ ও পত্রাদি লাভের প্রেক্ষিতে জামে মসজিদে উপস্থিত হয়ে খুতবা প্রদান করলেন। তিনি খলীফা হারূনুর রশীদের ইন্তিকালের কথা জনগণকে অবহিত করলেন এবং জনগণের বায়আত গ্রহণ করলেন।

এ সংবাদ পেয়ে যুবায়দা খাতুন রাজকোষসহ রিক্কা থেকে বাগদাদ অভিমুখে যাত্রা করলেন। সংবাদ পেয়ে আমীন আম্বার পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন এবং অত্যন্ত মর্যাদা সহকারে বাগদাদে নিয়ে আসলেন। মামূন পিতার মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে মার্ভে সেনাপতিবর্গ ও সেখানে উপস্থিত অমাত্যদেরকে সমবেত করলেন এবং তাঁদের কাছে নিজের করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ চাইলেন। এই সর্দার ও সিপাহ্সালারদের মধ্যে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মালিক, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুআয, শাবীব ইব্ন হুমায়দ ইব্ন কাহ্তাবা, আল্লামা হাজি, আব্বাস ইব্ন যুহায়র, আইউব ইব্ন আবূ সুমায়র, আবদুর রহমান ইব্ন আবদুল মালিক ইব্ন সালিহ্, ফযল ইব্ন সাহল প্রমুখ ছিলেন উল্লেখযোগ্য। বাগদাদ থেকে রওয়ানা হয়ে জুরজান পর্যন্ত মামূনসহ এদের সবাই হারূনের সাথেই ছিলেন। এ সফরে ফযল ইব্ন সাহ্ল সিপাহসালার ও সর্দারদেরকে মামূনের পক্ষে টানার চেষ্টা চালান। ফলে অনেকে মামূনের সমর্থনে সবকিছু করার অঙ্গীকারও করেছিলেন। কিন্তু ফযল ইব্ন রাবী ছিলেন আমীনের সমর্থক। এবার হারূনুর রশীদের ওফাতের পর ফযল ইব্ন রাবীর চেষ্টার ফলে তূসে উপস্থিত সকলেই আমীনের পক্ষে বায়আত করে বাগদাদে রওয়ানা হয়ে পড়লেন। তাঁরা একটি বারের জন্যেও চিন্তা করলেন না যে, খলীফার ওসীয়ত অনুসারে আমাদেরকে এখন মামূনের দরবারে উপস্থিত হওয়া কর্তব্য। কেননা, সেই ওসীয়ত অনুসারে এসব এখন মামূনের। খলীফার ওসীয়ত অনুসারে যারা খুরাসানে ও পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহে মামূনের আধিপত্যের সমর্থক ছিলেন সেই সব সেনাপতির কেউ কেউ পরামর্শ দিলেন যে, ফযল ইব্ন রাবী এখনো পথে রয়েছেন, এখান থেকে সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে তাকে মার্ভে নিয়ে আসা হোক। কিন্তু ফযল ইব্ন সাহ্ল এ ব্যাপারে ভিন্নমত প্রকাশ করে বললেন যে, যদি এভাবে তাদেরকে মার্ভে আসতে বাধ্য করা হয় তা হলে এরা প্রতারণাপূর্বক আনুগত্য প্রকাশের মাধ্যমে ভীষণ অনর্থের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। অবশ্য যারা ইতিপূর্বে মামূনের সমর্থনের অঙ্গীকার করেছিলেন তাঁদেরকে খলীফার ওসীয়ত এবং তাঁদের পূর্ব অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে পয়গাম পাঠানো যেতে পারে। সে মতে দুইজন কাসেদ প্রেরণও করা হলো। কিন্তু তারা যখন ফযল প্রমুখের কাছে গিয়ে পৌঁছলেন, তখন সকলকেই বৈরী ভাবাপন্ন দেখতে পেলেন। কেউ কেউ তো প্রকাশ্যে মামূনকে গালমন্দও করলেন। কাসেদদ্বয় অতিকষ্টে প্রাণ বাঁচিয়ে ফিরে আসলেন এবং সেখানকার অবস্থা সবিস্তারে মামূনের কাছে বিবৃত করলেন। মামূন এ ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন যে, তাঁকে পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহে তিষ্টাতে দেয়া হবে না। এজন্যে তিনি অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন। এদিকে ফযল ইব্ন সাহল পণ করে বসলেন যে, যেভাবেই হোক, মামূনকে খলীফা বানিয়েই ছাড়বো। মামূনের সঙ্গীদের মধ্যে এমনও অনেক ছিলেন যারা তাকে খলীফা বানানোর পক্ষপাতী ছিলেন না সত্য তবে পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহে তাঁর আধিপত্যকে তাঁরা সমর্থন করতেন। ফযল ইব্ন সাহ্ল এবং তাঁর সমর্থকরা আমীনকে খলীফারূপে মেনে নিতেই নারাজ ছিলেন। তাঁরা যে কোন মুল্যে মামূনকে খলীফারূপে প্রতিষ্ঠিত করার পক্ষপাতী ছিলেন। ফযল ইব্ন সাহ্লের পিতা সাহ্ল ছিলেন একজন নওমুসলিম অগ্নিপূজক যিনি হারূনুর রশীদের আমলে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। হারূনুর রশীদই সাহলের পুত্র ফযলকে মামূনের সচিবরূপে নিয়োগ করেন। অগ্নিপূজক বংশোদ্ভূত হওয়ার দরুন তিনি মামূনকেই খলীফারূপে প্রতিষ্ঠিত করতে আগ্রহী ছিলেন।

প্রকৃত ব্যাপার হলো, আমীনের জন্মদাত্রী ছিলেন হাশিমিয়া বংশের রমণী। সেজন্য আরবদের সমর্থন ছিল তাঁর পক্ষে। পক্ষান্তরে মামূনের জন্মদাত্রী ছিলেন ইরানী বংশোদ্ভূত। এজন্য ইরানী ও খুরাসানীরা ছিল মামূনের শুভাকাঙ্ক্ষী। আমীন বাগদাদে আরবদের মধ্যে ছিলেন। এদিকে মামূনও মার্ভে তাঁর সমর্থকগোষ্ঠী অর্থাৎ ইরানীদের মধ্যে ছিলেন। যুবায়দা খাতুন মামূনকে পছন্দ করতেন না। আবার আব্বাসীদের শুভাকাঙ্ক্ষী আরব সর্দাররা উলুভীদেরকে পছন্দ করতেন না। কিন্তু খুরাসানে উলুভীদের সমর্থকদের সংখ্যা ছিল প্রচুর। জা'ফর বারমাকী উলুভীদের সমর্থক এবং মামূনের গৃহশিক্ষক ছিলেন। এজন্যে খুরাসান প্রভৃতি পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যে মামূনের জনপ্রিয়তা ছিল বেশি। ফযল ইব্‌ন রাবী প্রমুখ বারমাকীদেরকেও ঘৃণা করতেন, আবার মামূনের প্রতিও প্রসন্ন ছিলেন না। মোটকথা মামূন ও আমীনের মধ্যে বনিবনা ছিল না। তাঁদের পাশেও এমন সব লোক জমায়েত হয়েছিল যারা দু'টি পরস্পর বিরোধী শিবিরে বিভক্ত ছিল। তাই হারূনের মৃত্যুর সাথে সাথে আমীন ও মামূনের নেতৃত্বে উভয় শিবিরের মধ্যে শক্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি শুরু হলো। তাদের একদল অপরদলের ওপর মোটেও সন্তুষ্ট ছিল না। মামূন খুরাসানবাসীদের অন্তর জয় করার জন্যে তাদের এক-চতুর্থাংশ খারাজ মওকুফ করে দিলেন এবং খুরাসানী সর্দারদেরকে বড় বড় পদে নিয়োগের অঙ্গীকার ব্যক্ত করলেন। ইরানবাসীরা উল্লসিত হয়ে বলতে শুরু করলেন, মামূনুর রশীদ হচ্ছেন আমাদের বোন-পো। সুতরাং তিনি নিশ্চয়ই আমাদেরকে পদোন্নতি দান করবেন। এদিকে মামূন মার্ভের উলামা ও কূফীদেরকে ডেকে জনগণকে তাঁর সপক্ষে টানার উদ্দেশ্যে ওয়ায-নসীহত করার জন্যে বলে দিলেন যাতে পরিস্থিতি তাঁর অনুকূলে থাকে। এতদসত্ত্বেও আমীনের খিদমতে উপঢৌকনাদিসহ বিনয়-সম্ভাষণপূর্ণ পত্র প্রেরণ করে আপন আনুগত্যের নিশ্চয়তা প্রদান করে মামূন অত্যন্ত বিচক্ষণতার পরিচয় দিলেন।

খলীফা আমীনুর রশীদ যদি বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিতেন, তবে মামূনুর রশীদের পক্ষ থেকেই অবৈধ আক্রমণের সূচনা হতো এবং বিশ্বের দরবারে তিনিই নিন্দিত হতেন। এতে হয়ত তাঁর পক্ষে সাফল্য অর্জন সম্ভব হতো না। কিন্তু ফযল ইব্‌ন রাবী প্রমুখ মন্ত্রণাদাতার কুপরামর্শে তিনি এমনি অদূরদর্শী তৎপরতায় লিপ্ত হলেন যে, জনসমক্ষে খুব শিগগিরই হারূনুর রশীদের সিংহাসনের অনুপযুক্ত বলে প্রতিপন্ন হলেন। সিংহাসনে আরোহণ করেই সর্বপ্রথম তিনি তাঁর ভাই কাসিম অর্থাৎ মু'তামিনকে জাযিরার হুকুমত থেকে পদচ্যুত করার ভুলটি করে কেবল কানসারা ও আওয়াসিম প্রদেশের শাসনভার তাঁর হাতে রাখলেন। জাযিরা রাজ্যে তিনি খুযায়মা ইব্‌ন খাযিমকে গভর্নর নিয়োগ করলেন। ঐ বছরই অর্থাৎ সিংহাসনে আরোহণের অব্যবহিত পরেই তিনি মামূনের পরিবর্তে তাঁর আপন পুত্র মূসা ইব্‌ন আমীনকে ফযল ইব্‌ন বারীর পরামর্শক্রমে যুবরাজ মনোনীত করতে গিয়ে মামূনকে বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার সুযোগ করে দিলেন। (পূর্বেই উক্ত হয়েছে যে, মৃত্যুর প্রাক্কালে) যখন হারূনুর রশীদ খুরাসান যাত্রা করছিলেন তখনই তিনি ঘোষণা করে দিয়েছিলেন যে, এ লশকর এবং সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম মামূনুর রশীদের হস্তে খুরাসানেই থাকবে এবং মামূনই এর স্বত্বাধিকারী হবেন। কিন্তু, ফযল ইব্‌ন রাবী, সমস্ত লোক-লশকর ও যুদ্ধ সরঞ্জামাদি যা তখন তূসে খলীফার সাথে ছিল—সব কিছু নিয়ে বাগদাদ রওয়ানা হয়ে পড়েন। এভাবে তিনি মামূনকে অত্যন্ত দুর্বল

করে ফেলেছিলেন। এজন্যে তাঁর মনে আশংকা ছিল যে, আমীনের পরে যদি মামূন সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং শীঘ্রই খলীফা হয়ে যান, তাহলে মামূন নিশ্চয়ই এর প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। এজন্যে যে কোন মূল্যে মামূনকে যুবরাজের পদ থেকে বঞ্চিত রাখার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর ছিলেন। ঐ একই আশংকা ছিল খুরাসানের ভূতপূর্ব গভর্নর আলী ইব্‌ন ঈসারও। এজন্যে তিনিও ফযল ইব্‌ন রাবীর পরামর্শের প্রতি দৃঢ় সমর্থন দেন এবং মামূনকে যুবরাজ পদ থেকে অপসারণের জন্যে আমীনকে প্ররোচিত করেন। কিন্তু খুযায়মা ইব্‌ন খাযিমের কাছে যখন ব্যাপারটি উত্থাপন করা হলো তখন তিনি এ পরামর্শের ঘোর বিরোধিতা করলেন এবং খলীফাকে এ আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত গ্রহণে নিবৃত রাখলেন। এসব খবর অরহর মামূনের কাছে পৌঁছেছিল। কিন্তু তিনি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব রইলেন এবং পানি কোন্ দিকে গড়ায় তা দেখার জন্যে প্রতীক্ষায় থাকলেন।

মামূন সকাশে রাফি ও হারছামা

উপরেই বর্ণিত হয়েছে যে, হারছামা ইব্‌ন আইউন সমরকন্দে রাফিকে অবরোধ করে রেখেছিলেন। রাফির পরাস্ত হওয়ার পূর্বেই তূসে হারূনুর রশীদের মৃত্যু হয়। রাফির সহোদর বশীর বন্দী হয়ে খলীফার দরবারে নীত হয় এবং তাঁরই নির্দেশে নিহত হয়। হারূনের মৃত্যুর পর হারছামা বাহুবলে সমরকন্দ পুনর্দখল করলেন এবং সেখানেই অবস্থান করতে লাগলেন। তাহের ইব্‌ন হুসাইনও ছিলেন ঐ সময় হারছামার সাথী। রাফি ইব্‌ন লাইছ সমরকন্দ থেকে পালিয়ে তুর্কীদের মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নেয় এবং একটি তুর্কী বাহিনী সাথে নিয়েই পুনরায় সমরকন্দে হারছামার সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এ যুদ্ধে রাফি পরাজিত হয়। তারপর তুর্কীদের সাথেও রাফির মনোমালিন্য শুরু হয়। ফলে সে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। সে যথারীতি মামূনের দরবারে দূত পাঠিয়ে নিরাপত্তা প্রার্থনা করে। মামূন তাকে নিরাপত্তা প্রদান করেন এবং সে মার্ভে মামূনের দরবারে উপস্থিত হয়। সেখানে তাকে মর্যাদাপূর্ণ আতিথ্য প্রদান করা হয় এবং অল্প কয়েকদিন পরেই হারছামাও মামূনের দরবারে উপস্থিত হন। মামূন তাঁকে তাঁর রেকাবী ফৌজের প্রধান পদে অধিষ্ঠিত করেন। এ সময়ে মামূন আব্বাস ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মালিককে রে-র গভর্নর পদ থেকে পদচ্যুত করেন।

আমীন-মামূনের সুস্পষ্ট বিরোধ

বাগদাদে আমীনের কাছে খবর পৌঁছল যে, মামূন হারছামাকে তাঁর রেকাবী বাহিনীর প্রধান পদে অধিষ্ঠিত করেছেন, রাফিকে সসম্মানে পারিষদভুক্ত করেছেন এবং রে-রাজ্যের গভর্নর পদ থেকে আব্বাস ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌কে পদচ্যুত করেছেন। এ সংবাদ পেয়েই অহেতুক তিনি ক্ষুব্ধ হলেন এবং খুতবা থেকে মামূনের নাম কেটে দিয়ে আপন পুত্রের নাম যুবরাজরূপে খুতবাভুক্ত করলেন। সাথে সাথে তিনি আব্বাস ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন ঈসা ইব্‌ন জা'ফর এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা ইব্‌ন নাহীককে দূতরূপে এ পয়গাম দিয়ে মামূনের কাছে পাঠালেন যে, আমার পুত্র মূসা তোমার পূর্বেই যুবরাজ হবে, এ ব্যাপারে তুমি সম্মত হয়ে যাও এবং এ মাসে সাধারণ্যে ঘোষণা দিয়ে দাও যে, মূসা ইব্‌ন আমীন প্রথম যুবরাজ। মামূন এ প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলেন। কিন্তু ফযল ইব্‌ন সাহ্‌ল এ মওকায় আব্বাস ইব্‌ন মূসাকে সপক্ষে টেনে এ ব্যাপারে সম্মত করে

ফেললেন যে, তিনি বাগদাদে অবস্থান করে গুপ্তচরের কাজ করবেন এবং জরুরী সংবাদগুলো যথাসময়ে সরবরাহ করবেন। আমীন খুরাসানের কোন কোন অঞ্চলও ছেড়ে দেয়ার জন্যে মামূনকে নির্দেশ দিলেন। মামূন তাঁর এ আবদারও প্রত্যাখ্যান করলেন। মামূন যখন সংবাদ পেলেন যে, বাগদাদে আমীন খুতবা থেকে তাঁর নাম বাদ দিয়ে দিয়েছেন তখন তিনিও পাল্টা ব্যবস্থারূপে খুরাসানে খুতবা থেকে আমীনের নাম বাদ দিয়ে দিলেন। এ সময়ে আমীন কা'বাগৃহে হারূনুর রশীদ রক্ষিত সেই দলীলও খুলে নিয়ে ছিঁড়ে ফেললেন। এটা ১৯৪ হিজরীর (৮০৯ খ্রি) শুরুর দিকের কথা। এবার আমীনের বিরোধিতা করার পূর্ণ অধিকার মামূনের অর্জিত হলো। মামূন অত্যন্ত সতর্কতার সাথে খুরাসান সীমান্ত বন্ধ করে দিলেন যাতে আমীনের কোন দূত বা পত্র খুরাসানে পৌঁছে বিদ্রোহের বহ্নি জ্বালিয়ে দিতে না পারে।

প্রদেশসমূহে অশান্তি

যখন দুই ভাইয়ের বিরোধ, কা'বাগৃহ থেকে দস্তাবেজ তুলে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলা এবং খুতবা থেকে পরস্পরের নাম প্রত্যাহার করে নেয়ার ব্যাপারটি জানাজানি হয়ে গেল, তখন চারদিকের সুযোগ সন্ধানীরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। তিব্বতের খাকান, তুর্কী রাজন্যবর্গ এবং কাবুলের বাদশাহর মতো মুসলিম সাম্রাজ্যের করদরাজ্যসমূহের রাজারা বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করলেন। তারা মুসলিম রাজ্যসমূহে লুটপাট, চোরাগোপ্তা হামলা ও প্রকাশ্য আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগলো। এ সব সংবাদ শ্রবণে মামূন চিন্তিত হলেন। কিন্তু ফযল ইব্‌ন সাহলের পরামর্শ মুতাবিক এসব রাজা-বাদশাহকে নম্রতাপূর্ণ এবং বন্ধু-ভাবাপন্ন পত্রাদি লিখলেন। তিনি কারো রাজস্বকর মওকুফ করে, কাউকে অন্যভাবে সুবিধাদি দিয়ে তাদের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করলেন। ফলে মামূনের এ দুশ্চিন্তা শিগগির কেটে গেল। দেশের অভ্যন্তরে আর কোনরূপ বিশৃংখলার সুযোগ রইল না। কেননা খুরাসানবাসীরা মনেপ্রাণে মামূনের সমর্থক ছিল। তাঁরা আরবপন্থী আমীনকে পরাস্ত দেখতে আগ্রহী ছিল। এদিকে পশ্চিমাঞ্চল তথা আমীনের শাসনাধীন রাজ্যসমূহে যে অশান্তি দেখা দিল তা অত্যন্ত বিপজ্জনক প্রতিপন্ন হলো। সিরিয়ায় বনূ উমাইয়া বংশের কেবল একব্যক্তি বেঁচে ছিলেন যার নাম আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন মুআবিয়া। তাঁর মা ছিলেন নফীসা বিন্‌ত উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব। ইনি সুফিয়ানী নামে খ্যাত ছিলেন। তিনি বলতেন ঃ আমি সিফ্‌ফীন যুদ্ধের সর্দারদের অর্থাৎ মুআবিয়া (রা) ও আলী (রা)-এর বংশধর। তিনি অত্যন্ত বিদ্যাধর এবং সচেতন পুরুষ ছিলেন। আমীন ও মামূনকে পরস্পর যুদ্ধোদ্যত দেখে সুযোগ বুঝে তিনি সিরিয়ায় বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করেন। সিরিয়ায় অবস্থান রত বনূ উমাইয়া সমর্থক গোত্রসমূহ তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালো। আমীন সিরিয়ায় অভিযান চালিয়েও পরাস্ত হলেন। কয়েক বছর পর্যন্ত সেখানে হাঙ্গামা রইল। অবশেষে ১৯৮ হিজরীতে (৮১৩ খ্রি) সুফিয়ানী কোন কোন শামী গোত্রের হাতে পর্যুদস্ত হয়ে সিরিয়া থেকে ফেরার হয়ে যায়। এবার সিরীয়রা দামেশ্‌ক দখল করে নেয়। আমীন যখন খানাকা'বা থেকে দস্তাবেজ উঠিয়ে ছিঁড়ে ফেলেন এবং দাউদ ইব্‌ন ঈসা এ নির্দেশ পালনে অস্বীকৃতি জানিয়ে মক্কা-মদীনা তথা হিজায প্রদেশের অধিবাসীদেরকে এ মর্মে বুঝালেন যে, আসলে এভাবে আমীনও মামূনের প্রতি

অবিচারই করেছেন। আমাদের উচিত হবে খলীফা হারূনুর রশীদের সাথে অথবা মামূনকে সাহায্য-সহযোগিতা করার যে অঙ্গীকার করেছি তার উপর অবিচল থাকা এবং আমীনের দুধের শিশু মূসার প্রতি আনুগত্যের শপথ না নেয়া। দাউদ ইব্ন ঈসার এ প্রচেষ্টার ফল দাঁড়ালো এই যে, হিজাযবাসীরা একবাক্যে মামূনের পক্ষে দাঁড়িয়ে গেল এবং আমীনের নাম তারা খুতবা থেকে বাদ দিয়ে দিল। তারা মামূনকেই খলীফা বলে স্বীকার করে নিল। দাউদ ইব্ন ঈসা মক্কা থেকে বসরা ও পারস্য কিরমান হয়ে মার্ভে গিয়ে মামূনুর রশীদকে হিজাযের পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করলেন। খুশি হয়ে মামূন তাঁকেই মক্কার গভর্নর নিয়োগ করে পাঠালেন। এটা হচ্ছে ১৯৬ হিজরীর (৮১১ খ্রি) ঘটনা। মোটকথা, বিদ্রোহজনিত ক্ষতি আমীনকেই সমধিক সইতে হয়েছে। মামূনকে এ জন্যে কোন ক্ষতিই সইতে হয়নি। এতে প্রমাণিত হয় যে, আমীনের রাজ্যশাসনের যোগ্যতার ঘাটতি ছিল।

রোমানদের অবস্থা

হারূনুর রশীদের ইন্তিকালের কয়েকদিন পরে রোম সম্রাট নিকফূরও জর্জানের যুদ্ধে নিহত হন।[১] তাঁর পুত্র[২] তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়, কিন্তু দু'বছর পর সেও মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তারপর তার ভাগিনী জামাই মীকাঈল ইব্ন জুরজীস সিংহাসনে আরোহণ করে। কিন্তু পরের বছরই অর্থাৎ ১৯৪ হিজরীতে (৮০৯ খ্রি) রোমানরা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসে। ফলে সে রাজধানী পরিত্যাগ করে সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসীদের সাথে গিয়ে মিলিত হয়। তখন রোমানরা তাদের সেনাপতি এলিউনকে সিংহাসনে বসায়। মোটকথা, যখন হারূনুর রশীদের রাজত্বে গৃহযুদ্ধ ও অরাজকতা চলছিল তখন রোমান সাম্রাজ্যও চরম বিশৃঙ্খলার শিকার ছিল।

আমীন ও মামূনের শক্তি পরীক্ষা

১৯৪ হিজরীর শেষ দিকে (৮১০ খ্রি) আমীন মামূনকে যুবরাজের পদ থেকে অপসারণ করেন এবং মামূনও আমীনের নাম খুতবা থেকে বাদ দিয়ে দেন। তারপর আমীন যে কেবল মামূনের স্থলে তাঁর নিজ পুত্রকে যুবরাজ করলেন তাই নয়, বরং তিনি তাঁর অপর ভাই মু'তামিনকেও পদচ্যুত করে তাঁর স্থলে তাঁর অপরপুত্র আবদুল্লাহকে যুবরাজ মনোনীত করলেন এবং যথারীতি খুতবাতে তাঁর উক্ত পুত্রদ্বয় মূসা ও আবদুল্লাহ্র নাম উচ্চারিত হতে লাগলো। এবার আমীন ও মামূনের শক্তি পরীক্ষার পথে আর কোন কিছুর অপেক্ষার প্রয়োজন রইল না। ফযল ইব্ন সাহ্লকে মামূন যুর-রিয়াসাতায়ন অর্থাৎ অসি ও মসির অধিকর্তা খেতাব প্রদান করে সালতানাতের নির্বাহী প্রধান (মাদারুল মাহাম) পদ দান করেন। তাহির ইব্ন হুসাইন ইব্ন মুসাব ইব্ন যুরায়ক ইব্ন আসাদ খুযায়ীকে তিনি প্রধান সেনাপতির পদে অধিষ্ঠিত করেন। ফযল ইব্ন সাহ্ল সীমান্তবর্তী রাজ্য রে-তে গিয়ে সেখানকার দক্ষ সৈন্যদেরকে সেনাদলে ভর্তি করে প্রধান সিপাহসালারের হাতে অর্পণ করেন। তাহির ইব্ন হুসাইন আবুল আব্বাস খুযায়ীকে রে-র প্রধান সেনাপতি পদে নিয়োগ করেন। আবুল আব্বাস রে-তে তাঁর

---

১. এ যুদ্ধ ছিল কুলচারীয়গণের সাথে।
২. তার নাম ছিল ইস্তিব্রাক। –অনুবাদক

বাহিনীকে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করেন। এদিকে আমীনুর রশীদ ইসমাত ইব্‌ন হাম্মাদ ইব্‌ন সালিমকে এক হাজার পদাতিক সৈন্যসহ হামাদানের দিকে প্রেরণ করেন। তিনি তাদেরকে এ মর্মে নির্দেশ প্রদান করেন যে, তোমরা হামাদানে অবস্থান করে অগ্রবর্তী বাহিনীকে সাদার দিকে রওয়ানা করবে। তারপর আমীন একটি বিশাল বাহিনী বিন্যস্ত করে ফযল ইব্‌ন রাবীর পরামর্শ অনুসারে আলী ইব্‌ন ঈসা ইব্‌ন মাহানের নেতৃত্বে মামূনের মুকাবিলার উদ্দেশ্যে খুরাসান অভিমুখে রওয়ানা করেন। আমীন ও তাঁর প্রধানমন্ত্রী ফযল ইব্‌ন রাবীর এটা ছিল একটা মারাত্মক ভুল পদক্ষেপ। কেননা, ইতিপূর্বেই খুরাসানবাসীরা আলীকে গভর্নররূপে পেয়ে সন্তুষ্ট ছিল না। তার প্রতি বিরূপ খুরাসানবাসীরা যখন তার আগমনের সংবাদ পেল তখন তারা ক্ষুব্ধ হয়ে আরো বেশি মারমুখী হয়ে উঠল। আমীন আলী ইব্‌ন ঈসাকে নাহাওন্দ, হামাদান, কুম, ইস্ফাহান এবং পার্বত্য অঞ্চল জায়গীরস্বরূপ প্রদান করেন। তিনি রাজকোষ থেকে প্রয়োজনাতিরিক্ত সাজ-সরঞ্জাম ও অর্থ-সম্পদ দিয়ে তাঁকে পঞ্চাশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য সাথে দিয়ে বিদায় করেন এবং আমিলদের নামে এ মর্মে ফরমান জারি করেন যে, তারা যেন আলী ইব্‌ন ঈসার সাহায্যার্থে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন এবং সম্ভাব্য সর্বপ্রকার সাহায্য-সহযোগিতা দান করেন। আলী ইব্‌ন ঈসা যখন আমীনের মাতা যুবায়দা খাতুনের নিকট থেকে বিদায় নিতে গেলেন তখন তিনি তাকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন যে, মামূনকে গ্রেফতার করে তার সাথে যেন কোন অসৌজন্যমূলক আচরণ করা না হয়। স্বয়ং খলীফা আমীন এবং তাঁর প্রভাবশালী শাসক সহকর্মিগণ ১৯৫ হিজরীর শাবান মাসে (৮১০ খ্রি) আলী ইব্‌ন ঈসা ও তার বাহিনীকে রাজধানীর বাইরে পর্যন্ত এগিয়ে বিদায় দেন। এটা ছিল এমনি একটি বাহিনী যে, বাগদাদবাসীরা ইতিপূর্বে এমন শানশওকত পূর্ণ বাহিনী কোনদিন দেখেনি।

আলী ইব্‌ন ঈসা খলীফা আমীনের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে যখন রে-এর নিকটবর্তী হলেন তখন তার সঙ্গীরা অগ্রবর্তী বাহিনী বিন্যাস এবং ব্যূহ-রচনার জন্য তাকে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু আলী তা উপেক্ষা করলেন এবং বললেন যে, তাহিরের মত ব্যক্তির মুকাবিলার জন্য ব্যূহ রচনার আদৌ প্রয়োজন নেই। বরং এদেরকে ঘেরাও করেই গ্রেফতার করে নেয়া উচিত। আলী ইব্‌ন ঈসার বিশাল বাহিনীকে আসতে দেখে তাহির ইব্‌ন হুসাইনের বাহিনীর কিছু লোক ঠিক কাতারবন্দি হওয়ার সময় আলীর দলে এসে যোগ দিল। বিজয়ী দলে যোগদান করে ফায়দা হাসিল করা এবং পরাজয়ের ক্ষতি এড়ানোই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু আলী ইব্‌ন ঈসা তাদেরকে পিটিয়ে বের করে দেন এবং তাদের কিছু সংখ্যককে গ্রেফতার করেন। এতে তাহির ইব্‌ন হুসাইনের খুব উপকার হলো। তার বাহিনীর প্রত্যেকটি সৈন্য তখন যুদ্ধের ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলো এবং মরিয়া হয়ে উঠলো। অবশেষে লড়াই শুরু হলো। আলীর দক্ষিণ বাহিনী ও বাম বাহিনী তাহিরের দক্ষিণ বাহিনী ও বাম বাহিনীকে পরাস্ত করে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পশ্চাদপসারণে বাধ্য করলো। কিন্তু তাহির তার মধ্যবাহিনীসহ আলীর মধ্যবাহিনীর উপর এমনি প্রচণ্ড আক্রমণ করলেন যে, আলীর মধ্যবাহিনী পরাস্ত হয়ে পিছু হটতে বাধ্য হলো। অবস্থা দৃষ্টে তাহিরের দক্ষিণ বাহিনী এবং বাম বাহিনী পুনরায় এগিয়ে এলো এবং সাহসে ভর করে তাহিরের সাথে এসে মিলিত হলো। তুমুল যুদ্ধের মধ্যে একটা

তীর এসে আলীর গলায় বিঁধলো। তাকে ভূতলশায়ী হতে দেখে তার বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। তাহিরের সৈন্যরা আলীর মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললো। তাহিরের বিজয়ী বাহিনী দুই ফার্সং[১] পর্যন্ত আলীর পলাতক বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন করলো। বাগদাদের বাহিনীর অনেকেই এভাবে নিহত ও বন্দী হলো। রাতের অন্ধকার নেমে এসে অবশিষ্ট বাহিনীকে নিহত ও বন্দী হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করলো। তাহির ইব্‌ন হুসায়ন রে-তে প্রত্যাবর্তন করে মামূনের নামে এভাবে বিজয়বার্তা প্রেরণ করলেন ঃ

আমীরুল মু'মিনীনের খিদমতে সবিনয় নিবেদন

এমন অবস্থায় আমি আপনাকে এ পত্র লিখছি ফযল আলী ইব্‌ন ঈসার খণ্ডিত শির আমার সম্মুখে। তার অঙ্গুরীয় এখন আমার আঙ্গুলে শোভা পাচ্ছে। তার বাহিনী এখন আমার নির্দেশাধীন।

তিনদিনে পত্রখানি মার্ভে ফযল ইব্‌ন সাহলের কাছে গিয়ে পৌঁছল।[২] ফযল তা নিয়ে মামূনের খিদমতে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং জয়ের জন্য মুবারকবাদ দিলেন। রাজদরবারের অমাত্যবর্গ মামূনকে আমীরুল মু'মিনীনরূপে অভিবাদন জানালেন। দু'দিন পর আলীর খণ্ডিত শিরও মার্ভে এসে পৌঁছল। গোটা খুরাসানে এর প্রদর্শনী হলো।

বাগদাদে আলী ইব্‌ন ঈসা ইব্‌ন হামানের নিহত হওয়ার সংবাদ পৌঁছতেই আমীন আবদুর রহমান ইব্‌ন জাবালা আনবারীকে বিশ হাজার সৈন্য সহকারে তাহিরের মুকাবিলার জন্যে প্রেরণ করলেন। তাঁকে হামাদান এবং খুরাসান রাজ্যের গভর্নর পদও প্রদান করা হলো এবং বলা হলো যে, এ রাজ্যগুলো পুনরুদ্ধার করে তুমিই রাজ্যগুলোর শাসন পরিচালনা করবে। আবদুর রহমান ইব্‌ন জাবালা হামাদানে পৌঁছে দুর্গে আশ্রয় নেন। তাহির ইব্‌ন হুসাইন তার আগমনের সংবাদ পেয়ে হামাদানের দিকে সসৈন্যে অগ্রসর হলেন, আবদুর রহমান ইব্‌ন জাবালা হামাদান থেকে অগ্রসর হয়ে তার মুকাবিলা করেন, কিন্তু তাহির প্রথম আক্রমণেই তাঁকে পরাস্ত করে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাতে বাধ্য করেন। আবদুর রহমান হামাদানে প্রত্যাবর্তন করে প্রস্তুতি গ্রহণ করে পুনর্বার তাঁর মুকাবিলা করেন। কিন্তু এবারও তাঁকে পরাজয় বরণ করতে হয়। অগত্যা তিনি পুনর্বার হামাদানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাহির ইব্‌ন হুসাইন হামাদান অবরোধ করে বসলেন। এ অবরোধ দীর্ঘস্থায়ী হলো। এই ফাঁকে তাহির ইব্‌ন হুসাইন কাযভীন জয় করে নেয়। কাযভীনের শাসক পলায়ন করেন। অবরোধ দীর্ঘ হওয়ায় শহরবাসীরা এতই অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে যে, তাদের পক্ষ থেকেই আবদুর রহমান ইব্‌ন জাবালা চোরাগোপ্তা হামলার আশংকা করলেন। অগত্যা তিনি তাহির ইব্‌ন হুসাইনের নিকট অভয় প্রার্থনা করলেন। তাহির তাকে অভয় দিয়ে নিজে হামাদান দখল করে ফেললেন। তাহিরের নিকট অভয় পেয়ে আবদুর রহমান নির্বিবাদে হামাদানে অবস্থান করতে থাকেন। একদা এক অসাধারণ মুহূর্তে আবদুর রহমান তাঁর সঙ্গী-সাথীদেরকে সমন্বিত করে তাহির ইব্‌ন হুসাইনের উপর অতর্কিতে হামলা করে

---

১. ছয় মাইল
২. তিন দিনের এ পথের দূরত্ব ছিল ২৫০ ফার্সং বা ৭৫০ মাইল। –অনুবাদক

বসেন। এবার তাহির আবদুর রহমানকে পরাস্ত করে হত্যা করেন। আবদুর রহমানের যে সঙ্গীরা মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেল তারা বাগদাদ থেকে আবদুর রহমানের সাহায্যার্থে আগমনকারী হুরায়সীর পুত্রদ্বয় আবদুল্লাহ্ আহমদের সাথে গিয়ে মিলিত হলো। উক্ত দুইজন আবদুর রহমানের নিহত হওয়ার সংবাদে এতই ভীতসন্ত্রস্ত হলো যে, কোনরূপ যুদ্ধে লিপ্ত না হয়ে তার পথ থেকেই বাগদাদে ফিরে যায়। তাহির একের পর এক শহরগুলো জয় করে অগ্রসর হতে থাকেন। হালওয়ান পৌঁছে তিনি ব্যূহ রচনা করেন এবং পরিখাদি খনন করে নিজের অবস্থানকে সংহত করেন। এ বিজয়গুলো সম্পন্ন হওয়ার পর মামূন সর্বত্র তাঁর সপক্ষে বায়আত গ্রহণের এবং তাঁর নামে খুতবা পাঠের নির্দেশ জারি করেন। ফযল ইব্ন সাহ্লকে 'যুর-রিয়াসাতায়ন' বা অসি ও মসির অধিপতি খেতাবে ভূষিত করে আপন প্রধানমন্ত্রী ও মাদারুল মাহাম পদে বরণ করেন এবং তাঁর অধীনে আলী ইব্ন হিশামকে যুদ্ধমন্ত্রী এবং নুয়াইম ইব্ন খাযিমকে অর্থমন্ত্রী ও সংস্থাপন বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। ফযল ইব্ন সাহলের ভাই হাসান ইব্ন সাহলকে তিনি রাজস্ব সচিব নিযুক্ত করেন।

খলীফা আমীনের রাজত্বে বিঘ্ন সৃষ্টি

বাগদাদে যখন এ দুঃসংবাদ পৌঁছল যে, আবদুর রহমান ইব্ন জাবালা ও আবদুর রহমানের সাথে যুদ্ধে নিহত হয়েছেন তখন গোটা শহরে হৈ চৈ পড়ে গেল। খলীফা আমীন আসাদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন মযীদকে ডেকে তাহিরের মুকাবিলায় যাত্রার নির্দেশ দিলেন। আসাদ ইব্ন ইয়াযীদ তার বাহিনীর সৈন্যদের এক বছরের অগ্রিম বেতন দাবি করলেন। তিনি আরো দাবি করলেন যে, প্রচুর যুদ্ধ সরঞ্জামাদি দিতে হবে, যত শহরই আমি জয় করবো, তার কোন হিসাব-নিকাশ আমার কাছে চাওয়া যাবে না, অতীতের দক্ষ সৈন্যদেরকে আমার সাথে দিতে হবে এবং অকর্মণ্য ও অদক্ষদেরকে আমার বাহিনী থেকে বের করে দিতে হবে। এ সব শর্তের কথা শুনে আমীর অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। তিনি আসাদ ইব্ন ইয়াযীদকে গ্রেফতার করলেন। এবার তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন হুসাইন ইব্ন কাহতাবাকে তাহিরের মুকাবিলায় অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিলেন। এই ব্যক্তিও নানারূপ শর্ত আরোপ করে আমীনের বিরাগভাজন হলেন। তারপর আসাদ ইব্ন ইয়াযীদের চাচা আদ ইব্ন মযীদকে তলব করে তার ভাতিজাকে গ্রেফতার করার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে তাহিরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাওয়ার জন্যে তাঁকে অনুরোধ জানালেন। সে মতে আহমদ ইব্ন মযীদ বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে বাগদাদ থেকে যাত্রা করলেন। তা লক্ষ্য করে আবদুল্লাহ ইব্ন হুমায়দ ইব্ন কাহ্তাবা আরো বিশ হাজার সৈন্যসহ যুদ্ধযাত্রার জন্যে উদ্যত হলেন। তাঁরা উভয়ে একই সময়ে হুলওয়ানের দিকে যাত্রা করলেন। হুলওয়ানের নিকটবর্তী কানিকীল নামক স্থানে উভয় সর্দার একই সঙ্গে শিবির স্থাপন করলেন। এ সংবাদ শ্রবণে তাহির ও তাঁর সৈন্য-সামন্ত নিয়ে তাদের মুকাবিলায় সেখানে এসে পৌঁছল। তিনি তাঁর গুপ্তচরদেরকে পোশাক পরিবর্তন করে ছদ্মবেশে বাগদাদের সৈন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে দিলেন। তারা বাগদাদ বাহিনীর মধ্যে গুজব রটিয়ে দিল যে, বাগদাদের রাজকোষ শূন্য হয়ে গেছে এবং সাথে সাথে সৈন্যদের বেতন-ভাতাও বন্ধ হয়ে গেছে। সৈন্যবাহিনীর লোকজন দিশেহারা হয়ে যেখানে যা পাচ্ছে তাই লুট করে নিচ্ছে। এ গুজব রটতেই সৈন্যবাহিনীর মধ্যে

বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। কেউ তা বিশ্বাস ও অনুমোদন করলো, আবার কেউ কেউ অবিশ্বাস এবং প্রতিবাদ করলো। দেখতে দেখতে দুইপক্ষের আত্মঘাতী দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে তাহিরের সাথে যুদ্ধ না করেই বাগদাদের দিকে রওয়ানা হয়ে পড়লো। তাহির অগ্রসর হয়ে হুলওয়ান দখল করে ফেললেন। এ সময় হারছামা একটি দুর্ধর্ষ সৈন্যবাহিনী নিয়ে মার্ভ থেকে মামূনের এ মর্মে ফরমান নিয়ে হুলওয়ানে এসে পৌছলেন যে, এ পর্যন্ত যত অঞ্চল জয় করেছে তা হারছামার হাতে ন্যস্ত করে তুমি আহওয়াযের দিকে অগ্রসর হও। তাহির সে ফরমান তামিল করে আহওয়ায অভিমুখে রওয়ানা হয়ে পড়লেন।

খলীফা আমীনের পদচ্যুতি ও পুনর্বহাল

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, খলীফা হারুনূর রশীদ আবদুল মালিক ইব্ন সালিহ্‌কে গ্রেফতার করে কারাগারে নিক্ষেপ করেছিলেন। আমীন সিংহাসনে বসেই তাঁকে মুক্তি দেন। যখন তাহিরের মুকাবিলায় বাগদাদ বাহিনী উপর্যুপরি পরাজয়বরণ করে চলেছিল, তখন তিনি খলীফার দরবারে উপস্থিত হয়ে পরামর্শ দেন যে, খুরাসানীদের মুকাবিলায় ইরাকবাসীদের পরিবর্তে সিরীয়দেরকে প্রেরণ করাই বাঞ্ছনীয়। কেবল তারাই পারবে খুরাসানীদের মুকাবিলা করতে। আর আমি নিজে তাদের আনুগত্যের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারি। এই পরামর্শ অনুসারে আমীন আবদুল মালিককে শাম ও জাযিরার গভর্নরী দান করে প্রেরণ করলেন। আবদুল মালিক রিক্কায় পৌছে শামদেশের রঈসদের সাথে পত্র যোগাযোগ করেন এবং স্বল্প সময়ের মধ্যেই শামদেশীয় একটি বিরাট বাহিনী গঠনে সমর্থ হন। হুসাইন ইব্ন আলী ইব্ন ঈসাও আবদুল মালিকের সাথে ছিলেন এবং তিনি সৈন্যবাহিনীর ঐ অংশের নেতৃত্বে ছিলেন যা খুরাসানীদের দ্বারা গড়ে উঠেছিল। এ সময় অসুস্থ হয়ে আবদুল মালিক মৃত্যুবরণ করেন। এদিকে শামী ও খুরাসানীদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায়। শামদেশীয়রা আপন আপন গৃহ অভিমুখে রওয়ানা হয়ে পড়ে। হুসাইন ইব্ন আলী খুরাসানীদেরকে নিয়ে বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করেন। বাগদাদবাসী রঈসগণ ও জনসাধারণ তাদেরকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। রাতের বেলা খলীফা আমীন হুসাইন ইব্ন আলীকে দরবারে তলব করেন। কিন্তু তিনি খলীফার সাথে সাক্ষাত করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। প্রত্যুষেই তিনি খলীফার অমাত্যবর্গকে তাঁকে পদচ্যুত করার জন্য প্ররোচিত করেন। হুসাইন নিজে বাগদাদের পুলের উপর চলে আসেন। এখানে আমীনের বাহিনী তার মুকাবিলা করে পরাস্ত হয়। হুসাইন্ ইব্ন আলী রাজপ্রাসাদের উপর হামলা চালিয়ে আমীন ও তাঁর মাতা যুবায়দা খাতুনকে গ্রেফতার করে মানসূর-প্রাসাদে নিয়ে বন্দী করে রাখেন এবং মামূনের খিলাফতের সপক্ষে বায়আত গ্রহণ করেন। পরদিন লোকজন হুসাইন ইব্ন আলীর কাছে তাদের ভাতা পরিশোধের দাবি জানিয়ে সাড়া না পেয়ে কানাঘুষাতে লিপ্ত হয়। তারা আমীনের পদচ্যুতি এবং গ্রেফতারীর জন্য দুঃখ প্রকাশ করতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধ হয়ে হুসাইন ইব্ন আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর হুসাইন ইব্ন আলী পরাস্ত ও গ্রেফতার হন। নগরবাসীরা মানসূর-প্রাসাদে গিয়ে আমীন ও রাজমাতা যুবায়দা খাতুনকে মুক্ত করে। তারা আমীনকে পুনরায় সিংহাসনে বসিয়ে তাঁর হাতে পুনরায় বায়আত হয়। হুসাইন ইব্ন আলী বন্দী অবস্থায় আমীনের সম্মুখে নীত হলেন। আমীন

তাঁকে মৃদু ভর্ৎসনা করে মুক্ত করে দিয়ে বললেন, তাহির ইব্‌ন হুসাইনের মুকাবিলায় অবতীর্ণ হয়ে তাকে পরাস্ত করে আপন ভুলের প্রায়শ্চিত্ত কর। তিনি হুসাইনকে বহুমূল্য বস্ত্রাদিও প্রদান করেন এবং অত্যন্ত সম্মানের সাথে বিদায় দেন। বাগদাদবাসীরা তাঁকে মুবারকবাদ দিয়ে নগরীর পুল পর্যন্ত এসে তাঁকে বিদায় সংবর্ধনা দিলেন। লোকজনের ভিড় কমে যেতেই হুসাইন ইব্‌ন আলী পুল অতিক্রম করেই সেখান থেকে বলীয়ান করতে উদ্যত হয় এবং পুনরায় খলীফার প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা করে। আমীন তার পশ্চাদ্ধাবনের উদ্দেশ্যে অশ্বারোহী বাহিনী প্রেরণ করলেন। বাগদাদের তিন মাইল দূরেই ঐ বাহিনী হুসাইনের নাগাল পায়। সামান্য যুদ্ধেই সে নিহত হয় এবং তার খণ্ডিত মস্তক আমীনের সম্মুখে নীত হয়। এটা ১৯৬ হিজরীর ১৫ই রজবের (৮১২ খ্রি এপ্রিল) ঘটনা। আলীর হত্যার দিনই আমীনের প্রধানমন্ত্রী ফযল ইব্‌ন রাবী এমনিভাবে আত্মগোপন করলো যে, কেউ তার সন্ধান পর্যন্ত পেল না। ফযল ইব্‌ন রাবী এরূপ আত্মগোপন ও প্রতারণা করায় আমীনের দুর্গতি ও দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পেল। তিনি একেবারে মুষড়ে পড়লেন।

তাহিরের রাজত্ব

বাগদাদে যখন এ অবস্থা চলছে তখন তাহির ইব্‌ন হুসাইন হুলওয়ানে হারছামা ইব্‌ন আইউনকে বিজিত রাজ্যসমূহের শাসনভার অর্পণ করে মামূনের নির্দেশ মুতাবিক আহওয়াযের দিকে অগ্রসর হলেন। নিজে যাত্রার পূর্বে তিনি হুসাইন ইব্‌ন উমর রুস্তমীকে অগ্রে রওয়ানা করেন। এদিকে আমীনের প্রেরিত আবদুল্লাহ্ ও আহমদ ফিরে আসায় তিনি মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন হাতিমকে আহওয়ায রক্ষার জন্য প্রেরণ করলেন। বাগদাদ থেকে সসৈন্যে মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াযীদের আগমনের সংবাদ পেয়ে তাহির হুসাইন ইব্‌ন উমর রুস্তমীর সাহায্যার্থে কয়েকটি সৈন্যদল প্রেরণ করলেন। তিনি তাদেরকে নর্দেশ দিলেন যে, যথাসত্বর আক্রমণ পরিচালনা করে তোমরা হুসাইন ইব্‌ন উমর রুস্তমীর সাথে গিয়ে মিলিত হবে। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াযীদ মুকারিম নামক স্থানে পৌঁছতেই তাহিরের প্রেরিত বাহিনী নিকটে আসার সংবাদ তিনি অবহিত হলেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াযীদ এখানে তাদের মুখোমুখি হওয়ার পরিবর্তে প্রথমে আহ্ওয়াযের দখল নিয়ে নেয়াই সমীচীন মনে করলেন। তিনি আহওয়াযে গিয়ে উপনীত হলেন। সেখানে তাহিরের বাহিনী যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো। তুমুল যুদ্ধের পর মুহাম্মদ ইয়াযীদ নিহত হলেন। তাহির আহওয়ায দখল করে নিজের পক্ষ থেকে ইয়ামামা, বাহরায়ন ও ওমানের জন্য শাসক মনোনীত করে সেসব স্থানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করে নিজে ওয়াসিতা অভিমুখে রওয়ানা হলেন। ওয়াসিতার শাসকও পলায়ন করলো। তাহির অনায়াসে ওয়াসিতা অধিকার করলেন এবং কূফা অভিমুখে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করলেন। কূফায় আমীনের নিয়োজিত শাসক আব্বাস ইব্‌ন হাদী আনুগত্য বদল করে মামূনের পক্ষ অবলম্বন করে আমীনের পদচ্যুতি ঘোষণা করলেন এবং মামূনের পক্ষে বায়আত গ্রহণ করে তাহিরের কাছে তার সংবাদ পাঠিয়ে দিলেন। বসরার গভর্নরও তাই করলেন। এই কূফা আর বসরাই ছিল ইরাকের কেন্দ্রীয় শহর। এ দুই প্রদেশের গভর্নর ছিলেন খলীফার নিজ পরিবারের লোক। তারা দু'জনই আমীনের পদচ্যুতি ঘোষণা করে এবং মামূনের খিলাফতের পক্ষে আনুগত্যের বায়আত করে অন্যদের জন্য অনুকরণীয় নমুনা হয়ে দাঁড়ালেন। এদিকে খলীফা বংশের

হিজাযের শাসকও মামূনের পক্ষে জনগণের আনুগত্যের শপথ গ্রহণের কথা পূর্বেই ব্যক্ত করা হয়েছে। তাহির এদের সবাইকে নিজ নিজ পদে বহাল রাখেন। তাহির নিজে জরজরায়া নামক স্থানে শিবির স্থাপন করে হারছ ইব্‌ন হিশাম এবং দাঊদ ইব্‌ন মূসাকে কসরে ইব্‌ন হুবায়রার দিকে যাত্রার নির্দেশ প্রদান করেন। এটা ১৯৬ হিজরীর রজব (৮১২ খ্রি মার্চ-এপ্রিল) মাসের কথা। তারপরেই খলীফা আমীনের পদচ্যুতি ও পুনর্বহালের ঘটনা ঘটেছিল।

খলীফা আমীন খলীফা পদে পুনর্বহাল হয়েই মুহাম্মদ ইব্‌ন সুলায়মান এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন হাম্মাদ বারবারীকে কসরে ইব্‌ন হুবায়রার দিকে এবং ফযল ইব্‌ন মূসাকে কূফার দিকে রওয়ানা করলেন। হারস এবং দাঊদ মুহাম্মদ ইব্‌ন সুলায়মান এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন হাম্মাদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন এবং তুমুল যুদ্ধের পর তাদেরকে বাগদাদে প্রত্যাবর্তনে বাধ্য করলেন। ফযল ইব্‌ন মূসা কূফার দিকে রওয়ানা হওয়ার সংবাদ পেয়ে তাহির মুহাম্মদ ইব্‌ন আলীকে ফযলের মুকাবিলার জন্য নির্দেশ দান করলেন। পথিমধ্যে উভয়ে সাক্ষাৎ হলে ফযল মুহাম্মদ ইব্‌ন আলীকে সম্বোধন করে বললেন, তুমি অযথাই আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছ। আমি তো খলীফা মামূনের অনুগতরূপেই এসেছি। এদিকে রাতের বেলা ফযল মুহাম্মদ ইব্‌ন আলীর বাহিনীর উপর অতর্কিত হামলা করলেন। কিন্তু মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী যেহেতু পূর্বেই তা আঁচ করে নিতে পেরেছিলেন তাই তিনি এদের অতর্কিত নৈশ আক্রমণের ব্যাপারে পূর্বেই প্রস্তুত ছিলেন। তিনি পূর্ণোদ্যমে যুদ্ধ করে ফযলকে পরাস্ত করে বাগদাদের দিকে পলায়নে বাধ্য করলেন। তারপর তাহির মাদায়েন অভিমুকে অগ্রসর হলেন। মাদায়েনে খলীফা আমীনের প্রচুর সংখ্যক সৈন্য মোতায়েন ছিল। এদিকে বাগদাদ থেকে রীতিমত সাহায্যকারী বাহিনী ও রসদ মাদায়েনে এসে পৌঁছে ছিল। কিন্তু তাহির উপস্থিত হওয়ার সাথে সাথে সকলেই বাগদাদের দিকে পালিয়ে গেল। তাহির মাদায়েন অধিকার করে সারসার নদীর তীরে শিবির স্থাপন করলেন এবং সেখানে একটি সেতু নির্মাণ করলেন। খলীফা আমীন কসরে ইব্‌ন হুবায়রা এবং কূফার দিকে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করার সময় তাহির আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা ইব্‌ন নাহীককে হারছামা ইব্‌ন আইউনের দিকে রওয়ানা করেছিলেন। নাহরাওয়ানের নিকট উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়। হারছামা আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ বাহিনীকে পরাস্ত করে তাড়িয়ে দেন এবং আলী ইব্‌ন মুহাম্মদকে গ্রেফতার করে মামূনের দরবারে পাঠিয়ে দেন এবং নিজে হুলওয়ানের পরিবর্তে নাহরাওয়ানে এসে অবস্থান করতে শুরু করেন।

আমীন নিহত হলেন

আমীনের প্রতিটি বাহিনী মামূনের বাহিনীসমূহের হাতে উপর্যুপরি পরাজয়বরণ করেই চললো। মামূনের দুর্ধর্ষ সেনাপতি তাহির ইব্‌ন হুসাইন এবং হারছামা ইব্‌ন আইউন দু'দিক থেকে বাগদাদের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। এদিকে মুসেল, ওয়াসেতা, কূফা, বসরা, হিজায, ইয়ামান, হীরা প্রভৃতি প্রদেশসমূহও ইতিমধ্যেই আমীনের হস্তচ্যুত হয়ে গেছে। আমীনের রাজত্ব কেবল বাগদাদ এবং তার উপকণ্ঠেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। উপর্যুপরি পরাজয়বরণ করতে করতে ১৯৬ হিজরীর রমযান (৮১২ খ্রি জুন) মাসে আমীনের জীবনের অত্যন্ত সঙ্গিন ও নাজুক পর্যায়ের সূচনা হলো। তিনি গোপনে তাহিরের বাহিনীর কাছে পয়গাম

পাঠিয়ে অর্থ-সম্পদের প্রলোভন দিয়ে তাদেরকে দলে ভিড়াতে সচেষ্ট হন। ফলে সারসার নদীর তীরের শিবির থেকে পাঁচ হাজার সৈন্য বাগদাদে আমীনের কাছে চলে আসে। এরপর ফৌজী সর্দারদেরও কেউ কেউ আমীনের সাথে গিয়ে মিলিত হন। আমীন পদমর্যাদা অনুসারে তাদের সকলকেই পুরস্কৃত ও সম্মানিত করেন এবং একটি শক্তিশালী বাহিনী গঠন করে তাহিরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তুমুল যুদ্ধের পর আমীনের এ বাহিনীও পরাজয়বরণ করে এবং পালিয়ে বাগদাদে আমীনের নিকট ফিরে আসে। এবার আমীন সম্পূর্ণ নতুন আরেকটি বাহিনী যাতে পরাজিত সৈন্যদের একজনও ছিল না— তাহিরের মুকাবিলায় প্রেরণ করলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে এ বাহিনীও পরাজয়বরণ করলো। এবার তাহির তাঁর বাহিনী নিয়ে সারসার দিক থেকে এবং হারছামা তাঁর বাহিনীসহ নাহরাওয়ানের দিক থেকে বাগদাদের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করলেন। তাহির আনরায় তোরণে শিবির স্থাপন করলেন। হারছামা নহ্‌রে ইয়ামানে ব্যূহ রচনা করলেন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ওয়াদ্দাহ শামাসিয়ার দিকে এবং মুসাইয়িব ইব্‌ন যুহায়ির কসরে কুলওয়াযির দিকে তাঁবু স্থাপন করলেন। এভাবে চতুর্দিক থেকে বাগদাদে অবরোধ করে মামূনের বাহিনী সেনাপতি নগরবাসীর জীবনযাত্রাকে দুর্বিষহ করে তুললো। এদিকে আমীন ও তাঁর যাবতীয় স্বর্ণ-রৌপ্যের অলংকারাদি ও তৈজসপত্রাদিসহ মূল্যবান আসবাবপত্র বিক্রি করে সৈন্যদের ভাতা প্রদান করলেন এবং প্রতিরোধের জন্য সম্ভাব্য সব কিছুই করলেন। এ অবরোধ প্রায় সোয়া একবছর পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হয়। এ দীর্ঘ সময় ধরে বাগদাদবাসী এবং আমীনের সেনাপতিরা যে বিপুল ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতির মুকাবিলা করেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়। কিন্তু এ সবই ছিল অর্থহীন ও নির্বুদ্ধিতামূলক। সা'দ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন কাদিম অভয় লাভ করে তাহিরের কাছে চলে আসেন। তাহির তাকে পরিখা খনন ও ব্যূহকে অগ্রগামী করার কাজে নিয়োগ করেন। অবরোধকারীদের মধ্যে তাহির ও হারছামা ছিলেন বড় সেনাপতি। কিন্তু সকলের ক্ষেত্রে অগ্রগামী তাহিরই গোটা বাহিনীর নেতারূপে পরিচিতি ও খ্যাতি লাভ করেছিলেন। আমীনের পক্ষ থেকে বাগদাদের উপকণ্ঠস্থিত দাজলা তীরবর্তী সালিহ প্রাসাদ এবং সুলায়মান ইব্‌ন মানসূর প্রাসাদে কতিপয় সর্দার অবরোধকারীদের উপর তোপ-কামানের (মিনজানিকের) সাহায্যে গোলা-বারুদ ও প্রস্তর নিক্ষেপ করে অবরোধ ভঙ্গের চেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন। তাহিরের পক্ষ থেকেও পাল্টা প্রস্তর ও অগ্নিগোলা নিক্ষিপ্ত হচ্ছিল। প্রজ্বলিত গোলাপিণ্ড ও প্রস্তর উভয় পক্ষ থেকেই নিক্ষিপ্ত হচ্ছিল। অবরোধকারীদের বাহিনী যতই অগ্রসর হচ্ছিল, পরিখা খনন করে তারা তাদের ব্যূহকে ততই এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। এভাবে বাইরের দিক থেকে বৃত্ত সংকীর্ণ হতে হতে তা একেবারে নগরপ্রাচীরে এসে ঠেকলো। অবরোধকারী বাহিনী নগরীর তোরণ এবং প্রাচীর ভেঙ্গে নগরীতে ঢুকে পড়লো। তারপর প্রতিটি মহল্লায় এবং শহরের প্রতিটি অংশে প্রতিটি কদমে কদমে মুকাবিলা করতে হয়। এমন কি শেষ পর্যন্ত 'মদীনাতুল মানসূর' বা মানসূর প্রাসাদে আমীনকেও অবরোধ করা হলো। শস্যসম্ভার এবং প্রয়োজনীয় জীবনোপকরণ নগরীতে প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। কারাগার থেকে কারাবন্দীদেরকে মুক্ত করে দেয়া হয়। শহরের গুণ্ডাপাণ্ডা এবং বখাটে যুবকদেরকে সৈন্যবাহিনীতে ভর্তি করে নেয়া হয়েছিল। লুটপাট চুরি-ডাকাতির উপদ্রব খুব বেশি ছিল। প্রভাবশালী ও বীর সৈন্যরা তাহিরের ষড়যন্ত্রে ও প্রলোভনে পড়ে ক্রমেই আমীনের কাছ থেকে

বিচ্ছিন্ন হয়ে তাহিরের নিকট এসে সমবেত হতে লাগলো। মওকা পেয়ে শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা শহর থেকে বেরিয়ে পড়তে লাগলেন। অনেক মহল্লা উজাড় ও জনশূন্য হয়ে গেল। বনূ কাহতায়া, মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা, ইয়াহইয়া ইব্‌ন আলী ইব্‌ন ঈসা ইব্‌ন মাহান, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ আব্বাস তাঈ পরপর গিয়ে তাহিরের সাথে মিলিত হলো। যে সমস্ত স্থানে এ ব্যক্তিগণ তাহিরের মুকাবিলার জন্যে আদিষ্ট ছিল, সেসব স্থান তারা তাহিরের কাছে সমর্পণ করতে থাকে। আমীন অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে মুকাবিলা করেন। অবশেষে তিনি চূড়ান্ত যুদ্ধের দায়িত্বভার মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা ইব্‌ন নাহীকের উপর অর্পণ করেন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ওয়াদ্দাহ-এর বাহিনী যে দিকে নিয়োজিত ছিল, সেদিক থেকে বাগদাদবাসীদের সমন্বয়ে গঠিত নতুন বাহিনী আক্রমণ চালিয়ে আবদুল্লাহ ইব্‌ন ওয়াদ্দাহকে পরাস্ত করে শুমাসিয়া দখল করে নেয়। এ সংবাদ পেয়ে হারছামা তার সাহায্যার্থে বাহিনী নিয়ে সেদিকে অগ্রসর হলেন, ঘটনাচক্রে তিনিও পরাজিত এবং বন্দী হন। কিন্তু তার সাথীরা প্রতারণাপূর্ণ চালের মাধ্যমে তাকে মুক্ত করতে সমর্থ হয়। এ সংবাদ জানতে পেরে স্বয়ং তাহির সসৈন্যে সেদিকে অগ্রসর হয়ে এক প্রচণ্ড হামলায় আমীন বাহিনীকে পশ্চাৎপসারণে বাধ্য করেন। তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ওয়াদ্‌দাহকে পুনরায় তাঁর স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাহির ক্রমান্বয়ে তাঁর সৈন্যদেরকে গোটা শহরে ছড়িয়ে দেন এবং মদীনাতুল মানসূরে আমীনকে অবরুদ্ধ করতে সমর্থ হন। আমীন অত্যন্ত ধৈর্যস্থৈর্যের সাথে পরিস্থিতির মুকাবিলা করতে থাকেন। হোমরা-চোমরাদের মধ্যে কেবল হাতিম ইব্‌ন সাকরাহ্ হাসান হুরায়শী এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন আগলাব আফ্রিকী তাঁর সাথে অবশিষ্ট ছিলেন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম আমীনকে বলেন, এই চরম দুর্যোগ মুহূর্তেও সাত হাজার অশ্বারোহী সৈন্য আমীরুল মু'মিনীনের যে কোন নির্দেশ পালনের জন্য সদা প্রস্তুত। এমতাবস্থায় রাজ্যের পদস্থ ব্যক্তিদের সন্তানদের হাতে রাজ্য শাসন ও রক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত করে নিজে কোন এক অলস মুহূর্তের ফাঁকে জাযিরা ও শামদেশের দিকে বেরিয়ে পড়ে নতুন এক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করাই আমীরুল মু'মিনীনের জন্য সমীচীন কাজ হবে। এমনও হতে পারে যে কিছুদিন যেতে না যেতেই জনমত আপনার সপক্ষে চলে আসবে এবং অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের কোন একটা পথ বেরিয়েই আসবে। আমীন যদি এ পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করতেন তবে নিশ্চয়ই তার পরিণতি তার চাইতে উত্তম হতো যা পরবর্তীতে সংঘটিত হয়েছে। যখন আমীরুল মু'মিনীনের হাবভাব টের পেয়ে তাহির সুলায়মান ইব্‌ন মানসূর এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা ইব্‌ন নাহীকের কাছে এ মর্মে বার্তা পাঠালেন যে, তোমরা যদি আমীনকে তাঁর এ ইচ্ছা থেকে বিরত না রাখ, তাহলে তা তোমাদের জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে না। তারা তাহিরের ভয়ে ভীত হয়ে আমীনের কাছে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, আমীরুল মু'মিনীনের জন্যে এটা মোটেই সমীচীন হবে না যে, নিজেকে তিনি ইব্‌ন আগলাব এবং ইব্‌ন আসকার মতো ব্যক্তিদের হাতে তুলে দেবেন। কেননা, এরা মোটেই বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য নয়। বরং হারছামা ইব্‌ন আইউনের কাছে অভয় প্রার্থনা করে তার দায়-দায়িত্বে চলে যাওয়াটা সমীচীন হবে। ইব্‌ন আসকার যখন জানতে পেলেন যে, খলীফা আমীন হারছামা ইব্‌ন আইউনের কাছে অভয় প্রার্থনা করে তারই কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে উদ্যত তখন সে বললো, আমীরুল মু'মিনীন!

আপনাকে যদি অভয় প্রার্থনাই করতে হয়, তবে তা তাহিরের কাছে করাটাই সমীচীন, হারছামার অভয়ে আপনি আশ্রয় নেবেন না। কিন্তু আমীন বললেন, আমি তাহিরের কাছে অভয় প্রার্থনা করবো না। সত্যি সত্যি তিনি হারছামার কাছে আশ্রয় চেয়ে পাঠালেন। হারছামা তা সানন্দে মঞ্জুর করলেন। কিন্তু এ সংবাদ তাহিরের কানে পৌঁছতেই এটা তার কাছে খুবই অসহনীয়বোধ হলো যে চূড়ান্ত বিজয়ের গৌরব ও কৃতিত্ব হারছামা লাভ করবেন। তিনি আমীন যাতে রাজপ্রাসাদ থেকে বের হতে না পারেন সে উদ্দেশ্যে কঠোর প্রহরা বসিয়ে দিলেন। হারছামা স্থির করেছিলেন যে, রাতের আঁধারে আমীন মহল থেকে বের হয়ে মহলের ঘাটে রক্ষিত নৌকায় হারছামার আশ্রয়ে চলে আসবেন। তাহিরের হাবভাব লক্ষ্য করে তিনি আমীনের কাছে এ মর্মে পয়গাম পাঠালেন যে, তিনি যেন আজ রাত ধৈর্য ধরে থাকেন, কেননা, আজ সকালে নদীর তীরে এমন কিছু নিদর্শন দেখা গেছে, যা রীতিমত সংকটজনক। জবাবে আমীন বলে পাঠালেন, এখানে আমার আর কোন শুভাকাঙ্ক্ষীই নেই। সকলে সরে পড়েছেন। তাই এখানে আর একঘণ্টাও তিষ্টানো দায়। আমার ভয় হচ্ছে, তাহির আমার উপস্থিতির কথা জানতে পেরে আমাকে না ধরে নিয়ে হত্যা করে ফেলে। অবশেষে ১৯৮ হিজরীর ২৫শে মুহাররম (৮১৩ খ্রি ২৫ সেপ্টেম্বর) রাতের বেলায় আমীন তাঁর পুত্রদ্বয়কে আলিঙ্গন করলেন, তাদেরকে আদর-সোহাগ করলেন। তারপর অশ্রুসজল চোখে নদীর ঘাটে এসে হারছামার যুদ্ধ জাহাজে আরোহণ করলেন। জাহাজে অপেক্ষারত হারছামা স-সম্মানে তাঁকে জাহাজে তুললেন এবং তাঁর হাতে চুমু খেলেন। তিনি জাহাজ চালকদেরকে রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ দিলেন। রওয়ানা হতেই তাহিরের নৌবাহিনী এসে সে জাহাজটিকে ঘিরে ফেললো। উভয় পক্ষে সংঘর্ষ শুরু হয়ে গেল।

ডুবুরী সৈন্যরা জাহাজ ছিদ্র করে ফেললো। আক্রমণকারী সৈন্যরা চতুর্দিক থেকে তীর বর্ষণ করতে লাগলো। অবশেষে পানি ভর্তি হয়ে জাহাজটি ডুবে গেল। জাহাজের কাপ্তান হারছামার চুল মুঠোয় ধরে তাকে উদ্ধার করে। আমীন পানিতে সাঁতার কাটতে লাগলেন। তাহিরের লোকজন তাঁকে ধরে ফেলে। আহমদ ইব্ন সালিম সাঁতার কেটে উঠতেই তাহিরের লোকজন তাকেও গ্রেফতার করে ফেলে। আহমদ ইব্ন সালিম নিজে বর্ণনা করেন, আমাকে গ্রেফতার করে তাহিরের সম্মুখে নিয়ে যাওয়া হয়। তাহির আমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করলেন। রাতের সামান্য অংশ অতিবাহিত হতেই তাহিরের সিপাহীরা কারাগারের দরজা খুললো। তারা আমীনকে কারাগারের ভিতর ঠেলে দিয়ে দরজা পুনরায় বন্ধ করে দিয়ে চলে গেল। এ সময় আমীনের 'পরনে একটা পাজামা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। অবশ্য মাথায় আমামা আর বাহুর উপর একটা ছেঁড়া কাপড় ছিল। আমি 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পড়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লাম। আমীন আমাকে চিনতে পেরে বললেন, তুমি আমাকে একটু জড়িয়ে ধরো, আমার বড্ড ভয় হচ্ছে। আমি তাঁকে জড়িয়ে ধরলাম। কিছুক্ষণ পরে যখন তাঁর ভয় কিছুটা কাটলো, তখন তিনি আমাকে মামূনের অবস্থা কি জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম, তিনি জীবিত এবং সুস্থই আছেন। তিনি বললেন, তাঁর প্রতিনিধি তো আমাকে বললো যে সে মারা গেছে। হয়তো বা এ কথা বলে সে যুদ্ধের ব্যাপারে আমাকে নিশ্চিন্ত করতে প্রয়াস পেয়েছে। আমি বললাম, আল্লাহই আপনার উজীরদের সাথে বোঝাপড়া করেন। তারা

আপনাকে ধোঁকা দিয়েছে। তারপর আমীন একটা দীর্ঘশ্বাস নিয়ে বললেন : কেন ভাই, তারা কি তাদের অঙ্গীকার পালন করবে না ? আমি বললাম, আল্লাহ চাহেতো নিশ্চয়ই পূর্ণ করবে। আমাদের এই বাক্যালাপ চলাকালেই মুহাম্মদ ইব্ন হামীদ সেখানে এল এবং দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো। আমীনকে চিনতে পেরে সে চলে গেল। তারপর মধ্য রাতে উন্মুক্ত তলোয়ার হাতে কয়েকটি আ'জমী (অনারব) কারাগারে এসে ঢুকলো। আমীন তাদেরকে আসতে দেখে ধীরে ধীরে পিছু হটতে লাগলেন। এমন সময় একজন লাফ দিয়ে আমীনকে গিয়ে ধরল এবং তাকে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে চোখের পলকে যবেহ্ করে শির নিয়ে উধাও হয়ে গেল। প্রত্যূষে এসে তারা লাশটিও নিয়ে গেল।

তাহির আমীনের লাশ প্রকাশ্যে লটকিয়ে রাখল। যখন জনতা তার লাশ ভাল মতে দেখে নিল তখন সে তার চাচাতো ভাই মুহাম্মদ ইব্ন হাসান ইব্ন জুরায়েক ইব্ন মুসআবের হাতে খলীফার সীলমোহরে, লাঠি ও অঙ্গুরীয় দিয়ে মামূনের কাছে পাঠালো এবং আমীন নিহত হওয়ার সংবাদ শহরে ঢোল-শোহরত করে দিল। জুমুআর দিন মামূনের সাথে মসজিদে খুতবা পড়লো এবং আমীনের নিন্দাবাদ করলো। সে আমীনের পুত্রদ্বয় মূসা ও আবদুল্লাহকে মামূনের কাছে পাঠিয়ে দিল। তারপর তাহিরের বাহিনী তাদের বেতন-ভাতার দাবি করলো। সে তা পরিশোধে ব্যর্থ হলে সৈন্যদল বিদ্রোহ করতে উদ্যত হলো। তাহির প্রাণ নিয়ে বাগদাদ থেকে পালিয়ে গেল। তারপর বিশিষ্ট ও ঘনিষ্ঠ সেনাপতিদেরকে একত্র করে এবং একটি বাহিনী যোগাড় করে তাদের সাহায্যে পুনরায় বাগদাদে প্রবেশ করলো এবং শহরবাসী ও সৈন্যদলকে তার আনুগত্য মেনে নিতে বাধ্য করলো।

আমীনের শাসনকাল পর্যালোচনা

খলীফা আমীন সাতাশ বা আটাশ বছরের আয়ু পেয়েছিল। তাঁর মোট খিলাফতকাল হচ্ছে চার বছর সাড়ে সাত মাস। এ গোটা সময়টা তিনি ফিতনা-ফাসাদ ও রক্তপাতের মধ্যে অতিবাহিত করেন। অকারণে হাজার হাজার মুসলমানের রক্তপাত করেন। আমীনের শাসনকাল ছিল মুসলিম জাহানের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক ও অশুভকাল। আমীন যদিও আরবী ব্যাকরণে সুপণ্ডিত ও কবি এবং জ্ঞানানুরাগী ছিলেন, জ্ঞানী-গুণীদের কদর করতেন, কিন্তু খেলাধুলা ও আমোদ-প্রমোদেই তিনি বেশি মত্ত থাকতেন। তাঁর মধ্যে শাসনকার্য পরিচালনার যোগ্যতার অভাব ছিল। সিংহাসনে বসেই তিনি মানসূর প্রাসাদের পার্শ্বে হকি খেলার মাঠ নির্মাণের নির্দেশ জারি করলেন। সাজ-সজ্জার দিকেই ছিল তাঁর ঝোঁক ও মনোযোগ। গানবাদ্য ও রূপ-পূজার অভিশাপও তাঁকে পেয়ে বসেছিল। সর্বোপরি তাঁর স্বার্থপর মন্ত্রী পরিষদে এমন একটি লোকও ছিল না যে তাঁকে তাঁর গুরুদায়িত্ব সম্পর্কে সতর্ক করতে পারতো।

মোটকথা, আমীন তাঁর যৌবনের প্রবণতাসমূহের হাতে পরাস্ত এবং রাজ্য শাসনের গুণাবলী থেকে শোচনীয়ভাবে বঞ্চিত ছিলেন। তাঁর উযীর ফযল ইব্ন রাবী আব্বাসীয় বংশের জন্যে উত্তম বলে প্রতিপন্ন হননি। এই ফযল ইব্ন রাবীই তুস থেকে সেই বাহিনী ও রসদপত্র বাগদাদে নিয়ে এসে মামূনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে আমীন ও মামূন দু'ভাইয়ের মধ্যে শত্রুতার বীজ বপন করে দিলেন— যাদের হারূনুর রশীদের অন্তিম ওসীয়ত অনুসারে মামূনের কাছেই থাকার

কথা ছিল। এতটুকু ব্যাপার হয়তো মামূন মেনেই নিতেন আর বিলাসব্যসনে ব্যস্ত থাকায় আমীনও আর মামূনের বিরুদ্ধে তেমন কিছুই করতেন না। কিন্তু ফযল ইব্‌ন রাবী অপর একটি অসঙ্গত ও অশোভন কাজ আমীনকে দিয়ে করালেন আর তাহলো মামূনের যুবরাজ পদ বাতিল করে দিয়ে আমীনের শিশুপুত্রকে মামূনের স্থলে যুবরাজ বলে ঘোষণা করিয়ে দিলেন। এ ছাড়া হারূনের ওসীয়ত-অনুসারে মামূনের প্রাপ্য রাজ্যের একটি অংশও তিনি কাটছাঁট করতে উদ্যত হন। এই ফযল ইব্‌ন রাবীর পরামর্শেই আমীন পবিত্র কা'বা ঘরে রক্ষিত হারূনের ওসীয়তনামা আনিয়ে ছিঁড়ে ফেলে দেন। ফলে আব্বাসী বংশের সকল প্রভাবশালী অমাত্যবর্গের মন আমীনের প্রতি বিষিয়ে ওঠে।

গভীরভাবে তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে, মুসলিম বিশ্বের এ বিপর্যয় ও ক্ষয়ক্ষতির হেতু ছিলেন হারূনুর রশীদ নিজে। তাঁর সবচাইতে নিন্দনীয় ও ভুল পদক্ষেপ ছিল এই যে, তিনি তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনয়নে ভুল পন্থা অনুসরণ করেছিলেন এবং মামূনকে আমীনের চাইতে যোগ্যতর পাত্র জেনেও তিনি আমীনকেই মামূনের উপর প্রাধান্য দান করেছিলেন। হারূনের পক্ষ থেকে বলা যেতে পারে যে, আমীন পিতামাতা উভয় দিক থেকেই ছিলেন সম্ভ্রান্তকুলশীল, পক্ষান্তরে মামূনের মা ছিলেন অগ্নি-উপাসক। তাই মামূন ক্ষমতাসীন হলে আরবদেরকে দুর্বল করে ইরানীদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়িয়ে তুলবেন এমন একটা আশংকা ছিল।

আমীনকে তিনি এ উদ্দেশ্যে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন যে, তিনি নির্ভেজাল হাশিমী বংশোদ্ভূত হওয়ায় হারূনের শেষ জীবনে অনুসৃত নীতি অনুযায়ী ইরানীদের প্রভাব-প্রতিপত্তি খর্ব করার কাজটি সমাধা করবেন। কিন্তু এ নীতিকে সফল করে তোলার জন্যে যে মন-মস্তিষ্ক ও মেধার প্রয়োজন ছিল আমীনের মধ্যে যে তার অভাব ছিল তাও হারূন সম্যক অবহিত ছিলেন। কেননা, তিনি তাঁর জীবদ্দশায়ই মামূনের যোগ্যতা এবং আমীনের অযোগ্যতার পরিচয় পেয়েছিলেন। আরো গভীরভাবে তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে এ ব্যাপারে হারূনুর রশীদেরও কোন অপরাধ ছিল না। একেবারে সূচনাকাল থেকেই আব্বাসীয়রা যে নীতি অনুসরণ করে আসছিলেন এটা ছিল তাঁরই স্বাভাবিক পরিণতি। আব্বাসীয়রা প্রথমে খুরাসানীদেরকে তাদের উদ্দেশ্য হাসিলের বাহনরূপ বেছে নিয়ে আরবদের বিরুদ্ধাচরণ করেন এবং আরবদের প্রভাব-প্রতিপত্তিকে খর্ব করার জন্য সর্বশক্তি ব্যয় করে নওমুসলিম খুরাসানীদেরকে শক্তিশালী করে তোলেন। আবূ মুসলিমকে আব্বাসী কর্তৃপক্ষ প্রতিটি আরবী ভাষীকে হত্যার যে নির্মম নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন, সে কথা পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। আবূ মুসলিম সে নির্দেশ অনুসারে খুরাসান ও ইরানে ছয় লক্ষ আরবকে যমদ্বারে প্রেরণ করেন। শুরু থেকেই বনূ উমাইয়ার বিরুদ্ধে উলুভী ও আব্বাসীদের যৌথ প্রচেষ্টা আরবদের প্রভাব-প্রতিপত্তির বিরুদ্ধে খুরাসানী, পারসিক ও ইরাকীদেরকে শক্তিশালী করে তোলার কাজে নিয়োজিত ছিল। বনূ উমাইয়ার বিরুদ্ধে সফলভাবে পরিচালিত প্রতিটি ষড়যন্ত্রেই ইরাকী ও খুরাসানীদের সহযোগিতা গ্রহণ করা হয়। এতদ্‌দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বনূ উমাইয়াদের যখন পতন ঘটছিল, উলুভীরা তখন নীরব দর্শক হয়েই রইল আর আব্বাসীয়রা ততক্ষণে খিলাফতের মালিক হয়ে গেল। এবার উলুভীরা আব্বাসীদের বিরোধিতা শুরু করলো। একের পর এক ষড়যন্ত্র চলতে লাগলো। এবারও ইরাকী এবং খুরাসানীরাই আব্বাসীয়দের মুকাবিলায় উলুভীদের পাশে এসে দাঁড়ালেন।

যাদেরকে পূর্বে বনী উমাইয়াদের বিরুদ্ধে আরবদেরকে হত্যার জন্য লেলিয়ে দেয়া হয়েছিল এখন তারাই আব্বাসীয়দের জন্যে সঙ্কটের কারণ হয়ে দাঁড়ালো। মানসূরের শাসনামল পর্যন্ত খুরাসানীদের উত্থান অব্যাহত ছিল। কেবল মাহ্দীর কয়েক বছরের রাজত্বকালে পারসিক বংশোদ্ভূতদের উত্থান কিছুদিনের জন্য বাধাগ্রস্ত ছিল। ঐ সময়টায় আরবদের কিছুটা মূল্যায়ন করা হলো। হাদী ও হারূনের খিলাফত আমলে পারসিক বংশোদ্ভূতদের উন্নতি ও শক্তিবৃদ্ধি সমানে চলতে থাকে। হারূনুর রশীদ তাঁর শেষ জীবন অনুভব করতে সক্ষম হন যে, আরবদেরকে দুর্বল করে আমরা আমাদের নিজেদের পায়ে কুঠারাঘাত করছি। তখন তিনি এর প্রতিকারের প্রতি যত্নবান হন। কিন্তু মৃত্যু তাঁকে আর সে প্রতিকারের জন্যে তেমন সময় দেয়নি।

আমীনের খিলাফতে আরবদের শক্তির কেন্দ্র ছিলেন আমীন আর খুরাসানীদের শক্তির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হন মামূন। অর্থাৎ আমীন ও মামূনের মাধ্যমে আরব বংশোদ্ভূতদের মুকাবিলা হয়। আমীন যেহেতু ব্যক্তি হিসাবে অথর্ব ছিলেন পক্ষান্তরে মামূন তাঁর তুলনায় অনেক প্রাজ্ঞ ছিলেন, তাই আরবদের সে মুকাবিলায় পরাজয় হয়। পারসিক বংশোদ্ভূতরাই ইসলামী হুকুমতের মালিক-মুখতার হয়ে ওঠে।

ঐ খুরাসানী ও পারসিক বংশোদ্ভূত লোকেরাই মামূনকে নিজেদের করে নিয়ে এবং রাষ্ট্রযন্ত্রকে নিজেদের করায়ত্ত করে মামূনের পরে রাষ্ট্রকে উলুভীদের হাতে তুলে দিতে প্রয়াস পায়। কিন্তু ঘটনা পরম্পরায় এমন কিছু কারণ সৃষ্টি হয়ে যায় যে, তাঁরা সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। ফলে রাজত্ব আব্বাসীদের হাতেই রয়ে যায়। অবশেষে ঐ খুরাসানীরা এবং নওমুসলিম তুর্কীরা অধিকতর সাহসী হয়ে ইসলামী-রাষ্ট্রকে খণ্ড-বিখণ্ড করে নিজেদের ভিন্ন ভিন্ন রাজত্ব গড়ে তোলে। এর বর্ণনা পরবর্তী অধ্যায়সমূহে আসছে। মোটকথা, ইসলামী খিলাফতে বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকারের অভিশাপ সমস্ত অনর্থ, সমস্ত বিপদাপদ ও সমস্ত দোষত্রুটির ভিত্তিস্বরূপ। এই বিদআতই মুসলমানদের সর্বাধিক অনিষ্ট সাধন করে এবং ইসলামী রাষ্ট্রের উজ্জ্বল ও মনোরম চেহারাকে সর্বদা ধূলি-ধূসরিত করে রেখেছে। আমীনের খিলাফত আমলের ধৃষ্টতাসমূহ ও ঐ খিলাফতের বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকারের অভিশাপেরই ফল ছিল।

হযরত আলী (রা), হযরত ইমাম হাসান (রা) ও আমীনুর রশীদের মধ্যে একটা অদ্ভুত সামঞ্জস্য ছিল এই যে, তাঁরা তিনজনই এমন তিনজন খলীফা ছিলেন যাঁরা তাঁদের পিতা ও মাতা উভয় দিক থেকে ছিলেন হাশিমী বংশোদ্ভূত। তিনজনের মায়েরা ছিলেন হাশিমী অথচ বাহ্যিকভাবে খিলাফত তাঁদেরকে আনুকূল্য প্রদর্শন করেনি। হযরত আলী (রা)-এর গোটা খিলাফতকালই কাটে মুসলমানদের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও গৃহযুদ্ধের মধ্য দিয়ে। শেষ পর্যন্ত এক পামরের হাতেই তাঁকে শাহাদাতবরণ করতে হয়। হযরত হাসান (রা) নিজেই খিলাফত ত্যাগ করেন। এতদসত্ত্বেও বিষপ্রয়োগে শাহাদাত লাভ করেন। আমীনের গোটা খিলাফতকালও যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যে অতিবাহিত হয় এবং তিনিও আততায়ীর হাতে নিহত হন।

চতুর্থ অধ্যায়

মামূনুর রশীদ

মামূনুর রশীদ ইব্‌ন হারূনুর রশীদের আসল নাম ছিল আবদুল্লাহ্। পিতা তাঁকে খিতাব দেন মামূন বলে। তাঁর উপনাম ছিল আবুল আব্বাস। ১৭০ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসের মাঝামাঝি শুক্রবার (৭৮৬ খ্রি সেপ্টেম্বর) তিনি ভূমিষ্ঠ হন। যে রাতে মামূনুর রশীদের জন্ম হয় ঐ রাতেই হাদীর ইন্তিকাল হয়। তাঁর মায়ের নাম ছিল মারাজিল। যিনি গর্ভস্থ সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর চল্লিশতম দিনে ইনতিকাল করেন। তিনি ছিলেন একজন পারসিক বংশোদ্ভূত ক্রীতদাসী। হিরাত এলাকার অন্তর্গত বাদেগীসে ঐ মহিলার জন্ম। খুরাসানের গভর্নর আলী ইব্‌ন ঈসা তাকে খলীফা হারূনুর রশীদের খিদমতে পেশ করেছিলেন। মামূনুর রশীদের মায়ের কোলে প্রতিপালিত হওয়ার সুযোগ ঘটেনি। হারূনুর রশীদ তাঁর প্রতিপালন এবং শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি বিশেষ যত্নবান ছিলেন। পাঁচ বছর বয়সে তিনি মামূনকে বিখ্যাত ব্যাকরণবিদ কিসাঈ ও ইয়াযীদীর শিক্ষাধীনে ন্যস্ত করেন। তাঁরা তাঁকে কুরআন মজীদ ও আরবী সাহিত্য শিক্ষা দেন।

বার বছর বয়সে যখন মামূন তাঁর আল্লাহ্প্রদত্ত মেধার বলে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন তখন তাঁকে জা'ফর বারমাকীর গৃহশিক্ষকতাধীনে দেয়া হয়। জা'ফর বারমাকী তাঁর গৃহশিক্ষকরূপে তাঁকে প্রয়োজনীয় শিক্ষাদীক্ষা দিতে থাকেন। ঐ বছরই অর্থাৎ ১৮২ হিজরীতে (৭৯৮ খ্রি) হারূনুর রশীদ তাঁকে আমীনের পরবর্তী রাজকুমার বা সিংহাসনের উত্তরাধিকারীরূপে মনোনয়ন দান করেন। ঐ দু'জন আলিম ছাড়াও হারূনের দরবারে আলিম-ফাযিল ও জ্ঞানী-গুণীদের কমতি ছিল না। তাঁদের অনেকেই বিভিন্ন সময়ে মামূনের শিক্ষকরূপে দায়িত্ব পালন করেন।

মামূন কুরআনুল করীমের হাফিয এবং ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন আলিম ছিলেন। ভাষার অলঙ্কার এবং অনবদ্য বাক্য-বিন্যাসে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তিনি তাঁর ভাই আমীনের চাইতে বয়সে কিছুটা বড় ছিলেন। ফিকাহ্ ও হাদীসশাস্ত্র তিনি বড় বড় ইমামের নিকট শিক্ষালাভ করেছিলেন। হারূনুর রশীদ অত্যন্ত যত্নসহকারে আমীন ও মামূনকে শিক্ষাদীক্ষা দানের ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর এ যত্ন ও শিক্ষাদীক্ষার প্রভাব যতটুকু মামূনের চরিত্রের উপর পড়েছিল, আমীনের চরিত্রে ততটুকু পড়েনি।

যদিও ১৯৩ হিজরীর জুমাদাস সানী (৮০৯ খ্রি এপ্রিল) মাসে খলীফা হারূনুর রশীদের ইন্তিকালের সাথে সাথেই মামূনুর রশীদ খুরাসান প্রভৃতি পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যের স্বাধীন শাসক হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর খিলাফতকাল শুরু হয় ১৯৮ হিজরীর মুহাররম (৮১৩ খ্রি সেপ্টেম্বর) মাসে আমীন নিহত হওয়ার পর। আমীন ঐ বছর ২৫শে মুহাররম (২৫ সেপ্টেম্বর) রাতের বেলা নিহত হয়েছিলেন। আর মামূনের বায়আত ও অভিষেক হয় তার অব্যবহিত পরবর্তী দিন শনিবার ১৯৮ হিজরীর ২৬শে মুহাররম (৮১৩ খ্রি ২৬ সেপ্টেম্বর) বাগদাদে।

মামূন যখন আমীনের নিহত হওয়ার সংবাদ অবগত হলেন আর বাগদাদে তাঁর সৈন্যবাহিনীর দখল প্রতিষ্ঠিত এবং বাগদাদবাসী কর্তৃক তাঁর খিলাফত স্বীকৃত হলো, তখন তিনি তাঁর উযীর ফযল ইব্‌ন সাহ্‌ল -এর ভাই হাসান ইব্‌ন সাহ্‌লকে জিবাল, পারস্য, আহওয়ায, বসরা, কূফা, হিজায, ইয়ামান প্রভৃতি বিজিত রাজ্যসমূহের শাসনভার অর্পণ করে বাগদাদ অভিমুখে প্রেরণ করলেন। হারছামা ইব্‌ন আইউন এবং তাহির ইব্‌ন হুসাইন এসব এলাকা জয় করেছিলেন। এ দুজন সিপাহ্‌সালারের অক্লান্ত চেষ্টায় ও বীরত্বের ফলেই মামূন বাগদাদের খিলাফত লাভ করেন এবং আমীন নিহত হন। এ ব্যাপারে সবচাইতে বেশি কৃতিত্বের অধিকারী তাহির ভেবেছিলেন যে, তাঁকেই এসব বিজিত এলাকায় শাসনভার অর্পণ করা হবে। কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে হাসান ইব্‌ন সাহলকেই সে দায়িত্ব অর্পণ করা হলো আর হাসান ইব্‌ন সাহল তাহিরকে জাযিরা, মুসেল ও শামের গভর্নর নিযুক্ত করে নসর ইব্‌ন শীছ ইব্‌ন আকীল ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন রাবী ইব্‌ন আমেরের মুকাবিলায় প্রেরণ করলেন। ঐ ব্যক্তি অর্থাৎ নসর ইব্‌ন শীছ আমীনের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে মামূনের খিলাফতের বিরুদ্ধে মুসেল ও সিরিয়ায় প্রচুর লোক সংগ্রহ করে ইরাকের শহরগুলো একে একে অধিকার করে চলেছিল। হাসান ইব্‌ন সাহল শাসক ও নায়েবে সালতানাত হয়ে আসায় লোকের বদ্ধমূল ধারণা হলো যে, মামূনের উপর ফযল ইব্‌ন সাহলের অপ্রতিহত প্রভাব বিদ্যমান রয়েছে আর এখন সর্বদিকে ইরানীদেরই জয়-জয়কার হবে। আরব সর্দাররা এ কথা কল্পনা করে অত্যন্ত সংকটবোধ করলেন এবং সাধারণভাবে তাদের মনে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হলো। সাথে সাথে এ ব্যাপারেও তারা নিশ্চিত হলেন যে, মামূন এখন ফযল ইব্‌ন সাহলের ইচ্ছানুসারে মার্ভকেই রাজধানী রূপে বহাল রাখবেন—তিনি আর বাগদাদে আসছেন না।

তাহিরকে হাসান ইব্‌ন সাহল নসর ইব্‌ন শীছের মুকাবিলায় প্রেরণ করলে সেখানে তিনি তেমন সাফল্য অর্জন করতে সমর্থ হননি। তাহির রিক্কা শহরে অবস্থান করে নসর ইব্‌ন শীছের সাথে মামুলী সংঘর্ষ চালিয়ে যান। রিক্কাতেই তাহিরের কাছে সংবাদ পৌঁছলো যে, খুরাসানে তাঁর পিতা হুসায়ন ইব্‌ন যুরায়ক ইব্‌ন মুসআব ইন্তিকাল করেছেন আর স্বয়ং খলীফা মামূন তার জানাযায় অংশগ্রহণ করেছেন। হারছামা ইব্‌ন আইউনকে হাসান ইব্‌ন সাহল খুরাসানের দিকে চলে যেতে নির্দেশ দিলেন। নসর ইব্‌ন শীছের বিদ্রোহ যেহেতু এ জন্য ছিল যে, আরবদের উপর অনারবদের প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে, সে জন্যে তাহির তাঁর মুকাবিলার ব্যাপারে ততটা উৎসাহী বা মনোযোগী ছিলেন না। কেননা স্বয়ং তাহিরের মনেও এ ক্ষোভ কিছুটা কম ছিল না। আব্বাসী খান্দানের পুরনো সংশ্লিষ্টজন হিসেবে হারছামা ইব্‌ন আইউনও অনারবদের ক্রমবর্ধমান প্রভাবকে সন্দেহের চোখেই দেখতেন।

ইব্‌ন তাবাতাবা ও আবুস সারায়ার বিদ্রোহ

আবুস সারা বা সারা ইব্‌ন মানসূর বনূ শায়বান গোত্রের লোক ছিল। আমীনের খিলাফত আমলে সে জাযীরার গভর্নর সৈন্যবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। সেখানে সে বনূ তামীমের এক ব্যক্তিকে হত্যা করলে গভর্নর কিসাস গ্রহণের উদ্দেশ্যে তাকে গ্রেফতার করার নির্দেশ দেন। প্রাণভয়ে সে ফেরারী হয়ে যায় এবং লুটপাট ও রাহাজানিতে লিপ্ত হয়। শেষ পর্যন্ত আরও ত্রিশ

ব্যক্তি তার সাথে রাহাজানিতে যোগ দেয়। কয়েকদিন পর সে তার সঙ্গী-সাথীদেরকে নিয়ে আর্মেনিয়াতে ইয়াযীদ ইব্ন মযীদের কাছে চলে যায়। ইয়াযীদ ইব্ন মযীদ তাকে সিপাহসালার পদে নিযুক্ত করেন। ইয়াযীদ ইব্ন মযীদের মৃত্যু হলে সে তার পুত্র আসাদ ইব্ন ইয়াযীদের কাছে থেকে যায়। আসাদ আর্মেনিয়ার শাসনক্ষমতা হারালে তখন সে আবুস সারা আহমদ ইব্ন মযীদের কাছে চলে যায়। আমীন যখন আহমদ ইব্ন মযীদকে হারছামার বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রেরণ করেন তখন আহমদ ইব্ন মযীদ আবুস সারাকে তাঁর বাহিনীর অগ্রবর্তী দলের সেনাপতির পদ দান করেন। হারছামা তার সাথে চক্রান্ত করে তাকে তাঁর দলে ভিড়িয়ে নেন। সে তখন হারছামার বাহিনীর একজন।

হারছামার কাছে গিয়ে সে ব্যক্তি জাযীরা থেকে তার স্বগোত্র বনূ শায়বানের লোকজনকে নিয়ে আসে এভাবে ঐ গোত্রের দুই হাজার লোক জাযীরা থেকে এসে হারছামার বাহিনীতে ভর্তি হয়। আবুস সারায়া হারছামাকে দিয়ে তাদের বড় বড় বেতনভাতা ধার্য করিয়ে দেয়। আমীন নিহত হলে হারছামা তাদেরকে বড় অংকের সেই বেতন ভাতাদানে অস্বীকৃতি জানায়। ক্ষুব্ধ আবুস সারায়া হারছামার কাছে হজ্জের অনুমতি প্রার্থনা করে। হারছামা তাকে হজ্জের অনুমতি দেন এবং সকল খরচ স্বরূপ তাকে বিশ হাজার দিরহাম প্রদান করেন। আবুস সারায়া সে অর্থ তার সাথীদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে বলে দেয় যে, তোমরাও একজন দু'জন করে ক্রমে ক্রমে আমার কাছে চলে আসবে। আবুস সারায়া বাহ্যত হজ্জের জন্যে হারছামার নিকট থেকে বিদায় নেয় এবং পথিমধ্যে একস্থানে অবস্থান করে। সেখানে আরো দুশ ব্যক্তি গিয়ে তার কাছে সমবেত হয়। এদেরকে সংঘবদ্ধ করে আবুস সারায়া আইনুত তামার আক্রমণ করে এবং সেখানকার সরকারী কর্মচারীদের গ্রেফতার করে সেখানে ব্যাপক লুটপাট চালায়। যুদ্ধলব্ধ দ্রব্যসম্ভার সে সাথীদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়। তারপরও সে তার লুটপাট অব্যাহত রাখে এবং কয়েকটি স্থানে সরকারী কোষাগারও লুট করে।

হারছামা তাকে দমন ও গ্রেফতার করার উদ্দেশ্যে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করলেন। আবুস সারায়া তাদেরকে পরাস্ত করে তাড়িয়ে দেয়। তার অবশিষ্ট সঙ্গী-সাথীরাও তার সাথে এসে যোগ দেয়। ফলে তার দলবল বেশ ভারী হয়ে ওঠে। তারপর আবুস সারায়া ও কূফার আমীনকে পরাজিত করে সেখানকার কোষাগার লুট করে এবং আম্বার অভিমুখে রওয়ানা হয়। সেখানকার আমীন ইবরাহীম মার্ভীকে হত্যা করে আম্বারেও যদৃচ্ছ লুটপাট চালায় এবং যুদ্ধলব্ধ দ্রব্যসম্ভার সঙ্গী-সাথীদের মধ্যে বণ্টন করে সেখান থেকে প্রস্থান করে। আম্বার থেকে যাত্রা করে তওক ইব্ন মালিক তাগলাবীর কাছে গিয়ে উপনীত হয়। তারপর সেখান থেকে রিক্কা অভিমুখে রওয়ানা হয় সেখানে ঘটনাচক্রে মুহাম্মদ ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন হাসান মুছান্না ইব্ন আলীর সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটে। মুহাম্মদ ইব্ন ইবরাহীম খিলাফতের দাবিদার রূপে আত্মপ্রকাশ করে সদলবলে রিক্কা থেকে বের করে দিলেন। তাঁর পিতা ইবরাহীম তাবাতাবা নামে অভিহিত হতেন। এ কারণে ইবরাহীম ইব্ন তাবাতাবা নামে খ্যাতিলাভ করেন।

এটি ছিল সেই যুগসন্ধিক্ষণ যখন হাসান ইব্‌ন সাহ্‌ল ইরাক, হিজায, ইয়ামান প্রভৃতির শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়ে বাগদাদে এসেছিলেন এবং তিনি স্বভাবত আরবদের ক্ষমতাকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখছিলেন। তারা তখন মামূনের খিলাফতকেই নিজেদের জন্যে ক্ষতিকর মনে করছিল। উলুভীরা পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণের জন্যে বিভিন্নস্থানে প্রস্তুতি গ্রহণে তৎপর ছিলেন। ওদিকে নসর ইব্‌ন শীছ ঘোষণা করে দেন যে, আমি আসলে আব্বাসী খিলাফতের বিরোধী নই, কিন্তু বর্তমান সরকারের বিরোধিতা করছি এ জন্যে যে, তারা আরবদের উপর অনারবদের প্রাধান্য দিলেন। তার এ ঘোষণার ফলে মামূনের আরব সেনাপতিরা নসর ইব্‌ন শীছের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ব্যাপারে নিরুৎসাহবোধ করেন।

ঐ সময় হাসান ইব্‌ন সাহল অসন্তুষ্ট হয়ে হারছামাকে খুরাসানের দিকে পাঠিয়ে দেন। আবুস সারায়া মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম (যৌবনে তাবাতাবা)-এর অস্তিত্বকে তার পক্ষে অত্যন্ত সহায়ক বিবেচনা করেন এবং কালবিলম্ব না করে সে তাঁর হাতে বায়আত গ্রহণ করে। ইব্‌ন তাবাতাবা আবুস সারায়াকে নদীপথে কূফার দিকে প্রেরণ করে নিজে স্থলপথে কূফা অভিমুখে অগ্রসর হন। পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে ১৫ জুমাদাস্‌সানী ১৯৯ হিজরীতে (৮১৫ খ্রি ফেব্রুয়ারী) একদিকে আবুস সারায়া এবং অপর দিকে ইব্‌ন তাবাতাবা কূফায় প্রবেশ করেন। তারা কূফার গভর্নর মূসা ইব্‌ন ঈসার আবাস স্থল ও শাহী কোষাগার 'কসরে-আব্বাসে' লুটপাট চালিয়ে সমস্ত কূফা শহরে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। কূফাবাসীরা ইব্‌ন তাবাতাবার হাতে বায়আত হয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর আধিপত্য স্বীকার করে নেয়।

হাসান ইব্‌ন সাহ্‌ল কূফায় আবুস সারায়া এবং ইব্‌ন তাবাতাবার অধিকার প্রতিষ্ঠার সংবাদ পেয়ে যুহায়র ইব্‌ন মুসাইয়িবকে দশহাজার সৈন্য দিয়ে কূফা অভিমুখে প্রেরণ করেন। আবুস সারায়া এবং ইব্‌ন তাবাতাবা কূফা থেকে বের হয়ে যুহায়র ইব্‌ন মুসাইয়িবের মুকাবিলা করেন। যুদ্ধে যুহায়রের বাহিনী পরাস্ত হয়। আবুস সারায়া যুহায়রের বাহিনীর শিবিরে লুটপাট ও নির্দয় হত্যাকাণ্ড চালায়। ইব্‌ন তাবাতাবা তাকে নির্দয় আচরণ করতে বারণ করেন। শুরু থেকেই লুটপাট, হত্যা, রাহাজানি ও নির্দয় হত্যাকাণ্ড ও স্বাধীন চলাফেরায় অভ্যস্ত আবুস সারায়ার কাছে ইব্‌ন তাবাতাবার এ নিষেধাজ্ঞা ছিল একেবারেই অসহনীয়। সে ইব্‌ন তাবাতাবাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করে। পরদিনই ইব্‌ন তাবাতাবার মৃতদেহ পাওয়া যায়। এভাবে তাঁর রাজত্বের অধ্যায়টি দেখতে না দেখতে শেষ হয়ে যায়। আবুস সারায়া কালবিলম্ব না করে মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন হুসাইন ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব নামক এক কিশোরের হাতে বায়আত করে তাঁকেই ইব্‌ন তাবাতাবার স্থলাভিষিক্ত করে। কার্যত সে নিজেই গত ঐ প্রশাসনের সর্বেসর্বা হয়ে ওঠে।

আবুস্ সারায়ার রাজত্ব ও তার পরিণতি

যুহায়র ইব্‌ন মুসাইয়িব পরাজিত হয়ে কসরে ইব্‌ন হুবায়রায় এসে বসবাস করতে থাকেন। হাসান ইব্‌ন সাহল আবদে দীন ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন খালিদ মার্দরোজীকে চার হাজার সৈন্য দিয়ে যুহায়রের সাহায্যার্থে প্রেরণ করলেন। যুহায়র ও আবদে দীন কূফায় আক্রমণ চালালেন। কিন্তু ১৯৯ হিজরীর ১৫ই রজব তারিখের (৮১৫ খ্রি মার্চ) যুদ্ধে তাঁরা আবুস

সারায়ার হস্তে পরাস্ত নিহত হন। এ বিজয়ের পর আবুস সারায়া কূফায় তার স্বনামে মুদ্রা চালু করে এবং উলুভীদের বেশ কয়েকজনকে বিভিন্ন প্রদেশের গভর্নর নিয়োগ করে প্রেরণ করে। সে আহওয়াযে আব্বাস ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা ইব্‌ন মুহাম্মদকে, মক্কায় হুসাইন ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন আলী ইব্‌ন হুসাইন ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব ওরফে আফতাসকে, ইয়ামানে ইবরাহীম ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন জা'ফর সাদিককে, বসরায় যাইদ ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন জা'ফর সাদিককে প্রেরণ করে। আব্বাসও বসরায় পৌঁছে সেখানকার আমিলকে পরাস্ত করে বসরা দখল করে নেন। অনুরূপভাবে আবুস সারায়ার অন্যান্য আমিলও নিজ নিজ কর্মস্থলে সাফল্য অর্জন করেন। আবুস সারায়া আব্বাস ইব্‌ন মুহাম্মদকে লিখলো যে, তিনি যেন আহওয়ায থেকে সৈন্য-সামন্ত নিয়ে পূর্ব দিক থেকে বাগদাদে আক্রমণ চালান। সৈন্যসহ সে নিজে এসে কসরে হুবায়রা ওঠে। হাসান ইব্‌ন সাহল বাগদাদ থেকে আলী ইবন সাঈদকে মাদায়েন ও ওয়াসিতের হিফাযতের জন্যে মাদায়েনের দিকে প্রেরণ করলেন। সে খবর পেয়ে আবুস সারায়া কসরে-হুবায়রা থেকে একদল সৈন্য পাঠিয়ে দিল। তারা আলী ইব্‌ন সাঈদের মাদায়েনে পৌঁছার পূর্বেই ১৯৯ হিজরীর রমযান (৮১৫ খ্রি মে) মাসে মাদায়েন দখল করে নিল। স্বয়ং আবুস সারায়া কসরে ইব্‌ন হুবায়রা থেকে রওয়ানা হয়ে নহর সারসার এসে অবস্থান গ্রহণ করে। আলী ইব্‌ন সাঈদ মাদায়েনে পৌঁছে ১৯৯ হিজরীর শাওয়াল (৮১৫ খ্রি জুন) মাসে আবুস সারায়ার বাহিনীকে অবরোধ করলেন। আবুস সারায়া তার বাহিনীর অবরুদ্ধ হওয়ার সংবাদ পেয়ে নহর সারসার থেকে কসরে ইব্‌ন হুবায়রা অভিমুখে রওয়ানা হয়ে পড়লো।

১৯৯ হিজরীর রজব (৮১৫ খ্রি মার্চ) মাসে হাসান ইব্‌ন সাহলের প্রেরিত বাহিনী আবুস সারায়ার হাতে পরাজয়বরণ করলো এবং তাঁর সেনাপতি তার হাতে গ্রেফতার ও নিহত হলে তিনি অত্যন্ত চিন্তিত হলেন। সেনাপতি তাহির তখন রিক্কায় অবস্থান করছিলেন এবং নসর ইব্‌ন শীছের দরুন ওখান থেকে তিনি সরে আসতে পারছিলেন না। হারছামা বাগদাদ থেকে বিদায় নিয়ে খুরাসানের দিকে রওয়ানা হয়ে পড়েছিলেন। এ দু'জন সর্দার ছাড়া আবুস সারায়ার মুকাবিলায় প্রেরণের মত আর কোন সেনাপতিও হাসান ইব্‌ন সাহলের কাছে ছিলেন না। ওদিকে আবুস সারায়া বাগদাদ জয়ের প্রস্তুতি গ্রহণে ব্যস্ত ছিল। বসরা, কূফা, ওয়াসেত, মাদায়েন প্রভৃতি এলাকা ইতিমধ্যেই তার দখলে এসে গিয়েছিল। হাসান ইব্‌ন সাহল ও হারছামা একে অপরের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। এ জন্য হাসান হারছামার কোনরূপ সাহায্য গ্রহণে অনিচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু এবার একান্তই দায়ে পড়ে তিনি দ্রুতগামী কাসেদ মারফত পত্রে হারছামাকে অনুরোধ করলেন যেন পথ থেকেই তাৎক্ষণিক ভাবে তিনি ফিরে আসেন এবং আবুস সারায়ার ব্যাপারটা চুকিয়ে যান। হারছামা যদিও চাইতেন না যে, হাসান ইব্‌ন সাহলের কোন কাজ সহজভাবে সম্পন্ন হোক, কিন্তু যেহেতু তিনি নিজে তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছেন, তাই এ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করাকেও তিনি সমীচীন মনে করলেন না। তিনি কালবিলম্ব না করে বাগদাদের দিকে অগ্রসর হলেন। হারছামা ঠিক তখনি বাগদাদে প্রবেশ করছিলেন যখন আবুস সারায়া নহরে সারসার থেকে মাদায়েনের অবরোধ সংবাদ শুনে কসরে-ইব্‌ন হুবায়রার দিকে রওয়ানা হয়েছিলেন। হারছামা কালবিলম্ব না করে বাগদাদ থেকে আবুস সারায়ার পশ্চাদ্ধাবন করলেন। পথিমধ্যে প্রথমে তিনি আবুস সারায়ার বাহিনীর একটি দলকে

পান এবং তাদেরকে ঘেরাও করে হত্যা করেন। তারপর দ্রুত অগ্রসর হয়ে আবুস সারায়ার নিকটবর্তী হন। সে তখন পিছনে ফিরে মুকাবিলায় প্রবৃত্ত হয়। এ সংঘর্ষে তার অনেক সঙ্গী-সাথী নিহত হয়। আবুস সারায়া নিজে সেখান থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। সে কূফায় পৌঁছে বনূ আব্বাস এবং তাদের সমর্থকদের বাড়িঘর বেছে বেছে লুট করে এবং সেগুলোকে ধূলিসাৎ করে দেয়। তাদের সমস্ত মাল-আসবাব এবং অন্যদের কাছে গচ্ছিত তাদের আমানতসমূহ দখল করে নেয়। হারছামা অগ্রসর হয়ে কূফা অবরোধ করেন। আবুস সারায়া সেখানে দীর্ঘ দু'মাস ধরে দৃঢ়তার সাথে তাঁকে প্রতিরোধ করে চলে। কিন্তু অবরোধের কঠোরতায় শেষ পর্যন্ত হতাশ ও অপারগ হয়ে মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন মুহাম্মদকে সাথে নিয়ে আটশ অশ্বারোহী সৈন্যসহ কূফা থেকে পালিয়ে যায়। ২০০ হিজরীর ১৫ই মুহাররম (৮১৫ খ্রি ২৬শে আগস্ট) হারছামা কূফায় প্রবেশ করে সেখানে একজন আমিল নিযুক্ত করেন এবং একদিন সেখানে অবস্থান করে বাগদাদ অভিমুখে রওয়ানা হয়ে যান।

আবুস সারায়া কূফা থেকে কাদিসিয়া এবং সেখান থেকে তূস অভিমুখে রওয়ানা হয়। খুযিস্তানে একটি কাফেলার সাথে তার সাক্ষাত হয় যারা প্রচুর মালপত্র নিয়ে যাচ্ছিল। আবুস সারায়া সে কাফেলা লুট করে সমস্ত দ্রব্যসম্ভার তার সঙ্গী-সাথীদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়।

ঐ সময়ই হাসান ইব্‌ন আলী মামুনী আহ্ওয়ায থেকে আবুস সারায়ার আমিলকে তাড়িয়ে দিয়ে তা দখল করে নেন। হাসান ইব্‌ন আলী আবুস সারায়ার এই নির্যাতনের সংবাদ পেয়ে আহ্ওয়ায থেকে সসৈন্য আবুস সারায়ার পশ্চাদ্ধাবন করতে রওয়ানা হন। উভয় পক্ষে যুদ্ধ হয় এবং আবুস সারায়া সে যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হয়। সে তখন জালূলা এলাকায় অবস্থিত 'রাস আইন' নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছে। হাসান ইব্‌ন আলী তা অবগত হয়ে সেখানে গিয়ে পৌঁছেন এবং আবুস সারায়াকে মুহাম্মদ ইব্‌ন জাফর ইব্‌ন মুহাম্মদসহ গ্রেফতার করে হাসান ইব্‌ন সাহলের খিদমতে পাঠিয়ে দেন। হাসান ইব্‌ন সাহল আবুস সারায়াকে হত্যা করিয়ে তার শবদেহ বাগদাদের পুলের উপর লটকিয়ে দেন এবং তার খণ্ডিত শির মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন মুহাম্মদকে সাথে দিয়ে মামূনের খিদমতে পাঠিয়ে দেন। আলী ইব্‌ন সাঈদ মাদায়েন জয় করে এবং আবুস সারায়ার সৈন্যদেরকে হত্যা করে হাসান ইব্‌ন সাহলের নির্দেশানুসারে প্রথমে ওয়াসিত অভিমুখে যান এবং দখল করে বসরা অভিমুখে যাত্রা করেন। সেখানে তিনি যাইদ ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন জা'ফর সাদিককে পরাজিত করে বসরা দখল করেন।

যাইদ ইব্‌ন মূসা বসরায় সমস্ত বনূ আব্বাস বংশীয়দের এবং তাদের সমর্থকদের বাড়িঘর অগ্নিসংযোগে পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। এ জন্যেও তিনি 'যাইদুন্‌নার' বা আগুনে যাইদ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। আলী ইব্‌ন সাঈদ যাইদুন্‌নারকে গ্রেফতার করে নজরবন্দী করেন। এভাবে ২০০ হিজরীর মুহাররম (৮১৫ খ্রি আগস্ট) মাসে আবুস সারায়া ও ইরাকের বিদ্রোহের অবসান ঘটে। কিন্তু হিজায ও ইয়ামানে তখনো হাঙ্গামা ও অশান্তি বিরাজ করছিল।

হিজায ও ইয়ামানে বিশৃঙ্খলা

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, আবুস সারায়া আবূ তালিব বংশীয়দেরকেই বিভিন্ন প্রদেশ ও রাজ্যের গভর্নররূপে নিযুক্তি দিয়েছিল। সর্বত্র আব্বাসীয়দের বিরুদ্ধে উলুভীরাই সক্রিয় ও

তৎপর ছিল। আবুস সারায়া উলুভীদেরকেই বিভিন্ন প্রদেশ ও রাজ্যে নিযুক্তি দিয়ে বাহ্যিকভাবে তার রাজত্বকে যে উলুভী রাজত্বের রূপ দিয়েছিল সেটা ছিল তার তীক্ষ্ণবুদ্ধিরই পরিচায়ক। আবুস সারায়ার জীবন ও রাজত্বের অবসান ঘটলেও তার নিযুক্ত অধিকাংশ উলুভী গভর্নর ও শাসক কিন্তু সাহস হারায়নি, তারা নিজেদের খিলাফত প্রতিষ্ঠার সাধনা চালিয়ে যেতে থাকে। আমীনের হত্যাকাণ্ডের পর উলুভীদের হাতে সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হয়। কেননা, স্বয়ং মামূনের উপর যাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল সেই ফযল, হাসান ও সাহলের পুত্ররা ইরানী বংশোদ্ভূত হওয়ায় আবূ তালিব বংশীয়দেরকে আব্বাস বংশীয়দের তুলনায় উত্তম বিবেচনা করতেন এবং উলুভীদের দিকেই তাঁদের ঝোঁক ছিল বেশি।

স্বয়ং মামূন জা'ফর বারমাকীর কাছে শিক্ষাদীক্ষা লাভ করেছিলেন। এ জন্য তাঁর অন্তরেও সৈয়দদের সম্ভ্রমে পরিপূর্ণ ছিল। তাঁর প্রধানমন্ত্রীর জন্যে আমীনের হত্যার পর সালতানাতের গতিধারা উলুভীদের দিকে ফিরিয়ে দেয়ার পূর্ণ সুযোগ উপস্থিত হয়েছিল। কিন্তু হারছামা ইব্ন আইউনের সামরিক কুশলতা ইরাকের বুক থেকে আবুস সারায়াকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে তাঁকে বিপদমুক্ত করে। উলুভীদের রাজ্যশাসন প্রণালী তাদেরকে হিজায ও ইয়ামানে ব্যর্থ প্রতিপন্ন করে। এর বিশদ বিবরণ এরূপ ঃ

আবুস সারায়া যখন হুসাইন ইব্ন হাসান ইব্ন আলী ইব্ন হুসাইন ওরফে হুসাইন আকতাসকে মক্কায় গভর্নর নিয়োগ করে পাঠায় তখন ঘটনাচক্রে হারূনুর রশীদের প্রসিদ্ধ ভৃত্য মাসরূর তার সঙ্গী-সাথীসহ সেখানে ছিলেন। ঐ সময় মামূনের পক্ষ থেকে মক্কায় আমিল ছিলেন দাউদ ইব্ন ঈসা ইব্ন মূসা আব্বাসী। দাউদ ও মাসরূর মক্কায় হুসাইন আকতাসের আগমনের সংবাদ পেয়ে আব্বাস বংশীয় এবং তাদের সমর্থকদের একটি পরামর্শসভা আহ্বান করেন। মাসরূর এবং অন্যান্য অনেকেই যুদ্ধের প্রস্তাব দিলেন, কিন্তু দাউদ ইব্ন ঈসা ইব্ন মূসা কোনক্রমেই হেরেম শরীফে রক্তারক্তি পছন্দ করলেন না। তিনি স্পষ্টতই এ ব্যাপারে তাঁর অনীহার কথা জানিয়ে বললেন, হুসাইন আকতাস একদিকে মক্কায় প্রবেশ করলে আমি অন্যপথে মক্কা থেকে বেরিয়ে যাব।

এ কথা শুনে মাসরূর চুপ হয়ে গেলেন। সত্যি সত্যি দাউদ হুসাইন আকতাস মক্কার নিকটবর্তী হয়েছেন শুনেই ইরাকের উদ্দেশে মক্কা ত্যাগ করে চললেন। তা লক্ষ্য করে মাসরূরও মক্কা থেকে বেরিয়ে গেলেন। হুসাইন আকতাস মক্কার বাইরে এসে থামলেন এবং মক্কায় প্রবেশ করতে ইতস্তত করছিলেন। যখন তিনি জানতে পেলেন যে, আব্বাস বংশীয়রা মক্কা ছেড়ে চলে গিয়েছে, তখন তিনি প্রথমে মাত্র দশজন সাথী নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করলেন। তিনি তাওয়াফ করলেন এবং একরাত মক্কায় কাটিয়েই তাঁর সঙ্গী-সাথীদেরকেও ডেকে এনে মক্কার দখল গ্রহণ করলেন। তিনি যথারীতি সেখানে রাজত্বও করতে লাগলেন। ইবরাহীম ইব্ন মূসা ইব্ন জা'ফর সাদিক ইয়ামানে পৌঁছে মামূনের নিযুক্ত আমিল ইসহাক ইব্ন মূসা ইব্ন ঈসাকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দিয়ে নিজে তার দখল গ্রহণ করে সেখানে রাজত্ব করতে শুরু করে দেন। হুসাইন আকতাস কা'বা শরীফের গিলাফ খুলে ফেলে আবুস সারায়ার কূফা থেকে প্রেরিত গিলাফ কা'বা গাত্রে চড়িয়ে দেন। আব্বাসীয়দের ধনসম্পদ ও ঘরবাড়ি লুট করেন। অন্যদের কাছে

গচ্ছিত তাদের ধনসম্পদ কুক্ষিগত করেন। কা'বা শরীফের স্তম্ভসমূহে লাগানো স্বর্ণ সম্ভার খুলে নেন এবং খানায়ে কা'বার কোষাগারে রক্ষিত সকল ধনসম্পদ ও মাল-আসবাবপত্র বের করে নিজের সঙ্গী-সাথীদের মধ্যে বণ্টন করে দেন।

হুসাইন আকতাসের সঙ্গী-সাথীরা হারাম শরীফের জালিসমূহ ভেঙ্গে ফেলেন। ওদিকে ইবরাহীম ইয়ামানে পৌঁছে হত্যাযজ্ঞ শুরু করে দেন। নিরপরাধ লোককে হত্যা করে তিনি 'কসাই' খেতাব অর্জন করেন। এখনো লোকে তাকে ইবরাহীম কাস্সাব বা কসাই ইবরাহীম নামে স্মরণ করে থাকে। ইবরাহীম ইব্ন মূসা এবং হুসাইন আকতাস যে সব সর্দারকে বিভিন্ন এলাকার দিকে প্রেরণ করেছিলেন, তারাও লুটপাট ও হত্যা রাহাজানির ব্যাপারে কেউ কম করেননি। যায়দ ইব্ন মূসার কথা উপরেই বর্ণিত হয়েছে যে বসরায় নির্যাতন নিপীড়ন চালিয়ে যায়দুন্নার বা আগুনে যায়দ খেতাব লাভ করেছিলেন। মোটকথা, উলূভীরা আবুস সারায়ার পক্ষ থেকে হুকুমতের ভয়ে লাভ করে চতুর্দিকে এক ব্যাপক হাঙ্গামা সৃষ্টি করে দেয়। তাদের এই নিপীড়ন নির্যাতনের নীতি সম্ভবত তাদের ব্যর্থতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

আবুস সারায়ার নিহত হওয়ার সংবাদ মক্কায় এসে পৌঁছলে মক্কাবাসীরা নিজেদের মধ্যে কানাঘুষা শুরু করে দেয়। হুসাইন আকতাস নিজে মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর সাদিকের কাছে উপস্থিত হয়ে বলেন, এটা সুবর্ণ সুযোগ, লোকজন আপনার প্রতি আকৃষ্ট রয়েছে। আবুস সারায়া নিহত হয়েছেন। আপনি এবার নিজের খিলাফতের বায়আত লোকজনের নিকট থেকে গ্রহণ করুন। আমি আপনার হাতে বায়আত হচ্ছি। তারপর আর কেউ আপনার বিরোধিতা করবে না। মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর ওরফে দীবাচা আলম তাতে সম্মত হলেন না। কিন্তু হুসাইন আকতাস এবং মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফরের ছাত্র আলী উভয়ে মিলে পুনঃপুনঃ কথা দেয়ায় শেষ পর্যন্ত মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর বায়আত নিতে উদ্যত হলেন। লোকজন বায়আত গ্রহণ করলো। তিনি আমীরুল মু'মিনীন খেতাবে অভিহিত হলেন। কিন্তু তারপরেই হুসাইন আকতাস এবং মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফরের পুত্র আলী স্বরূপে আবির্ভূত হলেন। তারা ব্যভিচারে এমনিভাবে মগ্ন হলেন যে, মক্কায় কুল নারীদের পক্ষে সতীত্ব রক্ষা মুশকিল হয়ে উঠলো। প্রকাশ্য দিবালোকে তারা নারীদের সম্ভ্রম লুটতে এবং পুরুষদের অবমাননা করতে লাগলো। দুষ্ট লোকদের একটি চক্র তাদের চারপাশে সমবেত হলো আর তারা দিবারাত্রি এই অপকর্মের মধ্যেই ডুবে রইল।

মক্কার কাযী মুহাম্মদের এক কিশোর পুত্র ইসহাক ইব্ন মুহাম্মদ একদিন বাজারের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। 'আমীরুল মু'মিনীন' মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফরের পুত্র আলী তাঁকে পাকড়াও করে তার গৃহের মধ্যে বন্দী করলেন। প্রকাশ্য দিবালোকে সংঘটিত এ অপরাধের দৃশ্য লোকজন প্রত্যক্ষ করলো। তারা একটি সভায় মিলিত হয়ে সর্বসম্মতিক্রমে মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর সাদিককে পদচ্যুত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তারা ঠিক করে যে, যে কোন মূল্যে কাযীর পুত্রকে আলী ইব্ন মুহাম্মদের কবল থেকে উদ্ধার করতে হবে। তারা মহা হৈচৈ বাঁধিয়ে দেয় এবং শোরগোল সহকারে মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর সাদিকের বাড়ি ঘেরাও করে। আমীরুল মু'মিনীন মুহাম্মদ তখন লোকজনের কাছে অভয় প্রার্থনা করেন এবং নিজে আপন পুত্র আলীর ঘরে গিয়ে কাযী পুত্রকে সেখানে দেখতে পান। তিনি তৎক্ষণাৎ তাকে জনতার হাতে ফিরিয়ে দেন। উপরেই বর্ণিত হয়েছে যে, ইবরাহীম ইব্ন মূসা কাযিম ওরফে ইবরাহীম কাসসাব ইয়ামানের আমিল ইসহাক ইব্ন মূসা ইব্ন ঈসাকে তাড়িয়ে দিয়ে ক্ষমতা দখল করেছিলেন।

ইসহাক ইব্‌ন মূসা ইয়ামানেই আত্মগোপন করে সুযোগ ও সময়ের অপেক্ষা করছিলেন। এবার উলুভীদের নির্যাতন-নিপীড়নের রাজত্ব এবং গণমনে বিরাজমান অসন্তোষ লক্ষ্য করে তিনি অনায়াসেই একটি বাহিনী গড়ে তুললেন। ইবরাহীমও ইয়ামান থেকে মক্কায় এসেছিলেন। ইসহাক ইয়ামান থেকে যাত্রা করে মক্কায় এসে হামলা চালালেন। উলুভীরা আশেপাশের বেদুঈনদেরকে সমবেত করে পরিখা খনন করে ইসহাকের মুকাবিলার জন্যে উদ্যত হয়। ইসহাক প্রথমে সারি বিন্যাস করে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিলেন, কিন্তু তারপর কি যেন মনে করে সোজা সেখান থেকে ইরাক অভিমুখে যাত্রা করলেন।

ওদিকে হাসান ইব্‌ন সাহ্‌ল ইরাকের ব্যাপারটি গুছিয়ে নিয়ে হারছামা ইব্‌ন আইউনকে হিজায ও ইয়ামানের গোলমাল দমনের দায়িত্ব প্রদান করলেন। হারছামা রাজ ইব্‌ন জামীল এবং জালুভীকে একটি সৈন্যবাহিনী দিয়ে মক্কা অভিমুখে প্রেরণ করলেন। হারছামা প্রেরিত এ বাহিনী এদিক থেকে যাচ্ছিল আর ওদিক থেকে ইসহাক আসছিলেন। পথিমধ্যে উভয়ের সাক্ষাৎ হলো। ইসহাকও তাঁদের সাথে মক্কার দিকে ফিরে যান। সেখানে পৌঁছে তারা উলুভীদেরকে মুকাবিলার জন্যে প্রস্তুত দেখতে পেলেন। ভীষণ যুদ্ধের পর উলুভীরা পরাজিত হলো। আব্বাসী সৈন্যবাহিনী বিজয়ীর বেশে মক্কায় প্রবেশ করলো।

মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর নিরাপত্তা প্রার্থনা করলেন। তাঁকে নিরাপত্তা দেওয়া হলো। তিনি মক্কা থেকে কূফা এবং কূফা থেকে জাহনিয়া অঞ্চলে চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে তিনি সৈন্য সংগ্রহে মনোনিবেশ করেন। এক বিরাট বাহিনী সংগৃহীত হলো। তিনি মদীনা মুনাওয়ারার ওপর হামলা চালালেন। মদীনার আমিল হারূন ইব্‌ন মুসাইয়িব মুকাবিলায় অবতীর্ণ হলেন। বেশ ক'টি লড়াই হলো। অবশেষে দীবাচা আলম মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর সাদিক শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে জাহিনিয়া অঞ্চলের দিকে ফিরে যান। এ লড়াইয়ে তাঁর একটি চক্ষু নষ্ট হয় এবং তাঁর প্রচুর সঙ্গীসাথী মারা পড়ে। পরবর্তী বছর হজ্জের মওসুমে মক্কার শাসনকার্যে এখনো পর্যন্ত বহাল রাজা ইব্‌ন জামীল এবং জালুভীর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করে মক্কায় আসেন। এ সময় তিনি লোকজনকে সমবেত করে খুতবা দিয়ে বলেন, আমি শুনেছিলাম, মামূনুর রশীদের মৃত্যু হয়েছে। এজন্যে আমি লোকজনের নিকট থেকে খিলাফতের বায়আত গ্রহণ করেছিলাম। এখন আমি জানতে পেরেছি যে, আসলে মামূনুর রশীদের মৃত্যু হয়নি। তাই আমি তোমাদেরকে আমার বায়আতের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিচ্ছি।

হজ্জ আদায়ের পর ২০১ হিজরীতে (৮১৬-১৭ খ্রি.) হাসান ইব্‌ন সাহ্‌লের নিকট তিনি বাগদাদে চলে যান। তিনি তাকে মামূনের দরবারে পাঠিয়ে দেন। মামূন তাঁকে সসম্মানে রাখেন। যখন মামূন মার্ভ থেকে ইরাকের দিকে যাচ্ছিলেন, তখন পথিমধ্যে জুরজান নামক স্থানে তিনি ইনতিকাল করেন।

হারছামা ইব্‌ন আইউনের হত্যাকাণ্ড

ফযল ইব্‌ন সাহ্‌ল হারূনুর রশীদের ওফাতের পর মামূনুর রশীদের মনে সাহস যুগিয়ে যান এবং তিনিই আমীনের মুকাবিলার সমস্ত আয়োজন করেন। মামূন তাঁকে উযীরে আযম এবং তরবারি ও কলমের অধিপতি করেন। ইরানীরা এজন্যে মামূনের প্রতি দুর্বল ছিল যে, মামূনের মা ছিলেন ইরানী বংশোদ্ভূত। মামূন শিক্ষাদীক্ষা পেয়েছিলেন জা'ফরের কাছে এবং তিনি

ইরানীদের এক-চতুর্থাংশ খারাজ মাফ করে দিয়েছিলেন । এজন্যে ফযলের ওজারতি লাভ এবং খলীফার উপর প্রভাব বিস্তারের সকল প্রকার সুবিধাই ছিল । তিনি মামূনকে খুরাসানের কেন্দ্রস্থল মার্ভেই রাজধানী রক্ষার ব্যাপারে সম্মত করে ফেলেছিলেন । এখানে আরবদের তেমন শক্তি ও প্রভাব বিস্তারের সুবিধা ছিল না । মামূনুর রশীদ বাগদাদে স্থানান্তরিত হলে সেখানে ফযলের তেমন প্রভাব চলতো না । সেখানে আরবরা মামূনকে ফযলের হাতে ক্রীতদাসের মতো ছেড়ে রাখতো না । ফযল ইব্‌ন সাহ্‌ল তাঁর ভাই মুহ্‌সিন ইব্‌ন সাহলকে ইরাক, হিজায প্রভৃতি অঞ্চলের শাসনভার অর্পণ করে আরবদের প্রভাব খর্ব করার ব্যবস্থা করেছিলেন । হারছামা এবং তাহির ছিলেন এমন দু'জন জবরদস্ত সিপাহসালার যাঁরা মামূনকে খলীফারূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে অনেক বড় বড় সামরিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন । তাহিরের খ্যাতি যদিও বা হারছামাকে অতিক্রম করে গিয়েছিল, কিন্তু হারছামার জ্যেষ্ঠতা সে ঘাটতিটুকু পূরণ করে দিয়েছিল । সুতরাং খলীফার দরবারে তাঁদের কারো দাবিই কম ছিল না ।

তাহির সম্যক টের পান যে, আমীনকে হত্যার কারণে ভ্রাতৃবৎসল মামূনের মনে তিনি আঘাত দিয়েছেন । এজন্যেই বিজিত এলাকাসমূহের শাসনভার তাঁকে না দিয়ে হাসান ইব্‌ন সাহ্‌লকে মামূনের ইচ্ছানুসারে অনায়াসেই ফযল ইব্‌ন সাহ্‌ল প্রদান করেছেন আর তাঁকেই পশ্চিমাঞ্চলের রাজ্যগুলোর ভাইসরয় নিযুক্ত করতে পেরেছেন । এজন্যে তাহিরের পক্ষে অনারবদের শক্তি খর্ব করার বা মামূনকে মার্ভ থেকে বাগদাদে স্থানান্তরিত করার চেষ্টা করা সম্ভবপর ছিল না । কেবল হারছামা ইব্‌ন আইউনের পক্ষেই মামূনকে আরবদের মনোভাব সম্পর্কে অবহিত করার সাহস দেখানো সম্ভব ছিল । হারছামা একথাও সম্যক জানতেন যে, ফযল ইব্‌ন সাহ্‌লের মাধ্যম ব্যতিরেকে কোন পত্র, দরখাস্ত ও সহায়ক লিপি সরাসরি মামূনুর রশীদের হাতে পৌঁছানোরও কোন উপায় নেই । তিনি একথাও জানতেন যে, ফযল ইব্‌ন সাহ্‌লের মাধ্যম ব্যতীত খলীফার সাথে সাক্ষাতেরও কোন উপায় নেই । অর্থাৎ ফযলের অনুমতি না নিয়ে কেউই খলীফার সাথে দেখা পর্যন্ত করতে পারতো না । এমতাবস্থায়, মামূনুর রশীদের অবস্থা ছিল অনেকটা মুহাম্মদ খানের হাতে ভারতবর্ষে জাহাঙ্গীরের অবস্থা ।

ইসলামের ইতিহাসে উযীরের হাতে এরূপ অসহায় বন্দীর অবস্থা কোন খলীফার জন্যে এটাই ছিল প্রথম । অথচ খলীফা নিজে জানতেন না যে, তিনি তাঁর উযীরের হাতে কতটা অসহায় । আবুস সারায়ার হত্যা এবং মক্কার দিকে সৈন্যবাহিনী প্রেরণের পরই হারছামা জানতে পারলেন যে, মামূনুর রশীদ এখন পর্যন্ত ইরাক ও হিজাযের বিদ্রোহ সম্পর্কে কিছুই অবগত নন । তিনি রাজ্যের অবস্থাদি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত । তাই হারছামা নিজে খলীফাকে রাজ্যের যাবতীয় বিষয়াদি সম্পর্কে অবহিত করার মানসে খুরাসানের দিকে রওয়ানা হলেন । তাঁর ইচ্ছে ছিল, ফযল ইব্‌ন সাহ্‌ল যে খলীফাকে কিভাবে রাজ্যের পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখেছেন সে তথ্যও তিনি তাঁকে অবহিত করবেন । হারছামা হাসান ইব্‌ন সাহ্‌লের নিকট থেকে বিদায় না নিয়েই খুরাসান অভিমুখে রওয়ানা হন । ফযল ইব্‌ন সাহ্‌ল যখন জানতে পারলেন যে, হারছামা খলীফার দরবারে রওয়ানা হয়ে গিয়েছেন, তখন তিনি মামূনুর রশীদের দ্বারা এ আদেশ লিখিয়ে পাঠিয়ে দিলেন যে, তুমি কালবিলম্ব না করে শাম ও হিজাযের দিকে চলে যাও, সেখানে এ মুহূর্তে তোমার খুবই প্রয়োজন । এ মুহূর্তেই আমার কাছে খুরাসানে আসার প্রয়োজন নেই ।

হারছামা যেহেতু প্রকৃত ব্যাপার পূর্ব থেকেই অবগত ছিলেন, তাই তিনি মামূনের নির্দেশের কোনই পরওয়া করলেন না, বরং পূর্ববর্তী বড় বড় খিদমত এবং জ্যেষ্ঠতার অধিকারের ওপর ভরসা করে মার্ভ অভিমুখে তাঁর যাত্রা অব্যাহত রাখলেন। তিনি যখন মার্ভের উপকণ্ঠে উপনীত হলেন, তখন ভাবলেন, ফযল ইব্‌ন সাহ্‌ল আমাকে খলীফার দরবারে পৌঁছতে নাও দিতে পারে। এমনকি খলীফা মামূনুর রশীদ হয়তো ঘুণাক্ষরেও টের পাবেন না যে, আমি এসেছি। তাই তিনি শহরে প্রবেশকালে তাঁর বাহিনীকে কাড়া নাকাড়া বাজাবার নির্দেশ দিলেন—যাতে খলীফা আঁচ করতে পারেন যে, নিশ্চয়ই কোন বড় সেনাপতির আগমন শহরে ঘটেছে। তাই এই বাদ্যের তান শোনা যাচ্ছে।

ওদিকে ফযল যখন জানতে পারলেন যে, হারছামা নির্দেশ পালন করেননি এবং মার্ভ অভিমুখে তাঁর যাত্রা অব্যাহত রেখেছেন আর তিনি তার বিরুদ্ধে খলীফার দরবারে অনুযোগ করার অভিপ্রায় পোষণ করেন তখন মামূনুর রশীদকে বলেন যে, আমি বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পেরেছি যে, আবুস সারায়াকে বিদ্রোহের জন্যে হারছামাই উস্কানি দিয়েছিল। আর যখন হারছামাকে সে বিদ্রোহ দমনের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল তখন সে আবুস সারায়াকে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত হাসান ইব্‌ন আলী তাকে হত্যা করেছিল। এখন তার অভিপ্রায় কি তা একমাত্র আল্লাহই বলতে পারেন। কিন্তু তার ঔদ্ধত্য যে চরমে উঠেছে, তা বলাই বাহুল্য। আপনি তাকে শাম অভিমুখে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন, অথচ সে তাতে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করে দর্পভরে মার্ভ অভিমুখে এগিয়ে আসছে।

যখন হারছামা মার্ভ শহরে প্রবেশ করলেন তার চতুর্দিকে একটা হৈ চৈ শোরগোল পড়ে গেল, মামূনের কানে বাদ্যের আওয়াজ পৌঁছল, তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ কিসের বাদ্যধ্বনি ও শোরগোল? জবাবে ফযল বললেন ঃ হারছামা এসে পৌঁছেছে। সে ঔদ্ধত্যের সঙ্গে বিজয়ীর বেশে রাজধানীতে এসে প্রবেশ করছে। একথায় মামূন অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। শেষ পর্যন্ত হারছামা দরবারে এসে উপনীত হলেন। হারছামা তাঁর মনের কথা প্রকাশ করার পূর্বেই খলীফা গর্জন করে উঠলেন ঃ আগে বল, নির্দেশ কেন অমান্য করেছ ?

হারছামা সে জন্যে ওযরখাহী করতে লাগলেন। কিন্তু মামূনের ক্রোধ তখন এতই চরমে উঠেছিল যে, তিনি তাঁর কোন কথায়ই কর্ণপাত না করে তৎক্ষণাৎ তাঁকে অপমান করে দরবার থেকে বের করে দিলেন। তারপর কারাগারে নিক্ষেপ করলেন। তাঁর কৃতিত্বসমূহের কথা খলীফার কর্ণগোচর হলে সেগুলোই হয়তো তাঁর মুক্তির সুপারিশ স্বরূপ কাজ করতো এবং ক্রোধ প্রশমিত হলে একটু আগে বা পরে তিনি তাঁর বক্তব্যের সারবত্তা অনুভব করতে পারতেন। কিন্তু ফযল ইব্‌ন সাহ্‌ল এ সুযোগকে একটুও হাতছাড়া হতে দিলেন না। সে হারছামাকে কারাভ্যন্তরে হত্যা করিয়ে খলীফাকে সংবাদ দিল যে,কারাগারে হারছামার মৃত্যু হয়েছে। হারছামার এ মৃত্যু সংবাদে মামূনের একটু দুঃখ হলো না। তাঁর যে অবস্থার পরিবর্তনের জন্যে হারছামা এসে অঘোরে প্রাণ দিলেন তাতে বিন্দুমাত্র পরিবর্তনও সাধিত হলো না। মামূন যে তিমিরে ছিলেন, সে তিমিরেই পূর্ববৎ পরে রইলেন। এখন বাহ্যত তাঁর তিমির মুক্তির আর কোন ব্যবস্থাই রইল না। কিন্তু স্বয়ং কুদরতের ইন্তেজাম এমনি ছিল যে, ফযলকে শেষ পর্যন্ত শোচনীয় মৃত্যুরই সম্মুখীন হতে হলো।

বাগদাদে গণ-অসন্তোষ

হারছামা মার্ভের কারাগারে যখন নিহত হন হাসান ইব্ন সাহল তখন বাগদাদের নাহ্রাওয়ানে অবস্থান করছিলেন। বাগদাদে হারছামার হত্যা সংবাদ পৌঁছতেই এখানে এক মহা হুলস্থুল কাণ্ড বেঁধে গেল। জনগণ বলাবলি করতে লাগলো যে, ফযল ইব্ন সাহল খলীফা ও খিলাফতকে তার কুক্ষিগত করে রেখেছে। আর যেহেতু সে পারসিক বংশোদ্ভূত এবং একজন পারসিকের সন্তান, তাই আরবদেরকে তার হাতে অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হবে। এই প্রেক্ষিতে মুহাম্মদ ইব্ন আবূ খালিদ বাগদাদবাসীদেরকে এমর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করলেন যে, আমি হাসান ইব্ন সাহলকে ইরাক থেকে বের করে তবে ছাড়বো। বাগদাদবাসীরা এ ব্যাপারে তাঁর আনুগত্যের শপথ নিল। মুহাম্মদ ইব্ন খালিদ যথারীতি একটি বাহিনী তৈরি করলেন এবং হাসান ইব্ন সাহলের পক্ষ থেকে নিযুক্ত বাগদাদের আমিল আলী ইব্ন হিশামকে বাগদাদ থেকে বের করে দিলেন। হাসান ইব্ন সাহল নাহ্রাওয়ান থেকে বাগদাদ অভিমুখে একাধিক সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করলেন। মুহাম্মদ তাদেরকে একে একে পরাস্ত করে তাড়িয়ে দিলেন। হাসান ইব্ন সাহল ওয়াসিতে পৌঁছেন। সেখানে তাঁর পৌঁছার কিছু দিনের মধ্যেই মুহাম্মদ ইব্ন আবূ খালিদ বাগদাদ থেকে সৈন্যবাহিনী নিয়ে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হন।

হাসান ইব্ন সাহল এ সংবাদ অবগত হয়ে ওয়াসিত থেকে বেরিয়ে পড়লেন। মুহাম্মদ ইব্ন আবূ খালিদ ওয়াসিতে প্রবেশ করে তা অধিকার করে নেন এবং কালবিলম্ব না করে হাসান ইব্ন সাহলের পশ্চাদ্ধাবন করেন। হাসান ইব্ন সাহল পেছনে ফিরে তাঁর মুকাবিলা করেন। ঘটনাচক্রে সংঘর্ষে মুহাম্মদ ইব্ন আবূ খালিদ পরাজয়বরণ করেন। তিনি জরজারায়ায় এসে অবস্থান করেন এবং নিজের অবস্থা শুধরে নিয়ে তারপর পুনরায় হাসান ইব্ন সাহলের মুকাবিলা করেন। তাদের মধ্যে বেশ ক'টি যুদ্ধ হয়। একটি যুদ্ধে মুহাম্মদ ইব্ন আবূ খালিদ মারাত্মক আহত হন। তাঁর পুত্র তাঁকে সাথে নিয়ে বাগদাদে পৌঁছেন। বাগদাদে পৌঁছতেই আহত মুহাম্মদ ইব্ন আবূ খালিদ মৃত্যুবরণ করেন। তারপর বাগদাদবাসীরা মাহ্দী ইব্ন মানসূরের পুত্র মানসূর ইব্ন মাহ্দী আব্বাসীকে খলীফা বানাতে উদ্যত হয়। কিন্তু মানসূর তাতে কোন মতেই স্বীকৃত হন না। শেষ পর্যন্ত লোকে তাঁকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করে এমর্মে রাযী করাতে সক্ষম হয় যে, খলীফা মামূনই থাকবেন এবং খুতবা তাঁরই নামে হবে, কিন্তু নায়েবে সালতানাতরূপে হাসান ইব্ন সাহলের পরিবর্তে মানসূরই বাগদাদের শাসনকার্য পরিচালনা করবেন। সেমতে ২০১ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে (৮১৬ খ্রি) মানসূর ইব্ন মাহ্দী বাগদাদের শাসনভার নিজ হস্তে তুলে নেন। তাঁর সেনাপতি হন ঈসা ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবূ খালিদ।

হাসান ইব্ন সাহ্ল এবার তাঁর অবস্থা শুধরে নিয়ে মানসূর ইব্ন মাহ্দীর মুকাবিলায় সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করলেন। উভয়পক্ষে বেশ ক'টি লড়াই হয়। ওদিকে মার্ভে মামূন এসবের কিছুই না জেনে নিশ্চিন্তে দিন কাটাচ্ছিলেন। কেননা, ফযল ইব্ন সাহল তাঁর কাছে সরাসরি সংবাদ পৌঁছবার সকল পথই রুদ্ধ করে রেখেছিল। মানসূর ইব্ন মাহ্দী এবং হাসান ইব্ন সাহলের সংঘর্ষের সময় বাগদাদের সমাজবিরোধী অপকর্মে নিয়োজিত গুণ্ডা-বদমাশদের স্বাধীনভাবে গুণ্ডামি করার সুযোগ জুটে যায়। লুটপাট, ডাকাতি, রাহাজানি, চুরি, ব্যভিচার,

ধর্ষণ প্রভৃতির হার আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পায়। শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপ অবাধে এবং প্রকাশ্যে সংঘটিত হতে থাকে। এসব অনাচার দুর্নীতি যখন সকল সীমা অতিক্রম করলো এবং বাগদাদে ভদ্র লোকদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠলো, তখন বাগদাদে খালিদ মাদরিউশ এবং সাহল ইব্‌ন সালামা নামক দু' ব্যক্তি তাদের ওয়ায-নসীহতের দ্বারা লোকজনকে সৎপথে ফিরে আসার এবং অসৎ জীবন ত্যাগের জন্যে উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। তাঁদের প্রচেষ্টায় অপরাধ প্রবণতার হার অনেকটা হ্রাস পায়। কিন্তু সাহল ইব্‌ন সালামার পক্ষ থেকে বিদ্রোহের আশংকা করেন মানসূর ইব্‌ন মাহ্‌দী এবং ঈসা ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ খালিদ। শেষ পর্যন্ত মানসূর ও ঈসা উভয়েই হাসান ইব্‌ন সাহলের সাথে এ শর্তে সন্ধি করেন যে, হাসান ইব্‌ন সাহল মামূনের স্বহস্ত স্বাক্ষরিত অভয় পত্র তাদেরকে শুনিয়ে দেবেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে তাঁদের দু'জনকেই বাগদাদের শাসনভার অর্পণ করবেন।

সে মতে হাসান ইব্‌ন সাহল বাগদাদে প্রবেশ করে তাঁর পক্ষ থেকে দু'জনকেই বাগদাদের শাসক নিযুক্ত করে নাহ্‌রাওয়ানে ফিরে যান। এটা ২০১ হিজরীর রমযান (৮১৭ খ্রি-এর এপ্রিল) মাসের ঘটনা। ২০১ হিজরীতে (৮১৬-১৭ খ্রি) মামূনুর রশীদ আলী রিযা ইব্‌ন মূসা কাযিম ইব্‌ন জা'ফর সাদিককে তাঁর উত্তরাধিকারী খলীফা মনোনীত করছিলেন আর বাগদাদে কী ঘটছে সে সম্পর্কে তিনি একেবারেই অনবহিত ছিলেন।

ইমাম আলী রিযার মনোনয়ন লাভ

মামূনুর রশীদ যদিও প্রকৃতপক্ষে ফযল ইব্‌ন সাহলের হাতে বন্দী এবং রাজ্যের অবস্থা সম্পর্কে তিনি কিছুই জানতেন না, ফযল তার ইচ্ছানুযায়ী রাজ্যশাসন করে চলেছিল, কিন্তু তাঁর ঐ বন্দী দশার কথা তিনি ঘুণাক্ষরেও টের পাচ্ছিলেন না। মামূন শুরু থেকেই সৈয়দ বংশ ও আহলে বায়আতদের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন—যা উপরেও বর্ণিত হয়েছে।

মামূন ২০০ হিজরী (৮১৫-১৬ খ্রি) আব্বাসীয় বংশের অধিকাংশ সদস্যকে মার্ভে তাঁর সকাশে তলব করেন এবং মাসের পর মাস ধরে তাঁদেরকে রাজকীয় আতিথ্য প্রদান করেন। কিন্তু একজনও সুযোগ্য উত্তরাধিকারী তাঁর চোখে পড়লো না। অবশেষে ফযল ইব্‌ন সাহল ও অন্যান্য আহলে বায়আত প্রেমিকদের মাধ্যমে তাঁর দৃষ্টি ইমাম আলী রিযা ইব্‌ন মূসা কাযিমের দিকে আকৃষ্ট হলো। প্রকৃত পক্ষে আলী রিযা বনী হাশিম বংশের যোগ্যতম পাত্র ছিলেন। তাই মামূনুর রশীদ নিঃসঙ্কোচে আলী রিযাকে তাঁক কন্যা সম্প্রদান করলেন এবং ২০১ হিজরীর রমযান (৮১৭ খ্রি-এর এপ্রিল) মাসে আলী রিযা ইব্‌ন মূসা কাযিমকে তাঁর উত্তরাধিকারীরূপে মনোনীত করে হারূনুর রশীদের ওসীয়ত অনুসারে পূর্ব নির্ধারিত উত্তরাধিকারী তাঁর ভাই মুতামানকে উত্তরাধিকারী পদ থেকে পদচ্যুত করলেন। অবশ্য মুতামানকে পদচ্যুত করার অধিকার স্বয়ং হারূনুর রশীদই মামূনকে দিয়ে রেখেছিলেন। তাই মুতামানকে পদচ্যুত করার জন্যে মামূনকে দায়ী করা চলে না। এরপর মামূন আব্বাসীদের প্রতীক কৃষ্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করে উলুভীদের প্রতীক সবুজ বস্ত্র ধারণ করতে শুরু করেন। গোটা দরবারের লোকজন এ ব্যাপারে তাঁর অনুসরণ করে।

এরপর মামূন এ মর্মে ফরমান জারি করেন যে, আমলা-অমাত্য এবং সামরিক অফিসারগণ এখন থেকে সবুজ বস্ত্র পরিধান করবেন। আমলাদের নামে এ মর্মেও ফরমান জারি করলেন

যে, তাঁরা যেন আলী রিযা ইব্‌ন মূসা কাযিমের নামে উত্তরাধিকারিত্বে বায়আত গ্রহণ করেন। এ ফরমান যখন ফযল ইব্‌ন সাহলের মাধ্যমে রাজ্যের আমলা-অমাত্যদের কাছে পৌঁছলো তখন কেউ কেউ স্বেচ্ছায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে আবার কেউ কেউ অনিচ্ছায় সে নির্দেশ পালন করলেন। কিন্তু ঐ ফরমান যখন হাসান ইব্‌ন সাহল বাগদাদের ঈসা ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ খালিদ এবং মানসূর ইব্‌ন মাহ্‌দীর কাছে প্রেরণ করলেন, তখন বাগদাদে নতুনভাবে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হলো। লোকজন এ ব্যাপারে নিশ্চিত হলো যে, ফযল ইব্‌ন সাহল খিলাফত আব্বাসীদের হাত থেকে উলুভীদের হাতে হস্তান্তরিত করতে পূর্ণমাত্রায় কৃতকার্য হয়েছেন। আব্বাসীয় এবং তাদের সমর্থকদের পক্ষে এ ছিল একেবারে অসহনীয় ব্যাপার। তাঁদের জানা ছিল যে, এ চেষ্টা সর্বপ্রথম আবূ মুসলিম খুরাসানী করেছিলেন। তারপর বারমাকীরাও এ চেষ্টা করেছিল— যারা ছিল পারসিক বংশোদ্ভূত। কিন্তু তারা এ ব্যাপারে কৃতকার্য হতে পারেনি। এখন আরেকজন পারসিক এ ব্যাপারে সফলকাম হয়ে গেল। কিন্তু আরব আজমের পার্থক্য অনেকটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। আরবরা সাধারণভাবে ফযল ইব্‌ন সাহলকে তাদের প্রতিপক্ষ এবং অনারবদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক মুরব্বীরূপেই জানতো। তাই আরব মাত্রই আলী রিযার উত্তরাধিকারীরূপে মনোনয়ন লাভকে আজমীদের সাফল্য এবং নিজেদের পরাজয় বলে গ্রহণ করলো।

বাগদাদে আরবদের সংখ্যা বেশি ছিল। আব্বাসীয়দের এটা ছিল খাস ঘাঁটি। এখানে এ সংবাদ লোকজনের মধ্যে অস্থিরতা সৃষ্টি করে এবং তাদেরকে তা সলা-পরামর্শ চিন্তা-ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করে তোলে। একদিকে তারা সবেমাত্র বিদ্রোহের পরিণামে কী ভীষণ দুর্গতি নেমে আসে, আর একদিকে তারা সবেমাত্র সে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, অপরদিকে মুসলিম জাহানে অর্থাৎ অন্যান্য প্রদেশ ও রাজ্যে আলী রিযার মনোনয়নের প্রতিক্রিয়া কি হয়েছে তা অবগত হওয়াকেও তারা জরুরী বিবেচনা করছিল। বাগদাদে এ সংবাদ পৌঁছে ২০১ হিজরীর রমযান (৮১৭ খ্রি.-এর এপ্রিল) মাসে। পূর্ণ তিনটি মাস ধরে বাগদাদবাসীরা কোনরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন। এ সময় আব্বাসীদের হাত থেকে খিলাফত উলুভীদের হাতে যেতে পারে না এ ধারণাটি বেশ শক্তি সঞ্চয় করে।

ইবরাহীম ইব্‌ন মাহ্‌দীর খিলাফত

২০১ হিজরীর ২৫শে যিলহজ্জ (৮১৭ খ্রি জুলাই) বনী আব্বাস বংশীয় এবং তাদের সমর্থক শুভানুধ্যায়ীরা ইবরাহীম ইব্‌ন মাহ্‌দীকে খিলাফতের জন্যে নির্বাচিত করে গোপনীয়ভাবে তাঁর হাতে বায়আত হন। এরপর ২০২ হিজরীর ১লা মুহাররম (৮১৭ খ্রি. ২০ জুলাই) নববর্ষের দিন বাগদাদবাসীরা প্রকাশ্যে ইবরাহীম ইব্‌ন মাহ্‌দীর হাতে বায়আত করে তাঁকে খলীফারূপে গ্রহণ করে এবং মামূনকে খলীফা পদ থেকে পদচ্যুত করে। ইবরাহীম খলীফা হয়েই সৈন্যদেরকে ছয় ছয় মাসের বেতন বখশিশ স্বরূপে প্রদানের অঙ্গীকার করেন এবং কূফা ও সাওয়াদ দখল করে মাদায়েনের দিকে অগ্রসর হন। তিনি সৈন্যবাহিনীকে সুসজ্জিত করার দিকে মনোনিবেশ করেন। তিনি বাগদাদের পশ্চিম দিকে আব্বাস ইব্‌ন মূসাকে এবং পূর্ব দিকে ইসহাক ইব্‌ন মূসাকে দায়িত্ব প্রদান করেন।

হুমায়দ ইব্‌ন আবদুল হামীদ হাসান ইব্‌ন সাহলের পক্ষ থেকে কসরে ইব্‌ন হুবায়রায় অবস্থায় করছিলেন। তিনি সেখান থেকে হাসান ইব্‌ন সাহলের কাছে যান। ইবরাহীম কস্‌রে

ইব্ন হুবায়রা দখলের জন্যে মুহাম্মদ ইব্ন আবূ খালিদকে প্রেরণ করেন। ঈসা ইব্ন মুহাম্মদ সে মতে কস্রে ইব্ন হুবায়রা দখল করে হুমায়দের সেনাছাউনিতে লুটপাট চালান। হাসান ইব্ন সাহল আব্বাস ইব্ন মূসা কাযিম অর্থাৎ আলী রিযার ভাইকে গভর্নরীয় সনদসহ কূফার দিকে পাঠিয়ে দেন। আব্বাস ইব্ন মূসা কাযিম কূফায় পৌঁছে ঘোষণা করেন যে, আমার ভাই আলী রিযা মামূনের পর খিলাফতের আসনের অধিকারী হবেন। এজন্যে তোমরা যারা আহলে বায়তের মহব্বতের দাবিদার তোমাদের ইবরাহীম ইব্ন মাহ্দীর খিলাফতকে স্বীকৃতি দেয়া এবং মামূনুর রশীদের বিরোধী কোন পদক্ষেপ গ্রহণ সমীচীন হবে না।

কূফাবাসীরা আব্বাস ইব্ন মূসা কাযিমকে গভর্নররূপে স্বীকার করে নেয়। কেবল শিয়ারা এই বলে তাঁর সাথে সম্পর্কহীনতার কথা ঘোষণা করে যে, আমরা তোমার ভাই ইমাম আলী রিযার সমর্থক, মামূনের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। ইবরাহীম ইব্ন মাহ্দী আব্বাস ইব্ন মূসা কাযিমের মুকাবিলার উদ্দেশ্যে তাঁর দু'জন সিপাহ্সালার সাঈদ এবং আবুল বাতকে দায়িত্ব প্রদান করলেন। আব্বাস তাঁর চাচাতো ভাই আলী ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফরকে তাদের মুকাবিলায় প্রেরণ করলেন। উভয় পক্ষের যুদ্ধে আলী ইব্ন মুহাম্মদ পরাজিত হলেন। সাঈদ হীরায় অবস্থান করে সৈন্যবাহিনীকে কূফার দিকে প্রেরণ করেন। কূফাবাসীরাও আব্বাস মুকাবিলায় অবতীর্ণ হলেন। বেশ ক'টি লড়াইর পর আব্বাস ও কূফাবাসীরা নিরাপত্তা প্রার্থনা করলেন। আব্বাস ইব্ন মূসা কাযিম তাঁর বাসগৃহ থেকে বের হয়ে আসলেন এবং বিজয়ী সৈন্যরা কূফা শহরে প্রবেশ করতে লাগলো। এমনি সময় আব্বাসের সঙ্গী-সাথীদের মধ্যে যুদ্ধের উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। তারা আবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। সাঈদের সৈন্য বাহিনী আবারো আব্বাসের সাথীদেরকে পরাস্ত করলো এবং কূফা দখল করে আব্বাসকে গ্রেফতার করলো।

সংবাদ পেয়ে সাঈদ হীরা থেকে কূফায় আগমন করেন। তদন্তে যখন প্রমাণিত হলো যে, নিরাপত্তা প্রার্থনার পর আব্বাস নিজে তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন নি, তখন তিনি আব্বাসকে মুক্ত করে দেন এবং কূফার কিছু লোককে হত্যা করেন। তিনি কূফায় নিজস্ব আমিল নিযুক্ত করে বাগদাদে ফিরে আসেন। হাসান ইব্ন সাহল হুমায়দ ইব্ন আবদুল হামীদকে কূফা অভিমুখে রওয়ানা করেন। কূফার আমিল তার সাথে মুকাবিলায় প্রবৃত্ত না হয়েই কূফা ছেড়ে পলায়ন করলেন। ইবরাহীম ইব্ন মাহ্দী হাসান ইব্ন সাহলের উপর হামলা করার জন্যে ঈসা ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবূ খালিদকে ওয়াসিত অভিমুখে প্রেরণ করলেন, কেননা হাসান ইব্ন সাহল তখন ওয়াসিতে অবস্থান করছিলেন। হাসান ইব্ন সাহল ঈসা ইব্ন মুহাম্মদকে যুদ্ধে পরাস্ত করে বাগদাদের দিকে তাড়িয়ে দেন। মোটকথা এরূপ হৈ-হল্লা ও হাঙ্গামার মধ্য দিয়ে ২০২ হিজরীর (৮১৭-১৮ খ্রি) অবসান ঘটে এবং ২০৩ হিজরী (৮১৮-১৯ খ্রি) শুরু হয়।

ইবরাহীম তাঁর খিলাফতকে মজবুত ও স্থায়ী করার সম্ভাব্য চেষ্টায় কোনরূপ ত্রুটি করেননি। কিন্তু ২০৩ হিজরীর (৮১৮ খ্রি. জুলাই-আগস্ট) প্রারম্ভের দিকে বাগদাদে এমন এক হাঙ্গামার সূত্রপাত হয়ে যে, তাতে তাঁর রাজত্ব ও খিলাফতসমূহ সঙ্কটের মধ্যে পতিত হয়।

একথার বিশদ বিবরণ হচ্ছে, হুমায়দ ইব্ন আবদুল হামীদ কূফা অধিকার করার পর ইবরাহীম ইব্ন মাহ্দীর সাথে লড়বার উদ্দেশ্যে বাগদাদ অভিমুখে রওয়ানা হয়ে যান। ইবরাহীম ইব্ন মাহ্দীর সিপাহ্সালার ছিলেন ঈসা ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবী খালিদ।

হুমায়দ গোপন বার্তা মারফত ঈসা ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ খালিদকে হাত করে তার সাথে গোপনে আঁতাত করেন। ফলশ্রুতিতে ঈসা ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ খালিদ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন করেন। এ গোপন আঁতাতের কথা অবগত হয়ে ঈসার ভাই হারূন ইব্‌ন মুহাম্মদ তা ইবরাহীম ইব্‌ন মাহ্‌দীকে অবগত করেন। খলীফা ইবরাহীম ইব্‌ন মাহ্‌দী ঈসা ইব্‌ন মুহাম্মদকে দরবারে তলব করে এজন্যে তাকে ভীষণ অপদস্থ করেন এবং কারাগারে নিক্ষেপ করেন। ঈসার বন্দী হওয়ার সংবাদে সৈন্যবাহিনীতে দারুণ অসন্তোষ দেখা দেয়। ঈসার নায়েব আব্বাস সৈন্যবাহিনীর লোকজনকে ইবরাহীম ইব্‌ন মাহ্‌দীর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তাঁর নিজের সমর্থনে নিয়ে ইবরাহীম ইব্‌ন মাহ্‌দীকে পদচ্যুত করার প্রস্তাব দেন। বাগদাদবাসীদের অনেকেই এ প্রস্তাবের সপক্ষে সাড়া দেয়। তারা ইবরাহীমের অনেক কর্মকর্তাকে গ্রেফতার করে। এরপর আব্বাস হুমায়দকে শীঘ্রই বাগদাদে চলে আসতে লিখে পাঠান এবং তিনি তার হাতে বাগদাদ সমর্পণ করবেন বলে জানান। তদনুযায়ী হুমায়দ সসৈন্য বাগদাদে এসে পৌঁছে শহরের একাংশ দখল করে বসেন। অপর অংশ ইবরাহীমের দখলে ছিল। শহরে বেশ ক'টি সংঘর্ষ হয়। অবশেষে হতাশ হয়ে ইবরাহীম ইব্‌ন মাহ্‌দী আত্মগোপন করেন। গোটা শহর হুমায়দ ইব্‌ন আবদুল হামীদ ও আলী উব্‌ন হিশাম প্রমুখ হাসান ইব্‌ন সাহলের সেনাপতিদের দখলে চলে যায়। এভাবে ২০৩ হিজরীর ১৭ই যিলহজ্জ (৮১৯ খ্রি.-এর জুন) ইবরাহীম ইব্‌ন মাহ্‌দীর খিলাফতের অবসান ঘটে।

ফযল ইব্‌ন সাহলের হত্যাকাণ্ড

উপরেই বর্ণিত হয়েছে যে, ফযল ইব্‌ন সাহল তার ইচ্ছেমত যে কোন সংবাদ মামূনকে অবগত করতেন আর যে ঘটনা তাঁর কাছে গোপন রাখতে চাইতেন তা অবলীলাক্রমে গোপন করে ফেলতেন। মামূন তা ঘুণাক্ষরেও টের পেতেন না। ইবরাহীম ইব্‌ন মাহ্‌দী যে বাগদাদে খলীফা হয়ে বসেছিলেন এ সংবাদটিও ফযল ইব্‌ন সাহল মামূনের কাছে গোপন রাখেন। ইরাকের সঠিক সংবাদ মামূনুর রশীদের কর্ণগোচর করার সাধ্য কারো হয়নি। তাহির ইব্‌ন হুসাইনকে ফযল রিক্কায় ওয়ালীরূপে নিযুক্তি দিয়ে রেখেছিলেন। তাহির ছিলেন একজন নামজাদা সেনাপতি। তিনি নিঃসন্দেহে এতটা যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন যে, ইরাকের উপদ্রব দূর করতে তাঁর সাহায্য নেয়া যেতে পারতো। কিন্তু ফযল ইব্‌ন সাহল তাঁকে আরেক হারছামা মনে করতেন। তাই তাঁকে একটি মামুলী ও কম গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক এলাকার শাসনভার অর্পণ করে অনেকটা নিষ্ক্রিয় করে রেখেছিলেন।

ইবরাহীম ইব্‌ন মাহ্‌দী সম্পর্কে ফযল মামূনকে শুধু এতটুকু জানিয়ে রেখেছিলেন যে, বাগদাদবাসীরা তাদের ধর্মীয় ব্যাপারসমূহের তত্ত্বাবধানের স্বার্থে ইবরাহীম ইব্‌ন মাহ্‌দীকে তাদের আমিলরূপে পেলে খুশি হবে বলে জানিয়েছে। এজন্যে ইবরাহীমকে বাগদাদের শাসনভার অর্পণ করা হয়েছে।

এদিকে ইরাকে গণ-অসন্তোষ ও অরাজকতা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। লোকজন ক্রমেই হাসান ইব্‌ন সাহলের প্রতি অধিক মাত্রায় ক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে থাকে। এ সময় কয়েক ব্যক্তি সাহসে ভর করে প্রাণের ঝুঁকি নিযে মার্ভ অভিমুখে যাত্রা করেন এবং সেখানে খিলাফতের

মনোনীত উত্তরাধিকারী আলী রিযা ইব্ন মূসা কাযিমের খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করে যে, একমাত্র আপনি ছাড়া মামূনকে আর কেউই রাজ্যের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করতে পারবে না। আপনি এ গুরুদায়িত্ব পালন করুন।

আলী রিযা যদিও ফযল ইব্ন সাহলকে তাঁর বিরোধিতা করতে কোন দিনই দেখেন নি বরং সর্বদা তাঁকে তাঁর প্রতি সহানুভূতিশীল ও সমর্থকরূপেই পেয়েছেন, কিন্তু এ পবিত্রাত্মা পুরুষ পূর্ণ সাহসিতার সাথে তৎক্ষণাৎ সে দায়িত্ব পালনে অগ্রসর হলেন। তিনি মামূনুর রশীদের ফযল ইব্ন সাহল ও হাসান ইব্ন সাহলের অন্যায় কার্যকলাপ, হারছামার অন্যায় হত্যাকাণ্ড, তাহিরকে নিষ্ক্রিয় রাখা, ইরাকের বিদ্রোহ ও ইবরাহীম ইব্ন মাহ্দীর খিলাফত সম্পর্কে তথ্যাদি বিশদভাবে অবহিত করলেন। সাথে সাথে তিনি তাঁকে বললেন যে, এ সব কারণে গণ-অসন্তোষ ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমন কি আপনার খিলাফতও এখন সঙ্কটাপন্ন হতে চলেছে। ইমাম আলী রিযা অত্যন্ত নিঃস্বার্থভাবে এ তথ্যও তাঁকে অবগত করতে বিরত রইলেন না যে, তাঁকে খিলাফতের উত্তরাধিকারী মনোনীত করায় বনূ আব্বাস এবং তাদের সমর্থকরা খলীফার প্রতি খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছেন।

এসব চাঞ্চল্যকর তথ্য অবগত হয়ে মামূনের রীতিমত টনক নড়লো। তিনি তাঁকে প্রশ্ন করলেন, আপনি ছাড়া আর কেউ কি এসব তথ্য অবগত আছে? জবাবে তিনি বললেন ঃ আপনার অমুক অমুক সেনাপতি এবং অমাত্য এ সম্পর্কে সম্যক অবহিত, কিন্তু ফযল ইব্ন সাহলের ভয়ে তাঁরা তা অতিকষ্টে চেপে আছেন। তাঁরা তা আপনাকে অবহিত করতে রীতিমত ভয় পান। মামূন তখন ঐ সব আমলা-অমাত্যকে একান্তে ডেকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করলে প্রথমে তাঁরা অস্বীকার করেন, কিন্তু যখন মামূন তাঁদেরকে নিশ্চয়তা প্রদান করে বললেন যে, ফযল তোমাদের কোনই অনিষ্ট করতে পারবে না। তোমরা নির্ভয়ে সত্য কথা বল, তখন তাঁরা আলী রিযার বর্ণনাকে অক্ষরে অক্ষরে অনুমোদন করলেন। সব শুনে মামূন মার্ভ থেকে ইরাক অভিমুখে যাত্রা করতে মনস্থ করলেন। সব জেনে ফযল যে সব সর্দার আলী রিযার বর্ণনা অনুমোদন করে মামূনের কাছে বক্তব্য দিয়েছিলেন এবং তাঁকে রাজ্যের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন, তাঁদেরকে নানারূপ ক্লেশ দেয়। কাউকে কারাগারে নিক্ষেপ করে আবার কাউকে প্রকাশ্যে অপদস্থ করে কশাঘাত করে। কিন্তু এখন আর করার কিছু ছিল না, যা হবার তা হয়েই গিয়েছে। মামূন এটুকু বিজ্ঞের পরিচয় দিলেন যে, নিজের পক্ষ থেকে ফযল ইব্ন সাহলকে কোনরূপ ভয়ভীতি প্রদর্শন করলেন না, বা হতাশ হতে দিলেন না বরং তিনি ফযল ইব্ন সাহলের চাচাত ভাই গাস্সান ইব্ন উব্বাদকে খুরাসানের গভর্নর নিযুক্ত করে নিজে খুরাসান থেকে ইরাক অভিমুখে রওয়ানা হলেন। তারা যখন সারাখ্স নামক স্থানে উপনীত হলেন, তখন চারব্যক্তি হাম্মামখানায় প্রবেশ করে ফযল ইব্ন সাহলকে হত্যা করে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়।

মামূন এ মর্মে ঘোষণা দিলেন যে, যে ব্যক্তি ফযলের হত্যাকারীদেরকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসবে, তাকে দশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দেয়া হবে। হত্যাকারীরা গ্রেফতার হয়ে তাঁর দরবারে নীত হলো। মামূন তাদেরকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করলেন এবং তাদের খণ্ডিত শির হাসান ইব্ন সাহলের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

মামূন হাসান ইব্‌ন সাহলকে শোকবাণী সম্বলিত পত্র লিখলেন এবং ফযল ইব্‌ন সাহলের স্থলে তাঁকেই তাঁর উযীররূপে মনোনীত করলেন। তিনি নিজে ফযল ইব্‌ন সাহলের মায়ের কাছে গিয়ে শোক প্রকাশ করলেন এবং বললেন যে, যেরূপ ফযল আপনার সন্তান ছিলেন সেরূপ আমিও আপনারই সন্তান। কয়েকদিন পর হাসান ইব্‌ন সাহলের কন্যা বুরানকে বিবাহ করে তিনি হাসানের মর্যাদা পূর্বের তুলনায় অনেকগুণ বৃদ্ধি করলেন। মোটকথা ফযল ইব্‌ন সাহলের হত্যাকাণ্ড ঠিক তেমনিভাবে সংঘটিত হয়, যেমনটি ইতিপূর্বে জা'ফর বারমাকীর হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মামূনই ফযল ইব্‌ন সাহলকে হত্যা করিয়েছিলেন আর যারা হাম্মামখানায় ঢুকে ফযলকে হত্যা করেছিল তারা মামূনেরই নিয়োজিত লোক ছিল। ফযল নিজেই নিজেকে হত্যাযোগ্য অপরাধী করে তুলেছিলেন। মামূন এ ব্যাপারে তাঁর পিতা হারূনুর রশীদের পদাঙ্কই অনুসরণ করেছেন। তবে ফারাক এতটুকু যে, হারূনুর রশীদ জা'ফরকে হত্যা করেন এবং গোটা বারমাকী খানদানকে কোপানলে নিক্ষেপ করে জা'ফর হত্যার দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেন। পক্ষান্তরে মামূন ফযল ইব্‌ন সাহলকে হত্যা করে তার বংশের লোকজনের প্রতি তাঁর বদান্যতা আরো বৃদ্ধি করে এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন যে, কারো পক্ষে মামূনকে দায়ী করার বা দোষারোপ করার কোন উপায়ই ছিল না। এমন কি স্বয়ং ফযলের ভাই এবং তার পিতামাতাও কোনদিন মামূনের এ দুর্নাম করতে পারেন নি।

ফযল ইব্‌ন সাহল সারাখ্‌স নামক স্থানে ২০৩ হিজরীর শা'বান (৮১৯ খ্রি-এর ফেব্রুয়ারী) মাসে নিহত হন।

ইমাম আলী রিযা ইব্‌ন মূসা কাযিমের ওফাত

খলীফা মামূনুর রশীদ তাঁর কন্যা উম্মে হাবীবাকে ইতিপূর্বেই আলী রিযার কাছে বিবাহ দিয়েছিলেন। এবারকার সফরকালে তিনি তাঁর অপর কন্যা উম্মে ফযলকে আলী রিযার পুত্র মুহাম্মদের সাথে বিয়ে দেন। কিন্তু স্বামীগৃহে কন্যাদানের অনুষ্ঠান কন্যার বয়ঃপ্রাপ্তি পর্যন্ত মুলতবি রাখেন। এ অনুষ্ঠান পরে ২১৫ হিজরীতে (৮৩০-৩১ খ্রি) সম্পন্ন হয়েছিল।

মামূনুর রশীদ ২০২ হিজরীর রজব (৮১৮ খ্রি ফেব্রুয়ারী) মাসে মার্ভ থেকে রওয়ানা হন এবং ২০৪ হিজরীর ১৫ই সফর (৮১৯ খ্রি জুলাই) বাগদাদ গিয়ে উপনীত হন। এ সফরে মামূনের প্রায় দেড় বছর সময় লেগে যায়। পথে প্রত্যেকটি স্থানে তিনি সপ্তাহ দিন এমন কি মাসাধিক-কাল পর্যন্ত অতিবাহিত করে বাগদাদ অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকেন। এ সফরে তিনি রাজ্যের অবস্থাদি সম্পর্কে সম্যক অবহিত হওয়ার সুযোগ লাভ করেন। তাঁর বাগদাদ পর্যন্ত পৌঁছুতে পৌঁছুতে পরিস্থিতি তাঁর সম্পূর্ণ অনুকূলে এসে যায়। এ সফরেই মামূনুর রশীদ আলী রিযার ভাই ইবরাহীম ইব্‌ন মূসা কাযিমকে আমীরুল হজ্জ নিযুক্ত করে পাঠান এবং সাথে সাথে তাঁকে ইয়ামান প্রদেশের গভর্নর হিসেবেও সনদ দান করেন। তূসে পৌঁছে মামূন সেখানে অবস্থান করেন এবং আপন পিতা হারূনুর রশীদের কবরে ফাতিহা পাঠ করেন।

তূসে তিনি মাসাধিক-কাল ধরে অবস্থান করেন। এখানেই খিলাফতের মনোনীত উত্তরাধিকারী ইমাম আলী রিযা আঙুর খাওয়ার ফলে ইন্তিকাল করেন।

মামূন তাঁর ইন্তিকালে অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং খালি মাথায় তাঁর শবযাত্রায় শামিল হন। কেঁদে কেঁদে তিনি বলতে থাকেন, "হে আবুল হাসান! তোমার পর এখন আমি কোথায় যাব? কি করবো?" তিন দিন পর্যন্ত তিনি তাঁর সমাধিতে অবস্থান করেন এবং তখন তাঁর আহার্য ছিল কেবল একটি রুটি এবং সামান্য লবণ। তিনি তাঁর পিতা হারূনুর রশীদের কবর খনন করিয়ে ঐ একই কবরে পিতার সাথে তাঁর লাশও দাফন করেন যাতে আলী রিযার বরকতে তাঁর পিতা হারূনুর রশীদেরও সদগতি হয়। আলী রিযাকে সত্যিই তিনি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে শ্রদ্ধা করতেন।

লোকে বলে যে, স্বয়ং মামূনুর রশীদই আলী রিযাকে আঙুরের সাথে বিষ দিয়ে হত্যা করেছেন। কিন্তু একথা সম্পূর্ণ ভুল বলেই মনে হয়। কেননা আলী রিযাকে উত্তরাধিকারী মনোনয়নের জন্যে মামূনুর রশীদকে কেউই চাপ দেয়নি। তিনি নিজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁকে খিলাফতের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন। স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তিনি তাঁর দু' কন্যার বিবাহ আলী রিযা ও তাঁর পুত্রের সাথে করিয়েছিলেন। অন্য কারো প্রস্তাব বা চাপ ছাড়াই স্বতঃস্ফূর্তভাবে তিনি আলী রিযার ভাইকে ইয়ামানের গভর্নর এবং আমীরুল হজ্জের সম্মানিত পদে অভিষিক্ত করেছিলেন। যাঁকে তিনি বিষপ্রয়োগে হত্যাই করতে চাইবেন তাঁর প্রতি তিনি এত বদান্যতা প্রদর্শন করতে পারেন না। সর্বোপরি, হারূনুর রশীদের কবরে তাঁকে দাফন করাটাই তাঁর প্রতি তাঁর অন্তরের শ্রদ্ধার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এতে কোনরূপ কপটতা বা ভণ্ডামির ব্যাপার নেই। তাঁর মৃত্যুতে মামূনের গভীর শোকাভিভূত হওয়াটাও তার একটি উজ্জ্বল প্রমাণ। একথাও ভুললে চলবে না যে, পরবর্তীকালেও মামূন সর্বদাই উলুভীদের সাথে সদয় আচরণ করেছেন এবং তাঁদেরকে রাষ্ট্রের বড় বড় পদে অভিষিক্ত করেছেন। এতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, উলুভীদের প্রতি তাঁর মনে কোনরূপ বিরূপ ভাব বা ঘৃণা-বিদ্বেষ ছিল না। তিনি সর্বদাই তাঁদের উপকার করার এবং তাঁদের অবস্থা উন্নয়নের প্রতি সচেষ্ট ও তৎপর ছিলেন। সত্যি সত্যি যদি তিনি আলী রিযাকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করতেন, তা হলে পরবর্তীকালে উলুভীদের প্রতি এরূপ সদাচরণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হতো না। তবে এটা খুবই সম্ভব যে, বনূ আব্বাসের কেউ বা তাদের কোন শুভাকাঙ্ক্ষী ইমাম আলী রিযাকে আঙুরের সাথে বিষ দিয়ে দিয়েছিল; কেননা, তারা ইমাম আলী রিযাকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারীরূপে মনোনীত করার দরুন মামূনুর রশীদের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল।

ইমাম আলী রিষা ৫৫ বছর বয়সে ২০৩ হিজরীর সফর (৮১৮ খ্রি-এর আগস্ট) মাসে ইন্তিকাল করেন। ১৪৮ হিজরীতে (৭৬৫-৬৬ খ্রি) মদীনা মুনাওয়ারায় তিনি ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন।

তাহির ইব্ন হুসাইনের সমাদর

তাহির ইব্ন হুসাইন ইব্ন মুসআব ইব্ন যুরায়ক ইব্ন মাহানের অবস্থা আগেই বর্ণিত হয়েছে। যুরায়ক ছিলেন হযরত তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ্র ক্রীতদাস, সেই বিখ্যাত তাল্হা ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ খুযাঈ যিনি তাল্হাতুত তাল্হাত নামে বিখ্যাত ছিলেন। যুরায়কের পুত্র মুসআব বনূ আব্বাসের নকীব সুলায়মান ইব্ন কাছীরের কাতিব এবং পরবর্তীকালে হিরাতের আমীর হয়েছিলেন।

মুসআবের পৌত্র তাহির ইব্‌ন হুসাইন ১৫৯ হিজরীতে (৭৭৫-৭৬ খ্রি) মার্ভ এলাকায় ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। তাহিরকে ফযল ইব্‌ন সাহল রিক্কার শাসনভার অর্পণ করে নসর ইব্‌ন শীছের মুকাবিলা করার নির্দেশ দেন। নসর ইব্‌ন শীছ আলেপ্পো ও তার উত্তরদিকের এলাকা জুড়ে একটি স্বাধীন রাজত্ব গড়ে তুলেছিলেন। তাহির যেহেতু বাগদাদ বিজয় এবং আমীনকে হত্যার মত কৃতিত্বের কোনই আশানুরূপ বিনিময় বা পুরস্কার পাননি এবং ফযল ইব্‌ন সাহল তাঁর কোনরূপ উৎসাহ বর্ধন করতে দেননি এজন্যে তিনি রিক্কায় অবস্থান করে অত্যন্ত মনমরা ও দায়সারা ভাবে নসর ইব্‌ন শীছের মুকাবিলা চালিয়ে যান। কিন্তু তাতে তাঁর কোনরূপ উৎসাহ-উদ্দীপনা বা আগ্রহ দেখা যাচ্ছিল না। নসর ইব্‌ন শীছ নিজে ঘোষণা করেছিলেন যে, আমি কেবল এজন্যে মামূনের আনুগত্য করতে চাই না যে, তিনি আরবদের উপর আজমী তথা অনারবদেরকে প্রাধান্য দিয়ে রেখেছেন। একারণে তাহিরও নসর ইব্‌ন শীছকে অন্তর থেকে ততটা অপছন্দ করতেন না। এবার মামূন সমস্ত ব্যাপার অবগত হওয়ার পর বাগদাদ অভিমুখে রওয়ানা হওয়ার সময় তাহির ইব্‌ন হুসাইনকে লিখলেন তাঁর বাগদাদে পৌঁছার পূর্বেই তিনি যেন নাহ্‌রাওয়ানে এসে তাঁর সাথে সাক্ষাত করেন।

মামূন তূস থেকে রওয়ানা হয়ে জুরজান পৌঁছেন। এখানেও তিনি মাসাধিককাল কাটান। এভাবে এক স্থান থেকে অপর স্থানের দিকে যাত্রা করে তিনি নাহ্‌রাওয়ানে পৌঁছলেন। তাহির ইব্‌ন হুসাইন ও তাঁর ভ্রাতুস্পুত্র ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন তাহিরকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে নাহ্‌রাওয়ানে এসে মামূনের খিদমতে উপস্থিত হন। মামূন যতই বাগদাদের নিকটবর্তী হচ্ছিলেন, ইবরাহীম ইব্‌ন মাহ্‌দীর খিলাফতের পতন ততই ঘনীভূত হচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত মামূনের বাগদাদে উপস্থিতির পূর্বেই ইবরাহীমের খিলাফতের অবসান ঘটে। তিনি আত্মগোপন করে বাগদাদের এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতে থাকেন।

নাহ্‌রাওয়ান থেকে রওয়ানা হয়ে মামূন ২০৪ হিজরীর ১৫ই সফর (৮১৯ খ্রি. আগস্ট) বাগদাদে এসে পৌঁছেন। এখানে তিনি যথারীতি দরবার অনুষ্ঠান করেন এবং তাহিরের পূর্ববর্তী বিজয়সমূহ এবং অবদানসমূহের প্রতি লক্ষ্য করে তাকে উদ্দেশ করে বলেন, তোমার যে কোন বাসনা আমার কাছে প্রকাশ কর, তা পূর্ণ করা হবে। তাহির বললেন, আমীরুল মু'মিনীন! আপনি সবুজ বস্ত্র পরিত্যাগ করে সেই পুরনো আমলের কালবস্ত্র পরিধানের অনুমতি দিন এবং আব্বাসীয়দের সেই পুরনো প্রতীক আপনি নিজেও গ্রহণ করুন! মামূন সত্যি সত্যি তাঁর কথা রাখলেন এবং সবুজবাসের পরিবর্তে আব্বাসী প্রতীক কৃষ্ণবাস ধারণ করলেন। এতে গোটা বাগদাদ নগরীতে আনন্দের বান ছুটলো এবং আব্বাস বংশীয়দের সকল অনন্তোষের অবসান ঘটলো। এটা হচ্ছে ২০৪ হিজরীর ২৩ শে সফরের (৮১৯ খ্রি. আগস্ট) ঘটনা।

সালতানাতের আমলা নিযুক্তি ও উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী

২০৪ হিজরীর সফর (৮১৯ খ্রি. আগস্ট) মাসে বাগদাদে পদার্পণ করেই মামূনুর রশীদ প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার দিকে মনোনিবেশ করলেন। তাহির ইব্‌ন হুসাইনকে তিনি পুলিশ প্রধান এবং বাগদাদের কোতওয়ালপদে অধিষ্ঠিত করলেন। সে যুগে এটা ছিল অনেক বড় একটা পদ। সাথে সাথে তাঁকে জাযিরা ও সাওয়াদের গভর্নরের দায়িত্বও প্রদান করলেন। কূফার

গভর্নরের পদ তিনি তাঁর ভাই আবূ ঈসাকে এবং বসরার শাসনভার অপর ভাই সালিহ্‌র হাতে অর্পণ করলেন। হিজাযের গভর্নর পদ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হুসাইন ইব্‌ন আব্বাস ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবূ তালিবকে এবং মুসেলের শাসনভার সাইয়িদ ইব্‌ন আনাস আযদীকে অর্পণ করেন। তাহির ইব্‌ন হুসাইনের পুত্র আবদুল্লাহ্‌কে রিক্কার গভর্নরের পদ দান করা হলো। জাযিরার শাসনভার ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন মুআযকে এবং আযারবায়জান ও আর্মেনিয়ার শাসনভাব ঈসা ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ খালিদকে অর্পণ করা হয়।

ঐ বছরই মিসরের গভর্নর সিররী ইব্‌ন মুহাম্মদের ইন্তিকাল হলে তদস্থলে তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সিররীকে উক্ত পদে নিযুক্ত করা হয়। ঐ বছরই সিন্ধুর গভর্নর দাঊদ ইব্‌ন ইয়াযীদেরও ইন্তিকাল হয়। তদস্থলে বাশশার ইব্‌ন দাঊদ সিন্ধুর গভর্নর নিযুক্ত হন। এ সময় তাঁর প্রতি বার্ষিক দশ হাজার দিরহাম রাজস্ব প্রদানের শর্ত আরোপ করা হয়। ঐ বছরই হাসান ইব্‌ন সাহলের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে। তাঁর পাগলামি এমনি চরমে পৌঁছে যে, শেষ পর্যন্ত তাঁকে শিকল পরাতে হয়। মামূনুর রশীদ তাঁর স্থলে আহ্‌মদ ইব্‌ন আবূ খালিদ আহ্ওলকে উযীরে আযম নিযুক্ত করেন। পারস্য উপসাগরের উপকূলে জাঠ নামক একটি সম্প্রদায়ের বাস ছিল। সংখ্যায় তারা ছিল প্রায় পনের-বিশ হাজার। ডাকাতি রাহাজানি করে তারা বসরার যাত্রাপথকে সঙ্কটাপন্ন করে তোলে। মামূনুর রশীদ তার জাযিরার আমিল ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন মুআযকে তাদের দমনের নির্দেশ দেন। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে তিনি ব্যর্থ হন।

খুরাসানের গভর্নর তাহির

২০৫ হিজরীতে (৮২০-২১ খ্রি) মামূনুর রশীদ ঈসা ইব্‌ন ইয়াযীদ জালুদীকে জাঠদের দমনের জন্যে নির্দেশ দিলেন। ঐ বছরই একদিন মামূনের এক আনন্দঘন বৈঠকে তাহির ইব্‌ন হুসাইন উপস্থিত হলেন। তাহিরের চেহারার দিকে নজর পড়তেই মামূনের স্মৃতিপটে তাঁর ভাই আমীনের চেহারা ভেসে উঠলো। সাথে সাথে তাঁর চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠলো। আমীনকে গ্রেফতার ও হত্যা করার সময় তাহির যে সব নির্যাতন-নিপীড়ন চালিয়েছিলেন সবই তাঁর মানসপটে ভেসে উঠতে লাগলো। তাহির খলীফার চোখে পানি দেখে তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করেন। জবাবে খলীফা বলেন, এ এমন একটি ব্যাপার যা প্রকাশ করলে অবমাননা হয় আর গোপন রাখলে মানসিক যাতনায় ভুগতে হয়। কিন্তু এ জগতের মানসিক যাতনা থেকে কে-ই বা মুক্ত আছে? আমিও এ যাতনাকেই কবুল করে নিচ্ছি।

তাহির তখন তো কিছু বললেন না। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি মামূনের পার্শ্বচর হুসাইনকে এ ব্যাপারে অনুরোধ জানান যে, যে করেই হোক তিনি যেন তা খলীফার নিকট থেকে জেনে নিয়ে তাঁকে অবহিত করেন। তিনি হুসাইনের কাছে তাঁর কাতিব মুহাম্মদ ইব্‌ন হারূন মারফত এক লক্ষ দিরহাম পাঠিয়ে জানালেন যে, এটা হচ্ছে তাঁর ঐ খিদমতের বিনিময় স্বরূপ। হুসাইন এক দুর্বল মুহূর্তে মামূনকে তাঁর সে দিনের অশ্রুপাতের কারণ কি জিজ্ঞেস করলেন। মামূন এ গোপন কথা ফাঁস না করার প্রতিশ্রুতি নিয়ে বললেন ঃ সেদিন তাহিরের মুখ দেখে আমার চোখে অশ্রু আসার কারণ, আমার মনে হলো. এই তো সেই তাহির যে আমার ভাই আমীনকে নানাভাবে নির্যাতন ও অপদস্থ করে নির্দয়ভাবে হত্যা করেছিল। অথচ আজ সে আমার প্রতি কতই না সম্মান সম্ভ্রম প্রদর্শন করছে।

হুসাইন যখন তাহিরকে এ সংবাদটি অবগত করলেন, তখন তাহির অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। তিনি তাঁর সম্মুখে মৃত্যুর বিভীষিকা দেখতে পাচ্ছিলেন। তিনি তখন নিশ্চিত হন যে, কোন না কোন দিন নিশ্চয়ই মামূন তাঁর অনিষ্ট করবেন। তিনি একথা মনে রেখে উযীরে আযম আহমদ ইব্‌ন আবূ খালিদকে বলেন ঃ বাগদাদে আমি এখন হাঁফিয়ে উঠেছি, এখন আমি বাগদাদ থেকে দূরে থাকতে চাই। আপনি দয়া করে আমাকে অন্য কোন প্রদেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। আমি আপনার এ উপকারটুকুর কথা কোনদিনই ভুলবো না।

মামূন যখন খুরাসান থেকে বাগদাদ অভিমুখে রওয়ানা করেন তখন আল-গাস্‌সান ইব্‌ন উব্বাদকে খুরাসানের গভর্নর নিযুক্ত করে এসেছিলেন। আহমদ ইব্‌ন আবূ খালিদ মামূনের খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করেন যে, গাস্‌সান ইব্‌ন উব্বাদ এবং খুরাসানের চিন্তা আমার রাতের আরামকে হারাম করে দিয়েছে। কেননা সীমান্তের তুর্কীদের সম্পর্কে খবর পেয়েছি যে, তারা নাকি বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করতে যাচ্ছে। যদি তাই হয়, তবে খুরাসান রক্ষা করা গাস্‌সান ইব্‌ন উব্বাদের পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব হবে না। সেখানে কোন যোগ্যতর ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির প্রয়োজন। মামূন বললেন ঃ ব্যাপারটি চিন্তার বৈকি! আচ্ছা তুমিই বলো দেখি কাকে সেখানে পাঠান যায়? আহমদ ইব্‌ন আবূ খালিদ অমনি বলে উঠলেন ঃ তাহির ইব্‌ন হুসাইনের চাইতে যোগ্যতর ব্যক্তি আর কাউকে আমি দেখছি না। মামূন বললেন ঃ তাহির ইব্‌ন হুসাইন নিজেও তো বিদ্রোহ করে বসতে পারে! আহমদ ইব্‌ন আবূ খালিদ বললেন ঃ সে দায়িত্ব আমি নিতে পারি। আমি আপনাকে সে নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, সে কখনো বিদ্রোহী হবে না।

মামূন তৎক্ষণাৎ তাহিরকে দরবারে ডেকে বাগদাদের পূর্ববর্তী সমস্ত প্রদেশগুলোর ভাইসরয় নিযুক্ত করলেন। সিন্ধু, বল্‌খ ও বুখারা পর্যন্ত গোটা খুরাসান রাজ্যের শাসনভার তাঁর হাতে অর্পণ করে মার্ভ অভিমুখে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি বাগদাদের কোতোয়াল ও পুলিশ প্রধানের দায়িত্ব তাহিরেরই পুত্র আবদুল্লাহ্‌র উপর অর্পণ করলেন। বিদায় দেবার সময় মামূন তাহিরকে দশ লক্ষ দিরহাম দান করলেন এবং একটি ক্রীতদাস উপঢৌকনস্বরূপ সাথে দিয়ে বললেন ঃ এ হচ্ছে তোমার পূর্ব অবদানের বিনিময় স্বরূপ। সেই ক্রীতদাসটিকে মামূন বুঝিয়ে দেন যে, তাহিরকে কখনো বিদ্রোহী হয়ে উঠতে দেখতে পেলে তাৎক্ষণিকভাবে ছলেবলে বিষ-প্রয়োগে তাকে হত্যা করতে হবে । তাহির ২০৫ হিজরীর যিলকদ (৮২১ খ্রি মে মাসের মাঝামাঝি) মাসের শেষ তারিখে খুরাসান অভিমুখে রওয়ানা হন।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহিরের গভর্নরী

২০৬ হিজরীতে (৮২১-২২ খ্রি) সংবাদ এলো যে, জাযিরার আমিল ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন মুআয এবং মিসরের গভর্নর সিররী ইব্‌ন মুহাম্মদ হাকাম উভয়েই ইন্তিকাল করেছেন। মৃত্যু সময় ইয়াহ্ইয়া তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ্‌কে জাযিরায় এবং সিররী তাঁর পুত্র উবায়দুল্লাহকে মিসরের গভর্নর পদে বসিয়ে গেছেন। নসর ইব্‌ন শীছ জাযিরা অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছেন আর উবায়দুল্লাহ্ মিসরে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করেছেন। মামূন বাগদাদের পুলিশ প্রধান ও কোতোয়ালের দায়িত্ব আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহিরের পরিবর্তে ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন হুসাইন ইব্‌ন মুসআবকে প্রদান করে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহিরকে জাযিরার শাসক নিযুক্ত করে জাযিরা

অভিমুখে প্রেরণ করলেন। যাত্রাকালে তিনি তাঁকে নির্দেশ দিলেন যে, রিক্কা ও মিসরের মধ্যবর্তী কোন সুবিধাজনক স্থানে অবস্থান করে প্রথমে নসর ইব্ন শীছের মুকাবিলা করবে। সেদিক থেকে নিশ্চিন্ত হওয়ার পর মিসর অভিমুখে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করবে।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন তাহির সসৈন্যে রওয়ানা হলেন। খলীফার নির্দেশ অনুসারে রিক্কা ও মিসরের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করে নসর ইব্ন শীছকে কাবু করার উদ্দেশ্যে চতুর্দিকে সামরিক ডিউটিসমূহকে ছড়িয়ে দিলেন। তাহির ইব্ন হুসাইন খুরাসান থেকে যখন সংবাদ পেলেন যে, খলীফা আবদুল্লাহ্কে জাযিরার গভর্নর করে আশেপাশের প্রদেশসমূহের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেছেন, তখন তিনি আবদুল্লাহ্র নামে একটি বিস্তারিত পত্র লিখে পাঠালেন। সে পত্রটিতে রাজ্য শাসন, চরিত্র মাধুর্য ও রাজনীতির যে চমৎকার নিয়মাবলী তিনি লিখে পাঠান তা নীতিশাস্ত্র ও রাজ্য শাসনের নিয়মাবলীর এক উৎকৃষ্ট বয়ান বলে পরিগণিত হয়ে থাকে।

মামূনুর রশীদ সে পত্রের উঁচুমানের বক্তব্য সম্পর্কে অবহিত হয়ে তার অনেক কপি নকল করিয়ে সমস্ত রাজ্যের আমলা-অমাত্যদের কাছে প্রেরণ করেন। ইমাম ইব্ন খালদুন তাঁর 'মুকাদ্দামায়ে তারীখ' গ্রন্থে এবং ইব্ন আছীর তাঁর 'তারীখে কামিলে' এর মূল্যবান পত্রখানি উদ্ধৃত করেছেন। লোকে এ পত্রখানাকে নীতিশাস্ত্রেরে পাঠ্যভুক্ত করা জরুরী বিবেচনা করেছে। ঐ বছরই মামূনের ভয়ে আত্মগোপনকারী এবং পরে ইবরাহীম ইব্ন মাহ্দীর মুসাহিব যিনি ইবরাহীমের আত্মগোপনের পর নিজেও আত্মগোপন করে বেড়াচ্ছিলেন, মামূনের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হন। মামূন তাঁর অপরাধ ক্ষমা করে দিয়ে তাঁকে প্রাণের নিরাপত্তা দান করেন।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন তাহির ও নসর ইব্ন শীছের মধ্যকার লড়াই বেশ ক'বছর পর্যন্ত স্থায়ী হয়। ফলে মিসরের দিকে অভিযান প্রেরণ সম্ভবপর হয়নি। ঐ বছরই ইয়ামানে আবদুর রহমান ইব্ন আহমদ বিদ্রোহের পতাকা ইত্তোলন করেন। কিন্তু সে বিদ্রোহ ঐ বছর দমন করা হয়। মামূন দীনার ইব্ন আবদুল্লাহ্কে ইয়ামান অভিমুখে প্রেরণ করলে আবদুর রহমান ইব্ন আহমদ দীনারের নিকট নিরাপত্তা প্রার্থনা করে ইয়ামান থেকে বাগদাদ উপস্থিত হওয়ার অভিলাষ ব্যক্ত করেন। ফলে ইয়ামানের রাজত্ব দীনার ইব্ন আবদুল্লাহ্র করতলগত হয়।

খুরাসানের গভর্নর তাহির ইব্ন হুসাইনের ইন্তিকাল

তাহির ইব্ন হুসাইন খুরাসান পৌঁছে অনায়াসেই শাসন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানকার সকল অশান্তি ও উপদ্রব দূরীভূত হয়। প্রকৃত পক্ষে খুরাসানের গভর্নরীর জন্যে তিনি ছিলেন অত্যন্ত যোগ্য পাত্র। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, তাহির মামূনুর রশীদের দিক থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করতেন না। সম্ভবত নিকট থেকে দূরে সরে গিয়ে এক বিশাল এলাকার রাজত্বভার হাতে নিয়ে তিনি নিজের নিরাপত্তার জন্যে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থাই অবলম্বন করেছিলেন যাতে মামূন তাঁকে কাবু করতে না পারেন। তিনি ফযল ইব্ন সাহলের পরিণাম দেখেছিলেন। বারমাকীদের পরিণামের কথা তাঁর অজানা ছিল না। আবূ মুসলিম খুরাসানীর অবস্থাও তাঁর জানা ছিল। তাঁর সম্পর্কে মামূনের অনুভূতির কথাও তিনি মামূনের পার্শ্বচর হুসাইনের মাধ্যমে জেনে নিয়েছিলেন।

মোদ্দাকথা, ২০৭ হিজরীর জুমাদাস সানী মাসে (৮২২ খ্রি সেপ্টেম্বর) জুমআর দিন মার্ভের জামে মসজিদে তাহির খুতবা প্রদান করলেন। সে খুতবায় তাহির খলীফা মামূনুর রশীদের নাম নিলেন না। এমন কি তিনি তাঁর জন্যে দু'আও করলেন না। কেবল মুসলিম জাতির অবস্থার সংশোধনের দু'আ করেই মিম্বর থেকে অবতরণ করলেন।

খুরাসানের পারচানবীস বা খলীফার প্রতিবেদন লিপিবদ্ধকারী কুলছুম ইব্‌ন ছাবিত উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিবেদন লিখে বাগদাদ পাঠিয়ে দিলেন। মামূন সে প্রতিবেদন পাঠ করে তাৎক্ষণিকভাবে উযীরে আযম আহ্‌মদ ইব্‌ন আবূ খালিদকে দরবারে তলব করে এ সংবাদ দিলেন এবং কালবিলম্ব না করে সসৈন্যে খুরাসান অভিমুখে রওয়ানা করে দিলেন। তিনি বললেন, যেহেতু তুমিই তাহিরের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলে, তাই তুমি নিজে গিয়েই খুরাসানকে এ আপদ থেকে রক্ষা কর। তাহিরকে গ্রেফতার করে সাথে নিয়ে আসবে। আহমদ ইব্‌ন আবূ খালিদ খুরাসান সফরের প্রস্তুতিতে লেগে গেলেন। পরদিনই বাগদাদে মামূনুর রশীদের কাছে বার্তাবাহক একটি প্রতিবেদন নিয়ে উপস্থিত হলো যাতে শনিবার দিন তাহিরের মৃত্যু হয়েছে বলে খলীফাকে জানানো হয়েছে।

তাহিরের এ মৃত্যু ছিল একান্তই আকস্মিক। শুক্রবারেই তাঁর জ্বর হয়। শনিবার দিন যখন অনেক বেলা হওয়া সত্ত্বেও তিনি শয়ন কক্ষ থেকে বের হলেন না, তখন লোকে প্রবেশ করে শয়ন কক্ষে তাঁকে চাদর মুড়ি দেয়া অবস্থায় মৃত দেখতে পায়। সম্ভবত মামূনুর রশীদের বিদায় কালে দেয়া সেই ক্রীতদাসটিই তাহিরের পরিবর্তিত মতিগতি লক্ষ্য করে তাঁকে বিষ দিয়ে দিয়েছিলে।

মামূনুর রশীদ তাহিরের মৃত্যু সংবাদ শুনে বললেন ঃ

الحمد لله الذی قدما واخرنا

অর্থাৎ সেই আল্লাহ্‌র প্রশংসা যিনি তাহিরকে আমার আগেই মৃত্যুদান করলেন। এরপর তিনি তাহিরের পুত্র তালহাকে খুরাসানের গভর্নররূপে সনদদান করলেন এবং আহমদ ইব্‌ন আবূ খালিদকে এজন্যে খুরাসানে রওয়ানা করলেন যে তিনি যেন তালহা ইব্‌ন তাহিরকে উত্তমরূপে খুরাসানের চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে আসেন এবং বিদ্রোহের কোনরূপ সুযোগ অবশিষ্ট না থাকে।

মামূনের এ অভ্যাসটি উল্লেখের দাবি রাখে যে, কোন বিদ্রোহী ব্যক্তির অপকর্মসমূহ লক্ষ্য করে তিনি তাকে শাস্তি দিতেন, হত্যা করাতেও কুণ্ঠিত হতেন না, কিন্তু ঐ অপরাধীর পরিবার-পরিজন ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের তিনি কোনরূপ ক্ষতি করতেন না বরং পূর্বের তুলনায় তাদের প্রতি আরো বদান্যতা প্রদর্শন করে তাদেরকে আরো আপন করে নিতেন।

আহমদ ইব্‌ন আবূ খালিদ খুরাসান গিয়ে মাওরাউন নাহ্‌র এলাকায় পৌঁছে সেখানকার বিদ্রোহীদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দান করেন। তিনি যখন খবর পেলেন যে, তাহিরের ভাই হুসাইন ইব্‌ন হুসাইন ইব্‌ন মুসআব কিরমানে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করেছেন তখন তিনি কিরমানে পৌঁছে তাকে গ্রেফতার করেন এবং মামূনের খিদমতে এনে উপস্থিত করেন। মামূন হুসাইন ইব্‌ন হুসাইনের অপরাধ ক্ষমা করে দেন। আহমদ ইব্‌ন আবূ খালিদ যখন খুরাসান

থেকে রাজধানী বাগদাদ প্রত্যাবর্তন করছিলেন, তখন তালহা ইব্ন তাহির ত্রিশ লাখ দিরহাম নগদ এবং এক লাখ দিরহাম মূল্যের দ্রব্যসামগ্রী উপঢৌকনস্বরূপ আহমদ ইব্ন আবূ খালিদের হাতে তুলে দেন। তিনি তাঁর কাতিবকে পাঁচ লাখ দিরহাম দান করেন।

ঐ বছরই মামূনুর রশীদ ঈসা ইব্ন ইয়াযীদ জালুদীকে পদচ্যুত করে দাঊদ ইব্ন মনজুরকে জাঠ দমন অভিযানে প্রেরণ করেন এবং বসরা, দজলা, ইয়ামামা ও বাহরায়ন এলাকার শাসনভার তাঁকে অর্পণ করেন। ঐ বছরই মুহাম্মদ ইব্ন হিফযকে তাবারিস্তান প্রভৃতি এলাকার শাসনভার অর্পণ করা হয়। ঐ বছরই বনূ শায়বান গোত্র বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করে। মামূনুর রশীদ সাইয়িদ ইব্ন আনাসকে তাকে দমনের দায়িত্ব প্রদান করেন। ওয়াকারা নামক স্থানে বনূ শায়বানের সাথে লড়াই হয়। তাদেরকে ভাল মত শায়েস্তা করে লণ্ডভণ্ড করে দেয়া হয়।

ঐ বছরই মামূনুর রশীদ মুহাম্মাদ ইব্ন জা'ফর আমেরীকে নসর ইব্ন শীছের কাছে দূতরূপে প্রেরণ করে তাকে আনুগত্য স্বীকারের আহ্বান জানান। আবদুল্লাহ্ ইব্ন তাহির একে উপর্যুপরি লড়াইয়ে কোণঠাসা করে ফেলেছিলেন। দূত মারফত প্রস্তাব পেয়ে নসর ইব্ন শীছ বললেন, আমি মামূনুর রশীদের সাথে সন্ধির জন্যে প্রস্তুত আছি। তবে একটি শর্তে, আমি তাঁর দরবারে উপস্থিত হবো না। মামূনের কাছে ফিরে এসে মুহাম্মাদ ইব্ন জা'ফর নসরের এ শর্তের কথা তাঁকে জানালে তিনি কসম খেয়ে বসলেন যে, যে পর্যন্ত নসরকে আমার দরবারে উপস্থিত হতে বাধ্য করতে না পারবো, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবো না। নসর তাঁর সঙ্গী-সাথীদেরকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ যে মামূনুর রশীদের জাঠ সম্প্রদায়ের ব্যাঙদেরকে এ পর্যন্ত দমাতে পারলেন না তিনিই কিনা শায়েস্তা করবেন আমাদের মত আরবদেরকে। বলাবাহুল্য, নসর ইব্ন শীছের সঙ্গী-সাথীদের সকলেই ছিল আরব। তারা পূর্বের তুলনায় অধিকতর প্রস্তুতিসহ যুদ্ধের জন্য তৈরি হতে লাগলেন।

আফ্রিকার বিদ্রোহ

আফ্রিকা অর্থাৎ সেট প্রদেশ যাতে তিউনিস ও কায়রোয়ানের মত বড় বড় কেন্দ্রীয় স্থান ছিল এবং যা মিসর ও মরক্কোর মধ্যে অবস্থিত ছিল— হারূনুর রশীদের আমলে ইবরাহীম ইব্ন আগলাবকে ১৮৪ হিজরীতে (৮০০ খ্রি) চল্লিশ হাজার দীনার বার্ষিক খারাজ ধার্য করে ঠিকাদারী স্বরূপ দেয়া হয়েছিল। ইবরাহীম অত্যন্ত সুচারুভাবে আফ্রিকার শাসনকার্য পরিচালনা করেন। এখন মামূনুর রশীদের আমলে আফ্রিকার শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রয়েছেন ইবরাহীমেরই পুত্র যিয়াদতুল্লাহ্ ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন আগলাব। ২০৮ হিজরীতে (৮২৩-২৪ খ্রি) তিউনিসে বিদ্রোহ দেখা দিল। মানসূর ইব্ন নুসায়র ছিলেন এ বিদ্রোহের নায়ক। মানসূর ইব্ন নুসায়র আফ্রিকার অধিকাংশ এলাকা দখল করে রাজধানী কায়রোয়ানে যিয়াদতুল্লাহকে অবরোধ করে বসলেন। যিয়াদতুল্লাহ্ মানসূরকে পরাজিত করে তাড়িয়ে দেন। কিন্তু মানসূর ইব্ন নুসায়র সৈন্য সংগ্রহ করে পুনরায় মুকাবিলায় অবতীর্ণ হন। দু'জনের শক্তিপরীক্ষার এ মহড়া ২০৮ হিজরী (৮২৩-২৪ খ্রি) থেকে ২১১ হিজরী (৮২৬-২৭ খ্রি) পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। অবশেষে ২১১ হিজরীতে (৮২৬-২৭ খ্রি) মানসূর ইব্ন নুসায়র তাঁর এক সহচরের হাতে নিহত হন। যিয়াদতুল্লাহ তখন শান্তিপূর্ণভাবে আফ্রিকা শাসনে মনোনিবেশ করেন।

নসর ইব্ন শীছের বিদ্রোহের অবসান

নসর ইব্ন শীছ সম্পর্কে উপরেই বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি ছিলেন হারূনুর রশীদের পুত্র আমীনের অন্তরঙ্গ বন্ধু। আমীন হত্যার সংবাদ পেয়ে এবং আরবদেরকে মামূনের নতুন প্রশাসনের অধীনে দুর্বল এবং আজমীদেরকে প্রবল দেখে বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। উলুভীদের প্রতি তাঁর কোনরূপ সহানুভূতি ও সহমর্মিতা ছিল না। কিন্তু আজমীদের প্রতি তাঁর ঘৃণাবোধ তাঁকে মামূনের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে উদ্বুদ্ধ করে। আবদুল্লাহ্ ইব্ন তাহিরের পূর্বে তাঁর পিতা তাহির ইব্ন হুসাইন দায়সারাভাবে তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যান। দীর্ঘকাল এ মুকাবিলা চলতে থাকে। নসর ইব্ন শীছ উকায়লী দীর্ঘকাল পর্যন্ত তাহিরের মুকাবিলায় যুদ্ধক্ষেত্রে টিকে থাকার ফলে তা একজন কৃতী সেনাপতিরূপে তাঁর সুনাম বৃদ্ধির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। জাযিরা প্রদেশের প্রায় সকল জেলাই তাঁর দখলে এসে গিয়েছিল। তিনি আলেপ্পোর উত্তরে কায়সুম নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। অবশেষে ২০৯ হিজরীতে (৮২৪-২৫ খ্রি) আবদুল্লাহ্ ইব্ন তাহির চতুর্দিক থেকে তাঁকে ঘিরে কায়সুমে অবরুদ্ধ করে ফেলেন। অবরোধের কঠোরতায় বাধ্য হয়ে অবশেষে নসর ইব্ন শীছ বিনা শর্তে অস্ত্র সংবরণ করে আবদুল্লাহ্ ইব্ন তাহিরের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। আবদুল্লাহ ইব্ন তাহির তাঁকে মামূনের কাছে বাগদাদে প্রেরণ করেন। শেষ পর্যন্ত তিনি মামূনের দরবারে নীত হলে মামূন তাঁকে ২১০ হিজরীর সফর (৮২৫ খ্রি-এর জুন) মাসে মদীনাতুল মানসূরে নজরবন্দী করে রাখেন।

ইব্ন আইশার হত্যাকাণ্ড ও ইবরাহীমের গ্রেফতারী

ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল ওয়াহ্হাব ইব্ন ইবরাহীম ইমাম ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আলী ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব ওরফে ইব্ন আইশা বায়আত গ্রহণ করেছিলেন ইবরাহীম ইব্ন মাহ্দীর হাতে। ইবরাহীম ইব্ন মাহ্দী আত্মগোপন করলে ইবরাহীম ইব্ন আইশা আত্মগোপন করেন। তাঁর সাথে ইবরাহীম ইব্ন আগলাব এবং মালিক ইব্ন শাহীনও ছিলেন। সে সময় নসর ইব্ন শীছকে গ্রেফতার করে আবদুল্লাহ্ ইব্ন তাহির বাগদাদে প্রেরণ করেন তখন গোয়েন্দারা মামূনকে এ সংবাদ দেয় যে, যেদিন নসর ইব্ন শীছ বাগদাদে প্রবেশ করবেন ঠিক ঐদিনই ইব্ন আইশা ইবরাহীম এবং মালিক ইব্ন শাহীন বাগদাদে বিদ্রোহের সূচনা করবেন। সেদিন বাগদাদে তুলকালামকাণ্ড ঘটবে। ইতিপূর্বে মামূনের কর্ণগোচর হয়েছিল যে, ইবরাহীম ইব্ন মাহ্দী ইবরাহীম ইব্ন আইশা ইবরাহীম ইব্ন আগলাব এবং মালিক ইব্ন শাহীন বাগদাদে আত্মগোপন করে বাগদাদে তাদের বিদ্রোহী প্রচারণা চালিয়ে তাদের দল ভারী করে চলেছেন।

এ খবর শোনার পরই বাগদাদ পুলিশকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, যে কোন মূল্যে এসব বিদ্রোহী নেতাকে গ্রেফতার করতে হবে। সত্যি সত্যি পুলিশ তৎপর হয়ে ওঠে এবং একমাত্র ইবরাহীম ইব্ন মাহ্দী ছাড়া অপর তিনজন বিদ্রোহী নেতাকে গ্রেফতার করে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। কারাগারের ফটক বন্ধ করা মাত্র তারা কারাপ্রাচীর ভেঙ্গে ফেরারী হওয়ার প্রয়াস পান। সংবাদ পেয়ে মামূন নিজে কারাগারে গিয়ে উপস্থিত হন এবং ইব্ন আইশাকে শূলীবিদ্ধ করে অন্য দু'জনকে হত্যা করেন। শূলে ঝুলানো অবস্থায়ই ইব্ন আইশার প্রাণবায়ু নির্গত হয়। আব্বাসী খিলাফতের তিনি ছিলেন প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত প্রথম আব্বাসী ব্যক্তি। এ হত্যাকাণ্ড

সংঘটিত হয় ২১০ হিজরীর সফর (৮২৫ খ্রি-এর জুন) মাসে। এর কয়েক দিন পরেই ইবরাহীম ইব্‌ন মাহ্‌দী নারীবস্ত্র পরিহিত অবস্থায় পথ অতিক্রমকালে গ্রেফতার হন এবং এরূপ নারীবস্ত্র পরিহিত অবস্থায়ই মামূনের দরবারে নীত হন।

মামূন দরবারে অমাত্যবর্গের কাছে তাঁর ব্যাপারে পরামর্শদানের জন্যেও অনুরোধ করলে সকলেই এক বাক্যে তাঁর হত্যার পক্ষে মত প্রকাশ করলেন। একমাত্র উযীর আযম আহমদ ইব্‌ন আবূ খালিদ তার বিদ্রোহের অপরাধ ক্ষমা করে দেয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করলেন। মামূন ইবরাহীম ইব্‌ন মাহ্‌দীকে ক্ষমা করে দেন এবং এই ক্ষমার তাওফীকদানের জন্যে আল্লাহ্‌র দরবারে শুকরিয়া সিজদা আদায় করেন। ইবরাহীম ইব্‌ন মাহ্‌দী তাঁর এ ক্ষমায় অভিভূত হয়ে মামূনের প্রশংসায় কবিতা শুনালেন। মামূন তাঁর সাথে অত্যন্ত সম্মানজনক আচরণ করেন। ইবরাহীম গ্রেফতার হয়েছিলেন ২১০ হিজরীর রবিউল আউয়াল (৮২৫ খ্রি-এর জুলাই) মাসে।

মিসর ও আলেকজান্দ্রিয়ার বিদ্রোহ

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, মিসরের গভর্নর সিররী ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন হাকাম মৃত্যুর সময় তাঁর পুত্র উবায়দুল্লাহকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে গিয়েছিলেন। উবায়দুল্লাহ্‌ শাসনভার হাতে নিয়েই বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করেন। নসর ইব্‌ন শীছের সাথে যুদ্ধরত থাকার দরুন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন তাহির মিসরের দিকে মনোনিবেশ করতে পারেননি। আর মামূনও তাঁর রাজত্বের অন্যান্য অংশের ব্যস্ততা শেষ করে উঠতে না পারায় নতুন করে কোন বাহিনীকে মিসর অভিমুখে পাঠাতে পারেননি। ঐ সময় মিসর প্রদেশের বিরাট একটা অংশ উবায়দুল্লাহ্‌রও হাতছাড়া হয়ে যায়।

ব্যাপারটি ছিল এই যে, স্পেনের রাজধানী কর্ডোভায় বসবাসকারী ইমাম মালিক ইব্‌ন আনাসের একজন অনুসারী উমাইয়া খলীফা হাকাম ইব্‌ন হিশামের বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলে খলীফা কর্ডোভার পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত তাদের বাসস্থান ধ্বংস করে তাদেরকে দেশছাড়া করেন।

এই দেশান্তরিতদের একদল মরক্কোতে বসবাস শুরু করে। আর অপর দল সমুদ্র পথে মিসরের দিকে রওয়ানা হয়ে আলেকজান্দ্রিয়ায় এসে উঠে। আলেকজান্দ্রিয়ায় উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন সিররীর পক্ষ থেকে একজন আমিল নিযুক্ত ছিলেন। এ নবাগত মালিকীরা সুযোগ পেয়ে এখানেও বিদ্রোহের প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং আলেকজান্দ্রিয়ার আমিলের উপর হামলা চালিয়ে আলেকজান্দ্রিয়া ও তার আশেপাশের এলাকা দখল করে আবূ হাফ্‌স উমর বালুতীকে তাদের আমীররূপে গ্রহণ করে। ঐ সময়ে আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন তাহির নসর ইব্‌ন শীছের সাথে যুদ্ধে রত ছিলেন।

উবায়দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন সিররী ঐ এলাকা আর ঐ নবাগত মালিকীদের হাত থেকে উদ্ধার করতে সমর্থ হননি। আবদুল্লাহ ইব্‌ন তাহির নসরের ব্যাপারটি সামনে নিয়েই মিসরের প্রতি মনোনিবেশ করলেন। উবায়দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন সিররী মুকাবিলায় অবতীর্ণ হন। কিন্তু আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন তাহির তাকে পরাজিত করে অবরুদ্ধ করেন। অবরোধের কঠোরতায় অতিষ্ঠ হয়ে উবায়দুল্লাহ অভয় প্রার্থনা করেন এবং নিজেকে আবদুল্লাহ্‌র হাতে সমর্পণ করেন। এ কাজ সম্পন্ন করে

আবদুল্লাহ্ আলেকজান্দ্রিয়া অভিমুখে রওয়ানা হন। তাঁর মুকাবিলা করার শক্তি নেই দেখে আবূ হাফ্স উমর বালুতী তাঁর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করেছেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন তাহির এ শর্তে তাঁর আবেদনে সম্মতি দেন যে, মিসর ও আলেকজান্দ্রিয়া ছেড়ে ভূমধ্যসাগরের কোন দ্বীপে তাকে চলে যেতে হবে।

তদনুযায়ী উমর তাঁর সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে জাহাজে করে ক্রীটস দ্বীপ অভিমুখে রওয়ানা হয়ে যান। সে দ্বীপে গিয়ে তারা তা দখল করে নেন এবং বাড়িঘর নির্মাণ করে স্থায়িভাবে বসবাস এবং রাজত্ব করতে থাকেন। এটা ২১০ হিজরীর (৮২৫-২৬ খ্রি) ঘটনা। ২১০ হিজরী (৮২৫-২৬ খ্রি) থেকে প্রায় ১৬০ বছর যাবত আবূ হাফ্স উমর বালুতীর বংশধররা ক্রীটস দ্বীপে রাজত্ব করেন। অবশেষে এ বংশের শেষ শাসক আবদুল আযীযের নিকট থেকে সম্রাট কনস্টানটাইনের পুত্র আরমিটাস এ দ্বীপটি দখল করে গ্রীক সাম্রাজ্যভুক্ত করেন।

যুরায়ক ও বাবক খুররমী

যুরায়কের আসল নাম ছিল আলী ইব্ন সাদাকা। তিনি ছিলেন আরব বংশোদ্ভূত। খলীফা মামূনুর রশীদ তাঁকে ২০৯ হিজরীতে (৮২৪-২৫ খ্রি) আর্মেনিয়া ও আযারবায়জানের গভর্নররূপে নিযুক্ত করেন। ২১১ হিজরীতে (৮২৬-২৭ খ্রি) চল্লিশ হাজারের মত সৈন্য সংগ্রহ করে তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা করে বসেন এবং মামূনুর রশীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। মামূনুর রশীদ ইবরাহীম ইব্ন লায়ছ ইব্ন ফযলকে আযারবায়জানের শাসনভার দিয়ে প্রেরণ করেন। পারস্য প্রদেশের উত্তর এবং আযারবায়জানের সীমান্তের নিকট হারূনুর রশীদের আমল থেকেই একটি নতুন ধর্মের ভিত্তি পাকাপোক্ত হচ্ছিল। অর্থাৎ জাভিদান নামক জনৈক অগ্নিউপাসক একটি নতুন ধর্মের উদ্ভাবন করে। সে ধর্মে হত্যা, রক্তপাত ও ব্যভিচার পাপ বলে গণ্য হতো না। এ ধর্ম অনেকটা মুযদাকী ধর্মের মতোই ছিল। জাভিদানের মৃত্যু হলে তারই এক শিষ্য বাবক খুররমী তার স্ত্রীকে হস্তগত করে আপন গুরুর সকল শিষ্যের সর্দারী লাভ করে। বাবক খুররমীর আমলে এরা খুবই শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং এদের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পায়। তাদের ডাকাতি, রাহাজানি ও লুটপাটে ঐ অঞ্চলের প্রদেশসমূহের শান্তি-শৃঙ্খলা দারুণভাবে বিঘ্নিত হয়।

২০১ হিজরীতে (৮১৬-১৭ খ্রি) এরা শাহী ফৌজের মুকাবিলা করতে শুরু করে। আযারবায়জান প্রদেশের গভর্নরকে কয়েকবারই এদের হাতে পরাজয়বরণ করতে হয় এবং তার প্রভাব-প্রতিপত্তি দারুণ বৃদ্ধি পায়। ২০৯ হিজরীতে (৮২৪-২৫ খ্রি) বাবক আযারবায়জানের আমিলকে জীবিত গ্রেফতার করতে সক্ষম হন। এর পরই যুরায়ককে গভর্নর করে পাঠানো হয়।

২১১ হিজরীতে (৮২৬-২৭ খ্রি) যখন যুরায়কও বিদ্রোহী হয়ে ওঠে তখন ঐ এলাকায় একজন শত্রুর স্থলে দুইজন শক্তিশালী শত্রুর উদ্ভব ঘটে। মামূনুর রশীদ মুসেলের শাসনকর্তা সাইয়্যিদ ইব্ন আনাসকে যুরায়ককে দমনের নির্দেশ দেন। সাইয়্যিদ ইব্ন আনাস একটি বিরাট বাহিনী নিয়ে যুরায়কের উপর আক্রমণ চালান, কিন্তু তিনি নিজে এ যুদ্ধে নিহত হন এবং তাঁর বাহিনী পরাজিত হয়ে পালিয়ে আসে। এ সংবাদে মামূন অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং ২১১

হিজরীতে (৮২৬-২৭ খ্রি) মুহাম্মাদ ইব্‌ন হুমায়দ তূসীকে মুসেলের গভর্নর পদে নিযুক্ত করে যুরায়ক ও বাবক উভয়ের উৎখাতের নির্দেশ দেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন হুমায়দ তূসী বাগদাদ থেকে সসৈন্যে রওয়ানা হলেন, কিন্তু ততক্ষণে মুসেল যুরায়কের দখলে চলে গেছে। মুসেলের নিকট উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়। যুরায়ক যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে পালিয়ে যায় এবং মুহাম্মাদ ইব্‌ন হুমায়দ মুসেলে প্রবেশ করেন।

তিনি মুসেলের আরব অধিবাসীদেরকে সৈন্যবাহিনীতে ভর্তি করেন এবং সৈন্যবাহিনীকে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করে যুরায়কের পশ্চাদ্ধাবনে অগ্রসর হন। জাব নদীর তীরে পুনরায় উভয় পক্ষের মধ্যে শক্তি পরীক্ষার সুযোগ উপস্থিত হলো।

এ যুদ্ধেও যুরায়ক পরাস্ত হয় এবং বন্দীত্বের অপমান তাকে সইতে হয়। মুহাম্মাদ ইব্‌ন হুমায়দ অগ্রসর হয়ে যুরায়কের সমস্ত আমিল ও আমলাদেরকে বেদখল করে গোটা আযারবায়জান প্রদেশ দখলে আনেন। এরপর মুহাম্মাদ ইব্‌ন হুমায়দ বাবক খুররমীর প্রতি মনোনিবেশ করলেন। উভয় পক্ষের মধ্যে বেশকটি যুদ্ধ হয়। মুহাম্মাদ ইব্‌ন হুমায়দ খুররমীদেরকে পরাস্ত করে পিছু হটাতে হটাতে পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত অগ্রসর হলেন। খুররমীরা পাহাড়ের উপর উঠে যায়। মুহাম্মাদ ইব্‌ন হুমায়দও তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে পাহাড়ের উপর উঠে যান। খুররমীরা সেখানে তাদের উপর পাল্টা আক্রমণ চালায় এবং মুহাম্মাদ ইব্‌ন হুমায়দের বাহিনী পরাজিত হয়। গোপন অবস্থান থেকে বের হয়ে খুররমীরা নিধনযজ্ঞ চালায়। এ যুদ্ধে মুহাম্মাদ ইব্‌ন হুমায়দ নিহত হন। বাবক খুররমীর সাহস ও মনোবল পূর্বের তুলনায় অনেকগুণ বৃদ্ধি পায়। এটা ২১২ হিজরীর (৮২৭-২৮ খ্রি) ঘটনা।

এ বছরই তাবারিস্তানের শাসনকর্তা মূসা ইব্‌ন হাফ্‌সের মৃত্যু হলে মামূন তদস্থলে তার পুত্রকে তাবারিস্তানের শাসনভার অর্পণ করেন। ঐ বছরই মামূন হাজিব ইব্‌ন সালিহকে সিন্ধুর শাসক নিযুক্ত করে পাঠান। সিন্ধুর পূর্ববর্তী শাসক বাশশার ইব্‌ন দাঊদ চার্জ বুঝিয়ে দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যায়। অবশেষে বাশ্‌শার ইব্‌ন দাঊদ পরাজিত হয়ে কিরমানে পালিয়ে যান।

ঐ বছরই অর্থাৎ ২১২ হিজরীতে (৮২৭-২৮ খ্রি) মামূনুর রশীদ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহিরকে মিসর থেকে ফিরিয়ে এনে বাবক খুররমীকে উৎখাত করার নির্দেশ দেন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহির দাইনুর নামক স্থানে সৈন্য বিন্যাস করে বাবক খুররমীর দিকে অগ্রসর হলেন, এমনি সময় খবর এলো যে, নিশাপুরে খারিজীরা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। কুরাসানের গভর্নর তাল্‌হা ইব্‌ন তাহির ইনতিকাল করায় তারা এ সুযোগ পেয়েছে। মামূনুর রশীদ তাল্‌হার ভাই আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহিরকে খুরাসানের গভর্নর পদে নিয়োগ করে নিয়োগপত্র তাঁর কাছে পাঠিয়ে তাড়াতাড়ি খুরাসানে গিয়ে খারিজী বিদ্রোহ দমনের নির্দেশ দেন। আবদুল্লাহ ইব্‌ন তাহির দাইনুর থেকেই সরাসরি নিশাপুরের দিকে যাত্রা করেন। এভাবে বাবক খুররমী আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহিরের আক্রমণ থেকে বেঁচে যায়। তারপর আর বাবক খুররমীকে দখলের জন্যে খলীফার পক্ষ থেকে কোন সেনাপতি প্রেরিত হননি। মামূনুর রশীদের মৃত্যুর পর এ ফিতনার উচ্ছেদ সাধন করা হয়। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহির খুরাসানে পৌঁছে সেখানকার বিদ্রোহ দমনে সফল হন।

বিবিধ ঘটনা

এ বছরই মামূনুর রশীদের উযীরে আযম আহমদ ইব্‌ন আবূ খালিদ ইন্তিকাল করেন। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও সচ্চরিত্র ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর স্থলে মামূনুর রশীদ আহমদ ইব্‌ন ইউসুফকে উযারতের খিলাত প্রদান করেন। আহমদ ইব্‌ন আবূ খালিদ বনী আমের গোত্রভুক্ত একজন শামী ক্রীতদাস ছিলেন। তিনি একজন উঁচু পর্যায়ের সাহিত্যিক ও লেখক ছিলেন।

আহমদ ইব্‌ন আবূ খালিদ একটি মামুলী দফতরের কেরানী ছিলেন। মামূন যেহেতু ব্যক্তিগতভাবে তাঁর যোগ্যতা ও জ্ঞান-গরিমা সম্পর্কে অবগত ছিলেন তাই সরাসরি তাঁকে উযীরে আযমের পদে নিযুক্তি প্রদান করেন। ২১২ হিজরীতে (৮২৭-২৮ খ্রি) আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ উমরী ওরফে আহমারুল আইন ইয়ামানে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে খলীফা মামূনুর রশীদ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল হামীদ ওরফে আবুর রাযীকে ইয়ামানের দায়িত্ব প্রদান করেন।

২১৩ হিজরীতে (৮২৮-২৯ খ্রি) মামূনুর রশীদ তাঁর পুত্র আব্বাসকে জাযীরাহ ছুগূর ও আওয়াসিমের এবং ভাই আবূ ইসহাক মু'তাসিমকে সিরিয়া ও মিসরের শাসনভার অর্পণ করেন। আবূ ইসহাক মু'তাসিম নিজের পক্ষ থেকে ইব্‌ন উমায়রা বায ঈসাকে মিসরের ওয়ালী নিযুক্ত করে প্রেরণ করেন। কায়সিয়া এবং ইয়ামানিয়ার একটি দল হাঙ্গামা বাধিয়ে ২১৪ হিজরীতে (৮২৯-৩০ খ্রি) ইব্‌ন উমায়রাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। তারা বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করেন, মুতাসিম মিসরে যান এবং তরবারির জোরে বিদ্রোহীদেরকে পরাস্ত করে নিজে মিসরে অবস্থান করতে থাকেন। নিজের পক্ষ থেকে তিনি আমিলদেরকে নিযুক্তি প্রদান করে মিসরে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন।

২১৩ হিজরীতে (৮২৮-২৯ খ্রি) মামূনুর রশীদ গাসসান ইব্‌ন আব্বাসকে সিন্ধুর গভর্নর করে পাঠান। ঐ বছরই ইয়ামানের ওয়ালী আবুর রাযী বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হন। অগত্যা মামূনুর রশীদ যিয়াদ ইব্‌ন আবূ সুফিয়ানের বংশধর মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম রিয়াদীকে ইয়ামানের গভর্নর পদে নিয়োগ করেন। তিনি সেখানে পৌঁছে যুবায়দ শহরের পত্তন করেন, ঐ শহরকেই তাঁর রাজধানীরূপে গ্রহণ করে সেখানে থেকেই তাঁর রাজ্য শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকেন। খলীফাকে তিনি নিয়মিত উপঢৌকনাদি পাঠাতেন এবং খুতবায় তাঁর নাম ব্যবহার করতেন। ২৪৫ হিজরী (৮৫৯-৬০ খ্রি) পর্যন্ত তিনি স্বাধীনভাবে ইয়ামানে রাজত্ব চালিয়ে যান। তাঁর পরেও ৫৩২ হিজরী (১১৩৭ খ্রি) পর্যন্ত তাঁর বংশধর ও ক্রীতদাসদের হাতে ইয়ামানের রাজত্ব অব্যাহত থাকে।

২১৪ হিজরীতে (৮২৯-৩০ খ্রি) খলীফা মামূন আলী ইব্‌ন হিশামকে জবল, কুম, ইস্পাহান ও আযারবায়জানের শাসনভার অর্পণ করেন। ২১৪ হিজরীতে (৮২৯-৩০ খ্রি) আবূ বিলাল সাবী শারী বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। মামূনুর রশীদ তাঁর পুত্র আব্বাসকে কয়েকজন সেনাপতিসহ তাকে দমনের জন্যে প্রেরণ করেন। যুদ্ধে আবূ বিলাল নিহত হন এবং এ বিদ্রোহের অবসান ঘটে।

... রোমক সম্রাট মিখাইলের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র নাওফিল তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। রোমকদের পক্ষ থেকে বৈরিতার লক্ষণ স্পষ্ট হতে থাকলে মামূনুর রশীদ ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন মুসআবকে সাওয়াদ, হুলওয়ান ও দাজলার গভর্নর করে বাগদাদে তাঁর

নায়েবরূপে রেখে নিজে সসৈন্যে রোমকদের উপর আক্রমণ চালান। মুসেল, এন্টিয়ক, মাসীসা ও তারতূস হয়ে তিনি রোমানদের এলাকায় প্রবেশ করেন। কারা দুর্গ দখল করে দুর্গপ্রাচীর ধূলিসাৎ করে দেন। তারপর আশনাসকে সুন্দাস দুর্গ এবং আজীফ ও জা'ফরকে সেনান দুর্গের দিকে সসৈন্যে প্রেরণ করেন। এ দু'টি দুর্গও বিজিত হয়। আব্বাস ইব্ন মামূনুর রশীদ মালিতা শহর জয় করেন।

মিসরে অবস্থানরত মুতাসিম মিসর থেকে প্রত্যাবর্তন করে মামূনের খিদমতে উপস্থিত হন। রোমকরা নিজেদের অক্ষমতার কথা প্রকাশ করে ক্ষমা প্রার্থনা করে। মামূন এবার প্রত্যাবর্তন করে দামিশ্ক অভিমুখে রওয়ানা হন। তিনি পথিমধ্যে থাকতেই রোমকরা নিজেদের শক্তি সংগঠিত করে তারতূস ও মাসীসায় আকস্মিক আক্রমণ চালায়। শহরের অধিবাসীরা রোমকরা সন্ধি করেছে ভেবে একান্তই অসতর্ক ছিল। তারা অত্যন্ত নির্মম হত্যার শিকার হন। এ সংবাদ পেয়েই মামূন তাঁর গতি পরিবর্তন করে সেদিকে ফিরে আসলেন। তাঁর প্রত্যাবর্তনের সংবাদে রোমক রাজ্যসমূহে রীতিমত আতঙ্কের সৃষ্টি হলো। মুসলিম বাহিনী দুর্গের পর দুর্গ ও শহরের পর শহর দখল করে এগিয়ে চললো।

একদিকে মামূন তাঁরা বিজয়যাত্রা অব্যাহত রেখে এগিয়ে চলেছিলেন অপর দিকে মুতাসিম আক্রমণ চালিয়ে ত্রিশটি দুর্গ দখল করে নেন। তৃতীয় দিকে ইয়াহইয়া ইব্ন আকছাম শহরের পর শহর জয় করে এবং রোমকদেরকে গ্রেফতার করতে করতে এগিয়ে চলেছিলেন। অবশেষে রোমান সম্রাট ক্ষমা প্রার্থনা করলে খলীফা মামূন সৈন্যবাহিনীকে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দিয়ে দামেশকে ফিরে যান। এবার তিনি মিসরের দিকে মনোনিবেশ করেন এবং সেখানকার বিদ্রোহীদেরকে শায়েস্তা করে সেখানকার অবস্থা স্বাভাবিক করেন। মিসর থেকে আবার সিরিয়া অভিমুখে ফিরে আসেন। এ আক্রমণ ও যাতায়াতে পুরো একটি বছর অতিক্রান্ত হয়ে যায়।

২১৭ হিজরীতে (৮৩২ খ্রি) রোমানরা আবারও বাড়াবাড়ি শুরু করে। মামূনুর রশীদ আবারও তার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। এবারও রোমানদের সাথে বেশ ক'টি যুদ্ধ হয়। রোমান সম্রাট নাওফিল আবারও অত্যন্ত বিনম্রভাবে সন্ধির দরখাস্ত করেন। এবারও মামূন তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়ে রোমান এলাকা থেকে ফিরে আসেন। ২১৮ হিজরীতে (৮৩৩ খ্রি) আবারও তাঁকে রোমানদের শায়েস্তা করার জন্যে অভিযান চালাতে হয়। সেখান থেকে ফেরার পথে আপন পুত্র আব্বাসকে বিজয়ের স্মৃতিস্বরূপ তাওয়ানা শহর নির্মাণের আদেশ দেন। তিনি এক বর্গমাইল বিস্তৃত দুর্গ নির্মাণ করেন এবং চার ক্রোশ স্থান ঘিরে বেষ্টনী প্রাচীর নির্মাণ করে বিভিন্ন শহরের লোকজনকে সেখানে আবাদ করেন।

ওফাত

রোম সফর থেকে ফেরার পথে বযন্দূন নদীর তীরে একদিন খলীফা মামূনুর রশীদ সদলবলে শিবির স্থাপন করেন। ২১৮ হিজরীর ১৩ই জুমাদাসসানী (৮৩৩ খ্রি-এর জুলাই) সেখানে তিনি জ্বরাক্রান্ত হন এবং ঐ স্থানেই ২১৮ হিজরীর ১৮ই (৮৩৩ খ্রি-এর জুলাই) জুমাদাসসানী ইন্তিকাল করেন। দিনটি ছিল বৃহস্পতিবার। মৃত্যুর পূর্বে আমীর-উমারা, আমলা-অমাত্য এবং উলামা ফুকাহাকে সম্মুখে ডেকে ওসীয়ত করেন এবং নিজের দাফন-কাফনের ব্যাপারে নির্দেশাদি প্রদান করেন। তাঁর মৃত্যুর পর কান্নাকাটি ও বিলাপ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করে দেন। তারপর তাঁর পূর্ব মনোনীত সিংহাসনের উত্তরাধিকারী তাঁর ভাই আবূ

ইসহাক মু'তাসিমকে সম্মুখে ডেকে উপদেশ প্রদান করেন এবং রাজনীতি ও রাজ্যশাসন প্রণালীর দিকে তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করেন। তারপর কুরআনুল করীমের আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করতে লাগলেন। এক সময় বলে উঠলেন ঃ

"হে সেই মহান সত্তা যাঁর রাজত্ব কোন দিনই বিলুপ্ত হবার নয়! তুমি সেই ব্যক্তির প্রতি সদয় হও, যার রাজত্ব অচিরেই বিলুপ্ত হতে যাচ্ছে।"

তারপরই তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। তাঁর ভাই আবূ ইসহাক মু'তাসিম এবং তাঁর পুত্র আব্বাস রিক্কার অন্তর্বর্তী বযন্দূন নদীর তীর থেকে তাঁর শবদেহ তারতূসে নিয়ে আসেন এবং সেখানেই তা দাফন করেন। মামূন মোট ৪৮ বছর বয়স পেয়েছিলেন এবং তাঁর রাজত্বকাল ছিল সাড়ে বিশ বছর।

মামূনের গোটা রাজত্বকাল যুদ্ধবিগ্রহ এবং বিদ্রোহ দমনের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। জাঠ বিদ্রোহীদের দমন এবং বাবক খুররমীকে দমনের অভিযান তাঁর আমলে অসম্পূর্ণই রয়ে যায়। এ দু'টি ফিতনার অবসান তাঁর জীবদ্দশায় হয়নি। প্রকৃতপক্ষে তাঁর রাজত্বকাল সত্যিকারভাবে শুরু হতে না হতেই মৃত্যুর হিমশীতল স্পর্শ তাঁকে গ্রাস করে। তাঁর অন্তিম জীবনে তিনি তাঁর শৌর্যবীর্য এবং সমরনায়করূপে কৃতিত্বের পরিচয় রেখেছেন। রোমকদের বিরুদ্ধে তিনি লাগাতার কয়েক বছর জিহাদে লিপ্ত থাকেন। এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, জিহাদরত অবস্থায় রণক্ষেত্রেই তিনি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছেন।

বিভিন্ন প্রদেশ ও রাজ্যের স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসন

যতদিন উমাইয়া খলীফাদের রাজত্ব ছিল, ততদিন দামেশ্ক ছিল বিশ্ব মুসলিমের একক কেন্দ্র ও রাজধানী। যখন বনূ আব্বাস তাদের স্থলাভিষিক্ত হলো তখন প্রথম আব্বাসী খলীফা আবদুল্লাহ্ সাফ্ফাহ ১৩২ হিজরীতে (৭৪৯-৫০ খ্রি) বনী উমাইয়ার খলীফাদের স্থলাভিষিক্তরূপে গোটা মুসলিম বিশ্বের শাসনকর্তা হন। কিন্তু মাত্র ছ'বছর পরই ১৩৮ হিজরীতে (৭৫৫-৫৬ খ্রি) স্পেন দেশ বনী আব্বাসের খিলাফত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক স্বতন্ত্র উমাইয়া খিলাফতের সূচনা হয়। ১৭২ হিজরী (৭৮৮-৮৯ খ্রি) সনে মরক্কোতে আরেকটি স্বতন্ত্র রাজত্ব ইদ্রিসিয়া সালতানাত নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবে মরক্কোও চিরতরে আব্বাসীদের রাজত্ব সীমানা থেকে বেরিয়ে যায়। এর কিছুকাল পর ১৮৪ হিজরীতে (৮০০ খ্রি) তিউনিস ও আলজিরিয়া এলাকা যাকে আফ্রিকা প্রদেশ বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে– নামেমাত্র আব্বাসীদের অধীনে রয়ে যায়। কেননা সেখানে ইবরাহীম ইব্ন আগলাবের স্বায়ত্তশাসিত রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত ঐ বংশের দ্বারা শাসিত হয়। ২০৫ হিজরীতে (৮২০-২১ খ্রি) মামূনুর রশীদ তাহির ইব্ন হুসাইনকে খুরাসানের গভর্নর করে পাঠান। সেই অবধি খুরাসানের রাজ্যশাসন তাহিরীয় বংশের লোকেরাই করতে থাকে। আফ্রিকা যেমন নামেমাত্র আব্বাসীদের অধীনে ছিল, তেমনি খুরাসানের তাহিরিয়া রাজ্যও নামেমাত্রই আব্বাসীয় শাসনাধীনে ছিল। অর্থাৎ সেখান থেকে খারাজ বা রাজস্ব আসা এবং খুতবায় আব্বাসীয় খলীফার নাম ব্যবহার ছাড়া আর সকল ব্যাপারেই তাহিরীয়রা পূর্ণ স্বাধীন ছিল।

২১৩ হিজরীতে (৮২৮-২৯ খ্রি) মুহাম্মদ ইব্ন ইবরাহীম যিয়াদীকে ইয়ামানের শাসনভার অর্পণ করা হয়। এরপর এ বংশের হাতেই ইয়ামানের শাসনভার ন্যস্ত থাকে। ইয়ামানও

খুরাসান ও আফ্রিকার মত স্বাধীন হয়ে যায়। মোটকথা ১২৮ হিজরী (৭৪৫-৪৬ খ্রি) থেকে ২১৩ হিজরী (৮২৮ খ্রি) পর্যন্ত ৭৫ বছরের মধ্যেই স্পেনের উমাইয়া রাজত্ব, মরক্কোর ইদরীসিয়া রাজত্ব, আফ্রিকার আগলাবিয়া রাজত্ব, খুরাসানের তাহিরিয়া রাজত্ব, ইয়ামানের যিয়াদিয়া রাজত্ব-- এই পাঁচটি স্বাধীন রাষ্ট্র মামূনুর রশীদের আমলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। অথচ এটা ছিল ইতিহাসের এমন একটি অধ্যায়, যখন আব্বাসীয় খিলাফতকে উন্নয়নশীল বলে ধারণা করা হতো।

মামূনুর রশীদের আমলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি

মামূনুর রশীদের শাসনামলের কোন একটি বছরও যুদ্ধবিগ্রহ ও হাঙ্গামা থেকে মুক্ত ছিল না। অহরহ তাঁকে রাজ্যের শাসন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং বিদ্রোহ দমনের চিন্তায় অস্থির থাকতে হতো। এমতাবস্থায় এমন ব্যস্ত-সমস্ত ও চিন্তাক্লিষ্ট খলীফার আমলে তাঁর রাজত্বের দিকে মনোনিবেশ করতে পারবেন এমনটি আশা করা যায় না। কিন্তু এ কথা ভেবে বিস্ময়াভিভূত হতে হয় যে,মামূনুর রশীদের শাসনাধীন আব্বাসীয় যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির যে ফল্গুধারা প্রবাহিত হয়েছিল এবং এ ক্ষেত্রে তিনি যে বিপুল সাফল্যের স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নয়নের ক্ষেত্রে তার নজীর দুর্লভ। এ জন্যে তাঁর অনন্যসাধারণ খ্যাতি ও মাহাত্ম্য আপন মহিমায় ভাস্বর হয়ে আছে। হারূনুর রশীদ বায়তুল হিকমত নামে বাগদাদের একটি অনুবাদ ও পুস্তকাদি রচনা ও সংকলনের কেন্দ্র খুলেছিলেন। তাতে নানা দেশের নানাভাষী ও নানা ধর্মের অনুসারী পণ্ডিতগণ কর্মরত থাকতেন।

এরিস্টটলের পুস্তকাদির অনুবাদ করার ইচ্ছে হলে মামূনের রোমান সম্রাটকে এরিস্টটলের লিখিত যাবতীয় পুস্তকাদি সম্ভাব্য উপায়ে সংগ্রহ করে তাঁর দরবারে পাঠিয়ে দিতে নির্দেশ দেন। এ নির্দেশ পালনে রোমান সম্রাটের কিছুটা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল। তিনি এ ব্যাপারে ঈসায়ী পণ্ডিতদের মতামত জানতে চাইলেন। তাঁরা বললেন, দর্শনের পুস্তকাদি আমাদের দেশে তালাবদ্ধ অবস্থায় সংরক্ষিত রয়েছে। এগুলো অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা নিষিদ্ধ রয়েছে। কেননা, এতে ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বিনষ্ট হয়। আপনি নিশ্চিন্তে এগুলো মুসলিম খলীফার দরবারে পাঠিয়ে দিতে পারেন, যাতে এগুলোর প্রসারে মুসলমানদের ধর্মীয় উৎসাহ-উদ্দীপনা ভাটা পড়ে। তাই রোমান সম্রাট পাঁচটি উট বোঝাই করে দর্শনের পুস্তকাদি মামূনুর রশীদের দরবারে প্রেরণ করলেন। মামূনুর রশীদ ইয়াকূব ইব্ন ইসহাক কিন্দীকে সব গ্রন্থ অনুবাদের দায়িত্ব প্রদান করলেন। তারপর তিনি তাঁর রাজ্যে কর্মরত ঈসায়ী পণ্ডিতদেরকে রোম ও গ্রীসের এলাকাসমূহে পাঠিয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুস্তকাদি সেদেশ থেকে খুঁজে খুঁজে সেখান থেকে বাগদাদে আনালেন। কাস্তা ইব্ন লুক নামক জনৈক খ্রিস্টীয় দার্শনিক পণ্ডিত স্বতঃস্ফূর্তভাবে রোম দেশে গিয়ে দর্শনের পুস্তকাদি অনুসন্ধান করে আনলেন। মামূনুর রশীদ এতে প্রীত হয়ে তাকে দারুত-তরজমা বা অনুবাদ কেন্দ্রে চাকরি দান করেন।

অনুরূপভাবে তিনি মজুসী পণ্ডিতদেরকে উচ্চবেতনে চাকরি দিয়ে মজুসীদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুস্তকাদির অনুবাদ করান। ভারতবর্ষের রাজারা মামূনের এ বিদ্যোৎসাহী মনের খবর পেয়ে তাদের দরবারে বড় বড় সংস্কৃত পণ্ডিতদেরকে উপঢৌকন স্বরূপ মামূনের দরবারে পাঠিয়ে তাঁর মনোরঞ্জনের প্রয়াস পান। বায়তুল হিকমতের পণ্ডিতদের এক একজনের বেতন

আড়াই হাজার মুদ্রা পর্যন্ত ধার্য ছিল এবং তাঁদের সংখ্যা শয়ের কোঠা পেরিয়ে গিয়েছিল। এঁদের মধ্যে ইয়াকুব কিন্দী, হুনাইন ইব্‌ন ইসহাক, কাস্তা ইব্‌ন লূক বা'লাবাক্কী, আবূ জা'ফর ইয়াহইয়া ইব্‌ন আদী, জিবরাঈল ইব্‌ন বখতীশূ' প্রমুখ বিখ্যাত ছিলেন। নির্ধারিত বেতনভাতা ছাড়াও পণ্ডিতদেরকে তাঁদের অনূদিত গ্রন্থের ওজনে স্বর্ণ-রৌপ্য উপহার দেয়া হতো। ফিলিস্তীন, মিসর, আলেকজান্দ্রিয়া, সিসিলী, রোম, ইরান ও ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশ থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুস্তকাদি আনিয়ে আরবী ভাষায় অনুবাদ করানো হতো। অনেক অনুবাদক পণ্ডিত এগুলোর সম্পাদনা ও সংশোধনের কার্যে নিয়োজিত থাকেন।

মামূনুর রশীদের শাসনামলে জনৈক বিখ্যাত পণ্ডিত মুহাম্মদ ইব্‌ন মূসা খাওয়ারিযমী মামূনের ফরমায়েশ মত জবর ও মুকাবিলা (বীজগণিত) শাস্ত্রের একটি পুস্তক প্রণয়ন করেন। তিনি এ বিষয়ের এমনি সূত্র মূলনীতি সম্বলিত পুস্তকও রচনা করেন যা আজ পর্যন্ত কোন পরিবর্তন পরিবর্ধন করা সম্ভবপর হয়নি। গ্রীক গ্রন্থাদিতে পৃথিবী গোলাকার বলে উল্লেখ দেখতে পেয়ে মামূনুর রশীদ ভূগোল ও জ্যোতির্বিদ্যার পণ্ডিতদেরকে গোটা পৃথিবীর পরিধি কত জানবার জন্যে একটি বিস্তীর্ণ মাঠে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবার নির্দেশ দেন। এ উদ্দেশ্যে সানজারের সমতল ভূমিকে পরীক্ষা ক্ষেত্ররূপে বেছে নেয়া হলো। একটি স্থানে উত্তর মেরুর উচ্চতার সাথে কোণ ধরে জরিপ যন্ত্রের মাধ্যমে পরিমাপ করতে করতে সোজা উত্তর দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। ৬৯ $\frac{২}{৩}$ মাইল অগ্রসর হওয়ার পর উত্তর মেরুর উচ্চতার কোণে এক ডিগ্রী বৃদ্ধি পায়। এতে বোঝা গেল যে ভূপৃষ্ঠে এক ডিগ্রীর দূরত্ব যখন ৬৯$\frac{২}{৩}$ মাইল, তখন ৩৬০ ডিগ্রী বিশিষ্ট এ পৃথিবীর পরিধি হবে ৬৯ $\frac{২}{৩}$ x ৩৬০ = ২৪,০০০ মাইল। কেননা চতুর্দিকে থেকে কোণগুলোর যোগফল ৩৬০। দ্বিতীয়বার কূফা প্রান্তরে ঐ একটি পরীক্ষা চালিয়ে ঐ একই ফল বেরিয়ে আসে।

খালিদ ইব্‌ন আবদুল মালিক মাররুজী এবং ইয়াহইয়া ইব্‌ন আবূ মানসূর প্রমুখের সাহায্যে শুমাসিয়ার মানমন্দির নির্মাণ সম্পন্ন করা হয় এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের পণ্ডিতদেরকে নক্ষত্রমণ্ডলীর ব্যাখ্যার গবেষণার নির্দেশ মামূন দান করেন। রীতিমত ফরমান জারি করে প্রতিটি শহর এবং প্রতিটি এলাকা থেকে পণ্ডিতমণ্ডলীকে এনে গবেষণা সংসদ প্রতিষ্ঠা এবং বিতর্কসভার আয়োজন করা হতো। সে সব সভা ও সেমিনারে খলীফা মামূন নিজে অংশগ্রহণ করতেন। কবি, সাহিত্যিক, কালাম শাস্ত্রবিদ, চিকিৎসাবিজ্ঞানী তথা জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখার সর্বোচ্চ স্তরের বিজ্ঞ পণ্ডিতদের ও বিশেষজ্ঞদের এমন সমাবেশ বাগদাদে ঘটিয়ে ছিলেন যে, গোটা বিশ্বে তার কোন নজীর পাওয়া যেত না। আরবী সাহিত্য ও ব্যাকরণের যশস্বী পণ্ডিত ও ইমাম আসমাঈ বার্ধক্যের দরুন কূফা ছেড়ে বাগদাদে আসতে পারেননি। তিনি সেখানে বসেই বাগদাদ দরবারের ভাতা লাভ করতেন। ভাষাতাত্ত্বিক জটিল সমস্যাসমূহের সমাধানের উদ্দেশ্যে সেখানেই তাঁর কাছে পাঠানো হতো। ব্যাকরণবিদ ফাররা বাগদাদে আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্র রচনা করে বাগদাদে বসে পুস্তক লিপিবদ্ধ করেন। তাঁর জন্যে রাজপ্রাসাদের একটি কক্ষ খালি করে দেয়া হয়েছিল। সেখানে বড় বড় পণ্ডিতরা শিষ্যরূপে তাঁর নিকট এসে বসতেন এবং রীতিমত পাঠ গ্রহণ করতেন। রচনা সৌকর্য ও লিপিবিদ্যা সম্পর্কে মামূনের যুগেই গ্রন্থাদি প্রণীত হয় এবং এ শাস্ত্রের নীতিমালাও প্রণীত হয়। মোটকথা, মামূনুর রশীদের

মনোযোগ ও বিদ্যোৎসাহিতার ফলশ্রুতিতে মুসলমানদের সম্মুখে গ্রীক, ইরানী, মিসরীয় এবং ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের মিলিত রূপ অবারিত হয়ে ওঠে।

যদিও কুরআন-হাদীসের বর্তমানে মুসলমানদের আর কোন জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রয়োজন ছিল না, তা সত্ত্বেও ঐ সব প্রাচীন দর্শন এবং রকমারি জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিকে মুসলমানদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে সবকিছুকে এমনিভাবে সুবিন্যস্ত ও মার্জিত করে তুলেছিল যেন তারা ঐ সব শাস্ত্র নতুনভাবে আবিষ্কার করলেন। এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ চালিয়ে যাওয়া হয়। ফলে বাহ্যত এ বিজাতীয় ধারার জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শন কুরআনের মুকাবিলায় এসে দাঁড়ায়। ইসলামের সেবকদের সম্মুখে সর্বপ্রথম ঐ সব কুরআন-বিরোধী তত্ত্ব ও তথ্যের ভুলত্রুটি নির্দেশের সুযোগ আসে। এভাবে নানা ধর্ম ও নানা শাস্ত্রের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইসলামের যে বিরাট বিজয় সূচিত হয়, তা মুসলমানদের দিগ্বিজয়ের তুলনায় অনেকগুণ বেশি তাৎপর্যমণ্ডিত ছিল যা উমাইয়া আমলে মুসলমানরা অর্জন করেছিল। আর এই জ্ঞানগত বিজয়সমূহ আব্বাসী খিলাফতকে উমাইয়া খিলাফতের সমকক্ষ করে দেয়। নতুবা দিক বিজয়ের ক্ষেত্রে আব্বাসী খিলাফত উমাইয়া খিলাফতের ধারেও ঘেঁষতে পারে না। বরং বলা যেতে পারে যে, দিক বিজয়ের ক্ষেত্রে আব্বাসীয় খিলাফত চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। কেননা, তারা উমাইয়াদের বিজিত রাজ্যসমূহকে ধরেও রাখতে পারেনি।

একটি অপবাদের জবাব, একটি ভ্রান্তির অপনোদন

ভারতবর্ষের ইতিহাসের অতি অপূর্ণাঙ্গ সার-সংক্ষেপ, যাকে ইতিহাস নামে অভিহিত করাও ভুল, আমাদের সরকারী বিদ্যালয়সমূহে পড়ানো হয়ে থাকে। সম্ভবত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে এ সমস্ত তথাকথিত ইতিহাস পুস্তকের লেখকরা এমন সব ভিত্তিহীন কথা তাঁদের পুস্তকসমূহে লিখেন যা পড়ে ভারতীয় উপমহাদেশের কোমলমতি ছেলেমেয়েরা ভ্রান্ত ধারণার শিকার হয়। এ জাতীয় ভ্রান্ত ধারণারূপী তীরের এক শিকার হচ্ছেন খলীফা মামূনুর রশীদও। প্রায় ৩০/৪০ বছর পূর্বে রাজা শিব প্রসাদ সিতারায়ে হিন্দ লিখিত একটি পুস্তক সরকারী বিদ্যালয়সমূহে পাঠ্য ছিল। তাতে লেখা ছিল যে, রাজপুতানার জনৈক রাজা বাপা রাভিলের বিরুদ্ধে মামূনুর রশীদ ২২ বার আক্রমণ করেন এবং প্রতিবারই বাপা তাকে পরাজিত করে বিতাড়িত করেন। শুনেছি এই নির্জলা মিথ্যা কথাটুকু অন্যান্য পুস্তকেও নাকি উদ্ধৃত করা হয়েছে। সেগুলোও পাঠ্য ছিল, নাকি এখনো আছে। যারা বাল্যকালে পড়েছে যে, বাপা ২২ বার মামূনকে পরাজিত করেছেন, মামূনুর রশীদ আব্বাসীয় সম্পর্কে তাদের মনে কি হীন ধারণা জন্ম নেবে যে, এ কেমন খলীফা যিনি সামান্য এক জমিদারকে পরাজিত করার জন্যে সারা জীবন ও সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেও তা করতে পারলেন না। উপরে মামূনুর রশীদের আমলের অবস্থা বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। খলীফা হওয়ার পূর্বে তাঁর কী ব্যস্ততা ছিল, তাও মোটামুটিভাবে আলোচনা করা হয়েছে। খুরাসান শাসনের দায়িত্ব লাভ করে তিনি সেখানে অবস্থানরত থাকা অবস্থায়ই খলীফা হারূনুর রশীদের ইন্তিকাল হয়। তারপর প্রায় ছয় বছর কাল তিনি মার্ভে অতিবাহিত করেন। মার্ভের বাইরে কোথাও তিনি এক দিনের জন্যেও যাননি। অবশ্য তাঁর সৈন্যবাহিনী কাবুল ও কান্দাহারের বিদ্রোহীদেরকে দমন করেছে আর ঐ দেশে ২০০ হিজরী (৮১৫-১৬ খ্রি) নাগাদ সাধারণভাবে ইসলামের প্রসার ঘটে গেছে।

ঐ সময় তিব্বতের রাজা ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তিনি তাঁর স্বর্ণ-রৌপ্য নির্মিত দেবমূর্তি খলীফা মামূনের কাছে মার্ভে পাঠিয়ে দেন। সিন্ধুদেশ তাঁর রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল। খলীফার দরবারে থেকে আমিল নিযুক্ত হয়ে রীতিমত সেখানে প্রেরিত হতেন এবং রাজত্ব করতেন। কিন্তু মামূন নিজে কোনদিন এদিকে পদার্পণ করেননি। তিনি মার্ভ থেকে রওয়ানা হয়ে বাগদাদ পর্যন্ত সফর করেন। সে সফরের বিশদ বিবরণ ইতিহাস গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু তাতে সিন্ধু বা ভারতবর্ষের দিকে তাঁর কোন সফরের কথা উল্লেখ নেই। বাগদাদে উপনীত হয়ে দীর্ঘকাল ধরে সেখানেই অবস্থান করেন। জীবনের শেষ অধ্যায়ে তিনি বাগদাদ থেকে বের হয়ে রোমের দিকে যাত্রা করেন এবং সে দেশে আক্রমণ পরিচালনা করেন। সিরিয়া ও মিসরেও তিনি গমন করেন।

এ পশ্চিমাঞ্চলীয় দেশসমূহের সফর শেষে প্রত্যাবর্তনকালে তিনি ইন্তিকাল করেন। এ কথাটি কোনমতেই বুদ্ধিগ্রাহ্য হয় না যে, তা হলে সেই সময়টি কখন ছিল, যখন মামূন ভারত আক্রমণ করেছেন বলে লিপিবদ্ধ করা হবে ? হ্যাঁ, এটা হতে পারে যে, সিন্ধুর কোন গভর্নর হয়তো কোন সময় রাজপুতানার জমিদার গোছের সামন্ত রাজাকে দমনের উদ্দেশ্যে কোন সামরিক ইউনিটকে প্রেরণ করে থাকবেন। কিন্তু সে অভিযান এতই মামুলী গোছের ও তাৎপর্যবিহীন যে, কোন ঐতিহাসিকই তার উল্লেখের প্রয়োজনবোধ করেননি। যদি বলা হয় যে, সিন্ধুর আমিলের প্রেরিত বাহিনী যেহেতু রাজা বাপার হাতে পরাস্ত হয়েছিল এ জন্যেই মুসলমান ঐতিহাসিকগণ তা চেপে গিয়েছেন। কিন্তু এরূপ বক্তব্যদাতা তার নীচতা ও হীনম্মন্যতাই প্রকাশ করে। কেননা, তাতে বোঝা যায় যে, তার মতে, ইতিহাস রচনায় এরূপ মিথ্যাচারকে সে বৈধ জ্ঞান করে। নতুবা মুসলমান ঐতিহাসিকরা মামূনের বাহিনীর বিভিন্ন পরাজয়ের এবং তাঁর সেনাপতিদের ব্যর্থতার কথা কোথাও গোপন করেননি।

জাঠদের লুটপাটের কথা বর্ণনা প্রসঙ্গে তাঁরা নসর ইব্ন শীছের মুখে উচ্চারিত সেই তিরস্কার পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন যাতে নসর বলেছিলেন– কয়েকটি জাঠ ব্যাঙের বিরুদ্ধেও তিনি জয়যুক্ত হতে পারলেন না। ঐতিহাসিকগণ যদি মামূনের পক্ষপাতিত্বের জন্যে এতই ব্যস্ত হতেন এবং এভাবে তাঁরা সত্যগোপনের অপরাধ করতে আগ্রহী হতেন তা হলে অনায়াসেই তাঁরা এ প্রসঙ্গটিও এড়িয়ে যেতে পারতেন। কেননা, এর অল্পকাল পরেই রোমানদের হাতে এ সম্প্রদায়টি নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। মোটকথা বাপার বীরত্বের অতিরঞ্জিত বর্ণনা দিতে গিয়ে তারা এই নির্জলা মিথ্যা কাহিনী ফেঁদেছেন, যার আদৌ কোন ভিত্তি নেই। এটা হচ্ছে রাজা বিক্রমাদিত্য সম্পর্কে কোন কোন হিন্দু ঐতিহাসিকের নির্লজ্জ মিথ্যা কাহিনী ফাঁদার মত ব্যাপার– যাতে তাঁরা লিখে যে, উক্ত রাজা ভারত থেকে সুদূর ইটালীর রোমে গিয়ে রোমান সম্রাট জুলিয়াস সীজারকে যুদ্ধে পরাস্ত করেছিলেন। তাঁদের ধারণা মতে, এভাবে গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের আড্ডায় বসে এক জাতীয় চমকদার গল্প বলে কিছুক্ষণের জন্যে হয় তো আত্মতৃপ্তি লাভ করা যায়, কিন্তু একে ইতিহাস চর্চা আদৌ বলা যায় না।

খলীফা মামূনের চরিত্র

খলীফা মামূনুর রশীদ গোটা বনূ আব্বাস বংশের মধ্যে ধৈর্য-স্থৈর্য, বুদ্ধি-শুদ্ধি ও শৌর্যবীর্যে সকলের শীর্ষে ছিলেন। তিনি নিজেই বলতেন ঃ আমীরে মুআবিয়া (রা)-এর আমর ইব্‌নুল আসের এবং আবদুল মালিকের হাজ্জাজের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু আমার জন্য কারো সাহায্যের প্রয়োজন নেই। তাঁর মন-মগজে শিয়া ধ্যান-ধারণার প্রভাব ছিল অত্যধিক। অর্থাৎ তিনি উলুভীদেরকে অত্যধিক শ্রদ্ধারপাত্র এবং খিলাফতের হকদার বলে মনে করতেন। এ কারণেই তিনি আপন ভাই মুতামানকে পদচ্যুত করে আলী রিযাকে খিলাফতের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন এবং তাঁরই সাথে নিজ কন্যার বিবাহ দেন। তাঁর ধারণা ছিল, নিজে খলীফার পদ থেকে সরে গিয়ে তাঁর জীবদ্দশায়ই আলী রিযাকে খলীফারূপে বরণ করবেন। কিন্তু খিলাফতের প্রথম দশক অতিক্রান্ত হওয়ার পর উলুভীদের বিদ্রোহ ও অবাধ্য আচরণে বিরক্ত হয়ে তিনি এ ধারণা পরিত্যাগ করেন। তিনি এরূপ ফরমান জারি করতেও উদ্যত হয়েছিলেন যে, কোন ব্যক্তি যেন হযরত আমীর মুআবিয়ার প্রশংসা বাক্য উচ্চারণ না করে। অন্যথায় তাকে অপরাধী বলে গণ্য করা হবে। কিন্তু পরে জনমত সৃষ্টি করবেন চিন্তা করে সে ফরমান জারি করেননি।

তিনি কুরআন শরীফ তিলাওয়াতে খুবই আগ্রহী ছিলেন। কোন কোন রমযানে দৈনিক এক খতম কুরআন পড়তেন। আলী রিযাকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করলে কোন কোন আব্বাসীয় তাঁকে এই বলে বারণ করেন যে, আপনি খিলাফতকে উলুভীদের হাতে হস্তান্তর করবেন না। জবাবে তিনি বলেন ঃ স্বয়ং হযরত আলী কারামাল্লাহু ওয়াজহাহু তাঁর খিলাফত আমলে আব্বাসীয়দেরকে অধিকাংশ প্রদেশের গভর্নররূপে নিয়োগ করেছিলেন। আমি তারই প্রতিদানে তাঁর বংশধরদের হাতে খিলাফত ও রাজত্ব সমর্পণ করতে চাই।

মামূন দারুল মুনাযিরায় যখন সকল ধর্মমতের লোকদেরকে স্বাধীনভাবে কথা বলার অধিকার প্রদান করলেন এবং একাডেমিক আলোচনা-সমালোচনা স্বাধীনভাবে হতে থাকলে কালাম শাস্ত্রের পণ্ডিতবর্গ এবং মুতাযিলাদের প্রতি তিনি অনেকটা ঝুঁকে পড়েন। এই স্বাধীনতা ও তর্ক-বিতর্কের ফলে খালকে-কুরআনের মত অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে বিতর্ক হয় এবং মামূন নিজে খালকে-কুরআনের পক্ষ অবলম্বন করে যারা এ মতের সমর্থক ছিলেন না তাদের প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করেন। এর ফলে বিরোধী বিশ্বাসের আলিম-উলামারা আরো কঠোরভাবে ঐ আকীদার বিরুদ্ধাচরণে অবতীর্ণ হন। এ বিরোধিতার ও রেষারেষির ফলে মামূনের পরবর্তী আমলে আলিম সমাজকে এ তুচ্ছ ও অর্থহীন মাসআলার জন্যে অনেক কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হয়।

আবূ মুহাম্মদ ইয়াযীদ বলেন ঃ আমি মামূনকে তাঁর শৈশবে পড়াতাম। একদা ভৃত্যরা নালিশ করলো যে, আপনি চলে যাওয়ার পর সে চাকর-বাকরদের সাথে দুষ্টুমি করে এবং তাদেরকে অহেতুক মারপিট করে আনন্দ পায়। এতে আমি তাকে সাতটি বেত্রাঘাত করি। এতে সে কাঁদতে কাঁদতে চোখের পানি মুছতে ছিল, এমন সময় উযীরে আযম জা'ফর বারমাকী আগমন করলেন। আমি তখন উঠে বেরিয়ে গেলাম। জা'ফর মামূনের সাথে কথাবার্তা বলে তাঁকে হাসিয়ে চলে গেলেন। তাঁর চলে যাওয়ার পর আমি মামূনের কাছে

আসলাম এবং বললাম, আমি তো এতক্ষণ এই ভয়ে অস্থির ছিলাম যে, তুমি জা'ফরের কাছে আমার বিরুদ্ধে নালিশ না করে বস। জবাবে মামূন বললেন, জা'ফর কেন আমি আমার পিতার কাছেও তো এ জন্যে নালিশ করতে পারি না। কারণ আমার কল্যাণের জন্যই আমাকে প্রহার করেছেন।

ইয়াহইয়া ইব্ন আকছাম বলেন ঃ একদা আমি মামূনুর রশীদের কামরায় শুয়েছিলাম। মামূনও অদূরে নিদ্রারত ছিলেন। হঠাৎ মামূন আমাকে ঘুম থেকে ডেকে বললেন, দেখুন তো আমার পায়ের কাছে কী যেন একটা আছে। আমি সেদিকে তাকিয়ে বললাম, কিছুই দেখছি না। মামূন তাতে নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। তিনি শয্যারচনাকারীদের ডাকলেন। তারা আলো জ্বালিয়ে তাঁর বিছানার নিচে একটি সাপ দেখতে পেল। আমি তখন মামূনকে লক্ষ্য করে বললাম ঃ আপনার অন্যান্য গুণের সাথে আপনার গায়েবের ইল্মও যেন আছে বলতে হবে। মামূন বললেন 'মাআয আল্লাহ্' (আল্লাহ্ পানাহ), এ আপনি কী বলছেন? ব্যাপার হচ্ছে এই যে, আমি এই মাত্র স্বপ্নে দেখলাম, কে একজন যেন আমাকে বলছেন, আপনি নিজেকে নিষ্পেষিত তরবারি থেকে রক্ষা করুন! তৎক্ষণাৎ আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমি ভাবলাম এখনই কোন দুর্ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। আমার সবচাইতে নিকটে ছিল আমার বিছানা। তাই সর্বপ্রথমে আমি এটাই পরখ করে দেখলাম এবং সাপ খুঁজে পেলাম।

মুহাম্মদ ইব্ন মানসূর বলেন, মামূন প্রায়ই বলতেন, শরীফ মানুষের একটা লক্ষণ এই যে, নিজের চাইতে বড়দের অত্যাচার তারা সয়ে যায় কিন্তু নিজের চাইতে ছোটদের প্রতি তারা অত্যাচার করে না।

সাঈদ ইব্ন মুসলিম বলেন, একদা মামূন বললেন, অপরাধীরা যদি জানতো যে আমি ক্ষমা কিরূপ পছন্দ করি তা হলে তাঁরা নির্ভয় হয়ে যেত এবং আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে উঠতো।

একবার এক অপরাধীকে লক্ষ্য করে মামূন বললেন ঃ আল্লাহ্র কসম! আমি তোকে হত্যা করবো। সে বললো, আপনি একটু ধৈর্য অবলম্বন করুন। কেননা নম্র আচরণ ক্ষমার অর্ধেক। মামূন বললেন, আমি তো কসম খেয়ে বসেছি। সে বললো,একজন খুনীর বেশে আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত হওয়ার চেয়ে একজন কসম ভঙ্গকারীরূপে উপস্থিত হওয়া লাখ গুণ উত্তম। একথা শুনে মামূন তার অপরাধ ক্ষমা করে দিলেন।

আবদুস সালাম ইব্ন সালাহ্ বলেন, একদা আমি মামূনের কক্ষে শয়ন করলাম। প্রদীপ নিভু নিভু করছিল। তাকিয়ে দেখি মশালচী দিব্যি নিদ্রা যাচ্ছে। মামূন নিজে উঠে স্বহস্তে চেরাগের সলিতা ঠিক করে আবার শুয়ে পড়লেন আর বললেন, অনেক সময় আমি যখন গোসলখানায় থাকি তখন এ ভৃত্যরা আমাকে গালি দেয় এবং আমার বিরুদ্ধে নানা কুৎসা রটনা করে। তারা মনে করে আমি বুঝি এগুলো শুনি না। কিন্তু আসলে আমি এ সব শুনেও ক্ষমা করে দেই। কোন দিন তাদেরকে ঘুণাক্ষরেও টের পেতে দেই না যে, আমি তাদের সব কথাই শুনেছি।

একদা মামূন দজলা নদীতে প্রমোদ বিহারে মত্ত ছিলেন। মাত্র ক'টি পর্দা ছিল। পর্দার অপর পার্শ্বে মাঝি-মাল্লারা ছিল। মামূন যে সেখানে রয়েছেন তা তারা টেরই পায়নি। তাদের

মধ্যে একজন বলে উঠলো, মামূন মনে করেন, আমি বুঝি তাঁকে খুবই সম্মান করে থাকি। কিন্তু তিনি একটুও বুঝেন না যে, যে ব্যক্তি আপন ভাইকে হত্যা করতে পারে তাঁকে আমি কিভাবে সম্মান করতে পারি ? মামূন মুচকি হেসে বলে ফেললেন, বন্ধুরা, তোমরাই একটা উপায় বল দেখি, যাতে ঐ মহাত্মার অন্তরে আমরা শ্রদ্ধার আসনটা করে নিতে পারি ?

ইয়াহইয়া ইব্‌ন আকছাম বলেন, একদা আমি মামূনের কামরায় শায়িত ছিলাম। তখনো আমার ঘুম আসেনি। হঠাৎ মামূনের কাশি পেল। তিনি তাঁর জামার আঁচলে মুখ চাপা দিলেন, যেন কারো ঘুম ভেঙ্গে না যায়। মামূন নিজে বলতেন, আমার কাছে যুক্তির প্রাবল্য শক্তির প্রাবল্যের চাইতে উত্তম। কেননা শক্তির প্রাবল্য শক্তির পতনের সাথে সাথে শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু যুক্তির প্রাবল্য কোন দিনই শেষ হবার নয়।

মামূন বলতেন, বাদশাহ্‌র পক্ষে তোষামোদ প্রিয় হওয়া অত্যন্ত মন্দ। কিন্তু বিচারকের সংকীর্ণতা তার চাইতেও মন্দ– যা ব্যাপার উপলব্ধি করার পূর্বেই তার মধ্যে দৃষ্ট হয়। তার চাইতেও মন্দতর হচ্ছে ধর্মীয় ব্যাপারে ফিক্‌হ শাস্ত্রবিদদের নির্বুদ্ধিতা। তার চাইতেও মন্দতর হচ্ছে ধনীদের কৃপণতা, বৃদ্ধদের উপহাস, যুবকদের আলস্য এবং যুদ্ধক্ষেত্রে কাপুরুষতা প্রদর্শন করা।

আলী ইব্‌ন আবদুর রহীম মারুজী বলেন, মামূন বলতেন, সেই ব্যক্তি তার নিজের প্রাণের শত্রু, যে সেই সব লোকদের নৈকট্য কামনা করে যারা তার নিকট থেকে দূরত্বকে পছন্দ করে, যে এমন ব্যক্তির সাথে বিনয়পূর্ণ আচরণ করে, যে তাকে সম্মান করে না, আর এমন ব্যক্তির প্রশংসায় আনন্দিত হয়, যে তাকে চেনেই না।

হাদবা ইব্‌ন খালিদ বলেন, একদা আমি মামূনের সাথে একত্রে আহার্য গ্রহণ করলাম। আহার শেষে যখন দস্তরখান উঠিয়ে নেয়া হলো, তখন মাদুরে পতিত খাবারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবশিষ্টাংশগুলো উঠিয়ে আমি মুখে দিচ্ছিলাম তা দেখে মামূন বললেন, তোমার ক্ষুধা মিটে নাই বুঝি। আমি বললাম, ক্ষুধা তো মিটেছে, কিন্তু হাদীস শরীফে এসেছে, যে ব্যক্তি খাবারের অবশিষ্টাংশ উঠিয়ে খায় সে দারিদ্র্য থেকে মুক্ত থাকবে। এ কথা শুনে মামূন আমাকে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা দান করলেন।

একবার হারূনুর রশীদ হজ্জ শেষে কূফায় এসে সকল মুহাদ্দিসকে ডেকে পাঠালেন। সকলেই আসলেন, কিন্তু আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইদরীস এবং ঈসা ইব্‌ন ইউনুস দু'জন আসতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন। হারূনুর রশীদ তাঁর দুই পুত্র আমীন ও মামূনকে তাঁদের খিদমতে পাঠালেন। তাঁরা দু'জন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইদরীসের ওখানে পৌঁছলে তিনি আমীনকে লক্ষ্য করে একশটি হাদীস পড়ে শুনালেন। মামূনও পাশে বসে তা শুনে যাচ্ছিলেন। তিনি হাদীস শুনিয়ে নিবৃত্ত হলেও মামূন বললেন, আপনি অনুমতি দিলে আমি ঐ হাদীসসমূহ আপনাকে মুখস্থ শুনিয়ে দিতে পারি। তিনি অনুমতি দান করলেন। মামূন হুবহু সে সব হাদীস তাঁকে শুনিয়ে দিলেন। ইব্‌ন ইদরীস মামূনের স্মরণশক্তি প্রত্যক্ষ করে অভিভূত হয়ে গেলেন। মামূনুর রশীদ একবার বলেন, আমি কোনদিন কারো কথায় এত লা-জবাব ও অপ্রস্তুত হইনি, যতটুকু হয়েছিলাম একবার কূফাবাসীদের প্রশ্নের মুখে। ব্যাপারটি ছিল এই যে, কূফাবাসীরা এসে

আমার নিকট কূফার আমিলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলো। আমি বললাম, তোমরা মিথ্যা বলছো, তিনি তো অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি। তারা বললো, আমরা মিথ্যাবাদী আর আমীরুল মু'মিনীন সত্যবাদী এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু ন্যায়পরায়ণ এই আমিলের ন্যায় বিতরণের জন্যে আমাদের এ শহরটাকেই বেছে নেয়া হলো কেন ? একে অন্য কোন শহরে পাঠিয়ে দিয়ে তাঁর ন্যায়পরায়ণতা থেকে আমাদের এ শহরের মত অন্য শহরবাসীদেরকেও উপকৃত হতে দেয়া উচিত নয় কি ? অগত্যা আমাকে বলতে হলো, আচ্ছা যাও, আমি তাকে পদচ্যুত করলাম।

ইয়াহইয়া ইব্ন আকছাম বলেন, একদা আমি মামূনুর রশীদের কক্ষে শয়ন করলাম। মধ্যরাতে আমার খুব পিপাসা পেল। আমি ঘন ঘন পার্শ্ব পরিবর্তন করতে লাগলাম। মামূনুর রশীদ ব্যাপার কি জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম, খুব তৃষ্ণা পেয়েছে। মামূন উঠে পানি নিয়ে এসে আমাকে পান করালেন। আমি বললাম, আপনি কোন ভৃত্যকে ডাকলেন না কেন ? মামূন জবাব দিলেন, আমার পিতা তাঁর পিতার নিকট থেকে তিনি তাঁর দাদার নিকট থেকে আর তিনি হযরত উকবা ইব্ন আমের (রা) থেকে শুনেছেন যে, নবী করীম (সা) বলেছেন, সেবকরাই জাতির নেতা হয়ে থাকেন।

খলীফা মামূনুর রশীদের সবচাইতে বড় কৃতিত্ব ও প্রশংসনীয় ব্যাপার হচ্ছে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনয়নের ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত পবিত্র ও উদার অন্তরের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি পিতৃস্নেহের ফাঁদে আটকা পড়েননি, যেমনটা তাঁর পূর্বসূরিরা উত্তরাধিকারী মনোনয়নের ক্ষেত্রে করেছিলেন এবং ইসলামী হুকুমতকে বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকারের অভিশাপে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছিলেন। মামূনুর রশীদ ইমাম আলী রিযাকে উত্তরাধিকারী মনোনয়নের মাধ্যমে আব্বাসীয়দেরকে বঞ্চিত করে অত্যন্ত স্বাধীনভাবে একজন সুযোগ্য লোককে মনোনয়ন প্রদান করেন যেমনটি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) হযরত উমর (রা)-কে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনয়নের ক্ষেত্রে করেছিলেন। কিন্তু আব্বাসীয়রা তাতে কতটুকু অসন্তুষ্ট হয়েছে, মামূন তা অচিরেই আঁচ করতে পারলেন। তিনি বুঝতে পারলেন এবং তারা নানারূপ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে মুসলিম বিশ্বকে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিতে উদ্যত হবে। আলী রিযার অকাল মৃত্যু মামূনের সে সদিচ্ছা পূর্ণ হতে দেয়নি। এরপর তিনি তাঁর বংশের মধ্য থেকেই তাঁর ভাই আবূ ইসহাক মু'তাসিমকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন আর আপন পুত্র আব্বাসকে সর্বপ্রকার যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও খিলাফতের দাবি থেকে স্বেচ্ছায় বঞ্চিত রাখেন। মু'তাসিম যেহেতু যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার দিক থেকে অগ্রগণ্য ছিলেন তাই তিনি মু'তাসিমকেই মনোনয়ন দান করেন এবং পুত্রকে উপেক্ষা করে যান। মামূনের পূর্বসূরিরা একজন নয় দু-দু'জন করে উত্তরাধিকারী নিয়োগের বিদআতে লিপ্ত ছিলেন। মামূন যদি তাঁদের অনুকরণ করতেন তাহলে তিনি অনায়াসেই আপন পুত্র আব্বাসকে মনোনয়ন দান করতে পারতেন। আর এই ভেবে অন্তত তিনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারতেন যে, মু'তাসিমের পরে অন্তত আমার ছেলেই খলীফা হবে। কিন্তু এ অসঙ্গত কাজটিও তিনি করতে চাননি। এ জন্যে মামূনের যতই প্রশংসা করা হোক, তা কমই হবে।

মু'তাসিম বিল্লাহ্

আবূ ইসহাক মু'তাসিম ইব্ন হারূনুর রশীদ ১৮০ হিজরীতে (৭৯৬ খ্রি) যখন রোমদেশ অভিমুখে যাত্রা করেন তখন সীমান্ত এলাকার জাবতারা নামক স্থানে বারেদা নাম্নী এক ক্রীতদাসীর গর্ভে ভূমিষ্ঠ হন। হারূনুর রশীদ তাঁর এ পুত্রটিকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। তিনি তাঁর সন্তানদের মধ্যে কোন কিছু ভাগ-বণ্টন করলে সব চাইতে বড় অংশটা দিতেন মু'তাসিমকে।

মু'তাসিম লেখাপড়ায় আদৌ উৎসাহী ছিলেন না। বাল্যকালে তিনি তাঁর সবটা সময় খেলাধুলাতেই কাটিয়ে দিতেন। হারূনুর রশীদ তাঁর একটি ক্রীতদাসকে এ উদ্দেশ্যে নিযুক্ত করেছিলেন যে,সে যেন সব সময় মু'তাসিমের সাথে সাথে থাকে এবং একটু সুযোগ পেলেই তাকে যেন কিছুটা পড়ালেখা শিক্ষা দেয়। সে ক্রীতদাসটির মৃত্যু হলে হারূনুর রশীদ তাঁকে লক্ষ্য করে বলেন, তোমার দাসটিও তো চলে গেল। এবার বল দেখি তোমার ইচ্ছা কি? জবাবে মু'তাসিম বলেন, আমীরুল মু'মিনীন! দাসটি যখন মরে গেছে, তখন আমার পড়ালেখার ঝামেলাটাও চুকে গেছে। এ ঝামেলায় গিয়ে লাভ কি ?

মু'তাসিম সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে যে, তিনি একেবারে নিরক্ষর ছিলেন। কিন্তু তা যথার্থ নয়। সত্য কথা হলো, তিনি খুব অল্প পড়ালেখা জানতেন। নিজের নাম-ধাম লেখা প্রভৃতির মত মামুলী পড়ালেখা তাঁর ছিল। কিন্তু যেহেতু শাহী খানদান এবং জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিদের সাহচর্যে মানুষ হয়েছেন এবং হারূন ও মামূনের আমলের জ্ঞানচর্চার মজলিসসমূহের উচ্চাঙ্গের একাডেমিক আলোচনাদি সর্বদাই শুনেছেন ও দেখেছেন তাই তাঁর জানাশোনার পরিধি অত্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মু'তাসিম অত্যন্ত বলিষ্ঠ গড়নের পাহলোয়ান এবং বীর পুরুষ ছিলেন। সাথে সাথে তিনি উঁচুদরের মানবিক যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন।

ইব্ন আবূ দাঊদ বলেন, মু'তাসিম প্রায় সময়ই তাঁর বাহু আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলতেন, এতে কামড় বসাও দেখি। আমি সজোরে দাঁত দিয়ে কামড় দিতাম। কিন্তু মু'তাসিম বলতেন, আমিতো একটুও টের পাচ্ছি না। আমি আবার কামড় দিতাম, কিন্তু তাতেও কোন কাজ হতো না। আমার দাঁতের কি ক্রিয়া হবে, ওখানে তো বল্লমের আঘাতও ফিরে আসতো। মু'তাসিম প্রায়ই দুই অঙ্গুলীর চাপ দিয়ে হাতের কব্জির হাড় ভেঙ্গে দিতেন।

মু'তাসিম কখনো কখনো নিজে স্ব-রচিত কবিতা আবৃত্তি করতেন। কবিদেরকে তিনি অত্যন্ত সম্মান ও সমাদর করতেন। খালকে কুরআনের মাসআলা নিয়ে তিনিও তাঁর ভাই মামূনের মত পাগলামিতে লিপ্ত ছিলেন। মামূনের মত তিনিও এ প্রশ্নে অনেক আলিম ও জ্ঞানীগুণীকে নানারূপ কষ্ট দিয়েছেন। হযরত ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বলকে এ প্রশ্নেই মু'তাসিম অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতন নিপীড়ন চালান।

মামূনুর রশীদের শাসনামলে মু'তাসিম বিল্লাহ সিরিয়া ও মিসরের গভর্নর ছিলেন। মামূনুর রশীদের রোমান এলাকা আক্রমণের সময় মু'তাসিম বিল্লাহ্ বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। এ জন্যেই খুশি হয়ে মামূনুর রশীদ তাঁকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন এবং আপন পুত্র আব্বাসকে বঞ্চিত করেন। মু'তাসিম বিল্লাহর খিলাফতের বায়আত মামূনের ইন্তিকালের পরদিনই অনুষ্ঠিত হয়। তারিখটি ছিল ১৯শে রজব, ২১০ হিজরী মুতাবিক ১০ আগস্ট ৮৩৩ খ্রিস্টাব্দ।

ফযল ইব্‌ন মারওয়ান নামক জনৈক খ্রিস্টান ব্যক্তি তাঁর কার্যব্যবস্থাপক ও নায়েব ছিল। বাগদাদে মামূনের মৃত্যু সংবাদ পৌছার অব্যবহিত পরেই ফযল ইব্‌ন মারওয়ান বাগদাদ-বাসীদের নিকট থেকে মু'তাসিমের খিলাফতের বায়আত গ্রহণ করেন। মু'তাসিম বাগদাদে উপনীত হয়ে এই ফযল ইব্‌ন মারওয়ানকেই তাঁর উযীরে আযম নিযুক্ত করেন। তারতূসে যখন মু'তাসিমের হাতে বায়আত অনুষ্ঠান হচ্ছিল তখন সামরিক বাহিনীর অনেকেই আব্বাস ইব্‌ন মামূনকে খিলাফতের যোগ্যতার পাত্র বলে মত প্রকাশ করেন। মু'তাসিম কালবিলম্ব না করে আব্বাসকে ডেকে পাঠান। আব্বাস তাঁর হাতে বায়আত গ্রহণ করেন। আব্বাসের বায়আত গ্রহণ করায় এ বিরোধিতার আপনা আপনি অবসান ঘটে।

খলীফা হয়েই মু'তাসিম তাওয়ানা শহর ধূলিসাৎ করে দিয়ে সেখানে এসে বসতি স্থাপনকারীদেরকে তাদের নিজ নিজ শহরে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ জারি করলেন। এর নানা কারণ হতে পারে।

১. এটা যেহেতু আব্বাসেরই হাতে পত্তন করা শহর, তাই তাঁর প্রভাব নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে মু'তাসিম তা ধ্বংস করে ফেলেন।

২. রোমান সীমান্তে মুসলিম অধ্যুষিত এ দুর্জয় মজবুত ঘাঁটিটি রোমানদেরকে আক্রমণের জন্য প্ররোচিত করতে পারে। তাই এ আপদ থেকে মুক্ত থাকাই ছিল এটা ধ্বংস করার উদ্দেশ্য। অথবা এর অন্য কোন কারণও থাকতে পারে যা একমাত্র আল্লাহ্ জানেন।

এ শহরটি ধ্বংস করিয়ে দিয়ে যে সমস্ত অস্থাবর সম্পদ নিয়ে আসা সম্ভবপর ছিল তা বাগদাদে নিয়ে আসেন এবং অবশিষ্ট সবকিছু অগ্নি সংযোগে জ্বালিয়ে দেন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসিমের বিদ্রোহ

মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসিম আলী ইব্‌ন উমর ইব্‌ন আলী ইব্‌ন হুসাইন ইব্‌ন আলী ইব্‌ন তালিব মদীনা মুনাওয়ারার মসজিদে অবস্থান করতেন এবং ধর্ম-কর্ম ও ইবাদত-বান্দেগীতে জীবন অতিবাহিত করতেন। জনৈক খুরাসানী ব্যক্তি তাঁর খিদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁকে খিলাফতের প্ররোচনা দিয়ে বলতে থাকে, আপনিই হচ্ছেন খিলাফতের যোগ্যতম ব্যক্তি। সুতরাং গোপনভাবে লোকদের বায়আত গ্রহণ করা উচিত। সে মতে খুরাসান থেকে যে সমস্ত লোক হজ্জ করতে এসে মদীনা মুনাওয়ারায় রয়ে যেত তাদেরকে সে তাঁর খিদমতে নিয়ে এসে বায়আত করাতে লাগলো।

এভাবে এক বিপুল সংখ্যক লোক খুরাসানে সংঘবদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসিম উক্ত খুরাসানীকে সাথে নিয়ে জুরজানে চলে যান এবং কাজের সুবিধার্থে কিছুদিন আত্মগোপন করে থাকেন। সেখানেও অত্যন্ত সন্তর্পণে বায়আতের কাজ চলতে থাকে। অনেক রঈস ও আমীর ব্যক্তি গোপনভাবে তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে থাকেন। অবশেষে মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসিম উলুভী বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। খুরাসানের গভর্নর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহির এ বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। তালিকান অঞ্চলে বেশ ক'টি যুদ্ধও সংঘটিত হয়। প্রত্যেকটি যুদ্ধে মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসিম উলুভী পরাস্ত হন।

অবশেষে মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসিম কেবল নিজের প্রাণ নিয়ে পলায়ন করেন। নাসা নামক স্থানে পৌঁছে তিনি গ্রেফতার হন এবং আবদুল্লাহ ইব্‌ন তাহিরের কাছে নীত হন। আবদুল্লাহ ইব্‌ন তাহির তাঁকে বাগদাদে মু'তাসিম বিল্লাহ্‌র খিদমতে পাঠিয়ে দেন। মু'তাসিম বিল্লাহ্ তাঁকে মাসরূর আল-কবীরের তত্ত্বাবধানে বন্দী করে রাখেন। ২১৯ হিজরীর ১৫ই রবিউল আউয়াল (৮৩৪ খ্রি-এর মার্চ) মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসিম বাগদাদে নীত হন। ২১৯ হিজরীর শাওয়াল (৮৩৪ খ্রি অক্টোবর) মাসের ১লা তারিখে অর্থাৎ ঈদুল ফিতরের রাতে সুযোগ বুঝে তিনি কারাগার থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে যান।

জাঠদের ধ্বংসসাধন

২১৯ হিজরীর জুমাদাল উখরা (৮৩৪ খ্রি) মাসে খলীফা মু'তাসিম তদীয় এক সিপাহ্‌সালার আজীদ ইব্‌ন আম্বাকে জাঠদের দমনের দায়িত্ব প্রদান করেন। আজীদ দীর্ঘ সাত মাস পর্যন্ত এ দস্যু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত থাকেন। অবশেষে তারা ২১৯ হিজরীর যিলহজ্জ (৮৩৫ খ্রি জানুয়ারী) মাসে নিরাপত্তা প্রার্থনা করতে বাধ্য হয় এবং আজীদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। আজীদ তাদের সর্বসাকল্যে সতের হাজার লোককে নিয়ে বাগদাদ অভিমুখে যাত্রা করেন। সতের হাজারের মধ্যে বার হাজার ছিল যুদ্ধক্ষম পুরুষ। ২২০ হিজরীর ১০ই মুহাররম (৮৩৫ খ্রি ১৫ই জানুয়ারি) আজীদ তাদেরকে নিয়ে বাগদাদে পদার্পণ করেন। মু'তাসিম নিজে কিস্তিতে আরোহণ করে শুমাসার দিকে আগমন করেন এবং জাঠবন্দীদের পরিদর্শন করে নির্দেশ দেন যে, এদেরকে রোমান সীমান্তের চশমাজারবা নামক স্থানের সন্নিকটে বসবাস করতে দাও। সে মতে তাদেরকে সেখানেই বসত করতে দেয়া হয়। ঘটনাক্রমে সীমান্তবর্তী এলাকায় এদেরকে পেয়ে রোমানরা নৈশ আক্রমণ চালিয়ে প্রত্যেকটি লোককে হত্যা করে চলে যায়। এভাবে এ দস্যু সম্প্রদায় একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

সামেরা শহর

খলীফা মু'তাসিম ছিলেন একজন সামরিক ব্যক্তিত্ব। তিনি সামরিক বাহিনীর প্রতি অধিক মনোযোগী ছিলেন। তাঁর পূর্বসূরি আব্বাসী খলীফাগণ সাধারণভাবে খুরাসানীদের বেশি কদর করতেন। আরব সৈন্যদের উপর তাঁদের আস্থা খুব কমই ছিল। যদিও খুরাসানীদের পক্ষ থেকেও তাঁদের জন্যে বারবার সঙ্কটের সম্মুখীন হতে হয়েছে, এতদসত্ত্বেও সামগ্রিকভাবে আরবদের মুকাবিলায় খুরাসানী ও ইরানীদের উপরই তাঁদের আস্থা ছিল বেশি। এ জন্যে সামরিক বাহিনীতে আরবদের সংখ্যা হ্রাস পেতে পেতে খুবই অল্পে এসে ঠেকে। মু'তাসিম বিল্লাহ শুরুতেই সৈন্যবাহিনীর বিন্যাসের দিকে মনোযোগী হন। তিনি ফারগানা ও আশরুস্‌না এলাকা থেকে তুর্কীদেরকেও সেনাবাহিনীতে ভর্তি করান।

এসব তুর্কী সেনার যুদ্ধপ্রিয়তা এবং তাদের কষ্টসহিষ্ণুতা তাঁর কাছে অত্যন্ত পছন্দনীয় ছিল। এ যাবত সামরিক বাহিনীতে আরবী ও ইরানী এই দুই শ্রেণীর সৈন্যই থাকতো। তুর্কীদের সাথে অহরহ সীমান্ত লড়াই লেগে থাকতো। কখনও তুর্কী সর্দাররা বশ্যতা স্বীকার করে করদ-মিত্রে পরিণত হতো, আবার কখনো বিদ্রোহী হয়ে মুকাবিলায় অবতীর্ণ হয়ে রীতিমত যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে নতি স্বীকার করতো। তাদের এরূপ আচরণের দরুন এ যাবত তাদেরকে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করার মত আস্থা স্থাপন করা যায়নি। মু'তাসিম এত প্রচুর

সংখ্যক তুর্কীকে ফৌজে ভর্তি করলেন এবং তাদেরকে এত গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে অধিষ্ঠিত করলেন যে, সংখ্যা ও গুরুত্বের দিক থেকে তারা রীতিমত ইরানীদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ালো। আরব সৈন্যরা সংখ্যায় হ্রাস পেতে পেতে কেবল মিসরীয় এবং ইয়ামানীরাই খলীফার বাহিনীতে অবশিষ্ট থাকে। খলীফা সমস্ত আরব সৈন্যকে মিলিয়ে একটি স্বতন্ত্র আরব রেজিমেন্ট গঠন করেন। ঐ রেজিমেন্টের নাম দেন মাগরিবা বা পশ্চিমা বাহিনী।

সমরকন্দ, ফারগানা ও আশরুস্নার তুর্কী সৈন্যদের সমন্বয়ে গঠিত সব চাইতে দুর্ধর্ষ ও বড় বাহিনীর নাম দেন ফারগানা। খুরাসানীরা ফারগানাদেরকে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী বলে ভাবতে থাকে। খলীফা মু'তাসিম যেহেতু নিজে শখ করে এ বাহিনীটি গঠন করেছিলেন তাই তাদের অশ্বও ছিল উন্নতজাতের। তাদের বেতন-ভাতাও ছিল অন্যদের তুলনায় বেশি। এ জন্যে খুরাসানীরা বাগদাদে তাদের সাথে ঝগড়া-কলহে প্রবৃত্ত হয়। মু'তাসিম বিল্লাহ্ তাদের এ অবাঞ্ছিত ঈর্ষা লক্ষ্য করে বাগদাদ থেকে নব্বই মাইল দূরবর্তী দজলা নদীর তীরে এবং কাতুন নদীর নির্গমন স্থলের নিকটে ফারগানা বাহিনীর সেনাছাউনি নির্মাণ করলেন। সেখানে তিনি তাঁর নিজের বসবাসের জন্যেও একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন। সৈন্যদের জন্যে ব্যারাকসমূহ নির্মাণ করান। বাজার, জামে মসজিদ প্রভৃতি জরুরী ঘরবাড়ি নির্মাণ করিয়ে এবং তুর্কীদের বসতি স্থাপন করে তিনি নিজেও এ নবনির্মিত শহরে স্থানান্তরিত হয়ে যান।

তিনি শহরটির নাম রাখেন সুররামানরাআ (এর অর্থ হচ্ছে যে দেখে তার মন জুড়ায়—অনুবাদক)। বহুল ব্যবহারে তা সামেরা রূপ পরিগ্রহ করে। এ শহরটি ২৩০ হিজরীতে (৮৪৪ খ্রি) স্থাপিত হয় এবং ঐ বছর থেকেই বাগদাদের পরিবর্তে সামেরা রাজধানীতে পরিণত হয়। রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ার অল্পদিনের মধ্যেই তার জনসংখ্যা ও জৌলুস বাগদাদের সমপর্যায়ে চলে আসে। আরব ও খুরাসানীদের পরিবর্তে তুর্কীরাই এখন রাজধানী ও খলীফার ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে বসে। ঐ বছরই মুহাম্মদ ইব্ন আলী রিযা ইব্ন মূসা কাযিম ইব্ন সাদিকের মৃত্যু হয় এবং বাগদাদে তিনি সমাহিত হন।

ফযল ইব্ন মারওয়ানের পদচ্যুতি

ঐ বছরই অর্থাৎ ২৩০ হিজরীতে (৮৪৪-৪৫ খ্রি) উযীরে আযম ফযল ইব্ন মারওয়ানের বিরুদ্ধে খলীফার কানে বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগ উত্থাপিত হয়। খলীফা হিসাব-পত্র যাচাই করার উদ্দেশ্যে তদন্ত কমিটি গঠন করেন। সত্যি সত্যি দশ লক্ষ দীনারের তহবিল তসরুফ ধরা পড়ে। খলীফা এ পরিমাণ অর্থ ফযলের সম্পত্তি থেকে উসুল করে নেন এবং তাঁকে মুসেলের নিকটবর্তী কোন একটি গ্রামে নজরবন্দী করেন। তাঁর স্থলে খলীফা মুহাম্মদ ইবন আবদুল মালিক ইব্ন আবান ইব্ন হামযাকে উযীরে আযম নিয়োগ করেন। মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল মালিক ইব্ন যাইয়াত নামে বিখ্যাত। তাঁর পিতামহ আবান একটি গ্রামে বাস করতেন এবং সেখান থেকে তৈল এনে বাগদাদে বিক্রি করতেন। মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল মালিক বাগদাদে প্রতিপালিত ও শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে উচ্চতর যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। তাঁর ওজরাতির মেয়াদ মু'তাসিম, ওয়াছেক এবং মুতাওয়াক্কিলের যুগ পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। খলীফা মামূনুর রশীদের আমলে যেমন কাযী ইয়াহইয়া ইবন আকছাম উযীরে আযম না হয়েও উযীরে আযমের চাইতে

বেশি ক্ষমতাধর ও প্রভাবশালী ছিলেন এবং সর্বদা মামূনের সাথে সাথে তাকতেন ঠিক তেমনি মু'তাসিমের আমলে ঐ কাযী আকছামেরই জনৈক শাগরিদ আহমদ ইব্ন আবূ দাঊদ থাকতেন। তিনিও উযীরে আযম না হলেও উযীরে আযমের সম-পর্যায়ের সম্মান ও প্রতিপত্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁরা দু'জন উস্তাদ ও শাগরিদ কালাম শাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং মু'তাযিলী ছিলেন। খালকে কুরআনের প্রশ্নে উলামাদের উপর মামূন ও মু'তাসিমের নির্যাতন-নিপীড়নের মূলে উক্ত দু'জনের প্রভাবই সমধিক কার্যকরী ছিল বলে বলা হয়ে থাকে। কিন্তু কেবল ইব্ন আবূ দাঊদই মু'তাসিমের দরবারে তখন এমন এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন– যিনি আরবদের সমর্থক ও শুভানুধ্যায়ী ছিলেন। তাঁর জন্যেই রাজধানী শহরে আরবদের যা একটু মর্যাদা ছিল, নতুবা সর্বদিক দিয়ে তুর্কীরা এবং তারপর ইরানীদেরই প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল।

বাবক খুররমী ও আফশীন হায়দার

বাবক খুররমী সম্পর্কে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, মামূনুর রশীদের প্রেরিত প্রত্যেক সিপাহসালারই তার হাতে যুদ্ধে পরাস্ত হয়েছেন। কারো নিকট সে পরাজিত হয়নি। উক্ত শহরকে সে তার বাসস্থানরূপে গ্রহণ করে এবং আশেপাশের সমস্ত এলাকার ওপর তার প্রতিপত্তি ও দাপট প্রতিষ্ঠিত হয়। আশেপাশের আমিল ও রঈসগণ তাঁর ভয়ে তটস্থ থাকতেন এবং তাঁর সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে তার লোকজনকে খাতির করতেন। খলীফা মু'তাসিম আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ইউসুফকে বাবক খুররমীকে দমনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করলেন। আবূ সাঈদ প্রথমে আর্দবেল এবং আযারবায়জানের মধ্যকার যে সব দুর্গ বাবক ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল সেগুলো মেরামত ও পুনর্নির্মাণ করেন। তার পর যুদ্ধাস্ত্র ও রসদপত্র সংগ্রহ করে বাবকের দিকে অগ্রসর হওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। বাবক খুররমীর একটি সেনাছাউনি ঐ এলাকার কোন একটি স্থানে নৈশ আক্রমণ করে। আবূ সাঈদ সে সংবাদ পেয়ে তাৎক্ষণিকভাবে তার পশ্চাদ্ধাবনে রওয়ানা হন। তাঁরা বাবকের বাহিনীর নিকটবর্তী হয়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হলেন। এ যুদ্ধে প্রথমবারের মত বাবক পরাজিত হয়। আবূ সাঈদ তার অনেক লোকজনকে হত্যা ও অনেককে গ্রেফতার করেন এবং নৈশ আক্রমণকালে তাদের ছিনিয়ে নেয়া দ্রব্যসম্ভার তাদের নিকট থেকে পুনরুদ্ধার করেন। তার এ প্রথম পরাজয়ের পরই যে সব সর্দার তার ভয়ে তার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে যেতেন, কিন্তু আন্তরিকভাবে তারা তাকে সমর্থন করতেন না এমন সব সর্দাররা ইসলামী বাহিনীর সমর্থনে এগিয়ে আসতে লাগলেন। বাবক খুররমীর ইসমত নামক জনৈক সিপাহসালার আযারবায়জান এলাকার জনৈক দুর্গাধিপতি মুহাম্মদ ইব্ন বাঈছের এখানে বসে ওঠে। মুহাম্মদ ইব্ন বাঈছ চিরাচরিত নিয়মানুসারে তাঁকে মেহমানদারী করেন। তাঁর সঙ্গী-সাথীদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেন এবং তাকে বিশেষ মর্যাদায় ও ব্যবস্থাপনায় রাখেন। রাতের বেলা তিনি ইসমতকে গ্রেফতার করে খলীফা মু'তাসিমের খিদমতে পাঠিয়ে দেন এবং তার সাথীদেরকে হত্যা করেন। খলীফা মু'তাসিম ইসমতের নিকট বাবকের গোপন রহস্যাদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। ইসমত মুক্তিলাভের আশায় সবই খলীফাকে খুলে বলে। মু'তাসিম ইসমতকে বন্দী করে রাখলেন এবং বাবকের মুকাবিলায় কোন বড় ও দুর্ধর্ষ সিপাহসালারকে প্রেরণ করা জরুরী বিবেচনা করলেন যাতে সহসাই এ ফিতনার উচ্ছেদ ঘটে।

মু'তাসিমের সিপাহসালারদের মধ্যে হায়দার ইব্ন কাউস ছিলেন শ্রেষ্ঠ সেনাপতি। তিনি ছিলেন আশরুসনার বাদশাহজাদা। তাঁর খানদানী খেতাব ছিল আফশীন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করলে তাঁর ইসলামী নামকরণ করা হয় হায়দার। এ জন্যে তিনি আফশীন হায়দার নামেই খ্যাতিলাভ করেন। তিনি সমস্ত ফারগানা রেজিমেন্ট অর্থাৎ তুর্কী সৈন্যবাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তিনি খলীফা মামূনুর রশীদের খিলাফত আমলেই মু'তাসিমের হাতে ইসলাম গ্রহণ করে তারই খিদমতে থাকতেন। মু'তাসিম সিরিয়া ও মিসরের গভর্নর থাকাকালে আফশীন হায়দারের সামরিক খিদমত গ্রহণ করেন এবং তাঁর সামরিক যোগ্যতা প্রত্যক্ষ করেন। তাই খিলাফতের দায়িত্বভার পেয়েই তিনি ফারগানা বাহিনী সংগঠিত করেন এবং ঈতাখ, আশনাস, আজিব, ওসীফ, বাগা কবীর প্রমুখকে সেনাপতি এবং আফশীন হায়দারকে প্রধান সেনাপতি পদে অধিষ্ঠিত করেন। বলাবাহুল্য, এদের সকলেই ছিলেন তুর্কী।

এ সেনাপতিদের জন্যে সামেরায় মহল নির্মিত হয়। খলীফা মু'তাসিম বিল্লাহ বাবকের শক্তি এবং দুর্গম পার্বত্য ঘাঁটির কথা লক্ষ্য রেখে আফশীন হায়দারকেই সেদিকে প্রেরণ করেন। তাঁর অধীন তুর্কী সৈন্যদের ছাড়াও খুরাসানী এবং আরব বাহিনীর সৈন্য ইউনিটসমূহও প্রেরিত হয়। জিহাদের উদ্দেশ্যে এক বিরাট সংখ্যক আম মুজাহিদও তাঁর সাথে যান। আফশীন সেখানে পৌঁছে অত্যন্ত চাতুর্য ও যোগ্যতার সাথে যুদ্ধ শুরু করেন। মু'তাসিম আফশীনকে এত সাজ-সরঞ্জাম ও বিরাট বাহিনীসহ প্রেরণ করা সত্ত্বেও পরবর্তীতে তাদের সাহায্যার্থে ঈতাখের নেতৃত্বে নতুন বাহিনী প্রেরণ করেন। কয়েকদিন পরে বাগা কাবীরকেও সৈন্য-সামন্ত ও যুদ্ধ-সরঞ্জামাদি দিয়ে প্রেরণ করেন। ফৌজের সমস্ত খরচাদি এবং যুদ্ধাস্ত্র প্রভৃতির খরচ ছাড়াও আফশীনের দৈনিক ভাতা ছিল দশ হাজার দিরহাম। অর্থাৎ যতদিন অবরোধ ও যুদ্ধ চলবে ততদিন তিনি দৈনিক দশ হাজার দিরহাম লাভ করবেন। এটা ছিল তাঁর নির্ধারিত বেতন-ভাতার অতিরিক্ত। যেদিন যুদ্ধ হতো না আফশীন তাঁর শিবিরে বা তাঁবুতে অবস্থান করতেন। খলীফার তহবিল থেকে ঐ দিনের অতিরিক্ত ভাতা তিনি পাঁচ হাজার দিরহাম করে পেতেন। বাবক বিরোধী যুদ্ধের জন্যে এটা ছিল বিশেষ ব্যবস্থা। এ যুদ্ধ প্রায় দেড় বছর কাল চলেছিল।

আফশীন আর্দবেল পৌঁছে যুদ্ধছাউনি তৈরি করেন এবং এরূপ অনেক সেনাছাউনি অল্প অল্প ব্যবধানে গড়ে তুলেন যাতে যুদ্ধের রসদ এবং চিঠিপত্র বার্তা প্রভৃতি নির্বিঘ্নে পৌঁছতে পারে। তারপর বাবকের দখল ও প্রহরাধীন পাহাড়সমূহে প্রবেশ করে সৈন্যদেরকে সুবিধামত স্থানসমূহে ছড়িয়ে দিয়ে কোথাও ঝাণ্ডা মারফত, আবার কোথাও কাসেদ মারফত একে অপরের সাথে যোগাযোগ রক্ষার ব্যবস্থা করে বাবকের সৈন্যদেরকে পিছু হটিয়ে এবং কেল্লার দিকে ঠেলে দিয়ে অগ্রসর হতে থাকেন। আকস্মিক নৈশ আক্রমণ এবং গোপন অবস্থানসমূহ থেকে হামলার খুবই আশঙ্কা ছিল। সেদিকেও আফশীনের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। আবহাওয়া এবং শীতের প্রাবল্য আরব ও ইরাকী সৈন্যদেরকে তুর্কী ও খুরাসানী সৈন্যদের তুলনায় বেশি কাবু করে।

জা'ফর ইব্ন দীনার খাইয়াত স্বেচ্ছাসেবক ও মুজাহিদ তথা মিলিশিয়া বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন। তিনি, ঈতাখ ও বাগা শৌর্যবীর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। বাবক এবং তার সিপাহসালার আযীন ও তুররাখান প্রমুখও বেশ বীরত্ব ও যোগ্যতা প্রদর্শন করে। আফশীনের ঐ এলাকায় পৌঁছার পূর্বেই বাবকের সাথে যুদ্ধরত আবূ সাঈদও আফশীনের অধীনে নিজের

বাহিনী ও নিজেকে নিয়োজিত করেন। এ যুদ্ধের ফলে অবশেষে বাবক খুররমী পরাজিত ও গ্রেফতার হয়ে বন্দী অবস্থায় সামেরার খলীফা মু'তাসিমের দরবারে নীত হয়। বাবক ও তার ভাই মুআবিয়া ২২৩ হিজরীর শাওয়াল (৮৩৮ খ্রি সেপ্টেম্বর) মাসে গ্রেফতার হয় এবং আফশীন ঐ বছরের সফর মাসে সামেরায় প্রত্যাবর্তন করেন।

খলীফা মু'তাসিম যুদ্ধ জয় এবং বাবকের গ্রেফতারীর সংবাদ পেয়ে এ মর্মে ফরমান জারি করেন যে, আযারবায়জানের বরযন্দ মঞ্জিল থেকে সামেরা পর্যন্ত প্রতি মঞ্জিলে যেন খলীফার পক্ষ থেকে আফশীনকে একটি খিলাত ও সুসজ্জিত ঘোড়া পেশ করা হয় এবং তাঁর অভ্যর্থনায় রাজকীয় ব্যবস্থা করা হয়। আফশীন রাজধানী সামেরার সন্নিকটবর্তী হলে খলীফা স্বয়ং শাহযাদা ওয়াছিককে আফশীনের অভ্যর্থনার জন্যে শহরের উপকণ্ঠে প্রেরণ করেন।

আফশীন যখন খলীফার সম্মুখে দরবারে উপস্থিত হলেন তখন স্বর্ণমণ্ডিত আসনে তাঁকে বসিয়ে মাথায় মুকুট পরানো হলো। বহুমূল্য খিলাত এবং নগদ বিশ লক্ষ দিরহাম উপঢৌকন স্বরূপ প্রদান করা হলো। এ ছাড়াও উক্ত বাহিনীর জওয়ানদের মধ্যে বিতরণের উদ্দেশ্যে আরো দশ লক্ষ দিরহাম প্রদান করা হলো। বাবককে খলীফা মু'তাসিমের নির্দেশে সামেরায় হত্যা করা হয় এবং তার ভাইকে বাগদাদে পাঠিয়ে সেখানে তাকে প্রাণদণ্ড দেয়া হয়। এরপর উভয়ের শবদেহ শূলিতে ঝুলিয়ে রাখা হয়। বাবকের দাপট প্রায় কুড়ি বছর কাল ধরে চলেছিল। এই সময়-সীমার মধ্যে সে এক লাখ পঞ্চাশ হাজার মানুষকে হত্যা করে। সাত হাজার ছয়শ মুসলমান নর-নারীকে তার বন্দীশালা থেকে উদ্ধার করা হয়। বাবকের পরিবার থেকে সতেরজন পুরুষ ও ত্রিশজন মহিলাকে আফশীন গ্রেফতার করেন।

আমুরিয়া বিজয় ও রোমের যুদ্ধ

বাবক খুররমী মুসলিম বাহিনীর অবরোধে অতিষ্ঠ হয়ে রোমান অধিপতি নাওফিল ইবন মীকাঈলের কাছে এই মর্মে একটি পত্র লিখল যে, মুতাসিম তাঁর গোটা বাহিনীকে আমার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছেন। বাগদাদ ও সামেরাসহ গোটা রাজ্যের প্রদেশসমূহ এখন সৈন্যশূন্য এবং সেনাধ্যক্ষের প্রায় সকলেই আমার বিরুদ্ধে নিয়োজিত রয়েছেন। এটা আপনার জন্য বাগদাদ আক্রমণের সুবর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছে, এ সুযোগ আপনি কোনক্রমেই হাতছাড়া করবেন না। মক্কা দখল করে আপনি সোজা বাগদাদ পর্যন্ত অগ্রসর হোন। বাবকের মতলব ছিল, রোম সম্রাট যদি আক্রমণ পরিচালনা করেন তাহলে মুসলিম বাহিনী নিশ্চিত দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়বে এবং তার উপর চাপ অনেকটা কমে যাবে।

পত্রপাঠ মাত্র রোম সম্রাট একলক্ষ সৈন্য নিয়ে আক্রমণ পরিচালনা করলেন। কিন্তু ততক্ষণে বাবকের সাথে যুদ্ধের অবসান ঘটেছে। মুসলিম সৈন্যরা তখন রোম সম্রাটের বিরুদ্ধে পূর্ণশক্তি নিয়োগে সমর্থ। নাওফিল সর্বপ্রথম জিবাত্রা নামক স্থানে নৈশ আক্রমণ চালিয়ে সেখানকার প্রতিরোধকারী পুরুষদেরকে হত্যা এবং নারী ও শিশুদেরকে বন্দী করে নিয়ে যান। এরপর তিনি মালাতিয়ার দিকে অগ্রসর হন এবং সেখানেও অনুরূপ ধ্বংসলীলা চালান।

২২৩ হিজরী ২৯শে রবিউস সানি (৮৩৮ খ্রি-এর মার্চ) মু'তাসিমের কাছে জিবাত্রা ও মালাতিয়ার ধ্বংস-যজ্ঞের সংবাদ পৌছে। সংবাদবাহক দূত তাঁকে এ কথাও জানায় যে,

জনৈকা হাশিমী বংশীয়া রমণীকে যখন রোমান সৈন্যরা টানাহেঁচড়া করে নিয়ে যাচ্ছিল তখন সে মু'তাসিম মু'তাসিম বলে চিৎকার করছিল। লাব্বায়িক! লাব্বায়িক!! বলে মু'তাসিম তৎক্ষণাৎ সিংহাসন থেকে উঠে অশ্বের উপর আরোহণ করলেন। রণ-দামামা বাজিয়ে তৎক্ষণাৎ যাত্রা শুরু হলো। এক বিশাল সৈন্যবাহিনী ও যথেষ্ট সংখ্যক দক্ষ সেনাপতি মু'তাসিমের সহযাত্রী হলেন। মু'তাসিম তখন আজীফ ইব্‌ন আম্বাসা ও উমর ফারগানীকে দ্রুতগামী সৈন্যবাহিনী সাথে দিয়ে অগ্রে প্রেরণ করলেন যাতে তাঁরা যথাসম্ভব শীঘ্র জিবাত্রায় পৌঁছে সেখানকার অধিবাসীদের আশ্বস্ত করেন এবং রোমানদেরকে তাড়িয়ে দেন। উক্ত সেনাপতিদ্বয়ের জিবাত্রা পৌঁছার পূর্বেই রোমানরা পালিয়ে যায়।

এরপর খলীফা মু'তাসিমও স-সৈন্য সেখানে গিয়ে উপনীত হন। সেখানে পৌঁছে খলীফা জানতে চান যে, রোমানদের সবচাইতে মশহুর মজবুত এবং গুরুত্বপূর্ণ শহর কোন্‌টি? জবাবে লোকজন জানায় যে, আজকাল আমুরিয়ার চাইতে বেশি মজবুত দুর্গ নগরী দ্বিতীয়টি নেই। এছাড়া রোম সম্রাট নাওফিলের জন্মস্থান হিসাবেও এর অত্যধিক গুরুত্ব রয়েছে। মু'তাসিম বললেন, আমার জন্মস্থান জিবাত্রায় যখন রোম সম্রাট ধ্বংস চালিয়েছে তখন জবাবে আমিও তার জন্মস্থান আমুরিয়া ধ্বংস করে ছাড়ব। সত্যি সত্যি তিনি এ অভিযানে এমনি সমরোপকরণ নিয়োগ করলেন যা ছিল অভূতপূর্ব। অগ্রবাহিনীর সেনাধ্যক্ষ নিয়োগ করলেন আশনাসকে। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন মুসআবকে তিনি তাঁর সাহায্যকারী সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করলেন। দক্ষিণ বাহিনীর সেনাপতি ঈতাখকে এবং বাম বাহিনীর কর্তৃত্ব জা'ফর ইব্‌ন দীনার খাইয়্যাতকে প্রদান করলেন। মধ্যবাহিনীর সেনাপতিত্বে আজীফ ইব্‌ন আম্বাসাকে নিয়োগ করলেন। এবম্বিধ ব্যবস্থা গ্রহণের পর তিনি রোমান সাম্রাজ্যে ঢুকে পড়লেন। গোটা বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করলেন আজীফ ইব্‌ন আম্বাসাকে। সুলুকিয়ায় পৌঁছে নদী তীরে তাঁর শিবির স্থাপন করলেন। স্থানটি ছিল তারতুস থেকে একদিনের পথের দূরত্বে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, খলীফা মু'তাসিম বিল্লাহ্ ইতিমধ্যেই আফশীনকে আর্মেনিয়া ও আযারবায়জানের গভর্নর নিযুক্ত করে আর্মেনিয়ার দিকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আফশীন আর্মেনিয়া থেকে আপন লোক-লশকর নিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে রোম সাম্রাজ্যে ঢুকে পড়েন। মুসলিম বাহিনীর একটি দল অগ্রসর হয়ে আঙ্কুরা দখল করে ফেলে। সেখানে প্রচুর খাদ্য-শস্য মুসলমানদের দখলে আসে– যা তখন তাদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় ছিল। রোম সম্রাট মুসলিম বাহিনীর আগমনের সংবাদ পেয়ে আঙ্গুরায় তাদের মুখোমুখি হতে মনস্থ করলেন, কেননা এখানেই সর্ববিধ রসদপত্র ও খাদ্য-শস্যের সংকুলান ছিল। কিন্তু এখানে নিযুক্ত তাঁর সৈন্যবাহিনী ও সেনাধ্যক্ষদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে তার অসন্তুষ্ট বাহিনী পশ্চাদপসরণ করে। এ সময় স্বয়ং রোম সম্রাট আফশীনকে প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে আর্মেনিয়া সীমান্তের দিকে অগ্রসর হন। সেখানে পরাস্ত হয়ে তিনি আঙ্গুরার দিকে পশ্চাদপসরণ করে দেখতে পান যে, ইতিমধ্যেই আঙ্গুরা মুসলমানদের দখলে চলে গিয়েছে। অগত্যা তিনি আর্মেনিয়ার দিকে অগ্রসর হন এবং যুদ্ধের সমস্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। চতুর্দিক থেকে যুদ্ধসামগ্রী এনে যুদ্ধের সামগ্রিক প্রস্তুতি গ্রহণে আত্মনিয়োগ করেন। এ দিকে খলীফা মু'তাসিম

আঙ্গুরায় অবস্থান করে সেনাপতি আফশীনের অপেক্ষায় থাকেন। আফশীন সেখানে উপস্থিত হয়ে খলীফার সাথে সহাবস্থানের গৌরব অর্জন করেন।

২২৩ হিজরীর শাবান (৮৩৮ খ্রি-এর জুলাই) মাসের শেষ দিকে খলীফা মু'তাসিম তাঁর লোক-লশকর নিয়ে আঙ্গুরা থেকে পুনরায় যাত্রা করেন। এ যাত্রায় যুদ্ধের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করে তিনি আফশীনকে দক্ষিণ বাহিনীর এবং আশনাছকে বাম বাহিনীর সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। নিজে ব্যূহের মধ্যবর্তী অবস্থানের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। মুসলিম বাহিনী অগ্রসর হয়ে আমুরিয়া নগরী অবরোধ করে বসে। তারা মোর্চা কায়েম করে সাবাত এবং দাব্বাবার সাহায্যে নগর-প্রাচীরের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। এ অবরোধ ২২৩ হিজরীর ৬ই রমযান (৮৩৮ খ্রি-এর জুলাই-সেপ্টেম্বর) থেকে শাওয়াল মাসের শেষ অবধি দীর্ঘ দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়। অবশেষে মুসলমানরা আমুরিয়া বিজয় করে সেখানকার লোকদের বন্দী ও হত্যা করে। যুদ্ধলব্ধ দ্রব্যসম্ভার মু'তাসিম ৫ দিন পর্যন্ত লোক-লশকর দিয়ে বিক্রি করান এবং অবশিষ্ট সবকিছু পুড়িয়ে দেন। তারপর আমুরিয়া নগরীকে ধূলিসাৎ করার নির্দেশ দেন। তাঁর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয়। রোম সম্রাট নাওফিল পলায়ন করে কনসটান্টিনোপলে চলে যান। খলীফা মু'তাসিম বন্দীদেরকে আপন সেনাধ্যক্ষদের মধ্যে ভাগ-বণ্টন করে তারতূসের দিকে যাত্রা করেন।

আব্বাস ইব্‌ন মামূনের হত্যা

সেনাপতি আজীফ ও আফশীনের মধ্যে দ্বন্দ্ব লেগেই ছিল। খলীফা মু'তাসিম প্রায়ই আজীফের কাজকর্মের সমালোচনা করতেন এবং আফশীনের মুকাবিলায় এতে তাঁর অবমাননা হতো। ফলে আজীফের বিশ্বস্ততা বিঘ্নিত হলো। তিনি খলীফা মু'তাসিমের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। ফলে রোম সাম্রাজ্যে অভিযান চলাকালে তিনি খলীফা মামূনের পুত্র তাঁর সহযাত্রী আব্বাসকে লক্ষ্য করে বললেন, মু'তাসিমের হাতে বায়আত করে আপনি বড্ড ভুল করে ফেলেছেন। আপনি নিজে খলীফা পদপ্রার্থী হলে সেনাধ্যক্ষরা আপনাকেই খলীফারূপে বরণ করতে আগ্রহী ছিলেন। আব্বাস তাঁর এই কথায় অনেকটা প্রভাবান্বিত হয়ে পড়েন। আজীফের এরূপ পৌনপুনিক প্ররোচনায় আব্বাসের মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। স্থির হয়, গোপনে গোপনে প্রথমে সেনাপতিদেরকে বশে আনতে হবে। তার যুগপৎ আক্রমণ চালিয়ে মু'তাসিম, আফশীন ও আশনাসকে হত্যা করে আব্বাসের খলীফা পদে আসীন হওয়ার কথা ঘোষণা করতে হবে। সলাপরামর্শ অনুসারে কাজ শুরু করে সৈন্যবাহিনীর এক বিরাট অংশকে খলীফারূপে আব্বাসকে বরণের জন্য প্রস্তুত করা হলো। কিন্তু আমুরিয়া জয়ের পরে সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনকালে পথিমধ্যে মু'তাসিম এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবগত হন।

সর্বপ্রথম মু'তাসিম আব্বাসকে ডেকে গ্রেফতার করেন এবং তাঁকে আফশীনের হাতে তুলে দেন। তারপর মাশ্‌শার ইব্‌ন সাহল উমর ফারগানী ও আজীফকে পর পর গ্রেফতার করেন। সর্বাগ্রে মাশ্‌শার ইব্‌ন সাহলকে হত্যা করা হলো। তারপর বান্‌জ নামক স্থানে পৌঁছে আব্বাস ইব্‌ন মামূনকে একটি বস্তায় পুরে বস্তার মুখ সেলাই করে দেয়া হলো। এ অবস্থায়ই দম বন্ধ হয়ে তিনি মারা গেলেন। তারপর নাসীবাঈন নামক স্থানে পৌঁছে একটি গর্ত খুঁড়ে উমর

কারপানীকে জীবন্ত প্রোথিত করা হলো। মুওসেল পৌঁছে আজীফকেও একটি বস্তায় পুরে বস্তার মুখ সেলাই করে দেওয়া হলো। ফলে, দম বন্ধ হয়ে তারও মৃত্যু হলো। সামেরায় পৌঁছে খলীফা মামূনুর রশীদের অবশিষ্ট সন্তানদেরকে গ্রেফতার করে একই ঘরে সকলকে আবদ্ধ করে রাখা হলো। একে একে সকলেই সেখানে মৃত্যুবরণ করলেন। মোটকথা, এই যাত্রায় খলীফা মু'তাসিম বিদ্রোহের সাথে জড়িত বলে সন্দেহকৃত সকলকেই বেছে বেছে হত্যা করলেন।

তাবারিস্তানের বিদ্রোহ

তাবারিস্তানের রঈস মাযইয়ার ইব্‌ন কারিন ছিলেন খুরাসানের গভর্নল আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহিরের অধীন। তিনি তাঁকে খারাজ দিতেন। কোন কারণে মাযইয়ার ও আবদুল্লাহর মধ্যে অসন্তুষ্টির সৃষ্টি হলো। মাযইয়ার বললেন, আমি রাজধানীতে সরাসরি খলীফার কাছে খারাজ প্রেরণ করবো– আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহিরের কাছে নয়। আবদুল্লাহ্ এতে অসন্তুষ্ট হন। তিনি একে তাঁর মর্যাদার পরিপন্থী বলে মনে করলেন। কিছুদিন পর্যন্ত এ বিরোধ অব্যাহত থাকে। মাযইয়ার সরাসরি কেন্দ্রে খারাজ পাঠিয়ে দিতেন। সেখান থেকে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহিরের প্রতিনিধির কাছে তা হস্তান্তরিত হতো।

বাবকের সাথে যুদ্ধ চলাকালে সেনাপতি আফশীন স্বাধীনভাবে খরচের অধিকার লাভ করেন। মু'তাসিম অহরহ তাঁর কাছে টাকা-পয়সা রসদপত্র প্রেরণ করতেন আর আফশীন অত্যন্ত কৃপণতার সাথে অর্থ ব্যয় করে উদ্বৃত্ত অর্থ তাঁর স্বদেশ আশরুসনায় (তুর্কিস্তান এলাকায়) পাঠিয়ে দিতেন।

আযারবায়জান থেকে প্রেরিত এ সব দ্রব্যসম্ভার যেত খুরাসান হয়ে। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহির যখন জানতে পারলেন যে, আফশীন অহরহ রসদপত্র, অর্থ-সম্পদ ও সমর-সম্ভারাদি তার মাতৃভূমিতে প্রেরণ করেছেন তখন তাঁর মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়। তিনি এ সব দ্রব্যসম্ভারের বাহকদেরকে বন্দী এবং সমস্ত দ্রব্যসম্ভার ছিনিয়ে নিয়ে আটক করলেন। সাথে সাথে আফশীনকে পত্র লিখলেন যে, আপনার বাহিনীর কতিপয় ব্যক্তি অমুক অমুক দ্রব্যসম্ভার নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় আমি তাদেরকে বন্দী করেছি এবং দ্রব্যসম্ভার আমার সৈন্যবাহিনীর মধ্যে ভাগবন্টন করে দিয়েছি। কেননা আমি তুর্কিস্তানের উপর আক্রমণ করতে মনস্থ করছি এবং সে প্রস্তুতি গ্রহণ করছি। অবশ্য সেই সব লোকজন নিজেদেরকে আপনার লোক এবং আপনার প্রেরিত বলে পরিচয় দিয়েছে এবং নিজেরা চোর নয় বলে আমার কাছে প্রকাশ করেছে। কিন্তু আমি তাদের কথায় আস্থা স্থাপন করতে পারিনি। কেননা তারা যদি চোরই না হতো তা হলে অবশ্যই আপনি এ ব্যাপারে অবহিত থাকতেন। তাই তাদের বক্তব্যকে আমি কোনক্রমেই সঠিক বলে মেনে নিতে পারিনি। পত্র পেয়ে আফশীন অত্যন্ত লজ্জিত হলেন এবং উত্তরে জানালেন, আসলে এরা চোর নয়, বরং আমার প্রেরিত লোক। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহির এ পত্রের জবাব পেয়ে বন্দীদেরকে মুক্ত করে দিলেন। কিন্তু দ্রব্যসম্ভার আর ফেরত দিলেন না।

এর একটি গোপন রিপোর্ট আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহির খলীফা মু'তাসিম বরাবরে পাঠিয়ে দিলেন। বাহ্যত মু'তাসিম এ ব্যাপারে তেমন গুরুত্ব আরোপ করলেন না। প্রকৃত ব্যাপার ছিল

এই যে, আফশীন তার মাতৃভূমি আশরুসনাতে তার রাজত্ব কায়েমের প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন। তার ধারণা ছিল যে, বাবকের যুদ্ধ শেষে সামেরায় প্রত্যাবর্তন করার সাথে সাথে মামূন তাকে খুরাসানের গভর্নর নিযুক্ত করবেন। তখন তার নিজ গুরুত্ব প্রতিষ্ঠার সুবর্ণ সুযোগ হাতে আসবে। কিন্তু মু'তাসিম তাঁকে আযারবায়জান ও আর্মেনিয়ার গভর্নর নিয়োগ করলেন। এভাবে তাঁর খুরাসানের গভর্নর হওয়ার সাধ পণ্ড হয়ে গেল।

তারপরেই রোমের যুদ্ধ শুরু হলো। এ যুদ্ধে আফশীনকে অংশগ্রহণ করতে হলো। কিন্তু এবার স্বয়ং মু'তাসিম সাথে ছিলেন। শুরুর দিকে তিনি যদি কাউকে সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করে থাকেন তো তিনি হচ্ছেন আজীফ–যাকে আফশীন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী বলে বিবেচনা করতেন। আজীফের পরিণতির কথা ইতিপূর্বেই বিবৃত হয়েছে। এবার আফশীন এক নতুন চাল চাললেন। তিনি তাবারিস্তানের শাসক মার্জিয়ারকে গোপনে একটি পত্র লিখে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহিরের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করলেন। সে পত্রের মর্ম ছিল এরূপ ঃ

"যরথুস্ত্র ধর্মের এখন আপনি ও আমি ছাড়া আর কোন সাহায্যকারী নেই। বাবক এ ধর্মেরই সাহায্যার্থে সক্রিয় ছিল। কিন্তু আপন নির্বুদ্ধিতার জন্যেই সে ধ্বংস হয়ে গেল। সে আমার উপদেশের প্রতি মোটেই কর্ণপাত করেনি। এখনও একটা সুবর্ণ সুযোগ আছে। তা হচ্ছে, আপনি বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করুন। এরা আমি ছাড়া আর কাউকেই আপনার বিরুদ্ধে প্রেরণ করবে না এটা নিশ্চিত। বর্তমানে আমার কাছে সবচাইতে বড় ও শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী রয়েছে। আমি আপনার দলে ভিড়ে যাবো। তারপর আমাদেরকে দমনের উদ্দেশ্যে মাগরিবী, আরব ও খুরাসানী সৈন্যদের বাহিনী ছাড়া আর কেউ এগিয়ে আসবে না। মাগরিবী সৈন্যদের সংখ্যা একান্তই অল্প। আমাদের একটা ছোট্ট বাহিনীই তাদের মুকাবিলায় যথেষ্ট। আরবদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, একটি গ্রাস তাদের সম্মুখে দিয়ে পাথর দিয়ে মাথা গুঁড়িয়ে দেয়া যাবে। খুরাসানীদের জোরের অবস্থা হচ্ছে ফুটন্ত দুধের মত– ফুঁসে উঠে পরক্ষণেই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। একটু শক্তভাবে আঘাত করলেই তাদের অবসান ঘটতে পারে। আপনি যদি একটু সাহস করেন তা হলে আযারবায়জানের সেই পুরোনো ধর্ম আবারো প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।"

মাযইয়ার পত্রখানি পাঠ করে অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করেন। প্রজাসাধারণের নিকট থেকে এক বছরের অগ্রিম রাজস্ব আদায় করে সমর-সম্ভার ক্রয় ও দুর্গ প্রাকারাদির সংস্কার সম্পন্ন করে বড় বাহিনীর মুকাবিলার জন্যে প্রস্তুত হয়ে বসেন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহির মাযইয়ারের বিদ্রোহের সংবাদ পাওয়া মাত্র আপন চাচা হাসান ইব্‌ন হুসাইনকে একটি বাহিনী সাথে দিয়ে এ বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। এদিকে মু'তাসিমের নিকট যখন এ বিদ্রোহের সংবাদ পৌঁছলো তখন তিনিও রাজধানী থেকে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহিরের সাহায্যার্থে বাহিনী প্রেরণের ফরমান জারি করলেন। কিন্তু আফশীনকে সেদিকে গমনের নির্দেশ দিলেন না। ফলে মাযইয়ার বন্দী হয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহিরের নিকট নীত হলেন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহির তাকে মু'তাসিমের দরবারে পাঠিয়ে দিলেন। হাসান ইব্‌ন হুসাইন যখন মাযইয়ারকে গ্রেফতার করেন তখন ঘটনাক্রমে আফশীনের উপরোল্লিখিত পত্রগুলো এবং এমর্মে আরো কিছু চিঠিপত্রও উদ্ধার করেন– যা মাযইয়ার আফশীনের কাছে

প্রেরণ করেছিলেন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহির এ পত্রগুলোও খলীফা মু'তাসিমের কাছে পাঠিয়ে দিলেন, কিন্তু খলীফা তা সযত্নে তাঁর নিজের কাছে রেখে দিলেন এবং বাহ্যত এগুলোর প্রতি কোন গুরুত্বই আরোপ করলেন না। এটা ২২৪ হিজরীর (৮৩৮ খ্রি) ঘটনা।

কুর্দিস্তানের বিদ্রোহ

তাবারিস্তানের বিদ্রোহ দমিত হতে না হতেই মুসেল এলাকায় জা'ফর ইব্‌ন ফিহের নামক জনৈক কুর্দী কুর্দদের এক বিরাট সংখ্যক লোককে সমবেত করে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করে। এ প্রদেশটি যদিও আযাবরায়জান এবং আর্মেনিয়া প্রদেশ সন্নিহিত ছিল, এতদসত্ত্বেও মু'তাসিম তাকে দমনের জন্যে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ আনাসকে জা'ফরকে দমনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করলেন। তিনি এ যাত্রায়ও আফশীনকে পাঠালেন না। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ তথায় উপনীত হয়ে ব্যূহ রচনায় মনোনিবেশ করলেন। ২২৪ হিজরীর (৮৩৮ খ্রি) শেষ নাগাদও এ যুদ্ধের অবসান ঘটলো না দেখে মু'তাসিম তাঁর এক সেনাপতি ঈতাখকে একটি বিপুল সংখ্যক সৈন্যের বাহিনী দিয়ে বিদ্রোহ দমনে প্রেরণ করলেন। জা'ফর ইব্‌ন ফিহের যুদ্ধে নিহত হলো। তার সঙ্গী-সাথীরা নিহত ও বন্দী হলো। এ বিদ্রোহও সম্ভবত আফশীনের ইঙ্গিতে দেখা দিয়েছিল। ২২৫ হিজরীতে (৮৩৯ খ্রি) এ বিদ্রোহের অবসান ঘটে।

আর্মেনিয়া ও আয়ারবায়জানের বিদ্রোহ

আফশীন তাঁর জনৈক আত্মীয় মুনকাজারকে আয়ারবায়জানে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে নিজে রাজধানীতে অবস্থান করতেন। মুনকাজার আযারবায়জানের এক পল্লীতে জনৈক খুরাসানীর প্রচুর গুপ্তধন লাভ করলেন। কিন্তু খলীফাকে তা অবগত না করে নিজে আত্মসাৎ করেন। মু'তাসিমের ঘটনা-পঞ্জিকাকার এ ঘটনার কথা মু'তাসিমকে অবহিত করেন। মুনকাজার তা অবগত হয়ে পঞ্জিকাকারকে হত্যা করতে উদ্যত হন। পঞ্জিকাকার আর্দবিলবাসীদের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। আর্দবিলবাসীরা মুনকাজারকে বাধা দিলে সে তাদেরকে হত্যার জন্য উদ্যত হয়। মু'তাসিম তা অবগত হয়ে মুনকাজারকে বরখাস্ত করে বরখাস্তপত্র আফশীনের কাছে পাঠিয়ে দেন এবং বগাকবীরকে মুনকাজারের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার জন্য ফৌজসহ আযারবায়জানের দিকে পাঠিয়ে দেন। সংবাদ পেয়ে মুনকাজার বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং আর্দবিল থেকে বের হয়ে বগাকবীরের বাহিনীর সাথে মুখোমুখি যুদ্ধে লিপ্ত হলো। যুদ্ধে মুনকাজার পরাস্ত হলো এবং আর্দবিল বগাকবীরের দখলে আসলো। মুনকাজার পালিয়ে আযারবায়জানের একটি দুর্গের অভ্যন্তরে ঢুকে দুর্গের দ্বার বন্ধ করে দিল। প্রায় এক মাসকাল দুর্গবন্দী থাকার পর তার সাথীরাই কোন এক অলস মুহূর্তে তাকে বন্দী করে বগাকবীরের হাতে অর্পণ করে। বগাকবীর তাকে সামাররায় নিয়ে এসে খলীফা মু'তাসিমের হাতে অর্পণ করলেন। খলীফা তাকে কারাগারে পাঠিয়ে দেন।

আফশীনের ভীষণ পরিণতি

উপরোক্ত ঘটনায় আফশীনের ব্যাপারে খলীফার সন্দেহ ঘনীভূত হলো। আফশীনও টের পেলেন যে, খলীফা তার প্রতি ঘোর সন্দিহান। তাই তিনি রাজধানী থেকে পালিয়ে যাবার

ফন্দি-ফিকির করতে লাগলেন। প্রথমে তিনি আপন প্রদেশ আযারবায়জান ও আর্মেনিয়া হয়ে খযর অঞ্চল দিয়ে মাতৃভূমি আশরুসনা (মাওরাউন নাহর) চলে যেতে মনস্থ করলেন। কিন্তু খলীফা মু'তাসিম যেহেতু মুনকাজার-এর স্থলে তাঁর নিজ লোককে স্থলাভিষিক্ত করে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তাই সেখানে তার নিরাপত্তা ছিল না, তাই তাঁর এ উদ্দেশ্য সফল হলো না।

এরপর তিনি খলীফা, মন্ত্রী-মুসাহেব ও সর্দারগণকে আমন্ত্রণ করে সারাদিন ভোজে আপ্যায়ন করে ব্যস্ত রেখে সন্ধ্যা সমাগমে তারা যখন ক্লান্ত-শ্রান্ত-অবসন্ন হয়ে শুয়ে পড়লেন তখন অবসর বুঝে পালিয়ে যেতে মনস্থ করেন। এ ব্যাপারে পুরোপুরি মনস্থির করার পূর্বেই ঘটনাচক্রে একদিন তিনি কোন কারণে রুষ্ট হয়ে ঘনিষ্ঠতম ভৃত্যকে একটু গালমন্দ করেন। ভৃত্যটি তখন সেনাপতি ঈতাখের কাছে এসে আফশীনের গোপন ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করে দেয়। ঈতাখ তৎক্ষণাৎ ভৃত্যকে সঙ্গে করে খলীফার সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং সমস্ত ব্যাপার খলীফাকে অবহিত করেন। খলীফা কালবিলম্ব না করে আফশীনকে দরবারে ডেকে পাঠালেন এবং তার গায়ের উর্দি খুলে নিয়ে তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করলেন। তাৎক্ষণিকভাবে তার বিরুদ্ধে আর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন না। তারপর খুরাসানের গভর্নর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহিরকে এ মর্মে ফরমান লিখে পাঠালেন যে, অবিলম্বে মাওরাউন নাহরের শাসকরূপে নিযুক্ত আফশীন তনয় হাসানকে আশরুসনার তার বাসভবন থেকে বন্দী করে রাজধানীতে পাঠিয়ে দাও। হাসান ইব্‌ন আফশীন প্রায়ই বুখারার শাসনকর্তা নূহ্ ইব্‌ন আসাদের বিরুদ্ধে অনুযোগ করতেন।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহির হাসান ইব্‌ন আফশীনকে এ মর্মে পত্র লিখলেন যে, আমি তোমাকে বুখারারও শাসক নিযুক্ত করলাম। তুমি বুখারায় গিয়ে আমার এ পত্র নূহ্ ইব্‌ন আসাদকে দেখিয়ে বুখারার শাসনভারও আপন হস্তে তুলে নাও। এদিকে বুখারার শাসক নূহ্ ইব্‌ন আসাদকে ইতিপূর্বে তিনি এ মর্মে লিখে পাঠান যে, হাসান ইব্‌ন আফশীনকে আমি তোমার কাছে পাঠাচ্ছি। বুখারায় প্রবেশমাত্র তুমি তাকে গ্রেফতার করে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে। সত্যি সত্যি এভাবে হাসান ইব্‌ন আফশীন গ্রেফতার হয়ে মার্ভে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহিরের দরবারে নীত হলেন।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহির বন্দী আফশীন তনয়কে মু'তাসিমের দরবারে পাঠিয়ে দিলেন। খলীফার দরবারে তার আগমন মাত্র খলীফা উযীরে আযম মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল মালিক কাযী আহ্মদ ইব্‌ন আবূ দাঊদ, ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ও আরো কতিপয় পারিষদকে নিয়ে গঠিত একটি কমিশনের হাতে আফশীনের তদন্ত ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব অর্পণ করলেন। খলীফা মু'তাসিম তাৎক্ষণিকভাবে আফশীনকে হত্যার নির্দেশ দিতে পারতেন। কিন্তু অন্য সর্দাররাও গোপনে ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকতে পারেন এই সন্দেহে তিনি ত্বরিত সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিরত থাকেন। এটা ছিল তাঁর অত্যন্ত প্রজ্ঞার পরিচায়ক। কেননা তিনি যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেন তাতে কোনরূপ সেনা অসন্তোষের অবকাশ ছিল না।

মু'তাসিম আফশীনের দুরভিসন্ধি সম্পর্কে সম্যক অবহিত হয়েছিলেন। বাবকের সাথে যুদ্ধ চলাকালেই তিনি অবহিত হয়েছিলেন যে, আফশীন ইতিপূর্বেই তার যে পুত্রকে আশরুসনার

আমিল নিযুক্ত করিয়ে নিয়েছিলেন; তার কাছে রাজকীয় বাহিনীর রসদপত্র গোপনে পাঠাচ্ছিলেন। কিন্তু তখন আফশীন এমন এক দুর্ধর্ষ বিদ্রোহীর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছিলেন যে, দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে অপরাজিত রয়ে খলীফাকে বিব্রত করে রেখেছিল। তাই মু'তাসিম এ ব্যাপারে টু শব্দটিও করেন নি। বাবকের যুদ্ধের সে কৃতিত্ব কোন মামুলী কৃতিত্ব ছিল না। তাই বাবকের যুদ্ধের অব্যবহিত পরে আফশীনকে তার কৃতিত্বের স্বীকৃতি ও পুরস্কার না দেয়া বা তার বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে শাস্তি প্রদান করা স্বয়ং মু'তাসিমের জন্য অত্যন্ত মারাত্মক হতো এবং এতে তাঁর দুর্নাম হতো। কৃতিত্বের পুরস্কার না দিলে তা তার অর্জনের নিদর্শন বলেই গণ্য হতো। এ ছাড়া তিনি তখনো আফশীনের মনোভাবের পরিবর্তনের ব্যাপারে আশাবাদী ছিলেন। কিন্তু আফশীনের চিঠিপত্র ও কার্যকলাপের দ্বারা যখন তার বিশ্বাসঘাতকতার ব্যাপারটি দিবালোকের মত স্বচ্ছ হয়ে উঠলো তখন তাঁর এছাড়া আর কোন গত্যন্তর ছিল না।

উযীরে আযম ও অন্যান্য সর্দারের সমন্বয়ে গঠিত কমিশন অত্যন্ত সতর্কতার সাথে আফশীনের মামলার শুনানী গ্রহণ ও তদন্তকার্য শুরু করলেন। প্রতিদিন কারাগার থেকে আফশীনকে আদালতে হাযির করা হতো এবং তার উপস্থিতিতেই সাক্ষীদের শুনানী গ্রহণ ও কাগজপত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষা হতো। মাযইয়ারকেও কারাগার থেকে সাক্ষীরূপে আদালতে হাযির করা হলো। আফশীনকে তার স্ব-লিখিত পত্রগুলো দেখানো হলো এবং পড়ে শুনানো হলো। আফশীন সবকিছু স্বীকার করলেন। মাযইয়ারও অকপটে সকল ব্যাপার খুলে বললেন। তারপর যে সব তথ্য প্রকাশিত হলো তাতে আফশীনের মুনাফিক হওয়ার কথা সুপ্রমাণিত হলো। তদন্তে প্রমাণিত হলো যে, সে কুরআন শরীফ, মসজিদ এবং মসজিদের ইমামগণের প্রতি অবমাননা প্রদর্শন করতো। যরথুস্ত্রের ধর্মগ্রন্থ প্রতিদিন সে পাঠ করতো এবং সর্বক্ষণ তা সাথে রাখতো। নবী করীম (সা)-এর শানে বেআদবী করতো, অথচ বাহ্যত মসজিদে হাযির হয়ে মুসলমানদের সাথে জামাআতে সালাতও আদায় করতো এবং ইসলামী নিয়ম-কানুন মেনে চলতো। মোদ্দাকথা, অকাট্যভাবে তার অমুসলিম মজুসী হওয়ার এবং মুসলমানদেরকে ধোঁকা দিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের সিংহাসন দখল করে মজুসী রাষ্ট্র কায়েমের ষড়যন্ত্র প্রমাণিত হলো। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে মোকদ্দমার শুনানী ও তদন্তকর্ম সম্পন্ন হলো। মাযইয়ারকে চারশ বেত্রাঘাত এবং আফশীনকে মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হলো। মাযইয়ার বেত্রাঘাত সহ্য করতে না পেরে প্রাণত্যাগ করলো এবং আফশীনকে শূলিতে চড়ানো হলো। দৃষ্টান্তমূলক ও শিক্ষণীয় শাস্তি হিসাবে এ শূলিতে ঝুলানোর কাজটি প্রকাশ্যে সম্পন্ন করা হলো। এটি ২২৬ হিজরীর শাবান (৮৪১ খ্রি জুন) মাসের ঘটনা। আফশীনের স্থলে ইসহাক ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মুআয প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হলেন।

মু'তাসিমের মৃত্যু

আফশীন সংকটের সুরাহা করে খলীফা মু'তাসিম বিল্লাহ্ তাঁর অধীনস্থ গোটা সাম্রাজ্যের সীমান্তসমূহের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হলেন। তারপর এ ব্যাপারেও যখন পূর্ণ নিশ্চিন্ত হলেন যে, দেশের অভ্যন্তরে কোন বিদ্রোহ বা অসন্তোষের আশংকা নেই; তিনি বললেন, যখন বনূ

উমাইয়ারা শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল তখন আমরা শাসন ক্ষমতার কোন অংশই ভোগ করিনি। কিন্তু এখন আমাদের শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বনূ উমাইয়ারা স্পেনে দিব্যি রাজত্ব করে যাচ্ছে। তাই এখন পশ্চিমাঞ্চলে (মাগারিতে) হামলা চালিয়ে সে রাজত্বও ছিনিয়ে নেয়া আমার কর্তব্য। সত্যি সত্যি আপন রাজকোষে, যুদ্ধসামগ্রী ও সামরিক প্রস্তুতির একটি নিরিখ নিয়ে তিনি আন্দালুস (স্পেনে) আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগলেন। এমনি সময় সংবাদ আসলো যে, ফিলিস্তীনে বসবাসকারী আবূ হারব ইয়ামানী যে নিজেকে বনূ উমাইয়া বংশীয় লোক বলে পরিচয় দিয়ে থাকে– সে তার চতুর্দিকে প্রায় এক লক্ষ লোক জুটিয়ে নিয়ে বিদ্রোহের পাঁয়তারা করছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, একদিন ফিলিস্তীনে অবস্থানকারী উক্ত আবূ হারব কোন এক কার্য উপলক্ষে বাইরে গিয়েছিল। সে সময় জনৈক সৈন্য তার গৃহে পদার্পণ করে এবং রাত্রি যাপনের ইচ্ছা ব্যক্ত করে। বাড়ির রমণীরা সৈন্যটিকে স্থান দিতে অসম্মতি প্রকাশ করে। কিন্তু সৈন্যটি রমণীদেরকে প্রহার করে বলপূর্বক বাড়ির পুরুষদের থাকার অংশে রাত্রি যাপন করে। আবূ হারব বাইরে থেকে এসে সৈন্যটির বলপূর্বক বাড়িতে অবস্থান এবং নারীদের প্রতি তার দুর্ব্যবহারের সংবাদ অবহিত হয়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং তাকে হত্যা করলেন। এদিকে শাসকের পক্ষ থেকে শাস্তির ভয়ে তিনি পার্শ্ববর্তী জর্দানী এলাকার একটি পাহাড়ে গিয়ে আত্মগোপন করলেন। তিনি তাঁর চেহারার ওপর একটি নেকাব ব্যবহার করে গ্রামাঞ্চলে ওয়ায-নসীহত করে বেড়াতে লাগলেন। দেখতে দেখতে তাঁর চারপাশে লক্ষাধিক ভক্ত জুটে গেল। খলীফার সাথে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে তারা তাঁর পতাকা তলে সমবেত হলো। মু'তাসিম রাজা ইব্ন আইউবকে এক হাজার অশ্বারোহী সৈন্য দিয়ে তাকে দমনের জন্যে প্রেরণ করলেন। কিন্তু রাজা ইব্ন আইউব আবূ হারবের বিপুল সংখ্যক ভক্ত দেখে ভড়কে যান। তিনি যুদ্ধ শুরু করতে পিছপা হলেন। তিনি ভাবলেন আবূ হারবের কৃষিজীবী ভক্তদের কৃষিকার্যে মনোযোগী হওয়ার মওসুম আসার পূর্বে যুদ্ধ শুরু করা সমীচীন হবে না। এই অবস্থায়ই ২২৭ হিজরীর ২০শে রবিউল আউয়াল (৮৪২ খ্রি-এর ৯ই জানুয়ারী) খলীফা মু'তাসিম বিল্লাহ্র ইন্তিকাল হয়। বনূ উমাইয়ার সাথে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার বাসনা তাঁর পূর্ণ হয়নি।

খলীফা মু'তাসিম বিল্লাহ্র মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ওয়াছিক বিল্লাহ্ আব্বাসী সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রজাসাধারণ নতুনভাবে তাঁর হাতে বায়আত হয়। মু'তাসিমের জানাযার নামাযের ইমামতি করেন ওয়াছিক বিল্লাহ্। সামার্রায় তাঁকে দাফন করা হয়।

মু'তাসিমের খিলাফতের বৈশিষ্ট্য

খলীফা মু'তাসিম যেহেতু তেমন শিক্ষিত ছিলেন না তাই তাঁর আমলে হারূনুর রশীদ ও মামূনের যুগের সেই জ্ঞানচর্চার জোর আর ছিল না। মু'তাসিম দেশ জয় ও যুদ্ধ-বিগ্রহে অধিক উৎসাহী ছিলেন। তাঁর শাসন আমলে রোম, খযররাজ্য, মাওরাউন নাহর, কাবুল, সিস্তান প্রভৃতি অঞ্চল বিজয় অর্জিত হয়। রোম সম্রাটের উপর তিনি যে মরণ আঘাত হানেন ইতিপূর্বে কোন মুসলিম শাসকের পক্ষে তেমন আঘাত হানা হয়নি। রোমের যুদ্ধ ও আমুরিয়া বিজয়ের সময়

ত্রিশহাজার রোমান সৈন্যকে হত্যা এবং অপর ত্রিশ হাজার সৈন্যকে বন্দী করার মাধ্যমে রোমানদের মনে তিনি ত্রাসের সঞ্চার করেন। তাঁর দরবারে যত রাজরাজড়ার আগমন ঘটে তেমনটি আর কোন মুসলিম খলীফার দরবারে হয়নি। মু'তাসিম স্থাপত্য শিল্পেরও একজন শৌখিন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর বাবুর্চিখানার প্রাত্যহিক ব্যয় ছিল এক হাজার দীনার।

তুর্কী গোলাম ক্রয় এবং তাদের সংখ্যাবৃদ্ধির দিকেও মু'তাসিমের খুব ঝোঁক ছিল। তিনি তাঁর খাস তুর্কী গোলামদেরকে বড় বড় সেনাপতির পদও দিয়েছিলেন। তাঁর আমলে তুর্কীদের প্রভূত উন্নতি ও অগ্রগতি সাধিত হয়। স্বল্পকালের মধ্যেই তুর্কীরা শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নতি করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখে। এর দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ইতিপূর্বে আরবদের মর্যাদা খর্বকারী খুরাসানীদের শক্তি ও মর্যাদা খর্ব করা। কালক্রমে এই তুর্কীরাই আব্বাসী খিলাফতের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মু'তাসিম এক-তৃতীয় শক্তিকে উদ্ভব ঘটিয়ে বিরাট ভুল করেন। অথচ তাঁর করণীয় ছিল আরবদের মধ্যে পুনঃশক্তি সঞ্চার করে তাদেরকে খুরাসানীদের মুকাবিলায় দাঁড় করিয়ে দেয়া। কিন্তু তাঁর বাপ-দাদারা যেহেতু পূর্ব থেকেই আরবদের পরিবর্তে খুরাসানীদের অধিকতর বিশ্বস্ত ও আপন বিবেচনা করে আসছিলেন তাই পিতৃপুরুষের সেই রীতিনীতিকে রাতারাতি পরিবর্তন করে নতুন পন্থা অবলম্বনে তিনি সাহসী হননি।

মুতাসিম খুরাসানীদের পূর্বের বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্রের কথাও সম্যক অবগত ছিলেন। তিনি জানতেন কেমন করে তাঁর বাপ-দাদারা বারবার খুরাসানী ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছেন এবং এ সব ষড়যন্ত্রকে ভণ্ডুল করতে তাঁদের কত বেগ পেতে হয়েছে। তিনি এটাও জানতেন যে, তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বী উলুভীদের কী বিপুল প্রভাব আরব ও খুরাসানীদের উপর বিদ্যমান রয়েছে। উলুভীরা অহরহ এ দুই শক্তির সাহায্যও লাভ করে থাকেন। এমতাবস্থায় মু'তাসিম যদি উলুভীদের প্রভাবমুক্ত তৃতীয় একটি শক্তি গড়ে তোলেন তবে এজন্যে তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তুর্কীরা তখনও ইসলামের সাথে তেমন ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়ে ওঠেনি। তুর্কীদেরকে অনেক পূর্বেই পরাভূত করে বশ্যতা শৃংখলে আবদ্ধ করলেও তাদের মধ্যে কিন্তু ইসলামের সুষ্ঠু প্রচার হয়নি। এর একটা বড় কারণ হচ্ছে তুর্কী এলাকাসমূহ যা মাওরাউন নাহর বলে খ্যাত—সাধারণত করদ তুর্কী প্রধানদের দ্বারাই শাসিত হতো। তারা কেবল ইসলামী খিলাফতকে রাজস্ব প্রদান করেই ক্ষান্ত হতো। তাদেরকে নিয়ে কেউ আর মাথা ঘামাতো না।

এহেন নওমুসলিম তুর্কীরা যখন লক্ষ্য করলো যে, প্রভূত উন্নতি করে তারাই এখন বিশাল ইসলামী সাম্রাজ্যের বৃহত্তম সামরিক শক্তি, তখন তারা ইসলামী খিলাফতের সিংহাসন দখলের স্বপ্নে বিভোর হলো। আফশীনের ঘটনাবলীতে সেই সত্যই বিধৃত হয়েছে। খলীফা মু'তাসিম অজ্ঞ হলেও অত্যন্ত বিচক্ষণ ছিলেন। তুর্কীদেরকে সামরিক বাহিনীতে ভর্তি করে শক্তিশালী বানানোর যে নীতি তিনি অবলম্বন করেছিলেন তার অনিষ্টকারিতা দূর করার মত যোগ্যতা ও বিচক্ষণতাও তাঁর মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় ছিল। তাই তাঁর জীবদ্দশায় তুর্কীদের হাতে ইসলামী হুকুমতের কোন অনিষ্টও সাধিত হয়নি। তাঁর উত্তরাধিকারীরাও যদি তাঁর মত বিচক্ষণ ও দূরদর্শী হতেন বা তিনি যদি আরো কিছুদিন বেঁচে থাকতেন তবে পরবর্তীকালে তুর্কীদের দ্বারা সৃষ্ট সমস্যাবলীর উদ্ভবই হতো না।

গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, এ সবই কল্পনামাত্র। আসলে সবচাইতে অনিষ্টকর ব্যাপার ও ত্রুটি ছিল এই যে, মুসলিম জাতির জন্য বংশানুক্রমিক রাজত্ব বা রাজতন্ত্রের অভিশাপকে স্বীকার করে নেয়া। পিতার পর পুত্রের সিংহাসনে আসীন হওয়ার এই ক্ষতিকর বিদআতই ইসলাম ও মুসলিম জাতির জন্য চরম বিপর্যয়কর প্রতিপন্ন হয়। সিদ্দীকী ও ফারূকী যুগের খিলাফতের কল্যাণকর ব্যবস্থা বিস্মৃত হয়ে যাওয়ায় মুসলমানদের দুর্দিন দেখা দেয়। 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন'। মোদ্দাকথা মু'তাসিমের খিলাফতের যুগেই তুর্কীদের নবজীবনের যাত্রা শুরু হয়।

মু'তাসিমকে খলীফায়ে মুছাম্মান বা আট সংখ্যার খলীফাও বলা যেতে পারে। কেননা তাঁর সাথে 'আট' সংখ্যার সম্পর্ক অত্যন্ত বেশি পরিলক্ষিত হয়। মু'তাসিম ছিলেন খলীফা হারূনুর রশীদের অষ্টম সন্তান। ১৮০ হিজরীতে (৭৯৬ খ্রি) মতান্তরে ১৭৮ হিজরীতে (৭৯৪ খ্রি) তার জন্ম। এ দু'টি সংখ্যায় ৮ রয়েছে। ২১৮ হিজরীতে (৮৩৩ খ্রি) তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। এখানেও ৮ সংখ্যাটি রয়েছে। আব্বাসীয় বংশের তিনি অষ্টম খলীফা। তাঁর আয়ুষ্কাল ছিল ৪৮ বছর। আটজন পুত্র ও আটজন কন্যা সন্তান রেখে তিনি ইনতিকাল করেন। তাঁর জন্ম বৃশ্চিক রাশিতে যা রাশিচক্রের অষ্টম রাশি। তাঁর রাজত্বকাল হচ্ছে আট বছর আট মাস আট দিন। আটটি প্রাসাদ তিনি নির্মাণ করেন। আটটি বড় বড় যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করেন। তাঁর দরবারে আটজন সম্রাটের আগমন ঘটে। আফশীন, আজীফ, আব্বাস, বাবক প্রমুখ আটজন প্রধান শত্রুকে তিনি হত্যা করেন। আট লাখ দীনার আট লাখ দিরহাম, আট হাজার অশ্ব, আট হাজার গোলাম ও আট হাজার বাঁদী তিনি তার উত্তরাধিকারীদের জন্যে রেখে যান। রবিউল আউয়াল মাসের আটদিন অবশিষ্ট থাকতে তিনি ইন্তিকাল করেন।

খলীফা মামূনুর রশীদের মতো খালকে কুরআনের পাগলামি তাঁর মগজকেও আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এমন একটি অপ্রয়োজনীয় ব্যাপারে তাঁর অধিক মনোনিবেশের ফলে অনেক আলিম-উলামায়ে কিরামকে তাঁর হাতে নির্যাতন সহ্য করতে হয়। এ ত্রুটিটি তাঁর জীবনে না থাকলে নিঃসন্দেহে তাঁকে আব্বাসীয় বংশের শ্রেষ্ঠ খলীফা বলে অভিহিত করা যেত। আব্বাসীয় বংশের প্রতাপ তাঁর আমলেই সমধিক বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাঁর পর ধীরে ধীরে এ বংশের পতনের লক্ষণসমূহ দেখা দিতে থাকে এবং ক্রমে ক্রমে তা নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে।

ওয়াছিক বিল্লাহ্

ওয়াছিক বিল্লাহ ইব্ন মু'তাসিম বিল্লাহ্ ইব্ন হারূনুর রশীদ ইব্ন মাহদী ইব্ন মানসূর আব্বাসীর কুনিয়াত আবূ জা'ফর বা আবুল কাসিম। তাঁর আসল নাম ছিল হারূন। মক্কার রাস্তায় কারাতীস নাম্নী দাসীর গর্ভে ২০শে শাবান ১৯৬ হিজরীতে (৮১২ খ্রি মে) মাসে তার জন্ম হয়। তাঁর পিতা মু'তাসিম বিল্লাহ্ তাঁকে সিংহাসনে উত্তরাধিকারী রাজকুমার রূপে মনোনীত করেন। মু'তাসিমের মৃত্যুর পর তিনি খলীফার আসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি অত্যন্ত গৌরবর্ণ লোক ছিলেন। তাঁর দাড়ি ছিল ঘন এবং সুন্দর। তাঁর শুভ্র গাত্র বর্ণের সাথে জরদ বর্ণের ঝলক পরিলক্ষিত হতো। চোখের শুভ্র অংশে কাল তিল দেখা যেত। তিনি ছিলেন একজন উচ্চাঙ্গের কবি ও সাহিত্যিক। আরবী সাহিত্যে তিনি মামূনের সমতুল্য বা তাঁর

চাইতেও উঁচুদরের সাহিত্যিক ছিলেন। দর্শনশাস্ত্রে কিন্তু তিনি মামূনের চাইতে নিম্ন পর্যায়ের ছিলেন। তিনি মামূনুর রশীদের জ্ঞানচর্চার মজলিসও দেখেছেন। জ্ঞানচর্চায় তিনি ভীষণ অনুরাগী ছিলেন। এ জন্যে তাঁকে ক্ষুদে মামূন বা দ্বিতীয় মামূন নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে।

ওয়াছিক বিল্লাহ্‌র এত বেশি আরবী কবিতা মুখস্থ ছিল যে, আব্বাসীয় বংশের অন্য কোন খলীফার এত বেশি কবিতা মুখস্থ ছিল না। আপন পিতা ও পিতামহের মতো তিনিও অত্যন্ত ভোজনবিলাসী ছিলেন। কবি-সাহিত্যিকদেরকে তিনি বড় বড় পুরস্কারে পুরস্কৃত করতেন। জ্ঞানীগুণীদের সমাদর করতেন। তাঁদের সাথে অত্যন্ত সম্মানজনক আচরণ করাকে জরুরী বলে বিবেচনা করতেন। কিন্তু খালকে কুরআনের পৈতৃক উন্মাদ এত বেশি তাঁকে পেয়ে বসেছিল যে, অনেক বড় বড় আলিমকে এ প্রশ্নে নিজ হাতে হত্যা করে তিনি পুণ্যলাভের তৃপ্তিবোধ করতেন।

অন্তিম বয়সে এমনি এক ঘটনা ঘটলো যাতে তাঁর 'খালকে কুরআন' সংক্রান্ত তৎপরতায় ভাটা পড়ে এবং তা একেবারে শূন্যের কোটায় নেমে আসে। ঘটনাটি ছিল এই— ইমাম আবূ দাঊদ ও ইমাম নাসাঈর উস্তাদ আবূ আবদুর রহমান আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইজদী খালকে কুরআন বিরোধী মতবাদ পোষণের অপরাধে বন্দী হয়ে তাঁর দরবারে নীত হন। তাঁকে যথারীতি খলীফার সম্মুখে উপস্থিত করা হলো। সেখানে কাযী আহমদ ইব্‌ন আবূ দাঊদও উপস্থিত ছিলেন। এই কাযী সাহেব মু'তাসিমের আমল থেকেই দরবারে প্রধানমন্ত্রীর সমমর্যাদা ভোগ করে আসছিলেন এবং তিনিও ঘটনাচক্রে খালকে কুরআনের ব্যাপারে খলীফার মতালবম্বী ছিলেন। অর্থাৎ তিনিও কুরআন শরীফকে সৃষ্ট ও অনিত্য বলে বিশ্বাস পোষণ করতেন। উক্ত কাযীকে আবূ আবদুর রহমান প্রশ্ন করলেন ঃ আচ্ছা, প্রথমে বলুন দেখি নবী কারীম (সা) নিজে এ খালকে কুরআনের ব্যাপারটি অবগত ছিলেন কিনা ?

জবাবে কাযী আহমদ বললেন ঃ অবশ্যই নবী করীম (সা) এটা জানতেন। তখন আবূ আবদুর রহমান আবার প্রশ্ন করলেন ঃ আচ্ছা, হুযূর (সা) কি লোকদেরকে কুরআন মাখলূক হওয়ার শিক্ষা দিয়েছেন ? কাযী আহমদ জবাবে বললেন ঃ না, হুযূর (সা) এরূপ কোন তা'লীম বা নির্দেশ দেন নি।

আবূ আবদুর রহমান তখন চিৎকার করে বললেন ঃ তা'হলে যে ব্যাপারে স্বয়ং হুযূর (সা) তা'লীম দেননি এবং এ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তিনি যেখানে লোকজনকে তা মানতে বাধ্য করেননি আপনারা এমন একটি ব্যাপারে লোকজনের মৌনতাকে কেন যথেষ্ট বিবেচনা করেন না বা তা মানতে কেনই বা আপনারা লোকজনকে বাধ্য করেন। এ কথাটি শোনামাত্র ওয়াছিক বিল্লাহ্‌র সম্বিত ফিরে এলো। তিনি তৎক্ষণাৎ দরবার থেকে উঠে আপন প্রাসাদে চলে গেলেন। তারপর একটি পালঙ্কে শয়ন করে বার বার বলতে লাগলেন ঃ যে ব্যাপারে স্বয়ং নবী করীম (সা) কোনদিন কড়াকড়ি করলেন না, মৌনতা অবলম্বন করলেন ঠিক সেই ব্যাপারটি নিয়েই আমরা কঠোরতা আরোপ করছি। তারপর তিনি এ মর্মে নির্দেশ জারি করলেন যে, আবূ আবদুর রহমানকে মুক্ত করে সসম্মানে তাঁর গৃহে প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা কর। সাথে সাথে তিনি তাঁকে ইনাম স্বরূপ তিনশ স্বর্ণমুদ্রা প্রদানেরও নির্দেশ দিলেন।

আবূ হারব ও দামেশ্‌কবাসী

খলীফা মু'তাসিমের আলোচনায় পূর্বেই বলা হয়েছে যে, রিযা ইব্‌ন আইউবকে মু'তাসিম আবূ হারব ইয়ামানীকে দমনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছিলেন। কিছুদিন অপেক্ষা করার পর তিনি আবূ হারবের সাথে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। এমনি সময় মু'তাসিম বিল্লাহর ইন্তিকাল এবং ওয়াছিক বিল্লাহর সিংহাসনে আরোহণের ঘটনা ঘটে। মু'তাসিমের মৃত্যু সংবাদ দামেশকে পৌঁছতেই দামেশকবাসীরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং তারা তাদের আমীরকে প্রাদেশিক রাজধানীতে গৃহে বন্দী করে। তারা যুদ্ধের প্রস্তুতিস্বরূপ লোক-লশকর সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয় এবং প্রচুর লোকবল যোগাড় করে।

এ সংবাদ রাজধানীতে পৌঁছামাত্র ওয়াছিক বিল্লাহ্ রিযা ইব্‌ন আইউবকে দামেশকবাসীদের প্রতি মনোনিবেশ করার এবং তাদেরকে সমুচিত শিক্ষাদানের নির্দেশ দিয়ে পাঠান। এ সময় রিযা ইব্‌ন আইউব রামাল্লায় আবূ হারবের সাথে মুখোমুখি যুদ্ধে রত ছিলেন। খলীফার উক্ত নির্দেশ পাওয়া মাত্র স্বল্পসংখ্যক সৈন্যকে আবূ হারবের সাথে যুদ্ধের জন্য রেখে অবশিষ্ট গোটা বাহিনী নিয়ে দামেশকের দিকে অগ্রসর হলেন। দামেশকবাসীরাও সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে তার জবাব দিল। প্রচণ্ড যুদ্ধে দামেশকবাসীদের দেড় হাজার এবং রিযা ইব্‌ন আইউবের দলের তিনশ লোক নিহত হলো। পরাস্ত হয়ে দামেশকবাসীরা সন্ধির আবেদন জানালো এবং এভাবেই এ বিদ্রোহের অবসান ঘটলো। দামেশকের বিদ্রোহ দমন করে রিযা ইব্‌ন আইউব পুনরায় রামাল্লায় যান এবং যুদ্ধে আবূ হারবকে পরাস্ত করে বন্দী করেন। আবূ হারবের বিশ হাজার সঙ্গী এ যুদ্ধে প্রাণ হারায়।

আশনাসের উত্থান ও পতন

খলীফা ওয়াছিক বিল্লাহ্ সিংহাসনে আরোহণ করেই তুর্কী গোলাম আশনাসকে তাঁর সহকারী খলীফা নিয়োগ করে সাম্রাজ্যের সর্বময় ক্ষমতা তারই হাতে তুলে দেন। মু'তাসিম বিল্লাহ্র আমলের উযীরে আযম মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল মালিক ইব্‌ন যাইয়াত ওয়াছিকের খিলাফত আমলেও স্বপদে বহাল থাকেন। আশনাসকে প্রদত্ত নায়েবে সালতানাত পদটি ছিল ওয়াছিক বিল্লাহর একান্তই নব উদ্ভাবিত।

নায়েবে সালতানাত খলীফার পূর্ণ ক্ষমতা নিজে ব্যবহার করতেন। তিনি পদমর্যাদায় রাজ্যের তাবৎ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মত উযীরে আযমেরও উর্ধ্বতন কর্তা বলে বিবেচিত হতেন। এ অবধি অন্য কোন খলীফা এরূপ সর্বময় ক্ষমতা অন্য কারো হাতে অর্পণ করেননি।

আফশীনের নিহত হওয়ায় যদিও তুর্কীদের ক্ষমতা অনেকটা খর্ব এবং তাদের মন ব্যথিত হয়ে গিয়েছিল তা সত্ত্বেও তাদের সৈন্য, পল্টন ও ব্যাটেলিয়নসমূহ পূর্ববৎ বহাল ছিল। তাদের মান-মর্যাদাও ছিল পূর্ববৎ অটুট। এবার ওয়াছিক বিল্লাহ্র ক্ষমতার মসনদে আরোহণের সাথে সাথে রাজ্যের পূর্ণ ক্ষমতা একজন তুর্কীর হাতে তুলে দেয়ায় মুসলিম জাহানে যেন তুর্কীদেরই রাজত্ব কায়েম হয়ে গেল। এ ক্ষমতার সুখ দীর্ঘকাল আশনাসের কপালে সয় নাই। কিছুদিন যেতে না যেতেই তার ক্ষমতার আওতা সংকুচিত হতে থাকে। কিন্তু এর দ্বারা এমনি একটি নজীর প্রতিষ্ঠিত হলো যে, কালক্রমে তারাই আব্বাসীয় বংশের পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

ওয়াছিক বিল্লাহ যেহেতু জ্ঞানানুরাগী ছিলেন, তাই তিনি জ্ঞানীগুণী ও পারিষদদেরকে নিয়ে জ্ঞানচর্চার মজলিসে বসতেন এবং ঘন্টার পর ঘন্টা জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা ও প্রাচীন ইতিহাস শ্রবণে কাটিয়ে দিতেন। জ্ঞানীগুণীদের অধিকাংশই যেহেতু আরব বংশোদ্ভূত ছিলেন তাই তাঁরা এ সুযোগে হারূনুর রশীদের আমলের ঘটনাবলীও শোনাতেন এবং সাথে সাথে বারমাকীদের জ্ঞানানুরাগ ও বদান্যতার কথাও বলতেন। ফাঁকে ফাঁকে তাঁর রাজসরকারে তাদের উচ্চক্ষমতা লাভ, ক্ষমতার অপব্যবহার এবং খিলাফতের বিরুদ্ধে তাদের ষড়যন্ত্রের ইতিহাসও তাঁর কর্ণগোচর করতে ত্রুটি করতেন না। ফলে ওয়াছিক বিল্লাহ্‌র সম্বিত ফিরে আসে। তখন তিনি তুর্কী ও খুরাসানী আমীর-উমারার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে লাগলেন। ফলে তুর্কী আশনাসের ক্ষমতার পরিধিও সংকুচিত হয়ে আসলো। এ অবস্থায় ২৩০ হিজরীতে (৮৪৪-৪৫ খ্রি) তাঁর মৃত্যু হয়।

আরবদের মর্যাদা খর্ব

এ যাবত আব্বাসীয় খলীফাগণ আরবদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও মর্যাদা খর্বই করে আসছিলেন। তাঁরা দিন দিন আজমী মানে অনারবদের মর্যাদা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করেই চলেছিলেন। তা সত্ত্বেও আরব ইসলামের পীঠস্থান এবং আরবরা ইসলামের আদি সেবক হওয়ায় সাধারণ্যে আরবদের একটি বিশেষ মর্যাদা ছিল। স্বয়ং খলীফার পরিবার ছিল একটি আরব পরিবার। সেহেতু আজমীরা কোনদিন আরবদের সম্ভ্রম নষ্ট করার কথা ভাবতে বা সে সুযোগ নিতে সাহসী হয়নি। খলীফাগণও কোন দিন হিজায বা ইয়ামানের কোন আরব কবীলাকে দমনের উদ্দেশ্যে কোন খুরাসানী বা তুর্কীবাহিনীকে প্রেরণ করেননি বরং ঐ সব আরব প্রদেশের বিশৃঙ্খলা দমনের প্রয়োজন দেখা দিলে তারা আরব, ইরাকী বা সিরিয়ান সৈন্যদের কোন বাহিনী পাঠিয়ে তা করতেন।

এরূপ সতর্কতা অবলম্বনের ফলে আরবদেরকে সামগ্রিকভাবে অত্যন্ত দুর্বল করে দেয়া হলেও তাঁদের প্রতি একটি শ্রদ্ধাবোধ জনমনে বিরাজমান ছিল। তাঁদের এ বিশেষ মর্যাদা সম্পর্কে কারো মনে কোনরূপ দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল না। এবার খলীফা ওয়াছিক বিল্লাহ্‌র আমলে একটি ঘটনায় আরবদের সে মর্যাদাটুকুও ছিনিয়ে নেয়া হলো সে ঘটনাটি ছিল এরূপ ঃ

মদীনার উপকণ্ঠে বনূ সুলায়ম গোত্রের বিপুল সংখ্যক লোক বসবাস করতো। তারা একবার বনূ কিনানার উপর আক্রমণ করলো এবং তাদের ধন-সম্পদ লুট করলো। আরবদের মধ্যে এ জাতীয় লুটপাটের প্রবণতা বৃদ্ধির কারণ ছিল এই যে, এখন আর তাঁরা রাজসরকারের চাকরিতে বা সৈন্যবাহিনীতে স্থান পাচ্ছিল না। আব্বাসীয় খলীফাগণ ক্রমান্বয়ে তাদেরকে সেনাবাহিনী থেকে ছাঁটাই করে দিচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় আরবদের সামরিক প্রতিভা এখন লুটপাট, ডাকাতি, রাহাজানিতে রূপান্তরিত হতে লাগলো। মদীনার আমিল মুহাম্মদ ইব্‌ন সালিহ্ বনূ সুলায়মের এ সীমালংঘনের সংবাদ পাওয়া মাত্র তাদেরকে দমনের জন্যে সৈন্যবাহিনী পাঠালেন। কিন্তু বনূ সুলায়ম গোত্রীয়রা ঐ বাহিনীকে পরাস্ত করলো। মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী গোটা এলাকা দেখতে দেখতে অশান্ত হয়ে উঠল। কাফেলাসমূহের যাতায়াতে অচলাবস্থা দেখা দিল। এ সংবাদ অবগত হয়ে ওয়াছিক বিল্লাহ্ তাঁর তুর্কী সিপাহ্‌সালার বগাকবীরকে তাঁর দুর্ধর্ষ তুর্কী বাহিনীসহ সে বিদ্রোহ দমনের জন্যে প্রেরণ

করলো। বগাকবীর ২৩০ হিজরীর শাবান (৮৪৫ খ্রি মে) মাসে সসৈন্যে মদীনায় গিয়ে উপনীত হলো। বনূ সুলায়মের সাথে তাঁর কয়েকটি যুদ্ধ হলো। অবশেষে বনূ সুলায়ম গোত্রীয়রা পরাভূত হলো। তাদের এক হাজার লোক বন্দী হয়ে মদীনায় নীত হলো। এবং বেশ কয়েক শত লোক নিহত হলো।

বগাকবীর প্রায় চার মাস ধরে তাঁর তুর্কী বাহিনীসহ মদীনায় অবস্থান করে আরব গোত্রসমূহকে নানাভাবে ভয়-ভীতি দেখিয়ে বিড়ম্বিত ও সন্ত্রস্ত করে তুললেন। হজ্জ থেকে ফিরে এসে বগাকবীর বনূ বিলাল গোত্রের দিকে মনোনিবেশ করলেন এবং তাদেরকেও বনূ সুলায়মের মত নানাভাবে শায়েস্তা করতে লাগলেন। তিনি তাদের তিনশ লোককে গ্রেফতার করে কারাবন্দী করলেন। তারপর বনূ মুররা গোত্রের দিকে তিনি মনোনিবেশ করলেন। ফাদাকে গিয়ে দীর্ঘ চল্লিশ দিন সেখানে অবস্থান করে বনূ কাজারা ও বনূ মুররার প্রচুর লোককে গ্রেফতার করে মদীনায় নিয়ে এসে তাদেরকেও কারাগারে নিক্ষেপ করেন। তারপর একে একে বনূ গোত্রীর বনূ ছা'লাবা ও আশজা গোত্রের রঈসদেরকে তলব করে তাদের নিকট থেকে আনুগত্যের অঙ্গীকার আদায় করলেন। তারপর তিনি বনূ কিলাবের তিন হাজার লোককে ধরে এনে দু' হাজারকে ছেড়ে দিয়ে এক হাজারকে কারাগারে প্রেরণ করলেন। তারপর ইয়ামামায় গিয়ে বনূ নুমায়রের পঞ্চাশ ব্যক্তিকে হত্যা করে চল্লিশ জনকে বন্দী করলেন।

ইয়ামামাবাসীরা রুখে দাঁড়ালো। বগাকবীর কয়েকটি যুদ্ধে তাদের দেড় হাজার লোককে হত্যা করলেন। যুদ্ধের সে দাবানল না নিভতেই ওয়াছিক বিল্লাহ্ আরও একজন তুর্কী সেনাপতিকে নতুন তুর্কী বাহিনী দিয়ে বগাকবীরের সাহায্যার্থে ইয়ামামায় প্রেরণ করলেন। বগাকবীর এবার নবোদ্যমে গোটা ইয়ামামায় হত্যাযজ্ঞ শুরু করলেন। ইয়ামামাবাসীরা সেখান থেকে পালালে তারা ইয়ামান পর্যন্ত গিয়ে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলো এবং হাজার হাজার লোককে নির্মমভাবে হত্যা করলেন। মোদ্দাকথা, আরব গোত্রসমূহকে মনের মত করে পদদলিত ও বিড়ম্বিত করে তারা দুশ আরব রঈসকে বন্দী করে বাগদাদে নিয়ে আসলেন।

যারা ইতিমধ্যেই মদীনার কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন এরা ছিলেন তাদের অধিক। মদীনায় পৌছে তারা মুহাম্মদ্ ইব্‌ন সালিহকে লিখে পাঠালেন যে, মদীনার বন্দীদেরকে নিয়ে বাগদাদে এসে উপনীত হও। মুহাম্মদ ইব্‌ন সালিহ্ সে হুকুম তামিল করে বন্দীদের বাগদাদে এনে পৌছালেন। এবার সকলকেই একত্রে বাগদাদের কারাগারে নিক্ষেপ করা হলো। বগা-কবীর এভাবে দীর্ঘ দু'বছর ধরে এভাবে তুর্কীদের হাতে আরবদেরকে হত্যা করিয়ে করিয়ে তাদের অবমাননার হদ্দ করলেন।

২৩০ হিজরীতে (৮৪৪-৪৫ খ্রি) খুরাসানের গভর্নর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহির ইন্তিকাল করলে তাঁর অন্তিম ইচ্ছা অনুসারে খলীফা ওয়াছিক বিল্লাহ্ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহিরের পুত্র তাহির ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন তাহিরকে খুরাসান, কিরমান, তাবারিস্তান ও রে-এর গভর্নর পদে সমাসীন করলেন।

আহমদ ইব্‌ন নসরের বিদ্রোহ ও পতন

আহমদ ইব্‌ন নসর ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন হায়ছাম খুযাঈর পিতামহ মালিক ইব্‌ন হায়ছাম খুযাঈ ছিলেন আব্বাসীয় বংশের খিলাফত প্রতিষ্ঠার অন্যতম নকীব। আহমদ ইব্‌ন নসর প্রায়ই

মুহাদ্দিসদের সাহচর্যে থাকতেন, তাই তিনিও একজন সেরা মুহাদ্দিস বলে গণ্য হতেন। তিনি খালকে কুরআন সংক্রান্ত আব্বাসী খলীফাদের আকীদা-বিশ্বাসের বিরোধী ছিলেন। এ জন্যে বনী আব্বাস বংশের খিলাফতের বিরোধী প্রচুর সংখ্যক লোক তাঁর হাতে এসে বায়আত গ্রহণ করে। ফলে ২৩১ হিজরীর ৩রা শাবান (৮৪৬ খ্রি মার্চ) আহমদ ইব্‌ন নসর বাগদাদে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করলেন। বাগদাদের পুলিশ কর্মকর্তা অত্যন্ত সন্তর্পণে আহমদ ইব্‌ন নসরকে গ্রেফতার করলেন।

আহমদ ইব্‌ন নসর ও তাঁর সঙ্গে যারা গ্রেফতার হলেন তাঁরা সামর্‌রায় ওয়াছিক বিল্লাহ্‌র সম্মুখে বন্দী অবস্থায় নীত হলেন। ওয়াছিক স্বহস্তে আহমদ ইব্‌ন নসরকে হত্যা করে তার খণ্ডিত দেহ ও শির বাগদাদে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁর খণ্ডিত দেহ বাগদাদের তোরণে এবং শির বাগদাদের পুলের উপর ঝুলিয়ে রাখা হলো। শিরের সাথে একজন প্রহরী এ উদ্দেশ্যে নিয়োগ করা হলো যেন সে বর্শার দ্বারা সব সময় শিরকে কেবলার দিক থেকে ফিরিয়ে রাখে। আর তাঁর কানে একটি ছিদ্র করে এ মর্মে একটি চিরকুট লিখে রাখা হলো যে, "এ শির আহমদ ইব্‌ন নসরের। খলীফা তাকে খালকে কুরআনের বিশ্বাসের দিকে আহ্বান করেছিলেন। কিন্তু সে তাতে সাড়া দিতে ব্যর্থ হয়। এ জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা কালবিলম্ব না করে তাকে দোযখের আগুনের দিকে টেনে নিয়েছেন। অবশ্য আহমদ ইব্‌ন নসরের হত্যার এ ঘটনাটি পূর্ব বর্ণিত আবূ আবদুর রহমানের আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইজদীর ঘটনাটির পূর্বের।

রোমানদের সাথে যুদ্ধবন্দী বিনিময়

রোমানদের সাথে যুদ্ধের ঘটনা অহরহ ঘটেই আসছিল। মুসলমানরা সর্বদাই যুদ্ধে রোমানদেরকে পরাস্ত করে এসেছে এবং কখনো কখনো তাঁরা যুদ্ধ জয় করতে করতে কনসটান্টিনোপল্ পর্যন্ত পৌছে গিয়েছেন। কিন্তু কোনদিনই রোমান সাম্রাজ্যের শিকড় গোড়া থেকে উপড়ে ফেলতে পারেননি। এর কারণ হচ্ছে খুলাফায়ে রাশিদীনের আমলে পারস্য সাম্রাজ্যের শাহানশাহী খতম হয়ে গেলেও রোমান সম্রাটগণ তখনো বর্তমান ছিলেন। যদিও শাম, ফিলিস্তীন, মিসর প্রভৃতি দেশ মুসলমানরা রোমানদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা কনসটান্টিনোপল বিজয় করে ইউরোপীয় ভূখণ্ডে ঢুকে পড়বার পূর্ণ প্রস্তুতি সত্ত্বেও তার পূর্বেই তাঁদের মধ্যে আত্মকলহ এমনভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো যে, কনসটান্টিনোপল ও ইউরোপ মুসলিম বাহিনীর অশ্বখুরের দ্বারা দলিত হতে হতে বেঁচে গেল। মুসলমানদের এ আত্মকলহ এমনিভাবে স্থায়িভাবে বাসা বেঁধে বসলো যে, কোনদিনই কোন মুসলিম খলীফা পূর্ণ অভ্যন্তরীণ শান্তি প্রতিষ্ঠা করে এবং বিদ্রোহের আশঙ্কামুক্ত হয়ে ইউরোপ বিজয়ের দিকে পূর্ণ মনোযোগী হওয়ার সুযোগ পেয়ে ওঠেননি।

মোট কথা, মুসলমানদের আত্মকলহ কনসটান্টিনোপলের কাইজার এবং ইউরোপের দেশসমূহের রক্ষাকবচ বনে গেল। রোমানদের সাথে সীমান্ত যুদ্ধের ধারা সর্বদাই চালু ছিল। মাঝে মাঝেই মুসলিম খলীফাগণ রোমমুল্লুকের ঈসায়ী সম্রাটদের বাহিনীকে আক্রমণ করে। তাদেরকে ভয়ভীতি দেখিয়ে পুনরায় সত্বর নিজেদের রাজধানীতে ফিরে আসতেন। এমনটি কখনো হয়নি যে, উপর্যুপরি কয়েক বছর ধরে তাঁরা রাজধানী থেকে বাইরে কোন বিজিত রোমান রাজ্যে অবস্থান করেছেন। ওয়াছিক বিল্লাহ্‌র খিলাফত আমলেও রোমানদের সাথে

সীমান্ত সংঘর্ষ লেগেই থাকতো। খলীফা হারূনুর রশীদের আমলে দু'-দু'বার মুসলিম ও খ্রিস্টান বন্দীদের বিনিময় হয়েছে। মুসলমানগণ তাদের হাতে বন্দী খ্রিস্টান সৈন্যদেরকে এবং বিনিময়ে খ্রিস্টানগণ মুসলিম বন্দীদেরকে মুক্তিদান করেছে। এ বন্দী বিনিময়পর্ব পূর্বেও লামেস নদীর তীরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আর এবারও ২৩১ হিজরীর ১০ই মুহররম (৮৪৫ খ্রি ১৭ সেপ্টেম্বর) তৃতীয়বারের মত এ একই লামেস নদীর উভয় তীরে ওয়াছিক বিল্লাহ্‌র যুগে অনুষ্ঠিত হলো। এ উদ্দেশ্যে উক্ত নদীতে পাশাপাশি দু'টি পুল নির্মিত হলো। একটি পুলে করে ঈসায়ী কয়েদীরা ওদিকে যাচ্ছিল। আর অঁপর পুলে করে মুসলমান বন্দীরা এদিকে আসছিল। ওয়াছিক বিল্লাহ্‌ এ উদ্দেশ্যে খাকানকে ঈসায়ী বন্দীদেরকে সাথে দিয়ে লামেস নদীর তীরে পাঠিয়ে দেন। সমসংখ্যক কয়েদীর বিনিময় পর্ব সম্পন্ন হলে দেখা গেল যে, খ্রিস্টান রাজ্য থেকে ফেরত আসা মুসলিম বন্দীর সংখ্যা চার হাজার ছশ জন, তখনও কিন্তু অনেক খ্রিস্টান যুদ্ধবন্দী মুসলমানদের হাতে রয়ে গিয়েছে। খাকান এ অবশিষ্ট খ্রিস্টান সৈন্যদেরকেও কোনরূপ বিনিময় ব্যতিরেকেই এই বলে রোমানদের হাতে প্রত্যর্পণ করলেন যে, এ বিনিময়ের ক্ষেত্রেও আমরা আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে চাই রোমান খ্রিস্টানদের প্রতি আমাদের বদান্যতার নিদর্শন স্বরূপ।

ওয়াছিক বিল্লাহর ওফাত

ওয়াছিক বিল্লাহ্‌ জলাতঙ্গ রোকে আক্রান্ত হন। তাঁর সারা দেহে ফোস্কা দেখা দিল। চিকিৎসার উদ্দেশ্যে তাঁকে উত্তপ্ত তন্দুরের উপর বসিয়ে দেয়া হলো। এতে রোগের প্রকোপ কিছুটা হ্রাস পেল। পরদিন ততোধিক উত্তপ্ত তন্দুরের উপর ততোধিক সময় তাঁকে বসিয়ে রাখা হলো। ফলে তিনি প্রচণ্ড জ্বরে আক্রান্ত হলেন। তন্দুরের উপর থেকে তুলে তারপর তাঁকে বায়ু সেবনের উদ্দেশ্যে পাল্কীতে করে বাইরে মুক্ত স্থানে নিয়ে যাওয়া হলো। কিন্তু ভূমিতে তাঁকে রাখা হলে দেখা গেল তাঁর প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে। অনতিবিলম্বে কাযী আহমদ ইব্‌ন দাউদ, উযীরে আযম মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল মালিক, সেনাপতি ঈতাখ ওসীফ, উমর ইব্‌ন ফারাহ প্রমুখ খলীফার প্রাসাদে পরামর্শ সভায় মিলিত হয়ে ওয়াছিক বিল্লাহ্‌র নয় বছর বয়স্ক কচি শিশু পুত্রকে খলীফা পদে বসানোর উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। এ সময় ওসীফ সমবেত পারিষদবর্গকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ

"আপনাদের কি আল্লাহ্‌র ভয় নেই যে, একটি কচি শিশুকে খলীফার গুরু দায়িত্বপূর্ণ পদে বসিয়ে দিচ্ছেন।" তাঁর এ বক্তব্য শুনে সকলের চৈতন্যোদয় হলো। তাঁরা একজন যোগ্য ব্যক্তিকে খলীফা পদে বরণের ব্যাপারে চিন্তাভাবনা শুরু করলেন। অবশেষে খলীফা ওয়াছিক বিল্লাহ্‌র ভাই জা'ফর ইব্‌ন মু'তাসিমকে ডেকে এনে খিলাত পরিয়ে খলীফার আসনে বসালেন। তাঁরা তখন তাঁকে মু'তাওয়াক্কিল 'আলাল্লাহ্‌ খেতাবে ভূষিত করলেন। মু'তাওয়াক্কিল খিলাফতের বায়আত গ্রহণ করেই সর্বপ্রথম ওয়াছিক বিল্লাহ্‌র জানাযার নামায পড়ালেন এবং তাঁকে দাফনের আদেশ জারি করলেন।

মক্কার পথে হারূনী নামক স্থানে ওয়াছিক বিল্লাহকে দাফন করা হলো। তাঁর খিলাফতের মেয়াদ ছিল পাঁচ বছর নয় মাস মাত্র। ছত্রিশ বছর চার মাস বয়সে ২৩২ হিজরীর ২৪শে যিলহজ্জ (৮৪৭ খ্রি-এর আগস্ট) রোজ বুধবার তিনি ইন্তিকাল করেন। তিনি অত্যন্ত ধীরস্থির ও

সহিষ্ণু প্রকৃতির লোক ছিলেন। কিন্তু খালকে কুরআনের প্রশ্নে তিনি অনেক বাড়াবাড়ি করেন। শেষ বয়সে তাঁর এ পাগলামি স্বভাব বিদূরিত হয়।

শিক্ষণীয় ঃ মৃত্যুর পর খলীফা ওয়াছিক বিল্লাহর শবদেহটি কিছুক্ষণ একাকী রেখে দিয়ে সকলে মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহর বায়আত গ্রহণে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এ সময় একটি শুশুক এসে ওয়াছিক বিল্লাহর চোখ দু'টি খুলে খেয়ে ফেলে।

মুতাওয়াক্কিল 'আলাল্লাহ্

মুতাওয়াক্কিল 'আলাল্লাহ্ ইব্ন মু'তাসিম বিল্লাহ ইব্ন হারূনুর রশীদের আসল নাম জা'ফর ও কুনিয়াত আবুল ফযল। ২০৭ হিজরী (৮২২-২৩ খ্রি) সুজা নাম্নী জনৈকা দাসীর গর্ভে তাঁর জন্ম হয়। ওয়াছিক বিল্লাহ্র মৃত্যুর পর ২৩২ হিজরীর ২৪শে যিলহজ্জ (৮৪৭ খ্রি-এর আগস্ট) তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিংহাসনে আরোহণ করে তিনি সৈন্যদের আটমাসের বেতন-ভাতা প্রদান করেন। আপন পুত্র মুনতাসিরকে তিনি হারামাইন, ইয়ামান ও তাইফের শাসনভার অর্পণ করেন।

মুহাম্মদ ইব্ন মালিকের পদচ্যুতি ও মৃত্যু

মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল মালিক ইব্ন যাইয়াত মু'তাসিমের খিলাফতের আমল থেকেই উযীরে আযমের গুরু দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। ওয়াছিক বিল্লাহ্র খিলাফত আমলেও তিনি এ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। মুতাওয়াক্কিল 'আলাল্লাহ-এর আমলে মাত্র একমাস কাল প্রধানমন্ত্রীরূপে থাকার পর তিনি খলীফার বিরাগভাজন ও পদচ্যুত হন। ঘটনা হচ্ছে, ওয়াছিক বিল্লাহ্ একবার তাঁর রাজত্বকালে তাঁর ভাই মুতাওয়াক্কিলের প্রতি অসন্তুষ্ট হন।

মুতাওয়াক্কিল তখন উযীরে আযম মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল মালিকের শরণাপন্ন হলেন এবং খলীফার কাছে তার জন্য সুপারিশ করে আমীরুল মু'মিনীনকে তার প্রতি সন্তুষ্ট করে দিতে বলেন। মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল মালিক দীর্ঘকাল ধরে প্রধানমন্ত্রী থাকায় অনেকটা দাম্ভিক ও রুক্ষ মেযাজের অধিকারী হয়ে পড়েছিলেন। তিনি নেহাত উপেক্ষার দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে অনেকটা ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললেন, তুমি নিজের চরিত্র সংশোধন কর, তা হলে খলীফা এমনিতেই তোমার প্রতি প্রীত হবেন, কারো সুপারিশের কোন্ প্রয়োজন হবে না। তারপর আবার ওয়াছিক বিল্লাহ্র কাছে মুতাওয়াক্কিলের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলেন, সে আমার কাছে সুপারিশের জন্যে এসেছিল, কিন্তু তার মাথায় মেয়েলী ধরনের লম্বা চুল দেখে আর পাত্তাই দেইনি। ওয়াছিক বিল্লাহ্ তখন মুতাওয়াক্কিলকে দরবারে ডেকে পাঠান এবং প্রকাশ্য দরবারে নাপিত ডাকিয়ে তার মাথা মুণ্ডন করিয়ে অপমান করে দরবার থেকে বের করে দেন। সব অপমানের মূলে যেহেতু মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল মালিক তাই খলীফার আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার এক মাস যেতে না যেতেই মুতাওয়াক্কিল ঈতাখকে নির্দেশ দিলেন যে, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল মালিককে তার স্বগৃহে গ্রেফতার করে গোটা রাজ্যে পত্র পাঠিয়ে দাও যে, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল মালিকের যে কোন সম্পদ যেখানেই থাক না কেন তা যেন বাজেয়াপ্ত করে নেয়া হয়। নির্দেশ মোতাবেক ঈতাখ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল মালিককে গ্রেফতার করলেন এবং তাঁর সমস্ত অর্থ-সম্পদ বাগদাদে আনিয়ে বায়তুলমালে জমা করে দেয়া হলো। কারাগারের কঠোরতা

মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল মালিকের সহ্য হলো না এবং ২৩৩ হিজরীর ১৫ই রবিউল আউয়াল (৮৪৭ খ্রি-এর অক্টোবর) কারাবন্দী অবস্থায়ই তাঁর মৃত্যু হলো। মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল মালিকের পর উমর ইব্‌ন ফারাহকেও একই বছর রমযান মাসে অনুরূপভাবে গ্রেফতার করে বন্দীশালায় নিক্ষেপ করা হয়। তারপর এগার লাখ দিরহাম অর্থদণ্ড আদায় করে মুক্তি দেয়া হয়।

ঈতাখের বন্দীত্ব ও মৃত্যু

ঈতাখ ছিলেন তুর্কী ক্রীতদাস। প্রথমে তিনি সালাম ইব্‌ন আবরাসের কাছে ছিলেন এবং পাচকের কাজ করতেন। এ জন্যে শেষ অবধি তিনি ঈতাখ তাব্বাখ বা পাচক ঈতাখ নামেই মশহুর হন। খলীফা মু'তাসিম বিচক্ষণতা, মার্জিত রুচি ও সুন্দর সুঠাম দেহবল্লরীর জন্য অভিভূত হয়ে ১৯৯ হিজরীতে (৮১৪-১৫ খ্রি) সালাম আবরাসের নিকট থেকে তাকে কিনে নেন। লোকটি যেহেতু অত্যন্ত পারঙ্গম এবং বিচক্ষণ ছিলেন তাই শীঘ্রই উন্নতি করে মু'তাসিমের আমলেই অনেক মাল-সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী হন। রাজকীয় বিরাগভাজনরা সাধারণত তারই ঘরে বন্দী থাকতেন, তাঁরই দায়িত্বে তাদেরকে রাখা হতো। আজীফ, মামূনুর রশীদের সন্তানবর্গ, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল মালিক, উমর ইব্‌ন ফারাহ্ প্রমুখ তাঁরই তত্ত্বাবধানে বন্দী থাকেন ও নিহত হন। সমর বিভাগ তথা স্বরাষ্ট্র দফতর তাঁরই অধীনে ছিল। হাজিব (দেহরক্ষী বাহিনীর প্রধান) ও দৌত্যকর্মের দায়িত্বও তিনি পালন করেন। হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর ঈতাখ বাগদাদের উপকণ্ঠে পৌঁছলে খলীফা মুতাওয়াক্কিলের নির্দেশ অনুসারে ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম তাঁকে দাওয়াত করে বাগদাদে গ্রেফতার করেন। তাঁর পুত্রদ্বয় মানসূর ও মুযাফ্‌ফরও বন্দী হলেন। এই কারাবন্দী অবস্থায়ই ঈতাখের মৃত্যু ঘটে। তাঁর পুত্রদ্বয় মুতাওয়াক্কিলের শাসনামলের শেষ অবধি বন্দীজীবন অতিবাহিত করেন। পরবর্তীকালে মুনতাসির শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে তাদের উভয়কে মুক্তি দেন।

খিলাফতের উত্তরাধিকারী মনোনয়ন ও বায়আত

২৩৫ হিজরীতে (৮৪৯-৫০ খ্রি) আযারবায়জানে মুহাম্মদ ইব্‌ন বাঈস ইব্‌ন জালীস বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করলে বাগাসগীর সৈন্যবাহিনী দিয়ে সে বিদ্রোহ দমন করেন। তারপর এ বছরই খলীফা মুতাওয়াক্কিল তাঁর তিন পুত্র যথাক্রমে মুহাম্মদ, তালহা ও ইবরাহীমকে খিলাফতের উত্তরাধিকারী মনোনীত করে প্রজাসাধারণের বায়আত গ্রহণ করেন। এ সময় তিনি স্থির করেন যে, আমার পর প্রথমে মুহাম্মদ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হবেন, তারপর তালহা খলীফা হবেন। মুহাম্মদকে মুনতাসির এবং তালহাকে মুতাজ্জ খিতাব প্রদান করলেন। মুহাম্মদ ও মুতাজ্জকে যথাক্রমে পশ্চিমাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর জায়গীর প্রদান করলেন। তারপর এ দু'জনকে সিংহাসনে উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করেন এবং শামদেশ তাদের জায়গীর বলে ঘোষণা করেন।

ঐ বছরই অর্থাৎ ২৩৫ হিজরীতে (৮৪৯-৫০ খ্রি) খলীফা মুতাওয়াক্কিল বিল্লাহ্ ফৌজের উর্দি পরিবর্তন করেন এবং কম্বলের জোব্বা পরিধান করিয়ে কোমর বন্ধনীর পরিবর্তে রশি দিয়ে কোমর বাঁধার প্রথা চালু করেন। যিম্মীদের জন্য নতুন উপাসনালয় নির্মাণও তিনি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। রাজ্যজোড়া ঘোষণা করে দেন যে, কোন ব্যক্তি কার্যোদ্ধার উদ্দেশ্যে কোন

শাসকের দোহাই দিতে পারবে না। খ্রিস্টানদের প্রতি নির্দেশ জারি করা হলো যে, তারা যেন ক্রুশ নিয়ে মিছিল-শোভাযাত্রা না করে। এ বছরই হাসান ইব্ন সাহল এবং তাহির ইব্ন হুসাইনের ভ্রাতুষ্পুত্রও মামূনুর রশীদের আমল থেকে বাগদাদের পুলিশ প্রধান ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন হুসাইন ইব্ন মুসআব মৃত্যুমুখে পতিত হন। মুতাওয়াক্কিল মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাককে পুলিশ বিভাগের প্রধান নিয়োগ করেন। সাথে সাথে তাকে পারস্য প্রদেশের গভর্নর পদেও অধিষ্ঠিত করেন। জ্ঞাতব্য যে, পারস্য প্রদেশ খুরাসান থেকে পৃথক ছিল। খুরাসানের হুকুমতও তাবারিস্তান প্রভৃতিসহ তাহির ইব্ন আবদুল্লাহ্ তাহির ইব্ন হুসাইনের করায়ত্তে ছিল। এ বছরই খলীফা মুতাওয়াক্কিল এ মর্মে নির্দেশ জারি করেন যে, খ্রিস্টানদের অবশ্যই গলাবন্ধ ব্যবহার করতে হবে। রঙীন নেকটাই সম্ভবত তারই স্মৃতিবাহী। ২৩৬ হিজরীতে (৮৫০-৫১ খ্রি) মুতাওয়াক্কিল ইমাম হুসাইন (রা)-এর মাযার যিয়ারতের উদ্দেশ্যে গমন নিষিদ্ধ করেন এবং মাযারের চর্তুস্পার্শে নির্মিত বাড়িসমূহ ধূলিসাৎ করে দেন। এ বছরই উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াহইয়া ইব্ন খাকানকে উযীর পদে নিযুক্তি দেয়া হয়।

আর্মেনিয়ার বিদ্রোহ

আর্মেনিয়া প্রদেশে গভর্নররূপে নিযুক্ত ছিলেন ইউসুফ ইব্ন মুহাম্মদ। বুকরাত ইব্ন আসওয়াত নামক বিশপ রাজধানীতে এসে ইউসুফ ইব্ন মুহাম্মদের কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করেন। ইউসুফ তাঁকে এবং তাঁর পুত্রকে গ্রেফতার করে খলীফা মুতাওয়াক্কিলের দরবারে পাঠিয়ে দিলেন। ফলে আর্মেনিয়ার পাদ্রীদের মধ্যে ইউসুফের বিরুদ্ধে প্রবল অসন্তোষ ও উত্তেজনা দেখা দিল। বুকরাত ইব্ন আসওয়াতের জামাতা মূসা ইব্ন জারারা পাদ্রীদের একটি সমাবেশ আহ্বান করে এ ব্যাপারে তাদের পরামর্শ কি জানতে চান। সকলে ইউসুফকে হত্যা করার জন্যে অঙ্গীকারাবদ্ধ হলেন। সে মতে মূসা ইব্ন জারারার নেতৃত্বে খ্রিস্টানরা বিদ্রোহী হয়ে উঠলো। ইউসুফ ইব্ন মুহাম্মদ তাদের মুকাবিলায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। ২৩৭ হিজরীর রমযান (৮৫২ খ্রি-এর মার্চ) মাসে ইউসুফ ইব্ন মুহাম্মদ তাঁর সঙ্গীসাথীসহ তাদের হাতে নিহত হলেন। এ সংবাদ পাওয়া মাত্র মুতাওয়াক্কিল বগাকবীরকে বিদ্রোহ দমনের জন্য আর্মেনিয়ায় প্রেরণ করেন। বগাকবীর মুসেল ও জাযীরা হয়ে আর্জনর নিকট গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করেন। আর্জন জয় করার পর মূসা ইব্ন জারারার প্রায় ত্রিশ হাজার সঙ্গী-সাথী নিহত হয় এবং প্রচুর সংখ্যক বন্দী হয়। তারপর ২৩৮ হিজরীতে (৮৫২-৫৩ খ্রি) বগাকবীর আর্মেনিয়ার বিদ্রোহী পাদ্রীদেরকে বেছে বেছে শাস্তি প্রদান করেন এবং গ্রেফতার করে সকলকে বাগদাদে পাঠান।

কাযী আহমদ ইব্ন আবূ দাউদের পদচ্যুতি ও মৃত্যু

কাযী আহমদ ইব্ন আবূ দাউদ ওয়াছিক বিল্লাহ্র আমলে উযীরে আযমের চাইতেও বেশি মর্যাদা ও প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী ছিলেন। মুতাওয়াক্কিলের আমলের প্রথম দিকেও তাঁর মান-মর্যাদা ও প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ন ছিল। কিন্তু ২৩৭ হিজরীতে (৮৫১-৫২ খ্রি) তিনি খলীফা মুতাওয়াক্কিলের বিরাগভাজন হন। খলীফা তাঁর সমুদয় ধন-সম্পদ ও জায়গীর বাজেয়াফত করার নির্দেশ জারি করেন। কাযী আহমদের পুত্র আবুল ওয়ালীদ তার সর্বস্ব বিক্রয় করে ষাট হাজার দিরহাম খলীফার খিদমতে পেশ করেন। মুতাওয়াক্কিল কাযী আহমদকে গ্রেফতার করে

কারাগারে নিক্ষেপ করেন এবং তাঁর স্থলে ইয়াহইয়া ইব্‌ন আকছামকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করেন। এ সময় কাযী আহমদ পক্ষাঘাতে ভুগছিলেন। মুতাওয়াক্কিল ২৪০ হিজরীতে (৮৫৪-৫৫ খ্রি) কাযী আকছামকেও বরখাস্ত করে তাঁর স্থলে জা'ফর ইব্‌ন আবদুল ওয়াহিদকে ঐ পদে নিযুক্তি প্রদান করেন। কাযী আহমদ ইব্‌ন আবূ দাউদ ঐ বছরই অর্থাৎ ২৩৭ হিজরীতে (৮৫১-৫২ খ্রি) তাঁর পুত্র আবুল ওয়ালীদের মৃত্যুর মাত্র কুড়ি দিন পর ইন্তিকাল করেন। ঐ একই বছর হিমসে ঈসায়ীরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং হিমসের আমিলকে দেশান্তরিত করে সেখানকার শাসনভার নিজেদের হাতে তুলে নেয়। খলীফা মুতাওয়াক্কিল তখন দামেশক ও দজলার বাহিনীদ্বয়কে হিমসে যাওয়ার নির্দেশ দেন। তার সে নির্দেশানুসারে হিমসে গিয়ে তারা সেখানকার বিদ্রোহ দমন করেন এবং বিপুলসংখ্যক খ্রিস্টানকে দেশান্তরিত করেন।

ঐ একই বছর মুতাওয়াক্কিল মিসরের কাযী আবূ বকর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবুল লায়ছকে পদচ্যুত করে বেত্রাঘাতের নির্দেশ প্রদান করেন এবং তাঁর স্থলে ইমাম মালিকের শাগরিদ হারিছ ইব্‌ন মিসকীনকে মিসরের কাযীউল কুযাতুল পদে নিযুক্তি দান করেন। ঐ বছরই খলীফা মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন তাহির ইব্‌ন হুসাইন ইব্‌ন মাসআবকে বাগদাদের পুলিশ প্রধান নিযুক্ত করেন। উল্লেখ্য, তাঁর ভাই তাহির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহির তখন খুরাসানের গভর্নর ছিলেন।

রোমানদের হামলা

২৩৮ হিজরীতে (৮৫২-৫৩ খ্রি) মিসরের গভর্নর আব্বাস ইব্‌ন ইসহাক দিমিয়াত উপকূলে নিযুক্ত সৈন্যবাহিনীকে কোন এক প্রয়োজনে মিসরে ডেকে পাঠান। ময়দান খালি দেখে রোমানদের একশটি জাহাজের একটি বহর দিমিয়াত লুণ্ঠনে লিপ্ত হয়। তারা অবাধে লুটপাট চালায়। সেখানকার জামে মসজিদ ভস্মীভূত করে এবং মাল-আসবাব ও বন্দীদেরকে জাহাজে তুলে তিউনিস অভিমুখে চলে যান। সেখানেও তারা ঐ একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করে। জবাবে আলী ইব্‌ন ইয়াহইয়া আর্মেনী সসৈন্যে রোমান এলাকায় আক্রমণ পরিচালনা করে বিপুল সংখ্যক খ্রিস্টানকে বন্দী করে নিয়ে আসেন। ২৪১ হিজরীতে (৮৫৫-৫৬ খ্রি) রোমের মহিলা কাইজার রাণী নাদুরা মুসলমান কয়েদীদেরকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করার অপপ্রয়াস চালান। যারাই খ্রিস্টধর্ম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায় তাদেরকেই নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। অনেকে প্রাণভয়ে খ্রিস্টান হয়ে যায়। তারপর কি যেন ভেবে বন্দী বিনিময়ের আবেদন জানান। মুতাওয়াক্কিল তাঁর সে আবেদনে সাড়া দিয়ে তাঁর ভৃত্য সাইফকে বাগদাদের কাযী জা'ফর ইব্‌ন আবদুল ওয়াহিদের সাথে ঈসায়ী কয়েদীদেরকে সাথে দিয়ে পূর্বোক্ত লামেস নদীর তীরে প্রেরণ করলেন। সেখানে মুসলমান কয়েদীদের সাথে যথারীতি তাদের বিনিময় সমাপ্ত হয়।

রোম আক্রমণ

উপরোক্ত কয়েদী বিনিময় অনুষ্ঠান সমাপ্ত হওয়ার পর রোমানরা পুনরায় বিশ্বাসঘাতকতা করে অতর্কিতে মুসলিম এলাকায় হামলা করে প্রচুর সংখ্যক মুসলমানকে ধরে নিয়ে যায়। মুসলমান সর্দাররা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলেও তাতে কোন কাজ হয়নি। এবার খলীফা মুতাওয়াক্কিল আলী ইব্‌ন ইয়াহইয়াকে সসৈন্য রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে জিহাদের উদ্দেশ্যে

রওয়ানা করে দেন এবং ২৪৪ হিজরীতে (৮৫৮-৫৯ খ্রি) নিজে রাজধানী ছেড়ে দামেশকে আসেন। দামেশকে অবস্থান করে তিনি রোম সাম্রাজ্যে সৈন্য প্রেরণ এবং সে হামলাকে সফল করার জন্য সম্ভাব্য সব কিছু করেন। খলীফার দামেশক অবস্থান উপলক্ষে গোটা মন্ত্রীসভা ও সচিবালয় দামেশকে স্থানান্তরিত হয়। কেননা মনে হচ্ছিল খলীফা এবার স্থায়িভাবেই দামেশকে বসবাস করবেন। কিন্তু দুই মাস না যেতেই দামেশকে ভীষণ মহামারী দেখা দেয়। অগত্যা খলীফাকে দামেশক থেকে বাগদাদে স্থানান্তরিত হতে হয়। দামেশক ত্যাগকালে তিনি বগাকবীরকে একটি বিশাল বাহিনী সাথে দিয়ে রোমান সাম্রাজ্যে আক্রমণ পরিচালনার জন্যে প্রেরণ করেন। সত্যি সত্যি বগাকবীর রোমান সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে হত্যা চালাতে থাকেন। অনেক দুর্গ তাঁর হাতে বিজিত হয়। খৃস্টানদের জানমালের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতিও তাঁর হাতে সাধিত হয়।

বগাকবীরের আক্রমণে যখন রোমানদের ত্রাহিত্রাহি অবস্থা হলো এবং খ্রিস্টানরা ক্ষমা ভিক্ষা করতে লাগলো তখন খলীফার নির্দেশ পেয়ে বগাকবীর প্রত্যাবর্তন করেন। ২৪৫ হিজরীতে (৮৫৯-৬০ খ্রি) খ্রিস্টানরা আবার বিশ্বাসঘাতকতা করলো। সুযোগ পেয়ে তারা মুসলিম এলাকায় লুটপাট করে পালিয়ে যেত। জবাবে আলী ইব্ন ইয়াহইয়া পুনরায় খ্রিস্টান এলাকায় ঢুকে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করে ফিরে আসেন। ২৪৬ হিজরীতে (৮৬০-৬১ খ্রি) খ্রিস্টানরা পুনরায় মুসলিম এলাকায় উপদ্রব করে। তারা সীমান্তবর্তী মুসলিম এলাকায় লুটপাট করে সে এলাকাকে বিরান করে দেয়।

এবার খলীফা মুতাওয়াক্কিল যুগপৎভাবে জল ও স্থলবাহিনী পাঠিয়ে রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বহুমুখী হামলা পরিচালনা করলেন। নৌ ও স্থল বাহিনীর যুগপৎ হামলায় খ্রিস্টান এলাকায় এক প্রলয়ঙ্করী অবস্থার সৃষ্টি হয়। আবার তারা ক্ষমা ভিক্ষা করে সন্ধি প্রার্থনা করে। মুসলমানরা খুশি মনে আবারো তাদের সে প্রস্তাবে সাড়া দিল। লামেস নদীর তীরে আবার খ্রিস্টান ও মুসলমান কয়েদীদের বিনিময় অনুষ্ঠান সম্পন্ন হলো। এবার ফেরত পাওয়া মুসলমান বন্দীর সংখ্যা ছিল দুই হাজার তিনশ। ২৪৬ হিজরীতে (৮৬০-৬১খ্রি) এ সৈন্যদেরকে মুক্ত করা হয়।

জাফরিয়া নদীর পত্তন

২৪৫ হিজরীতে (৮৫৯-৬০ খ্রি) মুতাওয়াক্কিল জাফরিয়া নামে একটি নতুন শহরের পত্তন করেন। এ শহর নির্মাণে দুই লক্ষ দীনার ব্যয়িত হয়। শহরের কেন্দ্রস্থলে লুলুয়া নামক একটি প্রাসাদ নির্মাণ করান। এ প্রাসাদটির উচ্চতা ছিল গোটা নগরীর বর্মখানার মধ্যে সর্বাধিক। এ শহরটিকে কেউ কেউ জাফরিয়া, আবার কেউ কেউ মুতাওয়াক্কিলিয়া বলে অভিহিত করতো। ঐ বছরই জাফর ইব্ন দীনার খাইয়াতের মৃত্যু হয়। ঐ বছর নাজাহ ইব্ন সালামাকে মুতাওয়াক্কিল এত বেশি প্রহার করেন যে, প্রহারেই তার মৃত্যু ঘটে। নাজাহ ইব্ন সালামা অত্যন্ত প্রতাপ-প্রতিপত্তি সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ছিলেন মুতাওয়াক্কিলের ফরমান জারি বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা। তার বিরুদ্ধে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ প্রমাণিত হয়। এ জন্যে তাকে এ কঠোর শাস্তি প্রদান করা হয়।

মুতাওয়াক্কিলের হত্যাকাণ্ড

খলীফা মুতাওয়াক্কিল তাঁর পুত্র মুনতাসিরকে তাঁর প্রথম উত্তরাধিকারী বলে মনোনয়ন দান করেন– যেমনটি উপরে বর্ণিত হয়েছে। মুনতাসির শিয়া মতবাদের দিকে অনেকটা ঝুঁকে পড়েছিলেন। ওয়াছিকও মুতাসিমের মত মুতাযিলাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তবে মুতাওয়াক্কিল সুন্নতের অত্যন্ত পাবন্দ এবং আহলে সুন্নত আলিমদের অত্যন্ত কদরদার ছিলেন। তিনি খালকে কুরআন বিশ্বাসের ঘোর বিরোধী এবং শির্ক বিদআত উচ্ছেদের ব্যাপারে খুবই উৎসাহী ছিলেন। পিতাপুত্রের তথা মুতাওয়াক্কিল ও মুনতাসিরের বিশ্বাসগত এই মতান্তর তাঁদের মধ্যে মনান্তরের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মুতাওয়াক্কিল এবার মুনতাসিরের পরিবর্তে তাঁর দ্বিতীয় সন্তান মু'তাজ্জকেই উত্তরাধিকারী মনোনীত করতে মনস্থ করেন। মুনতাসির ও মুতাজ্জ যেহেতু দু'জন পৃথক পৃথক রমণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন তাই তাঁদের মধ্যে রেষারেষি পূর্ব থেকেই বিদ্যমান ছিল। এবার যখন মুতাওয়াক্কিল মুতাজ্জকে মুনতাসিরের উপর প্রাধান্য আরোপ করতে লাগলেন তখন পিতা-পুত্রের এ বিরোধ চরমে উঠলো এবং মুনতাসির পিতার প্রাণের বৈরী হয়ে দাঁড়ালেন।

এর মাত্র কিছুদিন পূর্বে খলীফা মুতাওয়াক্কিল বগাকবীর, ওয়াসীফ কবীর, ওয়াসীফ সাগীর, দাওয়াজিন আশরুসনী প্রমুখ তুর্কী সিপাহসালারের কোন কোন তৎপরতার প্রতি চরম অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং তাদের কারো কারো জায়গীর বাজেয়াপ্ত করেন। এ জন্যে তুর্কীরা মুতাওয়াক্কিলের প্রতি অত্যন্ত অপ্রসন্ন ছিল। তাই মুনতাসির ও তুর্কীরা সম্মিলিতভাবে মুতাওয়াক্কিলকে হত্যার যোগসাজশে লিপ্ত হয়। বগাকবীর রোমানদের বিরুদ্ধে অভিযানে প্রেরিত হলেও তার পুত্র মূসা ইব্‌ন বগা শাহীপ্রাসাদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিযুক্ত ছিল।

বগাসগীর মুনতাসিরকে তাদের সমর্থনে পেয়ে তার চার পুত্র এবং তুর্কীদের একটি ছোট দলকে মুতাওয়াক্কিলের সংহারের উদ্দেশ্যে নিয়োগ করে। একদা রাতে মুনতাসির এবং তাঁর পারিষদবর্গ যখন একে একে সকলে দরবার থেকে উঠে গেলেন এবং ঐ স্থানে কেবল খলীফা, ফাতেহ ইব্‌ন খাকান ও অপর কেবল চারজন মুসাহেব সেখানে অবশিষ্ট ছিলেন তখন দজলা পারের দিক থেকে ঘাতকরা শাহী দরবারে ঢুকে পড়ে এবং খলীফার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এতে ফাতেহ ইব্‌ন খাকানও খলীফার সাথে নিহত হন। লাশ দুটো ওখানে ফেলে রেখে ঘাতকরা রাতের বেলাই রক্তসিক্ত তলোয়ার নিয়ে মুনতাসিরের সাথে গিয়ে দেখা করে এবং তাকে নতুন খলীফারূপে মুবারকবাদ জ্ঞাপন করে। মুনতাসির তৎক্ষণাৎ সওয়ারীতে আরোহণ করে শাহী মহলে গিয়ে প্রবেশ করলেন এবং লোকদের নিকট থেকে বায়আত গ্রহণ করলেন। ওসীফ ও অন্য তুর্কী সর্দাররা উপস্থিত হয়ে যথারীতি তাঁর হাতে বায়আত হলেন। এ খবর ইয়াহইয়া খাকানের পুত্র উবায়দুল্লাহ্ উযীরের কাছে পৌঁছামাত্র রাতের আঁধারেই তিনি মুতাজ্জ-এর সাথে গিয়ে সাক্ষাত করলেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই অল্পক্ষণ পূর্বে মুতাজ্জকে ডেকে পাঠিয়ে তাঁর বায়আত আদায় করে নিয়েছেন। মুতাজ্জ তখন তাঁর ঘরে ছিলেন না। উবায়দুল্লাহ্ উযীর যখন মুতাজ্জ-এর ঘরে গিয়ে পৌঁছলেন তখন তাৎক্ষণিকভাবে দশ হাজার লোক সমবেত হয়ে গেল। এদের মধ্যে আর্মেনীয়, আযারবায়জানীয়, আজমীরা ছিল। এরা সকলে সমবেত কণ্ঠে দাবি করে যে, আপনি আজ্ঞা করলে আমরা এক্ষুণি মুনতাসির ও তার সাঙ্গোপাঙ্গদের দফারফা করে দেব। উবায়দুল্লাহ্ তাতে সায় না দিয়ে মৌনতা অবলম্বন করেন। পরদিন প্রত্যূষে

মুতাওয়াক্কিল ও ফাতেহ্-এর দাফন কাফনের নির্দেশ দেন। এটা ৪ঠা শাওয়াল ২৪৭ হিজরীর (৮৬২ খ্রি-এর নভেম্বর মাসের) ঘটনা।

খলীফা মুতাওয়াক্কিল চল্লিশ বছর বয়সে চৌদ্দবছর দশ মাস তিন দিন শাসনকার্য পরিচালনা করে ইন্তিকাল করেন।

মুতাওয়াক্কিলের চরিত্র ও আরো কিছু কথা

মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ্ খলীফা পদে আসীন হয়েই সুন্নত পুনর্জীবিত করার প্রবণতা প্রদর্শন করেন। ২৩৪ হিজরীতে (৮৪৮ খ্রি) তিনি রাজ্যের মুহাদ্দিসগণকে রাজধানীতে আমন্ত্রণ জানিয়ে তাঁদের প্রতি পরম সম্মান প্রদর্শন করেন। তাঁর পূর্বের শাসকদ্বয় ওয়াছিক ও মুতাসিমের আমলে মুহাদ্দিসগণ প্রকাশ্যে হাদীসের দরস দিতে পারতেন না। মুতাওয়াক্কিল এ মর্মে ফরমান জারি করলেন যে, মুহাদ্দিসগণ এখন থেকে মসজিদসমূহে প্রকাশ্যে নির্ভয়ে হাদীস বর্ণনা করবেন এবং আল্লাহ্‌র গুণাবলী সম্পর্কে খোলাখুলি আলোচনা করবেন। মুতাওয়াক্কিলের এ নীতি-আদর্শ দর্শনে মুসলিম জনসাধারণ তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রীত হন। মসজিদে মসজিদে পূর্ণোদ্যমে হাদীসের দরস শুরু হলো। মুতাওয়াক্কিল কবর পূজার অবসান ঘটান। এ জন্যে শিয়ারা তাঁর প্রতি বৈরী হয়ে যায়। কেননা, তিনি হযরত ইমামের মাযারে শির্কপূর্ণ অনুষ্ঠানাদি মওকুফ করিয়ে দিয়েছিলেন।

২৪০ হিজরীতে (৮৫৪-৫৫ খ্রি) খাল্লাতবাসীরা আকাশ থেকে এমনি এক বিকট গর্জন শুনতে পান যে, অনেকে এ গর্জন শুনে প্রাণত্যাগ করেন। ইরাকে মুরগীর ডিমের মত বিরাটাকৃতির শিলা বর্ষিত হয়। মাগরিব এলাকায় তেরটি গ্রামে ধস নামে। ২৪৩ হিজরীতে (৮৫৭-৫৮ খ্রি) উত্তর আফ্রিকা, খুরাসান, তাবারিস্তান ও ইস্পাহানে প্রবল ভূমিকম্প হয়। অধিকাংশ পাহাড় বিদীর্ণ হয়ে যায়। সংশ্লিষ্ট এলাকার অধিবাসীদের অধিকাংশই ভূমিতে প্রোথিত হয়ে যায়। মিসরে পাঁচ সের ওজনের শিলাবৃষ্টি হয়। আলেপ্পোতে ২৪৩ হিজরীতে রমযান (৮৫৮ খ্রি জানুয়ারি) মাসে লোকজন একটি পাখিকে এ কথা বলে উড়ে যেতে দেখে যে, হে লোকজন! আল্লাহ্‌কে ভয় কর। তারপর উড়ে যাওয়ার পূর্বে চল্লিশবার আল্লাহ আল্লাহ উচ্চারণ করে। পরদিনও ঐ একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়। আলেপ্পোবাসীরা রাজধানীতে এ সংবাদ প্রেরণ করে এবং পাঁচশ প্রত্যক্ষদর্শী এ ঘটনার সত্যতার সাক্ষী প্রদান করে। ২৪৫ হিজরীতে (৮৫৯-৬০ খ্রি) পৃথিবীব্যাপী প্রবল ভূমিকম্পে অনেক শহর ও দুর্গ বিধ্বস্ত হয়। এন্টিয়কের একটি পাহাড় সমুদ্রবক্ষে নিমজ্জিত হয়। মক্কাবাসীদের ঝর্ণাধারাসমূহে অকস্মাৎ পানির অভাব দেখা দেয়। মুতাওয়াক্কিল আরাফাত থেকে পানি আনয়নের জন্য এক লক্ষ দিরহাম ব্যয় করেন। আকাশ থেকে বিকট আওয়াজ শোনা যায়।

মুতাওয়াক্কিল অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। কবি-সাহিত্যিকদেরকে তিনি এতবেশি পারিতোষিকাদি দান করেন যে, ইতিপূর্বে অন্য কোন খলীফা তেমনটি করেননি। তাঁরই শাসনামলে হযরত যুন্নুন মিসরী এতবেশি অলৌকিক কার্যকলাপ প্রদর্শন করেন যে, ইমাম মালিকের শাগরিদ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল হাকিম এতে ক্ষিপ্ত হয়। এ জন্যে যুন্নুন মিসরীকে যিন্দীক বলে অভিহিত করেন যে, তিনি এমন এক বিদ্যার আবিষ্কারক যা ইতিপূর্বে কোন বুযুর্গ অলিআল্লাহ প্রদর্শন করেন নি। মিসরের গভর্নর যুন্নুন মিসরীকে ডেকে এর ব্যাখ্যা চাইলে

তিনি তার যে জবাব দেন তাতে গভর্নর আশ্বস্ত হন এবং মুতাওয়াক্কিলের দরবারে তাঁর সপক্ষে প্রতিবেদন প্রেরণ করেন। ফলশ্রুতিতে মুতাওয়াক্কিল যুন্নুন মিসরীকে রাজধানীতে আমন্ত্রণ জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শ্রবণ করেন। তাঁর বক্তব্য শ্রবণে খলীফা অভিভূত হন এবং তাঁকে পরম সম্মান প্রদর্শন করেন। মুতাওয়াক্কিলের নিহত হওয়ার পর জনৈক ব্যক্তি স্বপ্নে তাঁকে প্রশ্ন করলেন, আল্লাহ্ আপনার সাথে কী আচরণ করলেন ? জবাবে তিনি জানালেন, সুন্নতের পুনর্জীবন ঘটানোর প্রয়াসের জন্য আল্লাহ তা'আলা আমাকে মাগফিরাত দান করেছেন।

ইব্ন আসাকির লিখেন যে, একদা মুতাওয়াক্কিল স্বপ্নে দেখেন যে, আকাশ থেকে একটি চতুষ্কোণ মুরব্বা পতিত হলে তাতে লেখা আছে ঃ

'জা'ফর আল-মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ্'

তারপর তাঁর অভিষেক অনুষ্ঠানের সময় যখন তাঁর খেতাব কি হবে এ নিয়ে চিন্তাভাবনা করা হচ্ছিল তখন কেউ প্রস্তাব করলেন মুনতাসির বিল্লাহ, আবার কেউ কেউ অন্যান্য প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। কিন্তু যখন মুতাওয়াক্কিল উপস্থিত উলামা ও বিজ্ঞজনদের সম্মুখে তাঁর উক্ত স্বপ্ন বৃত্তান্ত বর্ণনা করলেন তখন সকলে মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ্ খেতাবই পছন্দ করলেন।

একবার মুতাওয়াক্কিল তাঁর দরবারে উলামাদের আমন্ত্রণ জানালেন। আলিম-উলামায়ে কিরাম এসে সমবেত হলে মুতাওয়াক্কিল সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর আগমন দর্শনে সমস্ত উলামায়ে কিরাম উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করলেন। উক্ত সমাবেশে আহমদ ইব্ন মা'দলও উপস্থিত ছিলেন। তিনিও দরবারে আমন্ত্রিত আলিম অতিথি ছিলেন। কিন্তু সকলে দণ্ডায়মান হয়ে সম্মান প্রদর্শন করলেও তিনি মোটেই দাঁড়াবার নাম নিলেন না। বিস্মিত হয়ে মুতাওয়াক্কিল তাঁর উযীর উবায়দুল্লাহকে লক্ষ্য করে বললেন, এ লোকটি আমার হাতে বায়আত হয়নি? জবাবে মন্ত্রী প্রথমে জানালেন, তিনি বায়আত হয়েছেন সত্য, কিন্তু তিনি চোখে একটু কম দেখেন। আহমদ ইব্ন মা'দল তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন, আমার দৃষ্টি শক্তি ঠিকই আছে। কিন্তু আমি আপনাকে আল্লাহ্র শাস্তি থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যেই দণ্ডায়মান হইনি। কেননা, হাদীস শরীফে আছে, যে ব্যক্তি এরূপ আকাঙ্ক্ষা করে যে, লোকে তাকে দেখে তার সম্মানার্থে দণ্ডায়মান হোক, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা খুঁজে নেয়। এ জবাব শুনে মুতাওয়াক্কিল তাঁর পার্শ্বে এসে আসন গ্রহণ করলেন।

ইয়াযীদ মুহাল্লাবী বলেন, একদা মুতাওয়াক্কিল আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, ওহে! খলীফাগণ কেবল এ জন্যে প্রজাদের প্রতি কঠোরতা আরোপ করতেন যেন লোকে তাদেরকে সমীহ করে। কিন্তু আমি তাদের সাথে নম্র আচরণ করি এ জন্যে যেন তারা প্রসন্নমনে আমার আনুগত্য করে। উমর শায়বানী বলেন, নিহত হওয়ার দুইমাস পরে আমি মুতাওয়াক্কিলকে স্বপ্নে দেখলাম। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ্ তা'আলা আপনার সাথে কী আচরণ করলেন?

জবাবে তিনি বললেন, নবীর সুন্নতকে জিন্দা করার প্রয়াসের জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আমি তখন আবার জিজ্ঞেস করলাম, আপনার হত্যাকারীদের কি হবে। জবাবে তিনি বললেন ঃ আমি আমার পুত্র মুহাম্মদ (মুনতাসির)-এর অপেক্ষা করছি, সে এসে পৌঁছামাত্র আমি আল্লাহর দরবারে তার বিরুদ্ধে নালিশ করবো।

খলীফা মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ্ শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। আর তিনিই প্রথম খলীফা– যিনি শাফিঈ মাযহাব আবলম্বন করেন।

মুনতাসির বিল্লাহ্

মুনতাসির বিল্লাহ্ (ইব্‌ন মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ্ ইব্‌ন মুতাসিম বিল্লাহ্ ইব্‌ন হারূনুর রশীদ)-এর আসল নাম ছিল মুহাম্মদ আর তাঁর কুনিয়াত ছিল আবূ জা'ফর ও আবূ আবদুল্লাহ। ২২৩ হিজরী (৮৩৮ খ্রি) সনে সামরায় রুমিয়া জশিয়া নাম্নী বাঁদীর গর্ভে তাঁর জন্ম হয়। পিতা মুতাওয়াক্কিলকে ঘাতক হস্তে হত্যা করিয়ে ২৪৭ হিজরীর ৪ঠা শাওয়াল (৮৬২ খ্রি নভেম্বর) তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। খলীফা পদে আসীন হয়েই তিনি তার পিতা কর্তৃক সিংহাসনে মনোনীত অপর দুই উত্তরাধিকারী ভ্রাতৃদ্বয় মুতাজ্জ ও মুওয়াইয়াদের উত্তরাধিকারী পদ বাতিল করেন।

তুর্কীরা তখন খিলাফতের উপর জেঁকে বসেছিল। দিন দিন তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেয়েই চলেছিল। মুনতাসিরকে তো এই তুর্করাই খলীফার পদে বসিয়েছিল। এ জন্যে তারা তখন আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তাদের এই ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা দৃষ্টে মুনতাসির প্রমাদ গুনলেন। তিনি ভাবলেন যে, তাদের এ ক্রমবর্ধমান প্রভাব-প্রতিপত্তি এক সময় তার জন্যে কাল হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাই তিনি তাদের ক্ষমতা খর্ব করতে মনস্থ করলেন।

তিনি তার ছয় মাসের খিলাফত আমলে শিয়াদের প্রতি অনেক আনুগত্য প্রদর্শন করেন। ইমাম হুসাইন (রা)-এর মাযার যিয়ারত করার পুন অনুমতি তিনি প্রদান করেন। তিনি আলীপন্থীদেরকে তাদের সমুদয় অনুষ্ঠান স্বাধীনভাবে করার অনুমতি প্রদান করেন। খলীফা পদে আসীন হয়ে তিনি আহমদ ইব্‌ন খুসায়বকে মন্ত্রীত্ব এবং বগাকবীরকে প্রধান সেনাপতি পদ অর্পণ করেন। বগাকবীর প্রমুখ তুর্কী সর্দারদের প্ররোচনায়ই তিনি তাঁর ভ্রাতৃদ্বয়কে খিলাফতের উত্তরাধিকার বাতিল করেন। তিনি যখন তুর্কীদের ক্ষমতা খর্ব করার চেষ্টায় রত হলেন তখন তুর্কীরা তাঁর বুদ্ধিমত্তার ও সাহসিকতার জন্যে এ উদ্দেশ্যে তিনি যে সফলকাম হবেন সে ব্যাপারে প্রায় নিশ্চিত ছিলেন। তাই তারা তাঁর চিকিৎসক ইব্‌ন তাইফুরকে ত্রিশ হাজার দীনার উৎকোচ দিয়ে বিষ প্রয়োগে তাঁকে হত্যা করায়। উক্ত চিকিৎসক রক্তমোক্ষণের ছলে তাঁর উপর বিষ প্রয়োগ করে।

২৪৮ হিজরীর ৫ই রবিউল আউয়াল (৮৬২ খ্রি মে মাসে) মাত্র ছয় মাসেরও কম সময় খলীফা পদে আসীন হয়ে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর মাকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ আম্মা! আমার দীন ও দুনিয়া উভয়কুলই নষ্ট হলো। আমি আমার পিতার মৃত্যুর হেতু হই এবং এখন স্বল্পসময়ের ব্যবধানে তাঁরই পশ্চাদনুসরণ করছি। পারস্য সম্রাট কিসরার বংশের জনৈক রাজকুমার শেরোইয়া তার পিতাকে হত্যা করেছিল। সেও কয়েকমাসের বেশি আয়ু লাভে সমর্থ হয়নি।

মুসতাঈন বিল্লাহ্

মুসতাঈন বিল্লাহ্ (ইব্‌ন মু'তাসিম বিল্লাহ্ ইব্‌ন হারূনুর রশীদ)-এর আসল নাম ও উপনাম ছিল আবুল আব্বাস। তিনি ছিলেন গৌরবর্ণের এক সুপুরুষ। মুখে গুটি বসন্তের দাগ ছিল এবং তিনি তোতলা ছিলেন। মাখারিক নাম্নী দাসীর গর্ভে ২২১ হিজরীতে (৮৩৬ খ্রি) তিনি ভূমিষ্ঠ হন। মুনতাসিরের মৃত্যুর পর কে খলীফা হবেন সে ব্যাপারে খলীফার পারিষদবর্গের বৈঠক বসলো। মুতাওয়াক্কিলের সন্তানদ্বয় মুতাজ্জ ও মুওয়াইয়াদ তখনো জীবিত ছিলেন, কিন্তু

তুর্কী অমাত্যরা তাদের ব্যাপারে নিঃশঙ্ক ছিলনা। আর তারাই মূলত তাঁদেরকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করার মন্ত্র যুগিয়েছিল, তাই এবার তারা মুতাসিম বিল্লাহ্‌র পুত্র আহমদকে সিংহাসনে বসালো। এখন থেকে তাঁর খেতাব হলো মুসতাঈন বিল্লাহ্। মুসতাঈন বিল্লাহ অত্যন্ত পুণ্যবান, জ্ঞানী, সাহিত্যিক ও সুভাষী ছিলেন। ৬ রবিউস সানি, ২৪৮ হিজরীতে (জুন ৮৬২ খ্রি.) সিংহাসনে আরোহণ করেন। মুসতাঈনের অভিষেক অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে যখন তাঁকে নিয়ে খলীফার প্রাসাদের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহির ও প্রজাসাধারণ গোলযোগ ও হৈহল্লা করে তাঁর প্রতি অনাস্থা ও মুতাজ্জ-এর খিলাফতের সপক্ষে ধ্বনি দেয়। তুর্কীরা এদেরকে দমন করে।

উভয়পক্ষের যুদ্ধে গোলযোগকারীদের অনেকেই নিহত হয়। পরাস্ত হয়ে অনেকে প্রাণ নিয়ে পলায়ন করে। এদিকে জোর লড়াই চলছিল অপরদিকে তুর্কীরা মুসতাঈন বিল্লাহ্‌র হাতে বায়আত করছিল। গোলযোগ দমন হয় এবং পারিতোষিকাদির বণ্টন হতে থাকে। মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহিরের কাছে বায়আতের জন্য পয়গাম প্রেরণ করা হলো। তিনিও এসে যথারীতি বায়আত করলেন। বায়আত গ্রহণ সম্পন্ন হওয়ার পর সংবাদ এলো যে, খুরাসানের গভর্নর তাহির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ তাহির মারা গেছেন। মুসতাঈন বিল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্‌ন তাহিরকে তার স্থলে খুরাসানের গভর্নর নিযুক্ত করলেন।

এরই মধ্যে খুরাসানের পূর্বাঞ্চলে নিযুক্ত শাসক হুসাইন ইব্‌ন তাহির ইব্‌ন হুসাইনেরও মৃত্যু হয়ে যায়। তার স্থলে মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহিরকে নিযুক্তি দেয়া হয়। তার চাচা তালহাকে নিশাপুরের এবং তার পুত্র মানসূরকে সারাখ্‌স ও খাওয়ারিযমের শাসন ক্ষমতা অর্পিত হয়। হুসাইন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌কে হিরাতের শাসক নিযুক্ত করা হয় এবং তাঁর চাচা সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌কে তাবারিস্তানের এবং তাঁর চাচাত ভাই আব্বাসকে জুজান ও তালিকানের শাসক করে পাঠান।

২৪৮ হিজরীতে (৮৬২ খ্রি.) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন খাকান হজ্জে গমনের অনুমতি প্রার্থনা করেন। খলীফা তাঁকে অনুমতি দিলেন সত্য, কিন্তু তাঁর রওয়ানা হওয়ামাত্র জনৈক সর্দার আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়াকে গ্রেফতার ও দেশান্তরিত করার নির্দেশ প্রদান করেন। উক্ত সর্দার তাঁকে গ্রেফতার করে রিক্কায় দেশান্তরিত করে। ঐ দিনগুলোতেই তুর্কীরা মুতাজ্জ এবং মুওয়াইয়াদকে হত্যা করতে মনস্থ করে। আহমদ ইব্‌ন খুসায়ব তাদেরকে এ অন্যায় কাজ থেকে বারণ করেন। খলীফা মুসতাঈন সিংহাসনে বসেই জনৈক তুর্কী সর্দার তামেশকে উযীর এবং আহমদ ইব্‌ন খুসায়বকে নায়েবে উযীর পদে নিয়োগ করেন। মুতাজ্জ এবং মুওয়াইয়াদকে খলীফা জুসাক নামক একটি স্থানে নজরবন্দী করে রাখেন। তামেশকে উযারত ছাড়াও মিসর ও মাগরিবের গভর্নর পদে নিযুক্ত করেন। বগা কবীরকে হুলওয়ান ও মাসবুযান শাসনের সনদ দান করা হয়। আশনাসকে সিপাহ্‌সালার ও সংস্থাপন বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়। মোটকথা, রাষ্ট্রের সকল বড় বড় পদে তুর্কীদেরকে বসানো হলো।

২৪৯ হিজরীতে (৮৬৩ খ্রি.) রোমানদের পক্ষ থেকে হামলা হলো। তাদের হামলা প্রতিহত করতে গিয়ে আমর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ও আলী ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া নামক দু'জন বিখ্যাত সর্দারসহ

অনেক মুসলমান শাহাদাতবরণ করেন। উক্ত সর্দারদ্বয়ের মৃত্যু সংবাদে বাগদাদে শোকের কালো ছায়া নেমে আসে। তুর্কীদের বিরুদ্ধে লোকজন বলাবলি করতে লাগলো যে, শক্তি হাতে পেয়ে তারা খলীফাগণকে হত্যা ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গকে অপদস্থ করতে খুবই পারঙ্গমতার পরিচয় দেয়। কিন্তু কাফির বহিঃশত্রুর আক্রমণের মুখে কোনই যোগ্যতা ও তৎপরতার পরিচয় দিতে পারেনি যার ফলে ইসলামের দু'জন মহান সর্দারকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রাণ দিতে হলো এবং রোমানদের ঔদ্ধত্য বৃদ্ধি পেল।

এ জাতীয় আলোচনা সমালোচনার ফলে বাগদাদে চরম অসন্তোষ দেখা দিল। লোকজন জিহাদের জন্যে প্রস্তুত হতে লাগলো। চতুর্দিক থেকে মুসলমানরা জিহাদের উদ্দেশ্যে রাজধানীতে এসে সমবেত হতে লাগলো। মুসলমান আমীর-উমরাগণ এজন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ সংকুলানের ব্যবস্থা করেন। বাগদাদ থেকে বিপুল সংখ্যক মানুষ জিহাদের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে। মুসতাঈন ও তাঁর আমলাবর্গ সামার্‌রায় নির্লিপ্তভাবে বসে তা অবলোকন করতে থাকলেন। তারা এ ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করলেন না। অবশেষে মুসলমানরা সামার্‌রায় পৌঁছেও চরম অসন্তোষ প্রদর্শন করেন। তারা কারাগার ভেঙ্গে বন্দীদেরকে মুক্ত করেন। তারপর তুর্কী সর্দার বগা, ওসীফ ও আতামেশ তুর্কী বাহিনী নিয়ে মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। জনতার অনেকেই প্রাণ হারালো। তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনায় ভাটা পড়ে গেল। আতামেশের শক্তি ও সুবিধা যেহেতু অপেক্ষাকৃত বেশি ছিল এবং রাজকোষের অর্থ যথেষ্ট ব্যবহারের অধিকারও তিনি সংরক্ষণ করতেন তাই বগা ও ওসীফ তাঁর প্রতি ঈর্ষা পোষণ করতেন। তাঁরা আতামেশের পরে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আলীকে উযীর পদ দান করেন। অল্পকাল যেতে না যেতেই বগা সগীর এবং উযীর আবূ সালিহ্ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আলীর মধ্যে রেষারেষি ও সংঘাত দেখা দিল।

আবূ সালিহ্ আবদুল্লাহ্ বগা সগীরের ভয়ে সামাররা ছেড়ে বাগদাদে গিয়ে উঠলেন। খলীফা মুসতাঈন মুহাম্মদ ইব্‌ন ফযল জুরজানীকে উযীর পদে নিযুক্তি প্রদান করলেন। মোটকথা, খলীফা মুসতাঈন তুর্কীদের একেবারে হাতের ক্রীড়নক হয়ে গেলেন। সামাররায় তখন তুর্কীদেরই বাস। এজন্যে তুর্কীদের কবল থেকে মুক্ত হওয়ার কোন চেষ্টাও খলীফা করতে পারতেন না। এমনি যখন অবস্থা তখন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আমের ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন হুসাইন ইব্‌ন যাইদ শহীদ– যাঁর উপনাম ছিল আবুল হুসাইন, কূফায় বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। কূফায় তখন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ তাহিরের পক্ষ থেকে আইউব ইব্‌ন হুসাইন ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন সুলায়মান ইব্‌ন আলী ওয়ালী নিযুক্ত ছিলেন। আবুল হুসাইন আইউবকে কূফা থেকে বের করে দিলেন এবং শাহী বায়তুলমাল লুট করে কূফায় তাঁর পূর্ণদখল প্রতিষ্ঠা করলেন।

এরপর আবুল হুসাইন কূফা থেকে ওয়াসিতের দিকে অগ্রসর হলেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহির তখন হুসাইন ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন মুস্‌আব তার মুকাবিলার জন্য প্রেরণ করলেন। পথিমধ্যে উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হলো। আবুল হাসান তাকে পরাস্ত করে বিজয়ীর বেশে কূফায় ফিরে এলেন। বাগদাদবাসীরাও তখন তার সাহয্যার্থে এগিয়ে আসলেন। হুসাইন ইব্‌ন ইসমাঈল পুনরায় প্রস্তুতি নিয়ে আবুল হুসাইন ইয়াহ্‌ইয়ার

উপর আক্রমণ চালালেন। ইয়াহ্ইয়া কূফা থেকে বের হয়ে তার মুকাবিলা করলেন। তুমুল যুদ্ধের পর এবার আবুল হুসাইন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন উমর নিহত হলেন। তাঁর শির কেটে সামাররায় খলীফা মুসতাঈনের দরবারে প্রেরণ করা হলো। মুসতাঈন তা একটি সিন্দুকে পুরে অস্ত্রাগারে রেখে দিলেন। আবুল হাসান ইয়াহ্ইয়া হত্যার এ ঘটনাটি ঘটে ২৫০ হিজরী ১৫ই রজব (আগস্ট ৮৬৪ খ্রি.)।

আবুল হুসাইনকে পরাস্ত করার পুরস্কারস্বরূপ খলীফা মুসতাঈন আবদুল্লাহ্ ইব্ন তাহিরকে তাবারিস্তানে বেশ কয়েকটি জায়গীর প্রদান করেন। খলীফার প্রদত্ত এ জায়গীরগুলোর একটি ছিল দায়লাম সীমান্তের নিকটবর্তী অঞ্চলে। ঐ জায়গীরটির দখল নেয়ার জন্যে যখন মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ আমিল তথায় গিয়ে উপস্থিত হলেন তখন রুস্তম নামক এক ব্যক্তি তাকে বাধা দিল। দায়লামবাসীরা রুস্তম ও তার পুত্রদ্বয় মুহাম্মদ ও জা'ফরের পক্ষ অবলম্বন করলো। তাবারিস্তানে তখন মুহাম্মদ ইব্ন ইবরাহীম উলুভী অবস্থান করছিলেন। মুহাম্মদ ও জা'ফর ভ্রাতৃদ্বয় তাঁর সমীপে উপস্থিত হয়ে তাঁকে বললো যে, আপনি আমীর হওয়ার দাবি করুন, আমরা আপনার পাশে দাঁড়াবো। তিনি বললেন, তোমরা রে-নগরীতে গিয়ে হাসান ইব্ন যাইদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন হাসান ইব্ন যাইদ ইব্ন হাসান সিবতের খিদমতে গিয়ে এ আবেদন জানাও। তিনিই হচ্ছেন আমাদের অনুসরণীয় নেতা।

মুহাম্মদ ও জা'ফর তাদের পিতা রুস্তমের কাছে এসে তা বিবৃত করলেন। তিনি এ উদ্দেশ্যে এক ব্যক্তিকে রে-তে প্রেরণ করলেন। হাসান ইব্ন যাইদ সেখান থেকে তাবারিস্তানে চলে আসেন। দায়লাম ও বায়ান প্রভৃতি এলাকা থেকে লোক সেখানে এসে তাঁর হাতে বায়আত গ্রহণ করতে শুরু করে। দেখতে দেখতে এক বিরাট সংখ্যক জনতা তাঁর চারপাশে এসে জমায়েত হয়। হাসান ইব্ন যাইদ তাবারিস্তান দখল করে বসলেন। তারপর রে-ও তাঁর দখলে চলে আসে। এ সংবাদ পেয়ে মুসতাঈন হামাদান রক্ষার জন্যে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করলেন। কিন্তু এ বাহিনী পরাজিত হলো। তারপর বগাকবীরের পুত্র মূসাকে রাজধানী থেকে সৈন্যসামন্ত দিয়ে এ বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হলো। তিনি তাবারিস্তান তো হাসান ইব্ন যাইদের কবল থেকে উদ্ধার করলেন। কিন্তু দায়লামের উপর তাঁর দখল রয়েই গেল। মূসা সেখান থেকে রে-তে ফিরে আসেন। ইতিমধ্যে খলীফা মুসতাঈন দলীল ইব্ন ইয়াকূব নাসরানীকে তাঁর উযীর মনোনীত করলেন। স্বল্পকালের মধ্যেই বাগর নামক জনৈক তুর্কী সর্দারের সাথে ঐ নাসরানী উযীরের বিরোধ দেখা দেয়। এ ব্যাপারে বগা সগীর ও ওসীফ দু'জনেই বাগরকে দোষী সাব্যস্ত করেন। খলীফা তাকে বন্দী করেন। তুর্কীরা তখন গোলযোগ সৃষ্টি করে। তুর্কীদের এ গোলযোগলক্ষ্যে বগা সগীর বাগরকে হত্যা করিয়ে ফেলেন। এতে গোলযোগ হ্রাস পাওয়ার পরিবর্তে আরো বৃদ্ধি পায়। গোটা সামাররা বিদ্রোহী হয়ে উঠলো। চতুর্দিকে বিদ্রোহীদের পতাকা উড়তে দেখা গেল। অগত্যা খলীফা মুসতাঈন বাগা, ওয়াসীফ, শাবেক ও আহমদ ইব্ন সালিহ শিরজা সামাররা ত্যাগ করে বাগদাদে এসে উঠলেন। তাঁরা এসে বাগদাদস্থ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন তাহিরের ঘরে উঠলেন। এটা ছিল ২৫১ হিজরীর মুহাররম (ফেব্রুয়ারী ৮৬৫ খ্রি.) মাসের ঘটনা। খলীফার বাগদাদ আগমনে সমস্ত অফিস-আদালতও বাগদাদে স্থানান্তরিত হয়ে গেল।

খলীফার বাগদাদে স্থানান্তরিত হওয়ায় তুর্কীরা অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়। ছয়জন তুর্কী সর্দার বাগদাদে খলীফার দরবারে এসে কাকুতি-মিনতি করে এই মর্মে ক্ষমা প্রার্থনা করে যে, আমরা আমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত ও ক্ষমাপ্রার্থী। আপনি সামাররায় ফিরে চলুন। আমাদের দ্বারা আর কোনরূপ অপ্রীতিকর ব্যাপার সংঘটিত হবে না। খলীফা তাদের অতীতের বিশ্বাসঘাতকতা ও ঔদ্ধত্যসমূহ স্মরণ করিয়ে দিয়ে সামাররায় যেতে অস্বীকৃতি জানালেন। তুর্কীরা তখন সামাররায় গিয়ে মুতাজ্জ ইব্ন মুতাওয়াক্কিলকে কারাগার থেকে মুক্ত করে তাঁকেই খলীফারূপে বরণ করে নেয়। হারূনুর রশীদ তনয় আবূ আহমদও তখন সামাররায় ছিলেন। তাঁকে বায়আতের কথা বলা হলে তিনি বললেন, আমি ইতিপূর্বে মুসতাঈনের হাতে বায়আত গ্রহণ করেছি। আর মুতাজ্জ তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনয়ন বাতিলের ব্যাপারটি নির্বিবাদে মেনে নিয়েছেন। তাই আমি আর নতুন করে বায়আত করতে চাই না। মুতাজ্জ আর এ ব্যাপার নিয়ে উচ্চবাচ্য না করে তাঁকে তাঁর অবস্থার উপর ছেড়ে দেন।

বগাকবীরের পুত্রদ্বয় মূসা ও আবদুল্লাহ্ মুতাজ্জের হাতে আনুগত্যের বায়আত গ্রহণ করলেন। এভাবে আরো যারা মুতাজ্জকে পছন্দ করতেন তারা সকলেই একে একে সামাররায় গিয়ে উঠলেন। পক্ষান্তরে যারা মুসতাঈনকে পছন্দ করতেন তারা সামাররা থেকে বাগদাদে চলে আসলেন। বিভিন্ন প্রদেশের গভর্নর ও আলিমগণও এভাবে দু'দলে বিভক্ত হয়ে গেলেন। বাগদাদ ও সামাররায় সমান্তরালভাবে দু'জন খলীফার খিলাফত চলতে লাগলো। মুসতাঈনের পক্ষে প্রধানত তাহিরের বংশের লোকজন এবং খুরাসানীরা ছিল। পক্ষান্তরে প্রায় সমস্ত তুর্কী ও অন্যান্য সর্দার মুতাজ্জর পক্ষ অবলম্বন করে। এগার মাস পর্যন্ত উভয় খলীফার মধ্যে রেষারেষি চলতে থাকে। উভয়ই বাইরের গভর্নরদের আনুগত্য ও সহযোগিতা কামনা করে চিঠিপত্র লিখতেন। এ সংঘর্ষ কেবল বাগদাদ ও সামাররার মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না। বাইরেও এর অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিস্তার লাভ করতে লাগলো। অবশ্য এর বেশি জোর ছিল বাগদাদের উপকণ্ঠে। কেননা বাইরের অমাত্যগণ রাজধানীর শেষ পরিণতি কি দাঁড়ায় তা দেখেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যে উদগ্রীব ছিলেন।

অবশেষে ২৫১ হিজরীর যিলকদ (ডিসেম্বর ৮৬৫ খ্রি.) মাসের শেষদিকে আবদুল্লাহ্ ইব্ন তাহিরের পুত্র মুহাম্মদ বাগদাদের মুসতাঈন বিল্লাহ্‌র বাহিনীর সিপাহ্‌সালার রূপে বাগদাদ অবরোধকারী তুর্কীদের উপর তীব্র আক্রমণ পরিচালনা করে তাদেরকে পরাস্ত করলেন। তারা তখন পলায়নের পথ ধরলো। বাগদাদে মুসতাঈনের সাথে অবস্থানকারী বগা ও ওসীফ তাদের ছোট ছোট বাহিনী নিয়ে মুহাম্মদের সাথে যোগ দেন। অবশ্য তখন মুসতাঈনের বাহিনীতে খুব কম তুর্কীই ছিলেন। বগা ও ওসীফ যখন তাদের স্বজাতি তুর্কী ভাইদেরকে খুরাসানী ও ইরাকী বাহিনীর মুকাবিলায় অসহায়ের মত পলায়নপর লক্ষ্য করলেন তখন তাদের জাত্যাভিমান জেগে উঠলো। তারা তৎক্ষণাৎ আনুগত্য পরিবর্তন করে পরাজিত তুর্কী সেনাদের দলে গিয়ে ভিড়লেন। তাঁদেরকে দল ও আনুগত্য পরিবর্তন করতে দেখে তুর্কীদের মনোবল ফিরে পেল। তারা তাদের ছত্রভঙ্গ বাহিনীকে পুনর্বিন্যস্ত করে পুনরায় বাগদাদ অবরোধ করে বসলো।

এদিকে শহরে মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন তাহিরের বিরুদ্ধে গুজব রটানো হলো যে, তিনি জেনেশুনে খলীফাকে বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছেন। এসব গুজব শুনে তাঁর মনও দমে

গেল। অবশেষে ২৫২ হিজরীর ৬ই মুহাররম (৮৬৬ খ্রি ২৭ জানুয়ারী) মুসতাঈন বিল্লাহ্ একটি লিখিত ইকরার-নামা প্রেরণ করে আনুষ্ঠানিকভাবে মুতাজ্জ বিল্লাহ্র খিলাফতকে স্বীকৃতি দিয়ে নিজে খিলাফতের দাবি থেকে সরে দাঁড়ালেন। খলীফা মুতাজ্জ বাগদাদে প্রবেশ করে পদচ্যুত খলীফা মুসতাঈনকে নজরবন্দী করে ওয়াসিতে প্রেরণ করলেন। মুসতাঈন সেখানে নয় মাস পর্যন্ত জনৈক আমীরের তত্ত্বাবধানে রইলেন। তারপর সামাররায় চলে আসেন। এবং ২৫২ হিজরীর ৩রা শাওয়াল (অক্টোবর ৮৬৬ খ্রি.) খলীফা মুতাজ্জর ইঙ্গিতে নিহত হন।

মুতাজ্জ বিল্লাহ্

মুতাজ্জ বিল্লাহ ইব্ন মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ্ ইব্ন মুতাসিম বিল্লাহ্ ইব্ন হারূনুর রশীদ ২৩২ হিজরীতে (৮৪৬-৪৭ খ্রি.) সামাররায় ফাতহিয়া নাম্নী জনৈকা রোমানীয় দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ২৫১ হিজরীর মুহাররম (ফেব্রুয়ারী ৮৬৫ খ্রি.) মাসে সামাররায় তিনি খলীফা পদে বরিত হন। এক বছরকাল পর্যন্ত মুসতাঈন বিল্লাহ্র সাথে যুদ্ধবিগ্রহে ব্যস্ত থেকে মুসতাঈনকে খিলাফতের দাবি প্রত্যাহার করাতে সমর্থ হন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সুন্দর সুঠাম দেহের অধিকারী সুপুরুষ। তাঁর সিংহাসনে আরোহণের বছরই তুর্কী অমাত্য আশনাসের মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে আশনাস অর্ধলক্ষ দীনার রেখে যান। মুতাজ্জ তা বাজেয়াপ্ত করে নিজের প্রয়োজনে ব্যয় করেন। মুতাজ্জ যখন খলীফা পদে অধিষ্ঠিত হন তখন তাঁর বয়স ছিল উনিশ বছর মাত্র। তিনি আহমদ ইব্ন ইসরাঈলকে তাঁর উযীর মনোনীত করেন। মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন তাহিরকে তিনি পুলিশ বিভাগের প্রধান নিযুক্ত করেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন তাহিরের পুত্র মুহাম্মদ ছিলেন খুরাসানের গভর্নর, কিন্তু তিনি খুরাসানে তাঁর নায়েব রেখে বাগদাদে অবস্থান করতেন। মুতাজ্জকে তুর্কীরাই ক্ষমতায় বসায় এবং তিনি তুর্কীদের হাতের একেবারে ক্রীড়নক ছিলেন। বাগদাদে যে সৈন্য বাহিনী থাকতো তাতে খুরাসানী ও ইরাকী লোকেরা ছিল। এ বাহিনীকে বেতন-ভাতা বণ্টন করতেন মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্। মুতাজ্জ এ বাহিনীর বেতন-ভাতা যোগান বন্ধ করে দেন।

২৫২ হিজরীর রজব (জুলাই ৮৬৬ খ্রি.) মাসে খলীফা মুতাজ্জ তাঁর ভাই মুওয়াইয়াদীকে খিলাফতের উত্তরাধিকারী পদ থেকে পদচ্যুত করে কারাগারে প্রেরণ করেন এবং সেখানেই তাকে হত্যা করানো হয়।

২৫২ হিজরীর রমযান (সেপ্টেম্বর ৮৬৬ খ্রি.) মাসে বেতন-ভাতা না পাওয়ায় বাগদাদের সৈন্যবাহিনীতে বিদ্রোহ দেখা দেয়। তারা মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্র উপর আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ অতিকষ্টে সে বিদ্রোহ দমন করেন। এ বছরই সৈন্যবাহিনীর তুর্কী ও আরবদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। উভয়পক্ষে চরম কোন্দল চলে। বাগদাদবাসীরা আরবদের পক্ষ অবলম্বন করে, কিন্তু তুর্কীরা কূটনীতির জোরে ধোঁকা দিয়ে আরব সৈন্য ও সর্দারদেরকে হত্যা ও দেশান্তরিত করে। ঐ বছরই খলীফা মুতাজ্জ হুসাইন ইব্ন আবূ শাওয়ারিরকে কাযীউল কুযাত বা প্রধান বিচারপতি পদে নিযুক্তি প্রদান করেন।

খলীফার দাপট ও প্রতিপত্তি যেহেতু প্রায় নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল তাই বিভিন্ন প্রদেশের সুবাদারগণ নিজেদেরকেই তাদের সংশ্লিষ্ট প্রদেশের মালিক-মুখতার ভাবতে লাগলেন। খারিজী

এবং উলুভী (আলীপন্থী)-রা বিদ্রোহীর ধ্বজা উড়াতে লাগলো। মাসাভির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসাভির বাজালী খারিজী মুসেল দখল করে স্বায়ত্তশাসনের ঘোষণা দিয়ে দিল। খলীফার পক্ষ থেকে যে সর্দারকে তার সাথে মুকাবিলা করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হলো সে তাকে পরাস্ত করে রীতিমত তাড়িয়ে দেয়।

২৫৩ হিজরীতে (৮৬৭ খ্রি.) তুর্কীরা তাদের সেনাপতি ওসীফ, বগা ও সীমা তবীলের কাছে চার মাসের অগ্রিম বেতন-ভাতা দাবি করে বসলো। তাঁরা জানালেন যে, রাজকোষ অর্থশূন্য, তাই এ দাবি মিটানো সম্ভব নয়। তাতে তুর্কীরা অশান্ত হয়ে উঠলো। সর্দাররা তখন খলীফা মুতাজ্জকে তা অবগত করলেন। কিন্তু বেচারা মুতাজ্জই বা কি করতে পারতেন। বিক্ষুব্ধ তুর্কীরা তখন ওসীফকে ধরে নিয়ে হত্যা করলো। কিছুদিনের মধ্যেই বাবকিয়াল ও বগা সগীরের মধ্যে রেষারেষির সূত্রপাত হলো। খলীফা বাবকিয়ালের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করতে লাগলেন। বগা তখন খলীফাকে হত্যার ফন্দিফিকির করতে লাগলেন। যথাসময়ে মুতাজ্জ তা আঁচ করতে পারলেন। বাবকিয়ালের লোকজনরা তখন বগাসগীরকে হত্যা করে এ ষড়যন্ত্রের যবনিকাপাত ঘটায়।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহিরের মৃত্যু

খুরাসানের গভর্নর মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহির ২৫৩ হিজরীতে (৮৬৭ খ্রি.) বাগদাদে ইনতিকাল করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর পুত্র উবায়দুল্লাহকে তার স্থলে খুরাসানের গভর্নর নিয়োগের ওসীয়ত করে যান। কিন্তু তার অপর পুত্র ও উবায়দুল্লাহ্‌র ভাই তাহির ইব্‌ন মুহাম্মদ তার বিরোধিতা করেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌র জানাযার জামাআতেই উভয় ভাইয়ের মধ্যে সংঘর্ষ দেখা দেয়। অবশেষে পিতার অন্তিম ইচ্ছানুসারে উবায়দুল্লাহ্ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন বলে স্বীকৃত হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত খলিফা মুতাজ্জ সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহিরকেই মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহিরের স্থলাভিষিক্ত করেন। তিনি বাগদাদে অবস্থান করে গুরুদায়িত্ব পালন করে যান।

আহমদ ইব্‌ন তূলূন

তুর্কী সর্দারদের মধ্যে বাবকিয়াল ও বগা ওসীফ ও সীমা তবীলের মত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও খ্যাতনামা সর্দার ছিলেন। ২৫৩ হিজরীতে (৮৬৭ খ্রি.) খলীফা মুতাজ্জ বিল্লাহ্ বাবকিয়ালকে মিসরের গভর্নরী মসনদদান করেন। বাবকিয়াল তাঁর পক্ষ থেকে আহমদ ইব্‌ন তূলূনকে মিসরের নায়েব নিযুক্ত করে পাঠান। তূলূন একজন তুর্কী ছিলেন। বাল্যকালে ফারগানায় যুদ্ধে বন্দী হয়ে আসেন। খলীফার খানদানেই তিনি প্রতিপালিত ও বয়ঃপ্রাপ্ত হন। তিনি ছিলেন শাহী পরিবারের গোলামদের অন্তর্ভুক্ত। তার পুত্র আহমদ ইব্‌ন তূলূনও রাজধানীতে প্রতিপালিত হয়ে রাজনীতি ও রাজ্য পরিচালনার জ্ঞান অর্জন করেন। বাবকিয়াল মিসরের গভর্নরীর সনদ হাতে পেয়েই কাকে মিসরে তাঁর নায়েব নিযুক্ত করবেন চিন্তাভাবনা করতে লাগলেন। তাঁর মন্ত্রণাদাতারা আহমদ ইব্‌ন তূলূনের নাম প্রস্তাব করলেন। সে মতে তিনি তাঁকে মিসরে পাঠিয়ে দেন। আহমদ মিসরের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে রাজ্য পরিচালনা করতে থাকেন।

মুতাজ্জর পর মুহ্তাদী খলীফা হয়ে যখন বাবকিয়ালকে হত্যা করে অপর তুর্কী সর্দার ইয়ারকূজকে মিসরের গভর্নর মনোনীত করলেন তখন ইয়ারকূজও ইব্ন তূলূনকেই তাঁর নায়েবরূপে মিসরের শাসন ক্ষমতায় বহাল রাখলেন। এভাবে আহমদ ইব্ন তূলূন মিসরে অত্যন্ত দৃঢ়তা অর্জন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বংশধরগণ বংশানুক্রমে মিসরে রাজত্ব করেন এবং নিজেদের নামে মুদ্রা পর্যন্ত চালু করেন। মোটকথা ২৫৩ হিজরী (৮৬৭ খ্রি.) থেকে মিসরকে খিলাফতে আব্বাসীয় গর্ভনর বহির্ভূতই ধরতে হবে। কমপক্ষে এতটুকু বলতে হয় যে, ২৫৩ হিজরীতে (৮৬৭ খ্রি) মিসরে তূলূন বংশের রাজত্বের সূত্রপাত হয়।

ইয়াকূব ইব্ন লায়ছ সিফার

ইয়াকূব ইব্ন লায়ছ এবং তাঁর ভাই আমর ইব্ন লায়ছ উভয়ে সিজিস্তানে তামা ও পিতলের পাত্রের ব্যবসা করতেন। এ সময়ে যেহেতু খিলাফতে দুর্বলতার সুযোগ চতুর্দিকে বিদ্রোহ দেখা দিচ্ছিল তাই এ সুযোগে খারিজীরাও মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। তাদের মুকাবিলায় উলুভী তথা আহলে বায়তের সমর্থনেও অনেকে মাথা তুললো। এদের মধ্যে সালিহ্ ইব্ন নযর কিনআনীও আহলে বায়তের শুভাকাঙ্ক্ষী সেজে আত্মপ্রকাশ করলেন। ঐ ব্যক্তি বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করতেই আমীর-উমারা, রঈস ও প্রজাসাধারণের বিরাট একটি দল তাঁর সমর্থনে উঠে দাঁড়ালো। ইয়াকূব ইব্ন লায়ছও এদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েন। সালিহ্ যুদ্ধের মাধ্যমে সিজিস্তান অধিকার করেন এবং তাহিরিয়া খান্দানের লোকজনকে সেখান থেকে বহিষ্কার করেন। এ সাফল্য অর্জনের পরই সালিহ্র মৃত্যু হয়। দিরহাম ইব্ন হাসান নামক এক ব্যক্তি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। কিন্তু খুরাসানের গভর্নর অত্যন্ত চাতুর্যের সাথে তাকে বন্দী করে বাগদাদে পাঠিয়ে দেন। সালিহ্র সমর্থকরা এবার ইয়াকূব ইব্ন লায়ছকে তাদের দলপতিরূপে গ্রহণ করে। ইয়াকূব অত্যন্ত দক্ষতা ও বিচক্ষণতার সাথে সিজিস্তানে তাঁর পূর্ণ দখল প্রতিষ্ঠা করেন এবং মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন তাহিরের পক্ষ থেকে হিরাতে নিযুক্ত আমিল মুহাম্মদ ইব্ন আওস আম্বারীকে হিরাত থেকে বহিষ্কার করে খুরাসানের এলাকাসমূহ দখল করতে শুরু করেন।

এদিকে পারস্য প্রদেশের গভর্নর আলী ইব্ন হুসাইন ইব্ন শিবল কিরমান দখল করতে উদ্যত হন। ওদিকে ইয়াকূব ইব্ন লায়ছও কিরমানে অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পান। আলী ইব্ন হুসাইনের সিপাহ্সালারদেরকে পরাজিত করে ইয়াকূব তাদেরকে তাড়িয়ে দিতে সমর্থ হন। অবশেষে ২৫৫ হিজরীতে (৮৬৯ খ্রি) পারস্যের রাজধানী শিরাজ নগরীতে আক্রমণ পরিচালনা করে তা অধিকার করেন। তারপর তিনি কালবিলম্ব না করে সিজিস্তানে ফিরে আসেন এবং খলীফার দরবারে এ মর্মে একটি দরখাস্ত প্রেরণ করেন যে, এ অঞ্চলে দারুণ গোলযোগ চলছিল। লোকজন আমাকে ধরে তাদের আমীর মনোনীত করেছে। আমি আমীরুল মু'মিনীনের প্রতি অনুগত। তারপর ইয়াকূব ইব্ন লায়ছ পর্যায়ক্রমে খুরাসান থেকে তাহির বংশীয়দেরকে বহিষ্কার করে তার নিজের রাজত্ব গড়ে তুলেন। এতকাল তাহির ইব্ন হুসাইনের বংশধররাই একাধারে খুরাসানে রাজত্ব চালিয়ে আসছিল। এজন্যে খুরাসানের স্বাধীন রাজবংশের ইতিহাস আলোচনা কালে সর্বপ্রথম তাহিরিয়া বংশের উল্লেখ করা হয়ে থাকে। কিন্তু

সত্য কথা হলো, তাহিরীয় বংশীয়রা সর্বদাই খলীফার দরবারের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল এবং এ বংশের কেউ না কেউ বাগদাদের পুলিশ কর্মকর্তা থাকতেনই।

আব্বাসীয় খলীফাদের কোন দিন তাহিরীয় বংশীয়দেরকে খুরাসান থেকে বহিষ্কার করার সাহস হয়নি। কিন্তু তাহিরীয়রা সর্বদাই আব্বাসীয় খলীফাদের অধীন বলেই গণ্য করেছে। তারা খলীফার দরবার থেকে সর্বদাই গভর্নরীর সনদ হাসিল করেন এবং সর্বদাই নির্ধারিত খারাজ সরকারে প্রেরণ করতেন। পক্ষান্তরে ইয়াকূব ইব্ন লায়ছ যে রাজত্বের সূচনা করেন তা ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীন ও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। ইতিহাসে তা সাফারীয় রাজবংশ নামে পরিচিত। যথাস্থানে তা বর্ণিত হবে।

মুতাজ্জ বিল্লাহ্র পদচ্যুতি ও মৃত্যু

খলীফা মুতাজ্জ সম্পূর্ণভাবে তুর্কী সর্দারদের ক্রীড়নক ছিলেন। তারা যাই চাইতো খলীফাকে দিয়ে তাই করাতো। রাজকোষ অর্থশূন্য হয়ে পড়ে। বড় বড় সর্দার ইচ্ছামতো রাজকোষ লুটে নেয়। সৈন্যবাহিনীর লোকজন খলীফার কাছে বেতন-ভাতা দাবি করতো। কিন্তু খলীফা ছিলেন একান্ত অসহায় ও নিরুপায়। অবশেষে একদিন তুর্কীরা আমীরুল মু'মিনীনের দরজায় গিয়ে হট্টগোল সৃষ্টি করে এবং বলে যে, আমাদেরকে কিছু দেয়ার ব্যবস্থা করুন. নতুবা আপনার দক্ষিণহস্ত তথা পরিচালক সত্তা সালিহ্ ইব্ন ওয়াসীফকে আমরা আজ-কালকের মধ্যে হত্যা করবো।

সালিহ্ ইব্ন ওয়াসীফ ছিলেন অত্যন্ত প্রভাবশালী তুর্কী সর্দার। খলীফা তাকে অত্যন্ত ভয় করতেন। এ হট্টগোল প্রত্যক্ষ করে মুতাজ্জ তার মা ফাতহিয়ার কাছে গিয়ে বলেন, আপনার কাছে কিছু ধন-সম্পদ থাকলে তা দিয়ে এদেরকে নিবৃত্ত করুন। ফাতহিয়ার হাতে তখন প্রচুর অর্থ-সম্পদ থাকা সত্ত্বেও তিনি তার অনটনের কথা জানিয়ে অর্থদানে অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন। তুর্কীরা মুহাম্মদ ইব্ন বগা সগীর ও বাবকিয়ালকে তাদের দলে ভিড়িয়ে এদের নেতৃত্বে সশস্ত্র হয়ে খলীফার প্রাসাদের কাছে সমবেত হয়ে খলীফাকে বের হওয়ার আহ্বান জানালো। খলীফা অন্দর থেকে জানালেন যে, তিনি অসুস্থ অবস্থায় ওষুধ সেবন করেছেন বিধায় এখন বেরোতে পারবেন না। তিনি এখন অত্যন্ত দুর্বলতাবোধ করছেন। খলীফার এ জবাবে তুর্কীরা নিবৃত্ত হলো না। তারা বলপূর্বক প্রাসাদের মধ্যে ঢুকে পড়ে তাঁর পা ধরে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে বাইরে এনে বেদম প্রহার করে, গালাগাল দেয় এবং প্রাসাদের সম্মুখে দুপুরের উত্তপ্ত রৌদ্রে খালি মাথায় দাঁড় করিয়ে রাখে। তারপর রাস্তা অতিক্রমকারী প্রত্যেকে এক একটি করে চপেটাঘাত করে তাঁকে চরম অপদস্থ করে পদত্যাগপত্র লিখতে বলে। মুতাজ্জ তাতে অস্বীকৃতি জানালেন। তখন তারা কাযীউল কুযাত হুসাইন ইব্ন আবূ শাওয়ারিবকে ডেকে পাঠালো এবং মন্ত্রী ও অমাত্যবর্গের অধিবেশন আহ্বান করলো। তারপর মুতাজ্জর পদচ্যুতির সপক্ষে কাযী সাহেব ও অমাত্যবর্গের স্বাক্ষর গ্রহণ করে তাকে ভূগর্ভস্থ এক বদ্ধ কামরায় আটক করে। সেখানেই শ্বাসরুদ্ধ হয়ে তিনি মারা যান। এ ঘটনা ঘটে ২৫৫ হিজরীর রজব (৮৬৯ খ্রি জুলাই) মাসে আর মুতাজ্জর মৃত্যু হয় একই সনের ৮ই রমযানে।

তারপর লোকজন বাগদাদ থেকে মুতাজ্জর চাচাত ভাই মুহাম্মদ ইব্ন ওয়াসিককে খলীফা পদে বরণ এবং মুহতাদী বিল্লাহ্ খেতাব প্রদান করে। খলীফা মুতাজ্জর মা পুত্রের গ্রেফতারী ও

সত্য কথা হলো, তাহিরীয় বংশীয়রা সর্বদাই খলীফার দরবারের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল এবং এ বংশের কেউ না কেউ বাগদাদের পুলিশ কর্মকর্তা থাকতেনই।

আব্বাসীয় খলীফাদের কোন দিন তাহিরীয় বংশীয়দেরকে খুরাসান থেকে বহিষ্কার করার সাহস হয়নি। কিন্তু তাহিরীয়রা সর্বদাই আব্বাসীয় খলীফাদের অধীন বলেই গণ্য করেছে। তারা খলীফার দরবার থেকে সর্বদাই গভর্নরীর সনদ হাসিল করেন এবং সর্বদাই নির্ধারিত খারাজ সরকারে প্রেরণ করতেন। পক্ষান্তরে ইয়াকূব ইব্ন লায়ছ যে রাজত্বের সূচনা করেন তা ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীন ও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। ইতিহাসে তা সাফারীয় রাজবংশ নামে পরিচিত। যথাস্থানে তা বর্ণিত হবে।

মুতাজ্জ বিল্লাহ্র পদচ্যুতি ও মৃত্যু

খলীফা মুতাজ্জ সম্পূর্ণভাবে তুর্কী সর্দারদের ক্রীড়নক ছিলেন। তারা যাই চাইতো খলীফাকে দিয়ে তাই করাতো। রাজকোষ অর্থশূন্য হয়ে পড়ে। বড় বড় সর্দার ইচ্ছামতো রাজকোষ লুটে নেয়। সৈন্যবাহিনীর লোকজন খলীফার কাছে বেতন-ভাতা দাবি করতো। কিন্তু খলীফা ছিলেন একান্ত অসহায় ও নিরুপায়। অবশেষে একদিন তুর্কীরা আমীরুল মু'মিনীনের দরজায় গিয়ে হট্টগোল সৃষ্টি করে এবং বলে যে, আমাদেরকে কিছু দেয়ার ব্যবস্থা করুন. নতুবা আপনার দক্ষিণহস্ত তথা পরিচালক সত্তা সালিহ্ ইব্ন ওয়াসীফকে আমরা আজ-কালকের মধ্যে হত্যা করবো।

সালিহ্ ইব্ন ওয়াসীফ ছিলেন অত্যন্ত প্রভাবশালী তুর্কী সর্দার। খলীফা তাকে অত্যন্ত ভয় করতেন। এ হট্টগোল প্রত্যক্ষ করে মুতাজ্জ তার মা ফাতহিয়ার কাছে গিয়ে বলেন, আপনার কাছে কিছু ধন-সম্পদ থাকলে তা দিয়ে এদেরকে নিবৃত্ত করুন। ফাতহিয়ার হাতে তখন প্রচুর অর্থ-সম্পদ থাকা সত্ত্বেও তিনি তার অনটনের কথা জানিয়ে অর্থদানে অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন। তুর্কীরা মুহাম্মদ ইব্ন বগা সগীর ও বাবকিয়ালকে তাদের দলে ভিড়িয়ে এদের নেতৃত্বে সশস্ত্র হয়ে খলীফার প্রাসাদের কাছে সমবেত হয়ে খলীফাকে বের হওয়ার আহ্বান জানালো। খলীফা অন্দর থেকে জানালেন যে, তিনি অসুস্থ অবস্থায় ওষুধ সেবন করেছেন বিধায় এখন বেরোতে পারবেন না। তিনি এখন অত্যন্ত দুর্বলতাবোধ করছেন। খলীফার এ জবাবে তুর্কীরা নিবৃত্ত হলো না। তারা বলপূর্বক প্রাসাদের মধ্যে ঢুকে পড়ে তাঁর পা ধরে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে বাইরে এনে বেদম প্রহার করে, গালাগাল দেয় এবং প্রাসাদের সম্মুখে দুপুরের উত্তপ্ত রৌদ্রে খালি মাথায় দাঁড় করিয়ে রাখে। তারপর রাস্তা অতিক্রমকারী প্রত্যেকে এক একটি করে চপেটাঘাত করে তাঁকে চরম অপদস্থ করে পদত্যাগপত্র লিখতে বলে। মুতাজ্জ তাতে অস্বীকৃতি জানালেন। তখন তারা কাযীউল কুযাত হুসাইন ইব্ন আবূ শাওয়ারিবকে ডেকে পাঠালো এবং মন্ত্রী ও অমাত্যবর্গের অধিবেশন আহ্বান করলো। তারপর মুতাজ্জর পদচ্যুতির সপক্ষে কাযী সাহেব ও অমাত্যবর্গের স্বাক্ষর গ্রহণ করে তাকে ভূগর্ভস্থ এক বদ্ধ কামরায় আটক করে। সেখানেই শ্বাসরুদ্ধ হয়ে তিনি মারা যান। এ ঘটনা ঘটে ২৫৫ হিজরীর রজব (৮৬৯ খ্রি জুলাই) মাসে আর মুতাজ্জর মৃত্যু হয় একই সনের ৮ই রমযানে।

তারপর লোকজন বাগদাদ থেকে মুতাজ্জর চাচাত ভাই মুহাম্মদ ইব্ন ওয়াসিককে খলীফা পদে বরণ এবং মুহতাদী বিল্লাহ্ খেতাব প্রদান করে। খলীফা মুতাজ্জর মা পুত্রের গ্রেফতারী ও

অবমাননা দেখে একটি সুড়ংগ পথে পালিয়ে গিয়ে সামাররায় আত্মগোপন করেন। তারপর মুহ্তাদী খলীফা হলে ২৫৫ হিজরীর রমযান মাসে (আগস্ট ৮৬৯ খ্রি.) সালিহ্ ইব্ন ওয়াসীফ খলীফার নায়েব মনোনীত হলেন। তখন তাঁর কাছে নিরাপত্তা চেয়ে আত্মপ্রকাশ করেন। তারপর অনুসন্ধান করে তার কাছে এক কোটি ত্রিশ লক্ষ দীনার পাওয়া যায়। অথচ মুতাজ্জ মাত্র ৫০,০০০ দীনার তার কাছে চেয়েছিলেন যা দিয়ে অনায়াসে তিনি বিদ্রোহীদেরকে নিবৃত্ত করতে পারতেন। সালিহ ফাতহিয়ার সমস্ত অর্থ-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেন এবং সম্ভাব্য যে, এ পাষাণী হতভাগিনী মাত্র পঞ্চাশ হাজার দীনারের জন্য আপন পুত্রকে হত্যার মুখে ঠেলে দিল অথচ তার হাতে তখন এক কোটি দীনার ছিল। তারপর সালিহ্ ফাতহিয়াকে মক্কাশরীফে পাঠিয়ে দেন। মুতামিদ ক্ষমতাসীন হওয়া পর্যন্ত তিনি মক্কায়ই অবস্থান করেন। অবশেষে সামাররায় এসে ২৬৪ হিজরীতে (৮৭৭ খ্রি) মৃত্যুমুখে পতিত হন।

মুহ্তাদী বিল্লাহ্

মুহতাদী বিল্লাহ্ (ইব্ন ওয়াছিক বিল্লাহ্ ইব্ন মুতাসিম বিল্লাহ্ ইব্ন হারূনুর রশীদ)-এর আসল নাম মুহাম্মদ এবং উপনাম ছিল আবূ ইসহাক। পিতামহ মুতাসিমের শাসনামলে ২১৮ হিজরীতে (৮১৮ খ্রি.) জন্মগ্রহণকারী মুহতাদী ৩৭ বছর বয়সি ২৫৫ হিজরীতে (৮৬৯ খ্রি.) সিংহাসনে আরোহণ করেন।

উজ্জ্বল বর্ণের হালকা-পাতলা গড়নের সুদর্শন, আবিদ, যাহিদ সাধু প্রকৃতির ন্যায়পরায়ণ ও বীর পুরুষ ছিলেন এই খলীফা মুহ্তাদী বিল্লাহ্। ধর্মীয় বিধি-বিধান চালু করার ব্যাপারে তাঁর চেষ্টার অন্ত ছিল না। খলীফা পদে বরিত হওয়ার দিন থেকে নিহত হওয়া পর্যন্ত সর্বদাই রোযা অবস্থায় থাকতেন। কিন্তু এ ব্যাপারে তার কোন সহায়ক সমর্থক ছিল না। এমন এক কুক্ষণে তিনি খলীফা পদে বরিত হন যে, ইসলামী খিলাফতের মর্যাদা পুনরুদ্ধার করা তখন ছিল অত্যন্ত দুঃসহ কাজ। হাশিম ইব্ন কাসিম বলেন ঃ একদিন সন্ধ্যার সময় আমি মুহ্তাদীর কাছে উপবিষ্ট ছিলাম। আমি যখন তাঁর নিকট থেকে বিদায় নিয়ে উঠতে চাইলাম তখন তিনি বললেন, বস! আমি তখন বসলাম। দু'জনে একত্রে ইফতার করে তারপর নামায আদায় করলাম। খলীফা খাবার আনালেন। একটি বেতের ডালিতে পাতলা কয়েকখানা রুটি, একটি পেয়ালাতে লবণ, অপরটিতে শিরকা এবং আরেকটিতে কিছু যয়তুন তেল। এই ছিল আমীরুল মু'মিনীনের খাদ্যসম্ভার। তিনি আমাকে বললেন, খাও। আমি ভাবলাম আসল আহার্য বুঝি তারপরই আসবে। তাই আমি খুবই আস্তে আস্তে খাবার খেতে লাগলাম। খলীফা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, কি হে! তুমি খাচ্ছ না যে। দিনে রোযা ছিলে না ? আমি বললাম, রোযাতো ছিলাম। বললেন, আগামীকাল রোযা থাকবে না? বললাম, রমযান মাস কেন রোযা রাখবো না? বললেন, তাহলে ভালমত খাওয়া দাওয়া কর। এ আশায় বসে থেক না যে, আরো আহার্য-সম্ভার আসবে। কেননা এগুলো ছাড়া আমার এখানে আর কোন খাবারের আয়োজন নেই।

আমি বিস্ময় নেত্রে বললাম ঃ আমীরুল মু'মিনীন! ব্যাপার কি? আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে সর্বাধিক নিয়ামত দিয়ে রেখেছেন অথচ আপনার খাওয়া-দাওয়ার এ অবস্থা? মুহতাদী বললেন, তুমি সত্যই বলেছ। কিন্তু আমি চিন্তা-ভাবনা করে দেখলাম বনী উমাইয়া বংশের খলীফাদের

মধ্যে উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয এমনি একজন খলীফা ছিলেন যিনি অল্প আহার্য গ্রহণ করে এবং প্রজাসাধারণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভেবে শীর্ণকায় হয়ে গিয়েছিলেন। তারপর যখন নিজের খান্দানের খলীফাদের অবস্থা তলিয়ে দেখলাম তখন গোটা বনী আব্বাসের মধ্যে তেমনি একজনও খুঁজে পেলাম না। আমার মন লজ্জায় সংকুচিত হয়ে গেল য, আমরা হাশিমীয় বংশের হয়েও তাদের সমকক্ষ হতে পারলাম না। এ কথা ভেবেই আমি এ জীবন গ্রহণ করেছি।

মুহ্‌তাদী অহেতুক বিনোদন কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করে দেন। গানবাদ্যকে হারাম ঘোষণা করেন, আমিল সচিবদেরকে প্রজাসাধারণের প্রতি অবিচার অত্যাচার করতে কঠোরভাবে বারণ করে দেন। দফতরের নিয়মকানুন তিনি কঠোরভাবে মেনে চলতেন। নিজে প্রতিদিন দরবারে বসতেন এবং দরবারে আমে মামলা-মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করতেন। হিসাবরক্ষকদেরকে পাশে বসিয়ে হিসাব-নিকাশ মিলাতেন।

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, মুহ্‌তাদী বিল্লাহ্‌কেও তুর্কীরাই সিংহাসনে বসিয়েছিল। তুর্কী আমলাদের মধ্যে সর্বাধিক প্রভাব-প্রতিপত্তিশীল সালিহ্ ইব্‌ন ওয়াসীফ মুহ্‌তাদী বিল্লাহ্‌র অভিষেক অনুষ্ঠানের অব্যবহিত পরেই আহমদ ইব্‌ন ইসরাঈল যাইদ ইব্‌ন মুতাজ্জ বিল্লাহ্ ও আবূ নূহ্‌কে গ্রেফতার করে হত্যা করে এবং তাদের ধনসম্পদ বাজেয়াপ্ত করে। তারপর হাসান ইব্‌ন মুয়াল্লাদকেও গ্রেফতার করে তাঁর ধনসম্পদও বাজেয়াপ্ত করে। খলীফা মুহ্‌তাদী বিল্লাহ্ তা অবগত হয়ে অত্যন্ত ব্যথিত হন এবং তাকে মৃদু তিরস্কার করে বলেন, এদেরকে গ্রেফতার করাই কি যথেষ্ট ছিল না ! এদেরকে অযথাই হত্যা করার কি প্রয়োজন ছিল? তারপর মুহ্‌তাদী বিল্লাহ্ সামারিয়া থেকে সমস্ত বায়েজী নর্তকীদেরকে বহিষ্কার করলেন। শাহী মহলে রাখা হিংস্র জন্তুগুলোকে হত্যার এবং শখের কুকুরসমূহকে বের করে দেয়ার নির্দেশ জারি করলেন। তিনি সুলায়মান ইব্‌ন ওহাবকে তাঁর প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করলেন। কিন্তু কূটনৈতিক চালে সালিহ্ বা ওয়াসীফ তাঁকে পরাস্ত করে নিজেই রাজ্য পরিচালনা শুরু করেন। মুতাজ্জর পদচ্যুতি এবং মুহ্‌তাদীর খলীফারূপে অভিষেক অনুষ্ঠানের সময় মূসা ইব্‌ন বগা রাজধানীতে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি তখন কার্য ব্যাপদেশে রে-তে অবস্থান করছিলেন। তিনি যখন সংবাদ পেলেন যে, সালিহ্ মুতাজ্জকে পদচ্যুত করে মুহ্‌তাদীকে খলীফা পদে বসিয়েছে তখন মুতাজ্জর খুনের বদলা নেবার প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করে রাজধানী অভিমুখে রওয়ানা হলেন।

রাজধানীতে উপনীত হয়ে তিনি খলীফার দরবারে হাযির হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তাঁর উপস্থিতি টের পেয়ে সালিহ্ ইব্‌ন ওয়াসিক আত্মগোপন করলো। মূসাকে খলীফার দরবারে হাযির হওয়ার অনুমতি প্রদান করলেন। দরবারে উপস্থিত হয়েই মূসা খলীফাকে বন্দী করে একটি খচ্চরে আরোহণ করিয়ে বন্দীশালার দিকে নিয়ে যেতে উদ্যত হলো। মুহতাদী বললেন, মূসা, আল্লাহ্‌কে ভয় কর। শেষ পর্যন্ত তুমি কি করতে যাচ্ছ? জবাবে মূসা বললেন, আমার মনে কোন দুরভিসন্ধি নেই। তবে আপনি অঙ্গীকার করুন যে, আপনি সালিহ্-এর প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাবেন না। খলীফা এতে সম্মত হলে মূসা তৎক্ষণাৎ খলীফার হাতে আনুগত্যের শপথ নিলেন। তারপর সালিহ্‌র অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হলেন। খলীফা চাইতেন যে, কোনক্রমে মূসা ও সালিহ্‌র মধ্যে সমঝোতা হয়ে যাক। ফলে মূসা ও তার সাঙ্গোপাঙ্গদের বদ্ধমূল ধারণা হয় যে, খলীফা নিশ্চয়ই সালিহ্‌র অবস্থান সম্পর্কে অবগত আছেন এবং তিনিই

বুঝি তাকে গোপন করে রেখেছেন। এর ফল দাঁড়ালো এই যে, মূসা ইব্‌ন বগার ঘরে তুর্কী অমাত্যদের গোপন বৈঠক বসলো। বৈঠকে স্থির হয় যে, মুহ্‌তাদীকে হত্যা অথবা পদচ্যুত করতে হবে। খলীফা তা জেনে ফেলেন। পরদিন তিনি আম-দরবার তলব করলেন। তারপর সশস্ত্র সৈন্য পরিবেষ্টিত অবস্থায় ক্রুদ্ধ মূর্তিতে দরবারে উপস্থিত হয়ে তুর্কীদেরকে সম্বোধন করে বললেন, তোমাদের দুরভিসন্ধির কথা আমি অবগত আছি। তোমরা আমাকে অন্য খলীফাদের মতো ভেব না। যতক্ষণ আমার হাতে তলোয়ার থাকবে আমি তোমাদের কয়েকশ লোকের প্রাণ নিয়ে তবে ছাড়বো। আমি আমার শেষ কথা বলে যাওয়ার জন্য এসেছি। প্রাণ নিতে ও দিতে আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত। তোমরা মনে রাখবে, আমার সাথে বৈরিতা তোমাদের ধ্বংস ডেকে আনবে। আমি শপথ করে বলতে পারি সালিহ্ কোথায় আত্মগোপন করে আছে তার বিন্দুবিসর্গও আমি অবগত নই।

খলীফার তেজদীপ্ত ভাষণে মজলিসে স্তব্ধতা নামলো। কেউ আর টু শব্দটি পর্যন্ত করলো না। তারপর মূসা ঘোষণা করিয়ে দিলেন, যে ব্যক্তি সালিহ্‌কে বন্দী করে আনবে তাকে দশ সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক দেয়া হবে। ঘটনাচক্রে এক জায়গায় সালিহ্‌র সন্ধান পাওয়া গেল। মূসা তাকে হত্যা করিয়ে তার দেহচ্যুত শির বল্লমের মাথার উপর রেখে শহর প্রদক্ষিণ করালেন। মুহ্‌তাদী এতে ভীষণ ব্যথিত হন, কিন্তু তুর্কীদের প্রভাব-প্রতিপত্তির মুখে খলীফার করার কিছুই ছিল না। শেষ পর্যন্ত খলীফা তুর্কী সর্দার বাবকিয়ালের নিকট মূসাকে হত্যা করার লিখিত নির্দেশ পাঠালেন। বাবকিয়াল তা মূসাকে দেখিয়ে দিল। কালবিলম্ব না করে মূসা সসৈন্য খলীফার প্রাসাদ আক্রমণ করলেন। এদিকে মাগরিব ও ফারগানার সৈন্যরা খলীফার পক্ষে রুখে দাঁড়ালো। ইতস্তত কয়েকটি যুদ্ধ সংঘর্ষ হলো।

ইতিমধ্যেই বাবকিয়াল বন্দী হয়ে খলীফা মুহ্‌তাদীর সম্মুখে নীত হন। মুহ্‌তাদী তাকে হত্যা করিয়ে তার দেহচ্যুত শির তুর্কীদের দিকে ছুঁড়ে মারেন। এতে তুর্কীদের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি পায় এবং বাবকিয়ালের হত্যাকাণ্ডে বিক্ষুব্ধ ফারগানা প্রভৃতি স্থানে যে তুর্কীরা এতদিন খলীফার পক্ষে ছিলেন তারাও গিয়ে মূসার বাহিনীতে যোগ দিল। খলীফা মুহ্‌তাদী যখন তুর্কীদের দ্বারা অবরুদ্ধ ছিলেন তখন বাগদাদ, সামারা ও অন্যান্য স্থানের প্রজাসাধারণ খলীফার জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে দু'আ করছিল। কেননা প্রজাসাধারণ এই খলীফার ন্যায়পরায়ণতা ও নিষ্ঠার জন্যে তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রীত ও সন্তুষ্ট ছিল। তারা তাঁকে পুণ্যবান খলীফা বলে অভিহিত করতো।

কিন্তু তুর্কীদের সাথে এ ন্যায়পরায়ণ খলীফার সংঘর্ষের ফল তাঁর বিপক্ষেই যায়। খলীফা পরাস্ত হন। তুর্কীরা তাঁর অণ্ডকোষদ্বয়ে চাপ দিয়ে তাঁকে হত্যা করে। এ দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাটি ঘটে ২৫৬ হিজরীর ১৪ই রজব (জুন ৮৭০ খ্রি.) তারিখে। খলীফা মুহ্‌তাদী সাড়ে এগার মাসকাল খিলাফত পরিচালনা করেন। নিহত হওয়ার সময় তাঁর বয়স ছিল আটত্রিশ বছর।

মুহ্‌তাদীকে হত্যার পর তুর্কীরা জুসাক নামক স্থানে কারাবন্দী আবুল আব্বাস আহমদ ইব্‌ন মুতাওয়াক্কিলকে কারাগার থেকে মুক্ত করে সিংহাসনে বসায়। তারা তাঁর হাতে বায়আত করে তাঁর খিতাব দেয় মু'তামিদ আলাল্লাহ্।

মু'তামিদ আলাল্লাহ্

মুতাওয়াক্কিলের পুত্র মু'তামিদ 'আলাল্লাহ্ ২২৯ হিজরীতে (৮৪৩-৪৪ খ্রি.) ফতিয়ান নাম্নী জনৈকা রোমদেশীয় বাঁদীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। খলীফা মু'তামিদ 'উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন খাকানকে প্রধান উযীর মনোনীত করেন। ২৬৩ হিজরীতে (৮৭৬-৭৭ খ্রি.) এ ব্যক্তি অশ্বপৃষ্ঠ থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হলে মুহাম্মদ ইব্‌ন মুখাল্লাদ তাঁর স্থলে প্রধানমন্ত্রী পদে বরিত হন।

উলুভীদের বিদ্রোহ

২৫৬ হিজরীতে (৮৭০ খ্রি.) ইবরাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন হানফিয়া ইব্‌ন আবূ তালিব, যিনি সাধারণ্যে ইব্‌ন সূফী নামে মশহুর ছিলেন, মিসরে এবং আলী ইব্‌ন যায়দ উলুভী কূফায় আব্বাসীয় খিলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করেন। ইব্‌ন সূফী মিসরে উপর্যুপরি কয়েকটি সংঘর্ষে পরাজিত হয়ে মক্কায় পালিয়ে আসেন। মক্কার আমিল তাঁকে গ্রেফতার করে মিসরে ইব্‌ন তুলূনের নিকট পাঠিয়ে দেন। ইব্‌ন তুলূন তাকে কিছুকাল কারাবন্দী রেখে তারপর মুক্ত করে দেন। ইব্‌ন সূফী মুক্ত হয়ে মিসর থেকে মদীনায় চলে আসেন এবং সেখানেই মারা যান।

আলী ইব্‌ন যাইদ কূফায় বিদ্রোহ ঘোষণা করে সেখানকার আমিলকে সেখান থেকে বহিষ্কার করে নিজে কূফার সর্বময় কর্তা হয়ে বসেন। খলীফা মু'তামিদ শাহ্ ইব্‌ন মীকাল নামক জনৈক সর্দারকে তাঁর বিরুদ্ধে সসৈন্যে প্রেরণ করেন, কিন্তু ইনি আলী ইব্‌ন যাইদের কাছে যুদ্ধে পরাস্ত হন। এবার খলীফা কায়জুর নামক সর্দারকে কূফার বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করলেন।

তিনি গিয়ে আলী ইব্‌ন যাইদকে পরাস্ত করেন। ২৫৬ হিজরীর শাওয়াল মাসে (সেপ্টেম্বর ৮৭০ খ্রি.) ইনি আলী ইব্‌ন যাইদের উপর পুনরায় আক্রমণ চালান, এবারও যুদ্ধ হলো। যুদ্ধে আলী ইব্‌ন যাইদ পরাস্ত হয়ে গ্রেফতার হলেন। কায়জুর তাঁকে বন্দী অবস্থায় রাজধানীতেই নিয়ে এলেন। এদিকে হুসাইন ইব্‌ন যাইদ আলভী রে দখল করে বসেন। মূসা ইব্‌ন বগাকে তার মুকাবিলায় প্রেরণ করা হলো।

এর কিছুদিন পূর্বে আলী নামক একব্যক্তি নিজেকে উলুভী বলে পরিচয় দিয়ে প্রথমে বাহরায়নবাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তারপর সে আহ্সায় চলে আসে এবং সেখানেও নিজেকে উলুভী বলে পরিচয় দেয়। তবে প্রথমে যে নসবনামা বর্ণনা করেছিল এবার তাতে কিছু পরিবর্তন করে ফেলে। চতুর্দিকে উলুভীদের বিদ্রোহ ঘোষণার ধুম পড়ে গেছে দেখে তার মনেও বিদ্রোহের আকাঙ্ক্ষা দেখা দেয় এবং নিজেকে উলুভী পরিচয় দিয়ে লোকজনকে দলে ভিড়াতে থাকে। কিন্তু স্থানে স্থানে তার ভুয়া উলুভী পরিচয়ের কথা ফাঁস হয়ে যেতে থাকে। অবশেষে বাগদাদে সে কতিপয় ক্রীতদাসকে দলে ভিড়িয়ে তাদেরকে সাথে নিয়ে বসরায় গিয়ে উপস্থিত হয় এবং সেখানে গিয়ে ঘোষণা করে যে, কৃষ্ণকায় ক্রীতদাসদের যে-ই তার দলে ভিড়বে সেই মুক্ত বলে বিবেচিত হবে। এ ঘোষণা শোনামাত্র প্রচুর ক্রীতদাস তার পাশে এসে জমায়েত হয়।

এসব ক্রীতদাস মনিবরা যখন তাদের নিজ নিজ ক্রীতদাসদের ব্যাপারে তার সাথে আলাপ করার উদ্দেশ্যে তার কাছে দেখা করতে আসলেন তখন তার ইঙ্গিতে ক্রীতদাসরা তাদের মনিবদেরকে গ্রেফতার করে ফেলে। অবশেষে আলী তাদেরকে মুক্ত করে দেয়। প্রতিদিনই আলীর দলে প্রচুর ক্রীতদাস এসে যোগ দিতে থাকে। আলীর দল দিন দিন ভারী হতে থাকে। সে তাদেরকে রাজনীতি ও তরবারি পরিচালনা সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়ে দিয়ে তাদেরকে উত্তেজিত করতে থাকে। আরপর সে কাদিসিয়া এবং তার আশেপাশে লুটপাট করে বসরায় চলে আসে। বসরাবাসীরা তার মুকাবিলায় অবতীর্ণ হয়ে পরাস্ত হয়। তারপরেও বসরাবাসীরা বারবার তার সাথে মুকাবিলার জন্যে প্রস্তুতি নেয়, কিন্তু প্রতিবারই তারা পরাজিত হয়।

কৃষ্ণকায় ক্রীতদাস বাহিনী বসরা দখল করে ফেলে। খলীফার দরবার থেকে চার হাজার সৈন্যসহ আবূ হিলাল তুর্কীকে বিদ্রোহ দমনের জন্যে প্রেরণ করা হলো। রায়যান নদীর তীরে উভয় দলে যুদ্ধ হলো। ক্রীতদাস বাহিনী তাকেও যুদ্ধে পরাস্ত করে তাড়িয়ে দেয়। মোটকথা ক্রীতদাস বাহিনী কেবল বসরা দখল করে ক্ষান্ত হলো না, তারা আয়লা, আহওয়ায ও অন্যান্য অনেক স্থানও দখল করে নিল। পুনঃপুন তুর্কী সেনাপতিরা খলীফার পক্ষ থেকে তাদের মুকাবিলা করতে এসে প্রতিবারই পরাস্ত হয়ে ফিরে যান। অবশেষে সাঈদ ইব্ন সালিহ্ তাদেরকে পরাজিত করে বসরা থেকে বহিষ্কার করেন। কিন্তু ২৫৭ হিজরীর ১৫ই শাওয়াল (সেপ্টেম্বর ৮৭১ খ্রি.) ক্রীতদাস বাহিনী বাহুবলে বসরা পুনর্দখল করে গোটা বসরা শহরকে ভস্মীভূত করে দেয়। বড় বড় দামী প্রাসাদ আগুনে ভস্মীভূত হয়ে মাটির সাথে একাকার হয়ে যায়। লুটপাটের অন্ত ছিল না। যে-ই সম্মুখে পড়লো সে-ই তাদের তরবারির শিকার হলো।

এ সংবাদ অবগত হয়ে খলীফা মু'তামিদ মুহাম্মদ মা'রূফকে মাওলেদকে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী সাথে দিয়ে রওয়ানা করলেন। ক্রীতদাসবাহিনী বসরা থেকে বের হয়ে নাহরে মা'কিলে তার সাথে সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো। মাওলেদ বাহিনীকে যুদ্ধে পরাস্ত করে তারা তাদের সমস্ত রসদপত্র লুটে নেয় এবং পলায়নরতদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করে। তারপর তারা নাহ্‌রে মা'কিলের দিকে ফিরে আসে।

এরপর খলীফা মু'তামিদ সেনাপতি মানসূর ইব্ন জা'ফর খায়রাতকে ক্রীতদাস বাহিনীর মুকাবিলায় প্রেরণ করেন। ক্রীতদাসরা তাদের নেতা আলী ইব্ন আবানের নেতৃত্বে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত অবিশ্রান্তভাবে যুদ্ধ চলে। অবশেষে মানসূর ইব্ন জা'ফর পরাস্ত ও নিহত হয়। এ খবর পেয়ে খলীফা মু'তামিদ মক্কার নিযুক্ত গভর্নর তাঁর ভাই মুওয়াফ্‌ফাককে মক্কা থেকে ডেকে পাঠিয়ে মিসর, কিন্‌নাসরীন ও আওয়াসিমের গভর্নরীর সনদ দিয়ে ক্রীতদাস বাহিনীর মুকাবিলায় প্রেরণ করেন। তাঁর সাথে মুফ্‌লিহ্ নামক অপর একজন সেনাপতিকে আরেকটি বাহিনী সাথে দিয়ে একই উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। উভয়ে ক্রীতদাস বাহিনীর মুকাবিলায় রওয়ানা হয়ে পড়লেন।

ক্রীতদাসদের সঙ্গে যুদ্ধ হলো। যুদ্ধে মুফলিহ্ নিহত হলেন এবং তাঁর সঙ্গীসাথীরা পলায়ন করলো। এতে মুওয়াফ্‌ফাকের সাথীদের মধ্যেও এর বিরাট প্রতিক্রিয়া হলো। তাদের মধ্যেও এতে বিশৃংখলার ভাব দেখা দেয়। অবশেষে মুওয়াফ্‌ফাক পশ্চাদপসরণ করে আপন বাহিনীকে

বিশৃঙ্খলার হাত থেকে রক্ষা করেন। তিনি তাঁর বাহিনীকে পুনর্বিন্যস্ত করে আবূ খুসায়ব নদীর তীরে এসে পুনরায় ক্রীতদাসবাহিনীর সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। এ যুদ্ধে তিনি ক্রীতদাসদেরকে পরাস্ত করেন। তাদের বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। কয়েকশ ক্রীতদাসকে বন্দী করে এবং তাদের হাতে বন্দী অনেককে মুক্ত করে তিনি সামাররায় ফিরে আসেন। কিন্তু এ পরাজয়ের পরও ক্রীতদাসবাহিনীর উৎপাত বন্ধ হয়নি। তারা তাদের বাহিনীকে পুনর্বিন্যস্ত করে আবার লুটপাটে মত্ত হয় এবং ২৭০ হিজরী (৮৮৩-৮৪ খ্রি.) পর্যন্ত বসরাসহ ইরাকের অধিকাংশ এলাকা দখল করে রাখে।

ইয়াকূব ইব্‌ন লাইছ গভর্নর হলেন

মু'তামিদের খলীফা হওয়ার প্রথম বছরেই অর্থাৎ ২৫৬ হিজরী সালেই (৮৭০ খ্রি) মুহাম্মদ ইব্‌ন ওয়াসিল ইব্‌ন ইবরাহীম তামিমী কিছু সংখ্যক কুর্দীকে হাত করে পারস্য প্রদেশের গভর্নর হুরছ ইব্‌ন সায়মাকে হত্যা করে ঐ প্রদেশে তার দখল প্রতিষ্ঠা করে। এ লোকটি আসলে আরব ইরাকের বাসিন্দা ছিল। বহুদিন পর্যন্ত সে পারস্যে বসবাস করছিল। এদিকে ইয়াকূব ইব্‌ন লাইছ যখন তা অবগত হলেন তখন তিনি পারস্য আক্রমণ করলেন। মুওয়াফ্‌ফাক যে কোন মূল্যে পারস্যকে ইয়াকূব ইব্‌ন লাইছের কবল থেকে মুক্ত রাখার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে মু'তামিদের নিকট থেকে তাখারিস্তান ও বল্‌খের গভর্নরীর সনদ লিখিয়ে তাঁর কাছে প্রেরণ করান্। তাঁকে এ মর্মে বলে পাঠান যে, আপনি পারস্যের চিন্তা বাদ দিয়ে বল্‌খ ও তাখারিস্তানে শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। ইয়াকূব ইব্‌ন লাইছ একে সুবর্ণ সুযোগরূপে গ্রহণ করে বল্‌খ ও তাখারিস্তানে শাসন সংহত করে কাবুল গিয়ে উপনীত হন এবং তাবীলকে গ্রেফতার করেন। তিনি প্রচুর উপঢৌকনাদি খলীফার দরবারে প্রেরণ করেন।

তারপর তিনি সিজিস্তানে আসেন। সিজিস্তান থেকে হিরাত এবং হিরাত থেকে খুরাসান পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে খুরাসানের বিভিন্ন নগরীতে তিনি শাসন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন। ২৫৯ হিজরীতে (৮৭৩ খ্রি) ইয়াকূব ইব্‌ন লাইছ খুরাসান দখল করে সেখান থেকে তাহিরীয়দেরকে বহিষ্কার করেন। খলীফা মু'তামিদ তখন তাঁকে এ মর্মে একটি হুঁশিয়ারিপত্র প্রেরণ করেন যে, তোমাকে যে সব জনপদের গভর্নরীর দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে কেবল সেগুলো নিয়েই তুমি সন্তুষ্ট থাকবে। খুরাসানের উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করবে না। কিন্তু ইয়াকূব তাতে ভ্রূক্ষেপমাত্র করলেন না। ২৬০ হিজরীতে (৮৭৩-৭৪ খ্রি) হাসান ইব্‌ন যায়দ উলুভী দায়লাম থেকে ফৌজ নিয়ে ইয়াকূবের উপর হামলা চালান। তুমুল লড়াইয়ের পর হাসান ইব্‌ন যায়দ পরাস্ত হয়ে দায়লামে ফিরে যান। ইয়াকূব সারিয়া ও আমিল দখল করে অবশেষে সিজিস্তানে ফিরে যান।

মুসেলের বিদ্রোহ

মু'তামিদ আসাতেগীনে নামক জনৈক সর্দারকে মুসেলের গভর্নর নিযুক্ত করেন। তুর্কীরা মুসেলবাসীদের প্রতি অত্যাচার করতে শুরু করে। ফলে মুসেলবাসীরা ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সুলায়মানকে তাদের নেতা মনোনীত করে তুর্কীদেরকে তাড়িয়ে দেয়। খলীফা এ বিদ্রোহের

কথা অবগত হয়ে তুর্কীদের একটি বাহিনী তাদের দমনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করলেন। উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধের পর খলীফার পক্ষ মানে তুর্কীবাহিনী পরাস্ত হয় এবং মুসেলে ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সুলায়মানের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এটা ২৬০-৬১ হিজরীর (৮৭৩-৭৫ খ্রি) ঘটনা।

ইব্ন মুফলেহ, ইব্ন ওয়াসিল ও ইব্ন লাইছ

২৫৬ হিজরীতে (৮৭০ খ্রি) ইয়াকূব ইব্ন লাইছ যখন মুহাম্মদ ইব্ন ওয়াসিলের নিকট থেকে পারস্য প্রদেশ ছিনিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে তার উপর হামলা করেন তখন খলীফা তাঁকে বল্খ ও তাখারিস্তানের গভর্নরী দিয়ে পারস্য থেকে ফেরত নিয়ে আসেন। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, ইয়াকূবকে যে কোন মূল্যে পারস্য থেকে সরিয়ে রাখা। তারপর তিনি আবদুর রহমান ইব্ন মুফলেহকে সৈন্যবাহিনী দিয়ে মুহাম্মদ ইব্ন ওয়াসিলের নিকট থেকে পারস্য পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। আবদুর রহমান ও মুহাম্মদের মধ্যে পারস্যের দখল নিয়ে তুমুল যুদ্ধ বাঁধে। খলীফা আবদুর রহমান ইব্ন মুফলেহের সাহায্যার্থে তাশতামির নামক তুর্কী সর্দারকে একটি বাহিনী দিয়ে প্রেরণ করেন। তাশতামির নামক তুর্কী যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন এবং ২৬২ হিজরীতে (৮৭৫ খ্রি) মুহাম্মদ ইব্ন ওয়াসিল আবদুর রহমান ইব্ন মুফলেহ্কে বন্দী করতে সমর্থ হন। এবার খলীফা মু'তামিদ আবদুর রহমান ইব্ন মুফলেহকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে মুহাম্মদ ইব্ন ওয়াসিলের সাথে পত্র যোগাযোগ শুরু করেন। মুহাম্মদ ইব্ন ওয়াসিল খলীফার পত্রসমূহের জবাব পর্যন্ত না দিয়ে আবদুর রহমান ইব্ন মুফলেহকে হত্যা করে ওয়াসেত শহরে হামলার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। মূসা ইব্ন বগা উক্ত ওয়াসেত শহরে সসৈন্যে অবস্থান করছিলেন। মুহাম্মদ ইব্ন ওয়াসিল যখন ওয়াসেত অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছিলেন তখন ইবরাহীম ইব্ন সায়মা তাঁর পথ রোধ করে দাঁড়ালেন।

এদিকে ইতিমধ্যে খলীফা মু'তামিদের নিযুক্ত পারস্যের গভর্নর আবুস সাজ তদীয় জামাতা আবদুর রহমানকে মুহাম্মদ ইব্ন ওয়াসিলের বিরুদ্ধে রওয়ানা করলেন—যাতে তিনি ওকে উৎখাত করে পারস্যের দখল গ্রহণ করেন। আবদুস সাজ নিজে তখন বসরা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে সীমাহীন উপদ্রবরত ক্রীতদাস বাহিনীর সাথে যুদ্ধে রত ছিলেন। আবদুর রহমান যখন সৈন্যবাহিনীসহ পারস্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন তখন পথিমধ্যে ক্রীতদাসবাহিনীর সর্দার আলী ইব্ন আবানের সাথে ঘটনাচক্রে তার সংঘর্ষ বাঁধে। আলী ইব্ন আবান আবদুর রহমানকে যুদ্ধে পরাস্ত করে হত্যা করে।

মুহাম্মদ ইব্ন ওয়াসিল আহ্ওয়াযেই ইবরাহীম সায়মার মুখোমুখি হন। এমনি সময় খবর এলো যে, ইয়াকূব ইব্ন লাইছ সাফার সিজিস্তান থেকে লোক-লশকর নিয়ে এসে আক্রমণ চালিয়েছেন। মুহাম্মদ ইব্ন ওয়াসিল তামিমী ইবরাহীম ইব্ন সায়মার সাথে সংঘর্ষ এড়িয়ে পারস্যে ফিরে যায়। অবশেষে সাফার ও মুহাম্মদ ইব্ন ওয়াসিলের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। ইব্ন ওয়াসিল পরাজিত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যায়। ইয়াকূব সাফার পূর্ণ পারস্য প্রদেশ দখলে আনেন। খুরাসান ইতিমধ্যেই তার দখলে এসেছিল। এবার ২৬১ হিজরীতে (৮৭৫ খ্রি) পারস্যও তাঁর অধিকারে আসলো।

সামানিয়া রাজবংশের সূচনা

সামানী বংশের পূর্ণ বৃত্তান্ত বিশদভাবে যথাস্থানে আলোচিত হবে। এখানে কেবল ঘটনা প্রবাহের ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে এর সূচনাকাল সম্পর্কে আলোকপাত করাকে জরুরী মনে করছি।

আসাদ ইব্‌ন সামান খুরাসানের এক সম্ভ্রান্ত ও বিখ্যাত বংশের সন্তান ছিলেন। তাঁর চারপুত্র ছিলেন যথাক্রমে নূহ্, আহমদ, ইয়াহ্ইয়া ও ইলিয়াস। যে সময় মামূনুর রশীদ খুরাসানের রাজধানী মার্ভে অবস্থান করছিলেন সে সময় উক্ত ভ্রাতৃচতুষ্টয় মামূনুর রশীদের দরবারে গিয়ে উপস্থিত হন। মামূনুর রশীদ তাঁর উযীরে আযম ফযল ইব্‌ন সাহলের সুপারিশক্রমে তাঁদের চারজনকেই ভাল ভাল পদে নিয়োগ দান করেন। তারপর মামূনুর রশীদ যখন খুরাসানে গাস্‌সান ইব্‌ন উব্বাদকে তাঁর নায়েবে সালতানাত বানিয়ে ও খুরাসানের গভর্নর পদে অধিষ্ঠিত করে বাগদাদের দিকে রওয়ানা হলেন তখন গাস্‌সান ইব্‌ন উব্বাদ নূহকে সমরকন্দের, আহ্মদকে ফারগানার, ইয়াহ্ইয়াকে শাশ ও আশরুসনার এবং ইলিয়াসকে হিরাতের শাসনভার অর্পণ করেন।

মানূনুর রশীদ যখন তাঁর মশহুর সিপাহ্সালার তাহির ইব্‌ন হুসাইনকে খুরাসানের গভর্নর করে পাঠালেন তখন তিনিই উক্ত চার ভাইকে তাদের স্বপদে বহাল রাখেন। তারপর নূহ্ ইব্‌ন আসাদের মৃত্যু হলে তাহির ইব্‌ন হুসাইন সমরকন্দ এলাকাকে ইয়াহ্ইয়া ও আহমদের এলাকা দু'টির সাথে শামিল করেছেন। এর দিন কয়েক পরে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহির গভর্নর থাকাকালে ইলিয়াসও ইনতিকাল করলে তার পুত্র আবূ ইসহাক মুহাম্মদকে তার স্থলে হিরাতের শাসক নিযুক্ত করা হয়। আহমদ ইব্‌ন আসাদের সাতটি পুত্র সন্তান ছিল। তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁর বড় পুত্র নসরকে সমরকন্দের শাসক নিযুক্ত করা হয়।

তাহিরীয় বংশের খুরাসান থেকে উচ্ছেদ হওয়া এবং ইয়াকূব ইব্‌ন লাইছ সাফারের অধিকার প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত নসর সেখানকার শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন। ২৬১ হিজরীতে (৮৭৫ খ্রি) খলিফা মু'তামিদ নসরের কাছে সমরকন্দের গভর্নরীর সনদ প্রেরণ করেন। এতকাল এ প্রদেশের শাসক খুরাসানের শাসকের নিকট থেকেই শাসনভার লাভ করতেন। কিন্তু খুরাসান হস্তচ্যুত হওয়ার এবং ইয়াকূব ইব্‌ন সাফারের অধিকারে চলে যাওয়ায় খলীফা কমপক্ষে মাওরাউন নাহর এলাকায় নিজ অধিকার বহাল রাখার উদ্দেশ্যে সরাসরি নসরের কাছে শাসক নিযুক্তির সনদ প্রেরণ করেন এবং বলে পাঠান যে, ইয়াকূব ইব্‌ন সাফারের প্রতিষ্ঠা থেকে এ এলাকাকে সংরক্ষণ কর। নসর তার ভাই ইসমাঈলকে নাজারার শাসনভার অর্পণ করেন এবং নিজে সমরকন্দে শাসনকার্য চালাতে থাকেন। ২৭৫ হিজরীতে (৮৮৮-৮৯ খ্রি) এ দুই ভাইয়ের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। এমনকি যুদ্ধ পর্যন্ত বাঁধে। যুদ্ধে ইসমাঈল জয়ী হন। নসর বন্দী হয়ে ইসমাঈলের সম্মুখে নীত হন। ইসমাঈল তখন তাঁর ভাইয়ের পদতলে লুটিয়ে পড়েন এবং তাঁকে সসম্মানে সিংহাসনের উপর উঠিয়ে বসান এবং নিজে তাঁর আনুগত্যের অঙ্গীকার করেন। তারপর যথারীতি দু'ভাইই স্ব-স্ব এলাকার শাসন পরিচালনা করতে থাকে। এই ইসমাঈল সামানীয় রাজবংশের ভিত্তি স্থাপন করেন। এর বিশদ আলোচনা পরে আসছে।

যুবরাজের বায়আত

২৬১ হিজরীর শাওয়াল (৮৭৫ খ্রি. জুলাই) মাসে খলীফা মু'তামিদ একটি আম-দরবার ডেকে ঘোষণা করেন যে, আমার পরে আমার পুত্র জা'ফরই পরবর্তী খলীফা হবে। তারপর আমার ভাই আহমদ মুওয়াফ্ফাক হবে খিলাফতের দ্বিতীয় দাবিদার। তবে আমার মৃত্যু পর্যন্ত যদি আমার পুত্র জা'ফর বয়ঃপ্রাপ্ত না হয় তবে আমার ভাই-ই খলীফা পদে আসীন হবে এবং এমতাবস্থায় জা'ফর হবে তার পরবর্তী খলীফা।

এমর্মে সকলের বায়আত নেয়া হলো। জা'ফরকে মুফাওয়ায ইলাল্লাহ্ খেতাব দেয়া হলো এবং আফ্রিকা, মিসর, শাম, জাযিরা, মুসেল ও আর্মেনিয়ার শাসনভার তাঁর হাতে অর্পণ করে মূসা ইব্ন বগাকে তাঁর নায়েব নিযুক্ত করা হলো। আবূ আজ্দকে আন-নাসির লি দীনিল্লাহ্ আল-মুওয়াফ্ফাক খেতাব দিয়ে পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশসমূহের বাগদাদ, কূফা, তরীকে মক্কা, ইয়ামান, কসকর, আহ্ওয়ায ফারেস, ইস্পাহান, রে, যুঞ্জান এবং সিন্ধুর শাসনভার অর্পণ করেন। উক্ত দু'জন যুবরাজের জন্যে দু'টি শ্বেতবর্ণের পতাকা প্রস্তুত করা হলো। যুবরাজ হিসাবে এ বায়আত হওয়ার পর খলীফা মু'তামিদ তাঁর ভাই মুওয়াফ্ফাককে হাবশীদের উৎখাতের জন্যে প্রেরণ করলেন।

সাফারের যুদ্ধ

মুওয়াফ্ফাক হাবশীদের দমনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা না হতেই খলীফার কাছে সংবাদ পৌঁছলো যে, ইয়াকূব সাফার খুরাসান দখল সম্পন্ন করে রাজধানী দখলের উদ্দেশ্যে সসৈন্যে অগ্রসর হচ্ছেন। এ সংবাদে সকলেই উদ্বিগ্ন হলেন। মুওয়াফ্ফাক নিজেও হাবশীদের বিরুদ্ধে অভিযান মুলতবি করলেন। খলীফা নিজে রাজধানী থেকে অগ্রসর হয়ে যাফরামিয়া নামক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করলেন এবং আপন ভাই মুওয়াফ্ফাককে সাফারের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলেন। মুওয়াফ্ফাকের দক্ষিণ বাহিনীর নেতৃত্ব মূসা ইব্ন বগাকে এবং বামের বাহিনীর নেতৃত্ব মাসরূর বলখীকে অর্পণ করেন। মধ্যবর্তী বাহিনীর নেতৃত্ব দেন স্বয়ং মুওয়াফ্ফাক। ভোর থেকে আসর পর্যন্ত তুমুল রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। কখনো সাফার বাহিনী আবার কখনো মুওয়াফ্ফাকের বাহিনীর বিজয় হয়। জয়-পরাজয় অনির্ধারিত হয়ে পড়ে। এমনি সময় খলীফা মুওয়াফ্ফাকের সাহায্যার্থে একটি বাহিনী প্রেরণ করলেন। এ নতুন বাহিনীর আগমনে মুওয়াফ্ফাক বাহিনীর নতুনভাবে প্রাণ সঞ্চার হয় এবং সাফার বাহিনীর পরাজয় পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। ইয়াকূব ইব্ন সাফার এবং তার সঙ্গীরা রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেলেন। মুওয়াফ্ফাকের বাহিনী তার সেনাছাউনি লুটে নিল। সাফাররা রণাঙ্গণে পরাজিত হয়ে খুযিস্তানের দিকে রওয়ানা হলো এবং জুন্দ সাবূর নামক স্থানে গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করলো। মুওয়াফ্ফাক আর সাফারদের পশ্চাদ্ধাবন করতে পারলেন না। তিনি ওয়াসিতে এসে অবস্থান গ্রহণ করলেন। সেখানে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং বাগদাদে চলে আসেন।

এদিকে মুওয়াফ্ফাকও সাফার যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন ওদিকে মুহাম্মদ ইব্ন ওয়াসিল যিনি ইতিপূর্বে সাফার বাহিনীর হাতে পরাস্ত হয়ে পারস্য প্রদেশ হারিয়ে পলায়ন করছিলেন– তিনি এবার উভয়পক্ষের লড়াইয়ের এ সুবর্ণ সুযোগে ময়দান খালি পেয়ে পারস্য দখল করে বসেন। সাফার যখন পরাজিত হয়ে জুন্দী সাবূরে গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করলেন তখন হাবশীরা

সাফারের কাছে এ মর্মে পত্র লিখলো যে, আপনি এখন খলীফার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হোন, আমরা আপনাকে সাহায্য করবো। সাফার তাদের এ পত্রের জবাবে পূর্ণ 'কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরূন' সূরা লিখে তাদের কাছে পাঠালেন এবং উমর ইব্ন সরীর নেতৃত্বে একটি বাহিনী মুহাম্মদ ইব্ন ওয়াসিলের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলেন। উমর ইব্ন সরী মুহাম্মদ ইব্ন ওয়াসিলকে পারস্য থেকে বের করে দিয়ে পারস্য অধিকার করেন।

মু'তামিদ ইয়াকূব সাফারের যুদ্ধের পর মূসা ইব্ন বগাকে হাবশীদের বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। ওদিকে সাফারও একজন সর্দারকে আহ্ওয়াযে প্রেরণ করেন। আহ্ওয়াযে বাগদাদের খলীফা সাফার ও হাবশী বিদ্রোহীরা ত্রিমুখী যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। কোন দল অপর কোন দলের সাহায্যকারী বা সমর্থক ছিল না। ইয়াকূব সাফার জুনদী সাবূর থেকে সিজিস্তানের দিকে অগ্রসর হন এবং নিশাপুরে আযীয ইব্ন সরীকে এবং হিরাতে আপন ভাই উমর ইব্ন লাইছকে শাসক নিযুক্ত করেন। এ সব হচ্ছে ২৬১ হিজরীর (৮৭৫ খ্রি.) ঘটনা।

হাবশী ক্রীতদাসদের ওয়াসিত দখল

ইয়াকূব সাফার জুনদী সাবূর দখল করে সেখানে তার পক্ষ থেকে একজন আমিল নিযুক্ত করে সিজিস্তান অভিমুখে চলে যায়। জনৈক সর্দারকে আহ্ওয়াযের দিকে পাঠানো হয়েছিল। অবশেষে হাবশীরা আহ্ওয়াযে সাফারের অধিকার স্বীকার করে নেয় এবং সাফারের বাহিনীর সাথে সন্ধি করে তারা ওয়াসিতের দিকে অগ্রসর হয়। সেখানে খলীফার পক্ষ থেকে জনৈক তুর্কী সর্দার নিযুক্ত ছিলেন। আব্বাসীরা তাকে পরাস্ত করে ওয়াসিত দখল করে নয়। খলীফার বাহিনী হাবশীদের মুকাবিলায় টিকতে পারেনি। এটা ২৬৩ হিজরীর (৮৭৬-৭৭ খ্রি.) ঘটনা।

আহমদ ইব্ন তুলূনের শাম দখল

২৬৪ হিজরীতে (৮৭৭-৭৮ খ্রি.) মাজুর নামক জনৈক তুর্কী সর্দার শামদেশের গভর্নর পদে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর মৃত্যু হলে তাঁরই পুত্র পিতার স্থলে শাসনভার নিজহাতে তুলে নেন। আহমদ ইব্ন তুলূন এ সংবাদ অবগত হয়ে মিসরে আপন পুত্র আব্বাসকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে স্বয়ং দামেশকের দিকে অগ্রসর হন। তুর্কী সর্দার তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে নিলেন। ফলে ২৬৪ হিজরীতে (৮৭৭-৭৮ খ্রি) দামেশকে ও তার আশেপাশের এলাকাসমূহ ইব্ন তুলূনের পদানত হলো। দুই বছরকাল শামদেশে অবস্থান করে তিনি তাঁর শাসন সংহত করেন। ২৬৬ হিজরীতে (৮৭৭-৭৮ খ্রি.) তিনি শাম থেকে মিসর চলে আসেন। এভাবে মিসর ও শাম উভয় দেশই আহমদ ইব্ন তুলূনের দখলে চলে আসে।

ইয়াকূব ইব্ন লাইছ সাফারের মৃত্যু

ইয়াকূব ইব্ন লাইছ সাফারের শক্তি অনেক বৃদ্ধি পেয়ে গিয়েছিল। যদিও খুরাসান তাবারিস্তান ও পারস্যে আহমদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ খুজিস্তানী, সাঈদ ইব্ন তাহির, আলী ইব্ন ইয়াহ্ইয়া খারিজী, হাসান ইব্ন যায়দ উলুভী, রাফি ইব্ন হারছামা প্রমুখ কয়েকজন ক্ষমতা প্রত্যাশী শক্তি পরীক্ষায় লিপ্ত ছিলেন এবং প্রত্যেকেই তার অন্য প্রতিদ্বন্দ্বীকে মাত করে ক্ষমতা দখলের জন্যে অত্যন্ত তৎপর ছিলেন। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিলে যে, কে জিতবে আর কে

হারবে তা নির্ধারণ করা ছিল অত্যন্ত মুশকিল। তবে বাহ্যত ইয়াকূব ইব্‌ন লাইছ তাদের মধ্যে সর্বাধিক যোগ্যতাসম্পন্ন, সাহসী ও শক্তিশালী ছিলেন। তাঁর রাজ্যের পরিধিও ছিল খুবই বিস্তৃত। মু'তামিদ যখন লক্ষ্য করলেন, শাম তাঁর হাতছাড়া হয়ে গেছে, ইরাকেরও একটা বিশাল এলাকায় হাবশীরা জেঁকে বসেছে, আর কোন মতেই তাদেরকে কাবুও করা যাচ্ছে না, এদিকে খুরাসান ও পারস্য প্রভৃতি পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ তাঁর দখল থেকে বেরিয়ে গেছে, তখন তিনি ইয়াকূব ইব্‌ন লাইছকে খুরাসান প্রভৃতি এলাকার শাসনের সনদ যথারীতি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদান করাই সমীচীনবোধ করলেন–যাতে তিনি তাঁর আনুগত্য বন্ধনে আবদ্ধ থাকেন এবং বিদ্রোহী হয়ে না ওঠেন। তিনি ভাবলেন এভাবে এসব এলাকায় তাঁর শাসনক্ষমতা সুসংহত হবে। এ ব্যাপারে উভয় পক্ষে যথারীতি পত্রালাপও শুরু হয়। এমনি সময় ৯ই শাওয়াল, ২৬৫ হিজরীতে (৮৭৮ খ্রি) ইয়াকূব ইব্‌ন সাফার শূলবেদনায় আক্রান্ত হয়ে দেহত্যাগ করেন। ইয়াকূব ইব্‌ন সাফারের নামে জারিকৃত পারস্যের গভর্নরীর ফরমান খলীফার পক্ষ থেকে ঠিক ঐ সময় গিয়ে তাঁর কাছে পৌঁছলো যখন তাঁর মৃত্যুযাতনা শুরু হয়েছে।

ইয়াকূবের পর তাঁর ভাই আমর ইব্‌ন লাইছ সাফার তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি খলীফার দরবারে যথারীতি আনুগত্যের একরারনামা প্রেরণ করেন। খলীফা তাঁর এ একরারনামা পাঠ করে অত্যন্ত প্রীত হন এবং আমর ইব্‌ন লাইছের নামে খুরাসান, ইস্পাহান, সিন্ধু ও সিজিস্তানের গভর্নরীর সনদ প্রেরণ করে বাগদাদ ও সামাররার পুলিশ বিভাগের দায়িত্বও অর্পণ করলেন। সাথে সাথে তাঁর জন্যে সম্মানজনক খেলাতও পাঠালেন। খলীফার এই ফরমান ও খেলাত প্রেরণের ফলে জনসাধারণ খুশি মনে আমর ইব্‌ন লাইছের আধিপত্য মেনে নেয়। ফলে তাঁর শক্তি বৃদ্ধি পায়।

মুওয়াফ্‌ফাক ও মু'তামিদের হাতে হাবশীদের উচ্ছেদ

হাবশীদের আগ্রাসী তৎপরতা এবং খলীফার বাহিনীর বার বার তাদের হাতে পর্যুদস্ত হওয়ার ব্যাপারটি মামুলী ছিল না। প্রায় এক দশক ধরে হাবশীরা শাহী বাহিনীর জাঁদরেল জাঁদরেল সেনাপতিদেরকে অধঃমুখী করে রেখেছিল। তাদের আগ্রাসী তৎপরতায় বিভিন্ন জনপদ বিরাণ হয়ে গিয়েছিল। এক একজন হাবশী দল জনপদের উলুভী ও হাশেমী রমণীকে ভোগ করে চলেছিল। বাহবূদ এবং খবীছ নামক তাদের সর্দার মিম্বরে আরোহণ করে খুলাফায়ে রাশিদীন, আহলে বায়ত ও নবী সহধর্মিণীগণকে প্রকাশ্যে গালাগাল দিত। বাহবূদ নিজে আলিমুল-গায়ব তথা অদৃশ্যজ্ঞাতা ও অন্তর্যামী হওয়ারও দাবি করেছিল। সে নবী হওয়ার দাবি করেছিল। প্রায় এক কোটি মুসলমানকে সে নিধন করে। উপর্যুপরি তাদের বিজয়ে তাদের বিরাট প্রভাব ও ভীতি জনমনে অংকিত হয়। তুর্কীদের বীরত্বের দর্পও তারা চূর্ণ করে দেয়।

তুর্কীরা তাদের নাম শুনলেই ভয়ে কাঁপতো। অবশেষে খলীফা মু'তামিদের ভাই মুওয়াফ্‌ফাক তাঁর পুত্র আবদুল আব্বাস মু'তামিদকে যিনি পরবর্তীকালে মু'তামিদ বিল্লাহ নামে খ্যাতি অর্জন করেন– ২৬৬ হিজরীর রবিউস সানী (৮৭৯ খ্রি. নভেম্বর-ডিসেম্বর) মাসে হাবশীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থে প্রেরণ করেন। আবদুল আব্বাস মু'তামিদ ওয়াসিতের নিকট তুমুল যুদ্ধে হাবশীদেরকে পরাস্ত করেন। খলীফার সৈন্যদের হাতে এটাই ছিল হাবশীদের প্রথম উল্লেখযোগ্য পরাজয়।

তারপর মুওয়াফ্ফাক তাঁর পুত্রের সাথে গিয়ে মিলিত হন। এবার পিতা-পুত্র মিলে হাবশীদেরকে উপর্যুপরি পরাস্ত করতে থাকেন। চার বছর পর্যন্ত এরূপ যুদ্ধব্যস্ত থাকার পর ২৭০ হিজরীর সফর (৮৮৩ খ্রি. আগস্টের ১১) মাসের পয়লা তারিখে হাবশীদের সর্দার বহীর নিহত হওয়ায় এ উৎপাতের চির অবসান ঘটে। এ উপলক্ষে শহরে আলোকসজ্জা করা হয় এবং আনন্দোৎসব করা হয়। এদিকে মুওয়াফ্ফাক ও মু'তামিদ যখন হাবশীদের সাথে যুদ্ধরত ছিলেন ওদিকে মুসেলে তখন খারিজীরা তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে তুলেছিল। মুসাভির খারিজী ২৬৩ হিজরীতে (৮৭৬-৭৭ খ্রি.) নিহত হয় যা পূর্বেই বলা হয়েছে। তারপর তার ভক্ত অনুরক্তরা দুইভাগে বিভক্ত হয়ে ২৭৬ হিজরী (৮৮৯-৯০ খ্রি.) পর্যন্ত উভয় দলে পরস্পরে যুদ্ধরত থাকে। এতদসত্ত্বেও খলীফার পক্ষ থেকে শান্তি প্রতিষ্ঠার কোনই উদ্যোগ নেয়া হয়নি। এই একটি ঘটনা দ্বারাই গোটা রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পর্কে আঁচ করা যায়।

খুরাসানের অরাজকতা

ইয়াকূব ইব্ন সাফারের মৃত্যু হলে খলীফা মু'তামিদ ইয়াকূবের ভাই আমর ইব্ন লাইছকে গভর্নরীর সনদ প্রদান করেন। কিন্তু খুরাসানে তখনো তাহিরীয় বংশের সমর্থক ও শুভাকাঙ্ক্ষীর অভাব ছিল না। তাদের একজন ছিল আবূ তালহা এবং অপর এক ব্যক্তি রাফি ইব্ন হারছামা। তারা হুসাইন ইব্ন তাহিরের নামে লোকজনকে সংগঠিত করে শহর জনপদ দখল করতে এবং নিজেদের রাজত্ব গড়ে তুলতে প্রয়াস পায়। তারা কখনো আমর ইব্ন লাইছের আমিলদেরকে বের করে দিয়ে শহরসমূহ দখল করতো আবার কখনো নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধিয়ে দিত। এ সব লড়াইয়ে তারা বুখারার শাসক ইসমাঈল ইব্ন আহমেদ ইব্ন আসাদ ইব্ন সামানের সাহায্য-সহযোগিতা চাইত।

ইসমাঈল সামানী কখনো এর, আবার কখনো ওর সাহায্য করতেন। আবার কখনো আমর ইব্ন লাইছ সাফারের সাহায্যে এগিয়ে আসতেন। মোটকথা, এসব রাজ্যে তখন চরম বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছিল। এ অবস্থায় ২৭১ হিজরীতে (৮৮৪-৮৫ খ্রি.) মুওয়াফফাক নিজের পক্ষ থেকে মুহাম্মদ ইব্ন তাহিরকে খুরাসানের শাসক নিয়োগ করেন। আমর ইব্ন লাইছ সাফারকে খুরাসানের গভর্নর নিয়োগকারী খলীফা মু'তামিদ তাঁকে উক্ত গভর্নরী পদ থেকে পদচ্যুত করলেন। মুহাম্মদ ইব্ন তাহির নিজে বাগদাদে অবস্থান করতেন। তিনি নিজের পক্ষ থেকে খুরাসানে পূর্ব থেকে যুদ্ধরত রাফি ইব্ন হারছামাকে তাঁর নায়েব রূপে নিযুক্তি প্রদান করেন। কিন্তু তাতে খুরাসান-এর আশেপাশের এলাকাসমূহে অরাজক অবস্থার কোন উন্নতি ঘটেনি।

ইব্ন তূলূনের মৃত্যু

আহমদ ইব্ন তূলূনের কথা পুর্বেই আলোচিত হয়েছে। মিসর ও শাম দেশ তাঁর দখলে ছিল। খলীফা মু'তামিদ নামে মাত্র খলীফা ছিলেন। তাঁর ভাই মুওয়াফ্ফাক স্বীয় বীরত্ব ও বুদ্ধি বলে গোটা খিলাফত দরবারে প্রভাব বিস্তার করে রেখেছিলেন। রাজ্যের আসল কলকাঠি ছিল তাঁরই হাতে। ইব্ন তূলূনের সাথে পত্র যোগাযোগ করে এক সময় তিনি যোগসাজশ করে মিসরে চলে যেতে মনস্থ করেন। এটা ২৬৭ হিজরীর (৮৮০ খ্রি) ঘটনা। এ সময় মুওয়াফ্ফাক

হাবশী ক্রীতদাসদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। তিনি অন্যান্য সর্দারের মাধ্যমে মু'তামিদকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে তাঁর এ ইচ্ছা থেকে বিরত রাখেন। কিন্তু এজন্যে ইব্ন তূলূনের প্রতি তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন।

২৭০ হিজরীতে (৮৮৩-৮৪ খ্রি.) যখন মুওয়াফ্ফাক হাবশীদের সাথে যুদ্ধ থেকে নিরস্ত হলেন, ইব্ন তূলূন তখন এন্টিয়কে অসুস্থ হয়ে দেহত্যাগ করেন। তাঁর পুত্র খামারুভিয়া মিসর ও শামে পিতার স্থলাভিষিক্ত হলেন। মুওয়াফ্ফাক ইসহাক ইব্ন কিন্দাহ্ এবং মুহাম্মদ ইব্ন আবুস সাজকে শাম দেশ দখলের জন্যে প্রেরণ করলেন। তার নির্দেশানুযায়ী উক্ত দু'জন সর্দার শামদেশের শহর জনপদসমূহ দখল করতে শুরু করলেন। খামারুভিয়াও তাঁদের সাথে মুকাবিলার উদ্দেশ্যে তাঁর বাহিনী প্রেরণ করলেন। উক্ত সর্দারদ্বয় তাদের সাথে লড়াইয়ে প্রবৃত্ত হতে কিছুটা দ্বিধা করলেন এবং কেবল আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে নিয়োজিত রইলেন। এ সংবাদ অবগত হয়ে মুওয়াফ্ফাক তাঁর পুত্র আবুল আব্বাস মু'তাদিদকে শামদেশে প্রেরণ করলেন। মু'তাদিদ মিসরীয় সৈন্যদেরকে পিছনে হটিয়ে দামেশ্ক জয় করে আরো অগ্রসর হতে লাগলেন। স্বয়ং খামারুভিয়া তাঁর সাথে মুকাবিলার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হলেন। আবুল আব্বাস মু'তাদিদ যুদ্ধে পরাস্ত হলেন। তিনি যখন দামেশকে ফিরে গেলেন তখন দামেশকবাসীরা শহরের তোরণ খুলতে অস্বীকৃতি জানালো। অগত্যা তিনি তারনুসের দিকে অগ্রসর হলেন। খামারুভিয়া দামেশকে প্রবেশ করলেন এবং শামদেশের শহর ও জনপদসমূহে তাঁর খুতবা ও মুদ্রা চালু হলো। তারমুসবাসীরা বিদ্রোহী হয়ে আবুল আব্বাস মু'তাদিদকে তাদের এলাকা থেকে বের করে দিল এবং খামারুভিয়ার খুতবা তথায় চালু করলো। আবুল আব্বাস ভগ্ন হৃদয়ে বাগদাদে ফিরে আসলেন।

তাবারিস্তানের বিবরণ ঃ উলুভী, রাফি ও সাফার

উপরেই বর্ণিত হয়েছে যে, দায়লামবাসীদের সাহায্য-সহযোগিতায় তাবারিস্তানে হাসান ইব্ন যাইদ উলুভীর রাজত্ব ইতিমধ্যেই কায়েম হয়ে গিয়েছিল। ২৭০ হিজরীর রজব (৮৮৪ খ্রি. জানুয়ারী) মাসে ইব্ন যাইদের মৃত্যু হয়। তাঁর ভাই মুহাম্মদ ইব্ন যাইদ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। ২৭২ হিজরীতে (৮৮৫-৮৬ খ্রি.) কাযভীনের জনৈক তুর্কী আমিল চার হাজার সৈন্য নিয়ে তাবারিস্তান আক্রমণ করেন। মুহাম্মদ ইব্ন যাইদ আট হাজার সৈন্য নিয়ে তার মুকাবিলা করেন। কিন্তু যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন এবং জুরজানে গিয়ে আশ্রয় নেন। বিজয়ী সৈন্যরা তাবারিস্তান ত্যাগ করার সাথে সাথে তিনি তাবারিস্তান পুনর্দখল করেন। ২৭৫ হিজরীতে (৮৮৮-৮৯ খ্রি.) রাফি ইব্ন হারছামা তাবারিস্তান আক্রমণ করেন। মুহাম্মদ ইব্ন যাইদ দীর্ঘকাল তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করে ২৭৭ হিজরী (৮৯০-৯১ খ্রি.) পর্যন্ত তাবারিস্তান থেকে সম্পূর্ণভাবে উৎখাত হন। অবশেষে ২৮৩ হিজরীতে (৮৯৬ খ্রি.) রাফি ইব্ন হারছামা যখন আমর ইব্ন লাইছের সাথে যুদ্ধে নিহত হলেন তখন মুহাম্মদ ইব্ন যাইদ পুনরায় তাবারিস্তান অধিকার করেন। কিন্তু আমর ইব্ন লাইছ সাফার তাঁকে পুনরায় তাবারিস্তান থেকে উৎখাত করেন। ২৮৮ হিজরীতে (৯০১ খ্রি.) যখন ইসমাঈল সামানী আমর ইব্ন লাইছ সাফারকে গ্রেফতার করে বাগদাদে পাঠিয়ে ছিলেন তখন মুহাম্মদ ইব্ন যাইদ পুনরায় দায়লাম থেকে

বেরিয়ে এসে তাবারিস্তান পুনর্দখল করেন। এরপর ইসমাঈল সামানী মুহাম্মদ ইব্ন হারূনকে তাবারিস্তানে প্রেরণ করেন। এবার মুহাম্মদ ইব্ন যাইদ তাঁকে বাধা দিতে গিয়ে নিহত হলেন। তার পুত্র যাইদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন যাইদ বন্দী হয়ে বুখারার কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন।

আমর ইব্ন লাইছ সাফার

আমর ইব্ন লাইছ সাফার খলীফার দরবার থেকে খুরাসান সিজিস্তান প্রভৃতি এলাকার গভর্নরীর সনদ লাভ করেছিলেন। যা ইতিপূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া পারস্যও তাঁর আয়ত্তে এসে গিয়েছিল। ২৭১ হিজরীতে (৮৮৪-৮৫ খ্রি.) খলীফার দরবার থেকে আমর ইব্ন লাইছের নামে পদচ্যুতির ফরমান জারি করা হয়। ইস্পাহানের শাসক আহমদ ইব্ন আবদুল আযীযের প্রতি খলীফা নির্দেশ জারি করলেন যে, আমর ইব্ন লাইছকে পরাস্ত করে পারস্য প্রদেশ যেন তিনি পুনরুদ্ধার করেন। ফলে উভয়পক্ষে যুদ্ধ বাঁধে এবং আমর ইব্ন লাইছ সাফার যুদ্ধে পরাস্ত হন কিন্তু এতদসত্ত্বেও পারস্য তাঁর দখলেই থাকে।

অবশেষে ২৭৪ হিজরীতে (৮৮৭-৮৮ খ্রি.) স্বয়ং মুওয়াফ্ফাক পারস্য প্রদেশ আক্রমণ করেন। তিনি প্রদেশটিকে আমর ইব্ন লাইছের দখলমুক্ত করে বাগদাদে ফিরে আসেন। আমর ইব্ন লাইছ কিরমান ও সিজিস্তানের দিকে চলে যান এবং সিজিস্তান ও খুরাসানে সাফল্যের সাথে রাজত্ব করতে থাকেন। তিনি খলীফার দরবারে উপঢৌকনাদি প্রেরণ করে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির চেষ্টা করেন এবং ২৭৮ হিজরীতে (৮৯১ খ্রি) খলীফার দরবার থেকে মাওরাউন নাহর এলাকা তথা বুখারা, সমরকন্দ ও পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহের গভর্নরীর সনদ লাভে সমর্থ হন।

মাওরাউন নাহরে ইসমাঈল ইব্ন আহমদ সামানী কৃতিত্বের সাথে শাসনকার্য পরিচালনা করে যাচ্ছিলেন। আমর ইব্ন লাইছ উক্ত এলাকার সনদ লাভ করে সৈন্য-সামন্ত ও সমরাস্ত্র সংগ্রহে মনোনিবেশ করলেন। ইসমাঈল ইব্ন আহমদ সামানী তা অবহিত হয়ে আমর ইব্ন লাইছকে লিখে পাঠালেন যে, আমি সীমান্ত এলাকার এক কোণে পড়ে আছি, আপনার হাতে বিশাল রাজ্য রয়েছে। আপনি আমাকে এ কোণে পড়ে থাকতে দিন। আমাকে রাজ্যহারা করার কোন ফন্দি করবেন না। কিন্তু আমর ইব্ন লাইছ তাতে কর্ণপাত করলেন না। তিনি সসৈন্যে মাওরাউন নাহরে আক্রমণ চালালেন। ইসমাঈল সামানী তাঁর মুকাবিলায় অবতীর্ণ হলেন। যুদ্ধে আমর ইব্ন লাইছ বন্দী হয়ে সমরকন্দের কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন। ২৮৮ হিজরীতে (৯০১ খ্রি.) ইসমাঈল সামানী তাকে বাগদাদে পাঠিয়ে দেন। খলীফা মুতামিদের ওফাত পর্যন্ত তিনি বাগদাদের কারাগারেই থাকেন। তারপর মুকতাদী বিল্লাহ্ সিংহাসনে আরোহণ করে তাকে হত্যা করিয়ে ফেলেন।

মক্কা ও মদীনার অবস্থা

মদীনায় মুহাম্মদ ইব্ন হাসান ইব্ন জা'ফর ইব্ন মূসা কাসিম এবং তাঁর ভাই আলী ইব্ন হাসান একে অপরের বিরুদ্ধে আবির্ভূত হয়ে খলীফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন। সরকারের ভয় জনমন থেকে তখন সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত। সর্বত্র অরাজকতা ও গৃহযুদ্ধের প্রাদুর্ভাব মদীনা শরীফের অভ্যন্তরে দুই ভাই এমনি ঘোর কলহে লিপ্ত হলেন যে, উভয়পক্ষে প্রচুর লোকক্ষয় হলো। ২৭৭ হিজরীর (৮৯০-৯১ খ্রি.) পূর্ণ একটি মাস মদীনা শহরে জুমুআর জামাআত

অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। মক্কা শরীফের অবস্থাও ছিল তথৈবচ। সেখানে ইউসুফ ইব্‌ন আবুস সাজ ছিলেন প্রধান আমিল। তাঁর স্থলে খলীফার দরবার থেকে আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ তাঈ শাসকরূপে সনদ লাভ করলেন। আহমদ তাঈ তাঁর পক্ষ থেকে তাঁর গোলাম বদরকে আমীরুল হজ্জ বানিয়ে প্রেরণ করলেন। ইউসুফ তার মুকাবিলায় অবতীর্ণ হলেন। মসজিদে বায়তুল হারামের সম্মুখেই উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হলো। ইউসুফ বদরকে বন্দী করলেন। বদরের সৈন্যরা এবং হাজীরা মিলে ইউসুফের উপর হামলা করলেন। তারা ইউসুফকে বন্দী করে বাগদাদে পাঠিয়ে দিলেন এবং বদরকে মুক্ত করে দিলেন। মোটকথা, তখনকার পরিস্থিতি ছিল লাঠি যার মুল্লুক তার।

মুওয়াফ্‌ফাকের মৃত্যু

খলীফা মু'তামিদ বিল্লাহ্ নামে মাত্র খলীফা ছিলেন। তার ভাই মুওয়াফ্‌ফাকই স্বীয় শৌর্য-বীর্য ও জ্ঞানবত্তার জোরে রাষ্ট্রের প্রতিটি ব্যাপারে কর্তৃত্ব চালিয়ে যাচ্ছিলেন। সত্য কথা হলো, আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি খলীফা না হয়েও প্রকৃত পক্ষে তিনিই ছিলেন খিলাফতের চালিকাশক্তি। মুওয়াফ্‌ফাক যুবরাজও ছিলেন– যা উপরেই বিবৃত হয়েছে। তাঁর পূর্বে তুর্কী সর্দাররাই ছিলেন খিলাফতের প্রধান চালিকাশক্তি। মুওয়াফ্‌ফাক ক্ষমতা হাতে নিয়ে তাদের সে শক্তি খর্ব করে দেন এবং সে শক্তি নিজ হাতে তুলে নেন। মুওয়াফ্‌ফাক যেহেতু হাবশীদের দর্প চূর্ণ করে তাদেরকে উৎখাত করেছিলেন তাই মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে তাঁর এবং তাঁর পুত্র মু'তাদিদের জনপ্রিয়তা বেশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। তুর্কী সেনাপতিরা কোনদিনই হাবশীদের সাথে এঁটে উঠতে পারেননি। এ জন্যে তাদেরও আর মুওয়াফ্‌ফাকের বিরোধিতা করার মুখ বা সাহস ছিল না। কিন্তু রাষ্ট্রের শাসন-শৃঙ্খলা যেহেতু ইতিমধ্যেই অনেকটা শিথিল হয়ে পড়েছিল তাই অরাজকতা বেড়েই চলেছিল। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে দিনে দিনে যে সব শক্তি গড়ে উঠেছিল, এবার তারা মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো এবং তাদেরকে দমন করা যাচ্ছিল না। এতদ্‌সত্ত্বেও রাজধানীতে মুওয়াফ্‌ফাকের বর্তমানে কারো খলীফা (অগ্রাহ্য) করার বা খুতবায় তাঁর নাম এড়িয়ে যাওয়ার সাধ্য ছিল না। মুওয়াফ্‌ফাক যখন পারস্য ও ইস্পাহান থেকে বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করলেন তখন তাঁর গেঁটে বাত দেখা দেয়। নানারূপ চিকিৎসা করেও কোন ফলোদয় হয়নি। ২৭৮ হিজরীর ২২ সফর (৮৯১ খ্রি. ৬ জুন) তাঁর মৃত্যু হয় এবং তিনি রুসাফা নামক স্থানে সমাহিত হন। খলীফা মু'তামিদ তখন বেঁচে থাকলেও তাঁর মর্যাদা একজন কয়েদীর বেশি ছিল না। আসল খলীফা মুওয়াফ্‌ফাকই ছিলেন। তাঁর মৃত্যু হলে অমাত্যবর্গ তাঁর পুত্র আবুল আব্বাস মুতাদিদকে সর্ব সম্মতিক্রমে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করলেন। আপন শৌর্যবীর্য ও প্রজ্ঞাবলে তিনি রাষ্ট্রীয় সকল ব্যাপারের মধ্যমণিতে পরিণত হন। খলীফা মু'তামিদ পূর্ববৎ অক্ষম ও অথর্বরূপেই বহাল থাকেন।

কারামিতা

হিজরী ২৭৮ সালে (৮৯১-৯২ খ্রি.) কূফায় হামাদান ওরফে কারামিতা নামক জনৈক ব্যক্তি এক নতুন ধর্মের প্রবর্তন করে। সে ছিল একজন কট্টর শিয়া। তাঁর ধর্ম বিশ্বাস ছিল, ইমাম কেবল সাতজন ঃ

প্রথম ইমাম হুসাইন (রা)
দ্বিতীয় ইমাম আলী যায়নুল আবেদীন
তৃতীয় ইমাম বাকের ইব্ন আলী
চতুর্থ ইমাম হযরত জা'ফর সাদেক
পঞ্চম ইমাম ইসমাঈল ইব্ন জা'ফর
ষষ্ঠ ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল
সপ্তম ইমাম উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ।

নিজেকে সে উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ নায়েব বা প্রতিনিধিরূপে প্রচার করতো। অথচ প্রকৃত পক্ষে মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈলের উবায়দুল্লাহ্ নামে কোন পুত্র সন্তান ছিল না। সে হযরত আলী (রা)-এর পুত্র মুহাম্মদ ইবনুল হানফিয়াকে রাসূল বলে প্রচার করতো। তার প্রচারিত আযানে সে আশহাদু আন্না মুহাম্মদ ইবনুল হানফিয়া রাসূলুল্লাহ্ শব্দ যোগ করেছিল। সে বায়তুল মুকাদ্দাসকে কিবলা বলে প্রচার করতো। দিবা-রাত্রির মধ্যে কেবল তার দুই ওয়াক্ত নামায ছিল, দুই রাকাআত সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং দুই রাকাআত সূর্যাস্তের পরে। সে প্রচার করতো যে, কোন কোন সূরা মুহাম্মদ ইবনুল হানফিয়ার উপরও অবতীর্ণ হয়েছিল। জুমুআর পরিবর্তে সোমবারকে সে সপ্তাহের পবিত্র দিনরূপে গণ্য করে। সে দিন কোন কাজকর্ম করতো না। পূর্ণ বছরে দুই দিন রোযা ফরয জ্ঞান করতো। সে নবীয তথা দ্রাক্ষারসকে হারাম এবং মদ্যকে হালাল জ্ঞান করতো। সঙ্গমের ফরয গোসলকে সে অপ্রয়োজনীয় বিবেচনা করতো। তার ইচ্ছামত কোন কোন চতুষ্পদ জন্তুকে হালাল, আবার কোন কোন চতুষ্পদ জন্তুকে হারাম বলে অভিহিত করতো। কারামিতার বিরুদ্ধাচরণকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে সে অবশ্য বধ্য বিবেচনা করতো। সে তার নিজের উপাধি রেখেছিল 'কায়েম ইব্ন হক্ক' (সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত) বলে।

হাবশীদের সর্দার খবীছ এবং বাহবুদের সাথেও সে তার এ নতুন ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করে তাদেরকে তার সমর্থক বানাতে চেয়েছিল। কিন্তু তারা তার কথায় কর্ণপাত করেনি। তাদের উৎখাত হওয়ার আট বছর পর কূফায় সে স্বীয় ধর্মমত প্রচার করতে শুরু করলে অনেকেই তার হাতে দীক্ষা গ্রহণ করে তার ভক্তদলে শামিল হয়। বেগতিক দেখে কূফার আমিল তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন।

ঘটনাচক্রে কারারক্ষীদের শৈথিল্যের সুযোগ নিয়ে কারমাত কারাগার থেকে পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়। তার ভক্তরা রটিয়ে দিল যে, সে এত বেশি আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী যে, কারাগার তাকে আটকে রাখতে পারে না। ধীরে ধীরে তার প্রভাব-প্রতিপত্তি দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে। তার ভক্তদল দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। আজকাল আমরা আমাদের যুগের কবরপূজারী পীরপূজারীদেরকে দেখে তাজ্জব হই যে, কেমন করে তারা অজ্ঞ, মূর্খ, গাঁজাখোর আফিম খোরদেরকে কামেল ও আল্লাহ্র ওলী জ্ঞানে তাদের পিছু পিছু ছোটে এবং তাদের প্রত্যেকটি আদেশকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করাকে জরুরী জ্ঞান করে। কিন্তু ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, প্রত্যেক যুগেই এরূপ অজ্ঞদের একটি দল বর্তমান থাকে। আমাদের নজীবাবাদ শহরে এমনি এক ব্যক্তির কাছে শহরের পেশাদার নর্তকী ও পতিতা রমণীরা প্রতি বৃহস্পতিবার

এসে জমায়েত হয়। তারা তার মজলিসে নাচগান পরিবেশন করে। গুণ্ডা-বদমাশ যুবকরা এই সুযোগে তাদের যৌন লালসা চরিতার্থ করে। প্রকাশ্য মজলিসে আল্লাহ্ ও রাসূলের শানে ঔদ্ধত্যপূর্ণ বাক্যাদি উচ্চারিত হয়। নামায-রোযার তো কোন বালাই নেই। এক বিরাট সংখ্যক লোক তাকে একেবারে খোদার আসনে বসিয়ে রেখেছে। আর তার কাছে তাদের অভাব-অনটনের কথা জ্ঞাপন করে এবং মূল্যবান উপঢৌকনাদি পেশ করে তাকে সন্তুষ্ট করার প্রয়াস পায়। সুস্বাদু আহার্য দ্রব্যাদি এবং দুর্লভ উপহার সামগ্রী তারা তার হাতে তুলে দেয়।

এ ভক্তদের মধ্যে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী, ডাক্তার, ব্যবসায়ী ও উচ্চ শিক্ষিত লোকেরাও রয়েছে। অনেক চেষ্টা করেও কেন যে লোক তাকে এত ভক্তি করে তার কোন সঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাই অগত্যা মেনেই নিতে হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা এমন কিছু লোক সৃষ্টি করেছেন যারা চোখ থাকতে অন্ধ, মাথা থাকতেও বিবেকহীন, পাগল। এ জাতীয় লোক আজও সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায়। আর এ জাতীয় লোকেরাই সে যুগে কারমাতের নব্য আবিষ্কৃত ধর্মে দীক্ষিত হয়। এ জাতীয় লোকের উপস্থিতি সর্বদা অন্ধকারমনা লোকদেরকে তাদের রমরমা ব্যবসা চালাতে সাহসী করে তোলে এবং দীন ইসলামের মুকাবিলায় চিরকালই সমস্যা সৃষ্টি করে সত্যিকারের মুসলমানদেরকে তরবারি ও রসনার জিহাদের সুযোগ এনে দিয়েছে। তাই এদের অস্তিত্বও আল্লাহ্‌র হিকমত থেকে শূন্য বলে ভাবা যাবে না। এরা যদি নাই থাকতো তবে সত্যিকারের মুসলমানদের তাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার ও তৎপর হয়ে উচ্চতর মর্যাদা লাভ ঘটতো কী করে? নফসে আম্মারা বা পাপাচারের উদ্বুদ্ধকারী প্রবৃত্তি এবং বিতাড়িত শয়তানই যদি না থাকতো তা হলে আল্লাহ্‌র আনুগত্যের জন্যে পুরস্কার লাভ ঘটতো কী করে?

যুবরাজরূপে মু'তাদিদের অভিষেক

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, মুওয়াফ্‌ফাকের মৃত্যুর পর মু'তাদিদকে যুবরাজ মনোনীত করা হয়। কিন্তু তার এই যুবরাজ পদ প্রাপ্য ছিল জা'ফর ইব্‌ন মুতামিদের পর। জা'ফর ছিলেন প্রথম যুবরাজ এবং মুতাদিদ ছিলেন দ্বিতীয় যুবরাজ যেমনটি ছিলেন তাঁর পিতা মুওয়াফ্‌ফাক দ্বিতীয় যুবরাজ। কিন্তু ২৭৯ হিজরীতে (৮৯২-৯৩ খ্রি.) মু'তামিদ মু'তাদিদের প্রভাব-প্রতিপত্তির ভয়ে নিজ পুত্র জা'ফরের পরিবর্তে ভ্রাতুষ্পুত্র মুতাদিদের যুবরাজত্বকে অগ্রগণ্য করে তাঁকেই প্রথম যুবরাজরূপে মনোনয়ন দান করলেন। তিনি তাঁর অধীনস্থ প্রদেশসমূহে আমিলদের নামে এ মর্মে ফরমান জারি করে দিলেন যে, তাঁর পরে মুতাদিদকে সিংহাসনে আরোহণ করবেন।

রোমের যুদ্ধ

খলীফা মু'তামিদের আমলের অস্থির অশান্ত পরিস্থিতির আলোচনায় এখনো রোমানদের প্রসঙ্গ আসেনি। ২৫৭ হিজরীতে (৮৭১ খ্রি.) কনসটান্টিনোপলের কায়সার মীখাইল ইব্‌ন রূফিলকে তাঁর সাকলাবী নামক জনৈক আত্মীয় হত্যা করে তার সিংহাসনে আরোহণ করে। ২৫৯ হিজরীতে (৮৭৩ খ্রি.) রোমানরা মালীতা আক্রমণ করে। কিন্তু যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। ২৬৩ হিজরীতে (৮৭৬ খ্রি) তারা তারতূসের নিকটবর্তী কারকারা দুর্গ মুসলমানদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়। ২৬৪ হিজরীতে (৮৭৬-৭৭ খ্রি.) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন

রশীদ কাউস চল্লিশ হাজার শামদেশীয় সীমান্ত সৈন্যসহ রোমানদের উপর হামলা করে জয়ী হন, কিন্তু পরে আবদুল্লাহ্ ইব্ন রশীদ বন্দী হয়ে কনসটান্টিনোপলে নীত হন।

২৬৫ হিজরীতে (৮৭৮-৭৯ খ্রি.) রোমানরা আম-আফ্রিকা আক্রমণ করে চারশ মুসলমানকে হত্যা এবং চারশজনকে বন্দী করে। ঐ বছরই রোম সম্রাট আবদুল্লাহ্ ইব্ন রশীদকে কয়েক জিল্‌দ কুরআন শরীফসহ আহমদ ইব্ন তূলূনের কাছে উপঢৌকনস্বরূপ পাঠিয়ে দেন। ২৬৬ হিজরীতে (৮৭৯-৮০ খ্রি.) সাকলিয়া দ্বীপ সন্নিহিত রোমান মুসলমানদের নৌবহরের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধে, মুসলমানরা যুদ্ধে পরাজিত হয় এবং তাদের কয়েকখানা যুদ্ধ জাহাজ রোমানরা দখল করে নিয়ে যায়। অবশিষ্ট জাহাজগুলো সিসিলী দ্বীপে গিয়ে নোঙর করে।

আহমদ ইব্ন তূলূনের শামের নায়েব এই রোমানদের উপর একটি সফল হামলা চালিয়ে অনেক গনীমত হাসিল করেন। ২৭০ হিজরীতে (৮৮৩-৮৪ খ্রি.) এক লাখ সৈন্যসহ তারতূস থেকে ছয় মাইল দূরে অবস্থিত কলমিয়া আক্রমণ করে। তারতূসের শাসনকর্তা মাজিয়ার তাদের উপর নৈশ আক্রমণ চালিয়ে সত্তর হাজার সৈন্যকে বধ করেন। তাদের প্রধান পোপ বন্দী হন এবং প্রধান ক্রুশ মুসলমানদের দখলে আসে। ২৭৩ হিজরীতে (৮৮৬-৮৭ খ্রি.) তারতূসের শাসনকর্তা মাজিয়ার এবং আহমদ জু'ফী যৌথভাবে রোমানদের উপর হামলা করেন। যুদ্ধের সময় প্রস্তর নিক্ষেপক যন্ত্রের একটি গোলার প্রচণ্ড আঘাতে আহত হয়ে মাজিয়ার যুদ্ধ স্থল পরিত্যাগ করেন এবং পথেই ইনতিকাল করেন। মুসলমানরা তার শবদেহ তারতূসে নিয়ে এসে দাফন করেন। মুসলিম জাহানে চরম অস্থিরতা ও স্থানে স্থানে গৃহযুদ্ধ চলা সত্ত্বেও রোমানরা এ সময় মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোন উল্লেখযোগ্য বিজয় লাভে সমর্থ হয়নি।

মু'তামিদের মৃত্যু

খলীফা মু'তামিদ আলাল্লাহ্ ইব্ন মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ্ ২০ শে রজব ২৭৯ হিজরীতে (অক্টোবর ৮৯২ খ্রি.) ইনতিকাল করেন। সামাররায় তিনি সমাহিত হন। হারূনুর রশীদের তনয় মুতাসিম বিল্লাহ্‌র আমল থেকেই সামাররা ছিল আব্বাসীয় খলীফাদের রাজধানী। মু'তামিদ আলাল্লাহ্ সামাররা ছেড়ে বাগদাদে বসবাস করতে শুরু করেন। ফলে রাজধানী পুনরায় বাগদাদে চলে আসে। সামাররা থেকে রাজধানী বাগদাদে স্থানান্তরিত হওয়ায় খলীফার দরবারে জেঁকে বসা তুর্কী সর্দারদের ক্ষমতা লোপ পেয়ে যায়। রাজধানী পরিবর্তনের এ ব্যাপারটির কৃতিত্বও ছিল মু'তামিদের ভাই মুওয়াফ্‌ফাকেরই। তাঁর দূরদৃষ্টি ও প্রজ্ঞাই একাজে তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

মু'তামিদের আমলে রাষ্ট্র ও সরকারের কর্তৃত্ব নিতান্তই দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এমন পরিস্থিতিতে যা একান্তই স্বাভাবিক রাষ্ট্রের আমলাবর্গের সেই অনৈক্য ও রেষারেষি তখন চরমে উঠেছিল। গোটা রাজ্যের সর্বত্র চরম হাঙ্গামা বিরাজ করছিল। লোকের মন থেকে খলীফার প্রভাব বা শ্রদ্ধাবোধ সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত হয়ে গিয়েছিল। যে যেখানে সুযোগ পায় সেখানেই রাজ্য দখল করে নেয়। প্রাদেশিক গভর্নররা রাজস্ব প্রেরণ বন্ধ করে দেয়। দেশে আইন-কানুন বলতে কিছু ছিল না। যে যে ভূখণ্ড দখল করলো সেখানেই তার নিজস্ব আইন চালু করে দেয়।

প্রজাদের উপর ব্যাপক জুলুম হতে থাকে। আমলারা যেমন ইচ্ছে তাদের প্রতি নির্যাতন নিপীড়ন চালাতে থাকে। বাধা দেওয়ার মত কেউ ছিল না। সামান বংশীয়রা মাওরাউন নাহরে, সাফার বংশীয়রা সিজিস্তানে, কিরমান, খুরাসানে ও পারস্য দেশে, হাসান ইব্‌ন যাইদ তাবারিস্তান ও জুর্জানে, হাবশীরা বসরা, আল্লা ও ওয়াসিতে, খারিজীরা মুসেল ও জাযীরায়, ইব্‌ন তূলূন মিসর ও শামে এবং ইব্‌ন আগলাব আফ্রিকায় নিজেদের দখল প্রতিষ্ঠা করে নিজ নিজ রাজত্ব গড়ে তুলে।

এদের ছাড়াও অনেক ছোট ছোট সর্দারও বিভিন্ন এলাকায় আপন আপন দখল ও রাজত্ব প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর হয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে সংঘর্ষরত ছিল। খলীফার রাজত্বের নিদর্শন কেবল এতটুকুই ছিল যে, জুমুআর খুতবায় খলীফার নাম উচ্চারিত হতো। খলীফার আর কোন নির্দেশ মান্য করা হতো না। মুওয়াফ্‌ফাক তাঁর সকল শক্তি এবং গোটা জীবন এ সব বিদ্রোহ দমনেই ব্যয় করেন। কিন্তু একমাত্র হাবশী বা যঙ্গীদেরকে উৎখাত করা ছাড়া আর কোন ক্ষেত্রেই সাফল্য অর্জনে সক্ষম হননি। ঐ আমলেই কারামিতা প্রমুখের (পরবর্তীকালে প্রকাশিত) ফিতনার ভিত্তি রচিত হয়। ঐ আমলেই পরবর্তীকালের মিসরীয় সুলতানদের এবং ইয়ামানের শিয়াদের ঊর্ধ্বতম পুরুষ উবায়দুল্লাহ্ উবায়দ নিজে মাহ্‌দী হওয়ার দাবি করেন। এই ব্যক্তি কবীলা বনূ কিনানার অধিকাংশ লোককে সঙ্গে নিয়ে মাগরিবের (মরক্কোর) দিকে যাত্রা করেন এবং সেখানে ক্রমে ক্রমে দল ভারী করে মিসর ও আফ্রিকায় একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করেন। ঐ আমলেই হাদীস শাস্ত্রের প্রখ্যাত ইমামবর্গ ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, আবূ দাঊদ, তিরমিযী ও ইব্‌ন মাজা (র) প্রমুখ ইন্তিকাল করেন। মোটকথা, মু'তামিদের রাজত্বের তেইশটি বছর এভাবে অরাজকতা, অস্থিরতা, দুর্ভোগ ও ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়।

পর্যালোচনা

আব্বাসীয় বংশের খিলাফতের দেড়শ বছর ইতিমধ্যেই অতিক্রান্ত হয়েছে। পূর্ণ এক শতাব্দী ধরে তাদের রাজত্ব চলে অত্যন্ত শানশওকত ও দাপটের সাথে। মু'তাসিম বিল্লাহ্‌র মৃত্যু অর্থাৎ ২২৭ হিজরী (৮৪১-৪২ খ্রি.) থেকে পতনের নিদর্শনসমূহ প্রকাশ পেতে শুরু করে। পরবর্তী কুড়ি বছর খিলাফতে আব্বাসীয়রা বিগত শতাব্দীকালের গৌরব ফিরিয়ে আনা যাবে এরূপ একটা প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু ২৪৭ হিজরীতে (৮৬১-৬২ খ্রি.) মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ্-এর হত্যার দ্বারা এর সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শিথিল ও অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং বার্ধক্য এমনিভাবে তার উপর ছেয়ে যায় যে, অতীত গৌরব ফিরে আসার আর কোন সম্ভাবনাই রইল না। দুর্বলতা ও বার্ধক্যের ঐ বত্রিশটি বছরও আমরা পর্যবেক্ষণ করলাম। এখনও এ বার্ধক্যগ্রস্ত ও দুর্বল খিলাফতকে কয়েক শতাব্দীকাল বেঁচে থাকতে হবে। ইসলামী রাষ্ট্রের ভিন্ন ভিন্ন কয়েকটি কেন্দ্র ইতিমধ্যেই কায়েম হয়ে গেছে। আরো অনেকগুলো কায়েম হওয়ার পথে। শীঘ্রই এমন একটি যুগ আসবে যখন বাগদাদের খিলাফত বা আব্বাসীয় খিলাফতের নামের একটি মহিমা বাকি থাকবে, কিন্তু তা কোন শক্তিরূপে গণ্য হবে না।

এমতাবস্থায় আব্বাসী খিলাফতের খলীফাদের পরবর্তী অবস্থা যদি এই হারে এই অনুপাতে লিখিত হয় তা হলে ইতিহাস তার হৃদয়গ্রহিতা হারিয়ে বসবে এবং পাঠকদের মন-মস্তিষ্কে এক অনাহূত বোঝা ভারাক্রান্ত হয়ে পড়বে। এজন্যে এ পর্যন্ত লিখিত ইতিহাস খুবই সংক্ষেপে লিখিত হলেও পরবর্তী বর্ণনা আরও সংক্ষিপ্ত হবে। খলীফা মু'তামিদ বিল্লাহ্‌র খিলাফত আমলের যে বর্ণনা উপরে দেয়া হয়েছে তার অবিন্যস্তরূপ একথারই প্রমাণবহ যে, এ খলীফাদের ব্যক্তিগত চরিত্রে বর্ণনা উপযোগী উল্লেখযোগ্য ঘটনা আদতেই খুব কম ছিল। অবশ্য তাঁদের শাসনামলে অন্যদের ভুরি ভুরি উল্লেখযোগ্য ঘটনা রয়েছে। কেননা, নতুন নতুন সিলসিলা এবং নতুন নতুন রাজবংশের তখন উদ্ভব হচ্ছিল। এ সব সিলসিলা ও রাজবংশকে নিয়ে সমান্তরালভাবে এগিয়ে যাওয়া এক অসম্ভব ব্যাপার। তবে তার সূচনাকাল বর্ণনা যে, আব্বাসীয়দের সংস্পর্শে এসে কীভাবে তারা শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল তার প্রতি ইঙ্গিত করা জরুরী ছিল যাতে তাদের অবস্থা স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনাকালে তাদের সূচনা ক্ষণের প্রতি ইঙ্গিত করা যায়। ভবিষ্যতেও আব্বাসীয়দের সাথে সম্পর্কের ভিত্তিতে যে সব নতুন নতুন রাজবংশের উদ্ভব হবে সেগুলোর উল্লেখও যথাস্থানে করা হবে।

বনী উমাইয়া বংশের সবচাইতে বড় ত্রুটি হচ্ছে এই যে, তারা যুবরাজ বা পরবর্তী শাসক নির্বাচনকে বংশভিত্তিক করে ইসলামী রাষ্ট্রের ধ্বংসের বীজ বপন করেছিল এবং মুসলমানদেরকে এক বদঅভ্যাসে অভ্যস্ত করে তুলে। বনী আব্বাস বংশের ত্রুটি কোন অংশে তার চাইতে কম ছিল না যে, তারা বনী উমাইয়ার প্রতিটি ব্যাপার মিটিয়ে দিয়েছে, তাদের প্রতিটি স্মৃতিকে নিশ্চিহ্ন করেছে, কিন্তু তাদের এই কুপ্রথাকে তারা সযত্নে সংরক্ষণ করেছে এবং মুসলিম জাতির ধ্বংসের এ উপাদানকে তারা মজবুত থেকে মজবুততর করে তুলেছে। তাদের দ্বিতীয় ত্রুটি ছিল এই যে, শুরু থেকেই তারা আরবদের মুকাবিলায় নওমুসলিম ইরানীদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল। সাফ্‌ফাহ্ থেকে শুরু করে হারূনুর রশীদ পর্যন্ত এক মাহ্‌দী ব্যতীত সকলেই আরবদের শক্তি খর্ব করেন এবং মজুসী-বংশোদ্ভূত লোকদেরকে এগিয়ে নিয়ে যান। ফলে বনী আব্বাস বনী উমাইয়াদের বিজয়ের চাইতে একটুও অগ্রসর হতে পারেনি বরং দিন দিন তাদের রাজত্বের পরিধি হ্রাস পেতে থাকে। ইসলামের সঠিক রূপরেখা এবং ইসলামী নীতিবোধের উপর অগ্নিপূজারীদের একটা হালকা কুজঝটিকার আবরণ পড়ে। মজুসী-বংশোদ্ভূত এ লোকগুলোই আব্বাসীয় খলীফাদের জন্যে সর্বদা সমস্যার সৃষ্টি করতে থাকে। তবে সাহসী আব্বাসী খলীফাগণ এ সব সমস্যাকে জয় করতে সমর্থ হন। মু'তাসিম বিল্লাহ্ প্রবল শক্তিশালী মজুসীদের মুকাবিলায় মাওরাউন নাহরের তুর্কীদের এক নতুন শক্তি গড়ে তোলেন যাদের পিতৃপুরুষের ধর্ম মজুসীদের অগ্নি-উপাসনার ধর্ম হলেও বংশগত দিক থেকে তাদের চাইতে এবং খুরাসানীদের চাইতে স্বতন্ত্র ছিল। মুতাসিম বিল্লাহ্‌র এ উদ্যোগ অবশ্যই কার্যকর ও উপাদেয় প্রতিপন্ন হতো—যদি না তিনি তাদেরকে খুরাসানীদের তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী করে তুলতেন আর যদি তিনি আরবদেরকেও উন্নত করে উক্ত দু'দলের সমপর্যায়ে নিয়ে আসতেন। কিন্তু খলীফা বংশের সাথে দিন দিন আরবদের দূরত্ব বৃদ্ধিই পেতে থাকে। মু'তাসিম বিল্লাহ্‌র তুর্কী জনপদ সামাররায় অবস্থান করায় তুর্কীদের সীমাহীন উন্নতির পথ খুলে যায়। মু'তাসিম বিল্লাহ্ সম্ভবত এজন্যেই তুর্কীদেরকে পছন্দ করেন যে, তারা

উলুভীদের প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল। আরবদের প্রতি তাদের বিরূপ থাকার কারণ ছিল উলুভীরাও আরব ছিল। কিন্তু উলুভীদের প্রতি ইরানীদের অনুরাগ আরবদের চাইতেও বেশি ছিল। এজন্যে খলীফাদের সমস্যার অন্ত ছিল না। মু'তাসিম তাই উক্ত দু'দল ছেড়ে তৃতীয় এমন একটি দলকে বেছে নিলেন যারা এ ব্যাপারে একেবারেই নিরাসক্ত ছিল। কিন্তু ঐ তৃতীয় দল অর্থাৎ তুর্কীরা ইরানীদের মত সুসভ্য এবং অভিজ্ঞ রাজনীতি বিশারদ ছিল না। এদেরকে ব্যবহার করার জন্যে প্রয়োজন ছিল জবরদস্ত চৌকস হাতের। মু'তাসিমের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে যদি হারূন ও মামূনের মত উচ্চ মেধার আরও কয়েকজন খলীফা হতেন তা হলে আব্বাসী খিলাফতের ইতিহাস অন্যভাবে লিখিত হতো এবং মু'তাসিমের রাজধানী সামাররায় স্থানান্তর সঠিক ও কার্যকর বলে গণ্য হতো। কিন্তু মু'তাসিমের উত্তরাধিকারীদের দুর্বলতা এবং আরবদের দুর্বলতর হওয়ায় সামার্‌রায় রাজধানী স্থানান্তর বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ালো। মু'তাসিমের উত্তরাধিকারীদের অযোগ্যতার প্রতিবিধান কোনক্রমেই সম্ভবপর ছিল না।

তুর্কীরা ছিল একটা দুর্ধর্ষ সামরিক জাতি। তাদের মেধা বলতে কিছু ছিল না। তাই তারা না পারলো নিজেদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে আর না তারা উলুভীদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠার দিকে মনোযাগী হলো। উলুভীরা ক্লান্ত শ্রান্ত ও হতাশ হয়ে বসে পড়ে। বাহ্যত আব্বাসীয়দের সম্মুখে তেমন কোন বড় সংকট ছিল না। কিন্ত মু'তাসিমের পর স্বয়ং রাজধানী বাগদাদে যখন দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও অরাজকতা শুরু হলো তখন কেন্দ্রের এ অরাজকতার প্রভাব গোটা রাজ্যে পড়লো এবং বিভিন্ন প্রদেশের ওয়ালী ও আমিলরা কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেদের স্বাধীন রাজত্ব প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর হয়ে পড়লো। আন্দালুস (স্পেন), মরক্কো ও আফ্রিকার উদাহরণ তাদের চোখের সম্মুখেই ছিল। হৃৎপিণ্ড আঘাতগ্রস্ত হতেই গোটা দেহের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে রক্ত সঞ্চালন বন্ধ হয়ে গেল। ঐ সব প্রাদেশিক ওয়ালী ও আমিলদের স্বাধীনতা ঘোষণা ও অরাজকতা লক্ষ্য করে খারিজী, হাবশী, কারামতী প্রভৃতি দল ভাগ্য পরীক্ষায় অবতীর্ণ হলো। এখন এমন এক অবস্থার উদ্ভব হলো যে, মানসূর, হারূন ও মামূনও যদি এ অবস্থায় বেঁচে থাকতেন তবে তাঁদের পক্ষেও হয়তো পরিস্থিতি সামাল দেয়া মুশকিল হতো। মুতাওয়াক্কিলের হত্যা ছিল আব্বাসীয় খিলাফতের পক্ষেও অত্যন্ত অশুভ একটি ঘটনা। তাঁর অব্যবহিত পরেই যদি মুওয়াফ্‌ফাক সিংহাসনে আরোহণ করতেন তাহলে হয়তো তিনি সামাল দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি তখন খলীফারূপে কাজ করার মওকা পাননি। আর তাঁর পুত্র মু'তাদিদ—যিনি পিতার মতই শৌর্যবীর্যসম্পন্ন ছিলেন এমন সময় খলীফা হন যখন ব্যাধি সকল চিকিৎসার অতীত হয়ে গেছে।

পঞ্চম অধ্যায়

মুতাদিদ বিল্লাহ্

মু'তাদিদ বিল্লাহ্র বংশ তালিকা নিম্নরূপ

হারূনুর রশীদ

মু'তাসিম বিল্লাহ্

মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ্

মুওয়াফ্ফাক বিল্লাহ্

মুতাদিদ বিল্লাহ্

তাঁর আসল নাম ও উপনাম ছিল আবুল আব্বাস। ২৪৩ হিজরীর রবিউল আউয়াল (৮৫৭ খ্রি. জুলাই) সাওআব নাম্নী দাসীর গর্ভে তাঁর জন্ম। তাঁর চাচা মু'তামিদ বিল্লাহ্র পর ২৭৯ হিজরীর রজব (অক্টোবর ৮৯২ খ্রি) মাসে তিনি খলীফা পদে আসীন হন। তিনি অত্যন্ত সুদর্শন, সাহসী ও বুদ্ধিমান পুরুষ ছিলেন। প্রয়োজনে কঠোরতা এমনকি রক্তপাতেও কুণ্ঠিত হতেন না। চেহারায় ছিল গাম্ভীর্যের ছাপ। যে কোন বিষয় উপলব্ধি করার মত বুদ্ধিমত্তার অধিকারী ছিলেন। জ্যোতিষী ও গল্পকথকদের দুচোখে দেখতে পারতেন না। মামূনের যুগ থেকেই দর্শনের চর্চা খুব বেড়ে গিয়েছিল। ধর্মীয় কলহ এবং বাক্-বিতণ্ডার অবসানকল্পে তিনি দর্শন ও বাহাসের পুস্তকাদির প্রকাশ বন্ধ করে দেন। প্রজাদের ভূমি-রাজস্ব তিনি কমিয়ে দেন। তিনি অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ ছিলেন এবং প্রজাদের উপর থেকে সকল প্রকার অত্যাচার-উৎপীড়ন দূরীকরণে সচেষ্ট থাকতেন।

মক্কায় এতকাল পর্যন্ত দারুন্ নাদওয়া নামক কুরায়শদের সেই ইতিহাস বিখ্যাত মন্ত্রণাগৃহটি বর্তমান ছিল। মুতাদিদ তা ভেঙ্গে দিয়ে বায়তুল হারাম মসজিদের পাশে তদস্থলে একটি মসজিদ নির্মাণ করে দেন। পারসিক বংশোদ্ভূত লোকদের সংখ্যা যথেষ্ট হওয়ায় নওরোজের দিন তারা বাগদাদে উৎসব পালন ও অগ্নি প্রজ্বলনের প্রথা চালু করেছিল। মুতাদিদ ফরমানবলে তা বন্ধ করে দেন। তিনি মিসরের শাসক খামারুভিয়া ইব্ন আহ্মদ ইব্ন তূলূনের কন্যাকে বিবাহ করেন। তিনি মীরাছ সংক্রান্ত অধিদপ্তর কায়েম করেন এবং যাবিল আরহামদের জন্যেও উত্তরাধিকার দানের ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। প্রজাসাধারণ এতে তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রীত হয় এবং তাঁর জন্যে দু'আ করে। প্রজাসাধারণের মধ্যে এজন্যে তাঁর জনপ্রিয়তা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

একবার মু'তাদিদ কাযী আবূ হাযিমকে বলে পাঠালেন যে, আপনি অমুকের নিকট থেকে লোকের প্রাপ্য আদায় করিয়ে দিয়েছেন। তার কাছে আমার নিজেরও কিছু প্রাপ্য আছে। আপনি তা আমাকে আদায় করে দিন। কাযী জবাবে বলে পাঠালেন, আপনি সাক্ষী পেশ

করুন, তা হলে আপনার সপক্ষে রায় দেয়া হবে। মু'তাদিদের পক্ষে সাক্ষীরা কাযী আবূ হাযিমের আদালতে হাযির হতে অস্বীকৃতি জানালো এই ভয়ে যে, পাছে কাযী সাহেব তাদেরকে সাক্ষী হিসাবে অনুপযুক্ত না সাব্যস্ত করেন। ফলে মু'তাদিদ তাঁর প্রাপ্য আদায়ে ব্যর্থ হন। মু'তাদিদ আব্বাসীয় খিলাফতের অত্যন্ত দুরবস্থা যুগে খলীফা হন এবং তিনি এ দুরবস্থা কাটিয়ে উঠতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তাঁর প্রাণপণ চেষ্টায় উন্নতির কিছু লক্ষণ দেখা দিলেও তাঁর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে উন্নতির এ ধারা অব্যাহত রাখার মত যোগ্যতা ছিল না।

মু'তাদিদের ক্ষমতাসীন হওয়ার কয়েকদিন মাত্র পরেই নসর ইব্ন আহ্মদ সামানীর মৃত্যু হয় এবং তাঁর স্থলে তাঁর ভাই ইসমাঈল ইব্ন সামানী মাওরাউন নাহরের শাসক নিযুক্ত হন। মুসেল এলাকায় খারিজীদের দু'টি দল পরস্পরে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল। তন্মধ্যে একদলের নেতা আবূ জূযা ২৮০ হিজরীতে (৮৯৩-৯৪ খ্রি.) বন্দী হয়ে বাগদাদে নীত হলে মু'তাদিদ অত্যন্ত কষ্ট দিয়ে তাকে হত্যা করান। অপর দলের সর্দার হারূন শাবী বিদ্রোহী তৎপরতায় লিপ্ত থাকে। ২৮০ হিজরীতে (৮৯৩-৯৪ খ্রি) মু'তাদিদ নিজে জাযিরায় অভিযান চালিয়ে বনী শায়বানের গোত্রসমূহের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বিধান করেন এবং প্রচুর গনীমতের মাল নিয়ে বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করেন। মু'তাদিদ তাঁর বদর নামক গোলামকে পুলিশ বিভাগের প্রধান এবং উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন সুলায়মান ইব্ন ওয়াহবকে উযীর নিযুক্ত করেন। ২৮১ হিজরীতে (৮৯৪-৯৫ খ্রি.) তিনি মারভীন দুর্গ দখলকারী হামদান ইব্ন হামদূনকে বন্দী করে বাগদাদে ফিরে আসেন। উল্লেখ্য, উক্ত হামদান খারিজী নেতা হারূন শা'বীর সাথে সখ্যতা স্থাপন করেছিল। মু'তাদিদ এ সময় মারভীন দুর্গ ধূলিসাৎ করে দেন।

২৮১ হিজরীতে (৮৯৪-৯৫ খ্রি) মু'তাদিদ তাঁর পুত্র আলী ওরফে মুক্তাফীকে রে, কাযবীন, জুনজান, কুম, জাদআন প্রভৃতি এলাকার শাসক নিযুক্ত করেন। ২৮৩ হিজরীর রবিউল আউয়াল (এপ্রিল ৮৯৬ খ্রি.) মাসে খলীফা মু'তাদিদ মুসেল এলাকায় নিজে সসৈন্যে উপস্থিত হয়ে হারূন শা'বী খারিজীকে উৎখাত করতে সক্ষম হন। হারূনকে গ্রেফতার করে তিনি কারাগারে নিক্ষেপ করেন এবং নিজে বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করেন। এরপর বাগদাদে ঢাকঢোল পিটিয়ে তাকে হত্যা করেন। ২৮৫ হিজরীতে (৮৯৮ খ্রি.) মু'তাদিদ আযারবায়জান আক্রমণ করে আমুদকেল্লা অধিকার করেন এবং আহমদ ইব্ন ঈসা ইব্ন শায়খকে গ্রেফতার করেন। ২৮৬ হিজরীর রবিউসসানী (৮৯৯ খ্রি-এর এপ্রিল) মাসে তিনি বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করেন।

কারামিতাদের খারাজ

২৮১ হিজরীতে (৮৯৪ খ্রি.) কারামিতাভক্তদের মধ্যকার জনৈক ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মাহ্দী বাহরায়নের নিকটবর্তী কাতীফ নামক স্থানে এসে আলী ইব্ন মুআল্লা ইব্ন হামাদানের গৃহে অবস্থান করে এবং দাবি করে যে, যামানার মাহ্দী তাকে প্রেরণ করেছেন এবং তিনি নিজে শিগগিরই বিদ্রোহ করবেন। উক্ত আলী ছিল শিয়া মতাবলম্বী। সে শিয়াদেরকে একত্র করে ইয়াহ্ইয়া পেশকৃত কথিত যামানার ইমামের পত্রটি দেখায় এবং তাদেরকে তা পাঠ করে শুনায়। শিয়ারা অত্যন্ত ভক্তি গদ গদ চিত্তে পত্রটি শ্রবণ করে এবং মাহ্দী আত্মপ্রকাশ করলে তাঁর সাথে বিদ্রোহে শামিল হবে বলে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়। কিছুদিন পর ইয়াহ্ইয়া আত্মগোপন করে এবং তারপর পুনরায় আত্মপ্রকাশ করে কথিত ইমামের দ্বিতীয় একখানা পত্র দেখায় যাতে

লেখা ছিল– তোমরা মাথা পিছু ছত্রিশ দীনার করে ইয়াহ্ইয়াকে প্রদান কর। শিয়ারা তাৎক্ষণিকভাবে তা পালন করে। কয়েকদিন পর তৃতীয়বারের মত আত্মপ্রকাশ করে ইয়াহ্ইয়া কথিত ইমামের এ মর্মের একটি পত্র হাযির করে যাতে লেখা ছিল ঃ তোমরা তোমাদের অর্থ-সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ যামানার ইমামের জন্যে ইয়াহ্ইয়ার হাতে অর্পণ কর।

২৮৬ হিজরীতে (৮৯৯ খ্রি.) আবূ সাঈদ জানানী বাহরায়নে এসে কারামিতা ধর্মমতে বিশ্বাসী লোকদেরকে প্রকাশ্যে দাওয়াত দিল। এতকাল যারা গোপনে গোপনে এ ধর্ম পালন করে আসছিল এখন তারা প্রকাশ্যে তার ঝাণ্ডাতলে সমবেত হতে লাগল। আবূ সাঈদ তাদের সকলকে নিয়ে কাতীফে অবস্থান করে যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম প্রস্তুত করে বসরা আক্রমণ করতে মনস্থ করলো। বাহরায়নে এ বৃত্তান্ত অবহিত হয়ে খলীফা মু'তাদিদ বসরার আমিল আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ওয়াছিকীকে বসরায় প্রাচীর নির্মাণের নির্দেশ দিলেন। চৌদ্দ হাজার দীনার ব্যয়ে সে মতে বসরার প্রাচীর নির্মিত হলো।

আবূ সাঈদ বসরার উপকণ্ঠে পৌঁছতেই রাজধানী বাগদাদ থেকে আব্বাসী ইব্ন উমর গানাভী দু'হাজার অশ্বারোহী সৈন্যসহ বসরার হিফাযতের উদ্দেশ্যে সেখানে এসে উপনীত হন। বসরার বাইরেই আব্বাস ও আবূ সাঈদের মধ্যে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে আবূ সাঈদ আব্বাসকে গ্রেফতার করতে সমর্থ হয়। আব্বাসের সাথে অপর যারা যুদ্ধে বন্দী হলেন তাদের সকলকেই আবূ সাঈদ একে একে আগুনে নিক্ষেপ করে জীবন্ত দগ্ধ করে। এটা ২৮৭ হিজরীর শাবান (আগস্ট ৯০০ খ্রি.) মাসের ঘটনা। আবূ সাঈদ কারামতী যুদ্ধ বিজয়ের পর বসরা ছেড়ে হিজর জয় করতে মনস্থ করে। হিজরবাসীদেরকে অভয় দিয়ে সে অনায়াসেই হিজর অধিকার করে। তারপর বসরা অভিমুখে রওয়ানা হয়।

বসরাবাসীদের মনে ভীষণ আতঙ্কের সঞ্চার হয়। কিন্তু বসরার আমিল আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ওয়াছিকী তাদেরকে অভয় ও সান্ত্বনা দেন। আবূ সাঈদ এবারও বসরা ছেড়ে এবং আব্বাসকে মুক্ত করে দিয়ে বাহরায়নের নিকটবর্তী এলাকায় চলে যায়। ২৮৮ হিজরীতে (৯০১ খ্রি.) আবুল কাসিম ইয়াহ্ইয়া ওরফে যাকারাভিয়া ইব্ন মাহ্রাভিয়া কূফায় গিয়ে কুলায়স ইব্ন যামযাম ইব্ন আদী গোত্রকে কারামিতা মাযহাবে দীক্ষিত করে। দিন দিন তাদের দল ভারী হয়ে উঠলে শবল নামক জনৈক সর্দার তাদের উপর আক্রমণ করে তাদের আবুল ফাওয়ারিস নামক জনৈক সর্দারকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হন। অবশিষ্টরা পালিয়ে দামেশকের দিকে চলে যায়। শবল বন্দী আবুল ফাওয়ারিসকে বাগদাদে খলীফা মু'তাদিদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। খলীফা তাকে হত্যা করিয়ে দেন। কারামিতারা দামেশকে গিয়ে সেখানকার অধিবাসীদেরকে নিজেদের দলে ভিড়াতে প্রয়াস পায়। দামেশকের শাসক বতখ কারামিতাদের সাথে উপর্যুপরি কয়েকটি যুদ্ধে পরাস্ত হন। এটা ২৮৯ হিজরীর (৯০২ খ্রি.) কথা। এ সময় মু'তাদিদ বিল্লাহ্র শাসনের মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। কারামিতাদের অবশিষ্ট বর্ণনা পরবর্তীতে যথাস্থানে দেয়া হবে।

২৮৬ হিজরীতে (৮৯৯ খ্রি.) মু'তাদিদ তাঁর পুত্র আলীকে জাযীরা এবং আওয়াসিমের গভর্নর হিসেবে সনদ প্রদান করেন এবং হাসান ইব্ন আমর নাসরানীকে রিক্কা থেকে ডাকিয়ে এনে তাঁর মীর-মুন্সী বা উযীর পদ দান করেন। এই আলীই পরবর্তীকালে মুকতাফী লকবে খ্যাতি অর্জন করেন।

২৮৮ হিজরীতে (৯০১ খ্রি.) তাহির ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আমর ইব্ন লাইছ সাফার একটি বাহিনী যোগাড় করে পারস্য অধিকার করতে উদ্যোগী হন। ইসমাঈল সামানী তাকে স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে, তুমি যদি এ প্রদেশে হস্তক্ষেপ করার খায়েশ অন্তরে পোষণ কর, তা হলে আমি আসছি। এতে তাহির নিবৃত্ত হলো। কিন্তু খলীফা মু'তাদিদের গোলাম বদর গিয়ে পারস্য অধিকার করে ফেললো। উযীর উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন সুলায়মান ইব্ন ওয়াহবের ইন্তিকাল হলে খলীফা মু'তাদিদ তাঁর পুত্র আবুল কাসিমকে উযীরে আযম পদে মনোনীত করলেন। খলীফা মু'তাদিদের শাসনামলে ২৮৫ হিজরী (৮৯৮ খ্রি.) ২৮৭ হিজরী (৯০০ খ্রি.) এবং ২৮৮ হিজরীতে (৯০১ খ্রি.) মুসলমানরা রোমানদের ওপর আক্রমণ পরিচালনা করেন। যুদ্ধে কখনো রোমানদের, আবার কখনো মুসলমানদের বেশি ক্ষতি হয়।

মু'তাদিদ বিল্লাহ্র ওফাত

২৮৯ হিজরীতে (৯০২ খ্রি.) খলীফা মু'তাদিদ বিল্লাহ্ অধিক সঙ্গমজনিত কারণে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর উপর নানা রোগব্যাধির প্রাবল্য দেখা দেয়। মৃত্যু যাতনার সময় জনৈক চিকিৎসক তাঁর নাড়ি পরীক্ষা করছিলেন। আচমকা তিনি চিকিৎসককে সজোরে একটি লাথি মারেন। ফলে সাথে সাথে চিকিৎসক মারা গেলেন। ওদিকে মু'তাদিদেরও প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল। মু'তাদিদ চার পুত্র এবং এগারজন কন্যা সন্তান রেখে যান। ২৮৯ হিজরীর রবিউস সানী (৯০২ খ্রি. মার্চ) মাসের শেষ তারিখে মু'তাদিদের মৃত্যু হয়।

মুকতাফী বিল্লাহ্

মুকতাফী বিল্লাহ্র বংশতালিকা নিম্নরূপ

হারূনুর রশীদ

মু'তাসিম বিল্লাহ্

মুতাওয়াক্কিল 'আলাল্লাহ্

মুওয়াফ্ফাক বিল্লাহ্

মুকতাফী বিল্লাহ্

তাঁর আসল নাম ছিল 'আলী এবং উপনাম ছিল আবূ মুহাম্মদ। জীজাক নাম্নী জনৈকা তুর্কী দাসীর গর্ভে তাঁর জন্ম হয়। ইতিহাসে আলী নামের খলীফা কেবল দু'জনই হয়েছেন। একজন হযরত আলী কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহু এবং অপরজন এই মুকতাফী বিল্লাহ্। মু'তাদিদ বিল্লাহ্ তাঁকে স্বীয় উত্তরাধিকারী যুবরাজরূপে মনোনীত করেন। মু'তাদিদের ইন্তিকালের সময় তিনি রিক্কায় ছিলেন। পারস্যে ক্রীতদাস বদর এবং রাজধানীতে উযীরে আযম কাসিম ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ মুকতাফীর নামে লোকে বায়আত গ্রহণ করেন এবং রিক্কায় তাঁর কাছে সংবাদ প্রেরণ করেন। মুকতাফী জুমাদাল আউয়াল তারিখে বাগদাদে প্রবেশ করেন এবং উযীর কাসিমকে সাতটি খেলাত প্রদান করেন। মুকতাফী অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ, সদাচারী এবং সুঠাম দেহী সুপুরুষ ছিলেন। উযীর কাসিম ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ মু'তাদিদের সন্তানই কেবল খলীফা হোন এটাই চাইতেন না। তাঁর ইচ্ছে এ বংশের অন্য কেউ খলীফা হোন।

বদরের চাপের মুখে উযীরকে তার মত পরিবর্তন করতে হয়। এখন তার ভয় ছিল পাছে বদর দরবারে উপস্থিত হয়ে খলীফাকে তাঁর পূর্ব ইচ্ছার কথা জানিয়ে দেন। তাহলে খলীফা তাঁর শত্রু হয়ে যাবেন। তাই বদর পারস্য থেকে বাগদাদে এসে পৌঁছার পূর্বেই খলীফাকে তার প্রতি যে কোন প্রকারে সন্দিহান করে তুলবার ফন্দি তিনি আঁটতে লাগলেন। এ উদ্দেশ্যে বদরের সাথে পারস্যে অবস্থানকারী বড় বড় সর্দারকে রাজধানীতে ডেকে পাঠানো হলো। বদর যখন পারস্য থেকে ওয়াসিতে এসে পৌঁছলেন তখন তাঁর বিরুদ্ধে ওয়াসিতে একদল সৈন্য প্রেরণ করা হলো। বদর খলীফার দরবারে উপস্থিত হয়ে তার নির্দেশ হওয়ার কথা প্রকাশ করতে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। উযীর খলীফাকে তার বিরুদ্ধে আরো বেশি ক্ষেপিয়ে তুললেন। ফলে বাগদাদে পৌঁছবার পূর্বেই তাকে হত্যা করা হলো।

বদর ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ, সাহসী এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তাঁর হত্যা মামূনুর রশীদের খিলাফত আমলের প্রথম দিকে হারছামা ইব্‌ন আইউনের হত্যার সাথেই কেবল তুল্য। ২৮৯ হিজরীর রজব (৯০২ খ্রি জুলাই) মাসে ইসমাঈল সামানীর জনৈক বিদ্রোহী সর্দার মুহাম্মদ ইব্‌ন হারূন রে অধিকার করে নেয়। মুকতাফী তাকে দমনের জন্য একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। কিন্তু মুহাম্মদ হারূন তাদেরকে পরাস্ত করে তাড়িয়ে দেয়। খলীফা মুকতাফী তখন রে এলাকাও ইসমাঈল সামানীকে দিয়ে দেন। তিনি রে-তে পৌঁছে তা অধিকার করেন। মুহাম্মদ হারূন পরাস্ত হয়ে পালিয়ে যায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বন্দী হয়ে আসে। ইসমাঈল সামানী তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। ২৯০ হিজরীর শাবান (জুলাই ৯০৩ খ্রি) মাসে কারাগারেই তার মৃত্যু হয়।

সিরিয়ায় কারামিতাদের গোলযোগ

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, কারামিতারা বাহরায়ন প্রদেশ দখল করে কূফায় এসে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু সেখানে তারা পরাস্ত হয়। তারপর তারা দামেশকে গিয়ে সেখানকার আমিল তাফাজকে উপর্যুপরি পরাস্ত করে অবরোধ করে ফেলে। দামেশকে কারামিতাদের এ উৎপাত লক্ষ্য করে মুকতাফী বিল্লাহ্ বাগদাদ থেকে সসৈন্যে রওয়ানা হন। ২৯০ হিজরীতে (৯০৩ খ্রি.) তিনি রিক্কায় পৌঁছে মুহাম্মদ ইব্‌ন সুলায়মানকে একটি বিশাল বাহিনী দিয়ে দামেশকে কারামিতাদের দমনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন সুলায়মান অত্যন্ত সাহসিকতা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে কারামিতাদের মুকাবিলা করেন। কারামিতাদের সর্দার আবুল কাসিম ইয়াহ্ইয়া ওরফে যাকরাভিয়া ২৯১ হিজরীর ৬ই মুহাররম (৯০৩ খ্রি. ৩০ নভেম্বর) গ্রেফতার হয়। তাদের অনেকে হতাহত ও অনেকে বন্দী হয়, আবার অনেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। যাকরাভিয়া বন্দী অবস্থায় রিক্কায় মুকতাফীর সম্মুখে নীত হয়। তিনি তাকে হত্যা করেন। যাকরাভিয়ার পর তার ভাই হুসাইন কারামিতাদেরকে পুনরায় সংগঠিত করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। তাকেও হত্যা করা হয়। এই হুসাইন নিজেকে আমীরুল মু'মিনীন মাহ্দী খেতাবে ভূষিত করে। তার এক চাচাত ভাই ঈসা নিজেকে মুদ্দাছছির নামে অভিহিত করে দাবি করে যে, সূরা মুদ্দাছছিরে তারই নাম উল্লেখ করা হয়েছে। সে তার গোলামের নামকরণ করে 'মুতাওয়াক বিননূর' বা 'আলোকমালা সজ্জিত' বলে। মোটকথা, ২৯১ হিজরী (৯০৪ খ্রি.) অবধি কারামিতা নেতাদের সকলেই একে একে নিহত হয় এবং সিরিয়ার এ উৎপাত বন্ধ হয়। তবে এরা ইয়ামানে গিয়ে সেখানে নতুনভাবে উৎপাত সৃষ্টি করে।

মিসরে তূলূন বংশের রাজত্বের অবসান

কারামিতাদের যুদ্ধ থেকে অবসর হয়ে মুকতাফী রিক্কা হতে বাগদাদে ফিরে আসেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন সুলায়মানও দামেশক থেকে বাগদাদ অভিমুখে রওয়ানা হন। সিরিয়ার অধিকাংশ এলাকা ইব্‌ন তূলূনের পৌত্র হারূন ইব্‌ন খামারুভিয়ার শাসনাধীন ছিল। খলীফা কিংবা মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল কারোরই তার সাথে লড়াইর কোন ইচ্ছে ছিল না বরং কারামিতাদের উচ্ছেদ সাধনে খলীফার তৎপর হওয়ায় যেমন খলীফার জন্যে তাঁর রাজত্ব রক্ষার ব্যবস্থা ছিল তেমনি তা মিসর রাজ হারূনের পক্ষেও বেশ সহায়ক ছিল। মুহাম্মদ ইব্‌ন সুলায়মান প্রথমে মিসর রাজদরবারে তূলূন বংশের একজন বেতনভোগী সর্দার ছিলেন। তারপর কোন কারণে ঐ বংশের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে খলীফার দরবারের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েন। কারামিতাদেরকে দমন শেষে মুহাম্মদ ইব্‌ন সুলায়মান যখন বাগদাদ অভিমুখে যাচ্ছিলেন তখন তিনি হারূন ইব্‌ন খামারুভিয়ার দাস বদর হাম্মামীর এ মর্মের একটি পত্র পান যে, আজকাল তূলূন বংশ অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছে। তাঁদের শাসনব্যবস্থা প্রায় ভেঙ্গে পড়েছে। আপনি যদি এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে সসৈন্য এদিকে হানা দেন এবং মিসর আক্রমণ করেন তাহলে আমি রাজবংশের বিরুদ্ধে আপনাকে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত আছি।

মুহাম্মদ ইব্‌ন সুলায়মান এ পত্রখানা নিয়ে বাগদাদে আসেন এবং খলীফা মুকতাফীর দরবারে তা পেশ করেন। খলীফা কালবিলম্ব না করে এক বিশাল বাহিনী দিয়ে তাকে মিসর অভিমুখে প্রেরণ করলেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন সুলায়মান মিসরে পৌঁছেই যুদ্ধ শুরু করলেন। পূর্বের কথা অনুযায়ী বদর হামী দলত্যাগ করে তাঁর সাথে এসে মিলিত হলো। যুদ্ধে হারূন ইব্‌ন খামারুভিয়া নিহত হলেন। মিসর মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈলের পদানত হলো। তূলূন বংশের প্রত্যেকে বন্দী অবস্থায় বাগদাদে নীত হলো। এটা ২৯২ হিজরীর সফর (ডিসেম্বর ৯০৪ খ্রি.) মাসের ঘটনা। খলীফার দরবার থেকে ঈসা নওশরীকে মিসরের গভর্নর নিয়োগ করে তথায় প্রেরণ করা হলো। মুহাম্মদ ইব্‌ন সুলায়মান তাঁর হাতে মিসরের শাসন বুঝিয়ে দিয়ে বাগদাদে ফিরে আসেন। ওদিকে মিসরে তূলূন বংশের সমর্থক সর্দারদের একজন সিপাহ্‌সালার ইবরাহীম খিলজী ঈসা নওশরীকে পরাস্ত করে মিসর পুনর্দখল করে নেয়। বাগদাদ থেকে তাকে দমনের উদ্দেশ্যে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করা হলো। প্রথমে সে বাহিনী পরাস্ত হলেও পরে ইবরাহীম খিলজী পরাজিত ও বন্দী হয়ে বাগদাদের কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়। ঐ বছরই খলীফা ইয়ামানে কারামিতাদের উৎপাত বন্ধ করার উদ্দেশ্যে মুজাফফার ইব্‌ন হাজকে গভর্নরীর সনদ দিয়ে ইয়ামানে প্রেরণ করেন।

বনী হামদান

২৯২ হিজরীতে (৯০৫ খ্রি.) খলীফা মুকতাফী আবুল হায়জা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হামদান ইব্‌ন হামদূন আদভী তাগলবীকে মুসেল প্রদেশের গভর্নর নিয়োগ করেন। ২৯৩ হিজরীর পয়লা মুহাররম (২রা নভেম্বর ৯০৫ খ্রি.) তিনি প্রথম মিসরে গিয়ে উপস্থিত হন। তাঁর মুসেলে উপস্থিতির সাথে সাথে সেখানকার কুর্দীরা বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করে। আবুল হায়জা মিসর থেকে সৈন্য আনিয়ে কুর্দীদের মুকাবিলায় অভিযান পরিচালনা করেন। কিন্তু তিনি কুর্দীদের হাতে প্রথমে পরাস্ত হন। অগত্যা মুসেলে ফিরে এসে তিনি খলীফার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। সেমতে বাগদাদ থেকে সাহায্য পাঠানো হয়। ২৯৪ হিজরীর রবিউল আউয়াল

(জানুয়ারী ৯০৭ খ্রি.) মাসে আবুল হায়জা পুনরায় কুর্দীদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করেন। এবার কুর্দীরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে সীক পর্বতে আত্মগোপন করে। আবুল হায়জা দীর্ঘ দিন পর্যন্ত তাদেরকে অবরুদ্ধ করে রাখেন। দীর্ঘ দিন পর্যন্ত এ লড়াই ও অবরোধ চলার পর অবশেষে কুর্দী নেতা মুহাম্মদ ইব্ন বিলাল অভয় প্রার্থনা করেন। তাঁর সে প্রার্থনা মঞ্জুরও করা হয়। এ ঘটনায় গোটা প্রদেশে আবুল হায়জার দাপট কায়েম হয়। কুর্দীরা তাঁর বাধ্য ও অনুগত হয়ে পড়ে। ৩০১ হিজরীতে (৯১৩-১৪ খ্রি.) স্বয়ং আবুল হায়জা খলীফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করেন। খলীফা মুকতাদির তাঁর মুনিস নামক ভৃত্যকে তাকে দমনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। আবুল হায়জা বন্দী অবস্থায় বাগদাদে নীত হন। তাঁর অপরাধ ক্ষমা করা হয় এবং তিনি বাগদাদে বসবাস করতে থাকেন। তারপর আবুল হায়জা এবং তাঁর ভাই হুসাইনকে তাঁদের অন্যান্য নিকটাত্মীয়সহ কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। ৩০৫ হিজরীতে (৯১৭-১৮ খ্রি.) তাদেরকে মুক্তি দেয়া হয়।

তুর্কী ও রোমানদের হামলা

২৯১ হিজরীতে (৯০৪ খ্রি.) রোমানরা এক লাখ সৈন্য নিয়ে মুসলিম রাজ্য আক্রমণ করে। কিন্তু তাতে তারা সুবিধা করে উঠতে পারেনি। সীমান্তের মুসলিম সর্দাররা তাদেরকে মেরে তাড়িয়ে দেন। ২৯৩ হিজরীতে (৯০৬ খ্রি.) এক নতুন উপদ্রবের সূচনা হয়। মাওরাউন নাহরের অপর পারে উত্তরের পার্বত্য এলাকায় বসবাসকারী তুর্কীরা মাওরাউন নাহরে আক্রমণ চালায়। এটা ছিল তাদের পক্ষ থেকে এ ধরনের প্রথম হামলা। এই বন্য ও গেয়ো হামলাকারীরা সংখ্যায় ছিল প্রচুর। পাহাড়ী ঢলের মত তারা সমভূমিতে নেমে এসে চতুর্দিক ছেয়ে যায়। মাওরাউন নাহরের শাসনকর্তা ইসমাঈল সামানী অত্যন্ত সাহসিকতা ও পরম ধৈর্য-সহ্যের সাথে আপন সৈন্যবাহিনীকে সংগঠিত করে এ আক্রমণকারীদের সমুচিত শাস্তি বিধান করেন। তাদের হাজার হাজার সৈন্য বন্দী এবং হাজার হাজার হতাহত হয়। অবশিষ্টরা প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যায়। এ বছর রোমানরা সন্ধির আবেদন জানায় এবং পূর্বের নিয়মানুযায়ী বন্দী বিনিময় হয়। কিন্তু এ সন্ধির অব্যবহিত পরেই রোমানরা ফোরাস শহরে অতর্কিত নৈশ আক্রমণ চালিয়ে হাজার হাজার ঘুমন্ত মুসলমানকে শহীদ ও গ্রেফতার করে। তারা শহরের জামে মসজিদ ভস্মীভূত করে চলে যায়। ঐ বছরই ইসমাঈল সামানী দুয়াইলেম ও তুর্কীদের কোন কোন এলাকা বাহুবলে জয় করেন। ২৯৪ হিজরীতে (৯০৬ খ্রি) মুসলমানরা তারতূসের দিক থেকে রোমান সাম্রাজ্যের উপর হামলা করে একজন পাদ্রীসহ অনেককে গ্রেফতার করেন। এই পাদ্রী পরে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেন।

মুকতাফী বিল্লাহ্র মৃত্যু

সাড়ে ছয় বছরকাল রাজ্য শাসন করে ২৯৫ হিজরীর জুমাদাল আউয়াল (মার্চ ৯০৮ খ্রি.) মাসে মুকতাফী বিল্লাহ্ বাগদাদে ইন্তিকার করেন এবং মুহাম্মদ ইব্ন তাহিরের বাড়িতে সমাহিত হন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর ভাই জা'ফরকে তাঁর উত্তরাধিকারী যুবরাজরূপে মনোনয়ন দান করেন। মুকতাফী বিল্লাহ্ মৃত্যুকালে বায়তুলমালে দেড় কোটি দীনার রেখে যান। জা'ফর ইব্ন মুতাদিদের বয়স তখন ছিল মাত্র তের বছর। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করে মুকতাদির বিল্লাহ্ উপাধি গ্রহণ করেন।

মুকতাদির বিল্লাহ্

মুকতাদির বিল্লাহ্র আসল নাম ছিল জা'ফর এবং তার উপনাম ছিল আবুল ফযল। ২৮২ হিজরীর রমযান (ডিসেম্বর ৮৯৫ খ্রি.) মাসে গারীর নাম্নী রোমান দাসীর গর্ভে তার জন্ম হয়। মুকতাফী বিল্লাহ্ তার মৃত্যুর পূর্বে যখন তাঁর পরবর্তী উত্তরাধিকারীরূপে রাজকুমার মনোনয়নের ব্যাপারে লোকজনের পরামর্শ চাইলেন তখন লোকজন তাঁকে মুকতাদির বিল্লাহ্ নিশ্চিতভাবে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছেন বলে জানালে তিনি তাঁকেই রাজকুমার মনোনীত করেন। ইতিপূর্বে এত কম বয়সে আর কেউই খলীফা হননি। তাই মুকতাদির ক্ষমতাসীন হওয়ার অব্যবহিত পরেই তাঁকে পদচ্যুত করার ব্যাপারে জল্পনাকল্পনা চলে। উযীরে আযমের ক্ষমতার পরিধি যেহেতু অত্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং রাজকোষের অর্থ ব্যয়ের ক্ষমতাও তাঁর ছিল এজন্যও অমাত্যবর্গের মুকতাদিরের খিলাফত পছন্দ ছিল না। এদিকে উযীরে আযমেরও এই ছেলে মানুষের খিলাফত পছন্দ ছিল না। তাই তারা মুতাজ্জর পুত্র আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদকে সিংহাসনে বসার জন্যে প্ররোচণা দিতে লাগলো। মুকতাদিরকে পদচ্যুত করার এবং মুহাম্মদ ইব্ন মুতাজ্জকে সিংহাসনে বসাবার সলাপরামর্শ যখন চলছিল সেই সময় আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন মুতাজ্জর মৃত্যু হয়ে যায়। তারপর মুতাওয়াক্কিল বিল্লাহ্র পুত্র আবুল হুসাইনকে সিংহাসনে বসাবার প্রস্তুতি চলতে থাকে। ঘটনাচক্রে আবুল হুসাইনও এ সময় মৃত্যুবরণ করেন। দু'জন প্রস্তাবিত ব্যক্তির মৃত্যুতে খলীফা মুকতাদিরের খিলাফতের ভিত্তি একরূপ শক্তই হয়ে যায়। কয়েকদিন পর পুনরায় কানাঘুষা শুরু হয় এবং অমাত্যবর্গ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুতাজ্জকে সিংহাসনে আরোহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুতাজ্জ এ উপলক্ষে রক্তপাত হবে না এ শর্তে তাতে সম্মতি দেন। অমাত্যবর্গের সকলেই এ পরামর্শে শামিল ছিলেন। কিন্তু উযীরে আযম আব্বাস ইব্ন হুসাইন এতে শামিল ছিলেন না। ২০শে রবিউল আউয়াল ২৯৬ হিজরীতে (ডিসেম্বর ৯০৮) তিনি যখন বাগানে পায়চারী করতে যাচ্ছিলেন, তখন আকস্মিকভাবে তাঁর উপর আক্রমণ চালিয়ে তাঁকে হত্যা করা হয়। পরদিন ২১শে রবিউল আউয়াল মুকতাদিরের পদচ্যুতির ঘোষণা দিয়ে সকলে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মু'তাজ্জর হাতে বায়আত করেন। খলীফা মুকতাদির তখন মাঠে পোলো খেলছিলেন। পদচ্যুতির সংবাদ পাওয়া মাত্র তিনি রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করে বহির্দরজা বন্ধ করে দিলেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুতাজ্জ সিংহাসনে বসে আল-মুরতাযা বিল্লাহ্ উপাধি গ্রহণ করলেন। তিনি মুকতাদিরকে লিখে পাঠালেন যে, খলীফার প্রাসাদ ত্যাগ করে বেরিয়ে এসো এবং চিরতরে খিলাফতের মায়া ছেড়ে দেয়াই তোমার জন্য মঙ্গলজনক হবে। মুকতাদির জবাবে লিখে পাঠালেন যে, আপনার নির্দেশ শিরোধার্য। রাত পর্যন্ত আমাকের সময় দিন। রাতের বেলা ভৃত্য মুনিসের সাথে অন্যান্য ভৃত্যরা হাঙ্গামা সৃষ্টির পরিকল্পনা করল। হুসাইন ইব্ন হামদান খলীফার প্রাসাদের দরজায় পা দিতেই তারা তীর বর্ষণ করতে লাগলো। সন্ধ্যা পর্যন্ত মুকতাদিরের গোলামরা এরূপ তীর বর্ষণ অব্যাহত রাখে। রাত নাগাদ আরো অনেকে এসে মুকতাদিরের সপক্ষে দাঁড়াল। ফলশ্রুতিতে নব্য খলীফা আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুতাজ্জ তাঁর কয়েকজন শুভাকাঙ্ক্ষীসহ আত্মগোপন করতে বাধ্য হলেন। মুকতাদির ভৃত্য মুনিসকে পুলিশ প্রধানের দায়িত্ব দিয়ে বিদ্রোহী তৎপরতা দমনের আদেশ দিলেন। আবুল হাসান ইব্ন ফুরাতকে তিনি উযীরে আযম মনোনীত করেন।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মু'তাজ্জ গ্রেফতার হয়ে নিহত হন। ঐ বছরই অর্থাৎ ২৯৬ হিজরীর রবিউস সানী (৯০৯ খ্রি জানুয়ারী) মাসে আফ্রিকায় উবায়দুল্লাহ্ মাহ্‌দীর হাতে বায়আত হওয়ায় উবায়দিয়া শিয়া ইমামিয়া রাজবংশের সূচনা হয় এবং আগলাবী রাজবংশের অবসান ঘটে। তাই উবায়দিয়া রাজবংশের সূচনা এবং আগলাবী রাজবংশের অবসানের বিবরণ প্রদান সমীচীন মনে করছি।

উবায়দিয়া রাজবংশের সূত্রপাত

এ বংশের প্রথম বাদশাহ্ উবায়দুল্লাহ্ মাহ্‌দী নিজেকে মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন জা'ফর সাদিকের পুত্র বলে দাবি করতেন। কিন্তু তাঁর বংশপঞ্জী সম্পর্কে তীব্র মতবিরোধ রয়েছে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি ছিলেন অগ্নিউপাসক। আবার কেউ কেউ তাঁকে খ্রিস্টানও বলেছেন- শায়খুল মুনাযিরীন কাযী আবূ বকর বাকিল্লানীও উবায়দুল্লাহ্ মাহ্‌দীর সাইয়িদ বংশোদ্ভূত হওয়ার কথা অস্বীকার করেছেন। খলীফা কাদির বিল্লাহ্‌র শাসনামলে তার বংশতালিকা সম্পর্কে যখন আলোচনা পর্যালোচনা হচ্ছিল তখন বিশিষ্ট পণ্ডিতবর্গ উবায়দুল্লাহ্ মাহ্‌দীর উলুভী বা আলী বংশোদ্ভূত হওয়ার দাবিকে মিথ্যাচার বলে অভিহিত করেছেন। সে পণ্ডিতবর্গের মধ্যে আবুল আব্বাস আবিওযারা, আবূ হামিদ ইসফারায়েনী, আবূ জা'ফর নাসফী, কুদূরী প্রমুখও রয়েছেন। মুরতাযা ইব্‌ন বাতহাবী ও ইব্‌ন আয্‌যাকও উবায়দুল্লাহ্ মাহ্‌দীকে তাকে তার নসবনামা বর্ণনার ব্যাপারে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করেছেন।

উবায়দুল্লাহ্ মাহ্‌দী ছিলেন চরমপন্থী শিয়া। কিন্তু শিয়া পণ্ডিতবর্গও তার উলুভী হওয়ার কথা অস্বীকার করেছেন। উদাহরণস্বরূপ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নু'মান তার উলুভী হওয়ার দাবিতে তাকে মিথ্যাবাদী বলেছেন। ঐতিহাসিকদের শিরোমণি শায়খ জালালুদ্দীন সুয়ূতী অত্যন্ত জোর দিয়ে উবায়দুল্লাহ্ মাহ্‌দীকে তার নসবের দাবিতে মিথ্যাবাদী এবং অগ্নিপূজক বংশোদ্ভূত বলে তার সম্পর্কে তথ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। তবে ইতিহাস শাস্ত্রের অপর এক ইমাম ইব্‌ন খালদুন ইবায়দুল্লাহ্‌কে উলুভী বলে প্রমাণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি তাঁর মুকাদ্দমা ইব্‌ন খালদুনে এবং ইতিহাস পুস্তকে উবায়দুল্লাহ্‌র বংশ সংক্রান্ত দাবিকে যথার্থ বলে স্বীকার করেছেন। কিন্তু এর সপক্ষে তিনি যে যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন তা একান্তই দুর্বল এবং তাঁর নিজের মর্যাদার দিক থেকে চিন্তা করলে তা একান্তই হাস্যকর ঠেকে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, তিনি লিখেছেন উবায়দুল্লাহ্ খানদানে এক বিরাট সালতানাত গড়ে ওঠে। তিনি যদি উলুভীই না হতেন, তবে লোকে তাদের বাদশাহী মেনে নিত না বা তাদের পতাকাতলে সমবেত হয়ে শির দিতে কোনমতেই রাযী হতো না। কারো নসবনামা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে এরূপ যুক্তি-প্রমাণের আশ্রয় নেয়া একান্তই হাস্যকর ব্যাপার। সত্যকথা হলো, এ ব্যাপারে ইব্‌ন খালদুনের কাছে কোন প্রমাণ ছিল না। তিনি নিজে যেহেতু মাগরিবের লোক তাই একটি মাগরিবী রাজবংশ অজ্ঞাত কুলশীল হবে এটা পছন্দ করতে পারেন নি। অনুরূপভাবে মরক্কোর উয়ায়সিয়া রাজবংশকেও উলুভী প্রতিপন্ন করার জন্যে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেন এবং সুলতান দ্বিতীয় ইদরীসকে প্রথম ইদরীসের পুত্র প্রমাণ করতে এবং অযথা একজন বর্বর রমণীর সতীত্ব নিয়ে অযথা আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে পূর্ণ শক্তি নিয়োজিত করেছেন। কেননা, ওটাও একটা মাগবিরী সালতানাতই ছিল। এটা উক্ত ইমাম সাহেবের প্রতি আমাদের

একটা কুধারণাও হতে পারে। আল্লাহ্ মাফ করুন। এসব রাজবংশের ধারাবাহিক আলোচনা যেখানে আসবে সেখানেই তাদের বংশপঞ্জী সম্পর্কে আলোচনা করা যাবে।

পরবর্তীকালে ইব্‌ন হাওশাব নামক ইয়ামানে বসবাসকারী জনৈক কূফাবাসী কারামতী শিয়া হালওয়ানী ও সুফিয়ানী নামক দু'জন প্রচারককে আফ্রিকায় পাঠিয়ে তাদের মাধ্যমে সেখানে আহলে বায়তের প্রতি অনুরাগের দাওয়াত দিতে থাকে। তারা আফ্রিকার কাতামা নামক স্থানে যথারীতি প্রচারকেন্দ্র খোলে ও স্থায়িভাবে আখড়া গেড়ে বসে লোকজনকে কারামিতা আদর্শের দিকে আহ্বান জানাতে থাকে। তারা তাদের সপক্ষে প্রচুর লোককে ভিড়াতে সমর্থ হয়। তারা সেখানকার প্রচুর সংখ্যক লোকের মধ্যে এ ধারণা ছড়াতে সক্ষম হয় যে, হযরত আবূ বকর ও উমর (রা) বলপূর্বক ও অন্যায়ভাবে খিলাফত দখল করেছিলেন। এজন্যে তাঁদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা ধর্মত ওয়াজিব। খিলাফত ও ইমামত একমাত্র হযরত আলী (রা)-এর বংশধরদেরই অধিকার। এতে অন্য কারো অধিকার নেই। কাতামা এ আন্দোলনের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। সেখান থেকে যখন সংবাদ আসলো যে, হালওয়ানী ও সুফিয়ানীর মৃত্যু হয়েছে, তখন উক্ত উবায়দুল্লাহ্ জনৈক আবূ আবদুল্লাহ্ হুসাইন ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন যাকারিয়াকে এই নিশ্চিত ধারণা দিয়ে আফ্রিকায় তার প্রতিনিধি প্রচারকরূপে প্রেরণ করে যে, সে (উবায়দুল্লাহ্) ইমাম জা'ফর সাদিকের বংশধর। উক্ত প্রচারকারী ছিল সানআবাসী একজন শিয়া। উবায়দুল্লাহ্ তাকে এ ধারণা দেন যে, জা'ফর সাদিকের পুত্র মুহাম্মদকে মুহাম্মদ মাকতূস তাঁর প্রপিতামহ ছিলেন। এজন্যে প্রচারক আবূ আবদুল্লাহ্কে কাতামায় গিয়ে অবস্থান করতে হবে। তাঁর যুক্তি ছিল, কাতামা আর মাকতূস শব্দ দু'টিরই মূল ধাতু হচ্ছে আরবী 'কিৎমান যার অর্থ হচ্ছে গোপন করা।

আবূ আবদুল্লাহ্ প্রথমে ইয়ামানে ইব্‌ন হাওশাবের কাছে যায়। সেখান থেকে হাজীদের এক কাফেলার সাথে মক্কা মুয়ায্যামায় আসে। এখানে সে কাতামার হাজীদেরকে খুঁজে নিয়ে তাদের সাথে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করে। তারা তার ধর্মপরায়ণতা দেখে অত্যন্ত মুগ্ধ হয় এবং তার খুব খিদমত করে। হজ্জের পর তারা যখন আফ্রিকার উদ্দেশে যাত্রা করেন, তখন সেও তাদের সাথে রওয়ানা হয়ে যায়। তারা এটাকে তাদের সৌভাগ্য মনে করে। দেশে পৌঁছে তারা আঙ্কজান পর্বত শীর্ষে তার জন্যে একটা ঘর নির্মাণ করে দেয়। তারা এ ঘরের নাম রাখে 'ফাজ্জুল আখইয়ার'। আবূ আবদুল্লাহ্ সেখানে ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত হয়। লোকজন অত্যন্ত ভক্তি গদ-গদচিত্তে তার সাথে মুলাকাত করতে আসতো। সে তাদের কাছে প্রকাশ করতো যে, মাহ্দী অচিরেই আত্মপ্রকাশ করবেন। তিনিই আমাকে এখানে অবস্থানের আদেশ দিয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন, আমার সাহায্যকারী ভক্তদের নাম কিতমান ধাতু থেকে নিষ্পন্ন। তাই তারা কাতামাবাসীই হবে। ধীরে ধীরে কাতামায় আবূ আবদুল্লাহ্র নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

রাজধানী কায়রোয়ানে আফ্রিকায় নিযুক্ত ওয়ালী ইবরাহীম ইব্‌ন আগলাবের কাছে পৌঁছলে তিনি তাঁর অধীনস্থ মায়লার আমিলকে আবূ আবদুল্লাহ্র বিবরণ লিখে পাঠাতে নির্দেশ দিলেন। জবাবে আমিল এ মর্মে রিপোর্ট দিলেন যে, ঐ ব্যক্তি একজন সংসার বিরাগী। সে লোকজনকে

সালাত, সিয়াম শিক্ষা দেয়। এ জবাব পেয়ে ইবরাহীম চুপ হয়ে গেলেন। এর অল্প কিছুদিন পরেই আবূ আবদুল্লাহ্ তার লোক সংগ্রহ করে মায়লা শহরে আক্রমণ চালায়। শহরটি অবরোধ করে শহরের ওয়ালীকে তাড়িয়ে দিয়ে সে মায়লায় তার পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। সংবাদ পেয়ে ইবরাহীম ইব্ন আহমদ আগলাবী তাঁর পুত্র আহ্ওয়ালকে একটি বাহিনী দিয়ে মায়লায় প্রেরণ করেন। আবূ আবদুল্লাহ্ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মায়লা থেকে কাতামা অভিমুখে পালিয়ে যায় এবং একেবারে আঙ্কজান পর্বতে গিয়ে ওঠে। আহ্ওয়াল সেখান থেকে কায়রোয়ানে ফিরে যান। এ সময় আফ্রিকার বাদশাহ ইবরাহীম ইব্ন আহমদ মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁর পুত্র আবুল আব্বাস তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

আবূ আবদুল্লাহ্ আঙ্কজানে একটি নতুন শহর পত্তন করে তার নামকরণ করে 'দারুল হিজরত'। আহ্ওয়াল তাকে দমনের উদ্দেশ্যে আঙ্কজান গিয়ে উপস্থিত হন। এদিকে আবুল আব্বাসের মৃত্যু হয়ে যায় এবং তার পুত্র যিয়াদতুল্লাহ্ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েই আহ্ওয়ালকে রাজধানীতে ডেকে পাঠিয়ে কোন কারণে হত্যা করেন। আবূ আবদুল্লাহ্ দিন দিন শক্তিশালী হয়ে ওঠে। সে কাতামার একটি প্রতিনিধিদলকে হিমসে অবস্থানরত তার গুরু উবায়দুল্লাহ্ মাহ্দীর কাছে পাঠায় এবং তার নিজের সাফল্য ও বিজয় সম্পর্কে তাকে অবহিত করে তাকে সেখানে যাওয়ার জন্যে আহ্বান জানায়। এ প্রতিনিধি দলের আগমন এবং এরূপ বার্তা নিয়ে আসার সংবাদ গুপ্তচর মাধ্যমে খলীফা মুকতাফী বিল্লাহ্ অবহিত হন। তিনি অবিলম্বে উবায়দুল্লাহ্কে গ্রেফতার করার নির্দেশ জারি করেন এবং মিসরের গভর্নর ঈসা নওশরীকেও (ইবন তূলূনের বংশধরদের পতনের পর মিসরের গভর্নর নিয়োজিত ছিলেন) লিখেন যে, উবায়দুল্লাহ্ যখন মিসর দিয়ে অতিক্রম করবে, তাকে তুমি গ্রেফতার করবে। খলীফা মুকতাফীর এ আদেশকেও ইব্ন খালদূন উবাদুল্লাহ্র সাইয়িদ বংশোদ্ভূত হওয়ার প্রমাণ হিসাবে গণ্য করেছেন। অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছেন, উবায়দুল্লাহ্ যদি প্রকৃতই আহলে বায়তভুক্ত না হতেন তা হলে মুকতাফী তাকে গ্রেফতারীর হুকুম জারি করতেন না। অথচ এটা একেবারেই দুর্বল যুক্তি। কেননা, প্রতিটি গোলযোগ সৃষ্টিকারী বা গোপনে গোপনে এরূপ তৎপরতায় লিপ্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করাকে প্রতিটি রাষ্ট্রই তার দায়িত্ব বলে বিবেচনা করে। এমনকি এরূপ নাশকতামূলক তৎপরতার স্থান সে রাষ্ট্রের সীমার বাইরে হয়ে থাকলেও রাষ্ট্র তা করে থাকে। বলাবাহুল্য, আফ্রিকার আগলাব বংশীয় সুলতানরা আব্বাসীয় খলীফাদের কর্তৃক স্বীকার করতেন এবং তারা জুমুআর খুতবায় আব্বাসীয় সুলতানদের নাম উচ্চারণ করতেন। এছাড়া তদানীন্তন আফ্রিকার সীমা মিসরের সাথে লাগোয়া ছিল। সুতরাং মুকতাফী আফ্রিকায় কোন গোলযোগ সৃষ্টিকে কেমন করে মেনে নিতে পারতেন?

উবায়দুল্লাহ্ তার পুত্র ও ভক্তদেরকে নিয়ে সওদাগরের বেশে সওদাগরী কাফেলার সাথে হিম্স থেকে সত্যি সত্যি রওয়ানা হয়ে পড়লো। মিসরে গিয়ে সে ধরাও পড়লো, কিন্তু নওশরীকে প্রতারণা করে সে মুক্ত হয়ে গেল। মিসর অতিক্রম করে সে আফ্রিকা রাজ্যের সীমায় প্রবেশ করলো। এখানেও যিয়াদতুল্লাহ্র গুপ্তচর বাহিনী তার জন্যে ওঁৎপেতে ছিল। কিন্তু সকলের চোখে ধূলা দিয়ে সে সালহামাসা রাজ্যে গিয়ে উপনীত হলো। সেখানকার শাসক

ছেলেদেরসহ উবায়দুল্লাহ্কে গ্রেফতার করতে সমর্থ হলেন। যিয়াদতুল্লাহ্ বিলাস-ব্যসন নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। রাজ্য শাসনের দিকে তাঁর তেমন মনোযোগ ছিল না। এজন্যেই উবায়দুল্লাহ্ নির্বিঘ্নে তার শিয়া তৎপরতা চালিয়ে দল ভারী করতে সমর্থ হয়। যিয়াদতুল্লাহ্ যখন লক্ষ্য করলেন যে, আবূ আবদুল্লাহ্ আফ্রিকা রাজ্যের সুবিশাল এলাকায় স্বীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করে ক্রমেই তাঁর রাজ্য সীমাকে সঙ্কুচিত করে চলেছে তখন তিনি একটি বিশাল বাহিনী গঠন করে আবূ আবদুল্লাহ্কে উৎখাতের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করলেন।

আবূ আবদুল্লাহ্ রণক্ষেত্রে টিকতে না পেরে একটি সুউচ্চ পর্বতে আশ্রয় নিয়ে দীর্ঘ ছয়মাসকাল অবরুদ্ধ অবস্থায় অতিবাহিত করে। সপ্তম মাসে আকস্মিক এক নৈশ অভিযান চালিয়ে আফ্রিকান বাহিনীকে তাড়িয়ে দিয়ে একের পর এক বিজয় অর্জন করে এবং শহর ও জনপদ দখল করতে থাকে। যিয়াদতুল্লাহ্ অপর এক সেনাপতিকে তার মুকাবিলার জন্যে প্রেরণ করলেন। কিন্তু আবূ আবদুল্লাহ্র হাতে তারও পরাজয় ঘটে। অবস্থা বেগতিক দেখে ২৯৫ হিজরীতে (৯০৭-৮ খ্রি) যিয়াদতুল্লাহ্ বিশেষ যত্নসহকারে তাঁর বাহিনীসমূহ ও সিপাহসালারদেরকে আবূ আবদুল্লাহ্কে দমনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করলেন। কিন্তু ততক্ষণে আবূ আবদুল্লাহ্র দাপট ও প্রতিপত্তি কায়েম হয়ে গেছে। পূর্ণ বছরব্যাপী যুদ্ধ অব্যাহত রইল। কখনো আবূ আবদুল্লাহ্র পরাজয় হচ্ছিল, আবার কখনো আফ্রিকা বাহিনী পরাস্ত হচ্ছিল। আবূ আবদুল্লাহ্র লোক-লশকর দিন দিন বৃদ্ধি পেতে লাগলো। লোকজন ক্রমেই তার দলে ভিড়তে লাগলো। পক্ষান্তরে যিয়াদতুল্লাহ্র বাহিনীর লোকসংখ্যা দিন দিন হ্রাস পেতে থাকলো। একে একে অনেক শহর জনপদই আবূ আবদুল্লাহ্র পদানত হতে লাগলো। এমনকি যিয়াদতুল্লাহ্র বাহিনীর সর্দাররাও এসে আবূ আবদুল্লাহ্র শিবিরে ভিড়তে লাগলো।

আরূবা ইব্ন ইউসুফ ও হাসান ইব্ন আবূ খুযায়ব এসে তার এখানে চাকরি গ্রহণ করলো। ২৯৬ হিজরীর রজব (এপ্রিল ৯০৯ খ্রি) মাসে আবূ আবদুল্লাহ্ রাজধানী কায়রোয়ান দখল করে যিয়াদতুল্লাহ্কে তাড়িয়ে দিয়ে শাহী মহলসমূহে কাতামাবাসীদের বসবাসের সুযোগ করে দেয়। তার সালজামাদের আক্রমণ করে সেখানকার শাসক আলইয়াছ ইব্ন মিদরারকে পরাস্ত করে তাকে গ্রেফতার ও হত্যা করে। তারপর উবায়দুল্লাহ্ মাহ্দীকে কারামুক্ত করে ঘোড়ার উপর চড়িয়ে তার পিছনে পিছনে হাযা মাওলাকুম হাযা মাওলাকুম (ইনি তোমাদের মনিব,ইনি তোমাদের মনিব) বলতে বলতে সৈন্য শিবিরে এসে উপস্থিত হয়। সেখান থেকে মার্চ করে তারা 'রাফাদা' শহরে যায়। আবূ আবদুল্লাহ্ এবং অপর সকলে উবাদুল্লাহ্র হাতে বায়আত হয় এবং তাকে আল-মাহ্দী আমীরুল মু'মিনীন খেতাবে ভূষিত করে। এই বায়আত ২৯৬ হিজরীর রবিউস সানি (জানুয়ারী ৯০৯ খ্রি) মাসের শেষ দশকে অনুষ্ঠিত হয় আর সেদিন থেকেই উবায়দিয়া রাজত্বের সূচনা হয়।

মাহ্দী উবায়দুল্লাহ্ সিংহাসনে আরোহণ করেই তাঁর মুবাল্লিগ ওয়ায়েজদেরকে গোটা রাজ্যের সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়। কেউ তার ধর্মমত গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালে সে তাকে হত্যার হুকুম দেয়। কাতামাবাসীদেরকে সে বড় বড় জায়গীর ও রাষ্ট্রীয় উচ্চপদ দান করে। সাকালিয়া দ্বীপের গভর্নর রূপে সে হাসান ইব্ন আহমদ ইব্ন আবূ হুযায়রকে প্রেরণ করে। সে ব্যক্তি

২৯৭ হিজরীর যুলহাজ্জ (আগস্ট-সেপ্টেম্বর ৯১০ খ্রি.) মাসে সেখানে উপস্থিত হয়ে অত্যাচার নিপীড়নে দ্বীপবাসীকে অতিষ্ঠ করে তোলে। অনুরূপভাবে আফ্রিকা রাজ্যের সর্বত্র নিজস্ব ওয়ালী নিয়োগ করে সে যথারীতি তার রাজ্য শাসন চালিয়ে যায়।

২৯৯ হিজরীতে (৯১১-১২ খ্রি.) সাকালিয়া দ্বীপবাসীরা হাসান ইব্ন আহমদের বিরুদ্ধে উবায়দুল্লাহ্ মাহ্দীর কাছে লিখিতভাবে অভিযোগ জানালে তার স্থলে আলী ইব্ন উমরকে সাকালিয়ার গভর্নর নিয়োগ করা হয়। সাকালিয়াবাসীরা তার প্রতিও সন্তুষ্ট হতে পারেনি। তাই তারা তাকেও পদচ্যুত করে নিজেরাই আহমদ ইব্ন মাওহাবকে তাদের শাসকরূপে গ্রহণ করে নেয়। আহমদ ইব্ন মাওহাব মুকতাদির বিল্লাহ্ আব্বাসীর আনুগত্যের প্রতি লোকজনকে উদ্বুদ্ধ করে মাহ্দীর পরিবর্তে জুমুআর খুতবায় মুকতাদির বিল্লাহ্র নাম প্রবর্তন করেন। তিনি একটি নৌবাহিনী বিন্যস্ত করে আফ্রিকার উপকূলের দিকে প্রেরণ করেন।

উবায়দুল্লাহ্ মাহ্দী তার মুকাবিলার উদ্দেশ্যে হুসাইন ইব্ন আলী ইব্ন খুযায়রের অধীনে একটি নৌবহর প্রেরণ করলে উভয় পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ হয়। ইব্ন খুযায়র যুদ্ধে মারা যায় এবং উবায়দুল্লাহ্ মাহ্দীর নৌবহর সাকালিয়াবাসীরা পুড়িয়ে সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত করে দেয়। এ সংবাদ বাগদাদে পৌঁছলে খলীফা মুকতাদির বিল্লাহ্ আহমদ ইব্ন মাওহাবের জন্য বহুমূল্য কৃষ্ণখিলাত প্রেরণ করেন এবং পতাকা পাঠিয়ে তাকে সম্মানিত করেন। এভাবে প্রায় এক বছরকাল ধরে সাকালিয়া দ্বীপে আব্বাসীয় খলীফার নামে খুতবা পাঠ করা হয়। তারপর উবায়দুল্লাহ্ মাহ্দী একটি শক্তিশালী নৌবহর সাকালিয়া অভিমুখে প্রেরণ করলে আহমদ ইব্ন মাওহাব পরাস্ত হন। সাকালিয়া দ্বীপবাসীরা তাঁকে এবং তাঁর সৈন্য-সামন্তকে বন্দী করে উবায়দুল্লাহ্ মাহ্দীর কাছে প্রেরণ করে নিজেরা তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। উবায়দুল্লাহ্ মাহ্দী আহমদ ইব্ন মাওহাব ও তার সঙ্গীদেরকে ইব্ন খুযায়রের সমাধি ক্ষেত্রে নিয়ে হত্যার নির্দেশ জারি করে। এটা ৩০০ হিজরীর (৯১২-১৩ খ্রি.) ঘটনা।

যুবরাজের বায়আত

৩০১ হিজরীতে (৯১৩-১৪ খ্রি.) মুকতাদির তাঁর চার বছরের শিশু সন্তান আবুল আব্বাসকে তাঁর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন এবং মিসর মাগরিবের গভর্নরী তার নামে প্রদান করে মুনিস খাদিমকে তার নায়েব করে মিসর অভিমুখে প্রেরণ করেন। এই আবুল আব্বাসই পরবর্তীকালে কাহির বিল্লাহ্র পর রাযী বিল্লাহ্ উপাধি গ্রহণ করে খলীফা পদে আসীন হয়েছিলেন।

ঐ বছরই হাসান ইব্ন আলী ইব্ন হুসাইন ইব্ন আলী ইব্ন উমর ইব্ন আলী ইব্ন হুসাইন ইব্ন আলী আবূ তালিব (তিনিই পরবর্তীকালে তদ্রূপ নামে খ্যাতিলাভ করেন) তাবারিস্তান প্রদেশ অধিকার করেন। আতরূশ তাবারিস্তান ও দায়লামে ইসলাম প্রচার করেন এবং তাঁর আকর্ষণীয় ওয়ায-নসীহতের দ্বারা সে এলাকার লোকজনকে ইসলামে দীক্ষিত করে শক্তি অর্জন করেন এবং এভাবেই তাবারিস্তান দখল করেন। তিনি ধর্মমতের দিক দিয়ে শিয়া ছিলেন। এজন্যে তাঁর হাতে দীক্ষিতরা অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই তাঁরই মতাবলম্বী হয়। আতরূশের সেনাপতিদের সকলেই ছিলেন দায়লামী। ৩০৪ হিজরীতে (৯১৬-১৭ খ্রি.) খুরাসানের ওয়ালী তাবারিস্তান আক্রমণ করে আতরূশকে হত্যা করেন।

৩০২ হিজরীতে (৯১৪-১৫ খ্রি) উবায়দুল্লাহ্ মাহ্দী তাঁর সেনাপতি খাফাশা কাতামীকে আলেকজান্দ্রিয়া আক্রমণের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। মিসরে অবস্থানরত মুনিস খাদিম তার মুকাবিলা করেন। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে মাহ্দী পক্ষের সাত হাজার সৈন্য নিহত হওয়ার পর তারা আফ্রিকার দিকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

৩০৭ হিজরীতে (৯১৯-২০ খ্রি.) উবায়দুল্লাহ্ মাহ্দী তার পুত্র আবুল কাসিমকে একটি বিশাল বাহিনী সাথে দিয়ে মিসর আক্রমণের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। মুনিস খাদিমের হাতে শোচনীয় পরাজয়বরণ করে তারা ফিরে যেতে বাধ্য হয়। যুদ্ধে তাদের অনেক সেনাপতি বন্দী হয়। ঐ বছরই রোম সম্রাট মুকতাদির বিল্লাহ্‌র সাথে সন্ধি করেন এবং খলীফার সাথে সখ্যতা ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বাগদাদে তাঁর দূত প্রেরণ করেন। অত্যন্ত শানশওকতের সঙ্গে এ দূতকে অভ্যর্থনা জানানো হয়। ৩০৮ হিজরীতে (৯২০-২১ খ্রি.) উবায়দী বাহিনী মিসরের একাংশ অধিকার করে নেয়।

ইরাকে কারামিতাদের উৎপাত

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, কারামিতাদের একটি দল বাহরায়ন প্রদেশ দখল করে রেখেছিল। ৩১১ হিজরীর (৯২৩-২৪ খ্রি.) এক রাতে কারামিতা সর্দার আবূ তাহির সুলায়মান ইব্‌ন আবূ সাঈদ জানানী সতেরশ সৈন্য নিয়ে বসরা আক্রমণ করে বসে। তারা শহর প্রাচীরে সিঁড়ি লাগিয়ে প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে শহরের তোরণ খুলে দেয় এবং শহরে ব্যাপক নিধনযজ্ঞ চালাতে থাকে। বসরার আমিল সাইয়িদ মুফলিহী তাদের এ আক্রমণের কথা অবহিত হয়ে মুকাবিলায় অবতীর্ণ হন এবং তাদের হাতে নিহত হন। আবূ তাহির বসরা অধিকার করার পর সতের দিন পর্যন্ত বসরায় অবস্থান করে লুটপাট চালিয়ে প্রচুর মালপত্র ও বন্দী শিশু ও নারীসহ আঠারতম দিবসে হাজরের দিকে যাত্রা করে। খলীফা মুকতাদির এ দুঃসংবাদ অবগত হয়েই মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ফারূকীকে গভর্নরী সনদ দিয়ে সসৈন্য বসরা অভিমুখে রওয়ানা করে দেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ যখন বসরায় গিয়ে উপনীত হলেন ততক্ষণে আবূ তাহির বসরা থেকে বেরিয়ে পড়েছে।

৩১২ হিজরীতে (৯২৪-২৫ খ্রি.) আবূ তাহির কারামতী তার লোক-লশকর নিয়ে মক্কা থেকে প্রত্যাগমনকারী হজ্জযাত্রীদের কাফেলা লুটপাট করে। এ সময় তারা আবূ লুহায়জান হামদানী এবং মুকতাদির বিল্লাহের মামা আহমদ ইব্‌ন বদরকে উক্ত হজ্জযাত্রী কাফেলা থেকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। কয়েকদিন পরে তারা তাঁদেরকে মুক্তি দিয়ে মুকতাদিরের কাছে আহওয়াজ দাবি করে বসে। খলীফা তার প্রস্তাবে সম্মত না হলে সে আবার কাফেলাসমূহে লুটপাট চালাতে থাকে। খলীফা তাকে দমনের জন্যে সৈনবাহিনী প্রেরণ করলে আবূ তাহির সে শাহী বাহিনীকে পরাস্ত করে কূফা পর্যন্ত গিয়ে সেখানে দলবলসহ অবস্থান করে। তারপর সেখান থেকে প্রচুর ধনসম্পদ লুণ্ঠন করে হাজরে ফিরে যায়।

৩১৩ হিজরীতে (৯২৫-২৬ খ্রি.) কারামিতাদের ভয়ে কেউ হজ্জ করতে যায়নি। ৩১৪ হিজরীতে (৯২৬-২৭ খ্রি.) মুকতাদির বিল্লাহ্ ইউসুফ ইব্‌ন আবূস সাজকে আযারবায়জান থেকে ডেকে পাঠিয়ে পূর্বাঞ্চলের এলাকাসমূহের শাসক নিযুক্ত করে আবূ তাহির কারামিতার মুকাবিলা করার নির্দেশ দান করেন। কিন্তু কার্যত সে বছর কোন মুকাবিলা হয়নি। ৩১৫

হিজরীর রমযান (নভেম্বর ৯২৭ খ্রি) মাসে আবূ তাহির সসৈন্য কূফা অভিমুখে যাত্রা করে। এদিকে কূফা রক্ষার উদ্দেশ্যে ইউসুফ ওয়াসিত থেকে রওনা হলেন। কিন্তু আবূ তাহির একদিন পূর্বেই কূফা পৌঁছে। ইউসুফের বাহিনী আবূ তাহিরের হাতে পরাস্ত হয়ে পালিয়ে যায়। আবূ ইউসুফ আহত অবস্থায় ধৃত হন। আবূ তাহির ইউসুফের চিকিৎসার্থে একজন চিকিৎসক নিয়োগ করে। এ খবর বাগদাদে পৌঁছলে খলীফা সেখান থেকে মুনিসকে প্রেরণ করলেন। মুনিস সেখানে পৌঁছুবার পূর্বেই আবূ তাহির কূফা ত্যাগ করে আইনুত তামরের দিকে রওয়ানা হয়ে গিয়েছিল।

আবূ তাহির কূফা থেকে রওয়ানা হয়ে আম্বারে গিয়ে উপনীত হয় এবং আম্বার দখল করে সেখানকার সৈন্যদেরকে যুদ্ধে পরাস্ত করে তাড়িয়ে দেয়। অবশেষে নসর হাজিব বাগদাদ থেকে রওয়ানা হয়ে মুনিসের সাথে গিয়ে মিলিত হন এবং উভয়ে চল্লিশ হাজার সৈন্যর বিশাল বাহিনী নিয়ে কারামিতাদের উপর আক্রমণ চালান। কিন্তু এবারও তারা পরাস্ত হন। আবূ তাহির তার হাতে বন্দী ইউসুফকে হত্যা করে ফেলে। এ পরাজয়ের সংবাদে বাগদাদে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। বাগদাদবাসীরা ভয়ে শহর ছেড়ে পালাতে থাকে। ৩১৬ হিজরীতে (৯২৮-২৯ খ্রি.) আবূ তাহির আম্বার থেকে যাত্রা করে রাহবা নামক স্থানে উপনীত হয়ে সেখানে লুটপাট চালায়। একদিন এক রাতের জন্য সে তার লোকজনকে যথেচ্ছ হত্যাযজ্ঞ চালাবার অনুমতি প্রদান করে।

কারকীসাবাসীরা এ হত্যাযজ্ঞের ভয়ঙ্কর দৃশ্য অবলোকন করে নিরাপত্তা প্রার্থনা করে। আবূ তাহির তাদের সে আবেদন মঞ্জুর করে সেখানে হত্যাযজ্ঞ চালানো থেকে নিবৃত্ত থাকে। তারপর তার সৈন্যবাহিনীর বিভিন্ন দল আশেপাশে বিভিন্ন এলাকায় নৈশ আক্রমণ চালাবার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যায়। তিনদিনের অবিশ্রান্ত যুদ্ধে রিক্কা তাদের পদানত হলো এবং তারা জাযিরা প্রদেশ দখল করে নিলো। বাগদাদ থেকে তাদেরকে দমনের উদ্দেশ্যে সৈন্যদল প্রেরিত হলো। কিন্তু সকলই নিষ্ফল প্রতিপন্ন হলো। ৩১৬ হিজরীর শাওয়াল (ডিসেম্বর ৯২৮ খ্রি) মাসে কারামিতারা হাজরের দিকে চলে যায়। তার কিছু দিন পরেই আবার তারা সওয়াদ, আইনুত, তামর প্রভৃতি স্থানে দলবদ্ধভাবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। খলীফা মুকতাদির হারূন ইব্ন গরীব, সাফী, বসরী ও ইব্ন কায়স প্রমুখ সর্দারকে কারামিতাদের নির্মূল করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। কারামিতারা পরাস্ত হয়ে এবং তাদের পতাকা ফেলে পলায়ন করে। ফলে এ সব এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ বছরই আবূ তাহির দারুল হিজরত নামক একটি প্রাসাদ নির্মাণ করে।

রোমানদের আগ্রাসী তৎপরতা

৩১৪ হিজরীতে (৯২৬-২৭ খ্রি.) রোমানরা লামীতা অধিকার করে। ৩১৫ হিজরীতে (৯২৮ খ্রি.) তারা দিময়াত দখল করে নেয়। তারা সে শহরটি তছনছ করে জামে মসজিদে শঙ্খ বাজায়। ঐ বছরই দায়লামবাসীরা রে ও জিবাল এলাকায় আক্রমণ চালিয়ে হাজার হাজার লোককে হতাহত করে। একই বছর তারা খাল্লাত দখল করে এবং সেখানকার জামে মসজিদ থেকে মিম্বর বের করে ফেলে এবং তার স্থলে ক্রুশ প্রতিষ্ঠা করে মসজিদটিকে গির্জায় রূপান্তরিত করে।

মুকতাদিরের পদচ্যুতি ও পুনর্বহাল

৩১৭ হিজরীতে (৯৩০ খ্রি.) মুনিস ওরফে মুযাফ্ফার মুকতাদিরকে সিংহাসনচ্যুত করে। ব্যাপার ঘটেছিল এই যে, মুকতাদির মুনিসের স্থলে হারূন ইব্ন গরীবকে হাজিব পদে অধিষ্ঠিত করতে উদ্যোগী হন। মুনিস তা অবগত হতে পেরে লোক-লশকর ও অমাত্যবর্গের অধিকাংশকে নিয়ে খলীফার প্রাসাদ ঘেরাও করে মুকতাদিরকে গ্রেফতার করেন এবং মুতাদিদের পুত্র মুহাম্মদকে আল-কাহির বিল্লাহ্ উপাধিতে ভূষিত করে সিংহাসনে বসান। সকলে তাঁর হাতে খিলাফতের বায়আত করেন এবং আমিলদের কাছে অবগতি পত্র পাঠিয়ে দেয়া হয়। পরদিন সৈন্যবাহিনীর লোকজন এসে উপঢৌকনাদি দাবি করলো। এ দাবি পূরণে তালবাহানা দেখে লোকজন হট্টগোল শুরু করে দেয়। তারা মুকতাদিরের খোঁজে মুনিসের ঘরে ছুটে যায় এবং তাঁকে কাঁধে তুলে খলীফার প্রাসাদে নিয়ে এসে কাহির বিল্লাহ্কে ধরে এনে তার সম্মুখে হাযির করে। মুকতাদির তাঁকে অভয় দিয়ে বলেন, তুমি বিচলিত হয়ো না, কারণ এতে যে তোমার কোন হাত ছিল না তা আমি জানি। লোকজন শান্ত হলো। পুনরায় আমিলদের কাছে অবগতিপত্র পাঠানো হলো যে, মুকতাদির যথারীতি খলীফা পদে বহাল আছেন। মুকতাদির লোকজনকে উপঢৌকনাদি দিয়ে বিদায় করলেন।

মক্কায় কারামিতাদের ঔদ্ধত্য

বাহরায়নে কারামিতাদের রাজত্ব সংহত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। কারামিতাদের সর্দার ছিল আবূ তাহির, কিন্তু খুতবায় তারা আফ্রিকার ওয়ালী উবায়দুল্লাহ্ মাহ্দীর নাম নিতো। তারা তাকেই খলীফা বলে মান্য করতো। ৩১৮ হিজরীতে (৯৩১ খ্রি.) আবূ তাহির কারামতী সসৈন্য মক্কা মুয়াযযামায় যাত্রা করে। তখন ছিল হজ্জের মওসুম। বাগদাদ থেকে মানসূর দায়লামী আমীরুল হুজ্জাজ হয়ে রওয়ানা হয়েছিলেন ৮ই যিলহজ্জ মানসূর দায়লামী এবং ৯ই যিলহজ্জ তারিখে আবূ তাহির মক্কায় উপনীত হন। মক্কায় পৌঁছেই আবূ তাহির হাজীদের হত্যা করতে শুরু করে। সে তাদের সর্বস্ব লুট করে নেয়। খানাকা'বার অভ্যন্তরে হাজীদেরকে হত্যা করে যমযম কূপে তাদের লাশ নিক্ষেপ করতো। হাজরে আসওয়াদ বা পবিত্র কৃষ্ণপাথরটি লৌহ মুদ্গর দিয়ে টুকরো টুকরো করে এবং এগার দিন পর্যন্ত তা কা'বা প্রাচীর থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ফেলে রাখে। কা'বা ঘরের দরজা ভেঙ্গে ফেলে। প্রত্যক্ষদর্শী মুহাম্মদ ইব্ন রাবী ইব্ন সুলায়মান বলেন, এ গোলযোগের সময় আমি মক্কায়ই ছিলাম। আমার চোখের সম্মুখে এক ব্যক্তি খানাকা'বার মেহরাব উপড়িয়ে ফেলার উদ্দেশ্যে কা'বার ছাদে আরোহণ করলো। আমি তখন আর্তনাদ করে উঠলাম– হে আল্লাহ্! এ দৃশ্য আমি সইতে পারছি না। সে ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ পা পিছলে উপুড় হয়ে পড়লো এবং সাথে সাথে মৃত্যুমুখে পতিত হলো। আবূ তাহির এগারদিন পর্যন্ত মক্কাবাসীদের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করে। তারপর হাজরে আসওয়াদ উটের পিঠে তুলে বাহরায়নের রাজধানী হাজরের দিকে যাত্রা করে। মক্কা থেকে হাজর পর্যন্ত পৌঁছতে হাজরে আসওয়াদ বহনকারী চল্লিশটি উট একে একে মারা যায়। দীর্ঘ কুড়ি বছরকাল উক্ত পবিত্র পাথরটি কারামিতাদের দখলে থাকে। কারামিতাদেরকে এর বিনিময়ে পঞ্চাশ সহস্র দীনার প্রদানের প্রস্তাব দিলেও তারা তা প্রত্যর্পণ করতে সম্মত হয়নি। অবশেষে খলীফা মুতীঈ লিল্লাহ্-এর যামানার শেষ দিকে হাজরে আসওয়াদ তাদের নিকট

থেকে ফেরত নিয়ে খানাকা'বায় পুনঃস্থাপন করা হয়। কিন্তু এবার একটি উটই হাজর থেকে দীর্ঘ পথ বহন করে খানাকা'বায় এ পবিত্র পাথরটি নিয়ে আসে। আবূ তাহিরের এ অত্যাচার ও বাড়াবাড়ির সংবাদ অবহিত হয়ে উবায়দুল্লাহ্ আবূ তাহিরকে কঠোর ভর্ৎসনা করে পত্র লিখে এবং মক্কাবাসীদের লুণ্ঠিত ধন-সম্পদ প্রত্যর্পণ করার শক্ত তাগিদ দেয়। তদনুযায়ী আবূ তাহির মক্কাবাসীদের ধন-সম্পদের একাংশ ফেরত দেয়। কিন্তু হাজরে আসওয়াদ প্রত্যর্পণ করেনি। ৩৩৯ হিজরীতে (৯৫০-৫১ খ্রি.) হাজরে আসওয়াদ মক্কায় ফেরত আসে এবং কা'বা গাত্রে পুনঃস্থাপিত হয়।

মুকতাদির বিল্লাহ্ নিহত

৩২০ হিজরীর সফর (ফেব্রুয়ারী/মার্চ ৯৩২ খ্রি) মাসে মুনিস খাদিম মুসেল দখল করে নেয় এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন হামদানের পুত্রদ্বয় সাঈদ ও দাউদ এবং তাদের ভাতিজা নাসিরুদ্দৌলা হুসাইন ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হামদানকে পরাস্ত করে তাদেরকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয়। উল্লেখ্য, উক্ত ব্যক্তিরা খলীফার পক্ষ থেকে মুসেলের শাসনকার্যে লিপ্ত ছিলেন। মুনিসের মুসেল বিজয়ের পর বাগদাদ, শাম ও মিসরের সৈন্যরাও মুনিসের কাছে চলে আসে। এর কারণ হলো, মুনিসের দান করার অভ্যাস ছিল বলে সৈন্যবাহিনীর লোকজন তার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন ছিল। এমনকি নাসিরুদ্দৌলাও মুনিসের দলে এসে ভিড়ে যায় এবং মুনিসের সাথে মুসেলেই বসবাস করতে থাকে। পরবর্তী নওরোজ দিবসের পর মুনিস বাগদাদ আক্রমণ করতে মনস্থ করে। মুনিস এবং মন্ত্রীবর্গের মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টির ফলেই এ সব ঘটনার সূত্রপাত হয়।

সাঈদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ পরাস্ত হয়ে বাগদাদে চলে আসে। মুনিসের হামলার খবর শুনে বাগদাদ থেকে উক্ত সাঈদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হামদান, আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াকূব এবং অন্যান্য সর্দারের অধীনে সৈন্যবাহিনী প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয়। কিন্তু মুনিসের বাহিনী নিকটবর্তী হতেই সৈন্যরা বাগদাদ অভিমুখে পালিয়ে আসে। অগত্যা সর্দারদেরকেও বাগদাদে চলে আসতে হয়। মুনিস বাগদাদে পৌঁছে শুমাসিয়া তোরণে অবস্থান করে। সেখানে উভয় পক্ষের ব্যূহ রচিত হলো। উভয়পক্ষে যুদ্ধ শুরু হলে মুকতাদির খলীফার প্রাসাদ থেকে বের হয়ে একটি টিলার উপর দাঁড়িয়ে যুদ্ধের দৃশ্য অবলোকন করছিলেন। সম্মুখেই তাঁর সৈন্যরা যুদ্ধ করছিল। শেষ পর্যন্ত বাগদাদ বাহিনী পরাস্ত হলো। খলীফার সঙ্গী-সাথীরা তাঁকে এখানে দাঁড়িয়ে না থেকে ফিরে যেতে অনুরোধ জানালেন। খলীফা সেখান থেকে ফিরে যাবার সময় মুনিসের বাহিনীভুক্ত বার্বার সৈন্যদের একটি দল তাঁকে এসে ঘেরাও করলো। এক বার্বার সৈন্য খলীফার প্রতি তীর নিক্ষেপ করলো। তিনি তৎক্ষণাৎ ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেলেন। বার্বারী চোখের পলকে মুকতাদিরের শির দেহচ্যুত করলো এবং ঘোটা দেহকে বিবস্ত্র করে তাঁর শির বল্লমশীর্ষে নিয়ে মুনিসের নিকট হাযির করলো।

৩৩০ হিজরীর ২৭ শে শাওয়াল (জুলাই ৯৪২ খ্রি) বুধবার এ মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। মুনিস আবূ মানসূর মুহাম্মদ ইব্ন মুতাদিদকে সিংহাসনে বসিয়ে কাহির বিল্লাহ্ উপাধিতে ভূষিত করে। আলী ইব্ন মুকাল্লা প্রধানমন্ত্রী এবং আলী ইব্ন বালীক হাজিব পদে নিযুক্ত হন। মুকতাদিরের মাকে গ্রেফতার করে তার কাছে অর্থ দাবি করা হয় এবং এত বেশি প্রহার করা হয় যে, তিনি তাতেই মারা যান। এভাবে লোকজনকে ধরে ধরে বলপূর্বক অর্থ আদায় করা হয়।

কাহির বিল্লাহ্

কাহির বিল্লাহ্র বংশপঞ্জি নিম্নরূপ

মুতওয়াক্কিল বিল্লাহ

মারফূ' বিল্লাহ্

মু'তাদিদ বিল্লাহ্

কাহির বিল্লাহ্

মুৎনা নাম্নী জনৈকা দাসীর গর্ভে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর নাম ছিল মুহাম্মদ এবং উপনাম ছিল আবূ মানসূর।

খলীফা মুকতাদির বিল্লাহ্ নিহত হওয়ার পর তাঁর পুত্র আবদুল ওয়াহিদ হারূন ইব্ন গরীব মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াকুত এবং ইবরাহীম ইব্ন রায়েকসহ মাদয়ানে চলে যান। সেখান থেকে ওয়াসেত ও সূস হয়ে তিনি আহওয়াযে পৌঁছেন। কাহির বিল্লাহ্ তদীয় হাজিব আলী ইব্ন বালীককে সৈন্যদলসহ আবদুল ওয়াহিদ ও তাঁর সাথীদেরকে গ্রেফতার করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। ফলে আবদুল ওয়াহিদ ও তাঁর সাথীগণ চিঠিপত্রের মাধ্যমে মুনিস এবং খলীফার কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করেন। তৎক্ষণাৎ তাঁদেরকে নিরাপত্তা দেয়া হয় এবং তাঁরা বাগদাদে ফিরে আসলেন। মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াকূতকে মুসাহেবদের মধ্যে শামিল করে নেয়া হয়। কিন্তু উযীর আলী ইব্ন মাকাল্লার তা মোটেই মনঃপূত ছিল না। তিনি মুনিসকে তার বিরুদ্ধে এই বলে প্ররোচিত করেন যে, তিনি তার ঘোর বিরোধী এবং তাঁর পতনের জন্য সচেষ্ট। মুনিস বালীক এবং হাজিব আলী ইব্ন বালীককে খলীফার প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রাখার জন্যে নির্দেশ দিলেন। ফলে খলীফার গৃহে যাতায়াতকারী নারীদের পর্যন্ত কঠোরভাবে তল্লাশি নেয়া হতো। কারোই অন্দরে যাওয়ার অনুমতি ছিল না। খলীফা যখন জানতে পারলেন যে, তাঁকে নজরবন্দি করে রাখা হয়েছে এবং নিষ্ক্রিয় করার পাঁয়তারা চলছে তখন তিনিও মুনিস প্রমুখের বিরুদ্ধে কোন কোন সামরিক সর্দারদের সাথে গোপনে যোগসাজশ করতে লাগলেন। এদিকে মুনিস ও তার সাথীরা খলীফাকে পদচ্যুত করে আবূ আহমদ ইব্ন মুকতাফীকে সিংহাসনে বসাবার প্রস্তুতি গ্রহণে লিপ্ত হলেন। কাহির বিল্লাহ্ তাঁর প্রচেষ্টায় সফল হলেন। হাজিব আলী ইব্ন বালীক, বালীক ও মুনিসকে চাতুর্যের সাথে গ্রেফতার করে কাহির বিল্লাহ্র নির্দেশে হত্যা করা হয়। মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াকূত হাজিব এবং আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন কাসিম ইব্ন উবায়দুল্লাহ্কে উযীর নিযুক্ত করা হয়। এটা ৩২১ হিজরীর শাবান (আগস্ট ৯৩৩ খ্রি) মাসের কথা। ঐ সময়ই আত্মগোপনকারী আহমদ ইব্ন মুকতাফীকে খুঁজে বের করে গ্রেফতার করা হয়। কাহির বিল্লাহ্ তাকে প্রাচীর গেঁথে আটকে দেন। নিহতদের আবাসস্থলগুলোকে ধুলিসাৎ করে দেয়া হয়। তাদের ধন-সম্পদ খলীফা বাজেয়াপ্ত করেন। সাড়ে তিন বছর মন্ত্রীত্ব করার পর আবূ জা'ফর উযীর ও খলীফার কোপানলে পড়ে গ্রেফতার হন এবং কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। আঠারো দিন কারাগারে থাকার পর বন্দী অবস্থায়ই তাঁর মৃত্যু হয়।

বুওয়াইয়া দায়লামী রাজবংশের সূচনা

আব্বাসীয় খলীফাদের ইতিহাস বর্ণনাকালে এখন যেহেতু বারবার বুওয়াইয়া বংশের লোকদের প্রসঙ্গ আসবে তাই এখানে ঐ খান্দানের প্রাথমিক ইতিহাস বর্ণনা করা সমীচীন মনে করছি। আতরুশ অর্থাৎ হাসান ইব্‌ন আলী ইব্‌ন হুসাইন ইব্‌ন আলী যায়নুল আবিদীন সম্পর্কে পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, মুহাম্মদ ইব্‌ন যায়দ উলুভী নিহত হওয়ার পর ইনি দায়লামে গিয়ে লোকজনকে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন এবং দীর্ঘ তের বছরকাল অবিশ্রান্তভাবে দায়লাম ও তাবারিস্তানে ইসলামের প্রচারকার্য চালিয়ে সে এলাকার লোকদেরকে ইসলামে দীক্ষিত করেন।

ঐ সময় হাস্‌সান নামক এক ব্যক্তি দায়লামের শাসক ছিলেন। আতরুশের ক্রমবর্ধমান প্রভাব-প্রতিপত্তি লক্ষ্যে হাস্‌সান প্রমাদ গুণতে থাকেন এবং তা রোধের চেষ্টাও করেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আতরুশের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও জনপ্রিয়তা বেড়েই চলে। তিনি স্থানে স্থানে মসজিদ নির্মাণ করান এবং লোকজনকে ইসলামী অনুশাসনে অভ্যস্ত করে 'উশর'ও আদায় করতে শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত আতরুশ ঐ সব নওমুসলিমকে সংগঠিত করে একটি সশস্ত্রবাহিনী গড়ে তুলে কাস্পিয়ান, সালূস প্রভৃতি সীমান্তবর্তী শহর জনপদে হামলা করেন এবং ঐ সব এলাকার লোকজনকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে তাদেরকেও ইসলামের পতাকাতলে নিয়ে আসেন। তাবারিস্তান প্রদেশ সামানী বংশের শাসনাধীন ছিল। তাবারিস্তানের সামানী আমিল নির্যাতন-নিপীড়নের পথ বেছে নিলেন। আতরুশ দায়লামবাসীদের তাবারিস্তান আক্রমণের উৎসাহ যোগাতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত ৩০১ হিজরীতে (৯১৩-১৪ খ্রি.) আতরুশ দায়লামবাসীদের সমন্বয়ে একটি বাহিনী গঠন করে তাবারিস্তান আক্রমণ করে বসলেন এবং দায়লামের শাসনকর্তা মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন সালূককে যুদ্ধে পরাস্ত ও বিতাড়িত করে নিজে তাবারিস্তানের শাসন গ্রহণ করেন। আতরুশের পর তাঁর জামাতা হাসান ইব্‌ন কাসিম এবং তাঁর বংশধররা তাবারিস্তান জুরজান, সারিয়া, আমদ ও আস্তরাবাদে রাজত্ব করেন। তবে তাঁদের ফৌজী সর্দার সব সময়ই দায়লামীরাই ছিল। এ দায়লামীদেরই একজন লায়লা ইব্‌ন নু'মানকে হাসান ইব্‌ন কাসিম জুরজানের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। ৩০৯ হিজরীতে (৯২১-২২ খ্রি.) এ ব্যক্তি সামানীদের সাথে এক যুদ্ধে নিহত হন। তারপর সামানীরা একাধিকবার আতরুশের উপর আক্রমণ চালায়। বনী আতরুশের পক্ষ থেকে এ সব হামলার মুকাবিলা করতেন সুরখাব নামক একজন দায়লামী সিপাহ্‌সালার। তিনি সামানীদের আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন। সুরখাবের চাচা মাকান ইব্‌ন কানী দায়লামী আতরুশ বংশীয়দের পক্ষ থেকে আস্তারাবাদের শাসকরূপে নিয়োজিত ছিলেন।

মাকান তার স্বদেশী দায়লামীদেরকে সংগঠিত ও জোটবদ্ধ করে একটি বাহিনী গঠন করে জুরজান দখল করে নেন। মাকানের সাহায্যকারী এ দায়লামীদের মধ্যে আসফার ইব্‌ন শিরোইয়া দায়লামী ছিলেন একজন বিখ্যাত সমরনায়ক। মাকান তাঁর স্বায়ত্তশাসিত রাজ্য গড়ে তুলে তাবারিস্তানের অধিকাংশ অঞ্চলে নিজের দখল প্রতিষ্ঠা করেন এবং কোন কারণে আসফার ইব্‌ন শিরোইয়ার প্রতি অপ্রসন্ন হয়ে বের করে দেন। আসফার সেখান থেকে বহিষ্কৃত হয়ে

সামানীদের পক্ষ থেকে নিশাপুরে নিয়োজিত আমিল বকর ইব্‌ন মুহাম্মদের কাছে চলে যান। বকর ইব্‌ন মুহাম্মদ একটি বাহিনী সাথে দিয়ে আসফারকে জুরজান জয়ের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। এ সময়ে মাকান তাবারিস্তানে ছিলেন এবং তাঁর ভাই আবুল হাসান ইব্‌ন কানী আপন ভাইয়ের পক্ষে জুরজান শাসন করতেন।

এখানে আতরুশের পুত্র আবূ আলী বসবাস করতেন। তাঁর আর তখন কোন রাজ্য বাকি নেই। আবূ আলী একদিন মওকা পেয়ে আবুল হাসান কানীকে হত্যা করে ফেললেন। জুরজানে বসবাসরত দায়লামী বাহিনীর লোকজন আবূ আলীর হাতে বায়আত হয়ে গেল আর আবূ আলী তাঁর পক্ষ থেকে আলী ইব্‌ন খুরশীদ দায়লামীকে জুরজানের শাসক নিযুক্ত করেন। এটা সেই সময়ের কথা যখন আসফার সামানীদের পক্ষ থেকে সৈন্যদলসহ জুরজানের নিকট এসে হানা দিয়েছিল। আলী ইব্‌ন খুরশীদ আসফার এ মর্মে পত্র লিখলেন যে, তুমি আমার উপর হামলা করার পরিবর্তে আমার সাথে মিলে তাবারিস্তানে অবস্থানরত মাকানের উপর হামলা চালাও না কেন? আসফার বকর ইব্‌ন মুহাম্মদের নিকট থেকে অনুমতি দিয়ে এ প্রস্তাবে সায় দিলেন। এ খবর শুনে মাকান ইব্‌ন কানী তাবারিস্তান থেকে সসৈন্যে জুরজান অভিমুখে যাত্রা করলো। আলী ইব্‌ন খুরশীদ ও আসফার ইব্‌ন শিরোইয়া সম্মিলিতভাবে তাকে বাধা দেয়।

তারা মাকানকে পরাস্ত করে তাড়িয়ে দেয় এবং তাবারিস্তানে তাদের দখল প্রতিষ্ঠা করে। এর মাত্র কিছুদিনের মধ্যেই আলী ইব্‌ন খুরশীদ এবং আবূ আলী ইব্‌ন আতরুশ দু'জনেই মৃত্যুবরণ করেন। তাবারিস্তানে আসফার ইব্‌ন শিরোইয়া নির্বিবাদে রাজত্ব চালিয়ে যান। এটাকে মাকান সুবর্ণ সুযোগ মনে করে আসফারের উপর আক্রমণ চালিয়ে তাবারিস্তান দখল করে নেন। রাজ্যহারা আসফার বকর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইবনুল ইয়াসার কাছে জুরজানে চলে যান।

৩১৫ হিজরীতে (৯২৮ খ্রি) বকর ইব্‌ন মুহাম্মদের মৃত্যু হলে সামানী বাদশাহ তাঁর স্থলে আসফার ইব্‌ন শিরোইয়াকে তাঁর পক্ষ থেকে জুরজানের শাসক নিযুক্ত করেন। আসফার ইব্‌ন শিরোইয়ার সেনাপতিদের মধ্যে মিরদাওয়ায় নামক একজনকে আসফার সৈন্যবাহিনী সাথে দিয়ে জুরজান থেকে তাবারিস্তান আক্রমণের জন্যে প্রেরণ করলেন। মাকান যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে পালিয়ে আতরুশের জামাতা হাসান ইব্‌ন কাসিমের কাছে রে-তে চলে যান এবং মিরদাওয়ায় তাবারিস্তান দখল করে নেন। তারপর হাসান ইব্‌ন কাসিমের মৃত্যু হয়।

আসফার তাবারিস্তান ও জুরজান দখল করে খুরাসান ও মাওরাউন নাহরের ওয়ালী নসর ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন সামানের নামে খুতবা প্রবর্তন করেন। তারপর রে অভিমুখে অগ্রসর হয়ে রেও মাকানের হাত থেকে ছিনিয়ে নেন। রাজ্যহারা হয়ে মাকান এবার তাবারিস্তানের পার্বত্য অঞ্চলের দিকে চলে যান। আসফার ইব্‌ন শিরোইয়া তখন রে, কাস্পিয়ান, জানিজান, আবহুর, কুম ও কারখসহ বিশাল রাজ্যের শাসক। এবার আসফারের মনে স্বাধীনতার চিন্তা উঁকিঝুকি দিতে লাগলো। তিনি সামানী সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করে বসলেন। এ সংবাদ পেয়ে খলীফা মুকতাদির হারূন ইব্‌ন গারীবকে সৈন্য-সামন্ত দিয়ে আসফারের নিকট থেকে রাজ্য কেড়ে নেবার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করলেন। কিন্তু যুদ্ধে হারূন আসফারের হাতে পরাজিত হলেন। তারা স্বয়ং নসর ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন সামান আসফারকে

উৎখাতের উদ্দেশ্যে বুখারা থেকে লোক-লশকরসহ রওয়ানা হলেন। আসফার এবার ক্ষমাভিক্ষা করে করদানের অঙ্গীকার করলেন। নসর তার দরখাস্ত মঞ্জুর করে রে প্রদেশের শাসনভার তার হাতে রেখে নিজে বুখারায় ফিরে এলেন। আসফারের অন্যতম সেনাপতি মিরদাওয়ায় অন্যান্য সেনাপতিকে হাত করে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে তাকে গ্রেফতার করে হত্যা করেন এবং নিজে হামদান, ইস্পাহান প্রভৃতি এলাকা জয় করে বিশাল এলাকায় রাজত্ব করতে থাকেন এবং মাকান ইব্‌ন কানীকে ডেকে তাবারিস্তান ও জুরজানের শাসনভার অর্পণ করেন। তারপর মাকানকে পদচ্যুত করা হয়। মাকান দায়লামে চলে যান এবং সেখানে থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে তাবারিস্তান আক্রমণ করেন। কিন্তু মিরদাওয়ায় আমিলের হাতে পরাজিত হয়ে নিশাপুরে পালিয়ে যান।

৩১৯ হিজরীতে (৯৩১ খ্রি) মিরদাওয়ায় অধিকৃত সমস্ত এলাকার শাসনের সনদ আব্বাসী খলীফার নিকট থেকে আদায়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তাই তিনি আব্বাসী খলীফার দরবারে ঐসব এলাকার শাসনের সনদ প্রার্থনা করে বিনিময়ে বার্ষিক দু'লাখ দীনার খারাজ খলীফার দরবারে প্রেরণের অঙ্গীকার করেন। খলীফা সে আবেদনে সাড়া দিয়ে সনদ পাঠিয়ে দেন এবং নিজের পক্ষ থেকে তাকে জায়গীরও প্রদান করেন। ৩২০ হিজরীতে (৯৩২খ্রি) মিরদাওয়ায়হ্ গীলান থেকে তার ভাই ওয়াশমগীরকেও ডেকে পাঠান। মিরদাওয়ায়হর রাজত্বে আবূ শুজা বুওয়াইয়া নামক এক ব্যক্তির তিন পুত্র চাকরি সূত্রে সর্দারী হাসিল করেন। এদের জন্যেই গোটা এই কাহিনী শুনাতে হলো।

আবূ শুজা বুওয়াইয়া দায়লামী ছিল একজন একান্তই দরিদ্র মৎস্যজীবী। মাছ ধরে অত্যন্ত কষ্টে সে তার পরিবার-পরিজনের ব্যয় নির্বাহ করতো। একদিন সে স্বপ্নে দেখলেন যে, সে প্রস্রাব করতে বসেছে এবং তার প্রস্রাবনালী দিয়ে এমনি একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বের হলো যা দশ দিগন্তকে আলোক উদ্ভাসিত করে তুললো। এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা সে এভাবে করলো যে, তার ঔরসে এমন সন্তানের জন্ম হবে যারা বাদশাহ হবে এবং যতদূর পর্যন্ত সে আলোকরশ্মি ছড়িয়েছিল, তাদের রাজত্ব ততদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। তারপর উক্ত বুওয়াইয়া মৎস্যজীবীর তিনটি সন্তান জন্মগ্রহণ করলো। তাদের নাম ছিল যথাক্রমে আলী, হাসান ও আহমদ। পরবর্তীকালে তাদের তিনজনই প্রভূত উন্নতি করে যথাক্রমে ইমাদুদ্দৌলা, রুকনুদ্দৌলা ও মুইজুদ্দৌলা নামে খ্যাতি অর্জন করে এবং প্রভূত মান-সম্মানসহ রাষ্ট্রের উচ্চপদে আসীন হন বলে কেউ তাদের নসবনামা ইরান সম্রাট ইয়াজদগুর্দের সাথে, আবার কেউ বাহরামগূরের সাথে জুড়ে দিয়েছেন। শাসকদেরকে উচ্চকুলশীল প্রতিপন্ন করার এ প্রবণতা প্রায়ই দেখা যায়। আর চাটুকার শ্রেণীর লোকেরা এ কাজে সর্বাধিক সহায়ক প্রতিপন্ন হয়ে থাকে।

আমাদের নজীবাবাদ শহরটি পাঠানদের দ্বারা আবাদ হয়। পাঠানরা এখানে অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত খান্দান বলে গণ্য হয়ে থাকেন। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহের পর যখন পাঠানদের উপর ধ্বংস নেমে এলো তখন তাদের অনেকেই রামপুর,বেরিলী, শাহজাহানপুরের দিকে গিয়ে বসবাস করতে লাগলেন। শত শত লোকের বংশপঞ্জী মিটে গিয়ে তারা অজ্ঞাত কুলশীল হয়ে পড়ল। খুব কম সংখ্যক লোকই টিকে আছেন। কিন্তু দারিদ্র্য তাদেরকে এমন এক পর্যায়ে নামিয়ে দিয়েছে যে, এখন তারা আর কোন গণ্যমান্যর মধ্যেই আসছেন না। তাদের চাকর-নকর ও

গোলামদের অনেকেই কালের বিবর্তনে আজ ধনদৌলত ও বিত্তবৈভবের অধিকারী হয়ে নিজেদেরকে পাঠান বংশোদ্ভূত বলে দাবি করছেন। অনেক যোগী সন্তান নিজেদের কুলপঞ্জী নওয়াব নজীবুদ্দৌলার সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন। অনেক তেলী, মালী,ধোপা, নাপিত, জেলে ও জোলা নিজেদেরকে প্রকাশ্যে পাঠান ও খান বলে জাহির করছে। ধনসম্পদের প্রাচুর্য সত্ত্বেও তাঁরা নিজেদের বংশপরিচয় নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারছে না।

এ জন্যে আজ কোন সম্ভ্রান্ত পাঠানের পক্ষেই নিজের প্রকৃত বংশপঞ্জী বর্ণনা করে নতুন প্রজন্মকে নিজেদের বংশমর্যাদা সম্পর্কে নিশ্চিত করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। আমরা নিজের চোখে লোকের বংশপঞ্জী পরিবর্তন করে জাতে ওঠার দৃশ্য দেখছি। এমতাবস্থায় উক্ত মৎস্যজীবীর সন্তানদের রাষ্ট্রের উচ্চতর পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর নিজের কুলজীনামা ইরানের শাহানশাহদের কুলজীনামার সাথে মিলিয়ে দেয়ার ব্যাপারটি আমাদেরকে বিস্মিত করে না।

মাকান ইব্‌ন কানী যখন দায়লামবাসীদেরকে আপন সৈন্যবাহিনীতে ভর্তি করছিলেন তখন উক্ত বুওয়াইয়ার পুত্রত্রয়ও তার সৈন্যবাহিনীতে ভর্তি হয়ে গেল। মাকানের পরাজয় ও ব্যর্থতার পর অনেকেই তাকে ত্যাগ করে চলে যান মিরদাওয়ায়হর কাছে। মিরদাওয়ায়হ তাদের প্রত্যেককে তাদের যোগ্যতার চাইতে বড় বড় পদে অধিষ্ঠিত করে। বুওয়াইয়ার উক্ত পুত্রত্রয় ছিল তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। তারা তাদের সেবাপরায়ণতা ও বুদ্ধিমত্তার দ্বারা মিরদাওয়ায়হর নিকট অনেক মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়। মিরদাওয়ায়হ্ আলী ইব্‌ন বুওয়াইয়াকে কারখের শাসনকর্তা নিয়োগ করে। আলী তার সহোদরদ্বয় হাসান এবং আহমদকেও তার সাথে নিয়ে যায়। সে সময় মিরদাওয়ায়হর পক্ষ থেকে তার ভাই ওয়াশমগীর রে-র শাসনকার্য পরিচালনা করছিলেন।

ওয়াশমগীর হুসাইন ইব্‌ন মুহাম্মদ ওরফে আমীদকে তাঁর উযীর বানিয়ে রেখেছিলেন। আলী রে-তে পৌঁছে আমীদের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং তাকে একটি খচ্চর উপহার দেয়। তারপর কারখে গিয়ে সেখানকার শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকে। মিরদাওয়ায়হ্ যখন আমীদের সাথে আলীর এভাবে সাক্ষাতের এবং তার উপঢৌকন পেশ করার কথা অবহিত হলেন তখন তার মনে এ ব্যাপারে সন্দেহের উদ্রেক হলো যে, মাকানের নিকট থেকে আগত ও ভাল ভাল পদে অধিষ্ঠিত এবং বিভিন্ন এলাকার শাসনকার্যে নিয়োজিত ব্যক্তিরা পাছে পারস্পরিক যোগসাজশের মাধ্যমে কোন সমস্যার না সৃষ্টি করে ফেলে। তাই মিরদাওয়ায়হ তার ভাই ওয়াশমগীরকে এ মর্মে নির্দেশ প্রেরণ করলেন যে, মাকানের ওখান থেকে আগত যে সব ব্যক্তিকে বিভিন্ন শহর ও জনপদের শাসনকার্যের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়েছে তাদের সবাইকে গ্রেফতার কর। এ আদেশ অনুসারে কেউ কেউ গ্রেফতার হলেও কারখে নিয়োজিত আলী ইব্‌ন বুওয়াইয়াকে গ্রেফতারের কোন উদ্যোগই নেয়া হলো না। কেননা তাতে বিদ্রোহ দেখা দেয়ার আশঙ্কা ছিল।

আলী ইব্‌ন বুওয়াইয়া কারখের আশেপাশের কয়েকটি দুর্গ জয় করেন এবং যুদ্ধলব্ধ ধন-সম্পদ সৈন্যদের মধ্যে ভাগবন্টন করে দেন। সিপাহীদের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তা অত্যধিক বৃদ্ধি

পায় এবং সাথে সাথে তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তিও দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। ৩২১ হিজরীতে (৯৩৩ খ্রি) মিরদাওয়ায়হ্ রে-তে বন্দী উক্ত সর্দারদেরকে মুক্ত করে দেন। তাদের সকলেই কারখে আলী ইব্ন বুওয়াইয়ার কাছে চলে যায়। তিনি তাদের অত্যন্ত আদর-আপ্যায়ন করেন। এই দিনগুলোতেই শেরযাদ নামক একজন দায়লামী সর্দার একটি বাহিনীসহ আলী ইব্ন বুওয়াইয়ার কাছে এসে তাকে ইস্পাহানের উপর হামলা করতে প্ররোচিত করলো। মিরদাওয়ায়হ্ যখন অবগত হলেন যে, দায়লামী সর্দারদের সকলেই আলী ইব্ন বুওয়াইয়ার কাছে এসে সমবেত হয়েছে তখন তিনি এ মর্মে নির্দেশ পাঠালেন যে, নজরবন্দী থেকে মুক্ত হয়ে যে সর্দাররা তোমার কাছে গিয়ে উঠেছে তাদের সকলকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।

আলী ইব্ন বুওয়াইয়া এ আদেশ পালনে অস্বীকৃতি জানান এবং শেরযাদের সাথে মিলে ইস্পাহান আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকেন। ইস্পাহানে তখন মুযাফফর ইব্ন ইয়াকূত ও আবূ আলী ইব্ন রুস্তমের রাজত্ব চলছিল। এরা খলীফার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে ইতিমধ্যেই বিদ্রোহ ঘোষণা করছিলেন। আলী ইব্ন বুওয়াইয়া ইস্পাহান আক্রমণ করে মুযাফফর ইব্ন ইয়াকূতকে তাড়িয়ে দেন। আবূ আলী ইব্ন রুস্তম মারা যায় এবং ইস্পাহান আলী ইব্ন বুওয়াইয়ার দখলে চলে আসে। এ সংবাদ অবগত হয়ে মিরদাওয়ায়হ্ বিচলিত হয়ে পড়েন। কেননা, আলী ইব্ন বুওয়াইয়া এখন প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী। তিনি তাঁর ভাই ওয়াশমগীরকে সৈন্যবাহিনী সাথে দিয়ে আলী ইব্ন বুওয়াইয়াকে দমনের উদ্দেশ্যে ইস্পাহান অভিমুখে রওয়ানা করলেন। সংবাদ পেয়ে আলী ইস্পাহান ছেড়ে দিয়ে জুরজান দখল করে নিলেন। এটা ৩২১ হিজরীর যিলহজ্জ (ডিসেম্বর ৯৩৩ খ্রি) মাসের ঘটনা। ওয়াশমগীর ইস্পাহান অধিকার করে মুযাফফর ইব্ন ইয়াকূতকে তথাকার শাসনভার অর্পণ করেন। আলী ইব্ন বুওয়াইয়া তাঁর ভাই হাসানকে খারাজ আদায়ের উদ্দেশ্যে গারজুনের দিকে পাঠান। পথে মুযাফফর ইব্ন ইয়াকূতের সৈন্যবাহিনীর সাথে তার সংঘর্ষ হয়। হাসান যুদ্ধে তাকে পরাস্ত করেন এবং অর্থ আদায় করে ভাইয়ের কাছে নিয়ে আসেন।

আলী ইব্ন বুওয়াইয়া আস্তাখরের দিকে যাত্রা করেন। ইব্ন ইয়াকূত একটি বিরাট বাহিনীসহ তার পশ্চাদ্ধাবন করেন এবং তাকে যুদ্ধের জন্য চ্যালেঞ্জ করেন। উভয় পক্ষে যুদ্ধ হলো। যুদ্ধে আলী ইব্ন বুওয়াইয়ার ভাই আহমদ অত্যন্ত বীরত্ব প্রদর্শন করেন। মুযাফফর ইব্ন ইয়াকূত পরাস্ত হয়ে পলায়ন করেন এবং ওয়াসিতে গিয়ে উঠেন। আলী ইব্ন বুওয়াইয়া শিরাজ এসে তা অধিকার করেন। এভাবে গোটা পারস্য প্রদেশ তাঁর অধিকারভুক্ত হয়ে পড়ে। এখানে সেনাবাহিনীর লোকজন তাদের বেতন-ভাতা দাবি করে। সৈন্য-সামন্তের সংখ্যা তখন অনেক অথচ আলী ইব্ন বুওয়াইয়ার কাছে এত অর্থ-সম্পদ ছিল না যে, তাদের দাবি মেটাতে পারেন। এই চিন্তায় চিন্তাগ্রস্ত অবস্থায় তিনি একটি ঘরের ছাদে আরোহণ করেন। তাঁর চোখের সম্মুখে ছাদ থেকে একটি সাপ নিচে পড়লো। ইব্ন বুওয়াইয়া সে ছাদটি ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দিলেন। ছাদ ভাঙ্গতে গিয়ে সেখান থেকে স্বর্ণভর্তি সিন্দুক বেরিয়ে আসলো। এ স্বর্ণসম্ভার তিনি সৈন্যদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন। এভাবে তিনি এ চিন্তা থেকে মুক্ত হলেন। তারপর আলী কাপড় সেলাইয়ের উদ্দেশ্যে সৈন্যদ্বারা জনৈক দর্জিকে ডেকে পাঠালেন। দর্জি ভাবলো, তাকে বুঝি গ্রেফতার করা হবে। ভয়ে ছুটতে ছুটতে সে বললো, আমার কাছে সিন্দুক ছাড়া আর

কিছুই নেই আর আমি এখন পর্যন্ত খুলেও দেখিনি যে সিন্দুকের মধ্যে কী রয়েছে। তার এই স্বীকারোক্তি অনুসারে তার নিকট থেকে সিন্দুক উদ্ধার করা হলো। তাতে প্রচুর আশরফী পাওয়া গেল। আলী ইব্‌ন বুওয়াইয়া তাও অধিকার করলেন।

এ সমস্ত অর্থ-সম্পদ ছিল মুযাফফর ইব্‌ন ইয়াকূতের, তিনি এগুলো সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেননি। ঘটনাচক্রে এ সময় সাফারীয় রাজবংশের একটি ধনভাণ্ডারও তাঁর হাতে এসে যায়। এর অর্থ-সম্পদের পরিমাণ ছিল পাঁচ লাখ দীনার। একদিন আলী ইব্‌ন বুওয়াইয়া যখন ঘোড়ায় করে কোথাও যাচ্ছিলেন তখন অকস্মাৎ তাঁর ঘোড়ার পা মাটিতে ধসে গেল। সে স্থানটি খনন করতেই সে ধনভাণ্ডার বেরিয়ে এলো। এভাবে বিশাল সম্পদ ভাণ্ডার আলী ইব্‌ন বুওয়াইয়ার করতলগত হলো। তিনি অত্যন্ত সাফল্যের সাথে পারস্য প্রদেশ শাসন করে দিন দিন সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হয়ে মিরদাওয়ায়হর একজন শক্ত প্রতিপক্ষরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে তার ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ালেন।

কাহির বিল্লাহর অপসারণ

কাহির বিল্লাহ্ ছিলেন অত্যন্ত হিংস্র প্রকৃতির, অস্থিরমতি ও পাঁড় মদ্যপ। অবশ্য প্রজাদের মধ্যে মদ্যপান এবং মদ্য ব্যবসায় তিনি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। প্রায় দেড় বছর রাজত্ব করার পর সৈন্যবাহিনীর বিদ্রোহীদের হাতে তিনি গ্রেফতার হন। বিদ্রোহীসেনারা আবুল আব্বাস মুহাম্মদ ইব্‌ন মুকতাদিরকে সিংহাসনে বসিয়ে তাকে রাযী বিল্লাহ উপাধিতে ভূষিত করে। রাযী বিল্লাহ সিংহাসনে বসেই কাহির বিল্লাহকে অন্ধ করে দেন।

আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ খুরাসানী বর্ণনা করেন ঃ "একদা কাহির বিল্লাহ্ বল্লম হাতে আমার কাছে এসে বলেন, আব্বাসী খলীফাদের প্রত্যেকের চরিত্রগুণ আমার কাছে বর্ণনা কর। আমি বললাম ঃ

> "সাফ্‌ফাহ্ রক্তপাত করতেন নির্দ্বিধায়। তাঁর আমিলরাও পদে পদে তাঁকে অনুসরণ করতো। মানসূর ছিলেন বীর পুরুষ ও সঞ্চয়ী চরিত্রের লোক। মানসূরই সর্বপ্রথম আব্বাস বংশীয় ও আবূ তালিব বংশীয়দের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেন এবং পারস্পরিক সম্পর্ক বিনষ্ট করেন। সর্বপ্রথম তিনিই জ্যোতিষীদেরকে নৈকট্য প্রদান করেন। সুরিয়ানী ও আজমী কিতাবসমূহ যেমন জ্যামিতি, কালীলা ও দিমনা এবং গ্রীক পুস্তকাদি তাঁরই জন্যে অনুবাদ করা হয়।
>
> মাহ্‌দী অত্যন্ত দানশীল ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর পিতা যা লোকের নিকট থেকে বলপূর্বক ছিনিয়ে নিয়ে ছিলেন, তিনি তা প্রত্যর্পণ করেছিলেন। ধর্মদ্রোহীদেরকে তিনি হত্যা করেন। মসজিদুল হারাম, মদীনা শরীফের মসজিদে নববী এবং মসজিদে আকসার নির্মাণ কাজ তিনি করিয়ে ছিলেন। হাদী ছিলেন অত্যন্ত কঠোর ও দাম্ভিক চরিত্রের এবং তাঁর আমিলরাও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করতো।
>
> হারূনুর রশীদ হজ্জ ও জিহাদ করেন। মদীনার পথে রাস্তাঘাট ও জলাধার নির্মাণ করান। তিনি তারসূস, মাসীসা, মারআশ প্রভৃতি শহরের পত্তন করেন। জনহিতকর কার্যাদি দ্বারা তিনি প্রজাসাধারণকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেন। খলীফাদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম পোলো খেলেন, শিকার, বিহার করেন এবং দাবা খেলেন।

আমীন দাতা ছিলেন, কিন্তু আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত হয়ে পড়েন। মামূন জ্যোতির্বিদ ও দার্শনিকদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে পড়েন। তিনি অত্যন্ত সহিষ্ণুমনা ও উদার ছিলেন। মু'তাসিমও অনুরূপ চরিত্রের লোক ছিলেন তবে অশ্বারোহণ এবং অনারব রাজ-রাজড়াদের অনুকরণের শখ তাঁকেও পেয়ে বসেছিল। যুদ্ধ-বিগ্রহ ও বিজয় তিনি প্রচুর করেছেন। ওয়াছিক তাঁর পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। মুতাওয়াক্কিল সর্ব ব্যাপারে মামূন, মু'তাসিম ও ওয়াছিকের বিরোধী ছিলেন। তাঁদের আকীদা-বিশ্বাসেরও তিনি বিরোধী ছিলেন। হাদীসের ক্লাস চালু করারও তিনি নির্দেশ দেন। প্রজাসাধারণ তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রীত ছিল।

মোট কথা, এভাবে তিনি অন্যান্য খলীফার কথাও জিজ্ঞেস করতে থাকেন আর আমিও তাঁর জবাব দিতে থাকি। সব কিছু শুনে তিনি অত্যন্ত প্রীত ও সন্তুষ্ট হয়ে চলে যান।

রাযী বিল্লাহ্

রাযী বিল্লাহ্ ইব্ন মুকতাদির বিল্লাহ্র নাম মুহাম্মাদ এবং উপনাম আবুল আব্বাস। ২৯৭ হিজরীতে (৯০৯-১০ খ্রি) যালুম নাম্নী জনৈকা রোমান দাসীর গর্ভে তাঁর জন্ম হয়। কাহির বিল্লাহ্র পদচ্যুত হওয়ার পর ৩২২ হিজরীর জুমাদাসসানী (জুন ৯৩৪ খ্রি) মাসে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁকে কারাগার থেকে এনে সিংহাসনে বসানো হয়েছিল। তিনি আলী ইব্ন মাকাল্লাকে তাঁর উযীরে আযম মনোনীত করেন। মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াকূতকে গ্রেফতার করে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। ইয়াকূত সে সময় ওয়াসিতে ছিলেন। সৈন্যবাহিনী নিয়ে তিনি আলী ইব্ন বুওয়াইয়ার বিরুদ্ধে অভিযানে গিয়ে পরাস্ত হন। ঐ বছরই উবায়দুল্লাহ্ মাহ্দী মজূসী পঁচিশ বছর আফ্রিকায় রাজত্ব করে মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং তার পুত্র আবুল কাসিম বি আমরিল্লাহ্ উপাধি গ্রহণ করে তার স্থলাভিষিক্ত হয়।

মিরদাওয়ায়হ্ হত্যা

উপরেই বর্ণিত হয়েছে যে, মিরদাওয়ায়হ্ গোটা রে প্রদেশ, ইস্পাহান ও আহওয়ায প্রভৃতি অঞ্চল দখল করে খলীফার দরবার থেকে যথারীতি সনদও হাসিল করে। কিন্তু স্বল্পকাল পরেই সে স্বাধীন সম্রাটরূপে নিজেকে ঘোষণা করে স্বর্ণের এক সিংহাসনও নির্মাণ করে। সেনাপতিবর্গ ও সর্দারদের জন্যে সে রৌপ্যের আসন নির্মাণ করায়। পারস্য সম্রাটের মতো কারুকাজমণ্ডিত মুকুট শিরে ধারণ করে নিজেকে শাহানশাহ বলে ঘোষণা করে। তারপর সে ইরাক ও বাগদাদে হামলার প্রস্তুতি গ্রহণ করে ঘোষণা করে যে, আমি পারস্য সম্রাটের প্রাসাদরাজী পুনর্নির্মাণ করবো এবং ইরাকীদের রাজত্বকে চুরমার করে দিয়ে নতুনভাবে অগ্নি উপাসকদের রাজত্ব কায়েম করবো। তার এরূপ বাগাড়ম্বর তার কোন কোন সর্দারের নিকট অসহনীয়বোধ হয়। ৩২৩ হিজরীতে (৯৩৫ খ্রি) ইস্পাহানের বাইরে তাকে হত্যা করা হয়।

প্রদেশসমূহের অবস্থা

খলীফা রাযী বিল্লাহ্র রাজত্ব বাগদাদ এবং তার চতুষ্পার্শ্বেই সীমাবদ্ধ ছিল। কোন প্রদেশ থেকেই কোন রাজস্ব আসতো না। সর্বত্র লোকজন স্বাধীন রাজ্যসমূহ গড়ে তুলেছিলেন। যারা নির্দিষ্ট হারে কর প্রেরণের সুস্পষ্ট অঙ্গীকার করে খলীফার দরবার থেকে রাজ্য শাসনের সনদ হাসিল করেছিল তারাও সে অঙ্গীকার পূর্ণ করার কোন গরজবোধ করছিল না। বসরায় মুহাম্মদ

ইব্‌ন রাইক, খুযিস্তান ও আহওয়াযে আবূ আবদুল্লাহ্ বুরায়দী, পারস্যে আবূ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বুওয়াইয়া যার উপাধি ছিল ইমাদুদ্দৌলা, কিরমানে আবূ আলী মুহাম্মদ ইব্‌ন ইলিয়াস, রে, ইস্পাহান এবং পার্বত্য প্রদেশসমূহে রুকনুদ্দৌলা উপাধিধারী হাসান ইব্‌ন বুওয়াইয়া এবং মিরদাওয়ায়হ্‌র ভাই ওয়াশমগীর একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে রাজত্ব করে চলেছিল। মুসেল, দিয়ারবকর, দিয়ার মুদার, দিয়ার রাবীআ ইব্‌ন হামদানের দখলে ছিল।

মিসর ও সিরিয়া মুহাম্মদ ইব্‌ন তাফাজের নিয়ন্ত্রণে ছিল। মাওরাউন নাহর ও খুরাসানের কোন কোন অংশে ইব্‌ন সামান রাজত্ব করে চলেছিল। বাহ্‌রায়ন ও ইয়ামামা প্রদেশসমূহে আবূ তাহির কারামতীর রাজত্ব কায়েম ছিল। তাবারিস্তান প্রদেশে ছিল দায়লামীদের রাজত্ব। আন্দালুস, মরক্কো ও আফ্রিকায় তো দীর্ঘকাল পূর্ব থেকেই স্বায়ত্তশাসিত রাজ্যসমূহ কায়েম হয়েছিল।

রাযী বিল্লাহর সিংহাসনে আরোহণের প্রথম বছরেই ইমাদুদ্দৌলা আলী ইব্‌ন বুওয়াইয়া এক কোটি আশি লক্ষ দিরহাম বার্ষিক কর খলীফার দরবারে প্রেরণের অঙ্গীকার করে পারস্য প্রদেশের শাসনের সনদ হাসিল করেন। খলীফা তাকে সনদ, খিলাফত ও পতাকা পাঠিয়ে ইমাদুদ্দৌলা খেতাবে ভূষিত করেন, তাঁর ভাই হাসানকে রুকনুদ্দৌলা এবং অপর ভাই আহমদকে মুইজুদ্দৌলা খেতাবে ভূষিত করেন। মিরদাওয়ায়হ্ নিহত হওয়ার পর তার সৈন্যবাহিনী দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে একাংশ পারস্যে ইমামুদ্দৌলার কাছে এবং অপর অংশ তার এক সর্দার ইয়াহকামের কাছে অবস্থান করে।

ইয়াহকাম খলীফার দরবারে পৌঁছে প্রভাব বিস্তার করে এবং দরবারের সকল সর্দারের উপর টেক্কা দিতে 'আমীরুল উমারা' খেতাব হাসিল করে খলীফার মাথার উপর চেপে বসে ও বেশ দাপট নিয়েই বাগদাদে অবস্থান করতে থাকে। মিরদাওয়ায়হের ভাই ওয়াশমগীর রুকনুদ্দৌলা ইব্‌ন বুওয়াইয়ার মুকাবিলায় ইস্পাহান ত্যাগ করে জবোল ও আয়ারবায়জান দখল করে নেয়। রুকনুদ্দৌলা ইব্‌ন বুওয়াইয়া ইস্পাহান দখল করে বসেন। মুইজুদ্দৌলা ইব্‌ন বুওয়াইয়া আহ্‌ওয়ায দখল করেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন রাইক মুহাম্মাদ ইব্‌ন তাফাজের নিকট থেকে শামদেশ ছিনিয়ে নেন। তার হাতে তখন কেবল মিসর অবশিষ্ট থাকে। রাযীর আমলে খলীফা নামে মাত্র খলীফা ছিলেন। ইয়াহ্‌কাম খলীফা ও দরবারের মাথার উপর চেপে বেশ দাপটের সাথে বিরাজমান ছিল। কারো তার বিরুদ্ধে টুশব্দটি করার উপায় ছিল না। ইয়াহ্‌কাম নিজে ওয়াসিতে বসবাস করতো এবং মীর-মুন্‌শী বা প্রধান সচিব প্রধানমন্ত্রীরূপে খলীফার সাথে বাগদাদে অবস্থান করে রাজ্য পরিচালনা করতো।

রাযী বিল্লাহর মৃত্যু

কয়েক মাস কম সাত বছর সিংহাসনে থাকার পর ৩২৯ হিজরীর রবিউল আউয়াল (ডিসেম্বর ৯৪০ খ্রি) মাসে খলীফা রাযী বিল্লাহ্ উদরী রোগে ইন্তিকাল করেন। এ সংবাদ অবগত হয়ে ইয়াহকাম তার সচিবকে নির্দেশ লিখে পাঠায়। সে মতে ইবরাহীম ইব্‌ন মুতাদিদ বিল্লাহকে মুত্তাকী বিল্লাহ উপাধিতে ভূষিত করে ৩২৯ হিজরীর ২৯শে রবিউল আউয়াল (জানুয়ারী ৯৪১ খ্রি) সিংহাসনে বসানো হয়।

খলীফা রাযী বিল্লাহ্র খিলাফত আমলে মুহাম্মদ ইব্ন আলী সামআনী ওরফে ইব্ন আবুল গারাকির আবির্ভূত হয়ে খোদায়ী দাবি করে বসে। অনেক অজ্ঞ লোক তারও ভক্ত হয়ে যায়। খলীফা রাযীর খিলাফতের প্রথম বছরেই তাকে গ্রেফতার করে হত্যা করা হয়। তার সঙ্গী-সাথীদের মধ্যেও যারা তওবা করেনি তাদের সকলকে হত্যা করা হয়। এ বছর কারামিতারা বাগদাদ ও মক্কার মধ্যবর্তী এলাকায় এমন লুটপাট ও অরাজকতা চালায় যে, বাগদাদ থেকে সে বছর কেউই হজ্জে যেতে পারেননি। ৩২৭ হিজরী (নভেম্বর ৯৩৮—অক্টোবর ৯৩৯ খ্রি) পর্যন্ত বাগদাদের কেউই হজ্জে যাওয়ার সাহস করতে পারেনি। ৩২৭ হিজরীতে (৯৩৮-৩৯ খ্রি) আবূ তাহির কারামতী উট প্রতি পাঁচ দীনার কর প্রদান সাপেক্ষে হজ্জের অনুমতি দেয়। হজ্জের জন্য কর প্রদান এই ছিল প্রথম। বাগদাদবাসীরা মনোকষ্টের সাথে এ কর দিয়ে হজ্জ আদায় করেন। রাযীই শেষ খলীফা যিনি যথারীতি মিম্বরে আরোহণ করে খুতবা দিতেন। তারপর থেকে এ দায়িত্ব খলীফারা অন্যদের উপর ন্যস্ত করে দেন।

মুত্তাকী লিল্লাহ

মুত্তাকী লিল্লাহ্ ইব্ন মু'তাদিদ বিল্লাহ্ ইব্ন মুতাওয়াক্কিল যুহ্রা নাম্নী এক দাসীর গর্ভে ভূমিষ্ঠ হন। ৩৪ বছর বয়ঃক্রমকালে তিনি খলীফা হন। ৩২৯ হিজরীর ২৬শে রজব (এপ্রিল ৯৪১ খ্রি) ইয়াহ্কামের নির্দেশে ওয়াসিতের উপকণ্ঠে কুর্দীদের হাতে তিনি নিহত হন। দুই বছর আটমাসকাল তিনি আমীরুল উমারারূপে কার্যরত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর এগার লাখ দীনার মূল্যের সম্পদ বাজেয়াপ্ত হয়ে রাজকোষে আসে। ৩২৯ হিজরীর শাবান (মে ৯৪১ খ্রি) মাসে আবূ আবদুল্লাহ বুরায়দী বসরা থেকে সসৈন্য বাগদাদ অভিমুখে যাত্রা করে। মুত্তাকী তাকে ফিরে যাওয়ার জন্যে লিখে পাঠান। সে তাতে সম্মত হলে খলীফা তার বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করলেন। সৈন্যবাহিনী তার মুকাবিলা না করে পালিয়ে যায়। বুরায়দী বাগদাদে প্রবেশ করে খলীফার নিকট পাঁচ লাখ দীনার তলব করে, অন্যথায় তাঁকে পদচ্যুত করে হত্যা করা হবে বলে হুমকি দেয়। খলীফা কালবিলম্ব না করে এ অর্থ পাঠিয়ে দেন। চব্বিশ দিন পর ৩২৯ হিজরীর রমযান (জুন ৯৪৩ খ্রি) মাসে বুরায়দীর বাহিনী বেতন-ভাতা না পাওয়ায় বিদ্রোহ করে। বুরায়দী পালিয়ে ওয়াসিতে চলে যায়। যুরায়দীর প্রস্থানের পর কুর্তগীননামক একজন সর্দার খলীফা ও তার দরবারের উপর চেপে বসে। সে আমীরুল উমারার খেতাব লাভ করে। এ সময় তুর্কীদের ছাড়াও দায়লামীদের একটি বড় দলও মওজুদ ছিল। ইয়াহকামের আমল থেকে দায়লামীদের প্রভাব বাগদাদে বৃদ্ধি পেতে থাকে। দায়লামীরা কুর্তগীনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে। তুর্কী ও দায়লামীদের মধ্যে যুদ্ধ বাধে, কিন্তু তাতেও কুর্তগীনের প্রভাব অব্যাহত থাকে। এ সংবাদ অবগত হয়ে শামদেশে ক্ষমতাসীন মুহাম্মদ ইব্ন রাইক নিজে আমীরুল উমারা পদ দখলের উদ্দেশ্যে শাম থেকে বাগদাদ অভিমুখে যাত্রা করেন। কুর্তগীন বাগদাদ থেকে বের হয়ে তার মুকাবিলা করে। ইব্ন রাইক বলপূর্বক বাগদাদে প্রবেশ করেন। কুর্তগীন ধৃত হয়ে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। খলীফা ইব্ন রাইককে আমীরুল উমারা পদে অধিষ্ঠিত করে মুহাম্মদ ইব্ন রাইক আবূ আবদুল্লাহ্ বুরায়দীর নিকট থেকে বলপূর্বক রাজস্ব আদায় করেন।

৩৩০ হিজরীর রবিউস সানী (জানুয়ারী ৯৪২ খ্রি) মাসে ইব্ন বুরায়দী বাগদাদ আক্রমণ করে। ইব্ন রাইক যুদ্ধে পরাস্ত হন। বুরায়দীর বাহিনীতে তুর্কী ও দায়লামীরা শামিল ছিল। শহরে প্রবেশ করেই তারা লুটপাট শুরু করে দেয়। খলীফা ইব্ন রাইক ও স্বীয় পুত্র আবূ মানসূরসহ মুসেলে পালিয়ে যান। খলীফার প্রাসাদসহ বাগদাদবাসীদের বাড়িঘরে লুটপাট চললো। এ লুটপাটে কিছু কারামতী এসেও অংশগ্রহণ করে। শহরের সম্ভ্রান্ত অধিবাসীগণ সীমাহীন বিড়ম্বনার সম্মুখীন হন। মুসেলের শাসনকর্তা ছিলেন নাসিরুদ্দৌলা ইব্ন হামদান। খলীফা সেখানে পৌঁছতেই তিনি শহর ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। খলীফা এবং ইব্ন রাইক তাঁকে সান্ত্বনা ও অভয় দিয়ে ফিরিয়ে আনলেন। নাসিরুদ্দৌলা ইব্ন রাইককে হত্যা করে ফেলেন। খলীফা নাসিরুদ্দৌলাকে আমীরুল উমারা খেতাব প্রদান করলেন। তিনি নাসিরুদ্দৌলার ভাই আবুল হুসাইনকে সাইফুদ্দৌলা খেতাবে অভিহিত করেন। মুসেল থেকে ফৌজ নিয়ে নাসিরুদ্দৌলা ও খলীফা বাগদাদ অভিমুখে রওয়ানা হয়ে পড়লেন। বাগদাদে অবস্থানরত দখলদার ইব্ন বুরায়দী তাঁদের মুকাবিলা করে পরাস্ত হয়। ৩৩০ হিজরীর শাওয়াল (জুন ৯৪২ খ্রি) মাসে ইব্ন বুরায়দীর এ পরাজয়ের পর নাসিরুদ্দৌলা খলীফাসহ বাগদাদে প্রবেশ করলেন। নাসিরুদ্দৌলা ও সাইফুদ্দৌলা দীর্ঘ এগার মাস ধরে বাগদাদে খলীফার সাথে অবস্থান করেন। তারপর তাঁদের মুসেলের ভাবনা জাগে এবং তাঁরা মুসেলের পথে রওয়ানা হয়ে পড়েন। ৩৩১ হিজরীর রমযান (মে ৯৪৩ খ্রি) মাসে তূযূন নামক সর্দার বাগদাদে স্বীয় প্রভাব-প্রতিপত্তি ও দখল কায়েম করে। খলীফা তাকে আমীরুল উমারা খেতাব প্রদানে বাধ্য হন। এর মাত্র কিছুদিন পর ৩৩২ হিজরীর মুহাররম (সেপ্টেম্বর ৯৪৩ খ্রি) মাসে আবূ জা'ফর ইব্ন শেরযাদ বাগদাদে প্রবেশ করে। এ সময় তূযূন ওয়াসিতে গিয়েছিলেন। খলীপা মুত্তাকী ভীত হয়ে বাগদাদ থেকে মুসেলের দিকে পালিয়ে যান। তূযূন ও আবূ জা'ফর মিলে মুসেল আক্রমণ করে বসেন। সেখানে নাসিরুদ্দৌলা ও সাইফুদ্দৌলা ভ্রাতৃদ্বয় যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে খলীফাকে নিয়ে নাসীবায়নের দিকে চলে যান। নাসীবায়ন থেকে খলীফা মুত্তাকী রিক্কায় আগমন করেন এবং সেখান থেকে তূযূনকে পত্র লিখেন। তূযূন বনূ হামদানের সাথে সন্ধি করে বাগদাদে ফিরে আসে। খলীফা বনূ হামদানসহ রিক্কায় থেকে যান।

ঐ সময়েই আহওয়ায নিয়ন্ত্রণকারী শাসক মুইজুদ্দৌলা আহমদ ইব্ন বুওয়াইয়া ওয়াসিতের উপর হামলা করেন। তূযূন মুসেল থেকে ফিরে এসে তাঁর মুকাবিলা করে। তূযূন ও মুইজুদ্দৌলার মধ্যে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয় ৩৩২ হিজরীর ১৭ই যুলকাদা (জুলাই ৯৪৪ খ্রি) তারিখে। এ যুদ্ধে মুইজুদ্দৌলার পরাজয় হয় কিন্তু দ্বিতীয়বার হামলা করে তিনি ওয়াসিত অধিকার করে নেন। ৩৩২ হিজরীতে (৯৪৩-৪৪ খ্রি) রুশীয়রা আযারবায়জান সীমান্তের বারুণা শহরে হামলা চালায়। দায়লাম অধিপতি এ সংবাদ পেয়ে সেদিকে সৈন্য পাঠালেন। রুশীয়রা মুসলমানদের হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। মুসলমানরা সংঘটিত হয়ে তাদের মুকাবিলা করে। এ লড়াই দীর্ঘকাল যাবত চলে। অবশেষে তুমুল যুদ্ধের পর তারা রুশীয়দেরকে প্রচণ্ড মার দিয়ে তাড়িয়ে দেয়।

খলীফা মুত্তাকীর পদচ্যুতি

খলীফা মুত্তাকী ৩৩২ হিজরীর (৯৪৪ খ্রি-এর আগস্টের দিকে) শেষ নাগাদ বনূ হামদানের ওখানেই অবস্থান করেন। এ সময়ের মধ্যে খলীফা ও বনূ হামদানের মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি

হয়। খলীফা একদিকে বাগদাদে অপরদিকে মিসরে আখশীদ ইব্ন মুহাম্মদ তাকাজের কাছে চিঠিপত্র লিখতে থাকেন। ৩৩৩ হিজরীর ১৫ই মুহাররম (৮ই সেপ্টেম্বর ৯৪৪ খ্রি) আখশাদ রিক্কায় স্বয়ং খলীফার খিদমতে হাযির হন এবং তাঁকে মিসরে এসে সেখানে অবস্থানের আবেদন জানালেন। উযীরও তাঁর এ প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জানান এবং মিসরে রাজধানী স্থানান্তরের উপকারিতা বর্ণনা করেন। কিন্তু খলীফার এ প্রস্তাব মনঃপূত হলো না। ইতিমধ্যে বাগদাদ থেকে তূযূনের পত্র এসে পৌছাল। পত্রে খলীফা এবং তাঁর উযীর ইব্ন শেরযাদকে নিরাপত্তা দেয়া হয়। খলীফা এ পত্র পাঠ করে আনন্দ প্রকাশ করেন এবং আখশীদকে রেখেই ৩৩৩ হিজরীর মুহাররম (২৩ সেপ্টেম্বর ৯৪৪ খ্রি) মাসের শেষ তারিখে বাগদাদ অভিমুখে রওয়ানা হন। তূযূন সুন্দিয়া নামক স্থানে অগ্রসর হয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান এবং আপন তাঁবুতে নিয়ে যান। পরদিন খলীফার চক্ষুদ্বয়ে উত্তপ্ত কাঠি বুলিয়ে অন্ধ করে দেয়া হয়। তারপর আবুল কাসিম আবদুল্লাহ ইব্ন খলীফা মুকতাদি বিল্লাহকে ডেকে তাঁর হাতে অমাত্যবর্গ ও রাষ্ট্রের ঊর্ধ্বতন কর্মচারিগণ বায়আত করে তাঁকে মুসতাকফী বিল্লাহ্ খেতাবে ভূষিত করেন। সর্বশেষ পদচ্যুত খলীফা মুত্তাকীকে দরবারে পেশ করা হয়। তিনিও খলীফা মুসতাকফীর হাতে বায়আত হন। মুত্তাকীকে জাযিরায় অন্তরীন করে রাখা হয়। পঁচিশ বছর এ দুর্গতি ভোগ করে ৩৫৭ হিজরীতে (৯৬৮ খ্রি) তিনি মৃত্যু মুখে পতিত হন। কাহির বিল্লাহ মুত্তাকীর অন্ধত্বের সংবাদ শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে মন্তব্য করলেন ঃ এবার আমরা দু'জন অন্ধ হলাম, তৃতীয় অন্ধের স্থানটি অপূর্ণ রয়ে গেল। ঘটনাচক্রে এর মাত্র কয়েকদিন পরেই মুসতাকফীকেও ঐ একই ভাগ্যবরণ করতে হয়।

মুসতাকফী বিল্লাহ্

আবুল কাসিম আবদুল্লাহ্ মুসতাক্ফী বিল্লাহ্ ইব্ন মুকতাফী বিল্লাহ্ আমলাহুন নাস নাম্নী এক দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ৩৩৩ হিজরীর সফর (অক্টোবর ৯৪৪ খ্রি) মাসে একচল্লিশ বছর বয়সে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। এ সময় আবুল কাসিম ফযল ইব্ন মুকতাদির বিল্লাহও খিলাফতের দাবিদার ছিলেন। তিনি আত্মগোপন করেন। মুসতাকফী অনেক খোঁজাখুঁজি করিয়েও তাঁর কোন সন্ধান পাননি। মুসতাকফীর গোটা শাসনামলই তিনি আত্মগোপন অবস্থায় কাটিয়ে দেন। মুসতাকফী যখন কোনমতেই আর তাঁর সন্ধান পেলেন না, তখন তাঁর বাসগৃহ তিনি ধূলিসাৎ করে দিলেন।

খলীফা মুসতাক্ফী সিংহাসনে আরোহণ করার অব্যবহিত পরই তূযূনের মৃত্যু হয়। মুসতাকফী আবূ জা'ফর ইব্ন শেরযাদকে আমীরুল উমারা খেতাবে ভূষিত করেন। ইব্ন শেরযাদ ক্ষমতা হাতে পেয়েই নির্বিচারে রাষ্ট্রীয় অর্থব্যয় করতে শুরু করেন। রাজকোষ অচিরেই কপর্দকশূন্য হয়ে উঠলো। রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতি ঘটলো। কিছুদিনের মধ্যে বাগদাদে চুরি-ডাকাতির প্রকোপ এতই বৃদ্ধি পেল যে, লোকজন শহর ছেড়ে দেশান্তরী হতে শুরু করলো।

সতর্কবাণী

ইসলামী রাষ্ট্রের আয়তন ও পরিধি উমাইয়া আমল পর্যন্ত অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ইসলামী রাষ্ট্রের তখন একটিই কেন্দ্র ছিল। দামেশকের খলীফার দরবার থেকে যে ফরমান

জারি হতো তা আন্দালুস ও মরক্কোর পশ্চিম উপকূল থেকে শুরু করে চীন ও তুর্কিস্তান পর্যন্ত সমভাবেই তামিল করা হতো। ইসলামী খিলাফত বনূ আব্বাসের করতলগত হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই আন্দালুস তথা স্পেনে বনী উমাইয়া বংশের একটি স্বাধীন সালতানাত কায়েম হয়ে যায়। ফলে মুসলমানদের একটি রাষ্ট্রীয় কেন্দ্রের স্থলে দু'টি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এর অল্প কিছুদিন পর মরক্কোতে মুসলমানদের তৃতীয় আরেকটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর আফ্রিকা ও মিসরে আরেকটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। অনুরূপভাবে মাওরাউন নাহর, খুরাসান, পারস্য প্রভৃতি প্রদেশে বাগদাদের খলীফার নিয়ন্ত্রণমুক্ত রাজ্য কায়েম হয়ে যায়। এখন ইতিহাসের যে পর্যায়ে আমরা আলোচনা করছি তখন স্বয়ং বাগদাদ শহরেও খলীফার খিলাফত কায়েম নেই। অল্প কয়েকদিন পূর্বেও দজলা ও ফোরাত বিধৌত দো-আবা অঞ্চল খলীফার রাজত্বের অধীন ছিল। কিন্তু যখন থেকে আমীরুল উমারা পদের সৃষ্টি হলো সে সময় থেকে দো-আবা এলাকার প্রকৃত কর্তৃত্ব থাকতো আমীরুল উমারার হাতেই, আর এই আমীরুল উমারা নামেমাত্রই খলীফার অধীন ও নায়েব থাকতেন।

খাস বাগদাদ শহরে খলীফার ফরমানের মর্যাদা ছিল। আর বাগদাদ শহরে তাঁর কর্তৃত্বই সর্বোচ্চ বলে গণ্য হতো। এমন প্রতিটি ব্যক্তি যে অন্য সকলকে পরাস্ত করে নিজের শক্তি-সামর্থ্যের অভিব্যক্তি ঘটাতে পারতো সেই বাহুবলে আমীরুল উমারা বনে যেত। খলীফাকে বাধ্য হয়ে তাকে আমীরুল উমারা খেতাব দিতে হতো। খলীফার হাতে প্রকৃতপক্ষে কোন ক্ষমতা না থাকলেও তাঁর অল্পবিস্তর স্বাধীনতা অবশ্যই ছিল এবং তাঁর একরকম সম্ভ্রম বা দাপটও ছিল। কিন্তু এবার মুইজ্জুদ্দৌলা আহমদ ইব্‌ন বুওয়াইয়া আহওয়ায থেকে এসে বাগদাদ ও খলীফার উপর এমনিভাবে জেঁকে বসলো যে, সে দিব্যি মালিক (রাজা) উপাধি পেয়ে যাচ্ছে। তারপর একে একে অনেকেই মালিক হচ্ছেন। মুইজ্জুদ্দৌলা খলীফাকে অন্তরীণাবদ্ধ করে তাঁকে একজন সম্মানিত কয়েদীর মর্যাদা দিল। এ যাবত বাগদাদ শহরে খলীফার যেটুকু মানমর্যাদা ছিল তাও সে কেড়ে নিল। খলীফার কাজ শুধু এতটুকু ছিল যে, যখন বাইরের কোন দূত আসতেন তখন তাঁকে খলীফার দরবারে হাযির করা হতো এবং এ কৃত্রিম দরবারে খলীফার বাহ্যিক জাঁকজমক প্রদর্শন করে অভীষ্ট কাজটি সমাধা করা হতো। কাউকে খেতাব বা সনদ দেয়া প্রভৃতি কাজ খলীফার হাত দিয়েই হতো সত্য, কিন্তু তাতে খলীফার নিজের কোন ইখতিয়ার থাকতো না। প্রতিটি কাজের ইখতিয়ার থাকতো মালিক-এর হাতে।

খলীফার মর্যাদা কোন অংশেই দাবার ছকের রাজার চাইতে বেশি ছিল না। মালিক খলীফার একটা বেতন-ভাতা নির্ধারণ করে দিতো। এ বেতন-ভাতা পেতে যখন বিলম্ব হতো বা কোন সময় যখন তিনি আদৌ তা পেতেন না তখন অগত্যা তাঁকে কোন তৈজসপত্র প্রভৃতি বিক্রি করে তাঁর নিজ ব্যয় নির্বাহ করতে হতো। আব্বাসীয় খলীফাদের অবস্থা যখন এ পর্যায়ে নেমে এসেছে তখন বলাই বাহুল্য, সালতানাত বা রাষ্ট্রের ইতিহাস লেখকের আর তাঁদের কথা উল্লেখেরই প্রয়োজন নেই। কেননা এখন খলীফা শব্দটি ছাড়া তাদের কাছে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। কিন্তু যেহেতু ইসলামী হুকুমতের ইতিহাস পূর্ণ করতে হবে আর তার শাসকদের কথা বর্ণনা করতে হবে তাই তাতে ঐ মালিকের উল্লেখ করতেই হয় যারা বাগদাদে মালিক নামে অভিহিত হয়ে কেবল বাগদাদেই নয়, বরং দজলা ফোরাত দোআবা অঞ্চল ও অন্যান্য প্রদেশে

শাসনকার্য চালিয়েছে। তাই সে সব মালিকের আলোচনা প্রসঙ্গে আরো কিছু দূর পর্যন্ত আমাদেরকে ঐ আব্বাসী খলীফাদের সাহায্য নিয়ে এগুতে হবে– যারা দাবার ছকের রাজার চাইতে বেশি কিছু না হলেও এখনো তাঁদেরকে খলীফাই বলা হচ্ছে।

মোদ্দাকথা, আমরা এখন আব্বাসীয় খলীফাদের আলোচনা করছি না বরং আমাদের প্রতিপাদ্য হচ্ছে বাগদাদের হুকুমত বা খিলাফতের অবস্থা। সাথে সাথে একথাও লক্ষ্য রাখতে হবে যে, যদিও বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন রাজ্য ও রাজত্ব গড়ে উঠেছে, তবুও সকলেই কিন্তু খলীফার নামটির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করছেন। খুতবায় সকলেই তাঁর নাম উচ্চারণ করছেন। আন্দালুসে এক স্বতন্ত্র খিলাফত গড়ে উঠেছিল। উবায়দীপন্থীরা ছিল শিয়া কারামিতা; তারাও খিলাফত ও ইমারতের দাবিদার ছিল। এজন্যে আন্দালুস ও আফ্রিকায় বাগদাদের খলীফার নাম খুতবায় উচ্চারিত হতো না। কিন্তু অবশিষ্ট সমস্ত ইসলামী জগতের দেশ বা প্রদেশসমূহে বাগদাদের আব্বাসী খলীফাকে সকলেই খলীফা বলে মান্য করছিলেন এবং তাঁকেই নিজেদের ধর্মীয় নেতারূপে সম্মান করেছিলেন। অবশ্য, কখনো কখনো এমনও হয়েছে যে, কোন মালিক খোদ বাগদাদ নগরীতেই খুতবায় খলীফার নাম খারিজ করে দিয়েছে। কেবল নিজের নামেই খুতবা চালিয়ে দিয়েছে, কিন্তু অন্যান্য রাজ্যে অবশ্যই খলীফার নাম খুতবায় উচ্চারিত হয়েছে।

বাগদাদে বুওয়াইয়া বংশের রাজত্ব

বুওয়াইয়া বংশ সম্পর্কে পূর্বেই বলা হয়েছে যে, বুওয়াইয়ার পুত্রত্রয় আলী, হাসান ও আহমদ ইতিমধ্যেই সর্দারী ও রাজত্বের অধিকারী হয়ে বসেছেন। আলী (ইমাদুদ্দৌলা) পারস্য প্রদেশ নিয়ন্ত্রণ করছিলেন। হাসান (রুকনুদ্দৌলা) উস্পাহান ও তাবারিস্তান অঞ্চলে রাজত্ব করছিলেন। আহমদ (মুইজ্জুদ্দৌলা) আহ্ওয়ায শাসন করছিলেন। ইব্ন শেরযাদের আমীরুল উমারা থাকা অবস্থায় বাগদাদে চরম অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে বাগদাদের অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী এলাকায় অবস্থানরত মুইজ্জুদ্দৌলা বাগদাদ আক্রমণ করেন। শেরযাদ পালিয়ে বনূ হামদানের কাছে মুসেলে চলে যায়। মুইজ্জুদ্দৌলা নির্বিবাদে বাগদাদ দখল করে খলীফার খিদমতে উপস্থিত হন। খলীফা তাঁকে মুইজ্জুদ্দৌলা খেতাব প্রদান করেন।

মুইজ্জুদ্দৌলা নিজের নামে মুদ্রার প্রচলন করেন এবং অত্যন্ত দাপটের সাথে বাগদাদে রাজত্ব চালান। কয়েকদিন পরে মুইজ্জুদ্দৌলা জানতে পারেন যে, খলীফা মুসতাকফী তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছেন। এ সময় খুরাসানের ওয়ালীর দূত খলীফার দরবারে আসেন এবং এ উপলক্ষে দরবারে-আম বসে। মুইজ্জুদ্দৌলা প্রকাশ্য দরবারে দায়লামীদেরকে ইঙ্গিত করলেন। তাঁরা খলীফার দিকে অগ্রসর হলে খলীফা ভাবলেন তারা তাঁর হস্তচুম্বনের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হচ্ছে, তিনি সরল মনে হাত বাড়িয়ে দিতেই তারা সে হাত ধরে খলীফাকে সিংহাসন থেকে টেনে নামায় এবং প্রকাশ্য দরবারে তাঁকে গ্রেফতার করে। কারো টু শব্দটি করার উপায় ছিল না। মুইজ্জুদ্দৌলা তৎক্ষণাৎ বাহনে চড়ে তার নিজ ঘরে আসেন আর দায়লামীরা খলীফাকে টেনেহেঁচড়ে অপদস্ত করে মুইজুদ্দৌলার সম্মুখে উপস্থিত করে। এ সময় তাঁর চক্ষুদ্বয় উপড়ে ফেলা হয় এবং কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। এটা ৩৩৪ হিজরীর জুমাদাল উখরা (জানুয়ারী

৯৪৬ খ্রি) মাসের ঘটনা। খলীফা মুসতাক্ফী এক বছর চার মাস নামে মাত্র খলীফা ছিলেন। ৩৩৮ হিজরীতে (৯৪৯-৫০ খ্রি) অন্তরীণ অবস্থায়ই তিনি ইনতিকাল করেন।

মুতী' বিল্লাহ্

মুইজ্জুদ্দৌলা ইব্ন বুওয়াইয়া দায়লামী ছিলেন বুওয়াইয়ার সর্বকনিষ্ঠ সন্তান। এরা যেহেতু ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন আতরুশের হাতে, তাই দায়লামী মাত্রই শিয়া ছিল। বুওয়াইয়া বংশীয়রা শিয়া মতবাদ ও গোত্রপ্রীতির ব্যাপারে চরমপন্থী ছিল। মুসতাকফীকে অপমান, অপদস্ত, পদচ্যুত, অন্তরীণ ও অন্ধ করার পর মুইজ্জুদ্দৌলা কোন উলুভীকে খলীফা পদে বসাতে মনস্থ করেন, কিন্তু তাঁর কোন কোন পরামর্শদাতা তাঁকে এ কাজ করতে নিষেধ করেন। তারা তাঁকে এ মর্মে বোঝাবার চেষ্টা করেন যে, আপনি যদি কোন্ উলুভীকে খলীফা বানান তা হলে গোটা জাতি তাকেই খিলাফতের যোগ্য পাত্র বিবেচনা করে আপনার পরিবর্তে সেই উলুভী খলীফারই আনুগত্য করবে। ফলে দায়লামীদের উপর আপনার যে প্রভাব বিদ্যমান তা খর্ব হবে। ফলে আপনার এ প্রভাব-প্রতিপত্তির অবসান ঘটবে। তার চাইতে এই আব্বাসী খান্দানের কাউকে ধরে খলীফার আসনে বসানোই শ্রেয়। তাতে শিয়ারা তাকে আনুগত্যের অনুপযুক্ত বিবেচনা করে আপনারই আনুগত্যে লেগে থাকবে। কেবল এভাবেই বাগদাদে শিয়া প্রভাব বিদ্যমান থাকতে পারে। সেমতে মুইজ্জুদ্দৌলা আবুল কাসিম ফযল ইব্ন মুকতাদিরকে তলব করে মুতী' লিল্লাহ্ উপাধি দিয়ে সিংহাসনে বসিয়ে প্রথাগত বায়আত অনুষ্ঠান করেন এবং দৈনিক তিনি একশ দীনার তাঁর ভাতা নির্ধারণ করে দেন। মুতী' লিল্লাহ্ ৩১৬ হিজরীতে (৯২৯ খ্রি) মাশ্গালা নাম্নী এক দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন এবং জমাদিউস সানী ৩৩৪ হিজরীতে (জানুয়ারী ৯৪৬ খ্রি) তাঁকে সিংহাসনে বসানো হয়।

মুইজ্জুদ্দৌলা খলীফার উযীর রূপে আবূ মুহাম্মদ হাসান ইব্ন মুহাম্মদ মাহবালীকে নিযুক্তি প্রদান করেন। উযীর প্রকৃত পক্ষে মালিক-এরই উযীর হতেন। কেননা খলীফা তো নামেই কেবল খলীফা ছিলেন। মুসেলে নাসিরুদ্দৌলা ইব্ন হামদান এবং শামে সাইফুদ্দৌলা ইব্ন হামদান রাজত্ব করছিলেন। মিসরে আখশীদ মুহাম্মদ ইব্ন তাফাজ ফারগানীর শাসন চলছিল। নাসিরুদ্দৌলা যখন এভাবে মুইজ্জুদ্দৌলার বাগদাদের ক্ষমতা দখলের সংবাদ অবগত হলেন তখন তিনি মুসেল থেকে সসৈন্যে বেরিয়ে পড়লেন এবং ৩৩৪ হিজরীর শা'বান (৯৪৬ খ্রি এপ্রিল) মাসে সামা রায় উপনীত হলেন। এ সংবাদ পেয়ে মুইজ্জুদ্দৌলা খলীফা মূতি' বিল্লাহসহ বাগদাদ থেকে সেদিকে অগ্রসর হলেন। যুদ্ধে মুইজ্জুদ্দৌলা পরাস্ত হয়ে বাগদাদে ফিরে আসেন।

মুইজ্জুদ্দৌলা মুতী' বিল্লাহ্সহ পশ্চিম বাগদাদে এসে ওঠেন, পূর্ব বাগদাদে নাসিরুদ্দৌলা এসে অবস্থান নিলেন। উভয়পক্ষে যুদ্ধ চলতে লাগলো। অবশেষে উভয়পক্ষে সন্ধি হলো। মুইজ্জুদ্দৌলা নাসিরুদ্দৌলার পুত্র আবূ তাগলিবের সাথে তাঁর পৌত্রীর বিয়ে দিয়ে দেন। নাসিরুদ্দৌলা মুসেলে ফিরে যান। ৩৩৫ হিজরীতে (৯৪৬-৪৭ খ্রি) আবুল কাসিম বুরায়দী বসরায় মুইজ্জুদ্দৌলার বিরুদ্ধে পতাকা উত্তোলন করে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন। ৩৩৬ হিজরীতে (৯৪৭ খ্রি) মুইজ্জুদ্দৌলা খলীফা মুতীকে সাথে নিয়ে বসরা আক্রমণ করেন। আবুল কাসিমের বাহিনী পরাস্ত হয়। আবুল কাসিম পলায়ন করে বাহরায়নে কারামিতাদের কাছে চলে

যান। মুইজ্জুদ্দৌলা বসরা দখল করে আবূ জা'ফর সুহায়রীকে সেখানে রেখে খলীফাকে নিয়ে বাগদাদে চলে আসেন। ৩৩৭ হিজরীতে (৯৪৮-৪৯ খ্রি) মুইজ্জুদ্দৌলা মুসেলের ওয়ালী নাসিরুদ্দৌলার উপর আক্রমণ চালান। মুকাবিলা করতে না পেরে নাসিরুদ্দৌলা নাসিরায়ন চলে যান। এ সময় মুইজ্জুদ্দৌলার ভাই রুকনুদ্দৌলা সংবাদ পাঠান যে, খুরাসানের সৈন্যবাহিনী জুরজান ও রে আক্রমণ করে বসেছে। যথাসম্ভব শীঘ্র সাহায্যকারী বাহিনী পাঠাও। মুইজ্জুদ্দৌলা তৎক্ষণাৎ নাসিরুদ্দৌলার সাথে সন্ধি করে মুসেল থেকে বাগদাদ অভিমুখে রওয়ানা হয়ে পড়েন। নাসিরুদ্দৌলা মুসেলে ফিরে আসেন।

নাসিরুদ্দৌলার সাথে সন্ধির শর্ত ছিল এই যে, তিনি যথারীতি খারাজ বা রাজস্ব প্রেরণ করবেন এবং খুতবায় মুইজ্জুদ্দৌলা, রুকনুদ্দৌলা ও ইমাদুদ্দৌলা ভ্রাতৃত্রয়ের নাম উচ্চারণ করবেন। ৩৩৮ হিজরীতে (৯৪৯-৫০ খ্রি) মুইজ্জুদ্দৌলা খলীফা মুতীকে দিয়ে এ মর্মে ফরমান লিখিয়ে নেন যে, আলী ইব্‌ন বুওয়াইয়া ওরফে ইমাদুদ্দৌলা আপন সহোদর মুইজ্জুদ্দৌলার সাথে তাঁর সহকারী রূপে কাজ করবেন। কিন্তু ইমাদুদ্দৌলা এ বছরই মারা গেলে তার স্থলে তাঁর অপর সহোদর রুকনুদ্দৌলাকে মুইজ্জুদ্দৌলার সহকারীরূপে মনোনীত করা হয়। ৩৩৯ হিজরীতে (৯৫০-৫১ খ্রি) হাজরে আসওয়াদ খানাকা'বার নির্ধারিত স্থানে পুনঃসংস্থাপিত হয়। তার চতুষ্পার্শ্বে তিন হাজার সাতশ সাতাত্তর দিরহাম ওজনের স্বর্ণের একটি বৃত্ত লাগানো হয়।

৩৪১ হিজরীতে (৯৫২-৫৩ খ্রি) এমন একটি দলের উদ্ভব হয় যারা পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাসী ছিল। এক ব্যক্তি দাবি করে বসলো যে, হযরত আলী কারামুল্লাহ্ ওয়াজহাহুর আত্মা তার মধ্যে পুনরাবির্ভূত হয়েছে। তার স্ত্রীর দাবি ছিল যে, হযরত ফাতিমা (রা)-এর আত্মা তার দেহে ভর করে পুনরাবির্ভূত হয়েছে। অপর এক ব্যক্তি দাবি করলো যে, আমার মধ্যে জিবরাঈলের রূহ্ বিদ্যমান। এদের এ সব দাবির কথা শুনে লোকজন তাদেরকে প্রহার করে কিন্তু মুইজ্জুদ্দৌলা নিজে শিয়া হওয়ার দরুন লোকদেরকে তাদেরকে ক্লেশ দিতে বিরত রেখে তাদের প্রতি উল্টো সম্মান করার নির্দেশ জারি করেন। কেননা তাদের সকলেই নিজেদেরকে আহলে বায়তভুক্ত বলে প্রচার করতো। ৩৪৬ হিজরীতে (৯৫৭-৫৮ খ্রি) রে এবং তার আশেপাশের এলাকায় প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয়। গোটা তালেকান ধসে যায়। সেখানকার মাত্র ত্রিশ ব্যক্তি বেঁচে ছিল। অবশিষ্ট সকলেই নিহত হয়। রে-এর পার্শ্ববর্তী ত্রিশটি গ্রাম ভূমিধসে তলিয়ে যায়।

হুলওয়ান শহরের অধিকাংশ ভূমিধসে বিলীন হয়ে যায়। ৩৪৭ হিজরীতে (এপ্রিল ৯৫৭-মার্চ ৫৮ খ্রি) পুনরায় অনুরূপ ভূমিকম্প হয়। এ বছরই মুইজ্জুদ্দৌলা নাসিরুদ্দৌলার মুসেল থেকে খারাজ প্রেরণে বিলম্ব হওয়ার দরুন মুসেল আক্রমণ করেন। ৩৪৭ হিজরীর জুমাদাল আউয়াল মাসে (আগস্ট ৯৫৮ খ্রি) তিনি মুসেল অধিকার করেন। নাসিরুদ্দৌলা নাসিরায়ন চলে যান। মুইজ্জুদ্দৌলা তার প্রধান হাজিব সবুক্তগীনকে মুসেলে রেখে নিজে নাসিরায়ন অভিমুখে রওয়ানা হয়ে পড়েন। নাসিরুদ্দৌলা সেখান থেকে তাঁর ভাই সাইফুদ্দৌলার কাছে আলেপ্পোতে চলে যান। সাইফুদ্দৌলা চিঠিপত্র লিখে মুইজ্জুদ্দৌলার সাথে সন্ধি স্থাপনের প্রয়াস পান। ৩৪৮ হিজরীর মুহাররম (মার্চ-এপ্রিল ৯৫৯ খ্রি) মাসে এ চুক্তিপত্র লিখিত হয় এবং মুইজ্জুদ্দৌলা ইরাকের দিকে ফিরে আসেন। ৩৫০ হিজরীতে (৯৬১ খ্রি) মুইজ্জুদ্দৌলা বাগদাদে একটি বিশাল প্রাসাদ নিজের জন্যে নির্মাণ করান যার ভিত্তি ছত্রিশ গজ গভীর পর্যন্ত প্রোথিত ছিল। এ বছরই রোমানরা আফ্রীতাস ও ক্রীটদ্বীপ মুসলমানদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়। এ দ্বীপটি ২৩০ হিজরী (সেপ্টেম্বর ৮৪৪-আগস্ট ৮৪৫ খ্রি) থেকে মুসলিম অধিকারেই ছিল।

মুইজ্জুদ্দৌলার আরেকটি অভিশপ্ত কর্ম

৩৫১ হিজরীতে (৯৬২ খ্রি) মুইজ্জুদ্দৌলা বাগদাদের জামে মসজিদের তোরণে যে ঔদ্ধত্যপূর্ণ বাক্য উৎকীর্ণ করেন তা উদ্ধৃত করতেও গা শিউরে উঠে। কুফরের উদ্ধৃতি দিলে কেউ কাফির হয় না। এ প্রবচন অনুসারে নিম্নে তা হুবহু উদ্ধৃত করা হচ্ছে ঃ

لعن اللّٰه معاوية بن سفيان ومن غصب فاطمة فدكا
ومن منع عن دفن الحسن عند جده
ومن نفى ابا ذر ومن اخرج العباس عن الشورى

অর্থাৎ ঃ আল্লাহর অভিশাপ মুআবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ানের ওপর, আর যে ফাতিমাকে ফাদাক থেকে বঞ্চিত করেছে, আর যে ব্যক্তি হাসানকে তাঁর মাতামহের নিকট সমাহিত হতে দেয়নি, আর যে আবূ যরকে বহিষ্কার করেছে আর যে ব্যক্তি আব্বাসকে মজলিসে শূরা থেকে বহিষ্কার করেছে।

গাদীর উৎসব প্রবর্তন

মুইজ্জুদ্দৌলা ৩৫১ হিজরীর ১৮ই যিলহজ্জ (৯৬৩ খ্রি জানুয়ারী) বাগদাদে উৎসব পালনের নির্দেশ জারি করলেন আর এ উৎসবের তিনি নামকরণ করেন 'খুমে-গাদীরের ঈদ' বলে। এ উপলক্ষে ঢাকঢোল পিটানো হয় এবং আনন্দোৎসব করা হয়। এ তারিখে অর্থাৎ ১৮ই যিলহজ্জ (জানুয়ারী ৯৬৩ খ্রি) তারিখে যেহেতু হযরত উসমান (রা) শহীদ হয়েছিলেন এ জন্যেই শিয়ারা এদিনকে খুমে-গাদীরের ঈদ বা উৎসব পালনের জন্যে বেছে নেয়। আহমদ ইব্‌ন বুওয়াইয়া দায়লামী তথা মুইজ্জুদ্দৌলা কর্তৃক ৩৫১ হিজরীতে (৯৬২ খ্রি) প্রবর্তিত এ উৎসব শিয়াদের মধ্যে এমনি গুরুত্ব লাভ করে যে, আজকাল শিয়াদের আকীদা-বিশ্বাস এরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, ঈদে গাদীরের মর্যাদা ঈদুল আযহার চাইতেও বেশি।

তাযিয়াদারী প্রবর্তন

৩৫২ হিজরীর (৯৬৩ খ্রি) প্রারম্ভে বুওয়াইয়ার উক্ত পুত্রটি এ মর্মে ফরমান জারি করেন যে, দশই মুহাররম তারিখে হযরত ইমাম হুসাইনের শাহাদাতের শোক পালনার্থে দোকানপাট বন্ধ রাখতে হবে। সেদিন কোন বেচাকেনা হবে না। শহর ও গ্রামগঞ্জের সর্বত্র লোকজন মাতমের পোশাক পরিধান করবে এবং বিলাপ করবে। নারীরা নিজেদের চুল খুলে দিয়ে চেহারাকে কাল করে এবং কাপড় ছিঁড়ে ছিঁড়ে সড়ক ও বাজারসমূহে মর্সিয়া গেয়ে গেয়ে মুখ নখর দ্বারা আঁচড়িয়ে আঁচড়িয়ে ছাতি পিটাতে পিটাতে বের হবে। শিয়ারা অত্যন্ত প্রসন্ন মনে এ নির্দেশ পালন করে, কিন্তু আহলে সুন্নতপন্থীরা চাপা ক্রোধ নিয়ে গুমরে মরতে থাকে। কেননা তখন শিয়াদের রাজত্ব ছিল। পরবর্তী বছর অর্থাৎ ৩৫৩ হিজরীতে (৯৬৪ খ্রি) সে আদেশের পুনরাবৃত্তি হলে সুন্নী মহলে অসন্তোষ দেখা দেয়। প্রচুর রক্তপাতও হয়। তারপর থেকে শিয়ারা প্রতি বছর এ কুসংস্কারের পুনরাবৃত্তি করতে থাকে যা আজ পর্যন্ত আমরা উপমহাদেশেও প্রত্যক্ষ করছি। আশ্চর্যের বিষয়, উপমহাদেশে সুন্নীরাও তাযিয়ার এ কুসংস্কারে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

ওমান অধিকার ও মুইজ্জুদ্দৌলার মৃত্যু

ওমানে কারামিতাদের দখল প্রতিষ্ঠিত ছিল। এমতাবস্থায় ৩৫৫ হিজরীতে (৯৬৫ খ্রি) মুইজ্জুদ্দৌলা সমুদ্রপথে ওমান আক্রমণ করেন। উক্ত সালের ৯ই যিলহজ্জ তারিখে তিনি ওমান অধিকার করেন এবং কারামিতাদেরকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেন। হাজার হাজার কারামিতা এ সময় নিহত হয়। তাদের উননব্বুই খানা রণতরী ভস্মীভূত করে দেয়া হয়।

ওমান বিজয় সম্পন্ন করে মুইজ্জুদ্দৌলা ওয়াসিতে আসেন। এখান থেকে অসুস্থ হয়ে বাগদাদে ফিরেন। বাগদাদে তাঁর চিকিৎসার কোন ত্রুটি করা হয়নি। কিন্তু তাতে কোনই ফলোদয় হয়নি। ২২ বছর রাজত্ব করে ৩৫৬ হিজরীর রবিউল আউয়াল (ফেব্রুয়ারী ৯৬৭ খ্রি) মাসে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ইজ্জুদ্দৌলার রাজত্ব

মুইজ্জুদ্দৌলা তাঁর মৃত্যুকালে তাঁর পুত্র বখতিয়ারকে যুবরাজ মনোনীত করেন। মুইজ্জুদ্দৌলার পর তিনি ইজ্জুদ্দৌলার খেতাব খলীফার নিকট থেকে হাসিল করে রাজকার্য পরিচালনায় ব্রতী হন। দায়লামীরা এ পর্যায়ে এত বেশি শক্তিশালী হয়ে ওঠে যে, তাঁদেরকেই প্রকৃত শাসক মনে করা হতে থাকে। খলীফার নিজস্ব শক্তি বলতে তখন আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। এ পর্যায়ে তাঁরাই তাঁদের উত্তরাধিকারী মনোনীত করতেন। একদিকে খলীফা তাঁর নিজের উত্তরাধিকারী করতেন, অপরদিকে এই শাসক সুলতানগণ তাঁদের নিজ নিজ উত্তরাধিকারী মনোনীত করতেন। খলীফার হাতে রাজ্য পরিচালনার কোন ক্ষমতাই আর অবশিষ্ট ছিল না বরং তাঁরা নিজেরাই ছিলেন সুলতানদের দ্বারা শাসিত। প্রকৃত ক্ষমতা ঐ সুলতানদের হাতেই ছিল। এ জন্যে বাগদাদে এ সুলতানদের উত্তরাধিকারী মনোনয়নের ব্যাপারটি অধিক গুরুত্ববহ বলে বিবেচিত হতো। কেননা, রাজকার্য পরিচালনার সাথে তার সম্পর্ক ছিল। অন্য কথায় বলতে গেলে বাগদাদে দায়লামীদের প্রথম বাদশাহ ছিলেন মুইজ্জুদ্দৌলা। এবার দ্বিতীয় বাদশাহ্ ইজ্জুদ্দৌলা সিংহাসনে আরোহণ করলেন।

ইজ্জুদ্দৌলা আবুল ফযল আব্বাস ইব্ন হুসাইন শিরাজীকে তাঁর উযীর মনোনীত করেন। এ বছরই জাতী ইব্ন মুইজ্জুদ্দৌলা বসরায় তাঁর ভাই ইজ্জুদ্দৌলার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করেন। আবুল ফযল আব্বাস এ বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে তাকে গ্রেফতার করে ইজ্জুদ্দৌলার সম্মুখে এনে হাযির করেন। তিনি তাকে অন্তরীণাবদ্ধ করেন। ৩৬২ হিজরীতে (অক্টোবর ৯৭২—সেপ্টেম্বর ৭৩ খ্রি) ইজ্জুদ্দৌলা আবুল ফযল আব্বাসকে অপসারিত করে মুহাম্মদ ইব্ন বাকীয়াকে উযীর পদে নিযুক্ত করেন। মুহাম্মদ ইব্ন বাকীয়া ছিলেন একজন সাধারণ মানুষ। তিনি ছিলেন ইজ্জুদ্দৌলার রান্না ঘরের তত্ত্বাবধায়ক। ঐ বছরই আবূ তাগলিব ইব্ন নাসিরুদ্দৌলা ইব্ন হামদান মুসেলে তার পিতা নাসিরুদ্দৌলাকে অন্তরীণাবদ্ধ করে নিজে দেশ শাসনে ব্রতী হন। পূর্বেই বলা হয়েছে আবূ তাগলিব ইজ্জুদ্দৌলার কন্যার পাণি গ্রহণ করেছিলেন। আবূ তাগলিবের দুই ভাই ইবরাহীম ও হামদান মুসেল থেকে পালিয়ে বাগদাদে ইজ্জুদ্দৌলার কাছে চলে আসেন এবং আবূ তাগলিবের বিরুদ্ধে অনুযোগ করে তার বিরুদ্ধে ইজ্জুদ্দৌলার সাহায্য প্রার্থনা করেন। ইজ্জুদ্দৌলা তাঁর উযীর মুহাম্মদ ইব্ন বাকীয়া এবং সিপাহসালার সবুক্তগীনকে সাথে নিয়ে মুসেল আক্রমণ করেন। আবূ তাগলিব তাঁর সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে সঞ্জরে চলে যান।

ইজ্জুদ্দৌলা মুসেলে প্রবেশ করতেই আবূ তাগলিব সঞ্জর থেকে বাগদাদের উদ্দেশে বের হয়ে পড়লেন। এ খবর পেয়ে ইজ্জুদ্দৌলা ইব্ন বাকীয়া এবং সবুক্তগীনকে বাগদাদ রক্ষার উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে মুসেলে থেকে গেলেন। ইব্ন বাকীয়া আবূ তাগলিবের বাগদাদে পৌঁছবার পূর্বেই নিজে বাগদাদে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সবুক্তগীন বাগদাদের বাইরেই আবূ তাগলিবের মুকাবিলা করে তাকে প্রতিহত করতে মনস্থ করেন। এদিকে আবূ তাগলিব ও সবুক্তগীনের, ওদিকে বাগদাদে শিয়া-সুন্নী দাঙ্গা বেঁধে গেল। এ সংবাদ পেয়েই আবূ তাগলিব ও সবুক্তগীন সন্ধি করে ফেললেন এবং উভয়েই ঐকমত্যে উপনীত হলেন যে, উজ্জুদ্দৌলা ও তাবৎ শিয়াকে বেদখল করে নতুন খলীফাকে সিংহাসনে বসাতে হবে। কিন্তু পরবর্তীতে ভাবনা-চিন্তা করে তাঁরা সে ইচ্ছা থেকে বিরত থাকেন। ইব্ন বাকীয়াকে বাগদাদ থেকে ডেকে এনে সবুক্তগীন আবূ তাগলিবের সাথে সন্ধির শর্ত ঠিক করে নেন। এ শর্তানুসারে ইব্ন বাকীয়া ইজ্জুদ্দৌলাকে লিখে পাঠান যে, আপনি মুসেল থেকে বাগদাদে চলে আসুন এবং আবূ তাগলিবকে মুসেল ছেড়ে দিন।

আবূ তাগলিব মুসেল পৌঁছে আপন শ্বশুরকে আলিঙ্গন করলেন। ইজ্জুদ্দৌলা বাগদাদে ফিরে আসলেন। বাগদাদে ফিরে ইজ্জুদ্দৌলা অর্থ আদায়ের মানসে আহওয়াযে গেলেন। সেখানে তাঁর সহচর তুর্কী ও দায়লামীদের মধ্যে দাঙ্গা বেঁধে যায়। ইজ্জুদ্দৌলা তুর্কীদেরকে এ জন্যে কঠোর শাস্তি দেন। এ সংবাদ পেয়ে বাগদাদে অবস্থানরত সবুক্তগীন বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। তিনি ইজ্জুদ্দৌলার প্রাসাদ লুণ্ঠন করে তাঁর পরিবারস্থ লোকজনকে গ্রেফতার করে ওয়াসিতে পাঠিয়ে দেন। এটা ৩৬৩ হিজরীর যিলকদ (সেপ্টেম্বর ৯৭৪ খ্রি) মাসের ঘটনা।

এবার বাগদাদে সুবক্তগীনের সুন্নী রাজত্ব কায়েম হয়ে গেল। তিনি শিয়াদেরকে বাগদাদ থেকে বের করে দিলেন। তারপর খলীফা মুতীকে স্বেচ্ছায় পদত্যাগে বাধ্য করলেন। কেননা পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি শাসনকার্য পরিচালনার অযোগ্য হয়ে পড়েছিলেন। সে মতে ৩৬৩ হিজরীর যিলকদ (সেপ্টেম্বর ৯৭৪ খ্রি) মাসে খলীফা মুতী পদত্যাগ করেন এবং তাঁর পুত্র আবদুল করীমকে তায়েলিল্লাহ খেতাব দিয়ে খলীফা পদে আসীন করা হয়। খলীফা মুতী সাড়ে ছাব্বিশ বছর পর্যন্ত নামেমাত্র খলীফা ছিলেন। যখন থেকে নাসিরুদ্দৌলা ইব্ন হামদান মুসেল প্রদেশ অধিকার করেন তখন থেকেই রোমানদের আগ্রাসন প্রতিরোধ বা তাদের উপর হামলা চালানোর দায়িত্ব তাঁর উপরই বর্তাতে থাকে। আবার যখন ৩৬৩ হিজরীতে (অক্টোবর ৯৭৩-সেপ্টেম্বর ৯৭৪ খ্রি) নাসিরুদ্দৌলার ভাই সাইফুদ্দৌলা ইব্ন হামদান আলেপ্পো ও হিম্স অধিকার করে নেন তখন রোমানদের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহের এ দায়-দায়িত্ব তাঁর উপরই বর্তাতে থাকে। সাইফুদ্দৌলা অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে এ দায়িত্ব পালন করেন। তিনি রোমানদের হামলা প্রতিরোধ করেন এবং তাদের সমুচিত জবাব দেন।

৩৬৩ হিজরীতে (অক্টোবর ৯৭৩-সেপ্টেম্বর '৭৪ খ্রি) ইজ্জুদ্দৌলা খলীফা মুতী লিল্লাহ্‌র নাম খুতবা থেকে বাদ দিয়ে দেন। খলীফা তাতে ইজ্জুদ্দৌলার প্রতি গভীর অসন্তোষ প্রকাশ করেন। ইজ্জুদ্দৌলা তাতে অসন্তুষ্ট হয়ে খলীফার বেতন-ভাতা বন্ধ করে দেন। অগত্যা খলীফাকে আপন গৃহসামগ্রী বিক্রি করে নিজ ব্যয় নির্বাহ করতে হয়। পদচ্যুত হওয়ার পর মুতী লিল্লাহর

খেতাব হয় শায়খুল ফাযিল। মুতী ৩৬২ হিজরীর মুহাররম (৯৭২ খ্রি-এর অক্টোবর) মাসে ওয়াসিতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। আবূ বকর শিবলী (র) আবূ নসর ফরাবী ও কবি মুতানব্বী এ খলীফার আমলেই ইন্তিকাল করেন।

তায়ে' লিল্লাহ

আবূ বকর আবদুল করীম তায়ে' লিল্লাহ্ ইব্ন মুতী' লিল্লাহ্ হাযারা নাম্নী এক দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। খলীফা মুতী সরে দাঁড়ানোর পর পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে ৩৬৩ হিজরীর যুলকাদা (সেপ্টেম্বর ৯৭৪ খ্রি) মাসের তেইশ তারিখে বুধবারে তিনি খলীফা পদে আসীন হন। সবুক্তগীনকে নসরুদ্দৌলা খেতাব ও পতাকা দিয়ে ইজ্জুদ্দৌলার স্থলে নায়েবে সালতানাত ও সুলতান পদে আসীন করেন। এ বছরই মক্কা ও মদীনায় মাগরিবের শাসক মুইজ্জু উবায়দীর নাম খুতবায় উচ্চারিত হতে থাকে। উপরেই বর্ণিত হয়েছে যে,খলীফা মুতী' যখন খিলাফত থেকে সরে দাঁড়ান তখন বাগদাদে সবুক্তগীনের রাজত্ব চলছিল। ইজ্জুদ্দৌলা ইব্ন মুইজ্জুদ্দৌলা তখন আহওয়াযে ছিলেন। এ খবর পেয়ে ইজ্জুদ্দৌলার মায়ের সাথে সাক্ষাত মানসে ওয়াসিতে আসেন এবং আপন চাচা হাসান ইব্ন বুওয়াইয়াকে যিনি রুকনুদ্দৌলা খেতাব নিয়ে পারস্য শাসন করছিলেন– সবুক্তগীন তুর্কীদের বিরুদ্ধে সাহায্য পাঠানোর জন্যে পত্র লিখলেন।

রুকনুদ্দৌলা তাঁর উযীর আবুল ফাতাহ্ ইব্ন হুমায়দকে একটি বাহিনী দিয়ে আপন পুত্র আদুদুদ্দৌলার কাছে আহওয়াযে পাঠালেন। তিনি আদুদুদ্দৌলাকেও এ মর্মে পত্র লিখলেন যে, তুমিও সৈন্যবাহিনী নিয়ে আবুল ফাতাহ্র সাথে মিলিত হয়ে আপন চাচাত ভাই ইজ্জুদ্দৌলার সাহায্যার্থে এগিয়ে যাও।

এদিকে সবুক্তগীন খলীফা তায়ে' লিল্লাহ্ এবং তাঁর পিতা মুতী' উভয়কে সাথে নিয়ে তুর্কী বাহিনীসহ ওয়াসিতের দিকে যাত্রা করলেন। মুসেলের শাসক আবূ তাগলিব এ সংবাদ পেয়ে মুসেল থেকে রওয়ানা হয়ে বাগদাদ দখল করে ফেললেন। ওয়াসিতের নিকট পৌঁছেই সবুক্তগীন ও মুতী' উভয়েই মৃত্যুমুখে পতিত হন। তুর্কীরা উফতিগীনকে নিজেদের সর্দাররূপে বরণ করে নিয়ে ওয়াসিত অবরোধ করে ফেলে। উফতিগীন ছিলেন মুইজ্জুদ্দৌলার আযাদকৃত তুর্কী গোলাম। উফতিগীন দীর্ঘ পঞ্চাশ দিন পর্যন্ত অবরোধ অব্যাহত রাখেন।

আদুদুদ্দৌলা তাঁর পিতাসহ উযীর আবুল ফাতাহ্ ইব্ন হুমায়দকে সাথে নিয়ে ওয়াসিত পৌঁছলেন। আদুদুদ্দৌলা নিকটে এসে গেছেন এ সংবাদ পেয়ে উফতিগীন ওয়াসিত থেকে অবরোধ তুলে নিয়ে বাগদাদ অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেলেন। উফতিগীন নিকটে এসে পৌঁছে গেছেন খবর পেয়ে আবূ তাগলিব বাগদাদ ত্যাগ করে মুসেলের দিকে অগ্রসর হলেন। ইজ্জুদ্দৌলা ও সাইফুদ্দৌলা উভয়ে মিলে কয়েকদিন ওয়াসিতে অবস্থান করলেন। তারপর উভয় ভাই মিলে বাগদাদ অবরোধ করে চতুর্দিক থেকে রসদ আসার পথ বন্ধ করে দিলেন। শহরবাসীদের ভীষণ কষ্ট হতে লাগলো। তুর্কীরা উফতিগীনের ঘর লুট করে আত্মকলহে লিপ্ত হলো। অবশেষে উফতিগীন খলীফা তায়ে' লিল্লাহকে সাথে করে অবরোধ ভেঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন এবং তিক্রীতে গিয়ে উঠলেন।

৩৬৪ হিজরীর জুমাদাল আউয়াল (জানুয়ারী ৯৭৫ খ্রি) মাসে আদুদুদ্দৌলা ও ইজ্জুদ্দৌলা বাগদাদে প্রবেশ করলেন। আদুদুদ্দৌলা তুর্কীদের সাথে পত্র যোগাযোগ করে ৩৬৪ হিজরীর

রজব (মার্চ ৯৭৫ খ্রি) মাসে খলীফা তায়ে' লিল্লাহকে বাগদাদে ফিরিয়ে আনলেন এবং খলীফার প্রাসাদে তাঁকে রেখে তাঁর হাতে বায়আত হলেন। ইজ্জুদ্দৌলাকে অন্তরীণাবদ্ধ করে তিনি নিজে রাজত্ব করতে লাগলেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন বাকীয়াকে তিনি ওয়াসিতের শাসনভার অর্পণ করে সেখানে পাঠিয়ে দিলেন। ইজ্জুদ্দৌলার পুত্র যাবান বসরায় রাজত্ব করছিলেন। তিনি তাঁর পিতা ইজ্জুদ্দৌলাকে গ্রেফতার করে কারাগারে নিক্ষেপের বিবরণ লিখে রুকনুদ্দৌলার কাছে আদুদুদ্দৌলার বিরুদ্ধে অনুযোগ করলেন। রুকনুদ্দৌলা তা জানতে পেরে অত্যন্ত বিমর্ষ হলেন এবং আদুদুদ্দৌলাকে কঠোর ভর্ৎসনা করে পত্র লিখলেন। জবাবে আদুদুদ্দৌলা রুকনুদ্দৌলাকে লিখলেন ঃ

> "ইজ্জুদ্দৌলার রাজ্য পরিচালনার মত যোগ্যতা ও শক্তি ছিল না। আমি হস্তক্ষেপ না করলে বাগদাদের রাজত্ব বুওয়াইয়া বংশের হাতছাড়া হয়ে যেত। আমি ইরাক প্রদেশের খারাজ স্বরূপ বার্ষিক ত্রিশ লাখ দিরহাম প্রদানের অঙ্গীকার করছি। আপনি যদি ইরাকের দায়িত্ব নিজ হাতে তুলে নিতে চান তা হলে চলে আসুন। আমি ফারিস প্রদেশে চলে যাব।"

এ পত্র দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ইরাক ও বাগদাদ দায়লামী রাজত্বের অধীন ছিল। আর ঐ আমলে দায়লামীদের সবচাইতে বড় শাসক ছিলেন রুকনুদ্দৌলা। বাগদাদের খলীফা ইরাকের গভর্নরের অধীনে ও তত্ত্বাবধানে বাগদাদে কয়েদীদের মত থাকতেন। অবশেষে রুকনুদ্দৌলার আদেশানুসারে আদুদুদ্দৌলা ইজ্জুদ্দৌলাকে কারামুক্ত করে ইরাকের শাসনভার তাঁর হাতে অর্পণ করে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন যে, ইরাকে খুতবায় আদুদুদ্দৌলার নাম উচ্চারণ করা হবে এবং ইজ্জুদ্দৌলা নিজেকে আদুদুদ্দৌলার নায়েব রূপেই গণ্য করবেন। আবুল ফাতাহকে ইজ্জুদ্দৌলার কাছে রেখে তিনি নিজে পারস্যের দিকে চলে গেলেন।

উফতিগীন এ সব ঘটনার পর দামেশকে চলে গেলেন এবং সেখান থেকে মুইজ্জু উবায়দীর আমলেকে বহিষ্কার করে নিজে দামেশকের সর্বময় কর্তা বনে বসেন। দামেশকবাসীরা উফতিগীনকে নিজেদের শাসকরূপে পেয়ে আনন্দিত হলো। কেননা, শিয়া রাফিযীরা সেখানে বলপূর্বক নিজেদের আকীদা-বিশ্বাস লোকদের উপর চাপিয়ে দিয়ে তাদেরকে অতিষ্ঠ করে রেখেছিল। উফতিগীনের উপস্থিতিতে তারা সে আপদ থেকে রক্ষা পায়। উফতিগীন উবায়দী সুলতানের নামের স্থলে খলীফা তায়ের নাম খুতবায় প্রবর্তন করলেন। এটা ৩৬৪ হিজরীর শাবান (৯৭৫ খ্রি মে) মাসের কথা।

আদুদুদ্দৌলা

৩৬২ হিজরীতে (অক্টোবর ৯৭২-সেপ্টেম্বর '৭৩ খ্রি) রুকনুদ্দৌলার মৃত্যু হয়। আদুদুদ্দৌলা পিতার স্থলাভিষিক্ত হলেন। ইজ্জুদ্দৌলা আদুদুদ্দৌলার বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণে প্রয়াসী হন। আদুদুদ্দৌলা তার মতি-গতি টের পেয়ে বাগদাদ আক্রমণ করলেন। বাগদাদ অধিকার করে তিনি বসরাও দখল করলেন। এটা ৩৬৬ হিজরীর (৯৭৭ খ্রি-এর জুলাই) শেষ দিকের ঘটনা।

আদুদুদ্দৌলা তাঁর পিতার উযীর আবুল ফাতাহকে গ্রেফতার করেন ও অন্ধ করে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। কেননা তিনি ইজ্জুদ্দৌলার সমর্থক হয়ে গিয়েছিলেন। এ দিকে ইজ্জুদ্দৌলা আপন উযীর উসায়দ আদুদুদ্দৌলার সমর্থক হয়ে গিয়েছিলেন বলে অন্ধকারে মুসেল ও শাম

অভিমুখে চলে যান। সেখানে মুসেলের ওয়ালী আবূ তাগলিবের সমর্থন ও সহানুভূতি আকর্ষণ করে বাগদাদ আক্রমণ করেন। আদুদুদ্দৌলা ইজ্জুদ্দৌলাকে যুদ্ধে পরাস্ত করে গ্রেফতার করে হত্যা করে ফেলেন। তারপর আবূ তাগলিবকে সমুচিত শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে মুসেল ও জাযিরা অধিকার করেন। আবূ তাগলিব রাজ্যহারা হয়ে রোম সম্রাটের কাছে চলে যান। রোম সম্রাট তাঁর কন্যাকে আবূ তাগলিবের সাথে বিয়ে দেন। মোটকথা, মুসেল কিছুদিনের জন্যে বনূ হামদানের হাতছাড়া হয়ে যায়। সাড়ে পাঁচ বছর রাজত্ব করার পর ৩৭২ হিজরীতে (৯৮২-৮৩ খ্রি) আদুদুদ্দৌলার মৃত্যু হয়। অমাত্যবর্গ তাঁর পুত্র কায়জারকে সামসামুদ্দৌলা খেতাবে ভূষিত করে আদুদুদ্দৌলার স্থলাভিষিক্ত করে। খলীফা তায়ে লিল্লাহ্ও এ উপলক্ষে শোকজ্ঞাপন ও মুবারকবাদ জানানোর উদ্দেশ্যে সামসামুদ্দৌলার কাছে আসেন।

সামসামুদ্দৌলা

সামসামুদ্দৌলারা কয়েক ভাই ছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন শারফুদ্দৌলা। তিনি সামসামুদ্দৌলার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে পারস্য অধিকার করে নেন। ৩৭৫ হিজরীতে (৯৮৫-৮৬ খ্রি) শারফুদ্দৌলা বাগদাদ আক্রমণ করেন। ৩৭৬ হিজরীর রমযান (জানুয়ারী ৯৮৭ খ্রি) মাসে শারফুদ্দৌলা সামসামুদ্দৌলাকে গ্রেফতার করে বাগদাদ অধিকার করেন। খলীফা তায়ে লিল্লাহ্ সাম্রাজ্যের জন্যে শারফুদ্দৌলাকে অভিনন্দিত করেন। সামসামুদ্দৌলাকে পারস্যে পাঠিয়ে দেয়া হয়। সেখানে পৌঁছবার পর তাঁকে মুক্ত করে দেয়া হয়।

শারফুদ্দৌলা

শারফুদ্দৌলার বাগদাদ তথা ইরাক দখলের সময় মুসেলে দারুণ গোলযোগ চলছিল। বনূ হামদান সায়ফুদ্দৌলার পর তাঁর পুত্র সাদুদ্দৌলা আলেপ্পো প্রভৃতি স্থানে রাজত্ব চালিয়ে যাচ্ছিলেন। শারফুদ্দৌলা ইব্ন আদুদুদ্দৌলা দুই বছর আট মাসকাল রাজত্ব করার পর ৩৭৯ হিজরীতে (এপ্রিল ৯৮৯-মার্চ ৯৯০ খ্রি) শোথদরী রোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তিকাল করেন। শারফুদ্দৌলার ইনতিকালের পর তাঁর পুত্র বাহাউদ্দৌলা তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

বাহাউদ্দৌলা

বাহাউদ্দৌলাকে খলীফা তায়ে লিল্লাহ্ যথারীতি খেলাত প্রদান করেন এবং মুবারকবাদ প্রদানের জন্য স্বয়ং আগমন করেন। বাহাউদ্দৌলা নাসিরুদ্দৌলার পুত্রদ্বয় ইবরাহীম ও হুসাইনকে মুসেলের শাসনভার অর্পণ করে আমিলরূপে সেখানে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু এর অব্যবহিত পরেই তিনি এ জন্যে অনুতপ্ত হয়ে মুসেলের সাবেক আমীরকে লিখে পাঠালেন যে, কোন মতেই এদের কাছে যেন ক্ষমতা হস্তান্তর না করা হয়। কিন্তু ইবরাহীম ও হুসাইন বলপূর্বক মুসেল অধিকার করে নিলেন। ৩৮০ হিজরীতে (এপ্রিল ৯৯০-মার্চ ৯১ খ্রি) বাহাউদ্দৌলা তার ভ্রাতুষ্পুত্র আবূ আলী ইব্ন শারফুদ্দৌলাকে পারস্য থেকে ধোঁকা দিয়ে ডেকে এনে হত্যা করলেন। আবূ আলী তখন পারস্যে রাজত্ব করছিলেন। তাঁকে হত্যার পর পারস্যের সম্পদ-সম্ভার দখলের উদ্দেশ্যে বাহাউদ্দৌলা পারস্য অভিমুখে যাত্রা করলেন। সেখানে পৌঁছে তিনি পারস্য অধিকার করেন। পারস্যে অবস্থানরত সামসামুদ্দৌলা তখন তাঁর সমর্থকদেরকে

সংগঠিত করে দেশ দখল করতে শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি এমন দাঁড়ালো যে, বাহাউদ্দৌলাকে স্বেচ্ছায় পারস্য সামসামুদ্দৌলার হাতে ছেড়ে দিয়ে চুক্তিবদ্ধ হতে হলো। এ চুক্তিপত্র সম্পাদন করে বাহাউদ্দৌলা বাগদাদে ফিরে আসলেন। যখন তিনি এখানে এসে পদার্পণ করেন তখন বাগদাদে শিয়া-সুন্নী দাঙ্গা চলছিল।

বাহাউদ্দৌলা উভয় পক্ষের মধ্যে আপোস-রফা করিয়ে দেন। ফলে উভয়পক্ষই শান্ত হয়ে যায়। ৩৮১ হিজরীর রমযান (নভেম্বর ৯৯১ খ্রি) মাসে খলীফা তায়ে' লিল্লাহ্ আম-দরবার অনুষ্ঠান করেন। বাহাউদ্দৌলা সিংহাসনের পাশে একটি চেয়ারে উপবিষ্ট ছিলেন। অমাত্যবর্গ এসে একে একে খলীফার হস্তচুম্বন করে নিজ নিজ আসনে গিয়ে আসন গ্রহণ করছিলেন। এ সময় একজন দায়লামী সর্দার এসে দরবারে প্রবেশ করলো। সে হস্ত চুম্বনের ছলে খলীফার হাত ধরে টেনে তাঁকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে নিচে ফেলে বেঁধে ফেললেন। তারপর খলীফার দরবার ও প্রাসাদে লুটপাট চললো। বাহাউদ্দৌলা নিজ ঘরে চলে গেলেন। দায়লামীরা খলীফাকে অপদস্থ ও বিড়ম্বিত করে টেনেহেঁচড়ে বাহাউদ্দৌলার সম্মুখে হাযির করলো। বাহাউদ্দৌলা অসহায় খলীফাকে পদত্যাগে বাধ্য করলেন এবং আবুল আব্বাস আহমদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন মুকতাদিরকে ডেকে এনে কাদির বিল্লাহ উপাধি দিয়ে খলীফার আসনে বসালেন। তায়ে লিল্লাহকে খলীফা প্রাসাদের একাংশে অন্তরীণাবদ্ধ করে রাখা হলো এবং তাঁর জীবিকা প্রদানের ব্যবস্থা করা হলো। ৩৯২ হিজরী (১০০২ খ্রি) পর্যন্ত এ অবস্থায় জীবন ধারণ করে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

কাদির বিল্লাহ্

আবুল আব্বাস আহমদ কাদির বিল্লাহ্ ইব্‌ন মুকতাদির ৩৩৬ হিরজীতে (৯৪৭-৪৮ খ্রি) তামান্না নাম্নী এক দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ৩৮১ হিজরীর ১২ই রমযান (ডিসেম্বর ৯৯১ খ্রি) তিনি খলীফা পদে আসীন হন। তিনি অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ রাজনীতিক ছিলেন। তাহাজ্জুদের নামায কখনো কাযা করেননি। অত্যন্ত উঁচুদরের ফকীহ ও ধর্মতত্ত্ববিদ ছিলেন। সিংহাসনে আরোহণের অল্প কয়েকদিন পরেই ৩৮১ হিজরীর শাওয়াল (জানুয়ারী ৯৯২ খ্রি) মাসে তিনি একটি দরবার অনুষ্ঠান করেন তাতে বাহাউদ্দৌলা ও খলীফা কাদির বিল্লাহ পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার অঙ্গীকার করেন। কাদির বিল্লাহ খলীফা তায়ে লিল্লাহ্‌র আমলে খিলাফতের যে অবমাননা করা হয়েছে তার মাত্রা কমিয়ে আনতে এবং খলীফার মর্যাদা পুনরুদ্ধারের আপ্রাণ চেষ্টা করেন। কিন্তু দায়লামীদের প্রভাব-প্রতিপত্তি এতই বেড়ে গিয়েছিল এবং খলীফার মর্যাদা এতই কমে গিয়েছিল যে, কাদির বিল্লাহ্ তাতে তেমন পরিবর্তন সাধনে সক্ষম হননি। তা সত্ত্বেও তায়ে লিল্লাহ্‌র তুলনায় তিনি নিজের মর্যাদা অনেকাংশে বাড়াতে সমর্থ হয়েছিলেন।

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, ৩৮০ হিজরীতে (এপ্রিল ৯৯০-মার্চ ৯১ খ্রি) সামসামুদ্দৌলা এবং বাহাউদ্দৌলার মধ্যে এ মর্মে চুক্তি হয় যে, পারস্যে সামসামুদ্দৌলার এবং ইরাকে বাহাউদ্দৌলার রাজত্ব থাকবে। কিন্তু ৩৮৩ হিজরীতে (৯৯৩ খ্রি) বাহাউদ্দৌলা পারস্য থেকে সামসামুদ্দৌলাকে উৎখাত করে নিজের দখল প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। সামসামুদ্দৌলা সে বাহিনীকে পরাস্ত করে তাড়িয়ে দেন। ৩৮৪ হিজরীতে (৯৯৪ খ্রি) বাহাউদ্দৌলা তুর্কী সেনাপতিদের অধীনে একটি বিশাল বাহিনী পারস্য অভিমুখে পাঠান। সামসামুদ্দৌলার সাথে

উপর্যুপরি বেশ কয়েকটি যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধের ধারা ৩৮৮ হিজরী (৯৯৮ খ্রি) পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। জয় পরাজয় পালাক্রমে উভয় পক্ষেরই হতে থাকে। অবশেষে ৩৮৮ হিজরীর যিলহজ্জ (৯৯৮ খ্রি) মাসে নয় বছর পারস্যে রাজত্ব করার পর সামসামুদ্দৌলা বন্দী ও নিহত হন। পারস্য বাহাউদ্দৌলার দখলে আসে। ৩৮৯ হিজরীতে (৯৯৯ খ্রি) বাহাউদ্দৌলা স্বয়ং পারস্যে যান। এ সময় আবূ জা'ফর হাজ্জাজ ইব্ন হরমুজকে তিনি ইরাক শাসনের জন্য বাগদাদে রেখে যান। খলীফা কাদির বিল্লাহ্ আবূ জা'ফরকে আমীদুদ্দৌলা খেতাব দান করেন। এ বছরই অর্থাৎ ৩৮৯ হিজরীতে (৯৯৯ খ্রি) গোটা মাওরাউন নাহর সামানী শাসন থেকে মুক্ত হয় এবং এ বংশের শাসনের অবসান ঘটে। ইতিপূর্বে ৩৮৪ হিজরীতে (৯৯৪ খ্রি) খুরাসান তাদের দখল থেকে মুক্ত হয়েছিল। সামানীয়দের অর্ধেক রাজ্য সবুক্তগীন বংশের এবং অবশিষ্ট অর্ধেক তুর্কীদের দখলে চলে যায়। এর বিশদ বিবরণ পরে দেয়া হবে। কয়েকদিন পূর্বেই বাগদাদে শিয়া-সুন্নী দাঙ্গা বাধে। বাহাউদ্দৌলা পারস্য থেকে এ সংবাদ অবহিত হয়ে আমীদুদ্দৌলাকে বাগদাদ তথা ইরাকের শাসনক্ষমতা থেকে অপসারিত করে ৩৯০ হিজরীতে (৯৯৯ খ্রি) আবূ আলী হাসান ইব্ন হরমুজকে শাসনক্ষমতা অর্পণ করে 'আমীদুল জুয়ূশ' খেতাবে ভূষিত করেন। আমীদুল জুয়ূশ শিয়া-সুন্নী দাঙ্গার অবসান ঘটিয়ে শাসন-শৃঙ্খলা সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। ৩৯১ হিজরীতে (১০০০ খ্রি) আমীদুল জুয়ূশকে ক্ষমতাচ্যুত করে আবূ নসর ইব্ন সাবূযকে ইরাক ও বাগদাদের শাসনভার অর্পণ করা হয়। শিয়া-সুন্নী দ্বন্দ্ব পুনরায় দেখা দেয়। তবে কয়েকদিন পরে তা বন্ধও হয়।

৩৯৭ হিজরীতে (১০০৬ খ্রি) বাহাউদ্দৌলার ইন্তিকাল হলে তাঁর পুত্র সুলতানুদ্দৌলা তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। খলীফা কাদির বিল্লাহ্ তাঁকে সুলতানুদ্দৌলা খেতাব প্রদান করেন।

সুলতানুদ্দৌলা

সুলতানুদ্দৌলা আপন পিতা বাহাউদ্দৌলার মৃত্যুর পর পিতার স্থলাভিষিক্ত হয়েই আপন ভাই আবুল ফাওয়ারিসকে কিরমানের শাসনভার অর্পণ করেন। কিরমানে অনেক দায়লামী আবুল ফাওয়ারিসের চতুষ্পার্শ্বে জমায়েত হয়ে তাঁকে তাঁর ভাই সুলতানুদ্দৌলার হাত থেকে রাজ্য কেড়ে নেয়ার জন্যে প্ররোচিত করে। আবুল ফাওয়ারিস সত্যি সত্যি কিরমান থেকে সসৈন্যে এসে শিরাজ আক্রমণ করেন। এদিক থেকে সুলতানুদ্দৌলা মুকাবিলার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হন। তুমুল যুদ্ধের পর আবুল ফাওয়ারিস পরাস্ত হন। সুলতানুদ্দৌলা তার পশ্চাদ্ধাবন করে কিরমান পর্যন্ত অগ্রসর হন। ফলে আবুল ফাওয়ারিস কিরমানেও টিকতে পারলেন না। তিনি গযনীতে সুলতান মাহমূদের দরবারে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। সুলতান মাহমূদ তাঁকে সান্ত্বনা দেন এবং আপন একজন সেনাপতি আবূ সাঈদ তাযীকে সৈন্যদল সাথে দিয়ে আবুল ফাওয়ারিসের সাহায্যার্থে প্রেরণ করেন। আবুল ফাওয়ারিস এদেরকে সাথে নিয়ে পুনরায় পারস্য আক্রমণ করেন। কিন্তু এবারও সুলতানুদ্দৌলা তাঁকে পরাস্ত করে তাড়িয়ে দেন। এবার পরাস্ত হয়ে আবুল ফাওয়ারিস আর সুলতান মাহমূদের ওখানে গিয়ে উঠলেন না। কারণ সেনাপতি আবূ সাঈদ তাযীর সাথে তিনি ভাল আচরণ করেননি। এ জন্যে পরাজিত হওয়ার পর তিনি বুতায়হার শাসনকর্তা মুহায্যাবুদ্দৌলার কাছে চলে গেলেন। তারপর পত্র যোগাযোগের মাধ্যমে সুলতানুদ্দৌলার ক্ষমা লাভ করে পুনরায় কিরমান শাসনের অধিকার প্রাপ্ত হন।

তুর্কীদের বিদ্রোহ

চীন ও মাওরাউন নাহরের মধ্যবর্তী একটি উপত্যকা থেকে খাতা রাজ্যে বসবাসকারী তুর্কী গোত্রসমূহ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং তুর্কিস্তানের ওয়ালী তাগাখানের এলাকায় লুটপাট ও খুন-খারাবীতে লিপ্ত হয়। তাগাখান বিভিন্ন ইসলামী রাজ্য থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে এক লক্ষ বিশ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে তাদের মুকাবিলা ও পশ্চাদ্ধাবন করতে শুরু করেন। নিজের এলাকা থেকে তাদেরকে তাড়িয়ে দিয়ে সংকীর্ণ ও দুর্গম গিরিপথ দিয়ে তিনমাস পথ অতিক্রম করে তাদের নাগাল পেতে সক্ষম হন। যুদ্ধে তাদের দুইলক্ষ লোককে হত্যা করে তিনি ফিরে আসেন। এভাবে তুর্কী তথা মোগলদের সমুচিত শিক্ষালাভ হয়। এ ঘটনাটি ৪০৮ হিজরীতে (১০১৭ খ্রি) সংঘটিত হয়।

সুলতানুদ্দৌলা আপন ভাই মুশরিফুদ্দৌলাকে ইরাকের গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন। মুশরিফুদ্দৌলা ইরাকে সুলতানুদ্দৌলার স্থলে নিজের নামে খুতবা চালু করেন। তিনি সুলতানুদ্দৌলাকে পদচ্যুত করেন। এটা ৪১১ হিজরীর (১০২০ খ্রি) ঘটনা।

মুশরিফুদ্দৌলা

ইরাকে অবস্থিত দায়লামী সর্দারদের সকলেই যখন মুশরিফুদ্দৌলাকে শাসক রূপে বরণ করে নেন, তখন সুলতানুদ্দৌলা তাঁর পুত্র আবূ কালীজারকে সৈন্যবাহিনী দিয়ে প্রেরণ করেন। আবূ কালীজার আহওয়ায অধিকার করেন। কয়েকটি লড়াইয়ের পর ৪১২ হিজরী (১০২১ খ্রি)তে কূফায় শিয়া-সুন্নীদের মধ্যে তীব্র দাঙ্গা দেখা দেয়। শাসনক্ষমতা যাদের করতলগত ছিল সেই দায়লামী সর্দারদের সকলেই ছিলেন শিয়া আর ক্ষমতাহীন খলীফা ছিলেন সুন্নী। বাগদাদ ও সামাররায় প্রচুর তুর্কীর বাস ছিল। তাদের সকলেই সুন্নী ছিলেন বিধায় খলীফার আনুগত্যকে তাঁরা জরুরী মনে করতেন। খলীফা কাদির এ সব বিবেচনা করে সুন্নীদের সহযোগিতা নিয়ে কয়েকটি সাহসিকতাপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং শিয়াদেরকে তাদের কয়েকটি অপচেষ্টা থেকে বিরত রাখেন। তুর্কীরা এবং বাগদাদের সুন্নীদের একটা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক খলীফা কাদির বিল্লাহর সমর্থক ছিল। এ জন্যেই তাঁর পক্ষে কিছু মর্যাদা লাভ করা সম্ভবপর হয়। ৪১৬ হিজরীর (মে. ১০২৫ খ্রি) রবিউল আউয়াল মাসে মুশরিফুদ্দৌলা তাঁর রাজত্বের পঞ্চম বছরে ইনতিকাল করেন। তাঁর ভাই বসরার গভর্নর আবূ তাহির জালালুদ্দৌলা তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

জালালুদ্দৌলা

মুশরিফুদ্দৌলার মৃত্যুর পর বাগদাদে জালালুদ্দৌলার নামে খুতবা পঠিত হয়। জালালুদ্দৌলা বসরা থেকে রওয়ানা হয়ে বাগদাদ না এসে ওয়াসিতে চলে যান। বাগদাদবাসীরা তখন খুতবা থেকে তাঁর নাম খারিজ করে দিয়ে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র আবূ কালীজার ইব্‌ন সুলতানুদ্দৌলার নাম খুতবায় দাখিল করে নেন। আবূ কালীজার তখন কিরমানে তাঁর চাচা আবুল ফাওয়ারিসের সাথে যুদ্ধরত ছিলেন। বাগদাদবাসীরা আবূ কালীজারকে বাগদাদে আসার জন্যে আহবান জানান। কিন্তু তিনি বাগদাদ আগমনে সমর্থ হননি। এ সংবাদ পেয়ে জালালুদ্দৌলা ওয়াসিত থেকে বাগদাদের দিকে রওয়ানা হন। বাগদাদের সৈন্যবাহিনী তাঁকে

বাগদাদে প্রবেশ করতে না দিয়ে যুদ্ধে পরাস্ত করে তাড়িয়ে দেয়। জালালুদ্দৌলা পুনরায় বসরায় চলে যান। আবূ কালীজারের আগমনের ব্যাপারে বাগদাদবাসীরা নিরাশ হয়ে পড়লে খুরাসানী, তুর্কী ও দায়লামীরা মিলে সলাপরামর্শ করে যে, জালালুদ্দৌলাকে ফিরিয়ে দেয়ার পর এবার কোন কুর্দী বা আরব সর্দারের বাগদাদ দখলের সম্ভাবনা রয়েছে। কোন আরব বাগদাদের উপর জেঁকে বসলে, কোন তুর্কী বা দায়লামীর পক্ষে বাগদাদ পুনর্দখল করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। তখন আরব শাসক বসরা, শাম, হিজায, ইয়ামামা, বাহরায়ন, মুসেল প্রভৃতি প্রদেশ থেকে সাহায্য সংগ্রহ করে মজবুত হয়ে দাঁড়াবে।

এসব ভাবনাচিন্তা করে জালালুদ্দৌলার কাছে এ মর্মে পত্র প্রেরণ করা হলো যে, আপনি কালবিলম্ব না করে বাগদাদে আগমন করুন। সেমতে জালালুদ্দৌলা বাগদাদে এসে রাজত্ব করতে শুরু করেন। তাঁর নাম খুতবায় উল্লেখ করা হতে থাকে।

৪১৮ হিজরী (১০২৭ খ্রি)তে জালালুদ্দৌলা পাঁচ ওয়াক্ত নামায উপলক্ষে নাকাড়া বাজাবার নিদের্শ জারি করলেন। খলীফা কাদির বিল্লাহ্ ব্যাপারটি একটি বিদআত বিধায় তা অত্যন্ত অপছন্দ করেন এবং এ নির্দেশ প্রত্যাহার করে নিতে জালালুদ্দৌলাকে তাগিদ দেন। জালালুদ্দৌলা নির্দেশ প্রত্যাহার করলেন সত্য, কিন্তু খলীফার প্রতি তাঁর মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। কয়েকদিন পর খলীফা অনুমতি প্রদান করলে জালালুদ্দৌলা পুনরায় তাঁর নাকাড়া বাজাবার আদেশ জারি করলেন।

৪১৯ হিজরী (১০২৮ খ্রি)তে তুর্কীরা জালালুদ্দৌলার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। কিন্তু খলীফা কাদির বিল্লাহ্‌র মধ্যস্থতায় সে বিদ্রোহ প্রশমিত হয়। তারপর আবূ কালীজার ইরাক আক্রমণ করেন। জালালুদ্দৌলা তার মুকাবিলায় সৈন্য পাঠালে উভয় পক্ষে সংঘাতের সূচনা হয়। উভয়পক্ষে যুদ্ধ চলছিল এমতাবস্থায় ৪২২ হিজরী (১০৩০ খ্রি)তে খলীফা কাদির বিল্লাহ্ ইন্তিকাল করেন এবং তাঁর পুত্র আবূ জা'ফর আবদুল্লাহ্ 'কায়িম বি-আমরিল্লাহ্' লকব গ্রহণ করে খলীফার আসনে বসেন। শায়খ তকীউদ্দীন সালাহ্ কাদির বিল্লাহকে শাফিঈ মাযহাবের ফকীহদের মধ্যে গণ্য করেছেন।

কায়িম বি-আমরিল্লাহ

আবূ জা'ফর আবদুল্লাহ্ 'কায়িম বি-আমরিল্লাহ্' ইব্‌ন কাদির বিল্লাহ্ ১৫ই যিলকদ ৩৯১ হিজরী (অক্টোবর ১০০১ খ্রি)তে বদরুদ্দোজা নাম্নী জনৈকা আর্মেনীয় দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সুন্দর-সুঠাম, আবেদ-যাহেদ তথা দরবেশ প্রকৃতির সহিষ্ণু সাহিত্যিক, সুন্দর হস্তলিপির অধিকারী, দানশীল ও পরোপকারী চরিত্রের মহান ব্যক্তি ছিলেন। জালালুদ্দৌলার শাসন ক্ষমতায় ভাটা পড়ে গিয়েছিল। তাঁর সৈন্যবাহিনীতে বিদ্রোহ লেগেই থাকতো। ৪২৫ হিজরী (১০৩৩ খ্রি)তে জালালুদ্দৌলা বাগদাদের কারখ মহল্লায় বসবাস করতে থাকেন এবং বাসাসেরী নামে পরিচিত তুর্কী আরসলানকে বাগদাদের পশ্চিমাঞ্চলের শাসনভার অর্পণ করেন। বাসাসেরী ক্ষমতায় আসীন হয়ে বাগদাদবাসীদের জীবন অতিষ্ঠ করে তোলে। ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের দ্বারা সে খলীফাকেও অতিষ্ঠ করে তোলে। খলীফার অবস্থা তখন একজন কয়েদীর মতো হয়ে দাঁড়ায়।

শিয়া-সুন্নী দাঙ্গাও তখন বেশ কয়েকবার বাঁধে। বাসাসেরী নিজে শিয়াদের সমর্থক ছিল বিধায় সুন্নীদেরকে অনেক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। ৪২৭ হিজরী (১০৩৫ খ্রি)তে সৈন্যবাহিনীতে বিদ্রোহ দেখা দেয়। বিদ্রোহী সৈন্যরা জালালুদ্দৌলার বাড়ি অবরোধ করে তা লুণ্ঠন করে। জালালুদ্দৌলা ক্রীটে চলে যান। খলীফা 'কায়িম বি-আমরিল্লাহ্' মধ্যস্থতা করে তুর্কী সৈন্যদের ও জালালুদ্দৌলার মধ্যকার বিরোধ মিটিয়ে দেন। ৪২৮ হিজরী (১০৩৬ খ্রি)তে জালালুদ্দৌলা ও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র আবূ কালীজারের মধ্যকার বিরোধ নিষ্পত্তি হয়। তাঁরা এ সময় একে অপরের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করে চলার অঙ্গীকারে আবদ্ধ হন।

৪২৬ হিজরী (১০৩৪ খ্রি)তে জালালুদ্দৌলা খলীফা কায়িম বি-আমরিল্লাহ্র কাছে তাকে মালিকুল মুলূক উপাধিদানের আবেদন জানালেন। খলীফা শাস্ত্রজ্ঞদের কাছে এরূপ পদবীর বৈধতা সম্পর্কে ফাতাওয়া চাইলে তাঁদের কেউ কেউ এর বৈধতার পক্ষে আবার কেউ কেউ বৈধতার বিপক্ষে মত প্রকাশ করলেন। শেষ পর্যন্ত খলীফা বাধ্য হয়ে বৈধতার পক্ষের মতই মেনে নিলেন এবং সে মতেই কাজ করলেন। তিনি জালালুদ্দৌলাকে মালিকুল মুলূক (রাজাধিরাজ) খেতাবে ভূষিত করলেন। ৪৩১ হিজরী (১০৩৯ খ্রি)তে আবূ কালীজার বসরায় সামরিক অভিযান চালিয়ে সেখানকার আমিলকে তাড়িয়ে দিয়ে বসরা অধিকার করেন এবং আপন পুত্র ইয়াযুল মুলূককে বসরার শাসনকর্তা নিয়োগ করে নিজে আহওয়াযের দিকে অগ্রসর হন। ঐ বছরই তুগরিল বেগ সালজুকী খুরাসানে সুলতান মাসউদ ইব্ন মাহমুদ সবুক্তগীনের সেনাপতিকে পরাস্ত করে নিশাপুর অধিকার করেন। খুরাসান অধিকার করে তিনি সুলতানে আযম খেতাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

ঐ বছরই তুগরিল বেগ এবং জালালুদ্দৌলার মধ্যে সন্ধিনামা লিখিত হয় এবং খলীফা তাঁর বিশেষ দূত কাযী আবুল হাসানকে তুগরিল বেগের নিকট প্রেরণ করেন। ৪৩৫ হিজরীর (১০৪৩ খ্রি) শাবান মাসে জালালুদ্দৌলা ইন্তিকাল করেন। লোকজন তাঁর পুত্র আবূ মানসূর মালিকুল আযীযকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে। কিন্তু মালিকুল আযীয সৈন্য-সামন্তকে তাঁদের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী বখশিশ ভাতা দিতে সক্ষম হননি। ফলে সৈন্যবাহিনীর মধ্যে তিক্ততা সৃষ্টি হয়। আবূ কালীজার উদ্ভূত এ পরিস্থিতি থেকে ফায়দা ওঠান এবং প্রচুর অর্থবৈভব বাগদাদে সেনাপতিদের কাছে প্রেরণ করেন। ফলে তারই নামে খুতবা পাঠ করা হয়। ৪৩৬ হিজরীর সফর মাসে (আগস্ট ১০৪৪ খ্রি) আবূ কালীজার বাগদাদে প্রবেশ করলে খলীফা তাকে 'মহীউদ্দীন' (দীনের জীবন সঞ্চারকারী) খেতাবে ভূষিত করেন। ৪৩৯ হিজরী (১০৪৭ খ্রি) সালে মহীউদ্দীন ইব্ন সুলতানুদ্দৌলা ইব্ন বাহাউদ্দৌলা ইব্ন আদুদুদ্দৌলা ইব্ন রুকনুদ্দৌলা ইব্ন বুওয়াইয়া দায়লামী নামে খ্যাত আবূ কালীজার সুলতান তুগরিল বেগের সাথে তাঁর কন্যার বিবাহ দিয়ে তাঁর সাথে সন্ধিতে আবদ্ধ হন।

আবূ কালীজারের রাজত্ব

আবূ কালীজার নায়েবে সালতানাত হয়ে আপন বিদ্যাবুদ্ধি ও সামরিক শক্তি বলে ইস্পাহান ও কিরমান এলাকা দখল করে সোয়া চার বছরকাল রাজত্ব করে ৪৪০ হিজরী (১০৪৮ খ্রি)তে ইনতিকাল করেন। বাগদাদে তাঁর স্থলে তাঁর পুত্র আবূ নসর ফিদেয় শাহ্ স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি তখন 'মালিকুর রাহীম' উপাধি ধারণ করেন।

মালিকুর রাহীমের রাজত্ব

মালিকুর রাহীম বাগদাদ ও ইরাকে রাজত্ব শুরু করলেন এবং তাঁর অপর ভাই শীরায অধিকার করেন। ঐ বছরই বাগদাদে ভীষণ দাঙ্গা হয় আর এর মূলে ছিল শিয়া-সুন্নী বিভেদ। তারপর মালিকুর রাহীম তাঁর শীরায দখলকারী ভাই আবূ মানসূর খসরুকে আক্রমণ করেন। উভয়পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ হয়। তারপর মালিকুর রাহীমের অন্যান্য ভাই ও আত্মীয়-স্বজনরা বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করেন। ৪৪২ হিজরীতে (১০৫০ খ্রি) বাগদাদের শিয়া-সুন্নী দাঙ্গায় উভয় পক্ষের শত শত লোক নিহত হয়।

ঐ বছরই সুলতান তুগরিল বেগ ইস্পাহান অধিকার করেন এবং তিনি তাঁর ভাই আরসালান ইব্‌ন দাউদকে পারস্য অভিমুখে প্রেরণ করেন। আরসালান ইব্‌ন দাউদ ৪৪৪ হিজরী (১০৫২ খ্রি)তে পারস্য প্রদেশ দখল করে নেন। খলীফা কায়িম বি-আমরিল্লাহ সুলতান তুরগিল বেগের কাছে এ সব প্রদেশের শাসনের সনদ পাঠিয়ে দেন যেগুলো তিনি অধিকার করে নিয়েছিলেন। ৪৪৩ হিজরী (১০৫১ খ্রি)তে ঈদের সময় সুলতান তুগরিল বেগ বাগদাদে আগমন করেন এবং খলীফার হস্তচুম্বন ও খেলাত লাভে ধন্য হয়ে প্রত্যাবর্তন করেন। ৪৪৫ হিজরী (১০৫৩ খ্রি)তে পুনরায় বাগদাদে প্রচণ্ড শিয়া-সুন্নী দাঙ্গা সংঘটিত হয় এবং তাতে বাগদাদের কয়েকটি মহল্লা ভস্মীভূত হয়ে যায়। খলীফা কায়িম বি-আমরিল্লাহকে এ দাঙ্গা থামাতে প্রচুর বেগ পেতে হয়। মালিকুর রাহীম শীরায, বসরা প্রভৃতি স্থানে আপন ভাই-ভাতিজাদের সাথে যুদ্ধরত থাকেন। ৪৪৭ হিজরী (১০৫৫ খ্রি) পর্যন্ত এ অবস্থা চলতে থাকে।

এ সময়টিতে সুলতান তুগরিল বেগ আযারবায়জান ও জাযিরা দখল করে নেন। রোমকদের বিরুদ্ধেও তিনি জিহাদ পরিচালনা করেন। সেখান থেকে কল্পনাতীত পরিমাণ ধন-সম্পদ লাভ করে খুরাসান ও পারস্য দখল সম্পূর্ণ করে মুসেল ও সিরিয়াও অধিকার করেন। হজ্জ আদায়ের জন্যে তিনি বায়তুল্লাহ্ শরীফে গমন করেন। সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে রে ও খুরাসানে শাসন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় মনোযোগ দেন। বাগদাদ ও পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে তখন গুণ্ডা-বদমাশদের ভীষণ উপদ্রব ছিল। ৪৪৭ হিজরী (১০৫৫ খ্রি)-তে তুগরিল বেগ খলীফা কায়িম বি-আমরিল্লাহ্‌র কাছে দরবারে আনুগত্যের পত্র প্রেরণ করেন। ঐ সময় মালিক আবদুর রাহীম বসরা থেকে বাগদাদে আগমন করেন এবং খলীফাকে পরামর্শ দেন যে, তিনি যেন অবশ্যই তুগরিল বেগের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করে চলেন। খলীফা ৪৪৭ হিজরীর রমযান মাসে (ডিসেম্বর, ১০৫৫ খ্রি) এ মর্মে ফরমান জারি করলেন যে, খুতবায় যেন সুলতান তুগরিল বেগের নামও উচ্চারিত হয়। এ সংবাদ পেয়ে সুলতান তুগরিল বেগ অত্যন্ত প্রীত হন এবং খলীফার দরবারে উপস্থিতির অনুমতি চেয়ে পাঠান। খলীফা তাঁকে সে অনুমতি দান করেন। এদিকে বাগদাদের সেনাধ্যক্ষরা সুলতান তুগরিল বেগের প্রতি সম্মান ও আনুগত্য প্রকাশ করে পত্রাদি প্রেরণ করেন। ৪৪৭ হিজরীর রমযান (১০৫৫ খ্রি ডিসেম্বর) মাসে বাগদাদে সুলতান তুগরিল বেগকে অভ্যর্থনা জানানোর বিপুল আয়োজন করা হয়।

বাসাসিরী যেহেতু শিয়া ছিলেন এবং মিসরের শাসনকর্তা উবায়দীর সাথে তার যোগসাজশ ছিল তাই তিনি বাগদাদে দাঙ্গা সংঘটিত করেন। তুগরিল বেগ বাগদাদে উপনীত হয়ে সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করে দায়লামীদের শক্তি চূর্ণ করেন। ৪৪৮ হিজরীর শুরুর দিকে

(১০৫৬ খ্রি) সুলতান তুগরিল বেগ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী খাদীজা ওরফে আরসালান খাতুন বিনত দাউদের বিবাহ খলীফা কায়িম বি-আমরিল্লাহর সাথে দিয়ে খলীফার বংশের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করলেন। ৪৮৪ হিজরীর শাওয়াল মাসের শেষ তারিখে (ডিসেম্বর ১০৯২ খ্রি) সুলতান তুগরিল বেগের চাচাত ভাই কাতালমাশ সানজার নামক স্থানে বুসাসিরীর সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। কাতালমাশ যুদ্ধে পরাস্ত হন।

বাসাসিরী মুসেল প্রদেশ অধিকার করে মিসরের শাসনকর্তা মুসতানসির উবায়দীর নামে খুতবা প্রচলন করলেন। এদিকে জাযিরা প্রদেশের ওয়ালীও বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসলেন। সুলতান তুগরিল বেগ মুসেলে অভিযান চালিয়ে বিদ্রোহীদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করে ৪৪৯ হিজরীর শুরুতে (১০৫৭ খ্রি) বাগদাদের দিকে ফিরে আসেন। খলীফা তাঁকে সম্মানিত করেন। এ উপলক্ষে তিনি একটি দরবার বসান। খলীফা তুগরিল বেগকে 'মালিকুল মুল্‌ক আল-মাশরিক ওয়াল মাগরিব' (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অধিপতি) উপাধিতে ভূষিত করেন এবং গোটা সাম্রাজ্যের হুকুমত ও ইন্তিজামের সনদ প্রদান করেন।

এ সময় বাসাসিরী ও মিসরের ওয়ালী উবায়দী সুলতান তুগরিল বেগের ভাই ইবরাহীমকে প্ররোচনা দিয়ে হামদানে বিদ্রোহ করান। সুলতান তুগরিল বেগ হামদানের বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতেই সুযোগ বুঝে বাসাসিরী বাগদাদ আক্রমণ করে দখল করে বসেন এবং বাগদাদের জামে মসজিদে মুসতানসির উবায়দীর নামে খুতবা পাঠ করান। এটা ৮ই যিলকদ ৪৫০ হিজরীর (জানুয়ারী ১০৫৯ খ্রি) ঘটনা। বাগদাদের শিয়ারা সর্বতোভাবে বাসাসিরীকে সহযোগিতা করে। বাসাসিরী বাগদাদের মসজিদসমূহে আযানে 'হাইয়া আলা খায়ারিল আমল' বাক্যের সংযোজন করেন। বাসাসিরীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ বাগদাদের সুন্নীরা বিদ্রোহ করেন। কিন্তু তারা বাসাসিরীর সৈন্যদের হাতে পরাস্ত হয়ে নিহত হন। বাসাসিরী রঈসুর রুয়াসা নামে প্রসিদ্ধ খলীফার উযীর আযমকে ধরে শূলিতে চড়ান। ঘটনা ৪৫০ হিজরীর যিলহজ মাসের শেষ দিকে (ফেব্রুয়ারী ১০৫৯ খ্রি) সংঘটিত হয়। বাসসিরী মিসরে মুসতানসির উবায়দীর কাছে সুসংবাদ জানিয়ে তাঁর সাহায্য চেয়ে পাঠান, কিন্তু মিসর থেকে কোন সাহায্যই তিনি পাননি। এ দিকে বাসাসিরীর কাছে খবর পৌঁছে যে, সুলতান তুগরিল বেগ তাঁর ভাই ইবরাহীমের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হয়েছেন। এ সংবাদ পেয়ে তিনি কায়িম বি-আমরিল্লাহ এবং তাঁর বেগম আরসালান খাতুনকে গ্রেফতার করে বাগদাদের বাইরে কোন এক স্থানে নজরবন্দী করেন। খলীফার প্রাসাদ লুটপাট করা হয়। এ সব সংবাদ অবগত হয়ে তুগরিল বেগ বাগদাদ অভিমুখে রওয়ানা হন।

এ সংবাদ পেয়ে বাসাসিরী পূর্ণ এক বছর কাল বাগদাদ দখল করে থাকার পর ৪৫১ হিজরীর ৬ই যিলকদ (জানুয়ারী ১০৫৯ খ্রি) বাগদাদ ত্যাগ করেন। তুগরিল বেগ বাগদাদে প্রবেশ করে খলীফাকে বাগদাদে ফিরিয়ে আনেন এবং তাঁর অনুপস্থিতির দরুন খলীফাকে যে দুর্ভোগ পোহাতে হয় তজ্জন্যে তাঁর কাছে দুঃখ প্রকাশ করেন। এ সময় খুরাসানে তুগরিল বেগের ভাই দাউদের ইন্তিকাল হয়। ৪৫১ হিজরীর যিলকদে (জানুয়ারী ১০৫৯ খ্রি) খলীফা কায়িম বি-আমরিল্লাহ বাগদাদে প্রবেশ করেন।

এক নজরে বুওয়াইয়া রাজত্ব

বুওয়াইয়া মাহীগীর দায়লামীর বংশধরদের বর্ণনা উপরে দেয়া হয়েছে। এরা খলীফাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে খিলাফতের মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত করে। একশ বছরেরও অধিককাল ধরে তাঁরা বাগদাদের খলীফা এবং ইরাক ও পারস্যের উপর আধিপত্য বিস্তার করে রাখে। এরা ছিল শিয়া। এ জন্যে সুন্নীদেরকে এই শতাব্দীকালব্যাপী যে নিদারুণ দুঃখ-কষ্ট বরণ করতে হয় তা কল্পনা করাও অত্যন্ত বেদনাদায়ক। কিন্তু এদের রাজত্বকালে উলুভী তথা আলীপন্থীদেরও তেমন কোন উপকার হয়নি। এরা মুখে মুখে আহলে বায়তের প্রেমিক বলে দাবি করলেও কোন আলীপন্থীকে শক্তিশালী করা বা শাসনক্ষমতায় নিয়ে আসার কোনই প্রয়াস পায়নি। এদের মধ্যে কেউ কেউ বিদ্যোৎসাহী বলেও খ্যাতি লাভ করেছেন এবং এদের আমলে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও চালু হয়েছে। কিন্তু এ সবের উপর মজুসিয়ত তথা পারসিক ধর্মের প্রভাবই বেশি পরিলক্ষিত হয়। তারা আব্বাসী শাসনের অবসান ঘটিয়ে নিজেদের সম্প্রদায় ও গোষ্ঠী রাজত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পায়।

এদের আমলে আরব আধিপত্যের সকল নিদর্শন নিশ্চিহ্ন হয়। এদের সবচাইতে বড় কৃতিত্ব হচ্ছে তাদের আধিপত্যের এই গোটা একশ বছর ধরে তারা শিয়া-সুন্নী দাঙ্গা বাধিয়ে রাখে। ইসলামী সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে তাঁরা এমন সব মুশরিকানা প্রথা-পদ্ধতির পত্তন করে যা আজ পর্যন্ত মুসলমানদের গলায় লানতের শিকলরূপে ঝুলে আছে। এদের রাজত্বের পরিধি পারস্য ও ইরাকের বাইরে প্রসারিত হয়নি। খুরাসান ও মাওরাউন নাহরের শাসনক্ষমতা লাভ তাদের ভাগ্যে জোটেনি। সিরিয়া ও হিজায তাদের প্রভাব থেকে মুক্ত থেকেছে। তাদের রাজত্বের শ-সোয়াশ বছর বিশৃঙ্খলা, লুটপাট, রাহাজানি ও দাঙ্গা-হাঙ্গামায় পরিপূর্ণ ছিল। তাই বুওয়াইয়া বংশ মুসলিম জাতির জন্যে কোন হিতকর বা আশীর্বাদরূপী বংশ ছিল না। এরা মুসলিম জাতির শান-শওকত ও দাপটকে ধূলিসাৎ করার ব্যাপারে সর্বাধিক কাজ করেছে। তারা এমন কোন কীর্তি রেখে যেতে সমর্থ হয়নি যা নিয়ে মুসলিম জাতি গর্ব করতে পারে।

যাহোক, ৪৪৭ হিজরী (১০৫৫ খ্রি)তে এ বংশের রাজত্বের অবসান ঘটে এবং তাদের স্থলে সালজুকী বংশের রাজত্ব কায়িম বি-আমরিল্লাহ্ খিলাফতের আমলে প্রতিষ্ঠিত হয়।

সালজুকী রাজত্বের সূচনা

সালজুকী রাজত্বের অবস্থা আব্বাসী খলীফাদের বিবরণ স্থলে ঠিক তেমনভাবে বর্ণনা করা হবে না যেমনটি বুওয়াইয়া রাজত্বের অবস্থা উপরে বর্ণিত হয়েছে। সালজুকী রাজত্বের ইতিহাস স্বতন্ত্র কোন অধ্যায়ে বর্ণিত হবে। এখানে কেবল সালজুকী রাজত্বের সূচনা কিভাবে হলো তাই বর্ণনা করা জরুরী মনে করছি। তারপর আব্বাসীদের বর্ণনার সাথে অপর কোন বংশের রাজত্বের বর্ণনা দেয়ার হয়তো আর প্রয়োজন হবে না। সামানী বংশ এবং সবুক্তগীন গজনভীর বংশের প্রসঙ্গ এখনো উত্থাপিত হয়নি।

তুর্কী সম্প্রদায় চীন সীমান্ত থেকে শুরু করে খাওয়ারিযম শাশ, ফারগানা, বুখারা, সমরকন্দ ও তিরমিয পর্যন্ত ভূখণ্ডে বসবাস করতো। মুসলমানরা তাদেরকে পরাস্ত করে তাদের সর্দারদেরকে করদ সামন্তে পরিণত করেছিল। কিন্তু তাদের সম্প্রদায়ের কোন কোন

গোত্র চীন সীমান্তের নিকটবর্তী দুর্গম এলাকাসমূহে এমনভাবে বাস করে আসছিল যারা তখনো পর্যন্ত মুসলমানদের বশ্যতা স্বীকার না করে চীন ও তুর্কিস্তান প্রভৃতি এলাকা থেকে বিচ্ছিন্নভাবে জীবন যাপন করতো। এরা ৪০০ হিজরী (১০০৯ খ্রি)র দিকে তাদের উপত্যকাসমূহ থেকে বেরিয়ে এসে মাওরাউন নাহরের সেই সব এলাকায় চোরাগোপ্তা হামলা চালাতে শুরু করে সামানী বংশের পতনের পর যেগুলো সেখানকার তুর্কী সর্দারদের অধিকারে ছিল।

এ সব এলাকায় ইতিপূর্বেই ইসলাম বিস্তার লাভ করেছে। এদিকের সবচাইতে বড় সর্দার আইলাক খান ছিলেন এ এলাকার শাসনকর্তা। ইসলাম সম্পর্কে এ পর্যন্ত অনবহিত এ তুর্কীরা লুটপাটের স্বাদ পেয়ে যায় এবং তারা উপর্যুপরি তুর্কিস্তান ও মাওরাউন নাহর এলাকায় হামলা চালাতে থাকে। ৪১৮ হিজরী (১০২৭ খ্রি) পর্যন্ত এ সব তুর্কী তাদের পার্বত্য এলাকা থেকে বের হয়ে আসতে আসতে আযারবায়জান পর্যন্ত এসে গিয়েছিল। রাজ্যের শাসন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতি এবং খলীফা তথা ইসলামী রাষ্ট্রের দুর্বলতা তাদেরকে সুদূরের এলাকাসমূহে পর্যন্ত এসে লুটপাট করার সুযোগ করে দেয়।

৪১৮ হিজরী (১০২৭ খ্রি)তে লুটেরা তুর্কীদের একটি সম্ভ্রান্ত গোত্র–যারা এ পর্যন্ত লুটপাটের উদ্দেশ্যে বের হয়ে আসেনি– তুর্কিস্তান অভিমুখে যাত্রা করে এবং বুখারা থেকে ২০ ফারসং দূরবর্তী একটি শ্যামল প্রান্তরে রাজপথের নিকট তাঁবু স্থাপন করে। এ গোত্রের গোত্রপতির নাম ছিল সালজুক। এরা তাদের পূর্বে আসা তুর্কীদের তুলনায় ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত ছিল। তাদের সাথে ছিল তাদের পশুপাল। এরা সংখ্যায় ছিল প্রচুর এবং এদের দেহের গড়নও ছিল বেশ মজবুত। এরা ছিল অত্যন্ত বীর গোত্র। সুলতান মাহমূদ গযনভীর আমিল তূস সুলতান মাহমূদকে এ গোত্রের আগমনের সংবাদ দিতে গিয়ে লিখেন যে, বুখারার অদূরে এদের শিবির স্থাপনকে নিরাপদ মনে করা চলে না। সুলতান মাহমূদ সেদিকে মনোনিবেশ করলেন এবং সেখানে সদলবলে উপনীত হয়ে সেই তুর্কীদের কাছে এ মর্মে পয়গাম পাঠালেন যে, তোমাদের একজন প্রতিনিধিকে আমার দরবারে প্রেরণ কর। সেমতে সালজুক তনয় আরসালান অথবা ইসরাঈল সুলতান মাহমূদের দরবারে হাযির হন।

মাহমূদ গজনভী শান্তি-শৃঙ্খলার জামানত স্বরূপ তাকে বন্দী করে ভারতের দুর্গে পাঠিয়ে ছিলেন। দুই-তিন বছর পর মাহমূদ গজনভী মৃত্যুবরণ করেন। তুর্কীদের এ গোত্রটি তখন খুরাসানকে তাদের নিকট সহজলভ্য দেখে খুরাসান এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে এবং তাদের পূর্বে খুরাসানে লুটপাটকারী গোত্রগুলোর সাথে এসে মিলিত হতে শুরু করে। মাহমূদ গজনভীর পুত্র মাসউদ গজনভী তাদেরকে বাধা দেন এবং তাদের সাথে বেশ কটি যুদ্ধও করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা গজনভীদেরকে খুরাসান থেকে বেদখল করতে সমর্থ হয় এবং নিজেরা তা অধিকার করে নেয়। মাহমূদ গজনভীর বংশধররা দিন দিন দুর্বল থেকে দুর্বলতর হতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত তাঁরা সালজুকী গোত্রের সাথে সন্ধি করে খুরাসান আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। বুওয়াইয়া বংশীয়রা তখন আত্মকলহে লিপ্ত। এ ছাড়া সালজুকীদেরকে প্রতিহত করার যোগ্যতা বা সাহস কোনটিই তাদের ছিল না। তাই সালজুকীরা বিস্ময়কর গতিতে এগিয়ে যায়। বাগদাদে যেহেতু আব্বাসী খলীফা বর্তমান ছিলেন, তাই সালজুকীদের অন্তরে তাঁর প্রতি যথেষ্ট সম্ভ্রমবোধ বিদ্যমান ছিল।

সালজুকী গোত্র তাদের রাজত্ব শুরুর পূর্বেই বুখারা সন্নিহিত অঞ্চলে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তারা শিয়া প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়নি। কেননা বুখারা তথা গোটা মাওরাউন নাহর এলাকার মুসলমানরা ছিল সুন্নী। সালজুকীরাও তাই স্বভাবতই সুন্নী ছিল। যারা ইতিপূর্বে বুওয়াইয়াদের অত্যাচার-উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল সালজুকীরা তাদের কাছে ছিল রহমতের ফেরেশতাস্বরূপ। সালজুকীদের সর্দার তুগরিল বেগ প্রথমে খুরাসান, আযারবায়জান, জাযিরা প্রভৃতি অধিকার করে নিজের শক্তি বৃদ্ধি করেন। এরপর তিনি বাগদাদ অভিমুখে অগ্রসর হন যা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এভাবে দায়লামীদের বেদখল করে স্বয়ং বাগদাদে তিনি নায়েবে সালতানাতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হন। সুদীর্ঘকাল ধরে তাঁর বংশধররাই বাগদাদে রাজত্ব করতে তাকে। তাঁর অধঃস্তন পুরুষ আল-আরসালান সালজুকী দানিয়ূব নদী থেকে সিন্ধুনদ পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল এবং সর্বদিক দিয়ে শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে সমর্থ হন। এবার খলীফা 'কায়িম বি-আমরিল্লাহ্‌র' অবশিষ্ট বর্ণনার দিকে মনোনিবেশ করতে চাই।

৪৫১ হিজরী (১০৫৯ খ্রি)তে সুলতান তুগরিল বেগের ভাই খুরাসানের ওয়ালী চাগরী বেগ দাউদ গজনভী সুলতানের সাথে সন্ধি করেন। ঐ বছরই সুলতান মাসউদ গজনভীর মীর-মুনশী বা প্রধান সচিব আবুল ফযল বায়হাকী 'তারীখে' বায়হাকী নামক ইতিহাস গ্রন্থটি রচনা করেন। চাগরী বেগ দাউদের ইন্তিকালের পর সুলতান তুগরিল বেগ তাঁর ভ্রাতৃবধু অর্থাৎ সুলায়মানের মাতাকে বিবাহ করেন। ঐ বছরই অর্থাৎ ৪৫১ হিজরীর যিলহজ্জ মাসে (ফেব্রুয়ারি ১০৬০ খ্রি) সুলতান তুগরিল বেগ কূফায় পৌছে লুটপাটরত বাসাসিরীর উপর আক্রমণ চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন এবং পরে তাকে হত্যা করে তার কর্তিত শির বাগদাদে প্রেরণ করেন। সেখানে তা খলীফার প্রাসাদের তোরণে লটকিয়ে রাখা হয়। ৪৫২ হিজরীতে মুহাররম মাসে (ফেব্রয়ারী-মার্চ, ১০৬০ খ্রি) সুলতান তুগরিল বেগ বাগদাদে শাসন-শৃঙ্খলা সুপ্রতিষ্ঠিত করে আওসাতের দিকে যাত্রা করেন। সেখানে শাসন-শৃঙ্খলা সুপ্রতিষ্ঠিত করে ৪৫২ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে (এপ্রিল, ১০৬০ খ্রি) পার্বত্য এলাকা ও আযারবায়জানের দিকে যাত্রা করেন। ৪৫৩ হিজরীর ১৫ রবিউস সানী (মে, ১০৬১ খ্রি) আবুল ফাতাহ্ ইব্‌ন আহমদ আহওয়ায থেকে বাগদাদে আসেন। খলীফা তাঁকে উযীর পদে বরণ করেন। এর কয়েকদিন পরেই আবূ নসর ইব্‌ন জুহায়র ইব্‌ন মারওয়ানকে ফখরুদ্দৌলা উপাধি দিয়ে উযীরের পদ দেয়া হয় এবং আবুল ফাতাহ পদচ্যুত হয়ে আহওয়াযে ফিরে যান।

৪৫৩ হিজরী (১০৬১ খ্রি)-তে সুলতান তুগরিল বেগের স্ত্রী অর্থাৎ সুলায়মানের মায়ের মৃত্যু হলে রে-এর কাযী আবূ সা'দ মারফত তিনি খলীফার দরবারে এ মর্মে প্রস্তাব পাঠালেন যে, তিনি যেন তাঁর কন্যা সাইয়িদাকে তাঁর সাথে বিয়ে দেন। খলীফা তাতে অসম্মত হন। তারপর তুগরিল বেগ তার নিজের উযীর আমীদুল মুল্ক কুন্দরীকে এ উদ্দেশ্যে খলীফার কাছে প্রেরণ করেন। আমীদুল মুল্ক ৪৫৪ হিজরীর জুমাদাল উখরা (জুলাই, ১০৬২ খ্রি) পর্যন্ত বাগদাদে যথারীতি অবস্থান করে খলীফাকে সম্মত করতে সর্বতোভাবে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাতেও কোন কাজ হয় না। অগত্যা তিনি তুগরিল বেগের কাছে ফিরে যান। তুগরিল বেগ বাগদাদের কাযীউল কুযাত (প্রধান বিচারপতি) ও শায়খ আবূ মানসূর ইব্‌ন ইউসুফের নামে ক্রোধ মিশ্রিত

পত্র পাঠালেন। তাঁরা খলীফার দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁকে অনেক করে বোঝালেন। অবস্থা বেগতিক দেখে খলীফা তুগরিল বেগের প্রস্তাবে সম্মত হওয়াই সঙ্গত বিবেচনা করলেন। এ ছাড়া স্বয়ং খলীফার মহিষী আরসালান বেগ– যিনি তুগরিল বেগের ভ্রাতুষ্পুত্রী ছিলেন– তিনিও এ ব্যাপারে খলীফাকে সম্মত করতে চেষ্টা করেন। শেষ পর্যন্ত খলীফা 'কায়িম বি-আমরিল্লাহ' তুগরিল বেগের প্রস্তাবে সম্মত হন এবং তুগরিল বেগেরই উযীর আমীদুল মুল্‌ককে শাহযাদী সাইয়িদার বিয়ের উকীল মনোনীত করেন এবং এ মর্মে তাঁকে সংবাদ দেন। শেষ পর্যন্ত ৪৫৪ হিজরীর শাবান মাসে (সেপ্টেম্বর, ১০৬২ খ্রি) তাবরীযের শিবিরে খলীফা দুহিতা ও তুগরিল বেগের বিবাহ সম্পন্ন হয়।

এ বিয়ের পর তুগরিল বেগ খলীফা ও তাঁর কন্যার জন্যে প্রচুর ধন-সম্পদ, আসবাবপত্র ও মণিমানিক্য উপঢৌকনস্বরূপ প্রেরণ করেন। তিনি তাঁর লোকান্তরিত মহিষীর নামে প্রদত্ত সমস্ত জায়গীর খলীফা দুহিতা সাইয়িদার নামে হস্তান্তরিত করেন। তারপর ৪৫৫ হিজরীর মুহাররম মাসে (জানুয়ারী, ১০৬৩ খ্রি) সুলতান তুগরিল বেগ আর্মেনিয়া থেকে বাগদাদের উদ্দেশে রওয়ানা হন এবং এ সময় শাহযাদী সাইয়িদার রুখসতি অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। তুগরিল বেগ রবিউল আউয়াল মাস পর্যন্ত বাগদাদে অবস্থান করেন। তারপর তিনি তাঁর নবপরিণীতা স্ত্রী সাইয়িদা খাতুন সমভিব্যাহারে পার্বত্য প্রদেশের দিকে রওয়ানা হন। রে-তে পৌঁছে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ৪৫৫ হিজরীর ৮ই রমযান (সেপ্টেম্বর ১০৬৩ খ্রি) ইন্তিকাল করেন।

তুগরিল বেগ ছিলেন নিঃসন্তান। সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ চাগরী বেগ ছিলেন তুগরিল বেগের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান। সে হিসাবে উযীর আমীদুল মুল্‌ক সুলায়মানকেই তাঁর স্থলাভিষিক্ত করলেন। কিন্তু লোকজন তার বিরোধিতা করে এবং খুতবায় সুলায়মানের অপর ভাই আরসালান ইব্‌ন দাউদ চাগরী বেগের নাম পাঠ করে। আল্‌প আরসালান তখন খুরাসানের ওয়ালী ছিলেন এবং তিনি তখন মার্ভে অবস্থান করছিলেন। সংবাদ পেয়ে আল্‌প আরসালান মার্ভে থেকে রে আক্রমণ করেন। আমীদুল মুল্‌ক তাঁর দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। কিন্তু আল্‌প আরসালান আমীদুল মুল্‌কের প্রতি আস্থাবান হতে পারেননি। তিনি শেষ পর্যন্ত তাঁকে সন্দেহ করতে থাকেন। অবশেষে ৪৫৬ হিজরী (১০৬৩ খ্রি)তে তিনি আমীদুল মুল্‌ককে বন্দী করে নিজ মন্ত্রী নিযামুল মুল্‌ক তূসীকে উযীরে আযম নিয়োগ করেন। রে-তে প্রবেশ করে আল্‌প আরসালান খলীফা দুহিতা সাইয়িদাকে পূর্ণ মর্যাদা সহকারে বাগদাদ অভিমুখে রওয়ানা করে দেন। বাগদাদে সুলতান আল্‌প আরসালানের নামে খুতবা পাঠ করা হয়।

নিযামুল মুল্‌ক তূসী সুলতান আল্‌প আরসালানের পক্ষ থেকে ৪৫৬ হিজরীর ৭ই জুমাদাল উলা (মে, ১০৬৪ খ্রি) তারিখে বাগদাদে খলীফার কাছে বায়আতের উদ্দেশ্যে হাযির হন। খলীফা আম-দরবার অনুষ্ঠান করেন। নিযামুল মুল্‌ককে আনুষ্ঠানিকভাবে সিংহাসনে উপবিষ্ট করেন এবং তাঁকে যিয়াউদ্দৌলা এবং সুলতান আল্‌প আরসালানকে আল-ওয়ালিদুল মুওয়াইয়াদ খেতাবে ভূষিত করেন। ৪৬০ হিজরীতে (১০৬৭ খ্রি) খলীফা ফখরুদ্দৌলা ইব্‌ন জুবায়রকে পদচ্যুত করে ৪৬১ হিজরীর সফর মাসে (নভেম্বর, ১০৬৮ খ্রি) পুনরায় উযীর পদে পুনর্বহাল করেন। ৪৬২ হিজরী (১০৬৯ খ্রি)তে মক্কার ওয়ালী মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ হাশিম খুতবা

থেকে মিসরের উবায়দীর নাম খারিজ করে দিয়ে খলীফা কায়িম বি-আমরিল্লাহ্ এবং সুলতান আল্প আরসালানের নাম খুতবায় দাখিল করেন। তিনি আযান থেকে 'হাইয়া আলা খায়রিল আমল' বাক্যটি খারিজ করে দেন এবং নিজ পুত্রকে প্রতিনিধিরূপে আল্প আরসালানের খিদমতে প্রেরণ করেন। সুলতান তাতে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে খিলাত ও ত্রিশ হাজার দীনার ইনামস্বরূপ প্রদান করেন এবং বার্ষিক দশ হাজার দীনার বেতনভাতা নির্ধারণ করেন।

৪৬৩ হিজরী (১০৭০ খ্রি)-তে আলেপ্পোতেও খলীফা কায়িম বি-আমরিল্লাহ্ ও সুলতান আল্প আরসালানের নাম খুতবাভুক্ত হয়। ৪৬২ হিজরী (১০৬৯ খ্রি)-তে রোমান সম্রাট আরমানুস দু'লাখ সৈন্যের বিরাট বাহিনী নিয়ে খিলাত প্রদেশ আক্রমণ করেন। সুলতান আল্প আরসালান মাত্র পনের হাজার সৈন্য নিয়ে সেই দু'লাখ সৈন্যের বাহিনীকে পরাস্ত করেন। রোমান সম্রাট আরমানুসের সাথে তখন ফ্রান্স ও রাশিয়ার সম্রাটদ্বয়ও ছিলেন। রুশ সম্রাট যুদ্ধে বন্দী হন। তাঁর নাক-কান কেটে দেয়া হয়। রোমান সম্রাটকে বন্দী করে তাঁর নিকট থেকে আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি নিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়।

রোমানদেরকে এরূপ শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করার পর সুলতান আল্প আরসালান ৪৬৫ হিজরীতে (১০৭২ খ্রি) মাওরাউন নাহরের দিকে যাত্রা করেন। আমুদরিয়া নদীতে সেতু নির্মাণ করা হয়। সুলতানের বাহিনী দীর্ঘ কুড়ি দিন ধরে নদী পার হন। ইউসুফ খাওয়ারিযমী নামক জনৈক দুর্গাধিপতিকে অপরাধীরূপে সুলতানের দরবারে উপস্থিত করা হলো। সুলতান বললেন, একে ছেড়ে দাও। আমি তাকে তীর নিক্ষেপে হত্যা করবো। ঘটনাচক্রে তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। ইউসুফ দ্রুতবেগে অগ্রসর হয়ে সুলতানকে খঞ্জরবিদ্ধ করেন। সুলতান আহত হন। উপস্থিত লোকজন ইউসুফকে হত্যা করে। এদিকে সুলতান আল্প আরসালানও আঘাত সহ্য করতে না পেরে ৪৬৫ হিজরীর ১০ই রবিউল আউয়াল (নভেম্বর, ১০৭২ খ্রি) প্রাণ ত্যাগ করেন। তাঁর মরদেহ মার্ভে নিয়ে দাফন করা হয়। তাঁর পুত্র মালিক শাহ্ পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। খলীফা কায়িম বি-আমরিল্লাহ মালিক শাহের নামে সনদ ও খলীফার পতাকা পাঠিয়ে দিলেন।

৪৬৭ হিজরীর ১৫ই শাবান (এপ্রিল, ১০৭৫ খ্রি) খলীফা কায়িম বি-আমরিল্লাহ রক্ত মোক্ষণ করিয়ে শয়ন করেন। ঘটনাচক্রে মোক্ষণকৃত রগ থেকে রক্তক্ষরণ পুনরায় শুরু হয় এবং এতই রক্তক্ষরণ হয় যে, তাঁর জীবনের প্রদীপ নির্বাপিত হয়। অমাত্যবর্গ জরুরীভাবে তলব করা হলে তারা খলীফার পৌত্র আবুল কাসিম আবদুল্লাহ ইব্ন যখীরাতুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন কায়িম বি-আমরিল্লাহ খলীফার উত্তরাধিকারী মনোনীত করে তাঁর হাতে বায়আত গ্রহণ করে। পরদিনই খলীফা কায়িম বি-আমরিল্লাহ ইন্তিকাল করেন। তাঁর একমাত্র সন্তান যখীরাতুদ্দীন মুহাম্মদ পিতার জীবদ্দশায়ই ইন্তিকাল করেন। তাঁর মৃত্যুর ছ' মাস পর আবুল কাসিম আবদুল্লাহ্ নামক তাঁর এ পুত্র সন্তানটি ভুমিষ্ঠ হন। আবুল কাসিম সিংহাসনে আরোহণ করে মুকতাদী বি-আমরিল্লাহ্ উপাধি গ্রহণ করেন। খলীফা কায়িম বি-আমরিল্লাহ্ ৪৫ বছর খলীফা পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

মুকতাদী বি-আমরিল্লাহ্

আবুল কাসিম আবদুল্লাহ্ মুকতাদী বি-আমরিল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন কাসিম বি-আমরিল্লাহ্ আরগাওয়ান নাম্নী জনৈকা দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি উনিশ বছর তিন

মাস বয়ঃক্রমকালে খলীফা পদে আসীন হন। সিংহাসনে আরোহণ করেই গানবাদ্য ও আনন্দ উপভোগ প্রভৃতি নিষিদ্ধ করে ফরমান জারি করেন। তাঁর দ্বারা খলীফার দাপট ও গাম্ভীর্য বৃদ্ধি পায়। তিনি অত্যন্ত ধর্মভীরু ও সাহসী খলীফা ছিলেন। ৪৬৭ হিজরী (১০৭৪ খ্রি)তে দামেশক বিজয় করে খলীফা মুকতাদী ও সুলতান মালিক শাহর নামে খুতবা পাঠ করান। আযান থেকে 'হাইয়া আলা খায়রিল আমাল' বাক্য বাদ দিয়ে দেন। ক্রমে ক্রমে গোটা শাম দেশের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। ৪৬৯ হিজরী (১০৭৬ খ্রি)তে বাগদাদে আশ'আরী ও হাম্বলীদের মধ্যে ভীষণ দাঙ্গা সংঘটিত হয়। উভয়পক্ষে প্রচুর হতাহত হয়। এরপর এ দাঙ্গা প্রশমিত হয়। ৪৭০ হিজরী (১০৭৭ খ্রি) তে মালিক শাহ্ তাঁর ভাই তাজুদ্দৌলা তুতুশকে শামদেশ জায়গীর স্বরূপ দান করেন এবং এ মর্মে অনুমতি দান করেন যে, মিসরের যে সব এলাকা তিনি জয় করতে সমর্থ হবেন তাও তাঁর জায়গীর বলে গণ্য হবে।

৪৭১ হিজরী (১০৭৮ খ্রি)তে তাজুদ্দৌলা আলেপ্পো অবরোধ করেন। মিসরীয় সৈন্যরা এসে দামেশক অবরোধ করে বসে। দামেশকে অবরুদ্ধ আতসাজ তুতুশের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলে তিনি আলেপ্পোর অবরোধ উঠিয়ে দামেশকে আগমন করেন। মিসরীয়রা এ সংবাদ পেয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। তাজুদ্দৌলা তুতুশ আতসাজকে তার দায়িত্ব পালনে অবহেলার জন্যে অভিযুক্ত করে হত্যা করিয়ে ফেলেন। ৪৭৬ হিজরী (১০৮৩ খ্রি)তে খলীফা মুকতাদী তাঁর উযীর আমীদুদ্দৌলা ইব্ন ফখরুদ্দৌলাকে ওজারতের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে আবূ শুজা' মুহাম্মদ ইব্ন হাসানকে উযীর নিয়োগ করেন। মালিক শাহ আমীদুদ্দৌলাকে দরবারে তলব করে তাকে দিয়ার বকরের শাসনভার অর্পণ করেন।

৪৭৭ হিজরীর শা'বান মাসে (ডিসেম্বর ১০৮৪ খ্রি) কাওনিয়ার গভর্নর সুলায়মান ইব্ন কুতুলমাশ সালজুকী রোমকদের নিকট থেকে এন্টিয়ক ছিনিয়ে নেন। ৩৫৮ হিরজী (৯৬৮খ্রি) থেকে এন্টিয়ক রোমকদের অধীন ছিল। ৪৭৯ হিজরীতে (১০৮৬ খ্রি) মরক্কোর গভর্নর ইউসুফ ইব্ন তাশুফীন খলীফা মুকতাদীর দরবারে এ মর্মে আবেদন জানাল যে, যে পরিমাণ ভূখণ্ড তাঁর অধীনে রয়েছে তার সনদ দিয়ে তাঁকে যেন সুলতান উপাধি দান করা হয়। খলীফা মুকতাদী সে আবেদনে সাড়া দিয়ে তাঁর নিকট খিলাত ও পতাকা প্রেরণ করেন এবং তাঁকে 'আমীরুল মুসলিমীন' খেতাব দান করেন। এই ইউসুফ ইব্ন তাশুফীনই মরক্কো শহরের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। ৪৭৯ হিজরীর যিলহজ্জ মাসে (মার্চ ১০৮৭ খ্রি) সুলতান মালিক শাহ সর্বপ্রথম বাগদাদে প্রবেশ করেন। খলীফার দরবারে উপস্থিত হয়ে তিনি খিলাত লাভ করেন। পরদিন তিনি খলীফার সাথে পোলো খেলেন।

উযীর নিযামুল মুল্ক তাঁর মাদ্রাসা নিযামিয়া পরিদর্শন করেন। সুলতান মালিকশাহ্ একমাস বাগদাদে অবস্থান করে ইস্পাহান অভিমুখে রওয়ানা হন। ৪৮১ হিজরীতে (১০৮৮ খ্রি) ইবরাহীম ইব্ন মাসউদ ইব্ন মাহমূদ ইব্ন সবুক্তগীন ইন্তিকাল করেন এবং জালালুদ্দীন মাসউদ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। ৪৮৪ হিজরীতে (১০৯১ খ্রি) ফিরিঙ্গীরা গোটা সাকলিয়া দ্বীপ দখল করে নেয়। এ দ্বীপটি মুসলমানরা সর্বপ্রথম ২০০ হিজরীতে (৮১৫ খ্রি) জয় করেছিলেন। এ দ্বীপে প্রথমে বনী আগলবের রাজত্ব ছিল। তারপর তা উবায়দীদের অধিকারে আসে। উবায়দীদের হাত থেকে তা ফিরিঙ্গীরা ছিনিয়ে নেয়। ঐ বছর অর্থাৎ ৪৮৪ হিজরীর রমযান মাসে (নভেম্বর ১০৯১ খ্রি) সুলতান মালিকশাহ্ পুনরায় বাগদাদে আগমন করেন।

মজলিসে মৌলুদ

৪৮৫ হিজরী (১০৯২ খ্রি) তে মালিক শাহ সালজুকী বাগদাদে অত্যন্ত ধুমধামের সাথে মজলিসে মৌলুদ অনুষ্ঠান করেন। ঐ বছরই ৪৮৫ হিজরীর রমযান মাসে (নভেম্বর, ১০৯২ খ্রি) নাহাওন্দে উযীর নিযামুল মুল্ক তূসী সাতাত্তর বছর বয়সে হাসান সাব্বাহর অনুসারী জনৈক ঘাতকের হাতে নিহত হন।

ঐ বছরই ৪৮৫ হিজরীর ১৫ই শাওয়াল (ডিসেম্বর ১০৯২ খ্রি) মালিক শাহ সালজুকী ইনতিকাল করেন। তাঁর ইনতকালের অব্যবহিত পরেই মালিক শাহের মহিষী তুরকান খাতুন ও তাঁর পুত্র বরকিয়ারুকের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। ৪৮৬ হিজরীতে (১০৯৩ খ্রি) বরকিয়ারুক বাগদাদে আগমন করেন। খলীফা মুকতাদী তাঁকে রুকনুদ্দৌলা খেতাব প্রদান করেন এবং নায়েবের খিলাত ও সুলতানী উপঢৌকনাদি দান করেন। কথিত আছে যে, মালিক শাহর মৃত্যু খলীফা মুকতাদীর অভিশাপেরই ফলশ্রুতিতে হয়েছিল। মালিক শাহ খলীফাকে বলেছিলেন, আপনি বাগদাদ ত্যাগ করে অন্যত্র কোথাও চলে যান, যাতে আমি নিরংকুশভাবে বাগদাদকে আমার রাজধানী বানাতে পারি। খলীফা অতিকষ্টে আট দিনের সময় চেয়ে নিয়েছিলেন। তারপর তিনি রাত-দিন আট প্রহর মালিক শাহর বিরুদ্ধে বদ-দু'আ করতে থাকেন। আট দিন পূর্ণ না হতেই মালিক শাহর মৃত্যু হয় এবং খলীফা এ বিপদ থেকে রেহাই পান।

৪৮৭ হিজরীর মুহাররম (১০৯৪ খ্রি) মাসে খলীফা মুকতাদী বি-আমরিল্লাহ্ আকস্মিকভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হন। কথিত আছে যে, শামসুন্নাহার নাম্নী জনৈকা পূজারিণী তাঁকে বিষ প্রয়োগ করে। খলীফা মুকতাদীরের ওফাতের পর তাঁর পুত্র আবুল আব্বাস আহমদ সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং মুসতাযহির বিল্লাহ খেতাব গ্রহণ করেন।

মুসতাযহির বিল্লাহ্

আবুল আব্বাস আহমদ মুসতাযহির বিল্লাহ্ ইব্ন মুকতাদী বিল্লাহ্ ৪৭০ হিজরীর শাওয়াল মাসে (মে, ১০৭৮ খ্রি) ভূমিষ্ঠ হন এবং তাঁর পিতার মৃত্যুর পর ষোল বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। মুকতাদীর মৃত্যুর সময় বরকিয়ারুক বাগদাদেই ছিলেন। তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুসতাযহির বিল্লাহর হাতে বায়আত হন।

খলীফা মুকতাদীর মৃত্যুর তৃতীয় দিবসে শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। সুলতান বরকিয়ারুক তাঁর উযীর ইয্যুল মুল্ক ইব্ন নিযামুল মুল্ক এবং তাঁর ভাই বাহাউল মুল্ক সমভিব্যাহারে খলীফার দরবারে উপস্থিত থাকেন। অন্যান্য পারিষদও যথারীতি শোক প্রকাশার্থে হাযির ছিলেন। ৪৮৭ হিজরীতে (১০৯৪ খ্রি) মিসরের গভর্নর মুসতানসির উবায়দীর মৃত্যু হয়। তাঁর পুত্র মুস্তালী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। ৪৮৮ হিজরীতে (১০৯৫ খ্রি) সমরকন্দের গভর্নর আহমদ খান নিজের ধর্মদ্রোহিতার জন্যে বন্দী হয়ে নিহত হয় এবং তার চাচাত ভাই তার স্থলাভিষিক্ত হয়।

এ বছরই রে-এর নিকটবর্তী এলাকায় তুতুশ ও বরকিয়ারুকের মধ্যে যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে বরকিয়ারুকের হাতে তুতুশের মৃত্যু হয়। বরকিয়ারুকের শাসন তাতে সুসংহত হয়। বরকিয়ারুকের ভাই মুহাম্মদ শক্তি অর্জন করে খুরাসান অধিকার করেন। বরকিয়ারুক তাকে দমনের জন্যে অগ্রসর হলে রে-তে উভয়পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে বরকিয়ারুক পরাস্ত হয়ে

খুরাসানে চলে যান। মুহাম্মদ ইব্‌ন মালিক শাহ্ বাগদাদে প্রবেশ করে ৪৯২ হিজরীর ১৫ই যিলহজ্জ (নভেম্বর, ১০৯৯ খ্রি) খলীফা মুসতাযহির বিল্লাহ্‌র নিকট থেকে "গিয়াছুদ দুনিয়া ওয়াদদীন" খেতাব হাসিল করেন। তারপর তিনি খুরাসানের দিকে চলে যান। বরকিয়ারুক খুজিস্তান থেকে ওয়াসিতে পৌঁছে সৈন্যবাহিনী সংগঠিত করেন এবং ৪৯৩ হিজরীর ১৫ই সফর (ডিসেম্বর ১০৯৯ খ্রি) বাগদাদে গিয়ে উপনীত হন। খলীফা তাকে মুবারকবাদ জ্ঞাপন করেন এবং খিলাত দান করেন। বরকিয়ারুকের নামে খুতবা পাঠ করা হয় তারপর বরকিয়ারুক মুহাম্মদ ইব্‌ন মালিক শাহকে আক্রমণ করেন। হামদানের নিকটবর্তী নহরে আবইয়াযের তীরে উভয়পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে বরকিয়ারুক পরাজিত হন। এরপর ৪৯৩ হিজরীর ১৫ই রজব (জুন ১১০০ খ্রি) পুনরায় বাগদাদে সুলতান মুহাম্মদের নামে খুতবা পাঠ করা হয়। বরকিয়ারুক পরাস্ত হয়ে রে-তে অবস্থান করেন। সেখান থেকেই ইস্পাহানে এবং তারপর সেখান থেকে তিনি খুজিস্তানে গমন করেন। সেখান থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে ৪৯৪ হিজরীর ১লা জুমাদাসসানী (মে, ১১০১ খ্রি) পুনরায় তিনি মুহাম্মদের সাথে যুদ্ধে মুখোমুখি হন। তাকে পরাস্ত করে তিনি রে-তে চলে আসেন। মুহাম্মদ তাঁর আপন সহোদর সন্থুরের কাছে জুরজানে চলে যান। অবশেষে ৪৯৪ হিজরীর ১৫ই যিলকদ (অক্টোবর ১১০১ খ্রি) বরকিয়ারুক বাগদাদে উপনীত হন এবং তাঁর নামে বাগদাদে খুতবা পাঠ করা হয়।

মোদ্দাকথা সুলতান বরকিয়ারুক এবং তাঁর সহোদর সুলতান মুহাম্মদের মধ্যে একের পর এক লড়াই চলতে থাকে। বাগদাদে কখনো একজনের, আবার কখনো অন্যজনের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। কখনো বা সন্ধি হতো, আবার কখনো বা পরমুহূর্তেই তা লংঘিত হয়ে যুদ্ধ শুরু হয়ে যেত। এ উপর্যুপরি যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে ইরাক, পারস্য, জাযিরা প্রদেশ থেকে শান্তি-শৃঙ্খলা তিরোহিত হয়ে গেল। লোকের ধন-প্রাণ ও সম্ভ্রম বাঁচানো দুষ্কর হয়ে পড়লো। ৪৯৭ হিজরীর জুমাদাল আউয়াল (ফেব্রুয়ারী ১১০৪ খ্রি) মাসে সেনাধ্যক্ষদের চেষ্টায় উভয় ভাইয়ের মধ্যে একটি সন্ধি হয় এবং সন্ধি অনুযায়ী উভয়ের মধ্যে রাজ্য ভাগাভাগি হয়। সাথে সাথে এটাও স্থির হয় যে, উভয়ের রাজ্যে দু'জনের নাম যুগপৎভাবে খুতবায় উচ্চারিত হবে। এ সন্ধি অনুসারে বাগদাদ বরকিয়ারুকের ভাগে পড়ে। এ সন্ধির পর কিছুদিন বরকিয়ারুক ইস্পাহানেই অবস্থান করেন। সেখান থেকে বাগদাদে আগমনের পথে ইয়াযদজার্দ নামক স্থানে অসুস্থ হয়ে তিনি ৪৯৮ হিজরীর রবিউস সানী (১১০৫ খ্রি জানুয়ারী) মাসে দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি তাঁর পুত্র মালিক শাহ্ ইব্‌ন বরকিয়ারুককে আপন উত্তরাধিকারী এবং আমীর আয়াযকে তাঁর অভিভাবকরূপে মনোনীত করেন।

মালিক শাহের বয়স তখন মাত্র পাঁচ বছর ছিল। বরকিয়ারুকের মরদেহ ইস্পাহানে নিয়ে গিয়ে সেখানে দাফন করা হয়। আমীর আয়ায মালিক শাহকে নিয়ে ৪৯৮ হিজরীর ১৫ই রবিউসসানী (১১০৫ খ্রি ফেব্রুয়ারী) বাগদাদে প্রবেশ করেন। মালিক শাহকে খলীফা সেই সব খেতাব প্রদান করলেন যা ইতিপূর্বে তাঁর পিতামহ মালিক শাহ ইব্‌ন আল্‌প আরসালানকে প্রদান করা হয়েছিল। তাঁর নামে যথারীতি বাগদাদে খুতবা পঠিত হলো। তারপর সুলতান মুহাম্মদ মুসেল অধিকার করে বাগদাদের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। ৫০১ হিজরীতে (১১০৭ খ্রি.) তিনি বাগদাদে প্রবেশ করে আমীর আয়াযকে হত্যা করলেন এবং নিজ নাম খুতবায় পড়ালেন। ৫০২ হিজরীতে (১১০৮ খ্রি) সুলতান মুহাম্মদ বাগদাদে নিজের জন্যে একটি প্রাসাদ নির্মাণ

করলেন। গোটা পৈতৃক রাজ্যে এবার মুহাম্মদ ইব্ন মালিক শাহ্র শাসন পুরাদস্তুর প্রতিষ্ঠিত হলো। সমস্ত গোলযোগের অবসান ঘটলো। ৫১১ হিজরীর শা'বান মাসে (ডিসেম্বর ১১১৭ খ্রি) সুলতান মুহাম্মদ অসুস্থ হয়ে পড়েন। এ অসুখ দীর্ঘায়িত হয়। অবশেষে ৫১১ হিজরীর যিলহজ্জ মাসের শেষ দিকে (এপ্রিল ১১১৮ খ্রি) সুলতান মুহাম্মদ ইব্ন মালিক শাহ্ দেহত্যাগ করেন এবং তাঁর পুত্র সুলতান মাহমূদ তাঁর স্থলাভিষিক্তরূপে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

খলীফা তাঁর এ সিংহাসন আরোহণকে অনুমোদন করে তাঁর জন্যে খেলাত প্রেরণ করেন। ৫১২ হিজরীর মুহাররম মাসে (এপ্রিল-মে, ১১১৮ খ্রি) মসজিদসমূহে তাঁর নামে খুতবা পাঠ করা হয়। তারপর ৫১২ হিজরীর ১৫ই রবিউল আখের (আগস্ট, ১১১৮ খ্রি) তারিখে খলীফা মুসতাযহির বিল্লাহ্ দীর্ঘ চব্বিশ বছর তিন মাস কাল রাজত্ব করে ইন্তিকাল করেন এবং তাঁর পুত্র আবূ মানসূর ফযল সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি তখন মুসতারশিদ বিল্লাহ উপাধি গ্রহণ করেন।

মুসতারশিদ বিল্লাহ্

মুসতারশিদ বিল্লাহ্ ইব্ন মুসতাযহির বিল্লাহ্ ৪৮৫ হিজরীর রবিউল আউয়াল (এপ্রিল, ১০৯২ খ্রি) মাসে ভূমিষ্ঠ হন এবং ২৭ বছর বয়সে পিতার পর ৫১২ হিজরীর ১৫ই রবিউল আখের (আগস্ট, ১১১৮ খ্রি) তারিখে সিংহাসনে আরোহণ করেন। খলীফা মুসতারশিদের সহোদর আমীর আবুল হাসান ইব্ন মুসতাযহির বায়আত না করে বাগদাদ থেকে ওয়াসিতে চলে যান। এক বছর পর গ্রেফতার হয়ে বাগদাদে নীত হন। খলীফা তার অপরাধ ক্ষমা করে তাঁকে খলীফার প্রাসাদেই থাকতে দেন। খলীফা মুসতারশিদের অভিষেক অনুষ্ঠানের মাত্র দু'মাস পর সুলতান মাহমূদের ভাই মাসউদ ইব্ন সুলতান মুহাম্মদ সালজুকী যিনি মুসেলে অবস্থান করছিলেন– বিদ্রোহ করে বসেন। তিনি তাঁর সাথে এ বিদ্রোহ বুখারার গভর্নর কসীমুদ্দৌলা জঙ্গী ইব্ন আকসানযির এবং হরবলের গভর্নর আবুল হায়জাকে তাঁর সাথে মিলিয়ে নেন এবং বাগদাদে এসে নিজের দখল প্রতিষ্ঠা করেন। এদিকে সুলতান মাহমূদের অপর ভাই সুলতান তুগরিল ইব্ন সুলতান মুহাম্মদ তাঁর পিতার শাসনামল থেকেই জুনজানের শাসনকর্তারূপে নিয়োজিত ছিলেন। সুলতান মাহমূদ মালিক তুগরিলের উপর আক্রমণ চালান। মালিক তুগরিল জুনজান থেকে পালিয়ে যান। সুলতান মাহমূদ জুনজানে লুটপাট চালায়।

যখন সুলতান মুহাম্মদের মৃত্যু হলো এবং সুলতান মাহমূদ সিংহাসনে আরোহণ করলেন তখন সুলতান মুহাম্মদের ভাই অর্থাৎ সুলতান মাহমূদের চাচা সঞ্জর মাওরাউন নাহরের শাসক ছিলেন। সুলতান সঞ্জরের লকব প্রথমে নাসিরুদ্দীন তথা ধর্মের সাহায্যকারী ছিল। সুলতান মুহাম্মদের ইন্তিকালের পর সুলতান সঞ্জর মাওরাউন নাহর থেকে সুলতান মাহমূদের প্রতি আক্রমণ চালান। সাভা নামক স্থানে ৫১৩ হিজরীর জুমাদাল উলা (সেপ্টেম্বর ১১১৯ খ্রি) মাসে চাচা-ভাতিজার যুদ্ধ হয়। সুলতান সঞ্জরের সাথে এ যুদ্ধে সিজিস্তানের গভর্নর আবুল ফযল, খাওয়ারিযম শাহ্ মুহাম্মদ আমীর নযদা এবং আলাউদ্দৌলা প্রমুখ সর্দারও ছিলেন। এ যুদ্ধে সুলতান মাহমূদ পরাস্ত হন এবং সুলতান সঞ্জর জয়যুক্ত হন। তিনি অগ্রসর হয়ে হামদান অধিকার করেন। বাগদাদে এ খবর পৌঁছতেই সেখানে সুলতান সঞ্জরের নামে খুতবা পঠিত হয়।

সুলতান মাহমূদ পরাজিত হয়ে ইস্পাহানে গিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। অবশেষে সুলতান সঞ্জরের মায়ের চেষ্টায় উভয়ের মধ্যে সন্ধি হয়। সন্ধির শর্ত স্থির হয় যে, সুলতান সঞ্জর সুলতান মাহমূদকে তাঁর উত্তরাধিকারীরূপে মেনে নেবেন এবং খুতবায় সঞ্জরের পরে মাহমূদের নাম উচ্চারিত হবে। এ শর্তানুসারে সুলতান সঞ্জর মাওরাউন নাহর, গজনা, খুরাসান প্রভৃতি রাজ্যে সুলতান মাহমূদের উত্তরাধিকারিত্বের ফরমান পাঠিয়ে দেন। কেবল রে-অঞ্চল সুলতান সঞ্জর সুলতান মাহমূদের অধিকৃত রাজ্যসমূহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিজ দখলে নিয়ে অবশিষ্ট সকল রাজ্যে তাঁর কর্তৃত্ব স্বীকার করে নেন। এদিকে সুলতান মাহমূদ তাঁর ভাই সুলতান মাসউদের সাথে সন্ধি করে তাঁকে মুসেল ও আযারবায়জান প্রদেশদ্বয় দিয়ে দেন আর তিনি মুসেলকে নিজের রাজধানীরূপে গ্রহণ করেন।

৫১৩ হিজরীতে (১১১৯ খ্রি) সুলতান মাসউদ নিজের স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সুলতান মাহমূদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করেন। ৫১৪ হিজরীর ১৫ই রবিউল আউয়াল (জুন ১১২০ খ্রি) উভয় ভাইয়ের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে সুলতান মাসউদ পরাস্ত হয়ে মুসেলের নিকটবর্তী পর্বতে গিয়ে আশ্রয় নেন। অমাত্যবর্গ মধ্যস্থতা করে উভয় ভাইয়ের মধ্যে সন্ধি করিয়ে দেন। সুলতান মাহমূদ ৫১৪ হিজরীর রজব (অক্টোবর, ১১২০ খ্রি) মাসে বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করেন এবং সুলতান মাসউদ পুনরায় মুসেলে রাজত্ব করতে থাকেন। ৫১৫ হিজরী (১১২১ খ্রি)তে সুলতান মাহমূদ মুসেলের শাসনভার আকসুনকুর বারসেকীকে অর্পণ করেন এবং আযারবায়জান পূর্ববৎ মাসউদের হাতেই থাকে।

সুলতান তুগরিলের বর্ণনা ইতিপূর্বেই দেয়া হয়েছে। তিনি সুলতান মাহমূদের কাছে পরাস্ত হয়ে গাঞ্জায় চলে যান। ৫১৬ হিজরী (১১২২ খ্রি)তে সুলতান মাহমূদ ও সুলতান তুগরিলের মধ্যে চুক্তিপত্র লেখা হয়। এরপর সুলতান মাহমূদ আকসুনকুর বারসেকীকে মুসেল ছাড়া ওয়াসিত অঞ্চলও জায়গীর স্বরূপ দিয়ে দেন। আকসুনকুর বারসেকী নিজ পক্ষ থেকে কসীমুদ্দৌলা ইমাদুদ্দীন জঙ্গী ইব্‌ন আকসুনকুরকে ওয়াসিতের শাসনভার অর্পণ করেন। ৫১৭ হিজরীতে (১১২৩ খ্রি) সুলতান মাহমূদ তাঁর উযীর শামসুল মুল্‌ককে বধ করেন। এদিকে শামসুল মুল্‌কের ভাই নিযামুদ্দৌলাকে খলীফা মুসতারশিদ তাঁর উযীরের পদ থেকে পদচ্যুত করেন। ৫১৭ হিজরীর যিলহজ্জ (ফেব্রুয়ারী, ১১২৪ খ্রি) মাসে খলীফা মুসতারশিদ স্বয়ং সৈন্যবাহিনীকে বিন্যস্ত করে দাবিস ইব্‌ন সাদকাকে দমনের উদ্দেশ্যে বাগদাদ থেকে যাত্রা করেন। মুসেল ও ওয়াসিতের সৈন্যরাও খলীফার খিদমতে উপস্থিত হয়। মুবারাকা নামক স্থানে যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে ওয়াসিতের গভর্নর ইমাদুদ্দীন জঙ্গী ইব্‌ন আকসুনকুর অত্যন্ত বীরত্ব প্রদর্শন করেন। খলীফা যুদ্ধে জয়ী হন। ৫১৮ হিজরীর ১০ই মুহাররম (মার্চ, ১১২৪ খ্রি) খলীফা বিজয়ীর বেশে বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করেন। সুদীর্ঘকাল পর সম্ভবত এটাই ছিল আব্বাসী কোন খলীফার প্রথম সশরীরে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থেকে সেনাপতির দায়িত্ব পালনের ঘটনা। এরপর জানা গেল যে, দাবীস ইব্‌ন সাদকা বসরা লুণ্ঠনে উদ্যোগী হয়েছেন। ইমাদুদ্দীন জঙ্গী ইব্‌ন আকসুনকুর বসরার প্রতিরক্ষার দায়িত্ব লাভ করে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলে দাবীস ব্যর্থ মনোরথ হয়ে মালিক তুগরিল ইব্‌ন সুলতান মুহাম্মদের কাছে গিয়ে উপস্থিত হন। ঐ বছরই অর্থাৎ ৫১৮ হিজরী (১১২৪ খ্রি) ইরাকের প্রতিরক্ষা কার্যের ভারপ্রাপ্ত আকসুনকুর

বারসেকী যিনি তখন মুসেলের উপর রোমকদের হামলা প্রতিরোধের চিন্তায় ব্যস্ত ছিলেন, ইমাদুদ্দীন জঙ্গী ইব্ন আকসুনকুরকে বসরার শাসনকার্যের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে নিজের কাছে ডেকে পাঠালেন। ইমাদুদ্দীন জঙ্গী বসরা থেকে রওয়ানা হলেন সত্য, কিন্তু মুসেলে না গিয়ে তিনি ইস্পাহানে সোজা গিয়ে সুলতান মাহমূদের কাছে উঠলেন। সুলতান মাহমূদ তাঁকে বসরা শাসনের সনদ প্রদান করে বসরায় ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। দাবীস ইব্ন সাদকা সুলতান তুগরিলের কাছে উপনীত হলে তিনি তাঁকে নিজ অমাত্যবর্গের মধ্যে শামিল করে নিলেন। দাবীস তুগরিলকে প্ররোচনা দিয়ে তাঁকে দিয়ে ইরাক আক্রমণ করালেন।

৫১৯ হিজরীতে (১১২৫ খ্রি) তুগরিল দাবীসকে সাথে নিয়ে ওকুতা নামক স্থানে উপনীত হয়ে সেখানে অবস্থান করেন। এ সংবাদ পেয়ে খলীফা মুসতারশিদ বিল্লাহ্ ৫১৯ হিজরীর ৫ই সফর (মার্চ ১১২৫ খ্রি) মুকাবিলার উদ্দেশ্যে বাগদাদ থেকে সসৈন্যে অগ্রসর হলেন। নাহ্রওয়ানের উভয় পক্ষে মুকাবিলা হলো। কিন্তু দাবীস ও তুগরিল উভয়েই খুরাসানে সুলতান সঞ্জরের কাছে গিয়ে উপনীত হলেন। ৫৩০ হিজরীর রজব (এপ্রিল, ১১৩৬ খ্রি) মাসে বাগদাদের কোতোয়াল ইয়ারতাকিশ যাকভী ইস্পাহানে সুলতান মাহমূদের কাছে পৌঁছে অনুরোধ করলেন যে, খলীফা মুসতারশিদ সৈন্যবাহিনী বিন্যস্ত করেছেন। প্রচুর যুদ্ধাস্ত্রও তিনি সংগ্রহ করেছেন। এ ছাড়া তাঁর আর্থিক অবস্থাও বেশ সচ্ছল হয়ে উঠেছে। খলীফা হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার পূর্ণ আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এ কথা শোনামাত্র সুলতান মাহমূদ সৈন্যবাহিনীকে বিন্যস্ত করে স্বয়ং বাগদাদের পথে বেরিয়ে পড়লেন। খলীফা মুসতারশিদ যখন সংবাদ পেলেন যে, সুলতান মাহমূদ সসৈন্যে বাগদাদ অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছেন তখন তিনি তাঁকে লিখে পাঠালেন যে, এদিকে আসার দরকার নেই, তুমি দাবীস ও অন্যদের বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে ফিরে যাও। এ পত্র পাওয়ায় সুলতান মাহমূদের অনুমান সত্য বলেই প্রতীয়মান হলো। তিনি ধারণা করলেন,খলীফা বুঝি সত্যসত্যই তাঁর প্রভাব বলয় থেকে বেরিয়ে যেতে চাচ্ছেন। তিনি তখন আরো দ্রুতবেগে বাগদাদের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। অবশেষে ৫২০ হিজরীর ১৭ই যিলহজ্জ (জানুয়ারী ১১২৭ খ্রি) সুলতান মাহমূদ বাগদাদে পদার্পণ করলেন। খলীফা তখন পশ্চিম বাগদাদে সরে গেলেন। ৫২১ হিজরীর ১লা মুহাররম (জানুয়ারী ১১২৭ খ্রি) সুলতান মাহমূদের লোকজন খলীফার প্রাসাদ লুণ্ঠন করলো। ত্রিশ সহস্র বাগদাদবাসী খলীফা মুসতারশিদের পাশে এসে জমায়েত হলো। দজলা নদীর তীরে উভয় পক্ষে যুদ্ধ শুরু হলো। উভয় পক্ষে বেশ কয়েকটি যুদ্ধের পর শেষ পর্যন্ত খলীফা ও সুলতান মাহমূদের মধ্যে সন্ধি হয়। ৫২১ হিজরীর রবিউস সানী (এপ্রিল ১১২৭ খ্রি) মাসে সুলতান মাহমূদ বাগদাদ থেকে হামদানের পথে রওয়ানা হন। যাবার প্রাক্কালে তিনি ইমাদুদ্দীন জঙ্গীকে বসরা থেকে ফিরিয়ে এনে বাগদাদের প্রতিরক্ষার দায়িত্বে নিযুক্ত করলেন। উপরেই বর্ণিত হয়েছে যে, দাবীস ও তুগরিল উভয়েই খুরাসানে সঞ্জরের কাছে গিয়ে উপনীত হয়েছিলেন। তাঁরা সঞ্জরকে খলীফা মুসতারশিদ ও সুলতান মাহমূদের উপর বিষিয়ে তুলতে তৎপর হলেন। শেষ পর্যন্ত সুলতান সঞ্জর খুরাসান থেকে লোক-লশকর নিয়ে রে-এর উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে পড়লেন। তিনি রে-তে উপস্থিত হয়ে সুলতান মাহমূদকে তাঁর সাথে দেখা করার জন্যে ডেকে পাঠালেন। তাঁর এ ডেকে পাঠানোর উদ্দেশ্য ছিল এই যে, সুলতান মাহমূদ সত্যি সত্যি যদি বিদ্রোহ ভাবাপন্ন না

হয়ে থাকেন তবে অবশ্যই তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁর সাথে দেখা করতে আসবেন, অন্যথায় তাতে অস্বীকৃতি জানাবেন। সুলতান মাহমূদ কিন্তু নির্দ্বিধায় তাঁর চাচা সঞ্জরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁর কাছে চলে আসেন। সঞ্জর তাঁর সাথে অত্যন্ত সম্মানজনক আচরণ করেন এবং দাবীসের ব্যাপারে সুপারিশ করে তাকে সুলতান মাহমূদের সাথেই পাঠিয়ে দিলেন। মাহমূদ দাবীস সমভিব্যাহারে হামদানে প্রত্যাবর্তন করলেন। ৫২৩ হিজরীর ৯ই মুহাররম (জানুয়ারী ১১২৯ খ্রি) সুলতান মাহমূদ দাবীসকে নিয়ে বাগদাদে প্রবেশ করেন এবং খলীফার দরবারে তাঁকে হাযির করে তাকে ক্ষমা করে দেয়ার জন্যে খলীফার দরবারে সুপারিশ করলেন। খলীফা দাবীসের ঔদ্ধত্য ক্ষমা করে দেন। সুলতান মাহমূদ বাহরুজকে বাগদাদের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব দিয়ে ইমাদুদ্দীন জঙ্গীকে মুসেলের গভর্নর বানিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। ৫২৩ হিজরীর জুমাদাস সানী (জুন ১১২৯ খ্রি) মাসে সুলতান মাহমূদ বাগদাদ থেকে হামদানের উদ্দেশে রওয়ানা হন। এতে সুযোগ বুঝে দাবীস বাগদাদ থেকে রওয়ানা হয়ে হুল্লা অধিকার করে বসে এবং খলীফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করে। খলীফা তাকে দমনের উদ্দেশ্যে একটি বাহিনী প্রেরণ করলেন। উভয় পক্ষে যুদ্ধ চলাকালেই এ সংবাদ অবগত হয়ে ৫২৩ হিজরীর যিলকদ (নভেম্বর, ১১২৯ খ্রি) মাসে সুলতান মাহমূদও বাগদাদে এসে উপনীত হলেন। দাবীস এবার হুল্লা ছেড়ে বসরার দিকে পালিয়ে গেলেন এবং বসরায় প্রচুর লুটপাট করে পাহাড়ে গিয়ে আত্মগোপন করলেন। সুলতান মাহমূদ হামদানে ফিরে যান।

৫২৫ হিজরীর শাওয়াল (জানুয়ারী ১১৩১ খি) মাসে সুলতান মাহমূদ ইন্তিকাল করেন। তাঁর স্থলে তাঁর পুত্র দাউদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। বিলাদে জবল (পার্বত্য এলাকা) ও আযারবায়জানে তাঁর নামে খুত্‌বা পঠিত হয়। ৫২৫ হিজরীর যিলকদ (অক্টোবর, ১১৩১ খ্রি) মাসে দাউদ হামদান থেকে জুনজানের দিকে যাত্রা করেন। ইতিমধ্যে তিনি খবর পান যে, সুলতান মাসঊদ জুরজান থেকে এসে তাবরিজ অধিকার করে বসেছেন। কালবিলম্ব না করে দাউদ তাবরিজ অভিমুখে রওয়ানা হয়ে পড়লেন। ৫২৬ হিজরীর মুহাররম মাসে (১১৩১ খ্রি) তিনি তাবরিজ অবরোধ করলেন। চাচা-ভাতিজার মধ্যে বেশ ক'টি যুদ্ধ হওয়ার পর অবশেষে উভয়ের মধ্যে সন্ধি হয়। দাউদ তাবরিজ থেকে হামদানে ফিরে যান। মাসঊদ তাবরিজ থেকে বের হয়েই সৈন্য সংগ্রহে মনোযোগী হন এবং যখন একটি বিরাট বাহিনী তিনি গঠন করতে সমর্থ হলেন তখন খলীফা মুসতারশিদের কাছে বাগদাদে এ মর্মে পয়গাম পাঠালেন যে, বাগদাদে যেন তাঁর নামে খুতবা পাঠ করা হয়। উত্তরে খলীফা জানিয়ে দিলেন যে, এখন খুতবায় যেহেতু সুলতান সঞ্জরের নাম পঠিত হয়, তাই আপাতত তোমার বা দাউদের নাম পাঠের অবকাশ নেই। ইতিমধ্যে সালজুক শাহ ইব্‌ন সুলতান মুহাম্মদ এক বিরাট বাহিনী সংগঠিত করে বাগদাদে এসে উপস্থিত হলেন। খলীফা তাঁর সাথে সম্মানজনক আচরণ করলেন। এদিকে সুলতান ও ইমাদুদ্দীন জঙ্গী একত্রিত হয়ে বাগদাদ অভিমুখে রওয়ানা হয়ে পড়লেন। তাঁরা আব্বাসীয়া নামক স্থানে এসে অবস্থান গ্রহণ করলেন। সালজুক শাহ তাঁদের সাথে মুকাবিলার প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। তিনি কুরাজা সাকীকে তাঁদের বিরুদ্ধে রওয়ানা করলেন। ইমাদুদ্দীন জঙ্গী তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর জঙ্গী পরাস্ত হলেন। ইমাদুদ্দীন জঙ্গী পরাস্ত হয়ে তিকরীতের দিকে চলে গেলেন। তিকরীতে তখন

সুলতান সালাহুদ্দীনের পিতা নাজমুদ্দীন আইয়ুব শাসক ছিলেন। ইমাদুদ্দীন জঙ্গীর অবতরণের জন্যে তিনি নৌকাও সরবরাহ করেন এবং সেতুও বাঁধিয়ে দেন। জঙ্গী সাগর পার হয়ে মুসেলের পথ ধরেন। সুলতান মাসউদ চিঠিপত্র লিখে সালজুক শাহ ও খলীফাকে এ কথায় সম্মত করতে সমর্থ হন যে, ইরাকের শাসনক্ষমতা সুলতান মাসউদের হাতেই থাকবে। ইরাকের শাসনক্ষমতা ছাড়াও মাসউদ শাহ্ আরেকটি আনুকূল্য লাভ করবেন। সেটি হলো খুতবায় সুলতান মাসউদের পরে সালজুক শাহের নাম উচ্চারিত হবে। সে অনুসারে মাসউদ শাহ্ ৫৩৬ হিজরীর জুমাদালউলা (ডিসেম্বর ১১৪১ খ্রি) মাসে বাগদাদে প্রবেশ করেন এবং চুক্তিপত্র লিখিত হয়।

উপরেই বলা হয়েছে, সুলতান তুগরিল তাঁর চাচা সুলতান সঞ্জরের সাথে রয়েছেন। পাহাড়ে আত্মগোপনকারী দাবীসও সুলতান সঞ্জরের কাছে পৌঁছে যান। এসব অবগত হয়ে সুলতান সঞ্জর তুগরিল ও দাবীস সমভিব্যাহারে রে-এর দিকে অগ্রসর হলেন। সেখান থেকে যান হামদানে। সেদিক থেকে মাসউদ শাহ্ ও সালজুকশাহ্ তাঁদের সাথে কুরাজা সাবীকে নিয়ে সঞ্জরকে প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে বাগদাদ থেকে রওয়ানা হন। সঞ্জর আস্তর আবাদ থেকে অগ্রসর হয়ে মাসউদ ও সালজুক শাহর মুকাবিলা করেন এবং তাদেরকে যুদ্ধে পরাস্ত করে তাড়িয়ে দেন। সুলতান সঞ্জর মাসউদ ও সালজুকের অপরাধ ক্ষমা করে তাদেরকে কাছে ডেকে স্বস্থানে রাখেন এবং আপন ভ্রাতুস্পুত্র তুগরিলকে ইরাকের শাসনক্ষমতা ছেড়ে দেন। তিনি খুতবায়ও তাঁর নাম জারি করে দেন। ইতিমধ্যে অর্থাৎ ৫২৭ হিজরীর যিলহজ্জ (অক্টোবর ১১৩৩ খ্রি) মাসে সংবাদ আসলো যে, মাওরাউন নাহরের গভর্নর বিদ্রোহ ঘোষণা করে সামরিক প্রস্তুতি গ্রহণে তৎপর হয়ে উঠেছেন। মালিক সঞ্জরকে কালবিলম্ব না করে খুরাসানের দিকে যাত্রা করতে হলো। সে সময় সুলতান দাউদ ইব্ন আহমদ আযারবায়জানের দিকে ছিলেন। তিনি সৈন্য সংগ্রহ করে হামদানের দিকে অগ্রসর হলেন। ওদিক থেকে মুকাবিলার জন্যে তুগরিল অগ্রসর হলেন। দাউদ যুদ্ধে পরাস্ত হলেন। পরাজিত হয়ে তিনি বাগদাদে যান। সুলতান মাসউদ ও সুলতান সঞ্জরের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে বাগদাদে আসেন। দাউদ ও মাসউদ উভয়ে মিলিত হয়ে খলীফার কাছে আযারবায়জান অধিকার করে নেয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। খলীফা তাঁদেরকে অনুমতি দিলে তাঁরা মালিক তুগরিলের কর্মচারীদেরকে তাড়িয়ে দিয়ে আযারবায়জান অধিকার করে নিলেন। তুগরিল মুকাবিলা করতে এসে যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে পালিয়ে যান। সুলতান মাসউদ হামদান দখল করে নিলেন এবং সুলতান দাউদ আযারবায়জানে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। সুলতান মাসউদের নিকট হামদানে যখন খবর পৌঁছল যে, সুলতান দাউদ আযারবায়জানে স্বায়ত্তশাসনের কথা ঘোষণা করে বিদ্রোহ করে বসেছেন, তখন তিনি আযারবায়জান অভিমুখে রওয়ানা হয়ে পড়লেন। মওকা বুঝে মালিক তুগরিল সৈন্য সংগ্রহ করে বিলাদে-জবল তথা পার্বত্য এলাকা জয়ে মনোনিবেশ করলেন। সুলতান মাসউদ তাঁর মুকাবিলায় অবতীর্ণ হলেন। তুগরিল সুলতান মাসউদকে ৫২৮ হিজরীর রমযান (জুলাই, ১১৩৪ খ্রি) মাসে পরাস্ত করে তাড়িয়ে দেন। সুলতান পরাস্ত হয়ে বাগদাদে চলে আসেন। তুগরিল হামদানে চলে আসেন।

মোদ্দাকথা সালজুকীদের গৃহবিবাদের ঘটনা অনেক দীর্ঘ এবং বিরক্তিকর। সুলতান তুগরিলের মৃত্যু হলে সুলতান মাসউদ ইরাকে তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করলেন। খলীফা

মুসতারশিদ ও সুলতান মাসউদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। খলীফা তাঁর বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হলে উভয়পক্ষে যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়। খলীফার সৈন্যরা তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করে। ফলে খলীফা পরাস্ত হয়ে হামদানের এক দুর্গে বন্দী হলেন। এ সংবাদ বাগদাদে পৌঁছলে শহরবাসীর মাতম শুরু হয়ে যায়। এ সময় উপর্যুপরি কয়েকদিন ইরাক ও খুরাসানে ভূমিকম্প হয়। সুলতান সঞ্জর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র সুলতান মাসউদকে লিখে পাঠালেন যে, কালবিলম্ব না করে তুমি খলীফার কাছে গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা কর। ভূমিকম্প আসা এবং লোকদের মসজিদে নামাযের জন্যে না আসাটা কোন মামুলী ব্যাপার নয়। আমীরুল মু'মিনীনকে সসম্মানে রাজধানী বাগদাদে পাঠিয়ে দাও! সুলতান মাসউদ সুলতান সঞ্জরের আদেশ যথারীতি পালন করে স্বয়ং খলীফার দরবারে গিয়ে হাযির হলেন। যে সৈন্যরা সে সময় সুলতান মাসউদের সাথে গিয়েছিল তাদের মধ্যে যে ১৭ জন কারামিতা বা বাতেনী সম্প্রদায়ের লোকও ছিল তা সুলতান মাহমূদের নিজেরও জানা ছিল না। তারা খলীফার তাঁবুতে প্রবেশ করে তাঁর উপর চড়াও হয় এবং তাঁকে হত্যা করে। খলীফার এ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের খবর লোকজনের মধ্যে প্রচারিত হতেই বাতেনীদেরকে গ্রেফতার করা হয় এবং তাদের সকলকে হত্যা করা হয়। সুলতান মাসউদ নিজেও খুবই মর্মাহত হন। এ সংবাদ বাগদাদে পৌঁছলে সেখানে এক অবর্ণনীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়। ঘরে ঘরে মাতম শুরু হয়ে যায়। খলীফা মুসতারশিদের পুত্র আবূ জা'ফর মানসূর সিংহাসনে আরোহণ করলেন এবং তিনি রাশিদ বিল্লাহ্ খেতাব গ্রহণ করলেন।

রাশিদ বিল্লাহ্

রাশিদ বিল্লাহ্ ইব্ন মুসতারশিদ বিল্লাহ্ ৫০০ হিজরী (১১০৬ খ্রি) সালে জনৈকা দাসীর গর্ভে ভূমিষ্ঠ হন। জন্মের সময় তাঁর মলদ্বার ছিল না। চিকিৎসকরা একটি রৌপ্যনির্মিত অস্ত্রের দ্বারা ছিদ্র করে দিলে সে সমস্যার সমাধান হয়।

রাশিদ বিল্লাহ্ যখন বাগদাদে সিংহাসনে আরোহণ করেন, সুলতান মাসউদ তখন বাগদাদে ছিলেন না। রাশিদ বিল্লাহ্র নামে শহরে শহরে খুতবা পাঠ করা হলো। রাশিদ বিল্লাহ্ সিংহাসনে বসেই অত্যাচার-নিপীড়ন শুরু করলেন। তিনি অন্যায়ভাবে অনেকের সম্পদ কুক্ষিগত করলেন। লোকজন খলীফার বিরুদ্ধে শাহ্ মাসউদের কাছে অভিযোগ লিখে পাঠালেন। সুলতান মাসউদ তখন বাগদাদ অভিমুখে রওয়ানা হলেন। সুলতান মাসউদের বাগদাদের দিকে আসার খবর পেয়ে রাশিদ বিল্লাহ্ মুসেলের দিকে চলে যান। সুলতান মাসউদ বাগদাদে উপনীত হয়ে যথারীতি একটি অভিযোগপত্র তৈয়ার করালেন। তাতে যথারীতি এ মর্মে অনেক শহরবাসীর সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করা হলো যে, খলীফা অমুক অমুক ব্যক্তির নিকট থেকে অবৈধভাবে অর্থ কুক্ষিগত করেছেন, রক্তপাত ঘটিয়েছেন এবং মদ্যপান করেছেন। এ অভিযোগ পত্রখানা ফকীহ্ এবং কাযীদের নিকট প্রেরণ করে তিনি ফতওয়া তলব করলেন যে, খলীফা যদি এরূপ অবৈধ কার্যকলাপে লিপ্ত হন তবে নায়েবে সালতানাত খলীফাকে পদচ্যুত করতে পারেন কি না! জবাবে শহরের প্রধান কাযী ফতওয়া দিলেন যে, এরূপ অবস্থায় নায়েবে সালতানাত খলীফাকে পদচ্যুত করতে পারেন। সুলতান মাসউদ সেমতে কাজ করলেন। তিনি রাশিদ বিল্লাহর চাচা মুহাম্মদ ইব্ন মুসতাযহিরকে সিংহাসনে বসিয়ে তাঁর হাতে বায়আত

করলেন এবং সাথে সাথে রাশিদ বিল্লাহকে পদচ্যুত করার কথা ঘোষণা করে দিলেন। এটা হচ্ছে ৬ই যিলকদের ঘটনা।

রাশিদের খিলাফত এক বছর পর্যন্ত চলেছিল। মুহাম্মদ ইব্ন মুসতাযহির খলীফা হয়েই মুকতাফী বি-আমরিল্লাহ্ লকব গ্রহণ করলেন। রাশিদ স্বীয় পদচ্যুতির সংবাদ শুনে আযারবায়জানের দিকে চলে যান। তিনি তাঁর সৈন্যদের মধ্যে ধন-সম্পদ বণ্টন করেন। আযারবায়জানের শহরগুলোতে তিনি লুটপাট চালিয়ে ধ্বংস করেন। তারপর যান হামদানে এবং সেখানেও বিপর্যয় সৃষ্টি করেন। লোকজনকে ধরে শূলিতে চড়ান, হত্যা করেন এবং আলিম-উলামাকে দাড়ি-মুণ্ডন করে অপদস্ত করেন। তারপর ইস্পাহানে গিয়ে সে শহর অবরোধ করে বসেন। এমনি সময় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। ৫৩২ হিজরীর ১৬ই রমযান (জুন, ১১৩৮ খ্রি) কয়েকজন অনারব তাঁর শিবিরে প্রবেশ করে তাকে ছুরিকাহত করে হত্যা করে। বাগদাদে রাশিদের হত্যার খবর পৌঁছলে তাঁর শোকে সেখানে একদিন অফিস-আদালত বন্ধ হয়। খলীফার আলোয়ান ও লাঠি মৃত্যুর সময় রাশিদের কাছে এসেছিল– যা তাঁর হত্যার পরে মুকতাফীর হাতে বাগদাদে পৌঁছানো হয়।

মুকতাফী লি-আমরিল্লাহ্

আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ মুকতাফী লি-আমরিল্লাহ্ ইব্ন মুসতাযহির বিল্লাহ্ ৪৭৯ হিজরীর ১২ই রবিউল আউয়াল (জুলাই ১০৮৬ খ্রি) জনৈকা আবিসিনীয় দাসীর গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হন। ৫৩০ হিজরীর ১২ই যিলহজ্জ (সেপ্টেম্বর ১১৩৬ খ্রি) তিনি খলীফার আসনে আসীন হন। এর অব্যবহিত পরেই সুলতান মাসউদ সুলতান দাউদকে দখলের উদ্দেশ্যে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। দাউদ সারাগা নামক স্থানে যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে খুজিস্থানে পৌঁছে সৈন্য সংগ্রহে মনোযোগী হন এবং তশতর অবরোধ করেন। ওয়াসিতের শাসনকর্তা সালজুক শাহ্ সুলতান মাসউদের নির্দেশক্রমে তশতর রক্ষার নিমিত্তে অগ্রসর হলে যুদ্ধে দাউদের নিকট পরাস্ত হয়ে ফিরে যান। সুলতান মাসউদ রাশিদের দ্বারা বাগদাদ আক্রান্ত হতে পারে এ আশঙ্কায় বাগদাদ থেকে বের হওয়া সমীচীন মনে করলেন না। তিনি মুসেলের গভর্নর ইমাদুদ্দীন যঙ্গীকে খুতবায় মুকতাদীর নাম পাঠের লিখিত নির্দেশ পাঠালেন। ইমাদুদ্দীন যখন খুতবায় মুকতাদীর নাম পাঠ করলেন এবং রাশিদের নাম খুতবা থেকে খারিজ করে দিলেন তখন অসন্তুষ্ট হয়ে রাশিদ ৫২১ হিজরীর রজব (জুলাই ১১২৭ খ্রি) মাসে মুসেল ত্যাগ করলেন– যা উপরেই বলা হয়েছে। পারস্যের কতিপয় সর্দার রাশিদকে সহায়তা দানের উদ্দেশ্যে রাশিদের কাছে যেতে উদ্যোগী হন। এ সংবাদ অবগত হয়ে সুলতান মাসউদ বাগদাদ থেকে সসৈন্যে যাত্রা করেন এবং ৫৩২ হিজরীর শাবান (এপ্রিল ১১৩৮ খ্রি) মাসে তাদেরকে পরাস্ত করে ছত্রভঙ্গ করে দেন। তিনি সেখান থেকে আয়ারবায়জানের উদ্দেশে যাত্রা করেন। ওদিকে দাউদ, খাওয়ারিযম শাহ্ ও রাশিদ একত্রিত হয়ে সমবেতভাবে ইরাকের উদ্দেশে যাত্রা করেন। এ সংবাদ পেয়ে সুলতান মাসউদ বাগদাদ থেকে যাত্রা করেন। খাওয়ারিযম শাহ্ ও দাউদ উভয়েই রাশিদ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। রাশিদ ইস্পাহান অবরোধ করেন। ইতিমধ্যে কয়েকটি খুরাসানী গোলাম রাশিদকে হত্যা করে ফেলে। তাঁকে ইস্পাহানের শাদরিস্তানে দাফন করা হয়। এদিকে সালজুক শাহ্ ওয়াসিত থেকে এসে বাগদাদ আক্রমণ ও দখল করেন। চরম বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয়।

বাগদাদবাসীরা সালজুক শাহকে পরাস্ত করে বাগদাদ থেকে তাড়িয়ে দেয়। দেশের সর্বত্র এমনি অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হলো যে, ৫৩২ হিজরীতে (১১৩৭ খ্রি) বাগদাদ থেকে গেলাফে-কাবা পাঠানো সম্ভবপর হয়নি। পথেঘাটে শান্তি-শৃঙ্খলা বলতে কিছু ছিল না। ৫৩৩ হিজরীতে (১১৩৮ খ্রি) সুলতান মাসঊদ বাগদাদে এসে বাগদাদবাসীদের উপর থেকে অনেক প্রকার কর মওকুফ করে দেন। এমনি অবস্থায় কয়েক বছর অতিবাহিত হয়। সালজুকী বংশের অনেকের সাথে সাথে বাইরের অনেক সামন্ত-সর্দারও স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতার পাঁয়তারা করতে লাগলেন। সুলতান মাসঊদ তাঁর অনেক ঘনিষ্ঠ সর্দার ও সেনাপতিকে যাঁদের প্রতি তাঁর সন্দেহ ছিল অথচ তাঁরা তাঁর আয়ত্তাধীন ছিল তাদেরকে তিনি হত্যা করতে শুরু করলেন, কয়েকজন সর্দারকে তিনি ছলচাতুরীর মাধ্যমে বধ করেন। ফলে তিনি নিজে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়লেন। শেষ পর্যন্ত বাগদাদ ও ইরাককে পূর্ণ অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে ছেড়ে দিয়ে নিজে গিয়ে পার্বত্য এলাকায় বসবাস করতে লাগলেন। খলীফা মুকতাফী এ অবস্থার সুযোগ গ্রহণে একটুও ত্রুটি করলেন না। তিনি তাঁর প্রভাববলয় ও শক্তি শনৈ-শনৈ বৃদ্ধি করতে লাগলেন। দিন দিন খলীফা শক্তিশালী এবং সুলতান মাসঊদ ও সুলতান সঞ্জর দুর্বল হতে থাকেন। সুলতান সঞ্জর সুলতান মাসঊদকে ভর্ৎসনা করে চিঠি-পত্রাদি লিখলেন এবং নিজের বিশ্বস্ত সেনাপতিদেরকে হত্যার এবং বাগদাদ ত্যাগের কুফল বর্ণনা করলেন। অবশেষে ৫৪৪ হিজরীর শেষ দিকে (১১৪৯ খ্রি) সুলতান সঞ্জর রে-তে আগমন করেন। সুলতান মাসঊদও তাঁর খিদমতে এসে উপস্থিত হলেন। ৫৪৪ হিজরীর রবজ (নভেম্বর ১১৪৯ খ্রি) মাসে মালিক শাহ্ ইব্‌ন সুলতান মাহমূদ কতিপয় সর্দারকে সাথে নিয়ে বাগদাদ আক্রমণ করেন। খলীফা মুকতাফী শহরের দুর্গদ্বার বন্ধ করে দিয়ে আত্মরক্ষা করেন এবং সুলতান মাসঊদকে তলব করে পাঠান। কিন্তু রে-তে চাচা সুলতান সঞ্জরের কাছে অবস্থানরত সুলতান মাসঊদ সেখান থেকে এসে উঠতে পারেননি। মালিক শাহ বাগদাদে প্রবেশে ব্যর্থ হয়ে নাহরওয়ানে লুটপাট করে সে শহরটিকে বিরান করে দেন। এরপর ৫৪৪ হিজরীর ১৫ শাওয়াল (ফেব্রুয়ারী ১১৫০ খ্রি) মাসঊদ বাগদাদে পদার্পণ করেন। এরপর ৫৪৫ হিজরী (১১৫০ খ্রি)তে হামদানে চলে যান। ৫৪৭ হিজরীর ১লা রজব (অক্টোবর ১১৫২ খ্রি) সুলতান মাসঊদ ইন্তিকাল করেন। সুলতান মাসঊদের উযীর খাস বেগ তাঁর স্থলে মালিক শাহ্ ইব্‌ন সুলতান মাহমূদকে স্থলাভিষিক্ত করেন। কিন্তু সুলতান মাসঊদের মৃত্যুর পর বাগদাদে সালজুকীদের প্রভাব-প্রতিপত্তি দিন দিন খর্ব হতে থাকে। এ বংশের আর এমন কেউ রইল না যে আমীর ও সুলতানের মর্যাদা নিয়ে থাকতে পারে। এ জন্যে সুলতান মাহমূদকে সালজুকীদের শেষ পুরুষ বলে ধারণা করা হয়ে থাকে।

মালিখ শাহ্ সিংহাসনে আরোহণ করেই জনৈক সর্দারকে হাল্লা অধিকারের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। ঐ ব্যক্তি হাল্লা দখল করলেন। বাগদাদের কোতওয়াল জনৈক জালাল হাল্লায় গিয়ে মালিক শাহর প্রেরিত সেই সর্দারকে হত্যা করে নিজে হাল্লায় স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে শুরু করে দেয়। খলীফা মুকতাফী স্বয়ং সসৈন্যে হাল্লা আক্রমণ করে নগরবাসীদের আনুগত্যের শপথ আদায় করেন। এরপর খলীফা ওয়াসিত আক্রমণ করে তাও জয় করে ৫৪৭ হিজরীর ১০ই যিলকদ (ফেব্রুয়ারী ১১৫৩ খ্রি) বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করেন। ৫৪৮ হিজরী (১১৫৩ খ্রি)তে খলীফা তাঁর উযীর পুত্র ও আমীর তুরশুক উভয়কে তিকরীত জয়ের উদ্দেশ্যে প্রেরণ

করলেন। তাদের দুজনের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। উযীরপুত্রকে তিকরীতবাসীদের হাতে গ্রেফতার করিয়ে দিয়ে আমীর তুরস্তক নিজে খুরাসানের উদ্দেশে যাত্রা করেন। তিনি পথিমধ্যে লুটতরাজ করেন। ৫৪৯ হিজরী (১১৫৪ খ্রি)-তে খলীফা মুকতাফী নিজে তিকরীত আক্রমণ করে নগরটি পদানত করেন কিন্তু তিকরীতের দুর্গ অজেয়ই রয়ে যায়। খলীফা বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করে তাঁর উযীরকে দুর্গ বিধ্বংসী মিনজানিক সাথে দিয়ে তিকরীত দুর্গ জয়ের জন্যে প্রেরণ করলেন। উযীর সেখানে গিয়ে দুর্গ অবরোধ করলেন। এদিকে আরসালান ইব্ন তুগরিল ইব্ন সুলতান মুহাম্মদ একটি বাহিনী নিয়ে উযীরের উপর আক্রমণ চালান। এ সংবাদ অবগত হয়ে স্বয়ং খলীফা মুকতাফী একটি বাহিনী নিয়ে বাগদাদ থেকে রওয়ানা হন। আকর বাবেল নামক স্থানে উভয় বাহিনীর মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়। দীর্ঘ আঠার দিন যুদ্ধের পর খলীফার বাহিনীর অধিকাংশ সৈন্যই ফেরার হয়ে যায়, কিন্তু খলীফা অত্যন্ত বীরত্বের সাথে অবশিষ্ট সৈন্যদেরকে নিয়ে মুকাবিলা করেন। শেষ পর্যন্ত খলীফার জয় হয়। আরসালান ইব্ন তুগরিল ও তাঁর সঙ্গী-সাথীরা রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যান। ৫৪৯ হিজরীর ১লা শাবান (অক্টোবর ১১৫৪ খ্রি) খলীফা বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করেন। ৫৫০ হিজরী (১১৫৫ খ্রি)তে খলীফা ওকূকা আক্রমণ করেন কিন্তু কয়েকদিন অবরোধ করে থাকার পর বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করেন।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ৪৯০ হিজরী (১০৯৬ খ্রি)তে সুলতান বারকিয়ারুক সুলতান সঞ্জরকে খুজিস্তানের শাসনক্ষমতা ছেড়ে দিয়েছিলেন। যখন সুলতান মুহাম্মদ ও সুলতান বারকিয়ারুকের মধ্যে বিরোধ-সৃষ্টি ও লড়াই হয় তখন সুলতান মুহাম্মদ তাঁর সহোদর সঞ্জরকে খুরাসানের শাসনক্ষমতা ছেড়ে দেন। তখন থেকে খুরাসান বরাবরই সুলতান সঞ্জরের অধিকারে ছিল এবং সুলতান মুহাম্মদের পুত্ররা তাঁকে ইরাকের সুলতান বলেই অভিহিত করতেন। ৫৩৬ হিজরী (১১৪১ খ্রি)তে তুরকান খাতা নামে অভিহিত একটি গোষ্ঠী মাওরাউন নাহর এলাকাটি তুর্কিস্তানের খানদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নেন। সুলতান সঞ্জর এই খাতা গোষ্ঠীর লোকজনকে মাওরাউন নাহর এলাকা থেকে বহিষ্কারের চেষ্টা করেও সফল হতে পারেননি বরং তাদের সাথে যুদ্ধে তাঁর অনেক অভিজ্ঞ সেনাপতি নিহত হন। সুলতান সঞ্জর হীনবল হয়ে পড়ায় তাঁর অধীনস্থ শাসকদের শক্তি বৃদ্ধি পায়। এ প্রসঙ্গে খাওয়ারিযম শাহর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। ইনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। মাওরাউন নাহ্‌রে বসবাসকারী তুর্কী গুজ সম্প্রদায়ের লোকজনও খুরাসানে এসে লুটপাট ও অশান্তি সৃষ্টি করতে থাকে।

৫৪৮ হিজরী (১১৫৩ খ্রি)-তে ঐ তুর্কীদের এবং সুলতান সঞ্জরের মধ্যে লড়াই হয়। যুদ্ধে সুলতান সঞ্জরকে পরাস্ত করে তাঁরা তাঁকে তাদের সাথে বন্দী করে রাখে এবং খুরাসানের শহরসমূহে লুটপাট চালাতে থাকে। মাওরাউন নাহর এরা খাতা তুর্কীদেরকেও পরাস্ত করতে থাকে। গুজ তুর্কীরা সুলতান সঞ্জরকে গ্রেফতার করে একজন সহিসের সমান বেতন-ভাতা তাঁর জন্যে নির্ধারণ করে। সারকথা হলো, গোটা খুরাসান এলাকায় খুতবা কিন্তু তারা সুলতান সঞ্জরের নামেই দিত। ৫১১ হিজরী (১১১৭ খ্রি)-তে সুলতান সঞ্জর তাদের কবল থেকে মুক্ত হয়ে ৫৫২ হিজরী (১১৫৭ খ্রি)-তে ব্যর্থকাম অবস্থায়ই তাঁর মৃত্যু হয়। তারপর খাওয়ারিযম শাহ্ ও তাঁর বংশধররা গোটা খুরাসান এলাকা অধিকার করে বসেন। ইস্পাহান ও রে প্রদেশসমূহ সবুক্তগীনের বংশধরদের অধীনে চলে যায়। তারা চেঙ্গীয খানের অভ্যুদয় পর্যন্ত এসব এলাকায় ক্ষমতাসীন থাকে। মোটকথা খলীফা মুকতাফী ইব্ন আমরিল্লাহর আমলেই

খাওয়ারিযম শাহী রাজত্বের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। ৫৪৯ হিজরী (১১৫৪ খ্রি)-তে খলীফা মুকতাফী আলেপ্পোর গভর্নর নূরউদ্দীন মাহমূদ ইব্‌ন ইমাদুদ্দীন যঙ্গীকে মিসরের দিকে যেতে নির্দেশ দেন যাতে তিনি সেখানকার উবায়দী শাসকের কাজকর্মে হস্তক্ষেপ করতে পারেন। ঐ বছরই খলীফা নূরুদ্দীন মাহমূদকে 'মালিকুল আদিল' বা ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ্ উপাধিতে ভূষিত করেন।

সুলায়মান শাহ্ ইব্‌ন সুলতান মুহাম্মদ আপন চাচা সুলতান সঞ্জরের কাছেই থাকতেন। সুলতান সঞ্জর তাঁকেই তাঁর পরবর্তী উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। সুলতান সঞ্জর যখন তুর্কীদের হাতে বন্দী হয়ে পড়েন তখন তিনিই তুর্কীদের অবশিষ্ট বাহিনীর নেতৃত্ব প্রদান করেন। খুরাসানে তাঁর কোন নিরাপদ আশ্রয় স্থল নেই দেখে তিনি বাগদাদে চলে আসেন। ৫৫১ হিজরীর মুহাররম (ফেব্রুয়ারী ১১৫৬ খ্রি) মাসে তিনি খলীফার দরবারে হাযির হন এবং খলীফার হাতে বায়আত হয়ে নায়েবে সালতানাত মনোনীত হন। বাগদাদে তাঁর নামে খুতবা পাঠ করা হয়। ৫৫১ হিজরী (১১৫৬ খ্রি)-তে সুলায়মান শাহ্ বাগদাদ থেকে পার্বত্য এলাকার দিকে রওয়ানা হয়ে পড়েন। ৫৫১ হিজরীর যিলহজ্জ (ফেব্রুয়ারী ১১৫৭ খ্রি) মাসে সুলতান মাহমূদ মুসেলের গভর্নর ও অন্যান্য সর্দারকে সাথে নিয়ে বাগদাদ আক্রমণ করেন এবং শহর অবরোধ করে বসেন। মুসেলের সেনাপতি কুতবুদ্দীনকে তাঁর অগ্রজ নূরুদ্দীন যঙ্গী এ মর্মে তিরস্কার করে পত্র লিখেন যে, বাগদাদ অবরোধে তোমার অংশগ্রহণ করা উচিত হয়নি। তাই কুতবুদ্দীন যঙ্গী খলীফার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পিছপা হচ্ছিলেন। ফলে ৫৫২ হিজরীর রবিউল আউয়াল (এপ্রিল ১১৫৭ খ্রি) মাসে সুলতান মুহাম্মদ ইব্‌ন মাহমূদ অবরোধ উঠিয়ে নিয়ে হামদানের দিকে রওয়ানা হয়ে পড়লেন। কুতবুদ্দীন মুসেলের দিকে যাত্রা করলেন। সুলতান মুহাম্মদ ইব্‌ন মাহমূদ ইব্‌ন মালিক শাহ্ বাগদাদ অবরোধের পর ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়ে হামদানে অবস্থান করেন এবং ৫৫৪ হিজরীর যিলহজ্জ মাসে (১১৬০ খ্রি জানুয়ারী) সেখানেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। তারপর সালজুকী শাহযাদাদের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়। অবশেষে মুসেলে কুতবুদ্দীন যঙ্গীর কঠোর প্রহরাধীন সুলতান মুহাম্মদের চাচা সুলায়মান শাহকে ডেকে এনে সিংহাসনে বসানো হয়। অবশেষে তাঁরই রাজত্ব কায়েম হয়ে যায়। কিন্তু সুলায়মান শাহের শরফুদ্দীন নামক জনৈক সর্দার তাঁকে আর তাঁর উযীরকে হত্যা করে ফেলে। তারপর শরফুদ্দীন আরসালান শাহ্ ইব্‌ন তুগরিলকে সিংহাসনে বসাতে মনস্থ করেন এবং তাঁর আতাবেক এলিদুযকে আরসালান শাহকে সাথে নিয়ে হামদানে চলে আসতে লিখে পাঠান। সে মতে এলিদুয সসৈন্যে হামদানে এসে পৌঁছেন এবং তথায় আরসালান শাহের নামে খুতবা পাঠ করান। এলিদুয ছিলেন সুলতান মাসউদের জনৈক দাস। সুলতান তুগরিলের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী অর্থাৎ আরসালান শাহর মায়ের পাণি গ্রহণ করেন। আরসালান শাহর অভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হলে এবার তিনিই হলেন তার আতাবেক আযম বা প্রধান উপদেষ্টা। তিনি বাগদাদে খলীফার দরবারে আরসালান শাহর নামে খুতবা পাঠ করাবার আবেদন লিখে পাঠান। খলীফা তার দূতকে অপমান করে দরবার থেকে বের করে দেন। খলীফার উযীর ছিলেন মাহমূদ ইব্‌ন মালিক শাহর অভিষেকের পক্ষপাতী যিনি ছিলেন একজন অল্প বয়স্ক বালক এবং যাকে তাঁর পিতার মুসাহেবেরা পারস্যে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে পারস্যে গভর্নর যঙ্গী ইব্‌ন ওকালা সালগরী তাদের নিকট থেকে মাহমূদকে ছিনিয়ে নিয়ে আস্তখর কেল্লায় বন্দী করে

রেখেছিলেন। খলীফার উযীর আউনুদ্দীন আবুল মুযাফফার ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হুবায়রা তাঁকে এ মর্মে নির্দেশ পাঠালেন যে, তুমি অবিলম্বে মাহমূদকে মুক্ত করে তার হাতে বায়আত হয়ে তোমার শাসনাধীন এলাকায় তাঁর নামে খুতবার প্রবর্তন কর। যঙ্গী সেমতে কাজ করেন।

এদিকে এলিদকুযকে এ মর্মে লিখে পাঠান যে, তুমি আরসালান শাহের আনুগত্যের শপথ গ্রহণ কর। যঙ্গী তা প্রত্যাখ্যান করে সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করেন। উভয় পক্ষে বেশ ক'টি যুদ্ধ হয়, কিন্তু তাতে তেমন কোন ফলাফল আসেনি।

খলীফা মুকতাফী লি-আমরিল্লাহ্ চব্বিশ বছর চার মাসকাল খিলাফত পরিচালনার পর ৫৫৫ হিজরীর ২রা রবিউল আউয়াল (১১৬০ খ্রি) ইন্তিকাল করেন। তাঁর পুত্র আবুল মুযাফফর ইউসুফ মুসতানজিদ বিল্লাহ্ উপাধি গ্রহণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

মুকতাফী লি-আমরিল্লাহ্ সালজুকী সুলতানদের আধিপত্য থেকে নিজেকে মুক্ত করে ইরাক ও বাগদাদে স্বাধীনসত্তা নিয়ে রাজত্ব করেন। এ জন্যে তিনি আব্বাসীয় শেষ দুর্বল খলীফাদের মধ্যে একজন শক্তিমান খলীফা বলে গণ্য হয়ে থাকেন।

দায়লামী ও সালজুকী

দায়লামী অর্থাৎ বুওয়াইয়ারা ক্ষমতা লাভ করে আব্বাসীয় খলীফাদের সম্ভ্রম নষ্ট করে। তারা তাদের রাজত্বকালে ইসলামী খিলাফতের প্রভূত ক্ষতিসাধন করে। তাদের শাসনামলে শিয়া-সুন্নী দাঙ্গাও প্রায়ই লেগে থাকতো। ফলে, অহরহ মুসলমানদের শক্তি ক্ষয় হতে থাকে। তাদের পরে যখন সালজুকীরা তাদের স্থলাভিষিক্ত ও ক্ষমতার অধিকারী হলেন, তখন খিলাফত ও খলীফাগণের সম্ভ্রম বৃদ্ধি পায়। সালজুকীরা আব্বাসীয় খলীফাদের সাথে সম্ভ্রমপূর্ণ আচরণ করতেন। তাঁরা খলীফাদের একান্তই ভক্ত অনুরক্ত ছিলেন।

সালজুকীদের ক্ষমতা বুওয়াইয়াদের তুলনায় অনেক বেশি ছিল। সালজুকী সুলতানরা সামগ্রিকভাবে খলীফার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেননি। সালজুকী আমলে মুসলমানদের হৃত গৌরব ও শক্তি পুনরুদ্ধার হয়। সালজুকীদের রাজ্যশাসন দক্ষতাও বুওয়াইয়াদের তুলনায় অনেকগুণ বেশি ছিল। শেষ দিকে আত্মকলহ ও গৃহবিবাদে সালজুকীরাও শাসনক্ষমতা হারিয়ে বসে এবং তাদের যুগের অবসান ঘটে। অবশ্য, ছোট ছোট সামন্ত রাজ্যে আরো অনেক দিন পর্যন্ত তাদের শাসন চলতে দেখা যায়। কিন্তু নায়েবে সালতানাত এবং মুসলিম সাম্রাজ্যের অভিভাবকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন আর তাঁদের পক্ষে সম্ভবপর হয়নি।

মুস্তানজিদ বিল্লাহ

মুস্তানজিদ বিল্লাহ্ ইব্ন মুকতাফী লি-আমরিল্লাহ ৫১০ হিজরীর রবিউস সানী (আগস্ট ১১১৬ খ্রি) মাসে তানেকা গুরজিস্তানী দাসীর গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মার নাম ছিল তাউস। ৫৪৭ হিজরী (১১৫২ খ্রি)তে তিনি উত্তরাধিকারী মনোনীত হন এবং পিতার মৃত্যুর পর ৫৫৫ হিজরী (১১৬০ খ্রি)তে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ৫৫৬ হিজরী (১১৬১ খ্রি)তে তুর্কমেন গোষ্ঠী, কুর্দীরা এবং সর্বশেষ আরবরা একের পর এক বিদ্রোহ করেন। খলীফা মুস্তানজিদ এসব বিদ্রোহ দমন করেন। হাল্লা নামক স্থানে বনী আসাদ গোত্রের লোকদের সংখ্যাধিক্য ছিল। তাদের মধ্যে বিদ্রোহের লক্ষণ দেখা দিলে ৫৫৮ হিজরী (১১৬২ খ্রি)তে

খলীফা সমগ্র বনী আসাদ গোত্রের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালিয়ে তাদেরকে ইরাক থেকে বহিষ্কার করেন। ৫৫৯ হিজরীতে (১১৬৩ খ্রি)তে ওয়াসিতে বিদ্রোহ দেখা দিলে তাও সামরিক বাহিনীর সাহায্যে দমন করা হয়। ৫৬০ হিজরী (১১৬৪ খ্রি)তে খলীফার উযীর আঈনুদ্দীনের মৃত্যু হয়। ৫৬৩ হিরজীতে (১১৬৭ খ্রি) মিসরের শেষ উবায়দী শাসক আযিদ লি-দীনিল্লাহ্-এর উযীর শাওর ইব্ন সাওয়ার নিজের হাতে ক্ষমতা তুলে নিয়ে তাঁকে মিসর থেকে তাড়িয়ে দেন। শাওর মিসর থেকে মালিকুল আদিল নূরুদ্দীন যঙ্গীর কাছে আসেন। নূরুদ্দীন ছিলেন সালজুকী সুলতানদের একজন সেনাপতি বা সর্দার।

তাঁর পিতা ইমাদুদ্দীন যঙ্গীর কথা উপরেই বিবৃত হয়েছে। নূরুদ্দীন মাহমূদ যঙ্গী আলেপ্পো, সিরিয়া প্রভৃতি রাজ্য অধিকার করে রেখেছিলেন। তিনি বাগদাদের খলীফার অনুগত ছিলেন। নূরুদ্দীন মাহমূদের সর্দারদের মধ্যে নজমুদ্দীন আইয়ূব (যার বর্ণনা ইতিপূর্বেই এসেছে) এবং তাঁর পুত্র সালাহুদ্দীন ইউসুফ ইব্ন নজমুদ্দীন ইউসুফ এবং নজমুদ্দীন আইয়ূবের ভাই আসাদুদ্দীন শেরকোহ উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মালিকুল আদিল নূরুদ্দীন মাহমূদ সেনাপতি আমীর আসাদুদ্দীন শেরকোহকে দুই হাজার অশ্বারোহী সৈন্য দিয়ে মিসরের দিকে রওয়ানা করেন। শেরকোহ ইব্ন শাওয়ারকে খতম করেন। কিন্তু শাওয়ার নূরুদ্দীনের দরবারে গিয়ে যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিলেন তা পূর্ণ করলেন না। এটা ছিল একটা দুর্যোগকাল। এই সময় ক্রুসেডাররা সিরিয়া ও মিসরের উপকূল অঞ্চলে আঘাত হেনে উপকূলীয় এলাকাসমূহ দখল করে নিয়েছিল। শেরকোহকে এ খ্রিস্টানদেরকেও দেশ থেকে বের করে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হলো। শেরকোহ এবং তার ভ্রাতুষ্পুত্র সালাহুদ্দীন দীর্ঘ কয়েক মাসের যুদ্ধে ফিরিঙ্গীদেরকে মিসর থেকে বহিষ্কার করে দেন এবং নিজে সিরিয়ার দিকে চলে আসেন। ৫৬৪ হিজরী (১১৬৮ খ্রি)-তে ক্রুসেডাররা পুনরায় মিসরের উপর হামলা চালায়। আযিদ লি-দীনিল্লাহ পুনরায় সাহায্যের জন্য মালিকুল আদিল নূরুদ্দীন যঙ্গীর শরণাপন্ন হলেন। নূরুদ্দীন সালাহুদ্দীনকে সাথে দিয়ে পুনরায় শেরকোহকে মিসরের দিকে প্রেরণ করলেন। ক্রুসেডাররা শেরকোহর আগমনের সংবাদ পেয়ে পলায়ন করলো। আযিদ লি-দীনিল্লাহ শেরকোহকে নিজের উযীর পদ দান করে তাঁকে তাঁর নিজের নিকট রেখে দিলেন। শাওর বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করলেন। শেরকোহ কালবিলম্ব না করে তাকে খতম করে দেন এবং অত্যন্ত শান্তি-শৃঙ্খলার সাথে উযীররূপে দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। এক বছর পর ৫৬৫ হিজরী (১১৬৯ খ্রি)তে মিসরে শেরকোহ মৃত্যুমুখে পতিত হন। মিসরের শাসক আযিদ লি-দীনিল্লাহ্ শেরকোহের ভ্রাতুষ্পুত্র সালাহুদ্দীন ইউসুফকে উযীর মনোনীত করেন। শেরকোহ এবং সালাহুদ্দীন উভয়েই তাঁদের পুরাতন মনিব সুলতান নূরুদ্দীন মাহমূদের প্রতিও অত্যন্ত বিশ্বস্ত এবং তাঁর অনুগত ছিলেন। এভাবে সিরিয়া ও মিসরের উভয় দেশের ইসলামী শক্তি সম্মিলিতভাবে ঈসায়ী হামলার মুকাবিলায় শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলে। এদিকে খলীফা মুসতানজিদ বিল্লাহও ইরাকের সমস্ত বিদ্রোহ দমনে সফলকাম হন। ফলে খলীফার আধিপত্য পুরোদমে প্রতিষ্ঠিত হয়। মালিকুল আদিল নূরুদ্দীন যঙ্গী খলীফা মুসতানজিদ বিল্লাহর পূর্ণ অনুগত এবং তাঁর প্রতিটি আদেশ মান্য করার জন্যে সদাপ্রস্তুত ছিলেন। সে জন্যে ঐ যুগটা ছিল শান্তিপূর্ণ এবং ইরাক, সিরিয়া ও মিসরের জন্যে সমৃদ্ধির যুগ। ৫৬৬ হিজরীর ৯ই রবিউস সানী (ডিসেম্বর ১১৭০ খ্রি) অসুস্থ হয়ে খলীফা মুসতানজিদ বিল্লাহ

ইন্তিকাল করেন। এই খলীফার আমলেই হযরত শায়খ আবদুল কাদির জিলানী (র) ইন্তিকাল করেন। মুসতানজিদের পর লোকজন তাঁর পুত্র আবূ মুহাম্মদ হাসানকে সিংহাসনে বসিয়ে মুস্তাযী বি-আমরিল্লাহ খেতাবে ভূষিত করেন।

মুস্তাযী বি-আমরিল্লাহ্

মুস্তাযী বি-আমরিল্লাহ্ ইব্ন মুসতানজিদ বিল্লাহ্ ৫৩৬ হিজরী (১১৪১ খ্রি)তে জনৈকা আর্মেনীয় দাসীর গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হন। সিংহাসনে বসেই তিনি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেন। প্রজাদের যাবতীয় কর মওকুফ করে দেন। তাঁর রাজত্বের প্রথম বছরই মিসরের উবায়দী শাসনের অবসান ঘটে। উপরেই বর্ণিত হয়েছে যে, সালাহুদ্দীন ইউসুফ শেষ উবায়দী শাসক আযিদ লি-দীনিল্লাহর উযীরে আযম হয়ে গিয়েছিলেন। সালাহুদ্দীন মিসরের বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দূর করে সর্বক্ষেত্রে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি প্রতিটি বিভাগের দায়িত্ব নিজ হাতে তুলে নিয়ে উত্তমভাবে রাজকার্য পরিচালনা করতে থাকেন। সিরিয়ার গভর্নর নূরুদ্দীন মাহমূদ যঙ্গী ৫৬৬ হিজরী (১১৭০ খ্রি)-র শেষ দিকে সুলতান সালাহুদ্দীনকে এ মর্মে ফরমান লিখে পাঠান যে, মিসরে খলীফা মুস্তাযী বিল্লাহ্ আব্বাসীর নামে খুতবা জারি কর। সালাহুদ্দীন ইউসুফ নিজেকে সুলতান নূরুদ্দীনের নায়েব বা প্রতিনিধিরূপে গণ্য করতেন। তিনি ভয়ে ভয়ে এ হুকুম তামিল করলেন। ৫৬৭ হিজরীর মুহাররম মাসের প্রথম দিকে (সেপ্টেম্বর ১১৭১ খ্রি) আশুরার পূর্বের জুমুআয় খলীফা মুস্তাযী বি-আমরিল্লাহর নাম খুতবায় শুনে জনগণ তা খুবই পছন্দ করল। এর কয়েকদিনের মধ্যেই ১০ই মুহাররম আযিদুদ্দীনের মৃত্যু হয়। পরবর্তী জুমুআয় সমগ্র মিসরে বাগদাদের খলীফার নামে খুতবা পাঠ করা হলো। সুলতান সালাহুদ্দীন যথারীতি এ সংবাদ সুলতান নূরুদ্দীনকে অবহিত করলেন। সুলতান নূরুদ্দীনও যথারীতি এ সুসংবাদ বাগদাদে প্রেরণ করলেন। এ সংবাদ বাগদাদে পৌঁছতেই খলীফা আনন্দে নহবত বাজালেন এবং গোটা বাগদাদে আলোকসজ্জা করলেন। খলীফা তাঁর খাস খাদেম এবং খলীফার প্রাসাদের রক্ষী সন্দলকে নূরুদ্দীনের কাছে পাঠালেন এবং তারই মাধ্যমে নূরুদ্দীন ও সালাহুদ্দীনের জন্যে বহুমূল্য খিলাত ও কৃষ্ণবর্ণ বিশেষ পতাকা প্রেরণ করলেন। সন্দলের উপস্থিতিতে নূরুদ্দীনও পরম উল্লাস প্রকাশ করেন এবং সালাহুদ্দীনের কাছে খলীফার খিলাত প্রেরণ করেন। মিসর থেকে উবায়দী রাজত্বের উচ্ছেদ ঘটলো এবং তথায় আইয়ূবী শাসনের পত্তন হলো। নূরুদ্দীনের কাছে সিরিয়া ও মুসেলের সমগ্র এলাকা ছিল। এবার খলীফা তাঁর নামে মিসর, সিরিয়া, জাযিরা, মুসেল, দিয়ারে বকর, খাল্লাত, বিলাদে রোম ও সাওয়াদে ইরাকের শাসনের সনদ লিখে দিয়ে ঐ সব এলাকায় তাঁকেই তাঁর নায়েবে সালতানাত বা ভাইসরয় মনোনীত করে সার্বিক দায়িত্ব অর্পণ করলেন। নূরুদ্দীনের পক্ষ থেকে সালাহুদ্দীন মিসরের সার্বিক দায়িত্বে রইলেন। সালাহুদ্দীন যেরূপ মিসরে নূরুদ্দীনের প্রতিনিধিত্ব করতেন, তেমনি নূরুদ্দীনও বাগদাদের খলীফার আনুগত্য করতেন। এবার খলীফা মুস্তাযীকে সকল রাজা-বাদশাহই ভয় ও সমীহ করতে লাগলেন। দূর-দূরান্ত পর্যন্ত তাঁর নামে খুতবা পঠিত হতে লাগলো। কেউ তাঁর বিরুদ্ধে টু শব্দটি করার সাহস পেত না। খলীফা কুতবুদ্দীন কায়েমাযকে সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করেছিলেন। ৫৭০ হিজরীতে (১১৭৪ খ্রি) কায়েমায

বাগদাদে খলীফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। খলীফা প্রাসাদে অবরুদ্ধ অবস্থায় প্রাসাদের ছাদের উপর থেকে উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে জনসাধারণকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ কুতবুদ্দীন কায়েমাযের ধন-সম্পদ তোমাদের জন্যে বৈধ করা হলো। এ ঘোষণা শোনামাত্র লোকজন তার বাড়ির দিকে ধাবিত হলো এবং চোখের পলকে তার সর্বস্ব লুটে নিল। কায়েমায বাগদাদ থেকে ফেরার হয়ে হিল্লায় গিয়ে পৌঁছলো। সেখান থেকে মুসেলের দিকে যাত্রাকালে পথিমধ্যে তার মৃত্যু হয়।

৫৭৩ হিজরী (১১৭৭ খ্রি)তে খলীফা মুস্তাযীর উযীর আদুদুদ্দীন আবুল ফারাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ হজ্জের উদ্দেশ্যে এক বিরাট কাফেলা নিয়ে রওয়ানা হলে পথিমধ্যে জনৈক কারামতী তাঁকে প্রতারণার মাধ্যমে হত্যা করে। তারপর খলীফা আবূ মানসূর যহীরুদ্দীন ইব্‌ন নসর ওরফে ইব্‌ন আতাকে উযীর পদে মনোনীত করেন। সাড়ে নয় বছর খলীফা পদে থাকার পর ৫৭৫ হিজরীর যিলকদ (এপ্রিল ১১৮০ খ্রি) মাসে খলীফা মুস্তাযী বি-আমরিল্লাহ্ ইন্তিকাল করেন। উযীর যহীরুদ্দীন ইব্‌ন আতা এখন খলীফা তনয় আবুল আব্বাস আহমদকে সিংহাসনে বসালেন। তিনি নাসির লি-দীনিল্লাহ্ উপাধি গ্রহণ করলেন।

নাসির লি-দীনিল্লাহ্

নাসির লি-দীনিল্লাহ্ ইব্‌ন মুস্তাযী বি-আমরিল্লাহ্ ৫৫৩ হিজরীর ১০ই রজব (আগস্ট ১১৫৮ খ্রি) জমরুদ নাম্নী জনৈকা তুর্কী দাসীর গর্ভে ভূমিষ্ঠ হন। ৫৭৫ হিজরীতে যিলকদ (এপ্রিল ১১৮০ খ্রি) মাসে তিনি পিতার স্থলে খলীফার মসনদে আরোহণ করেন। তিনি অত্যন্ত চৌকস ও দূরদর্শী খলীফা ছিলেন। মসনদে বসেই তিনি অধীনস্থ রাজ্যসমূহে কাসেদ মারফত এ মর্মে ফরমান পাঠিয়েছিলেন যে, খলীফার পক্ষ থেকে খলীফার আমীরগণ বায়আত বা আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করবেন। সে সময় হামদান, ইস্পাহান ও রে-তে বহলোয়ান ইব্‌ন ইলিদকুয রাজত্ব করছিলেন। তাঁর বায়আত নেওয়ার উদ্দেশ্যে শায়খুশ শুয়ূখ সদরুদ্দীনকে রাজধানী বাগদাদ থেকে প্রেরণ করা হলো। বহলোয়ান প্রথমে বায়আত করতে অস্বীকৃতি জানালেন। কিন্তু যখন স্বয়ং তাঁর সর্দাররাই খলীফার আনুগত্যের শপথ গ্রহণ না করলে তাঁর প্রতি তাঁদের সমর্থন প্রত্যাহারের হুমকি দিলেন তখন অগত্যা বহলোয়ানকেও বায়আত হতে হলো। ইলিদকুয আতাবেক ইতিপূর্বে ৫৬৮ হিজরীতে (১১৭২ খ্রি) হামদানে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ইলিদকুয আরসালান শাহ্ ইবন সুলতান তুগরিলের গৃহশিক্ষক ও অভিভাবক ছিলেন। তিনি যেহেতু আরসালান শাহর মাকে বিবাহ করে নিয়েছিলেন এ জন্যে আরসালান শাহ্ ছিলেন তার সৎপুত্র। ইলিদকুযের মৃত্যুর পর আরসালান শাহর গৃহশিক্ষকের দায়িত্ব বর্তালো ইলিদকুযের পুত্র বহলোয়ানের উপর।

৫৭৩ হিজরী (১১৭৭ খ্রি)-তে আরসালান শাহেরও মৃত্যু হলে বহলোয়ান আরসালানের পুত্র তুগরিল ইব্‌ন আরসালান ইব্‌ন তুগরিলকে তাঁর মসনদে বসিয়ে নিজে উপরোক্ত রাজ্যসমূহে রাজত্ব করতে থাকেন। ৫৮২ হিজরী (১১৮৬ খ্রি)র বহলোয়ান ইব্‌ন ইলিদকুযের মৃত্যুকালে হামদান, রে, ইস্পাহান, আযারবায়জান ও আরানিয়া এলাকাসমূহ তাঁর অধীনে ছিল এবং তুগরিল ইব্‌ন আরসালান তাঁর অভিভাবকত্বের অধীন ছিলেন। বহলোয়ানের মৃত্যুর পর

তাঁর ভাই উছমান ওরফে কিযিল আরসালান ইব্ন ইলিদকুয তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তুগরিল ইব্ন আরসালান প্রথম প্রথম কিছুদিন তো কিযিল আরসালানের অভিভাবকত্বে চললেন, কিন্তু তারপরই আমীর-উমারাদেরকে হাত করে তাঁর অভিভাবকত্ব থেকে মুক্ত হয়ে তিনি কয়েকটি শহর অধিকার করে নিলেন। তারপর কিযিল আরসালান ও তুগরিলের মধ্যে কয়েকটি যুদ্ধও হয়। দিন দিন তুগরিলের ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং কিযিল আরসালানের ক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকে। কিযিল আরসালান খলীফার জন্যে উদ্বেগের কারণ রয়েছে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করলেন। খলীফা নাসির লি-দীনিল্লাহ্ বাগদাদে নির্মিত সালজুকী সুলতানদের প্রাসাদসমূহ ধূলিসাৎ করিয়ে দিলেন এবং কিযিল আরসালানের সাহায্যার্থে বাগদাদ থেকে আবুল মুযাফ্ফর উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন ইউনুসকে সসৈন্যে প্রেরণ করলেন। উবায়দুল্লাহ্ কিযিল আরসালানের নিকটে পৌঁছবার পূর্বে ৫৮৪ হিজরীর ১৮ই রবিউল আউয়াল (মে, ১১৮৮-৮৯ খ্রি) হামদানে তুগরিলের সাথে তার মুকাবিলা হয়ে যায়। তুমুল যুদ্ধের পর তুগরিল জয়যুক্ত হন এবং উবায়দুল্লাহ্ গ্রেফতার হন। অবশিষ্ট সৈন্যরা পশ্চাদপসরণ করে বাগদাদে পৌঁছে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। কিন্তু তারপর কিযিল আরসালান হামদান, রে, ইস্পাহান প্রভৃতি সকল প্রদেশে নির্বিবাদে রাজত্ব চালিয়ে যান। তিনি তাঁর স্বনামে মুদ্রা ও খুতবার প্রচলন করেন। ৫৮৭ হিজরীতে (১১৯১ খ্রি) বন্দী অবস্থায় তুগরিল নিহত হন এবং এভাবে সালজুকী রাজত্বের অবসান ঘটে। সুলতান তুগরিল বেগের দ্বারা এ বংশের যে রাজত্বের সূচনা করেছিলেন এবং তারই নামের অপর একজন তুগরিল বেগের দ্বারা তার অবসান ঘটলো।

৫৮৫ হিজরী (১১৮৯ খ্রি)-তে তিকরীতের গভর্নর আমীর ঈসার মৃত্যু হলে তাঁর ভাইয়েরা তিকরীত অধিকার করে বসেন। খলীফা নাসির এক সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে তিকরীতে নিজ অধিকার কায়েম করেন এবং আমীর ঈসার ভাইদের নামে জায়গীর প্রদান করেন। এরপর ৫৯১ হিজরী (১১৯৪ খ্রি)-তে খলীফা নাসির খুযিস্তানে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করে সে রাজ্যও দখল করেন এবং নিজের পক্ষ থেকে তাশতাকীন মুজীরুদ্দীনকে খুযিস্তানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। সে সময় রে-তে কুতলুগ ইব্ন বহলোয়ান ইব্ন ইলিদকুয রাজত্ব করছিলেন। খাওয়ারিযম শাহ্ কুতলুগকে পরাস্ত করে তাড়িয়ে দেন এবং তার রাজ্য দখল করে নেন। মুওয়াইয়াদ উদ্দীন আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন আলী যিনি খলীফার নির্দেশ মুতাবিক খুযিস্তান জয় করে তুশতাগীনের হাতে তা অর্পণ করেছিলেন। তিনি সসৈন্যে রওয়ানা হচ্ছিলেন এমন সময় কুতলুগ ইব্ন বহলোয়ান তাঁর কাছে পৌছে তাঁকে রে অভিমুখে সসৈন্য অভিযান চালাতে উৎসাহিত করেন। মুওয়াইয়াদ উদ্দীন কুতলুগ সমভিব্যাহারে হামদানের দিকে অগ্রসর হন। খাওয়ারিযম শাহের পুত্র সেখানে পূর্ব থেকেই সৈন্যবাহিনী নিয়ে মওজুদ ছিলেন। মুওয়াইয়াদ উদ্দীনের আগমন সংবাদ পেয়ে তিনি রে-এর দিকে সরে যান। মুওয়াইয়াদ উদ্দীন বিনা বাধায় হামদান দখল করে নেন। তারপর তিনি হামদান থেকে রে অভিমুখে রওয়ানা হন। ইব্ন খাওয়ারিযম সেখান থেকেও সরে পড়েন। মুওয়াইয়াদ উদ্দীন রে-ও দখল করে নেন। এভাবে ক্রমে ক্রমে মুওয়াইয়াদ উদ্দীন কুতলুগের অধীনস্থ সমস্ত এলাকা অধিকার করে নেন। খাওয়ারিযম শাহ্ প্রথমে একজন দূত পাঠিয়ে এ সব এলাকা থেকে দখল প্রত্যাহার করার জন্যে মুওয়াইয়াদ উদ্দীনকে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। কিন্তু জবাবে মুওয়াইয়াদ উদ্দীন জানান,

এ সব এলাকা খলীফা নাসির লি-দীনিল্লাহ্‌র বাহিনী জয় করেছে। এরা কস্মিনকালেও তা ফেরত দেবে না। খাওয়ারিযম শাহ এক বিরাট বাহিনী নিয়ে হামদান আক্রমণ করেন। এমনি সময় ৫৯২ হিজরীর শাবান (জুলাই, ১১৯৬ খ্রি) মাসে অকস্মাৎ মুওয়াইয়াদ উদ্দীনের মৃত্যু হয়। এতদসত্ত্বেও তাঁর বাহিনী শক্তভাবে খাওয়ারিযম শাহর বাহিনীর মুকাবিলা করে। শেষ পর্যন্ত বাগদাদের বাহিনী সেনাপতির অভাবে পরাস্ত হয়ে যায় এবং হামদান খাওয়ারিযম শাহের হস্তগত হয়। এরপর খাওয়ারিযম শাহ্ ইস্পাহানে যান। ইস্পাহানও তাঁর করতলগত হয় এবং সেখানে তিনি তার পুত্রকে একটি বিরাট বাহিনীসহ রেখে যান— যাতে তারা প্রতিপক্ষের আক্রমণ প্রতিহত করে শহর রক্ষা করতে পারে। খলীফা নাসির লি-দীনিল্লাহ্ সাইফুদ্দীন তুগরিল নামক জনৈক সর্দারকে সসৈন্যে ইস্পাহানে প্রেরণ করলে তিনি খাওয়ারিযম শাহকে তাড়িয়ে দিয়ে ইস্পাহান পুনরুদ্ধার করেন। এরপর একে একে হামদান, জুনজান এবং কাযভীনও অধিকার করে খলীফা নাসির লি-দীনিল্লাহ্ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। ৬০২ হিজরী (১২০৫ খ্রি)-তে খুযিস্তানের আমীর তুশতাগীনের মৃত্যু হলে খলীফা নাসির তাঁর স্থলে তাঁর জামাতা সঞ্জরকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন। ৬০৬ হিজরী (১২০৯ খ্রি)তে খলীফা তাঁর প্রতি কোন কারণে অসন্তুষ্ট হন। পূর্বেই বলা হয়েছে, এ সময় পারস্যের শাসক ছিলেন আতাবেক সা'দ যঙ্গী ইব্‌ন ওকলা। খলীফা সঞ্জরকে দমনের জন্যে তাঁর নায়েবে উযীরকে সসৈন্য খুযিস্তানে প্রেরণ করেন। নায়েবে উযীর খুযিস্তানের নিকটে পৌঁছতেই সঞ্জর খুযিস্তান ছেড়ে সা'দ যঙ্গীর কাছে পারস্যে চলে যান। সাদ সঞ্জরকে যথেষ্ট সমাদর ও আপ্যায়ন করেন। ৬০৬ হিজরীর রবিউল আউয়াল (সেপ্টেম্বর ১২০৯ খ্রি) মাসে খলীফার বাহিনী খুযিস্তান অধিকার করে সঞ্জরকে তলব করেন। সঞ্জর উপস্থিত হতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। বাগদাদ বাহিনী পারস্যের রাজধানী শীরাজ নগরীর দিকে অগ্রসর হয়। আতাবেক সা'দ যঙ্গী সঞ্জরের জন্যে সুপারিশ করে নায়েবে উযীরকে পত্রাদি লিখেন। শেষ পর্যন্ত সঞ্জর নায়েবে উযীর সমীপে উপস্থিত হন। তিনি সঞ্জরকে সাথে নিয়ে ৬০৮ হিজরীর মুহাররম (জুন ১২১১ খ্রি) মাসে বাগদাদে আসনে। সঞ্জরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় খলীফার দরবারে উপস্থিত করা হয়। খলীফা তাঁর ভৃত্য ইয়াকূতকে সিজিস্তানের শাসক নিযুক্ত করে কর্মস্থলে পাঠিয়ে দেন এবং সঞ্জরকে মুক্ত করে খিলাত দান করেন। ৬১৩ হিজরীর মুহাররম (১২১৬ খ্রি) মাসে খলীফা তাঁর আপন পৌত্র মুওয়াইয়াদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন নাসির লি-দীনিল্লাহকে খুযিস্তানের পার্শ্ববর্তী এলাকা তশতরের আমীর নিযুক্ত করে প্রেরণ করেন। তাঁর পিতা আলী ইতিপূর্বেই ৬১২ হিজরীর যিলকদ (মার্চ ১২১৬ খ্রি) মাসে ইন্তিকাল করেছিলেন।

আগলামাশ ছিলেন বহলোয়ান ইব্‌ন ইলিদকুযের একজন সর্দার। তিনি তার বীরত্ব ও বিচক্ষণতার জোরে জাবাল প্রদেশের উপর আধিপত্য বিস্তার করে স্বাধীনভাবে সেখানে রাজত্ব করে যাচ্ছিলেন। ৬১৪ হিজরীতে (১২১৭ খ্রি) বাতেনী ফের্কা তথা কারামতিরা তাঁকে হত্যা করে ফেলে। আগলামাশ নিহত হওয়ার পর একদিকে তাঁর রাজ্যের উপর পারস্যের শাসনকর্তা আতাবেক সা'দ ইব্‌ন ওকলা এবং অপরদিকে খুরাসান ও মাওরাউন নাহরের শাসক খাওয়ারিযম শাহ্ আধিপত্য বিস্তারে সচেষ্ট হন। আতাবেক ইব্‌ন যঙ্গী সসৈন্য অগ্রসর হবার সময় রে-তে উভয় বাহিনীর মুখোমুখি যুদ্ধ হয়। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে আতাবেক সা'দ পরাজিত ও

গ্রেফতার হন। খাওয়ারিযম শাহ্ আগলামাশের গোটা রাজ্যে নিজ দখল প্রতিষ্ঠা করে রাজধানী বাগদাদে খলীফার নিকট নায়েবে সালতানাতরূপে খুতবায় তাঁর নাম পাঠের আবেদন করে পাঠান। কিন্তু খলীফা তাতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। খাওয়ারিযম শাহ্ বাগদাদের দিকে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করলেন। কিন্তু রাস্তায় এত ভারী বরফপাত হলো যে, তাঁর প্রেরিত বাহিনীর অধিকাংশই তাতে মারা গেল। অবশিষ্টদেরকে তুর্কী ও কুর্দীরা লুটপাট করে তাদের সর্বস্ব ছিনিয়ে নেয়। অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় স্বল্প সংখ্যক সৈন্য খাওয়ারিযম শাহের কাছে ফিরে আসে। খাওয়ারিযম শাহ্ একে অশুভ লক্ষণ মনে করে খুরাসানে ফিরে যান। বিজিত রাজ্যে তিনি তাঁর পুত্র রুকনুদ্দীনকে প্রতিনিধিরূপে রেখে ইমাদুল মূল্ক সাদীকে তাঁর 'মাদারুল মাহাম' নিযুক্ত করেন। তিনি তাঁর বিজিত রাজ্যসমূহে খলীফা নাসিরের নাম খুতবা থেকে মওকুফ করে দেন। এটা ৬১৫ হিজরীর (১২১৮ খ্রি) ঘটনা।

৬১৬ হিজরী (১২১৯ খ্রি)তে চীন সংলগ্ন তমগাচ পার্বত্য এলাকায় বসবাসকারী তাতার উপজাতীয়রা বিদ্রোহ করে। এদের মাতৃভূমি ছিল তুর্কিস্তান থেকে ছয় মাসের দূরত্বে অবস্থিত। এ উভয় গোত্রের সর্দারের নাম ছিল চেঙ্গিস খান। তুর্কীদের তামরানী নামক গোত্রের লোক ছিলেন এই চেঙ্গিস খান। চেঙ্গিস খান তুর্কিস্তান ও মাওরাউন নাহরে হামলা চালিয়ে এবং খাতা তুর্কীদের হাত থেকে তাদের অধিকৃত এলাকাসমূহ ছিনিয়ে নিয়ে নিজের আধিপত্য কায়েম করেন। তারপর তিনি খাওয়ারিযম শাহের উপর হামলা চালিয়ে খুরাসান ও জাবাল প্রদেশ তাঁর হাত থেকে ছিনিয়ে নেন। তারপর তিনি আরানিয়া এবং শেরোয়ান অধিকার করেন। এই তাতারীদেরই একটি দল গজনী, সিজিস্তান, কিরমান প্রভৃতি এলাকার দিকে চলে যান। খাওয়ারিযম শাহ্ এই তাতারীদের হাতে পরাস্ত হয়ে তাবারিস্তানের কোন এক স্থানে চলে গিয়ে একুশ বছর রাজত্ব করার পর ৬১৭ হিজরী (১২২০ খ্রি)তে মৃত্যুমুখে পতিত হন। খাওয়ারিযম শাহকে পরাস্ত করার পর তাতারীরা তাঁর ছেলে জালালুদ্দীন ইব্ন খাওয়ারিযম শাহকে গজনীতে পরাস্ত করে। চেঙ্গিস খান সিন্ধু নদের তীর পর্যন্ত তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করেন। জালালুদ্দীন সিন্ধু নদ অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশ করেন। কিছুদিন ভারতে কাটিয়ে তারপর তিনি ৬২২ হিজরী (১২২৫ খ্রি)-তে খুযিস্তান ও ইরাকের দিকে চলে যান এবং আযারবায়জান ও আর্মেনিয়া অধিকার করে নেন। মুযাফফরের হাতে নিহত হওয়া পর্যন্ত তিনি সেখানেই ছিলেন। চেঙ্গিস খান ও তাঁর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার বিস্তারিত বিবরণ পরে আসছে। ৬২২ হিজরীর রমযান (সেপ্টেম্বরে ১২২৫ খ্রি) মাসের শেষ দিকে ৪৭ বছর খলীফা থাকার পর খলীফা নাসির লি-দীনিল্লাহ্ মৃত্যুমুখে পতিত হন। এখানে উল্লেখযোগ্য, খাওয়ারিযম শাহ্ যেহেতু খলীফার সাথে বাদ-বিসম্বাদে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন এবং তাঁর অধিকৃত এলাকাসমূহে খলীফার নাম খুতবা থেকে মওকুফ করে দিয়েছিলেন। এজন্যে খলীফা নাসির লি-দীনিল্লাহ্ই চেঙ্গিস খানকে খুরাসান আক্রমণে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। কেননা, খাওয়ারিযম শাহকে স্বহস্তে শাস্তি দেওয়া বা তার প্রতিশোধ তখন তাঁর নিজের জন্যে দুঃসাধ্য ছিল। নাসির লি-দীনিল্লাহ্ তাঁর গুপ্তচর বাহিনীকে দেশজোড়া প্রতিটি শহরে ছড়িয়ে রেখেছিলেন। তাঁরা লোকজনের সাধারণ ব্যাপারসমূহ সম্পর্কেও ওয়াকিফহাল থাকতে সচেষ্ট থাকতেন এবং অধিকাংশ লোকের এরূপ একটা ধারণা ছিল যে, জিনরা তাঁর বশীভূত এবং তারাই তাঁকে সব গোপন সংবাদ সরবরাহ করে থাকে।

তিনি রাজনৈতিক চাল চালতে অত্যন্ত সিদ্ধহস্ত ছিলেন। রাজ্যসমূহে তাঁর বিস্তর প্রভাব বিদ্যমান ছিল। তবে প্রজাসাধারণ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ছিল না। তাঁর কঠোর শাসন ও কঠোর শাস্তি সকলেরই মনঃকষ্টের কারণ ছিল। এ খলীফারই যুগে ৫৮৩ হিজরী (১১৮৭ খ্রি)-তে সুলতান সালাহুদ্দীন ক্রুসেডারদের নিকট থেকে অনেক শহর ছিনিয়ে নেন। বায়তুল মুকাদ্দাসও ৯১ বছর পর মুসলমানদের অধিকারে আসে।

৫৮৯ হিজরী (১১৯৩ খ্রি)তে বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয়ী সুলতান সালাহুদ্দীন ইউসুফের ইন্তিকাল হয়। এই খলীফারই রাজত্বকালে আবুল ফারাহ ইব্‌ন জাওযী, ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী, নাজমুদ্দীন কুবরা, আল-ফাতাওয়া প্রণেতা কাযী খান, হিদায়া প্রণেতা প্রমুখ বিশিষ্ট জ্ঞানীগুণী ইন্তিকাল করেন। খলীফা নাসিরুদ্দীনের পর তাঁর পুত্র আবূ নসর মুহাম্মদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি যাহির বি-আমরিল্লাহ্ উপাধি গ্রহণ করেন।

যাহির বি-আমরিল্লাহ্

যাহির বি-আমরিল্লাহ্ ইব্‌ন নাসিরুদ্দীন ৫৭১ হিজরী (১১৭৫ খ্রি) ভূমিষ্ঠ হন। পিতার মৃত্যুর পর ৫২ বছর বয়সে ৬২২ হিজরীর ১লা শাওয়াল (অক্টোবর ১২২৫ খ্রি) তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। মসনদে আরোহণ করেই তিনি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় বিশেষভাবে মনোযোগ প্রদান করেন। প্রজাসাধারণের সুখ-শান্তি বিধান করেন। কর মওকুফ করেন। পূর্ববর্তী খলীফাগণ লোকজনের যে সব সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেছিলেন তিনি তা প্রত্যর্পণ করেন। ঋণগ্রস্ত লোকদের ঋণ তিনি পরিশোধ করে দিতেন। এ খলীফা বলতেন, আমি সন্ধ্যাবেলা দোকান খুলেছি, আমাকে কিছু পুণ্য সঞ্চয় করতে দাও। একদা খলীফা কোষাগারের দিকে পদার্পণ করলে জনৈক গোলাম বলে উঠলো, আমীরুল মু'মিনীন, এ কোষাগার তো আপনার পিতার আমলে পূর্ণ থাকতো। জবাবে খলীফা বললেন, আমি তা কোন করণীয় কাজ খুঁজে পেলাম না যা দ্বারা এ কোষাগার পূর্ণ হতে পারে। আমি তো পারি কেবল কোষাগার শূন্য করতে। কোষাগার পূর্ণ করা হচ্ছে বেনিয়া সওদাগরদের কাজ। আলিম-উলামা ও বিদ্বজ্জনকে এ খলীফা প্রচুর উপঢৌকনাদি দান করতেন। এ খলীফার শাসনকাল অনেকটা হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের শাসনামলের মত ছিল। রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা বিরাজমান ছিল। প্রজাসাধারণ তাঁর ন্যায়বিচারে অত্যন্ত প্রীত ও সন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁর আয়ুষ্কাল ছিল অতি অল্প। কেবল সাড়ে নয় মাসকাল খিলাফতের দায়িত্ব পালন করে ৬২৩ হিজরীর ১৫ই রজব (জুলাই ১২২৬ খ্রি) তিনি ইন্তিকাল করেন। তাঁর ইন্তিকালের পর তার পুত্র আবূ জা'ফর মানসূর 'মুস্তানসির বিল্লাহ' উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

আবূ জাফর মুস্তানসির বিল্লাহ্

মুস্তানসির বিল্লাহ্ ইব্‌ন যাহির বি-আমরিল্লাহ ৫৮৮ হিজরী (১১৯২ খ্রি) জনৈকা তুর্কী দাসীর গর্ভে ভূমিষ্ঠ হন। পিতার মৃত্যুর পর ৬২৩ হিজরী (১২২৬ খ্রি) তিনি ক্ষমতাসীন হন। তিনি সদগুণাবলীতে তাঁর পিতার সাথে তুল্য ছিলেন। পিতার মতই তিনি ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠায় অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার ব্যাপারে তাঁর প্রবল অনুরাগ ছিল। বাগদাদে তিনি মাদ্রাসা মুস্তানসিরিয়া প্রতিষ্ঠা করে সুযোগ্য উলামাকে মুদারিস পদে নিযুক্ত

করেন। এ মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠায় তাঁর ৬২৫ হিজরী (১২২৭ খ্রি) পর্যন্ত দীর্ঘ ছয় বছরকাল ব্যয় হয়। এ মাদ্রাসায় তিনি একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন যার জন্যে একশ ষাটটি উটে করে অত্যন্ত মূল্যবান ও দুর্লভ গ্রন্থাদি আনয়ন করা হয়। হাদীস, আরবী ব্যাকরণ, চিকিৎসা শাস্ত্র, ফারায়েয প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ উস্তাদদেরকে তিনি মাদ্রাসায় আহার্য, ফলমূল, মিষ্টান্ন এবং প্রয়োজনীয় সবকিছু দিয়ে নিযুক্ত করেন। অনেক গ্রাম ও ভূসম্পদ মাদ্রাসার জন্য ওয়াক্‌ফ ছিল। ৬২৮ হিজরী (১২৩০ খ্রি)-তে মালিক আশরাফ দারুল হাদীস আশরাফিয়া প্রতিষ্ঠার্থে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ৬৩০ হিজরী (১২৩২ খ্রি)-তে এর নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয়। ৬২৯ হিজরী (১২৩১ খ্রি)-তে মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ ইব্‌ন হুদ আন্দালুসে (স্পেনে) আব্বাসীয় দাওয়াতের পুনরাবৃত্তি করেন। ৬৩৪ হিজরীতে (১২৩৬ খ্রি) এশিয়া মাইনরের অধিকাংশের শাসনকর্তা খাওয়ারিযম শাহের অধঃস্তন পুরুষ আলাউদ্দীন কায়কোবাদের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র গিয়াসুদ্দীন কায়খসরু মসনদে আরোহণ করেন। ৬৪১ হিজরী (১২৪৩ খ্রি)তে তাতারীদের আক্রমণের মুখে পরাস্ত হয়ে গিয়াসুদ্দীন কায়খসরু তাদের করদ রাজারূপে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করলে এশিয়া মাইনরে দীর্ঘ দুইশ বছরব্যাপী সালজুকী শাসনের অবসান ঘটে। গিয়াসুদ্দীন কায়খসরু ৬৫৬ হিজরী (১২৫৮খ্রি) পর্যন্ত তাতারীদের করদ রাজারূপে রাজত্ব করার পর মৃত্যুমুখে পতিত হন। এ সময়ই উছমানী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা তাঁর গগনস্পর্শী অট্টালিকা সদৃশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। যার বিস্তারিত বর্ণনা পরে আসছে।

খলীফা মুস্তানসির রাজ্যের শাসন-শৃঙ্খলা বিধান ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করেন। কিন্তু তুর্কী ও তাতারীরা যেহেতু বিভিন্ন প্রদেশ ও জনপদে উপর্যুপরি আক্রমণ চালিয়ে সেগুলো অধিকার করে চলেছিল, সেজন্যে খলীফার রাজস্ব আয় হ্রাস পায়। মিসর ও সিরিয়ায় শাসনকর্তৃত্বের অধিকারী সালাহুদ্দীন ইউসুফের বংশধরদের মধ্যে অনৈক্যের দরুন সে রাজ্যগুলোও হাতছাড়া হয়ে যায়। তাতারীদের হামলায় মাওরাউন নাহর থেকে ভূমধ্য সাগর ও কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত এলাকাসমূহ ছারখার হয়ে যায়। এতদসত্ত্বেও ইরাকের উপর খলীফার শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং তাতারীদের (মোগলদের) অন্তরে বাগদাদের খলীফার প্রভাব এমনিভাবে ছিল যে, তারা খলীফার অধিকৃত এলাকাসমূহের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারতো না। যেভাবে খুরাসান, আযারবায়জান, মুসেল, শাম প্রভৃতি রাজ্যের সুলতানগণ খলীফার অসন্তুষ্টির ভয়ে ভীত থাকতেন। তেমনিভাবে মোগলরাও বাগদাদের খলীফার প্রাধান্য স্বীকার করতো এবং কোনরূপ ঔদ্ধত্য প্রদর্শনের কথা চিন্তাও করতে পারতো না। এই তাতারীরা যেহেতু সূর্য পূজারী ছিল এবং সালজুকীদের মতো মুসলমান হয়ে আসেনি তাই মসজিদে কার নামে খুতবা হলো তা নিয়ে তাদের কোন মাথাব্যথা ছিল না। এ জন্যে তাদের অধিকৃত এলাকাসমূহে পূর্ববৎ খুতবা খলীফার নামেই পঠিত হতো। আর এ জন্যে খলীফাও নিশ্চিন্ত থাকতেন। তাতারীদের এই বন্যা লক্ষ্য করে খলীফার চাইতেও অধিকতর বীরত্ব ও সাহসের অধিকারী খলীফা মুস্তানসিরের ভাই খাফাজী বলতেন, আমি তাতারীদেরকে জৈহূন নদীর তীর পর্যন্ত গোটা ভূখণ্ড থেকে নিশ্চিহ্ন করে ছাড়বো।

৬৪১ হিজরী (১২৪৩ খ্রি)-তে খলীফা মুস্তানসিরের ইন্তিকাল হলে তাঁর এই সুযোগ্য ভাই খাফাজীকে মসনদে না বসিয়ে অমাত্যরা মুস্তানসিরের পুত্র আবূ আহমদ আবদুল্লাহকে শুধু এ জন্যে মসনদে বসায় যে, তিনি অত্যন্ত নম্র মেযাজ ও গোবেচারা ধরনের লোক ছিলেন।

আমলা-অমাত্যরা নিজেদের দাপট বৃদ্ধির স্বার্থে এরূপ নিরীহ গোবেচারা ধরনের খলীফাকেই পছন্দ করতো। আবূ আহমদ আবদুল্লাহ্ মুসতাসিম বিল্লাহ্ উপাধি ধারণ করে খলীফার আসনে উপবিষ্ট হলেন।

মুসতাসিম বিল্লাহ্

মুসতাসিম বিল্লাহ্ ইব্ন মুস্তানসির বিল্লাহ্ ৬৯০ হিজরী (১২৯১ খ্রি)তে হাজার নাম্নী জনৈকা দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন এবং পিতার মৃত্যুর পর খলীফার আসনে উপবিষ্ট হন। এই খলীফার মধ্যে সাহস ও দূরদর্শিতার অভাব ছিল। তাঁর মধ্যে ধর্মপরায়ণতা ও সুন্নতের পাবন্দির কমতি ছিল না। তবে তিনি মুওয়াইয়াদ উদ্দীন আলকামী নামক এমন এক ব্যক্তিকে তাঁর উযীর মনোনীত করেন, যে ছিল একজন কট্টরপন্থী শিয়া। আলকামী উযীর হয়েই সমস্ত ক্ষমতা নিজ হাতে তুলে নিয়ে খলীফাকে একেবারে হাতের পুতুল বানিয়ে ফেলেন। আলকামী প্রতিটি ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য দিয়ে শিয়াদেরকে অগ্রসর করার চেষ্টায় মেতে ওঠেন। তিনি দায়লামীদের যুগের শিয়া বিদআতসমূহ পুনর্জীবিত করে তোলেন। ফলে দায়লামীদের যুগের সেই কুখ্যাত শিয়া-সুন্নী দাঙ্গা পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। সাথে সাথে আলকামী নানা ছলেবলে-কৌশলে আব্বাসীদের নাম-নিশানা মুছে ফেলে দিয়ে উলুভীদেরকে বাগদাদের খলীফার আসনে বসানোর পাঁয়তারায় লিপ্ত হলো। বাগদাদে তখন আলকামীর এ সব ষড়যন্ত্র ও পাঁয়তারা আঁচ করার মতো লোকেরও অভাব ছিল না। তাঁরা খলীফাকে আলকামীর এ দুরভিসন্ধি সম্পর্কে অবহিত করলেন। খলীফা এতই কাপুরুষ ও নির্বোধ ছিলেন যে, দূরদর্শী লোকদের এ অনুযোগ সম্পর্কে তিনি স্বয়ং আলকামীর সাথেই আলোচনা করলেন। ধূর্ত আলকামী সাথে সাথে খলীফার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে পাল্টা ঐ লোকদেরকে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী ও বিশ্বাসঘাতক বলে অভিহিত করলেন। সরলপ্রাণ খলীফা তা বিশ্বাস করলেন। ফলে আলকামীর ক্ষমতা আরো বৃদ্ধি পেল। মঙ্গলকামীদের সৎপরামর্শদান একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। তারপর ধুরন্ধর আলকামী খলীফাকে আমোদ-প্রমোদ ও পানাসক্তির দিকে ঠেলে দিলেন। এভাবে তিনি তার নিজের জন্যে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করলেন এবং খলীফার সন্দেহ থেকে বেঁচে রইলেন। কিছু দিন পর স্বয়ং খলীফা তনয় আবূ বকর শিয়াদের হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে বাগদাদের শিয়া জনপদ কারখ মহল্লায় হামলা চালালেন। তিনি আলকামী সম্পর্কেও কটুকাটব্য করলেন। এতে আলকামী অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ন হন এবং খলীফার দরবারে তার বিরুদ্ধে নালিশ করেন। কিন্তু খলীফা আলকামীর মনোবাঞ্ছা অনুসারে আবূ বকরকে শাস্তি না দিয়ে পুত্রের মনই রক্ষা করলেন। ফলে আলকামীর অন্তর্জ্বালা আরো বৃদ্ধি পায়। তিনি চেঙ্গিস খানের পৌত্র হালাকু খানের সাথে পত্রযোগে যোগসাজশ শুরু করে দেন। হালাকু খান তখন তাতারীদের সর্দার এবং খুরাসান প্রভৃতি রাজ্যের বাদশাহ। আলকামীর দূতকে হালাকু খান প্রথমে তেমন গুরুত্ব দেন নাই। আলকামী লিখেছিলেন ঃ

"আমি অতি সহজেই বিনা যুদ্ধে ও বিনা রক্তপাতে বাগদাদ ও ইরাকে আপনার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে দিতে পারি। আপনি অবশ্যই সসৈন্যে এদিকে আক্রমণ করুন।"

জবাবে হালাকু খান আলকামীর দূতকে শুধু এতটুকু বললেন ঃ "আলকামী যে অঙ্গীকার করছে, তার জন্যে যথেষ্ট বিশ্বাসবহ তেমন কিছু নেই। আমি কি করে তার কথায় আস্থা স্থাপন করি?"

আসল কথা হচ্ছে, খলীফার সৈন্য সংখ্যার প্রাচুর্য, আরবদের শৌর্যবীর্য ও বাগদাদবাসীদের দুরন্ত সাহসকে মোগলরা খুব ভয় করতো। ইতিপূর্বে সিরিয়ায় তারা আরব গোত্রদের সাথে বিভিন্ন যুদ্ধে বারবার পরাস্তও হয়েছিল। আলকামী খলীফার খিদমতে হাযির হয়ে রাজস্ব আয়ের স্বল্পতা এবং সামরিক বাহিনীর লোকদের বেতন-ভাতা বেশি হওয়ার অনুযোগ করে সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা হ্রাসের প্রস্তাব পেশ করলেন। খলীফা তা মেনেও নিলেন। ফলে বাগদাদের সৈন্যবাহিনীর এক বিরাট অংশ অন্যান্য শহরে ও প্রদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয়া হলো। যে স্বল্পসংখ্যক লোক সামরিক বাহিনীতে অবশিষ্ট ছিল তাদেরও বেতন পরিশোধের জন্যে এ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হলো যে, শহরের বিপনন কেন্দ্রসমূহ থেকে তারা কর উঠিয়ে তা বেতন-ভাতাস্বরূপ নিয়ে নেবে। এর ফলে নগরবাসীদের দুর্ভোগ বৃদ্ধি পেল। চারদিকে লুটপাট শুরু হলো। সামরিক বাহিনীর অনেক ইউনিটকে আলকামী ছাঁটাই করে ফেলল। খলীফার কাছে বলা হলো যে, তাতারীদের প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে তাদেরকে সীমান্তবর্তী এলাকায় নিয়োজিত করা হয়েছে। হাল্লা নামক স্থানে শিয়া অধিবাসীদের সংখ্যা তেমন উল্লেখযোগ্য ছিল না। তাদেরকে প্ররোচিত করে আলকামী হালাকু খানকে এ মর্মে পত্র লিখেন যে, আমাদের পূর্বপুরুষগণ আমাদেরকে ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়ে গেছেন যে, অমুক সনে অমুক তাতারী সর্দার বাগদাদ তথা ইরাকে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করবেন। তাদের সেই ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে আপনিই হচ্ছেন সেই বিজয়ী তাতারী সর্দার। আমাদের স্থির বিশ্বাস, আপনার শাসন এ দেশে প্রতিষ্ঠিত হবেই। অতএব আমরা আগাম আপনার আনুগত্যের অঙ্গীকার করছি এবং আপনার নিকট নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি।

হালাকু খান অত্যন্ত প্রসন্ন মনে দূতকে অভয়পত্র লিখে দিলেন। হালাকু খানের দরবারে নাসীরুদ্দীন তূসীর অত্যধিক প্রভাব ছিল। তিনি তাঁর উযীররূপে দায়িত্ব পালন করতেন। নাসীরুদ্দীন তূসীও ছিলেন আলকামীর মত কট্টরপন্থী শিয়া। আলকামী আব্বাসী খিলাফতের ধ্বংসসাধন করে শিয়া রাজত্ব প্রতিষ্ঠার মিশনের সাথে তিনিও ছিলেন পূর্ণ একাত্ম ও সমান অংশীদার। আলকামী নাসীরুদ্দীনকে লিখে পাঠালেন যে, যেভাবেই পারেন হালাকু খানকে বাগদাদ আক্রমণে প্ররোচিত করুন। এখনই বাগদাদ আক্রমণের সুবর্ণ সুযোগ। সাথে সাথে ঐ ধুরন্ধর হালাকু খানের নামেও এ মর্মে আবেদনপত্র প্রেরণ করলো যে, আমি বাগদাদ সৈন্যশূন্য করছি। যুদ্ধাস্ত্রসমূহ বাইরে সরিয়ে দিয়েছি। এর চাইতে বড় গ্যারান্টি আপনি আর কী চান? এ আবেদনপত্র প্রেরণের সাথে সাথে সে আরবদের শাসকের নামেও বাগদাদ আক্রমণের আহ্বান সম্বলিত আবেদনপত্র প্রেরণ করলো। হালাকু খানের কাছে আলকামীর আবেদনপত্র খানা ঠিক এমন মুহূর্তে পৌঁছলো যখন সে কারামিতা অর্থাৎ ইসমাঈলীদের নিকট থেকে বিখ্যাত আলমূত কেল্লা অধিকার করে নিয়েছে এবং ইসমাঈলীদের সর্বশেষ বাদশাহ্ তার দরবারে বন্দীরূপে নীত। হালাকু খান নাসীরুদ্দীন তূসীর কাছে বাগদাদ আক্রমণ সম্পর্কে পরামর্শ চাইল। নাসীরুদ্দীন বললেন ঃ জ্যোতির্বিদ্যার আলোকে দেখা যাচ্ছে, বাগদাদে আপনার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। তাই বাগদাদ আক্রমণে আপনার কোন ক্ষতি নেই।

সত্যি সত্যি হালাকু খান বিরাট বাহিনীর অগ্রবর্তী দল হিসাবে বাগদাদের দিকে রওয়ানা হলো। এ বাহিনী নিকটবর্তী হওয়ার সংবাদ পেয়ে মুসতাসিম বিল্লাহ্ সেনাপতি ফাতহুদ্দীন দাঊদকে দশ হাজার আইবেক অশ্বারোহী মুজাহিদসহ প্রেরণ করলেন। ফাতহুদ্দীন ছিলেন

অত্যন্ত অভিজ্ঞ ও বীর সেনাপতি। মোগলরা যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে। ফাতহুদ্দীন ঐ স্থানে অবস্থানকেই সঙ্গত বিবেচনা করেন। কিন্তু অনভিজ্ঞ মুজাহিদ বাহিনী মোগলদের পশ্চাদ্ধাবন করতে জেদ ধরে। অগত্যা ফাতহুদ্দীন মোগলদের পশ্চাদ্ধাবন করেন। এবার মোগলরা রুখে দাঁড়ায়। পিছনে যে সব মোগল লুক্কায়িত রয়ে গিয়েছিল তারা পেছন দিক থেকে এবং সম্মুখের মোগলরা সম্মুখ দিক থেকে বাগদাদ বাহিনীর উপর আক্রমণ চালায়। এই সাঁড়াশি আক্রমণের মুখে বাগদাদ বাহিনী দিশেহারা হয়ে পড়ে। ফাতহুদ্দীন রণক্ষেত্রেই নিহত হলেন। অবশিষ্টরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে বাগদাদে পৌঁছে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। মুজাহিদদের অদূরদর্শিতার জন্যে বাগদাদ বাহিনীর বিজয় পরাজয়ে রূপান্তরিত হলো। কিন্তু খলীফা মুসতাসিম তাঁর স্বভাবসুলভ নির্বুদ্ধিতার দরুন পলাতক সেনাপতির মুখ দর্শনে তিন তিন বার বলে উঠলেন ঃ

الحمد لله على سلامه مجاهد الدين–

"দীনের মুজাহিদরা নিরাপদে ফিরে এসেছে এজন্যে আল্লাহ্‌র শোকর"

রাগদাদ বাহিনী পরাজিত হলেও হালাকু খানের ঐ অগ্রবর্তী বাহিনীও পেরেশান এবং ক্ষত-বিক্ষত ছিল। এটাই ছিল খলীফা মুসতাসিমের সান্ত্বনা যে,

رشیده بود بلائم ولم نجیر كَزشت–

"এসেছিল বিপদ বটে
ভালোয় ভালোয় গেল কেটে "

কিন্তু যে আলকামী খলীফাকে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে চাতুর্যের সাথে সম্পূর্ণ অনবহিত রেখেছিল সে মনে মনে বিজ্ঞের হাসি হাসছিল। এমনি সময় খবর রটে গেল যে, হালাকু খান এক বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে বাগদাদ অবরোধ করে বসেছে। নগরবাসীরা আক্রমণ ঠেকাবার চেষ্টা করে পঞ্চাশ দিন পর্যন্ত সে আক্রমণ ঠেকিয়ে রাখে এবং একজন তাতারীকেও শহরে প্রবেশ করতে দেয়নি। শহরে শিয়ারা হালাকু খানের সৈন্যবাহিনীর কাছে গিয়ে গোপনে গোপনে অভয় আদায় করে এবং শহরের অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করে। উযীর আলকামী শহরের মধ্যেই অবস্থান করে এবং ঘণ্টায় ঘণ্টায় হালাকু খানকে সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত রাখে। স্বয়ং উযীর যেহেতু শহরবাসীর স্বার্থের অনুকূলে ছিল না এবং তাদের জন্যে তার অন্তরে বিন্দুমাত্র দরদ ছিল না তাই শহরবাসীরা প্রতিনিয়ত দুর্বল হয়ে পড়ছিল। শেষ পর্যন্ত উযীর আলকামী শহর থেকে বের হয়ে হালাকু খানের সাথে দেখা করে এবং কেবল নিজের জন্যে অভয় নিয়ে ফিরে আসে। এদিকে খলীফার সাথে দেখা করে সে জানায় যে, তাঁর জন্যেও সে হালাকু খানের নিকট থেকে অভয় নিয়ে এসেছে। সে বলে, আপনিও আমার সাথে হালাকু খানের কাছে চলুন। তিনি আপনাকে ঠিক সেরূপ ইরাকের রাজত্ব পূর্বের ন্যায় বহাল রাখবেন যেমনটি তাতারীরা ইতিপূর্বে গিয়াসুদ্দীন কায়খসরুকে তাঁর রাজ্যের শাসনকার্যে বহাল রেখেছিল। সে মতে খলীফা তাঁর পুত্রসহ শহর থেকে বেরিয়ে হালাকু খানের সৈন্যদের নিকট গিয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁকে সৈন্যবাহিনীর মধ্যে আটকে রেখে হালাকু খান তাকে তাঁর অমাত্যবর্গ ও বিদ্বানমণ্ডলীকে তলব করতে বললো। খলীফার নির্দেশ পেয়ে অমাত্যবর্গ ও বিদ্বানমণ্ডলী শহর থেকে বের হয়ে তাতারবাহিনীর কাছে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁদের

মুতাজ্জর পর মুহ্তাদী খলীফা হয়ে যখন বাবকিয়ালকে হত্যা করে অপর তুর্কী সর্দার ইয়ারকূজকে মিসরের গভর্নর মনোনীত করলেন তখন ইয়ারকূজও ইব্‌ন তূলূনকেই তাঁর নায়েবরূপে মিসরের শাসন ক্ষমতায় বহাল রাখলেন। এভাবে আহমদ ইব্‌ন তূলূন মিসরে অত্যন্ত দৃঢ়তা অর্জন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বংশধরগণ বংশানুক্রমে মিসরে রাজত্ব করেন এবং নিজেদের নামে মুদ্রা পর্যন্ত চালু করেন। মোটকথা ২৫৩ হিজরী (৮৬৭ খ্রি.) থেকে মিসরকে খিলাফতে আব্বাসীয় গর্ভনর বহির্ভূতই ধরতে হবে। কমপক্ষে এতটুকু বলতে হয় যে, ২৫৩ হিজরীতে (৮৬৭ খ্রি) মিসরে তূলূন বংশের রাজত্বের সূত্রপাত হয়।

ইয়াকূব ইব্‌ন লায়ছ সিফার

ইয়াকূব ইব্‌ন লায়ছ এবং তাঁর ভাই আমর ইব্‌ন লায়ছ উভয়ে সিজিস্তানে তামা ও পিতলের পাত্রের ব্যবসা করতেন। এ সময়ে যেহেতু খিলাফতে দুর্বলতার সুযোগ চতুর্দিকে বিদ্রোহ দেখা দিচ্ছিল তাই এ সুযোগে খারিজীরাও মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। তাদের মুকবিলায় উলুভী তথা আহলে বায়তের সমর্থনেও অনেকে মাথা তুললো। এদের মধ্যে সালিহ্ ইব্‌ন নযর কিনআনীও আহলে বায়তের শুভাকাঙ্ক্ষী সেজে আত্মপ্রকাশ করলেন। ঐ ব্যক্তি বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করতেই আমীর-উমারা, রঈস ও প্রজাসাধারণের বিরাট একটি দল তাঁর সমর্থনে উঠে দাঁড়ালো। ইয়াকূব ইব্‌ন লায়ছও এদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েন। সালিহ্ যুদ্ধের মাধ্যমে সিজিস্তান অধিকার করেন এবং তাহিরিয়া খান্দানের লোকজনকে সেখান থেকে বহিষ্কার করেন। এ সাফল্য অর্জনের পরই সালিহ্‌র মৃত্যু হয়। দিরহাম ইব্‌ন হাসান নামক এক ব্যক্তি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। কিন্তু খুরাসানের গভর্নর অত্যন্ত চাতুর্যের সাথে তাকে বন্দী করে বাগদাদে পাঠিয়ে দেন। সালিহ্‌র সমর্থকরা এবার ইয়াকূব ইব্‌ন লায়ছকে তাদের দলপতিরূপে গ্রহণ করে। ইয়াকূব অত্যন্ত দক্ষতা ও বিচক্ষণতার সাথে সিজিস্তানে তাঁর পূর্ণ দখল প্রতিষ্ঠা করেন এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহিরের পক্ষ থেকে হিরাতে নিযুক্ত আমিল মুহাম্মদ ইব্‌ন আওস আম্বারীকে হিরাত থেকে বহিষ্কার করে খুরাসানের এলাকাসমূহ দখল করতে শুরু করেন।

এদিকে পারস্য প্রদেশের গভর্নর আলী ইব্‌ন হুসাইন ইব্‌ন শিবল কিরমান দখল করতে উদ্যত হন। ওদিকে ইয়াকূব ইব্‌ন লায়ছও কিরমানে অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পান। আলী ইব্‌ন হুসাইনের সিপাহ্‌সালারদেরকে পরাজিত করে ইয়াকূব তাদেরকে তাড়িয়ে দিতে সমর্থ হন। অবশেষে ২৫৫ হিজরীতে (৮৬৯ খ্রি) পারস্যের রাজধানী শিরাজ নগরীতে আক্রমণ পরিচালনা করে তা অধিকার করেন। তারপর তিনি কালবিলম্ব না করে সিজিস্তানে ফিরে আসেন এবং খলীফার দরবারে এ মর্মে একটি দরখাস্ত প্রেরণ করেন যে, এ অঞ্চলে দারুণ গোলযোগ চলছিল। লোকজন আমাকে ধরে তাদের আমীর মনোনীত করেছে। আমি আমীরুল মু'মিনীনের প্রতি অনুগত। তারপর ইয়াকূব ইব্‌ন লায়ছ পর্যায়ক্রমে খুরাসান থেকে তাহির বংশীয়দেরকে বহিষ্কার করে তার নিজের রাজত্ব গড়ে তুলেন। এতকাল তাহির ইব্‌ন হুসাইনের বংশধররাই একাধারে খুরাসানে রাজত্ব চালিয়ে আসছিল। এজন্যে খুরাসানের স্বাধীন রাজবংশের ইতিহাস আলোচনা কালে সর্বপ্রথম তাহিরিয়া বংশের উল্লেখ করা হয়ে থাকে। কিন্তু

বরং পশমী কম্বলে তাকে লেপটে লাথিতে লাথিতে
তার প্রাণ সংহার করাই সমীচীন হবে।"

হালাকু খান তাতে সায় দিল এবং এ দায়িত্বটি আলকামীর উপরই অর্পিত হলো। সে তার মনিব মুসতাসিম বিল্লাহকে পশমী কম্বলে জড়িয়ে একটি স্তম্ভের সাথে বেঁধে উপর্যুপরি লাথির পর লাথি মারতে লাগলো। এভাবে যখন খলীফার প্রাণবায়ু বের হয়ে গেল তখন সে তাতারী সৈন্যদের হাতে তাঁর শবদেহ অর্পণ করে। তারা তার নির্দেশানুসারে তাদের পদাঘাতে খলীফার শবদেহকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ধূলির সাথে মিশিয়ে দিল। সে এই ভেবে আনন্দবোধ করছিল যে, উলুভী অর্থাৎ শিয়াপন্থীদের রক্তের প্রতিশোধ নেয়া হলো। মোদ্দাকথা, খলীফার দাফন-কাফন বা শেষকৃত্য বলেও কিছুই হলো না। আব্বাসীয় বংশের যাকেই তাতারীরা সম্মুখে পেল নির্বিচারে নির্দয়ভাবে হত্যা করলো। কেউ তাদের হাত থেকে রক্ষা পেল না।

তারপর হালাকু খান শাহী গ্রন্থাগারের দিকে মনোনিবেশ করলো। সে ছিল অসংখ্য গ্রন্থের বিপুল এক সমাহার। সমস্ত গ্রন্থ দজলা নদীতে নিক্ষেপ করা হলো। দজলা নদীতে যেন একটি বাঁধের সৃষ্টি হলো। তারপর ধীরগতিতে পানি তা বয়ে নিয়ে গেল। দজলার যে পানি ইতিপূর্বে মনুষ্য রক্তে লাল হয়ে উঠেছিল এবার গ্রন্থাদির কালির রঙে তা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করলো। দীর্ঘকাল পর্যন্ত পানির এ কৃষ্ণবর্ণ অব্যাহত ছিল। তারপর শাহী প্রাসাদগুলো লুণ্ঠন করে ধূলিসাৎ করে দেয়া হলো। মোদ্দাকথা, বাগদাদে যে রক্তপাত ও ধ্বংসযজ্ঞ চালান হলো, পৃথিবীর ইতিহাসে তার কোন নজীর নেই। ইসলাম তথা মুসলিম জাহানের উপর এ ছিল এমন এক বিপর্যয় যে, লোকে তাকে ছোট মহাপ্রলয় নামে অভিহিত করে।

এবার এ মহাবিপর্যয় ও নরহত্যাযজ্ঞের হেতু—আলকামীর চেষ্টা হলো হালাকু খান যেন কোন উলুভী অর্থাৎ শিয়াপন্থীকে বাগদাদের শাসনকর্তা নিয়োগ করে তাকে খলীফা খেতাবে ভূষিত করে। প্রথমে যখন হালাকু খান বাগদাদ আক্রমণ করে তখন আলকামীকে সে আশ্বাস দেয়া হয়েছিল। আলকামীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, হালাকু খান কোন হাশেমী উলুভীকে খলীফা পদে বসিয়ে তাকেই নায়েবে সালতানাত পদটি দান করবে। কিন্তু সে গুড়ে বালি। হালাকু খান ইরাকে তার নিজের লোককে শাসক নিযুক্ত করলো। তা দেখে আলকামীর আশাভঙ্গ হলো। সে নানা কূটচাল চেলেও হালাকু খানকে ইরাকে তার নিজের পদলাভে সম্মত করতে সমর্থ হলো না। এমন কী এ জন্যে সে অনেক কান্নাকাটি ও কাকুতি-মিনতি পর্যন্ত করেছে। কিন্তু সকলি গরল ভেল। তার সকল পদলেহন, খোশামোদ ও তোষামোদ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। শেষ পর্যন্ত আশা ভঙ্গের ব্যথাদীর্ণ বুকে শীঘ্রই সে অক্কা পেল।

খলীফা মুসতাসিম বিল্লাহই ছিলেন বাগদাদের আব্বাসীয় খলীফাদের শেষ পুরুষ। ৬৫৬ হিজরীর (১২৫৮ খ্রি) পর বাগদাদ আর রাজধানী রইল না। খলীফা মুসতাসিম বিল্লাহর পর সাড়ে তিন বছরকাল পৃথিবীতে খলীফা বলে কেউ ছিলেন না। তারপর ৬৫৯ হিজরী (১২৬২ খ্রি)-তে মুসতাসিম বিল্লাহর চাচা আবুল কাসিম আহমদের হাতে খিলাফতের বায়আত করা হয়।

মিসরে আব্বাসীয় খিলাফত

সুলতান সালাহুদ্দীন ইব্‌ন আইয়ূব উবায়দী রাজত্বের অবসানের পর মিসরে আইয়ূবী রাজত্বের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। পূর্বেই এ সম্পর্কে সাধারণভাবে আলোচনা করাও হয়েছে।

৬৪৮ হিজরী (১২৫০ খ্রি) পর্যন্ত মিসর, সিরিয়া ও হিজাযে সুলতান সালাহুদ্দীনের বংশধরদের রাজত্ব টিকে ছিল। সুলতান সালাহুদ্দীন যেহেতু বংশে ছিল কুর্দী, তাই তাঁর বংশধরদের রাজত্বকে যেমন আইয়ূবী রাজত্ব বলা হয়ে থাকে, তেমনি কুর্দী রাজবংশের রাজত্বও বলা হয়ে থাকে। আইয়ূবী রাজবংশের সপ্তম বাদশাহ ছিলেন সুলতান সালাহুদ্দীনের সহোদরের পৌত্র মালিকুস সালিহ্। তিনি তার স্ববংশীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের হাত থেকে নিরাপদ থাকার উদ্দেশ্যে কোফকাফ এলাকা তথা সারকশিয়া প্রদেশ থেকে বার হাজার ক্রীতদাস (মামলুক) ক্রয় করে একটি পদাতিক রক্ষীবাহিনী বিশষভাবে গড়ে তুলেছিল। তাঁরই রাজত্বকালে ফ্রান্সের খ্রিস্টান বাদশাহ্ মিসরের ওপর নৌ-হামলা চালান। ক্রীতদাস বাহিনী অত্যন্ত দক্ষতার সাথে লড়াই করে রণক্ষেত্র থেকে ফ্রান্সের বাদশাহকে গ্রেফতার করে। এ কৃতিত্ব প্রদর্শনের পর ক্রীতদাস বাহিনীর মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

মালিকুস সালিহের ওফাতের পর তাঁর পুত্র মালিক মুয়াযযম তুরাণ শাহ্ মসনদে আরোহণ করেন। কিন্তু মাত্র দু'মাস অতিক্রান্ত না হতেই সুলতান মালিকুস সালিহর শাজারাতুদদুর নাম্নী এক আদরিণী দাসী সিংহাসন অধিকার করে বসে। এর রাজত্বকাল বিশৃঙ্খলা ও হাঙ্গামার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। শাজারাতুদদুর মাত্র তিন মাসকাল রাজত্ব করার পর আত্মগোপন করেন এবং নামেমাত্র আইয়ূবী খান্দানের এক ব্যক্তি মালিকুল আশরাফ মূসা ইব্ন ইউসুফকে সিংহাসনে বসানো হয়। এর রাজত্বকালে ক্রীতদাস বাহিনীর ক্ষমতা আরো বৃদ্ধি পায়। অবশেষে ৬৫৩ হিজরী (১২৫৫ খ্রি)-তে মামলুকরা (ক্রীতদাসরা) তাদেরই একজন আযীব আইবেক সালেহীকে মালিকুল মুইজ্জ উপাধিতে ভূষিত করে সিংহাসনে বসায়। এভাবে মিসরে আইয়ূবী শাসনের অবসান হয়ে মামলুক শাসনের সূচনা হয় এবং তা দীর্ঘকাল পর্যন্ত টিকে থাকে।

৬৫৫ হিজরী (১২৫৭ খ্রি)-তে মালিকুল মুইজ্জের পর তার শিশুপুত্র আলী মসনদে উপবিষ্ট হন। তাঁর লকব রাখা হয় মালিকুল মানসুর। আমীর সাইফুদ্দীন মামলুককে তার আতাবেক বা অভিভাবক মন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়। ৬৫৭ হিজরী (১২৫৮ খ্রি)-তে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের ফতওয়া নিয়ে মালিকুল মানসূরকে এ জন্যে পদচ্যুত করা হয় যে, তিনি তখনো শিশু মাত্র। তাঁর স্থলে আমীর সাইফুদ্দীনকে মসনদে বসানো হয়। তাঁর খেতাব হয় মালিকুল মুযাফফর।

সাধারণত মামলুকরা নিজেদের মধ্য থেকে বিশ-পঁচিশ ব্যক্তিকে নির্বাচিত করে তাঁদের উপরই শাসনকার্যের দায়িত্ব অর্পণ করতেন। এই কুড়ি-পঁচিশ ব্যক্তিই শাসক পরিষদের সদস্য বা নির্বাহীবৃন্দ বলে গণ্য হতেন। এদের মধ্য থেকে কাউকে তারা সদর বা আমীর নিযুক্ত করতেন। এই নির্বাচিত সদর বা প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে বাদশাহদের মত মসনদে আরোহণ করতেন এবং সুলতান বা মালিক নামে অভিহিত হতেন। মসনদে আরোহণ করে সুলতান নির্বাহী পষিদের অপর সদস্যদেরকে বড় বড় সামরিক ও প্রশাসনিক পদে নিয়োগ দান করতেন। এই কুড়ি-পঁচিশ ব্যক্তির মধ্য থেকে কেউ উযীরে আযম বা প্রধানমন্ত্রী, কেউ রঈসুল আসফার বা সেনাধ্যক্ষ, আবার কেউ পুলিশ বাহিনী প্রধান, কেউ অর্থ বিভাগ প্রধান নিযুক্ত হতেন। এদের ছাড়া অন্যদের মর্যাদা হতো অপেক্ষাকৃত কম। এ নির্বাহী পরিষদের সদস্যদের মর্যাদা হতো আবার সবার উপরে। মামলুক বাহিনীর কিছু লোক যখন মারা যেত তখন সরকারী কোষাগার থেকে অর্থব্যয় করে সেই সংখ্যক সরকারী ক্রীতদাস ক্রয় করে এনে সে

সংখ্যা পূরণ করা হতো। মামলুকদের দ্বিতীয় স্তরের হাতে এ নীতিমালা সর্বাধিক নিষ্ঠার সাথে পালিত হতো।

ভারতেও মামলুক বংশ বলে একটি বংশ রাজত্ব করেছে। কিন্তু এখানে দুই-তিন জন ব্যকিক্রম ছাড়া অবশিষ্ট সকল সুলতানই ছিলেন সুলতান শামসুদ্দীন আলতামাশের বংশধরদের মধ্য থেকে। অর্থাৎ সেই বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের অভিশাপ এখানেও বর্তমান ছিল। পক্ষান্তরে মিসরের মামলুক সুলতানগণের অধিকাংশই ছিলেন আক্ষরিক অর্থেই ক্রীতদাস। তাদের ব্যক্তিগত যোগ্যতা বলেই তারা রাষ্ট্রের শীর্ষ পদে অধিষ্ঠিত হতেন। ঐতিহাসিকগণ এদিকে তেমন ভ্রূক্ষেপ করেন নি। তাই মিসরী মামলুক রাজত্বের এই উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্যের কথাটি কেউই স্পষ্ট করে লিখেন নি। কিন্তু এ এক অনস্বীকার্য সত্য যে, মিসরের মামলুক রাজত্বের কোন কোন ব্যাপার সংশোধনের অতীত না থাকলেও এ ব্যাপারটি তাদের মধ্যে অবশ্যই অত্যন্ত প্রশংসনীয় ছিল যে, বাদশাহ্ নির্বাচন তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বাধীনভাবে করতেন। এ সালতানাতের বিস্তারিত বর্ণনা ইনশা আল্লাহ্ স্বতন্ত্রভাবে একটি অধ্যায়ে করা হবে। এখানে শুধু এতটুকু বর্ণনা করা জরুরী মনে করছি যে, মালিক মুযাফফর যখন শুনতে পেলেন যে, মোগল অর্থাৎ তাতারী সৈন্যরা বাগদাদ, ইরাক, খুরাসান, পারস্য, আযারবায়জান, জাযিরা, মুসেল প্রভৃতি এলাকা ধ্বংস করে পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করে সিরিয়া অঞ্চলেও ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে তখন তিনি তাঁর মামলুক বাহিনী ও মিসরীয় সৈন্যদের নিয়ে মিসর থেকে সিরিয়া অভিমুখে রওয়ানা হন।

৬৫৫ হিজরীর ১৫ই রমযান (অক্টোবর ১২৫৭ খ্রি) শুক্রবার নহরে জালুত নামক স্থানে মামলুক বাহিনী সিপাহ্সালার রুকনুদ্দীন বায়বার্স নেতৃত্বে মোগলদেরকে এমনি শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করলেন যে, এমন শোচনীয় ও অপমানজনক পরাজয় ইতিপূর্বে আর কোথাও তারা বরণ করেনি। হাজার হাজার মোগল সৈন্য রণক্ষেত্রে নিহত হলো। যারা বেঁচে রইল তারা মামলুকদের সম্মুখ থেকে এমনভাবে পালিয়ে গেল যেমন ছাগল-ভেড়ার পাল সিংহ দেখলে পালায়। মোগলদের অনেক দ্রব্য-সম্ভার মামলুকদের হস্তগত হলো। তাদের অন্তরে মামলুকদের ভয় ও দাপট এমনভাবে অংকিত হলো যে, তারা কত রাজ-রাজড়াদের রাজত্বের অবসান ঘটিয়েছে, কত রাজ্য চুরমার করে দিয়েছে, কিন্তু মামলুকদের ভয়ে মিসরের মামলুকদের দিকে কোনদিন আড়চোখে তাকাতে সাহসী হয়নি। মামলুকরা আলেপ্পো পর্যন্ত মোগলদের পশ্চাদ্ধাবন করে। তারপর তারা মিসরে ফিরে যায়। ৬৫৮ হিজরীর ১৬ই যিলকদ (নভেম্বর ১২৬০ খ্রি) মালিকুল মুযাফফর নিহত হলে রুকনুদ্দীন বায়বার্স মসনদে আরোহণ করেন। তিনি মালিকুয যাহির খেতাব ধারণ করেন।

মালিকুয যাহিরের ক্ষমতাসীন হওয়ার পর জানা গেল যে, ৩৭তম ও শেষ আব্বাসীয় খলীফা মুসতাসিম বিল্লাহ্‌র চাচা আবুল কাসিম আহমদ যিনি বাগদাদে অন্তরীণ অবস্থায় ছিলেন এবং বাগদাদ ধ্বংস ও মুসতাসিমের নিহত হওয়ায় কোনমতে কয়েদখানা থেকে গোপনে পালিয়ে গিয়ে সিরিয়ার কোন এক স্থানে আত্মগোপন করে বাস করছেন। মালিকুয যাহির দশজন সম্ভ্রান্ত আরব সম্বলিত একটি প্রতিনিধিদলকে মিসর থেকে উক্ত আবুল কাসিম আহমদ ইব্ন যাহির বি-আমরিল্লাহ্ আব্বাসীর খোঁজে সিরিয়ায় পাঠালেন। তারা তাঁকে সঙ্গে নিয়ে মিসরে প্রত্যাবর্তন করলেন। মালিকুয যাহির আবুল কাসিমের আগমন সংবাদে মিসরের সমস্ত

বিদ্বজ্জন ও অমাত্যবর্গকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর অভ্যর্থনার জন্যে রাজধানী কায়রো থেকে বেরিয়ে আসলেন। তাঁকে অত্যন্ত সম্মানের সার্থে অভ্যর্থনা করে শহরে এনে ৬৫৯ হিজরীর ১৩ই রজব (জুন ১২৬১ খ্রি) তার হাতে বায়আত গ্রহণ করলেন। এখন থেকে তাঁর খেতাব হলো আল-মুসতানসির বিল্লাহ্। তাঁর নামে খুতবা পঠিত এবং মুদ্রায় তাঁর নাম অঙ্কিত হলো। জুমুআর দিন খলীফা শোভাযাত্রা সহকারে মসজিদে আগমন করেন। খুতবায় বনী আব্বাস বংশের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়। খলীফার জন্যে দু'আ করা হয়। জুমুআর নামাযান্তে খলীফা সুলতান যাহিরকে খিলাত দানে সম্মানিত করেন। ৪ঠা শাবান ৬৫৯ হিজরী (জুলাই ১২৬১ খ্রি) সোমবার খলীফা কায়রোর বাইরে শহরতলিতে শিবির স্থাপন করে আনুষ্ঠানিকভাবে দরবার বসান। তিনি নিজের পক্ষ থেকে মালিকুয যাহিরকে নায়েবে সালতানাত নিযুক্ত করে মিসরের পূর্ণ শাসন ক্ষমতা তারই হাতে তুলে দেন। অর্থাৎ এ মর্মের একটি লিখিত ফরমান পাঠ করে দরবারে তিনি সকলকে শুনিয়ে দেন। মালিকুয যাহির খলীফার জন্যে খেদমতগার, খাজাঞ্চি, সাকী বা আবদার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কর্মচারী নিযুক্ত করে দেন এবং মিসরের রাজকীয় কোষাগারের একাংশ খলীফার ইচ্ছামত ব্যয় করার জন্যে নির্ধারণ করে তাঁর এখতিয়ারে ছেড়ে দেয়ার কথা ঘোষণা করেন। এভাবে সাড়ে তিন বছর আল-মুসতানসির বিল্লাহ্ আবুল কাসিম আহমদ খলীফা পদে আসীন থাকার পর ৬৬০ হিজরীর ২রা মুহাররম (২৭ নভেম্বর ১২৬১ খ্রি) যখন মালিকুয যাহিরের নিকট থেকে সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাতারদের দমনের উদ্দেশ্যে সিরিয়ায় গিয়েছিলেন তখন একটি যুদ্ধ চলাকালে নিহত অথবা নিখোঁজ হয়ে যান। খলীফার নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার পর দীর্ঘ একবছর কাল আর কাউকে খলীফা করা হয়নি। অবশেষে আরেকজন শাহযাদার সংবাদ পেয়ে মালিকুয যাহির তাঁকে মিসরে এনে খলীফা পদে আসীন করেন। এ শাহযাদার নাম ছিল আবুল আব্বাস আহমদ ইব্ন হাসান ইব্ন আলী ইব্ন আবূ বকর ইব্ন খলীফা মুস্তারশিদ বিল্লাহ্ ইব্ন মুস্তাহি বিল্লাহ্। তাঁর প্র-পিতামহ পর্যন্ত কয়েক পুরুষের কেউ খলীফা হননি। এভাবে খলীফা মুস্তারশিদের বংশধরদের মধ্যে পুনরায় আব্বাসীয় খিলাফতের সূচনা হলো। এ খলীফার উপাধি হয় হাকিম বি-আমরিল্লাহ্।

৬৬১ হিজরীর ৮ই মুহাররম (নভেম্বর ১২৬২ খ্রি) হাকিম বি-আমরিল্লাহ্ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ৬৭৪ হিজরীতে (১২৭৫ খ্রি) মালিক যাহির সুদান দেশ জয় করেন। এটা ছিল এক বিরাট বিজয়। ৬৭৬ হিজরীর মুহাররম (জুন, ১২৭৬ খ্রি) মাসে মালিক যাহিরের মৃত্যু হলে মালিক সাঈদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ৬৭৮ হিজরীতে (১২৭৯ খ্রি) মালিক মানসূর মিসরের সুলতান পদে আসীন হন। ৬৮০ হিজরীতে (১২৮১ খ্রি) মালিক মানসূর সিরিয়ায় উপস্থিত হয়ে তাতারীদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে তাড়িয়ে দেন। ৬৮৯ হিজরীতে (১২৯০ খ্রি) মালিক মানসূরের ইন্তিকাল হয় এবং মালিক আশরাফ ক্ষমতাসীন হন। ৭০১ হিজরীর ১৮ জুমাদাল আউয়াল (জানুয়ারী ১৩০২ খ্রি) খলীফা হাকিম বি-আমরিল্লাহ্ চল্লিশ বছর পাঁচ মাস দশ দিন রাজত্ব করে ইনতিকাল করে কায়রোতে সমাধিস্থ হন। তাঁর স্থলে খলীফা হন তাঁরই পুত্র আবুর রবী' মুস্তাকাফী বিল্লাহ্। মোদ্দাকথা, মিসরে ৯২২ হিজরী (১৫৮৪ খ্রি) পর্যন্ত স্বাধীন মামলুক রাজত্ব কায়েম থাকে। ৭৮৪ হিজরী (১৩৮২ খ্রি) পর্যন্ত বাহরিয়া মামলুক নামে অভিহিত সরকেশী মামলুকরা রাজত্ব করেন। তারপর তাদেরই অপর সম্প্রদায় চরকেসী মামলুকরা ক্ষমতাসীন হতে থাকেন। বাহরিয়া মামলুকদের শেষ সুলতান মালিক সালিহ্ ৭৮৪ হিজরীর রমযান (নভেম্বর ১৩৮২ খ্রি) মাসে পদচ্যুত হন এবং তাঁর স্থলে

বরকূফ চরকস মালিকুয যাহির খেতাব নিয়ে মসনদে আরোহণ করেন। তারপর ৯২২ হিজরী (১৫৮৪ খ্রি) পর্যন্ত একের পর এক চরকসী গিরজী মামলুকরা মিসরের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে থাকেন। গিরজী বা চরকসী সুলতানদের শেষ সুলতান তুমান-বে সুলতান সালীম উসমানীর হাতে পরাস্ত হওয়ায় মিসর উসমানীয় সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে।

মামলুকদের রাজত্ব শুরুর প্রথম দিকেই মিসরে আব্বাসীয় খিলাফতের দ্বিতীয় যুগের সূচনা হয় পূর্বেই যা বর্ণিত হয়েছে। এই ধারা ৯২২ হিজরী (১৫৮৪ খ্রি)-তে মামলুক রাজত্বের অবসানের সাথে সাথে শেষ হয়ে যায়। মিসরের আব্বাসীয় খিলাফত অনেকটা আজকালকার পীরের গদীর মতই ছিল। নামে এরা খলীফাই ছিলেন এবং তাঁদের উত্তরাধিকারীও মনোনীত হতেন। ভারত এবং অন্যান্য দেশের মুসলমান বাদশাহ তাদের নিকট থেকে রাজ্য শাসনের সনদ এবং খেতাবও হাসিল করতেন। মিসরের মামলুক সুলতানগণও নিজেদেরকে সেই খলীফাদের নায়েবে সালতানাত (ভাইসরয়) বলে অভিহিত করতেন। বাহ্যত তাঁরা তাঁদের প্রতি সম্মান ও সম্ভ্রম প্রদর্শন করতেন। খুতবায়ও তাঁদের নাম পঠিত হতো। কিন্তু আসলে তাঁদের কোন শক্তি-সামর্থ্য ছিল না। তাঁদের বেতন-ভাতা নির্ধারিত ছিল। মিসরের সুলতানরা না দিতেন তাদেরকে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে, না দিতেন তাঁদের সাথে কাউকে মেলামেশা করতে। এই খলীফা তাঁদের পরিবারের সদস্যবর্গসহ তাঁদের প্রাসাদসমূহের মধ্যেই অনেকটা নজরবন্দী হয়ে থাকতেন। তাঁদের অবস্থা ছিল অনেকটা রাজনৈতিক শাহী কয়েদীদেরই মত। নামে তাঁরা ছিলেন খলীফা। কিন্তু আসল ইসলামের খলীফা যে অর্থ বহন করে তার সাথে তাঁদের ফারাক ছিল আসমান যমীনের। সুলতান সলীম উছমানী মিসর অধিকার করার পর মিসরের আব্বাসী খলীফা মুহাম্মদের উপরই তিনি আধিপত্য লাভ করেন। মুহাম্মদ ছিলেন মিসরের খলীফাদের মধ্যে অষ্টাদশতম এবং খলীফা হিসাবে শেষ খলীফা। এই খলীফার কাছে যে বিশেষ পতাকা এবং জুব্বা খিলাফতের নিদর্শনস্বরূপ বিদ্যমান ছিল সুলতান সলীম তাঁকে সম্মত করে তা নিজে হস্তগত করে নেন। মিসর থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় সুলতান সলীম ঐ আব্বাসী খলীফাকেও সাথে করে নিয়ে যান। আব্বাসী খলীফা সুলতান সলীমকে তাঁর উত্তরাধিকারী খলীফারূপে মনোনয়নও দান করেন। এভাবে ৯২২ হিজরী (১৫৮৪ খ্রি)-তে আবুল আব্বাস সাফ্ফাহ থেকে শুরু করে চলে আসছিল আব্বাসীদের খিলাফত দীর্ঘ আটশ বছর পর নামমাত্র খিলাফতের রূপ পরিগ্রহ করে তার অবসান ঘটে এবং সে যুগে খিলাফতের সবচাইতে যোগ্য হকদার উছমানীদের খিলাফতের সূচনা হয়। আব্বাসীয় বংশের ৩৭ জন খলীফা বাগদাদ তথা ইরাকে এবং ১৮ জন মিসরে রাজত্ব করেন। এদের মোট সংখ্যা ছিল ৫৫ জন।

আব্বাসীয় খিলাফতের প্রতি আলোকপাত করতে গিয়ে আমরা অনেক দূর পর্যন্ত চলে এসেছি। এবার আমাদেরকে পুনরায় এই ধারার শুরুতে চলে যেতে হবে এবং ডানে বায়ে যে জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ শাখাসমূহ রেখে এসেছি তার প্রতি আলোকপাত না করে আমরা এক পদও অগ্রসর হতে পারি না। হয়তো এখানে পাঠকগণ আব্বাসীয় খিলাফতের সম্পর্কে একটি পর্যালোচনা আশা করতে পারেন। কিন্তু যা কিছু বলার ছিল তার সব কিছুই আমি যথাস্থানে বলে এসেছি। তাই এই আযীমুশশান খলীফা বংশের পরিণতি দর্শনে স্বাভাবিকভাবে অন্তরে যে ভাবের উদয় হয়েছে তাকে আর নষ্ট করতে চাই না। হ্যাঁ পরবর্তী অধ্যায়ে কয়েকটি জরুরী কথা আরয করে এই খণ্ডের এখানেই ইতি টানছি।

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

খিলাফতে বনী উমাইয়া ও খিলাফতে আব্বাসীয়ার বর্ণনা সমাপ্ত হয়েছে। কিন্তু তাঁদের বর্ণনা পাঠে খলীফাদের শাসন ও ক্ষমতা, বিজয় ও যুদ্ধ-বিগ্রহের একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা মানসপটে অংকিত হয়। সাধারণভাবে ঐতিহাসিকগণ রাজরাজড়াদের এরূপ বিবরণ তাঁদের লিখিত ইতিহাস গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ করে থাকেন। উপরে তাই সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু অধুনা ইতিহাসশাস্ত্র যে উন্নতি করেছে তাতে নতুনভাবে লিখিত কোন ইতিহাসগ্রন্থে এটাও খুঁজে দেখা হয় যে, যে যুগ বা যে রাজবংশের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে, তার শাসননীতি কি ছিল? সমাজের লোকজনের জীবনযাত্রা প্রণালী বা মানচিত্র কি ছিল? তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষই বা কতটুকু ছিল ইত্যাদি। পাঠকদের সে চাহিদা পূরণ করতে হলে পুস্তকের কলেবর অন্তত দ্বিগুণ বৃদ্ধি করতে হয়। এ সংক্ষিপ্ত পুস্তক দ্বারা পাঠকদের সে চাহিদা যথার্থভাবে পূরণ করা সম্ভব হবে না। এ অপূর্ণতার কথা স্বীকার করে নিয়েই নিম্নে কয়েকটি ইঙ্গিত গ্রন্থের সাহায্য নিয়ে লিপিবদ্ধ করছি।

রাষ্ট্রের উল্লেখযোগ্য কর্মচারী ও পদাধিকারী

খিলাফতে বনী উমাইয়া ছিল একটি বিজয়ী ও সাম্রাজ্যবাদী পরাক্রমশীল সালতানাত। সে যুগে আরবদেরকে বিজয়ী জাতি এবং পৃথিবীর অন্যান্য জাতিকে বিজিত জাতি বলে বিবেচনা করা হতো। আরবদের মধ্যে ধর্মীয় প্রেরণা বিদ্যমান ছিল। কুরআনুল করীম ও সুন্নাতে রাসূল ছাড়া অন্য কোন আইন তাদের জন্যে অবশ্য পালনীয় ও রাষ্ট্রীয় ফরমানের মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারতো না। মুসলমানদের মধ্যে আত্মকলহও ছিল, কিন্তু এ আত্মকলহ থাকা সত্ত্বেও আরব, সিরিয়া, মিসর, ইরাক প্রভৃতি মুসলিম রাজ্যের গণজীবন এবং তাদের মধ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্যে কোন জটিল রাষ্ট্রনীতির তেমন প্রয়োজন ছিল না। খলীফা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারসমূহে পরামর্শ গ্রহণ করতেন, কিন্তু সে পরামর্শ গ্রহণের ক্ষেত্রে তাঁর জন্যে কোন বাধ্যবাধকতাও ছিল না। আবার বিনা তলবেও লোকে তাঁদেরকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দান করতো। অনেক সময় সেই পরামর্শ তাঁকে মঞ্জুরও করতে হতো। রাষ্ট্রে সাধারণত আরবসুলভ সরলতার প্রতিফলন ছিল। মামুলী একজন মরুচারী বেদুঈনও নির্বিবাদে খলীফার দরবার পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারতো। খলীফার প্রবল পরাক্রম এ মরুচারী বেদুঈনের বাকস্বাধীনতাকে একটুও বাধাগ্রস্ত করতে পারতো না। খলীফা তাঁর অধীনস্থ প্রদেশ ও রাজ্যসমূহে নিজ নায়েব মনোনীত করে প্রেরণ করতেন। সেসব রাজ্য বা প্রদেশে নায়েবের নিরংকুশ ক্ষমতা থাকতো। খলীফা যেমন গোটা মুসলিম জাহানের শাসক ছিলেন, তেমনি তিনি গোটা মুসলিম জাহানের প্রধান সিপাহ্সালার বলেও গণ্য হতেন। প্রদেশ ও রাজ্যসমূহের আমিলগণ তাঁদের সংশ্লিষ্ট এলাকার বাদশাহ ও সিপাহ্সালার হতেন। একাধারে তারাই হতেন

ধর্মীয় নেতা, সালাতের ইমাম এবং কাযীউল কুযাত বা প্রধান বিচারপতি। খলীফারও যখন কোন ধর্মীয় প্রশ্নে কোনরূপ দ্বিধাদ্বন্দ্ব উপস্থিত হতো তখন তিনি ধর্মবেত্তা আলিম ও ফকীহগণের কাছে তা জিজ্ঞেস করে জেনে নিতে একটুও সংকোচবোধ করতেন না। অনুরূপ আমিল বা ওয়ালীদেরও সময় সময় উলামা ও ফকীহদের মতামত চাইতে হতো। কোন কোন সময় আবার এক একটি প্রদেশে একজন আমিল বা গভর্নরের সাথে আরেকজনকে কাযী বা প্রধান বিচারপতি করে পাঠানো হতো। আমিল হতেন শাসন বিভাগের প্রধান। তাঁর কাজ হতো সৈন্যবাহিনীকে পরিচালনা করা, শত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা, প্রজাসাধারণের দেখাশোনা করা ও রাজস্ব আদায় করে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে তা সঞ্চিত করা। কাযীর কাজ ছিল শরীয়তের দণ্ডবিধি জারি করা, বিচার-মীমাংসাদি করা এবং শরীয়তের বিধি-বিধান ও অনুশাসন জনসাধারণকে মেনে চলার জন্য বাধ্য করা। এমতাবস্থায় আমিল কেবল সেনাবাহিনী প্রধানই হতেন। মোদ্দাকথা, বনী উমাইয়ার খিলাফতে সরলতার আধিক্য ছিল। শরীয়তের বিধি-নিষেধ দিয়ে সমস্ত জটিলতার নিরসন করা হতো। প্রজাসাধারণ ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত থাকায় অত্যন্ত সুখী ও সমৃদ্ধ ছিল। প্রজা-সাধারণের উপর কোনরূপ অন্যায় কর আরোপ করা হতো না। শাসন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্যে রাষ্ট্রকেও খুব একটা অর্থ ব্যয় করতে হতো না। খলীফা একাধারে গোটা মুসলিম জাহানের আধ্যাত্মিক নেতা এবং দুনিয়াবী শাহানশাহ বলে বিবেচিত হতেন। এ জন্যে রাষ্ট্রের শাসন-শৃঙ্খলা বহাল রাখাটা ছিল খুবই সহজসাধ্য। বিধিবদ্ধভাবে কেউ উযীর হতেন না। আবার প্রয়োজনে যে-কেউ উযীরের দায়িত্ব পালন করতে পারতেন।

খিলাফতে আব্বাসীয়ায় আরবদের সাথে ইরানী-তুর্কীরাও বিজয়ী জাতির মর্যাদায় অভিষিক্ত হন। ক্রমে ক্রমে বিজিত জাতিদের ক্ষমতা বিজয়ী আরবদের চাইতেও অধিক হয়ে যায়। ফলে শাসন-শৃঙ্খলার ব্যাপারে জটিলতার উদ্ভব হয়। যদি আরব, ইরানী ও তুর্কীদেরকে ইসলামের শিক্ষানুযায়ী সমমর্যাদায় রাখা হতো এবং সত্যিকারের সাম্য প্রতিষ্ঠিত থাকতো, তা হলে রাষ্ট্রব্যবস্থায় বনী উমাইয়াদের চাইতেও বেশি সরলতা ও দক্ষতার অভিব্যক্তি ঘটতো। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এসব জাতির মধ্যে বিরোধ, মনোমালিন্য ও রেষারেষি ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। এর আসল কারণ ছিল, ইরানীদেরকে আরবদের উপর প্রাধান্য দেয়া। খলীফার দরবারে ইরানী ও সাসানী ঠাটবাটের প্রাদুর্ভাব ঘটলো এবং শান্তিময় আরব সরলতাকে তাচ্ছিল্যভরে দরবার থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করা হলো। ফলে ইসলামী খিলাফতকে এমনি জটিলতার আবর্তে পড়তে হলো যাতে তার প্রভাবও দিন দিন হ্রাস পেতে পেতে শূন্যের কোটায় গিয়ে দাঁড়ালো। আব্বাসী খিলাফতের উল্লেখযোগ্য পদ ও পদবীসমূহ ছিল নিম্নরূপ ঃ

উযীরে আযম

প্রথম প্রথম খলীফার একজন মাত্র উযীর থাকতেন আর তিনি হতেন সব ব্যাপারে খলীফার নায়েব বা প্রতিনিধি স্বরূপ এবং সকল বিভাগের উচ্চতর অধিকর্তা। পরবর্তীকালে যখন দেখা গেল একজন মাত্র উযীরের পক্ষে সকল বিভাগের দেখা-শোনা ও পরিচালনার দায়িত্বপালন সম্ভব নয় তখন উযীরে আযম বা প্রধানমন্ত্রীর অধীনে বিভিন্ন বিভাগের স্বতন্ত্র উযীর নিযুক্ত করা হতে থাকে। উযীরে আযম প্রথম দিকে শুধু এমন সব ক্ষমতার অধিকারী বলে বিবেচিত হতেন, যেগুলো খলীফা স্বেচ্ছায় তাঁর উপর অর্পণ করতেন। এমন অনেক ব্যাপারও রাষ্ট্রে থাকতো

যেগুলোর ইখতিয়ার খলীফা ভিন্ন আর কারোরই ছিল না। অবশ্য, উযীরে আযম সে সব ব্যাপারেও খলীফাকে পরামর্শ দিতে পারতেন। এ জাতীয় পরামর্শ দানের জন্যে কেবল উযীরে আযমই নন রাষ্ট্রের অন্যান্য অমাত্যকেও খলীফা মতামত প্রদানের জন্যে আহ্বান জানাতেন। কোন কোন খলীফা যেমন খলীফা হারূনুর রশীদ তাঁর উযীরে আযমকে সালতানাতের প্রতিটি ব্যাপারে নিরংকুশ ক্ষমতা দিয়ে রেখেছিলেন। উযীরে আযমই যে কোন প্রকার বিধি-নিষেধ জারি করে দিয়ে খলীফাকে কেবল তা অবগত করতেন। এরূপ পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী উযীরদের মর্যাদা ছিল অত্যুচ্চ এবং প্রকৃতপক্ষে এরূপ উযীরে আযম খলীফার চাইতেও বেশি ক্ষমতাধর বলে বিবেচিত হতেন।

পরবর্তীকালে যখন খলীফাগণ খুব দুর্বল হয়ে পড়েন এবং দায়লামী আমীরুল উমারা বা সালজুকী সুলতানরা খিলাফতের উপর চেপে বসেন, তখন খলীফার উযীরে আযম এবং উক্ত সুলতানদের উযীরে আযম হতেন পৃথক পৃথক। এ পর্যায়ে খলীফার উযীরে আযম তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ পদ বলে বিবেচিত হতো না। এই দ্বৈতশাসনের যুগে কোন কোন সময় খলীফার উযীরকে রঈসুর রুআসা এবং সুলতানের উযীরকে উযীর বলা হতো। কোন কোন সময় খলীফার উযীরের মর্যাদা ছিল খলীফার চাইতেও বেশি। আর যে সব ক্ষেত্রে খলীফার উযীর সুলতানের মনোনীত ব্যক্তি হতেন সে সব ক্ষেত্রে খলীফা তাঁর উযীরের হাতে বন্দী হয়ে পড়তেন।

উযীর নির্বাচন সাধারণত খলীফা তাঁর ব্যক্তিগত জানাশোনার ভিত্তিতেই করতেন। আবার কখনো কখনো তিনি নেহায়েত মামুলী সামাজিক মর্যাদার লোককে খিলাত দিয়ে রাষ্ট্রের সবচাইতে উঁচু পদে বসিয়ে দিতেন। কখনো বা একজন উযীরের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্রই হতেন পরবর্তী উযীর। খলীফা হারূনুর রশীদের উযীর জাফর বারমাকী ও ফযল, আল্‌প আরসালান ও মালিক শাহের উযীর নিযামুলমুল্‌ক প্রমুখ অত্যন্ত নামকরা উযীর ছিলেন।

আমীরুল উমারা

এ পদটি আব্বাসী খলীফাদের পতনের যুগে সৃষ্টি হয়। ক্ষমতাবান লোকেরা খলীফার উপর চেপে বসে নিজে নিজে এ পদবীটি গ্রহণ করে। এই আমীরুল উমারারা আসলে ইরাক, পারস্য ও খুরাসানের একচ্ছত্র শাসক ছিলেন। রাষ্ট্রের অপর সকল পদস্থ কর্মকর্তা তাঁদেরই অধীন এবং তাঁদেরই দ্বারা নিয়োজিত হতেন। খলীফা হতেন নামেমাত্র খলীফা অথবা কেবল বায়আতের জন্যে। দায়লামীদের শাসনকাল প্রায় একশ বছর বিস্তৃত ছিল। তাঁদেরকেই আমীরুল উমারা বলা হতো।

সুলতান

দায়লামীরা যেমন নিজেদের জন্যে 'আমীরুল উমারা' খেতাব বেছে নেয়, তেমনি সালজুকীরা নিজেদের জন্যে 'সুলতান' খেতাবটি বেছে নেয়। এই সালজুকী সুলতানরা দায়লামীদের চাইতে তুলনামূলকভাবে খলীফাদের বেশি অনুগত ছিলেন। দায়লামীরা দরবারে খিলাফতের সকল ক্ষমতা রহিত করেছিল। সালজুকীরা খলীফার মর্যাদা স্বীকার করে নেয় এবং তাঁদেরকে শাসন পরিচালনার সুযোগও দান করে। তাঁদের যুগে খলীফাগণ তাঁদের হৃত শান-শওকত ও প্রভাব-প্রতিপত্তি উদ্ধারে যত্নবান হন এবং এ ব্যাপারে অনেকটা সফলও হন। আব্বাসী খলীফাগণের প্রথম যুগে আমীরুল উমারা ও সুলতানের কোন পদ ছিল না।

আমিল বা ওয়ালী (গভর্নর)

প্রদেশ ও রাজ্যসমূহের শাসকদের সাধারণত ক্ষমতা থাকতো। প্রত্যেক আমিল বা ওয়ালী তাঁর প্রদেশের রাজস্ব আয়ের একটি নির্ধারিত অংশ খলীফার দরবারে নিয়মিত প্রেরণ করতেন। কোন কোন সময় কোন নির্দিষ্ট প্রদেশের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ খারাজ বা রাজস্ব নির্ধারণ করেই আমিলকে কেন্দ্র থেকে পাঠানো হতো। প্রদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারসমূহে এবং শাসন-শৃঙ্খলা বিধানের ব্যাপারে ওয়ালী পূর্ণ ক্ষমতা ও স্বাধীন হতেন। বিনিময়ে তিনি নির্ধারিত রাজস্ব প্রতিবছর খলীফার দরবারে পাঠাতেন। এটা অনেকটা ইজারাদারীর মতো ব্যবস্থা ছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমিলকে তাঁর প্রদেশের আয়-ব্যয়ের হিসাব কেন্দ্রে দিতে হতো। এমতাবস্থায় তাঁকে নির্ধারিত হারের কর দিতে হতো না বরং যে বছর যে পরিমাণ সম্পদ উদ্বৃত্ত থাকতো সে বছর তা-ই কেবল কেন্দ্রে পাঠাতে হতো। আফ্রিকিয়া, ইয়ামান, মাওরাউন নাহরের মতো সীমান্তবর্তী প্রদেশসমূহে সাধারণত পূর্বোক্ত ইজারাদারী ব্যবস্থা অর্থাৎ নির্ধারিত অংকের কর কেন্দ্রে প্রেরণের ব্যবস্থা থাকতো। এরূপ প্রদেশসমূহের আমিলদের থেকে নামে মাত্র খারাজ আদায় করা হতো। কোন কোন ক্ষেত্রে তো এসব প্রদেশের জুমুআর মসজিদসমূহে খুতবায় খলীফার নাম উচ্চারণকেই যথেষ্ট বলে বিবেচনা করা হতো। এসব সীমান্তবর্তী প্রদেশসমূহের আমিল বা ওয়ালিগণ কোনরূপ বিশ্বাসঘাতকতা, বিরোধিতা বা বিদ্রোহ না করলে তাঁদেরকে সাধারণত বদলী বা পদচ্যুত করা হতো না। তবে অন্যান্য প্রদেশে খলীফা ঘন ঘন আমিল পরিবর্তন করতে থাকতেন।

সাহিবুশ শুরতা (পুলিশ প্রধান)

শহর ও জনপদসমূহে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, বিদ্রোহ দমন ও চোর-ডাকাতদেরকে গ্রেফতার করে তাদের শাস্তি বিধানের দায়িত্ব যার উপর ন্যস্ত থাকতো, তাঁকে 'সাহিবুশ শুরতা' বলা হতো। আমরা একে পুলিশ বিভাগের প্রধান বলে থাকি। এই সাহিবুশ শুরতা নিজে বাগদাদে অবস্থান করতেন, ইরাকের অন্যান্য শহরে তাঁর নায়েব বা প্রতিনিধি নিয়োগ করতেন। কোন কোন সময়ে ইরাকের সামরিক বাহিনী প্রধান এবং প্রদেশের আমিল বা গভর্নর নিজেই এ দায়িত্ব পালন করতেন। বিখ্যাত তাহির ইব্‌ন হুসাইন সাহিবুশ শুরতা থেকেই খুরাসানের গভর্নর হয়েছিলেন। মোটকথা, এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ ছিল এবং কোন সাধারণ ব্যক্তি এ দায়িত্ব লাভ করতেন না।

হাজিব

হাজিব ছিলেন খলীফার ব্যক্তিগত দেহরক্ষী এবং তাঁর দেহরক্ষী বাহিনীর প্রধান হতেন। খলীফার দরবারে তাঁর মর্যাদা ও প্রতিপত্তি থাকতো সর্বাধিক। হাজিব সফরে বা ঘরে সর্বাবস্থায় ছায়ার মত খলীফার সাথে সাথে থাকতেন এবং খলীফার একাকিত্বের সময় তাঁর মন ভুলানো সঙ্গী হতেন। খলীফার প্রাসাদের ভৃত্য ও রক্ষিগণ এবং সান্ত্রীরা তাঁর অধীন থাকতেন। হাজিবকে খলীফার দরবারে প্রবেশকারী প্রত্যেককে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন এবং খলীফার হুকুম তামিলের জন্য সদাপ্রস্তুত থাকতে হতো। হাজিবের কাছে কোন কোন সময় উযীরে আযমকেও নতি স্বীকার করতে হতো। হাজিব খলীফার গোপন তথ্যাদি সম্পর্কে সম্যক অবগত এবং

খলীফার সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি হতেন। হারূনুর রশীদ তাঁর হাজিব মাসরূরকে দিয়েই তাঁর উযীর জা'ফর বারমাকীকে হত্যা করিয়েছিলেন।

কাযীউল কুযাত (প্রধান বিচারপতি)

কাযীউল কুযাতের স্বতন্ত্র পদ সর্বপ্রথম খলীফা হারূনুর রশীদই সৃষ্টি করেছিলেন– যা সর্বশেষ আব্বাসীয় খলীফার যুগ পর্যন্ত কায়েম ছিল। এই পদকে আজকাল 'শায়খুল ইসলাম' বলা হয়ে থাকে।[1] কাযীউল কুযাত সমস্ত প্রদেশ ও রাজ্যে নিজ ক্ষমতা বলে তাঁর নায়েব বা প্রতিনিধি নিয়োগ করতেন। আবার প্রত্যেক সুবা বা প্রদেশের কাযী তাঁর নিজ ক্ষমতাবলে তাঁর অধীনস্থ প্রত্যেক শহরে স্থানীয় কাযী নিয়োগ করতেন। তাঁর কাজ হতো ধর্মীয় বিধি-বিধানের হিফাযত ও পাবন্দী করানো এবং বিচারপ্রার্থী ও বিবদমান লোকদের মধ্যে বিচার মীমাংসা করে দেয়া। এটা অত্যন্ত বড় পদ ছিল। দরবারে কাযীউল কুযাতের মর্যাদা সেনাবাহিনী প্রধান বা উযীরে আযমের চাইতে কোন অংশে কম ছিল না। নতুন মসনদে আরোহণকারী তখনই খলীফা বলে গণ্য হতেন যখন কাযীউল কুযাত তাঁকে খলীফা বলে স্বীকৃতি দিতেন। কোন খলীফাকে পদচ্যুত করতে কাযীউল কুযাতের নিকট থেকেই ফতওয়া হাসিল করা হতো। কাযীকে খলীফা পদচ্যুত করতে পারতেন।

তবে নতুন খলীফার অভিষেক অনুষ্ঠানে কাযীর মঞ্জুরি ছিল অপরিহার্য। গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় ব্যাপারসমূহে যেমন কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনীর অভিযান চালানো বা কোন প্রদেশের আমিল নিয়োগকালে কাযীর পরামর্শও গ্রহণ করা হতো। যদি খলীফা নিজে সিপাহ্সালার হয়ে কোন রাষ্ট্র আক্রমণ করতেন, তবে কাযীউল কুযাতও তাঁর সহযাত্রী হতেন, নতুবা প্রতিটি বাহিনীর সাথে কাযী তাঁর একজন প্রতিনিধিকে পাঠাতেন। চুক্তিপত্র, সন্ধিপত্র, কোন রাজ্যের শাসনের সনদ, খলীফার গুরুত্বপূর্ণ ফরমান ও ওসীয়তনামা প্রভৃতির উপর অবশ্যই কাযীর মোহর অঙ্কিত থাকতো।

রাঈসুল 'আস্কর (সেনাবাহিনী প্রধান)

যদিও প্রত্যেক খলীফা, প্রত্যেক আমিল, প্রত্যেক উযীর এবং প্রত্যেক পদস্থ ব্যক্তি সিপাহ্সালার হতে পারতেন, এতদসত্ত্বেও খলীফার নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর একজন প্রথাসিদ্ধ রাঈসুল 'আস্কার বা প্রধান সেনাপতিও থাকতেন। এটাকে কোন স্থায়ী বা স্বতন্ত্র পদ মনে করা হতো না বরং প্রতিটি সেনা ইউনিটেরই একজন করে সেনাপতি থাকতেন। যে ব্যক্তিকে বড় বড় অভিযানে সেনাপতি করে পাঠানো হতো, তাঁকেই সাধারণত রাঈসুল 'আস্কার বা রাঈসুল আসাকির (সেনাবাহিনীর বা সেনাবাহিনীসমূহের প্রধান) নামে অভিহিত করা হতো।

মুহ্তাসিব

মুহ্তাসিবের কাজ হতো শহর পরিক্রমা করে লোকজনকে আইন ও শরীয়তের পরিপন্থী কার্যকলাপ থেকে বিরত রাখা বা বে-আইনী ও বে-শরা কাজের জন্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শাস্তি

---

১. বলাবাহুল্য, মূল পুস্তক রচনাকালে এ বক্তব্য প্রযোজ্য ছিল। বর্তমানে 'শায়খুল ইসলাম' পদও কোথাও আছে বলে জানা যায় না। — অনুবাদক

বিধান করা। মুহ্তাসিব কখনো কাযীউল কুযাতের, আবার কখনো সাহিবুশ শুরতার অধীন হতেন। আজকালকার পরিভাষায় একে মিউনিসিপ্যাল ইন্সপেক্টরও বলা যেতে পারে। ব্যবসায়ী, সওদাগর বা দোকানদারদের ওজন ও মাপ ঠিক কিনা তা দেখার বা এ ব্যাপারে তাদের ত্রুটির জন্যে তাদেরকে শাস্তি দেয়ার ক্ষমতাও তার হাতে থাকতো। প্রত্যেক শহর ও কসবায় পূর্ণ স্টাফসহ একজন মুহ্তাসিব নিযুক্ত থাকতেন।

নাযির

খলীফা সালতানাতের সকল বিভাগের দেখাশোনা বা তদারকির জন্যে একজন প্রধান নাযির নিযুক্ত করতেন যাঁর মর্যাদা ছিল একজন মন্ত্রীর সমপর্যায়ের। তাঁর অধীনে প্রত্যেকটি বিভাগের ভিন্ন ভিন্ন নাযির বা ইন্সপেক্টর নিযুক্ত থাকতেন। মুশরিফে আ'লা বা প্রধান নাযির প্রত্যেকটি বিভাগের প্রতিবেদন সংগ্রহ করার পর এর একটি জরুরী সারসংক্ষেপ খলীফার খিদমতে পেশ করতেন।

সাহিবুল বারীদ বা রাঈসুল বারীদ (ডাক বিভাগ প্রধান)

প্রত্যেক প্রদেশে ডাক বিভাগের দেখাশোনা ও পরিচালনার জন্যে খলীফার পক্ষ থেকে একজন সাহিবুল বারীদ অর্থাৎ পোস্টমাস্টার জেনারেল নিযুক্ত হতেন। তাঁর কাজ ছিল শাহী ডাক রওয়ানা করা ও কাসেদ বা পত্রবাহকদের জন্যে রাস্তার চৌকিসমূহে বাহনের ব্যবস্থাপনা করা। তারই অধীনে প্রত্যেক মঞ্জিলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ঘোড়া, খচ্চর বা উটের একটি বহর সদাপ্রস্তুত থাকতো। সাহিবুল বারীদের এটাও একটা কর্তব্য ছিল যে, তিনি তাঁর প্রদেশের গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় খবরাদি কেন্দ্রে পৌঁছাবেন। খলীফার দরবারে এসব খবর যথারীতি পৌঁছানো হতো। সাহিবুল বারীদের অধীনে গুপ্তচরদের একটি বাহিনীও থাকতো, যাদের মাধ্যমে প্রদেশের প্রজাসাধারণ ও শাসকদের এবং বিভিন্ন বিভাগের অবস্থাদি সম্পর্কে খলীফাকে অবহিত করা হতো।

সাহিবুল বারীদ প্রত্যেকটি শহরে তাঁর একজন নায়েব নিযুক্ত করতেন। এই বিভাগটি প্রজা-সাধারণের চিঠিপত্রাদি একস্থান থেকে অন্যস্থানে পৌঁছাবার দায়িত্বও পালন করতো। এই সাহিবুল বারীদের অধীনে বার্তাবাহী কবুতরের একটি ঝাঁকও থাকতো। সাহিবুল বারীদের কাছে এমন একটি রেজিস্টারও থাকতো যাতে প্রতিটি ডাকঘর ও চৌকির দূরত্ব, দিক ও সেখানকার কর্মচারীবৃন্দের তালিকা লিপিবদ্ধ থাকতো।

কাতিব

খলীফা এক ব্যক্তিকে তাঁর কাতিব বা মীর-মুন্শী (প্রধান সচিব) নিযুক্ত করতেন। তিনিও উযীরদের মধ্যে গণ্য হতেন। তাঁর কাজ ছিল খলীফাকে বাহির থেকে আগত পত্রাদি পড়ে শুনানো, ফরমানাদি লেখা, খলীফার নির্দেশ মুতাবিক হুকুম জারি করা ও রুত্বপূর্ণ দলীল-দস্তাবেজসমূহ সংরক্ষণ করা। তাঁরই অধীনে বিভিন্ন দফতর হতো। যেমন শাহী ফরমানের নকল সংরক্ষিত রাখার দফতর, রেজিস্ট্রি দফতর, দীওয়ানুল জুয়ূশ বা সামরিক বাহিনীর রেকর্ডের দফতর, দীওয়ানুন্ নাফাকাত বা বেতন-ভাতাদির রেকর্ডের দফতর ইত্যাদি।

আমীরুল মিনজানীক

এর কাজ ছিল সামরিক প্রকৌশলীর কাজ। সৈন্যবাহিনীর যে পল্টন সুড়ঙ্গ নির্মাণ ও খনন কাজে নিয়োজিত থাকে সে পল্টনও তাঁর অধীন হতো। রাস্তা নির্মাণ, যুদ্ধ ও শিবিরের স্থান নির্বাচন, শত্রুদের দুর্গ ধ্বংস করা, দুর্গ, কৃত্রিম দুর্গ ও পরিখা নির্মাণ তাঁর কাজ ছিল। দুর্গ অবরোধ করার সময় তাঁর পরামর্শ ও প্রস্তাব বিশেষ গুরুত্ব পেত।

আমীরুত তা'মীর বা রাঈসুল বিন্না

তিনি হতেন প্রধান প্রকৌশলী। শাহী প্রাসাদাদি নির্মাণ ও মেরামত করা, শহর নির্মাণ,লেক নির্মাণ, পুল নির্মাণ, বাঁধ নির্মাণ প্রভৃতি ছিল তাঁর কাজ।

আমীরুল বাহ্‌র

নৌবাহিনীর জাহাজ এবং নৌবাহিনীর প্রধানকে আমীরুল বাহ্‌র বলা হতো। তাঁর অধীনে অনেক 'কায়েদ' থাকতেন। প্রত্যেক কায়েদের অধীনে একটি যুদ্ধ জাহাজ থাকতো। কায়েদকে কাপ্তান বলা যেতে পারে।

তাবীব

একাধিক অভিজ্ঞ ও দক্ষ চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ রাজধানীতে মওজুদ থাকতেন এবং তাঁরা রীতিমত খলীফার দরবারে উপস্থিত থাকতেন। ইল্‌মী মজলিস বা একাডেমিক আলোচনাসমূহে তাঁরা অবশ্যই উপস্থিত থাকতেন। তাঁদের তত্ত্বাবধানে হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহ সরকারী ব্যয়ে পরিচালিত হতো। প্রত্যেক রাজ্য ও ধর্মের চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ তাতে শামিল থাকতেন। এঁদের অধিকাংশই ছিলেন দারুত-তাসানীফ্, দারুত তরজমা ও বায়তুল হিকমার গৌরব বর্ধনকারী যুগবিখ্যাত লেখক, অনুবাদক ও গবেষক।

রাষ্ট্রের উল্লেখযোগ্য দফতরসমূহ

খলীফাকে যদিও নিরংকুশ ও একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী বলেই মনে করা হতো, এতদসত্ত্বেও শাসন পরিচালনার ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বিহীন ক্ষমতার অধিকারী ও পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন না। খলীফার মসনদে আরোহণের সময় যখন তাঁর হাতে বায়আত করা হতো, তখন কুরআন-সুন্নাহর শর্ত তাঁর জন্যে অবশ্যই যুক্ত থাকতো। বিদ্বানমণ্ডলী ও শাস্ত্রজ্ঞগণ খলীফার শরীয়তের পরিপন্থী কার্যকলাপের সমালোচনার এবং এ ব্যাপারে তাঁকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা সংরক্ষণ করতেন। তাঁদের এ অধিকার প্রয়োগে খলীফার পক্ষ থেকে বাধা-বিপত্তির সৃষ্টি হলে জনসাধারণ সে বাধার মুকাবিলায় ধর্মীয় নেতাদের সমর্থনে দাঁড়াতো, এমনকি এ জন্যে খলীফাকে পদচ্যুত করতে পর্যন্ত তাঁরা উদ্যত হতো এবং কালবিলম্ব না করে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তো। কখনো কখনো ধর্মীয় নেতাদের এ দায়িত্ব পালনে শৈথিল্যও দেখা যেত। নানা অনাচারের উদ্ভব হতো এবং খিলাফত ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়তো। খলীফার যে ব্যক্তিত্ব ও প্রভাব ছিল, তার উপর নির্ভর করে খলীফা কখনো কখনো পরামর্শ ব্যতিরেকেও নির্দেশাদি জারি করতেন এবং তা বাস্তবায়নও করতে পারতেন। কিন্তু সাধারণত গণস্বার্থ বিষয়ক ব্যাপারাদি নির্ধারিত আইনের ছকেই নিষ্পন্ন হতো এবং সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রযন্ত্র অত্যন্ত

নিয়মতান্ত্রিক ভাবেই চলতো। এ কারণেই রাজরাজড়াদের গৃহযুদ্ধাদি এবং আমীর-উমারাদের মতানৈক্য ও রেষারেষি সত্ত্বেও আব্বাসীয় খিলাফত আমলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতি এবং নাগরিকদের সভ্যতা-ভব্যতার শিক্ষা কখনো ব্যাহত হয়নি। আব্বাসী খিলাফতের সূচনার যুগেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল। তারপর আব্বাসীয় আমলের দিনগুলোতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার উন্নতিতে বা আবিষ্কারের গতিতে একটুও ছেদ পড়েনি। কারণ, রাষ্ট্রব্যবস্থা ইসলামী মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এ জন্যে রাষ্ট্র দুর্বল এবং যুদ্ধবিগ্রহ ও অনৈক্য প্রবল হওয়া সত্ত্বেও তা লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়নি বরং বিশৃঙ্খলার যুগেও তার প্রাণশক্তি বর্তমান ছিল এবং ইল্‌মী, সামাজিক ও নৈতিক অগ্রগতির পথে তেমন কোন বিপত্তির সৃষ্টি হয়নি। সামানী, সাফারী ও সালজুকীদের রাজত্ব তেমন একটা দীর্ঘস্থায়ী বা টিকসই ছিল না, কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাঁদের যুগে এবং তাঁদের আয়ত্তাধীন রাজ্যসমূহে বড় বড় জাঁদরেল আলিম এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখার যুগখ্যাত পণ্ডিতমণ্ডলী ও বিদ্বজ্জনের জন্ম হয়েছে এবং তাঁরা তাঁদের অমর কীর্তিসমূহ রেখে যেতে সমর্থ হয়েছেন।

দীওয়ানুল আযীয

দরবারে খিলাফত বা খলীফার সচিবালয়ের নাম ছিল দীওয়ানুল আযীয। যে সব উযীর রাষ্ট্রীয় সমস্ত ব্যাপারে পূর্ণ কর্তৃত্বের অধিকারী হতেন এবং যারা রাষ্ট্রীয় শক্তির চাবিকাঠি বলে বিবেচিত হতেন, তাঁদের দফতর বা সচিবালয়সমূহকে দীওয়ানুল আযীয বলে অভিহিত করা হতো। রাষ্ট্রের সমস্ত দফতর ও বিভাগ এ দফতরের অধীন হতো। উযীরে আযমকে সংশ্লিষ্ট দফতরের আমলাদের সাথে সলা-পরামর্শ করে বিধি-নিষেধ জারি করতে হতো।

দীওয়ানুল খারাজ

একে অর্থ দফতর মনে করা যেতে পারে। কখনো এ দফতরটি উযীরে আযম বা প্রধানমন্ত্রীর হাতেই থাকতো, আবার কখনো এ জন্যে ভিন্ন স্বতন্ত্র একজন মন্ত্রী নিযুক্ত হতেন— যিনি প্রধানমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে থাকতেন। কখনো কখনো খলীফা অর্থমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব উযীরের হাতে না রেখে কাতিবের মাধ্যমে নিজেই এ বিভাগের তত্ত্বাবধান করতেন। অর্থমন্ত্রী বা দীওয়ানুল খারাজের দায়িত্বে নিযুক্ত মন্ত্রী কখনো কখনো প্রদেশসমূহে তার নায়েব নিযুক্ত করতেন এবং তাঁর এ নায়েবরা প্রাদেশিক গভর্নরের কর্তৃত্বের বাইরে থাকতেন। সাধারণত অর্থমন্ত্রী প্রদেশের গভর্নরদের তত্ত্বাবধানে প্রাদেশিক অর্থ দফতরের দায়িত্ব রেখে দিয়ে তাঁকেই এই ব্যাপারের দায়িত্বশীল ও জবাবদিহিকারী কর্তৃপক্ষরূপে গণ্য করতেন।

দীওয়ানুল জিয্‌য়া বা দীওয়ানুয্‌ যিমান

এ দফতরে জিয্‌য়া এবং যিম্মী তথা অমুসলিম প্রজাদের সংক্রান্ত দলীল-দস্তাবেজ থাকতো। জিয্‌য়া উসুল, জিয্‌য়ার পরিমাণ নির্ধারণ, জিয্‌য়া মওকুফ প্রভৃতি ব্যাপার এ দফতরের অধীন হতো। এ দফতরের প্রধান অর্থমন্ত্রীর অধীনস্থ বলে গণ্য হতেন। তবে কাযীউল কুযাতের নির্দেশাদিও তাঁকে মেনে চলতে হতো। কাযীউল কুযাতের নির্দেশাদি

সাধারণত জিয়য়ার পরিমাণ হ্রাস বা তা মওকুফ করার ব্যাপারেই হতো। যেমন তাঁর নির্দেশ হতো, অমুক প্রদেশের অমুক অমুক ব্যক্তির নিকট থেকে জিয়য়া উসুল করা হবে না, ইত্যাদি।

দীওয়ানুল আস্‌কার

এ দফতরে ফৌজী রেজিস্টার থাকতো। এ দফতর উযীরে আযম বা খলীফার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে থাকতো। সৈন্যবাহিনীর লোকদের বেতন-ভাতাও এ দফতরের মাধ্যমে প্রদত্ত হতো। প্রধান সেনাপতিও এ বিভাগের প্রধান বলে গণ্য হতেন। কিন্তু তাঁর এ বিভাগে শুধু এতটুকুই কাজ ছিল যে, তাঁর উপস্থিতিতে সৈন্যদের বেতন-ভাতাদি দেয়া হতো। ভারবাহী পশু ইত্যাদি ক্রয়, অস্ত্র সঞ্চয়, ফৌজী পোশাকাদি তৈরি প্রভৃতি বিভাগও এ দফতরের অধীনে ছিল।

দীওয়ানুশ শুরতা

পুলিশ বিভাগের দফতরসমূহ এবং তার ব্যবস্থাপনা একজন স্বতন্ত্র কর্মকর্তার অধীনে ন্যস্ত থাকতো। মুহতাসিব প্রভৃতি পদও এ বিভাগেরই অধীন ছিল। পুলিশ বিভাগের সিপাইদের বেতন-ভাতা সাধারণত সামরিক বাহিনীর সিপাইদের চাইতে বেশি হতো এবং এদের নিয়োগের ব্যাপারে যাচাই-বাছাইও হতো বেশি।

দীওয়ানুদ্ দিয়া'

ইরাক প্রদেশে অবস্থিত খলীফার জায়গীর বলে গণ্য এলাকাসমূহের এবং খলীফার নিজস্ব জমিজমার উৎপাদন বৃদ্ধি এবং এগুলোকে শস্যশ্যামল রাখার উদ্দেশ্যে এ দফতরটি নিয়োজিত ছিল।

দীওয়ানুল বারীদ

এ দফতরের সদর দফতর ছিল বাগদাদে।এ দফতরে রাজ্যসমূহের মানচিত্র, ডাকঘরসমূহের তালিকা এবং প্রতিটি মঞ্জিল ও রাস্তা সম্পর্কে দিকনির্দেশ, কর্মচারীদের জন্যে নির্দেশনা, চাকরিজীবী ও কর্মকর্তাদের খিদমত সম্পর্কে প্রতিবেদন এবং রাস্তার নিরাপত্তা সংক্রান্ত জ্ঞাতব্য বিষয় প্রভৃতি সংরক্ষিত থাকতো।

দীওয়ানুল নাফ্‌কাত

শাহী মহলের খরচপত্র, পারিতোষিক, ভাতা ও দান-দক্ষিণার রেজিস্টার এ দফতরের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল।

দীওয়ানুত-তাওকী'

দফতরে খলীফার স্বাক্ষর বা সীলমোহরে যে সব নির্দেশাদি জারি হতো তা সংরক্ষিত থাকতো। এ বিভাগও কাতিবের তত্ত্বাবধানে থাকতো। একে রেজিস্ট্রার বিভাগও বলা যেতে পারে।

দীওয়ানুন্ নযর ফিল-মাযালিম

এ দফতরটি মুশরিফে-আলার অধীনে থাকতো। শাহী মহলের কর্মকর্তাদের কার্যকলাপের নিরিখ নেয়া, রেজিস্টারসমূহের গরমিল ধরা এবং বিভিন্ন দফতর পরিদর্শন ছিল এ দফতরের কাজ। এ দফতর কর্মকর্তাদেরকে দুর্নীতি থেকে বিরত রাখতো।

দীওয়ানুল আনহার

খাল মেরামত ও সংরক্ষণ করা এবং সেচ ব্যবস্থার উন্নতি বিধান ও সম্প্রসারণ এ দফতরের কাজ। নতুন খাল খননের ব্যাপারে কৃষি-খামারের মালিকরা ছাড়াও আমীর-উমারা এবং সমাজসেবীদের স্বাধীনতা ছিল। কৃষক বা কোন এলাকার অধিবাসীরা যদি নতুন খাল খনন করতে চাইত তাহলে তার অর্ধেক খরচ সরকার বহন করতো। পানি বণ্টনের ব্যাপারে বিভিন্ন গ্রামের লোকদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে এ দফতরের লোকজন গিয়ে সে বিরোধের নিষ্পত্তি করে দিতেন। নতুবা সাধারণভাবে এ সব ব্যাপারে কোনরূপ সরকারী হস্তক্ষেপ করা হতো না। কৃষকরা নিজেরাই আপোসে তাদের বিরোধ নিষ্পত্তি করে নিত। নতুন খাল খননে সরকারের শুধু এতটুকু সুবিধা হতো যে, সরকারী রাজস্ব আদায় অনেকটা সহজ হয়ে যেত। কেননা, তাতে কৃষকদের উৎপাদন ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পেত। ফলে রাজস্ব প্রদানে কেউ দ্বিধা বা গড়িমসি করতো না।

দীওয়ানুর রাসায়েল

এ দফতরের কর্মচারী কর্তকর্তাদের কাজ ছিল সন্ধিপত্রাদির মুসাবিদা করা, শাহী ফরমানসমূহের বক্তব্য লিখে মোহরাঙ্কিত করা এবং লেফাফায় তা বন্ধ করে পুনরায় সীলমোহর এঁটে দেয়া, গুরুত্বপূর্ণ ফায়সালাসমূহের নকল রাখা এবং জনগণের জ্ঞাতব্য বিষয়াদির নকল তৈরি করে বিভিন্ন প্রদেশে ও শহরে প্রেরণ, জনসাধারণের নিকট থেকে আবেদনপত্র নিয়ে সংশ্লিষ্ট দফতরে তা প্রেরণ করা এবং যে দফতরের জন্যে যে ফরম সমীচীন হবে তা তৈরি করা, এসব ছিল এই দফতরের কাজ।

দারুল 'আদল

এ দফতরে সর্বস্তরের আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করা যেত। দারুল 'আদলে বাগদাদের কাযী অর্থাৎ রাষ্ট্রের কাযীউল কুযাত বা প্রধান বিচারপতি, উযীরবর্গ ও ফকীহ্, আলিমগণ একত্রিত হয়ে সমবেতভাবে গুরুত্বপূর্ণ মোকদ্দমাসমূহের শুনানি গ্রহণ করতেন। দারুল 'আদলে খলীফা সভাপতিরূপে শরীক হতেন আর যদি বিচার্য ব্যাপারের সাথে খলীফার নিজের কোন সংশ্লিষ্টতা থাকতো তা'হলে ঐ বিশেষ সেশনের সভাপতির দায়িত্ব উযীরে আযম বা কাযীউল কুযাতের উপর বর্তাতো। কোন প্রাদেশিক গভর্নরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অভিযোগ আনা হলে বা কোন সিপাহ্সালারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনীত হলে অভিযুক্ত গভর্নর বা সিপাহ্সালারকে আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে নিজ সাফাই পেশ করার সুযোগ দেয়া হতো। এই আদালতে কেবল এমন ব্যক্তিরাই সাক্ষ্য হিসাবে উপস্থিত হওয়ার অধিকার পেতেন যাদের সচ্চরিত্র হওয়ার লিখিত সনদ থাকতো এবং সে সনদে কাযী বা মুহতাসিবের স্বাক্ষর থাকতো। বড় বড় পদস্থ ব্যক্তিও এ আদালতে সাক্ষী দানকালে কম্পমান থাকতেন। কেননা, যে কোন সময় তাঁদের সচ্চরিত্রতার সনদ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হওয়ার এবং ফলশ্রুতিতে সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হওয়ার আশঙ্কা বিদ্যমান থাকতো।

দারুল কাযা

কাযী হতেন পদমর্যাদা নির্বিশেষে শহরের সকল শ্রেণীর লোকের জজ, ম্যাজিস্ট্রেট ও মুন্সেফ। যদি ঐ শহরের আমিল বা গভর্নরের বিরুদ্ধেও কেউ মামলা দায়ের করতো, তাহলে

সেই গভর্নরকেও একজন সাধারণ আসামীর বেশে কাযীর কাঠগড়ায় গিয়ে হাযির হতে এবং তার সপক্ষে সাক্ষী উপস্থিত করতে হতো। অমুসলিম নাগরিকদের জন্যে তাদের স্বধর্ম ও স্ব-সম্প্রদায়ের মুন্সেফের কোর্টের ব্যবস্থা থাকতো– যেখানে তাদের মোকদ্দমাসমূহের শুনানি ও রায় হতো। ঐ অমুসলিম মুন্সেফদের আদালতেই অমুসলিমদের সমুদয় দীওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার নিষ্পত্তি হতো। কিন্তু যদি মামলার একপক্ষ অমুসলিম হতো, তাহলে উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে যে কোর্টে ইচ্ছে মামলা দায়ের করতে পারতো। তবে এরূপ মামলার আপীল কাযীর আদালতে হতে পারতো। সাধারণত অমুসলিমরাও তাদের মামলা কাযীর আদালতেই দায়ের করতো এবং সেখান থেকেই মামলার রায় নিতে আগ্রহী থাকতো। তাতে তাদের কোনরূপ আপত্তি বা দ্বিধা থাকতো না।

রাষ্ট্রের সাধারণ অবস্থা

রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে প্রজাসাধারণের জীবনযাত্রা এবং তাদের পারস্পরিক ব্যাপারসমূহে কখনো হস্তক্ষেপ করা হতো না। শহর-বন্দর বা পল্লীগ্রামের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারসমূহ সাধারণত তাদের নিজেদের আয়ত্তাধীনে থাকতো। তারা নিজেরাই নিজেদের মধ্যে আপোস-নিষ্পত্তি এবং আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করতো। যদি তারা কোন আমিলের (গভর্নর বা শাসকের) প্রতি অসন্তুষ্ট হতো তা হলে খলীফার দরবারে তাঁকে বদলী করার দরখাস্ত করতো এবং সাধারণত খলীফা এ জাতীয় আবেদনে সাড়াও দিতেন। সাধারণত কোন এলাকাবাসীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের ওপর কোন আমিল বা গভর্নরকে চাপিয়ে দেয়া হতো না। প্রত্যেক শহরবাসীর নিজেরাই একটি সৈন্যবাহিনীর ক্ষমতার অধিকারী থাকতো। কোন কোন সময় এমনও হয়েছে যে, কোন শহরের গভর্নরকে কোন বাহিনী অবরোধ করে বসেছে। তিনি হয়তো সরকারী বাহিনীর দ্বারা তাদেরকে প্রতিহত করতে চাইলেন। কিন্তু শহরবাসীদের মধ্যে এবং প্রতিহতকারী সরকারী বাহিনীর মধ্যে সন্ধি হয়ে গেল। এমতাবস্থায় গভর্নরকে বাধ্য হয়ে উক্ত শহর ত্যাগ করতে হতো।

নাগরিকদের অধিকার নষ্ট করার সাধারণত শাসনকর্তাদের সাহস হতো না। যে কোন সাধারণ নাগরিক যে কোন বড় শক্তিধর শাসক এমন কি খলীফার দরবারে পর্যন্ত অবাধে পৌঁছে যেতে পারতো এবং তার ইচ্ছে মতো স্বাধীনভাবে বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারতো। খলীফারা সাধারণত নিজেদেরকে জনপ্রিয় এবং প্রজাহিতৈষীরূপে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করতেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকতার ব্যাপারে সাধারণভাবে আব্বাসীয় খলীফারা অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন।

পর্যটন সুবিধা

আব্বাসীয় খলীফাগণ ইরাক, হিজায, পারস্য, খুরাসান, মুসেল, সিরিয়া প্রভৃতি প্রদেশে পথঘাটের নিরাপত্তা ও পথিকদের যাতায়াতের সুযোগ-সুবিধার উত্তম ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। সামরিক প্রহরা সর্বত্র বিদ্যমান ছিল। সামান্য সামান্য ব্যবধানে চৌকির ব্যবস্থা ছিল। প্রত্যেক মঞ্জিলেই শাহী ঘোড়া, উট ও অন্যান্য বাহন মওজুদ থাকতো। প্রত্যেক মঞ্জিলেই যাত্রীদের থাকা-খাওয়া ও বিশ্রামের উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকতো। ডাক বিভাগের অধীনে রক্ষিত বাহনগুলো ভাড়া দিয়ে অন্য যাত্রীরাও ব্যবহার করতে পারতো। কখনও কোথাও কোন

বিদ্রোহী বাহিনী বা ডাকাতদলের প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ায় রাস্তায় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে ব্যবসায়ী কাফেলার নিরাপত্তার জন্যে সাথী ফৌজও সাথে দেয়া হতো। হাজীদের কাফেলায় যাকে আমীরুল হজ্জ নিযুক্ত করা হতো, তার অধীনে হাজীদের নিরাপত্তা বিধানের জন্যে একদল সৈন্যও দিয়ে রাখা হতো।

ব্যবসায়-বাণিজ্যের সুবিধা

প্রত্যেকটি শহরে একটি ব্যবসায়ী সমিতি (চেম্বার অব কমার্স) থাকতো– যাতে কোন সরকারী প্রতিনিধি থাকার বাধ্যবাধকতা ছিল না। ব্যবসায়ীরা নিজেরাই ব্যবসায়পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করতো। ব্যবসায় পণ্যের উপর কর থাকতো নামে মাত্র, ফলে এ ব্যাপারে কোন সময় ব্যবসায়ীদের কোনরূপ অনুযোগ থাকতো না। ব্যবসায়ীরা শাহী আমলাদের চাইতে অধিকতর সম্মানিত বিবেচিত হতেন। ব্যবসায়ীরা শাহী দরবারে উপনীত হওয়ার সুবিধাদি পেতেন। যে সব বণিক বাহির থেকে ব্যবসায়পণ্যাদি নিয়ে এসে বিক্রি করতেন, সাধারণত শহরের শাসকরা তাদেরকে এমনভাবে আদর-আপ্যায়ন করতেন যেন বাহির থেকে পণ্যাদি সরবরাহ করে বণিক তাঁর একটা বড় উপকার করে দিয়েছেন। বণিকের ব্যবসায়পণ্যাদি ঘটনাচক্রে বিক্রি না হলে শাসক, সুলতান বা খলীফা বিনা প্রয়োজনেও তা কিনে নিতেন। তবুও বহিরাগত বণিককে অপ্রসন্নভাবে ফেরত যেতে দিতে চাইতেন না। যে আমিল বা শাসকের শাসনাধীন এলাকায় কোন বণিকের কাফেলা লুণ্ঠিত হতো তিনি একান্তই অযোগ্য ও দায়িত্বজ্ঞানহীন শাসক বলে বিবেচিত হতেন। শহরের আমীরগণ ব্যবসায়ীদেরকে তাঁদের ওখানে নিমন্ত্রণ করে অত্যন্ত সম্মানিত মেহমানরূপে তাদের আদর আপ্যায়ন করতেন। কোন ব্যবসায়ী বহির্দেশ থেকে ঘুরে আসলে স্বয়ং খলীফা তাঁকে খলীফার প্রাসাদে নিমন্ত্রণ করে তাঁর সফর কাহিনী অত্যন্ত আগ্রহের সাথে শ্রবণ করতেন এবং নানাভাবে তাকে সম্মানিত করতেন। খলীফাদের এরূপ আচরণের ফলে ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। এ জন্যেই আব্বাসীয় খলীফাদের আমলে সর্বপ্রকার শিল্পের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয় এবং প্রতিটি শহরই কোন না কোন শিল্পের জন্যে বিখ্যাত হয়ে ওঠে। এভাবে এক স্থানের উৎপন্ন দ্রব্যাদি অন্যত্র যেতে থাকে। আরববাসীরা তো প্রাচীনকাল থেকেই ছিল বণিকের জাত। কিন্তু আব্বাসীয় খিলাফত আমলে ইরানীরা ব্যবসায়র ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে ওঠে। তাদের সে উৎসাহ এতই বৃদ্ধি পায় যে, মুসলিম বণিকরা উত্তরে উত্তর সাগরের উপকূল পর্যন্ত এবং দক্ষিণে আফ্রিকার দক্ষিণ উপকূল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। যার প্রমাণস্বরূপ প্রত্নতাত্ত্বিকরা সুইডেন ও মাদাগাস্কারে বাগদাদের শিল্পসামগ্রী খুঁজে পান। ওয়াছিক বিল্লাহ্‌র মতো কোন কোন খলীফা বহিরাগত সওদাগরদের উপর তাদের আনীত পণ্যদ্রব্যাদির শুল্ক মওকুফ করে দেন।

সরকারী রাজস্ব

কৃষিপণ্যাদির শুল্ক অর্থমূল্যে আদায় করার পরিবর্তে শুল্কের ভাগ নির্ধারিত ছিল যে, কোন উৎপন্ন দ্রব্যের কতভাগ কর স্বরূপ দিতে হবে। উৎপন্ন দ্রব্যাদির দুই-পঞ্চমাংশ সরকারী রাজস্বরূপে আদায় করা হতো এবং তিন-পঞ্চমাংশ কৃষকের থাকতো। যেখানে কৃষককে নিজ ব্যবস্থাপনায় সেচকাজ করতে হতো সেখানে কৃষককে তিন-চতুর্থাংশই ছেড়ে দেয়া হতো এবং সরকারী রাজস্বরূপে কেবল এক-চতুর্থাংশ আদায় করা হতো। কোন কোন জমির কেবল এক-

পঞ্চমাংশ রাজস্বরূপে নিয়ে চার-পঞ্চমাংশই কৃষকের জন্যে ছেড়ে দেয়া হতো। আঙ্গুর ও খেজুর বাগানসমূহের রাজস্ব এ হারে আদায় করা হতো। বাহরায়ন, ইরাক, জাযিরা প্রভৃতি স্থানে এমনও অনেক কৃষক ছিল– যাদের জমির নির্ধারিত রাজস্ব-হার চুক্তি অনুসারে খিলাফতে রাশিদার যুগ থেকেই চলে আসছিল। সেগুলো ছিল অনেকটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, কৃষকদের উপর তার অতিরিক্ত রাজস্ব-হার ধরা যেত না। রাজস্ব নির্ধারণের সময় অনেক ক্ষেত্রেই রাজস্ব আদৌ ধরা হতো না। আবার সামান্য সামান্য অজুহাতেও অনেক জমির রাজস্ব মওকুফ করে দেয়া হতো। রাষ্ট্র সবসময় কৃষকদেরকে সুখী-সমৃদ্ধ রাখার দিকে যত্নবান থাকতো। যাতে এলাকার ফসল উৎপাদনের আগ্রহ লোক হারিয়ে না বসে এবং তার শ্যামল প্রান্তরসমূহ অনাবাদী হয়ে না পড়ে। রাজ্যের বিশাল এলাকার ভূমি রাজস্ব ছিল কেবল এক-দশমাংশ। যিম্মীদের নিকট থেকে—যাদেরকে সামরিক বাহিনীতে কোন দায়িত্ব পালন করতে হতো না তাদের জানমালের হিফাযত বাবদ নামে মাত্র ট্যাক্স নেয়া হতো আর যারা স্বেচ্ছায় সামরিক বাহিনীতে ভর্তি হতে এগিয়ে আসতো, তাদের উপর থেকে জিয্‌য়া কর নেয়া হতো না। কিন্তু মুসলমান নাগরিকদের জন্যে সামরিক দায়িত্ব পালন ছিল বাধ্যতামূলক। যিম্মীদের অর্থাৎ অমুসলিম নাগরিকদের মধ্যেও বৃদ্ধ, অপ্রাপ্ত বয়স্ক এবং নিঃস্বদের নিকট থেকে কোনরূপ কর নেয়া হতো না। তাদের কর মওকুফ করে দেয়া হতো। মুসলমানদের নিকট থেকে 'সাদাকাত' খাতে একটি ট্যাক্স নেয়া হতো। বিত্তবান মুসলমানদের নিকট থেকে যাকাত নামেও কর আদায় করা হতো। একে ইনকামট্যাক্স বা আয়কর বলে ধরা যেতে পারে।

সরকারের ব্যয়ের খাতসমূহ

রোমক সীমান্তে যে সব সৈন্য স্থায়িভাবে সীমান্তচৌকিসমূহে নিযুক্ত থাকতো, অন্য সৈন্যদের তুলনায় তাদের বেতন-ভাতা বেশি ছিল। এরূপ একজন সৈন্য সাধারণত পনের থেকে ত্রিশ টাকা বেতন পেত। একদল সৈন্য সর্বদা রাজধানীতে নিযুক্ত থাকতো। সামরিক বাহিনীর একটি অংশ রাস্তাঘাটের প্রহরায় নিযুক্ত থাকতো। তাদের দায়িত্ব হাজার হাজার চৌকি বা ফাঁড়িতে বিভক্ত করা থাকতো। বড় বড় শহর এবং কেন্দ্রীয় স্থানসমূহেও এক বিপুলসংখ্যক সৈন্য সর্বদা মোতায়েন থাকতো। শহরসমূহের হিফাযতের উদ্দেশ্যে ইন্সপেক্টরের অধীনে এবং সাহিবুশ শুরতার তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত পুলিশরাও সরকারী তহবিল থেকে বেতন-ভাতা পেত। রাজস্বের একটি বিরাট অংশ সামরিক বাহিনীর খাতে ব্যয়িত হতো। ডাক বিভাগের জন্যে নিয়োজিত সৈন্য, সওয়ারীর পশু এবং ওগুলোর দায়িত্বে নিযুক্ত সরকারী কর্মচারীরা এবং ডাক খরচও তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। রোমকদের সাথে লড়াইর উদ্দেশ্যে যে সব স্বেচ্ছাসেবী ভর্তি হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসতো, তাদের আহার্য, বাহন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিও সরকারীভাবে সরবরাহ করা হতো। তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের পরিবারবর্গকে নগদ অর্থ বা খাদ্যদ্রব্যাদি সরকারীভাবে সরবরাহ করা হতো। যুদ্ধাবস্থায় সৈন্যবাহিনীর যাবতীয় আহার্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরকারকেই দিতে হতো। রোমানদের সাথে প্রায় সর্বদাই যুদ্ধ অব্যাহত ছিল। এ জন্যে খলীফাদেরকে সীমান্তবর্তী এলাকায় অনেক শহর ও দুর্গ নির্মাণ করতে হয়। প্রাদেশিক সরকার প্রদেশের সৈন্যদের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করতো। কিন্তু রোম সীমান্ত বাগদাদ ও ইরাক, ডাক বিভাগ, পথঘাটে প্রহরারত বাহিনী এবং খলীফার ব্যক্তিগত

প্রহরায় নিযুক্ত বাহিনী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের যাবতীয় ব্যয় খলীফার কেন্দ্রীয় তহবিল থেকেই নির্বাহ করা হতো। প্রত্যেক নতুন সিংহাসনারোহী খলীফা সৈন্যবাহিনীকে আনুষ্ঠানিকভাবে ইনাম দিতেন।

বড় বড় কীর্তিমান পুরুষদেরকে জায়গীরও প্রদান করা হতো। তাঁদের জন্যে বেতন-ভাতাদিও নির্ধারিত থাকতো। শহর-নগর ও কেল্লা নির্মাণ ছাড়াও মাদ্রাসা, সরাইখানা, পুল, খাল, কুয়ো, মসজিদ প্রভৃতিও অহরহ নির্মিত হতে থাকতো। শিল্পী, আবিষ্কারক ও কারিগরদেরকে বড় অংকের ইনাম ও বেতন-ভাতা দেয়া হতো। ফলে তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধি পেত। হাকীম, চিকিৎসক, কবি, সাহিত্যিক এবং শাস্ত্রবিদদেরকে অকুণ্ঠে ইনাম ও সম্মান দেয়া হতো। কোন কোন খ্রিস্টান ও ইহুদী চিকিৎসক বাগদাদে এতই বিত্তবৈভব ও প্রাচুর্যের অধিকারী হয়ে পড়েছিল যে, একমাত্র খলীফা ছাড়া আর কারোরই এত বিত্তবৈভব ছিল না। বাগদাদে অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। এগুলোর রাজসিক ব্যয় নির্বাহ করা হতো। অনুরূপভাবে অন্যান্য শহরেও উচ্চমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানাদি প্রতিষ্ঠিত ছিল। অস্ত্র নির্মাণ, বর্ম নির্মাণ, মিস্ত্রী তৈরীকরণ, ঔষধ তৈরী ও আতর তৈরির কারখানাসমূহ বড় বড় শহরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এগুলোকে উৎসাহ প্রদান করা হতো। রেশমী ও পশমী কাপড় নির্মাণের কারখানাদি এবং স্ফটিক ও কাচ জাতীয় তৈজস শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি স্বয়ং খলীফাদের মনোযোগের দরুন সম্ভবপর হয়।

খলীফার তোষাখানায় হাজার হাজার খিলাত, শাল-আলোয়ান, মনোহর কারুকার্য খচিত চাদর, বহুমূল্য তলোয়ার, বর্শা, ঢাল, ধনুক, প্রভৃতি কেবল এ জন্যে মওজুদ রাখতে হতো যাতে এগুলো ইনাম ও সম্মানের প্রতীকরূপে বড় বড় বীরপুরুষ, জ্ঞানীগুণী, শিল্পী ও আবিষ্কারকদেরকে প্রদান করা যায়। বিদেশ থেকে বহিরাগত সওদাগররা যে সব মূল্যবান পণ্যাদি নিয়ে আসতো, খলীফা তা উচ্চমূল্যে ক্রয় করে তোষাখানায় সংরক্ষণ করতেন। এগুলো পরে ইনামরূপে প্রদত্ত হতো।

সামরিক ব্যবস্থাপনা

সামরিক বাহিনীর সামগ্রিক সংখ্যা সময় সময় হ্রাসবৃদ্ধি করা হতো। অনেক ব্যাটালিয়ন থাকতো। প্রতি ব্যাটালিয়নে প্রায় দশ হাজার করে সৈন্য থাকতো। ব্যাটালিয়ন প্রধানকে আমীরুল জায়শ বলা হতো। আমীরুল জায়শের অধীনে দশজন করে সর্দার থাকতো। প্রত্যেক সর্দারের অধীনে এক হাজার করে সৈন্য থাকতো। এই সর্দারদেরকে বলা হতো কায়েদ। আবার প্রত্যেক কায়েদের অধীনে দশজন করে নকীব থাকতেন। এক একজন নকীব একশ করে সৈন্যের সেনাপতিরূপে থাকতেন। প্রত্যেক নকীবের অধীনে দশজন করে আরিফ থাকতেন। একজন হতেন দশজন সৈন্যের অফিসার বা হাবিলদার স্বরূপ। ফৌজের ইউনিফর্মে খলীফারা অনেক সময় নিজ নিজ অভিরুচি অনুযায়ী পরিবর্তনও ঘটাতেন। উদাহরণস্বরূপ মু'তাসিম তুর্কী সৈন্যদের ইউনিফর্মে লেইস লাগানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রত্যেক ব্যাটালিয়নের সাথে একটি ইউনিট থাকতো পরিমাপকরূপে। একটি ইউনিট থাকতো খননকারীরূপে। এদের কাছে শাবল, গাঁইতি ও কুঠারাদি থাকতো। অনেক ক্ষেত্রে সামরিক বাহিনীর ইউনিফর্ম হতো মূল্যবান কিংখাব বস্ত্রে নির্মিত। বাহনরূপে প্রচুর পরিমাণে উট ও

খচ্চর থাকতো। পদাতিক সৈন্যদের সাথে বল্লম, তলোয়ার ও ঢাল থাকতো। এদেরকে হারাবিয়া বাহিনী বলা হতো। যে পদাতিক বাহিনীর সাথে তরবারি ও বর্ম ছাড়াও তীর-ধনুকও থাকতো তাদেরকে বলা হতো রামিয়া বা নিক্ষেপক বাহিনী। প্রত্যেকটি সৈন্যের মস্তকে শিরস্ত্রাণ, দেহে মখমলমণ্ডিত চারটি লোহার পাত সম্বলিত বর্ম, হাতে লৌহনির্মিত বাজুবন্ধ ও দস্তানা এবং পায়ে মোজা থাকতো। প্রতিটি ব্যাটালিয়নের সাথে প্রকৌশলীদের একটি সঙ্গত সংখ্যক বাহিনীও মওজুদ থাকতো। কয়েকজন চিকিৎসক এবং সার্জনও অবশ্যই সাথে থাকতেন। একটি ঔষধ ভাণ্ডার এবং ঔষধ নির্মাণের যাবতীয় সরঞ্জামও অর্থাৎ ভ্রাম্যমাণ হাসপাতাল এবং আহতদেরকে বহনের জন্যে প্রয়োজনীয় বাহন, পাল্কী প্রভৃতি সাথে থাকতো। প্রত্যেক ব্যাটালিয়নের সাথে একটি অশ্বারোহী বাহিনীও থাকতো এবং এসব অশ্বারোহী হতো উঁচুমানের বল্লম নিক্ষেপকারী ও তীরন্দাজ।

খিলাফতের মধ্যে যখন দুর্বলতা দেখা দিল অর্থাৎ খলীফাগণ দুর্বল হয়ে পড়েন এবং বুওয়াইয়ারা প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী হয়ে পড়ে তখন ফৌজী সর্দারদেরকে জায়গীরদানের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তারা সংশ্লিষ্ট ভূ-ভাগের সরকারী রাজস্ব তাদের বেতন-ভাতা বাবদ নিজেরাই নিয়ে নিতো। এ ব্যবস্থায় কৃষকদের উপর নির্যাতন শুরু হয়। তুর্কী অর্থাৎ সালজুকরা যখন খিলাফতের উপর প্রভাব বিস্তার করে তখন তাঁরা তাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে সমস্ত মুসলিম রাজ্যে এ নিয়ম চালু করে যে, প্রত্যেক আমিল বা ওয়ালী (গভর্নর)কে এক একজন সেনাপতিরূপে গণ্য করে সংশ্লিষ্ট ভূ-ভাগের রাজস্ব আদায় অনুপাতে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্যবাহিনী তাকে সার্বক্ষণিকভাবে তৈরি রাখতে হতো। অর্থাৎ ফৌজী সর্দারদেরকে জায়গীর দিয়ে সে এলাকার শাসন প্রশাসনের সামগ্রিক দায়িত্ব তাদের উপরই অর্পণ করে রাখা হতো। কেন্দ্রের তলব অনুসারে যে কোন সময় তারা নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য নিয়ে উপস্থিত হতো। এভাবে সমগ্র রাজ্যের ক্ষমতা ফৌজী সর্দারদের কুক্ষিগত হয়ে পড়ে এবং প্রাক্তন কর্মকর্তা ও জায়গীরদারগণ ক্ষমতাহারা হয়ে পড়েন। শাহী কেন্দ্রীয় কোষাগারের সাথে সামরিক বাহিনীর আর কোন সম্পর্কই অবশিষ্ট রইল না বরং ফৌজ সর্দারগণ নিজেরাই নিজেদের বেতন-ভাতা নিজেদের জায়গীর থেকে উঠিয়ে নিতেন। তাদের বেতন-ভাতা হ্রাস-বৃদ্ধি করার ক্ষমতাও তাদের হাতেই এসে পড়ে। খলীফাকে বাধ্য হয়েই নিজের ফৌজী বাহিনীর সংখ্যা হ্রাস করতে হয়– যাতে খলীফার ক্ষমতাও স্বাভাবিকভাবেই খর্ব হয়ে পড়ে। সালজুকীদের দুর্বল হয়ে পড়ার পর বাগদাদের খলীফা ইরাকে আবার তাঁর ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং তা সংহত করে আবার সেই প্রশাসন থেকে সামরিক বাহিনীর পৃথক রাখার পুরনো নীতি চালু করেন।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি

বাগদাদে হারুনুর রশীদের আমল থেকেই বায়তুল হিকমা বা বিজ্ঞান ভবন চালু ছিল। মামূনের আমলে গ্রীক, সুরিয়ানী, হিব্রু, সংস্কৃত, ফার্সী প্রভৃতি ভাষায় গ্রন্থাদি অনুবাদের একটা বিভাগ বা অনুষদ চালু করা হয়। স্বয়ং খলীফা একাডেমিক আলোচনার ব্যবস্থাপনায় থাকতেন এবং আলোচনায় তিনি নিজেও অংশগ্রহণ করতেন। আমীর, উযীর ও বড় লোকদের গৃহাঙ্গনে জ্ঞানী-গুণীদের সমাবেশ হতো এবং জোরেশোরে জ্ঞানমূলক আলোচনা সমালোচনা হতো

শ্রোতারা তাতে আলোকদীপ্ত হতেন এবং তা উপভোগ করতেন। পুস্তকাদির গ্রন্থনা, সংকলন ও অনুবাদের জন্যে যেমন জ্ঞানীগুণী ও পণ্ডিতদের এক বিরাট দল অহরহ লেগে থাকতেন তেমনি এগুলোর অনুলিখনের জন্যে সে হারে প্রচুর লোকজন নিয়োজিত থাকতেন। পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশকদেরও অত্যন্ত কদর ছিল। তাই তাঁরা গ্রন্থাদির অনুলিখনের জন্য এক বিরাট সংখ্যক লিপিকারদের সর্বদা নিয়োজিত রাখতেন। জ্ঞানানুসন্ধান ও গবেষণার উদ্দেশ্যে লোকজন দূরবর্তী এলাকাসমূহে সফর করতো। ফিরে এসে তাঁরা তাদের দেশবাসী ও শাহী দরবারসমূহের জন্যে ভূষণস্বরূপ প্রতিপন্ন হতেন। আব্বাসীয় খিলাফত আমলে আরবী ব্যাকরণ নাহুশাস্ত্র আবিষ্কৃত হয় এবং এ শাস্ত্রের বড় বড় গ্রন্থাদি রচিত হয়। অনেক লেখক নিজ নিজ সফরনামা রচনা করেন। হাদীসশাস্ত্র সংকলিত হয়। উসূলে হাদীসের কিতাবাদি রচিত হয়। কালামশাস্ত্র, ফিকাহ্শাস্ত্র, উরুযশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে হাজার হাজার গ্রন্থ রচিত হয়। কেবল রাজধানী বাগদাদেই নয়, দেশের সর্বত্র নগর-বন্দরে গ্রন্থকারগণ গ্রন্থ রচনায় নিয়োজিত ছিলেন। চিকিৎসাশাস্ত্র এবং শারীর বিজ্ঞানের বিশালায়তন মূল্যবান গ্রন্থাদি রচিত ও প্রকাশিত হয়। দাওয়াখানা বা ফার্মাসিক্যাল কারখানাসমূহও এ যুগেরই আবিষ্কার। ইতিহাসশাস্ত্র সংকলন এবং তার বিন্যাস, সংস্কার ও অলংকরণও এ যুগেরই গর্বের ধন। জ্যোতির্বিজ্ঞানে আব্বাসীয়রা অনেক মূল্যবান ও উপাদেয় আবিষ্কারের হোতা। মামূনুর রশীদ দু' দু'বার ভূতাত্ত্বিক জরিপের মাধ্যমে পৃথিবীর ব্যাস ২৪ হাজার মাইল বলে প্রমাণ করেন। তিনি অনেক মান-মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। স্থাপত্য বিজ্ঞানের পুস্তকাদিও তিনি লিখান। দূরবীক্ষণ এবং ঘড়িও আব্বাসীয় যুগের আবিষ্কার। তাসাউফ, নীতিবিজ্ঞান এবং ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে বড় বড় গ্রন্থাদি এ যুগে রচিত হয়। অংকশাস্ত্র, ভূ-তত্ত্ব, প্রাণীতত্ত্ব, উদ্ভিদতত্ত্ব, যুক্তিবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে শুধু গ্রন্থাদিই রচিত হয়নি বরং মুসলমান পণ্ডিতগণই এসব শাস্ত্র আবিষ্কার করেন। এটা এ বিষয়ের বিশদ বিবরণ দানের ক্ষেত্র নয়। এ জন্যে স্বতন্ত্র বিশালায়তন পুস্তক রচনা করতে হবে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের এ উন্নতির ক্ষেত্রে স্পেনের উমাইয়া খলীফাগণের অবদানও আব্বাসী খলীফাদের চাইতে কোন অংশেই কম নয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আমরা এ পর্যন্ত যতটুকু অধ্যয়ন করলাম তার সারমর্ম দাঁড়াচ্ছে এই যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জীবনী অধ্যয়নের পর আমরা খুলাফায়ে রাশেদীনের বিস্তারিত আলোচনা পাঠ করলাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পর তাঁর এমন কোন নিকটাত্মীয় যিনি তাঁর সম্পদের উত্তরাধিকারী হতে পারতেন– তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের শাসক বা খলীফা হননি। এটা ছিল ইসলামের শিক্ষার ফলশ্রুতি। খুলাফায়ে রাশেদীনের প্রত্যেক খলীফারই সন্তানগণ ছিলেন, তাঁদের সে সন্তানদের খলীফা হওয়ার মত যথেষ্ট যোগ্যতাও ছিল, কিন্তু এতদসত্ত্বেও কোন খলীফা তাঁর নিজ সন্তানকে খলীফা মনোনীত করে যাননি এবং কেউ খিলাফতের উত্তরাধিকারীও হননি। কেবল হযরত আলী কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহুর পর তাঁর পুত্র হযরত হাসান (রা)-কে কূফাবাসীরা খলীফা পদে বসায়,কিন্তু তিনিও মাত্র ছ'মাস পরেই এ খিলাফত হযরত আমীর মুআবিয়া (রা)-এর হাতে অর্পণ করেন। হযরত আমীর মুআবিয়া দ্বারা এ ভুলটি হয় যে, তিনি তাঁর পুত্রকে তাঁর উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করে সেই

ইসলামী খিলাফতকে– যা মুসলমানদের সংখ্যাগুরু জনতার সমর্থনেই স্থিরীকৃত হতে পারতো, তাঁর ব্যক্তিগত সম্পদের মতো, ব্যক্তিগত উত্তরাধিকারের মতো আপন সন্তানের হাতে তুলে দেন। তবুও তিনি এ কথা প্রকাশ্যে অস্বীকার করেননি যে, ইসলামী রাষ্ট্রের শাসনাধিকার কোন খান্দান বা গোষ্ঠীর একক সম্পদ নয়। এ জন্যে তিনি ইয়াযীদের খিলাফতের ব্যাপারে সমস্ত মুসলমানের সমর্থন আদায়ের প্রয়াস চালান। আমীরে মুআবিয়া (রা)-এর ভুলটিও তেমন মারাত্মক ছিল না। কেননা, সে যুগের মুসলমানগণ তা সংশোধনের চেষ্টাও শুরু করে দেন। এ চেষ্টার ফলে কারবালার বিয়োগান্ত ঘটনা সংঘটিত হয়। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা)-এর খিলাফত প্রতিষ্ঠা ছিল তার একটি সফলরূপ। সে ক্ষেত্রে হযরত আমীরে মুআবিয়ার বংশ ইসলামী খিলাফত থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু হযরত আমীরে মুআবিয়া (রা)-এর ভুলটির সাথে যুক্ত হয়েছিল ইহুদী আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাবার ষড়যন্ত্র যা ছিল ইসলামের বিরুদ্ধে একটি পরিকল্পিত প্রয়াস। অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্রের শক্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ করার জন্যে একই সাথে দু'টি উপসর্গ কাজ করেছে। এর একটি আমীরে মুআবিয়া (রা)-এর ত্রুটি এবং এটিকে অভ্যন্তরীণ উপসর্গ ও দল বলে অভিহিত করা হয়েছে এবং অপরটি সাবায়ী ষড়যন্ত্র বলে অভিহিত করা হয়েছে– এ দু'টি উপসর্গ ইসলামের এক বিরাট ফিতনার রূপ পরিগ্রহ করে। ফলে একদিকে ইসলামী রাষ্ট্রের কেন্দ্র কিছুটা কক্ষচ্যুত এবং অনেক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়। বংশানুক্রমিক খলীফা মনোনয়নের কুপ্রয়াসকে মারোয়ান বংশীয়রা অনেকটা স্থায়ী রীতিতে পরিণত করে। ফলে অযোগ্য ও নিষ্কর্মা লোকদের খলীফা পদে বরিত হওয়ার সুযোগ জুটে যায়। ইসলামী খিলাফতের দাপট ও গাম্ভীর্যের তাতে যথেষ্ট ক্ষতি হয়। সাবায়ী আন্দোলন থেকে ফায়দা লুটে ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রেরই সাথে তাল দিয়ে সমান্তরাল একটা অবৈধ প্রশাসন চালুর অপচেষ্টা চলে। অবশেষে উমাইয়া খলীফাদের রাজত্বের অবসানে আব্বাসীয় খলীফাগণ খলীফার আসনে অধিষ্ঠিত হন। ফলে খিলাফত দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। ইতিপূর্বে বনূ উমাইয়ারা গোটা মুসলিম জাহানের শাসনকার্য পরিচালনা করতো। ফলে মুসলমানদের কেন্দ্র ছিল একত্র ও অভিন্ন। কিন্তু আব্বাসীয় আমলের সূচনাতেই স্পেন কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং সেখানে এক স্বতন্ত্র রাজত্ব গড়ে ওঠে। আব্বাসীয় খিলাফতের সাথে তার কোন সম্পর্ক ছিল না।

তারপর একে একে মরক্কো, আফ্রিকা এবং তারপরে একে একে আরো অনেক মুসলিম রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। উমাইয়া খিলাফতের পর আব্বাসীয় খিলাফতের বর্ণনাও আমরা সমাপ্ত করেছি। কিন্তু ক্রমান্বয়ে স্বতন্ত্রভাবে গড়েওঠা অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের কথা আমরা ছেড়ে এসেছি। তাই আব্বাসীয় খিলাফতের বর্ণনার পর এবার তৃতীয় খণ্ডে আমরা সেই সব বিচ্ছিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রের আলোচনা করবো। বিষয় ও ঘটনাবলীর ধারাবাহিকতার স্বার্থে এখানে শাসক বংশসমূহের একটি মোটামুটি চিত্র তুলে ধরা সমীচীন বোধ করছি।

হিস্পানিয়া (স্পেন)

মুসলমানরা স্পেন বিজয় করে ৯৩ হিজরী (৭১১ খ্রি)তেই সেখানে নিজেদের রাজত্ব গড়ে তোলেন। এভাবে এ দেশটি বনূ উমাইয়া খলীফাদের একটি প্রদেশে রূপান্তরিত হয়। ১৩৮ হিজরী (৭৫৫ খ্রি) পর্যন্ত অন্যান্য প্রদেশের মতো এখানেও উমাইয়া খলীফাদের পক্ষ থেকে

আমীর ও আমিল তথা গভর্নর নিযুক্ত হতেন এবং তাঁরা উমাইয়া খলীফাদের হয়ে সেখানে রাজত্ব করতেন। আব্বাসীয়রা যখন উমাইয়া খিলাফতের বিলোপসাধন করলেন এবং নিজেরা সেখানে দখলদারী কায়েম করলেন তখন দশম উমাইয়া খলীফা হিশামের পৌত্র আবদুর রহমান কোন প্রকারে স্পেনে গিয়ে উপনীত হন এবং সেখানে নিজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হন। এটা ১৩৮ হিজরী (৭৫৫ খ্রি)-এর ঘটনা। আব্বাসীয় বাহিনী তাঁর ওপর আক্রমণ চালালে তিনি তাদেরকেও পরাস্ত করেন এবং কর্ডোভাকে রাজধানী করে সেখানে তাঁর শান-শওকতপূর্ণ রাজত্বের সূচনা করেন। ৪২২ হিজরী (১০৩০ খ্রি) পর্যন্ত তাঁরই বংশের লোকজন সে দেশ শাসন করে। স্পেনের এ খলীফাদের শান-শওকত ও প্রভাব-প্রতিপত্তি গোটা ইউরোপ মহাদেশকে বিস্ময়াভিভূত করে তুলে। তাঁদের জ্ঞানানুরাগ ও বিদ্যোৎসাহিতা গোটা বিশ্বের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁদের কীর্তিগাঁথা আব্বাসীয়দের কীর্তিগাঁথার চাইতেও অধিকতর চমকপ্রদ ও শিক্ষণীয়। ৪২২ হিজরীতে (১০৩০ খ্রি) স্পেনে অরাজকতার সূত্রপাত হয় এবং উমাইয়াদের শান-শওকতপূর্ণ রাজত্বের অবসান ঘটে। স্পেনে উমাইয়া খিলাফতের অবসানে সেখানে ছোট ছোট বেশ কয়েকটি মুসলিম রাজ্য গড়ে ওঠে। ঐ সব ছোট ছোট রাজ্য কর্ডোভা, আশবেলা (সেভিল), গ্রানাডা, বালানশিয়া, তলীতলা (টলেডো), মাল্কা (মালাগা) প্রভৃতি শহরে তাদের রাজধানী গড়ে তোলে। কিছুদিনের মধ্যেই উভয় আফ্রিকার মুসলিম রাজ্যগুলো স্পেনের অধিকাংশে নিজেদের দখল প্রতিষ্ঠা করে। এদিকে খ্রিস্টান রাজারা মুসলমানদের আত্মকলহের সুযোগ গ্রহণ করে তাদের এ আত্মকলহে আরো ইন্ধন যুগিয়ে তাদেরকে আরো দুর্বল করে তোলে। তারপর তারা মুসলমানদের ওপর নির্যাতনের যে স্টিমরোলার চালায় তা ছিল অভূতপূর্ব। মানব জাতির ইতিহাসে নির্যাতনের এরূপ কলংকজনক নজীর খুঁজে পাওয়া দুষ্কর— যেমনটি স্পেনের বিজয়ী খ্রিস্টানরা মুসলমানদের প্রতি করেছে। স্পেনের সে মর্মবিদারী ইতিহাস আজো মুসলমানদের রক্তাশ্রু বহিয়ে চলেছে। স্পেনের মুসলমানদের ধ্বংসের সে মর্মন্তুদ কাহিনী মুসলিম হৃদয়কে ব্যথাতুর না করে পারে না।

মরক্কোয় স্পেনীয় সালতানাত

১৭২ হিজরী (৭৮৮ খ্রি)-তে মরক্কোও আব্বাসীয় খিলাফত থেকে বিচ্ছিন্নতা ঘোষণা করে এবং সেখানে একটি স্বায়ত্তশাসিত রাজত্ব গড়ে ওঠে। এ রাজ্যটি হিস্পানিয়া রাজ্যের প্রতিবেশী হওয়া সত্ত্বেও যেমনভাবে তা আব্বাসীয় খিলাফতের বিরোধী ছিল যেমন বিরোধী ছিল স্পেন বা আন্দালুসিয়া সালতানাতেরও। প্রায় দু' শতাব্দী ধরে এ রাজ্যটি টিকেছিল। সোয়াশ বছর পর্যন্ত সেখানে ইদরীসীদের স্বাধীন হুকুমত কায়েম ছিল। তারপর আফ্রিকায় উবায়দী রাজত্বের সূচনা হলে তারা একে তাদের করদ রাজ্যে পরিণত করে। এরপর এ রাজ্যটি খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যায় এবং কিছুদিন মামুলী রঈসদের সামন্তরাজ্য রূপে অস্তিত্ব রক্ষা করে অবশেষে চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

আফ্রিকীয় আগলাবী রাজত্ব

১৮৪ হিজরী (৮০০ খ্রি)তে আফ্রিকা প্রদেশ (তিউনিসিয়া)ও আব্বাসীয় খিলাফতের কবল থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ইবরাহীম ইব্ন আগলাবের বংশধররা শতাধিক বছর ধরে সেখানে অত্যন্ত শান-শওকতের সাথে রাজত্ব করে। ২১৯ হিজরী (৮৩৪ খ্রি)তে আগলাবী

সালতানাত সাকালিয়া (সিসিলী) দ্বীপ খ্রিস্টানদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তাকে তাদের রাজত্বভুক্ত করে ফেলে। তাদের রাজত্বের শেষ পর্যন্ত তারা এ দ্বীপ তাদের দখলে রাখে। এ বংশে বেশ ক'জন সুযোগ্য এবং প্রজ্ঞাবান শাসকের উদ্ভব হয়। যখন উবায়দীরা সেখানে অভ্যুত্থান ঘটায় তখন তাঁরা আগলাবী সালতানাতের ভিত্তির উপরই তাদের রাজত্ব গড়ে তুলেছিল। তারা ইদরীসীয়দের শাসনযন্ত্রকে বিকল করে দিয়ে আগলাবীদের রাজধানী কায়রোয়ানকেই নিজেদের রাজধানীরূপে গ্রহণ করে। এমনকি এক পর্যায়ে তারা মিসর পর্যন্ত জয় করে ফেলে এবং শেষ পর্যন্ত মিসরে তাদের রাজধানী স্থানান্তরিত করে। আগলাবীয়দের রাজত্বের ইতিহাস ইদরীসীয়দের ইতিহাস থেকেও অধিকতর চমকপ্রদ। ২৯৬ হিজরী (৯০৮ খ্রি)তে এ রাজত্বের অবসান ঘটে। এ বংশ কেবল (সিসিলী) দ্বীপই দখল করে ক্ষান্ত হয়নি বরং তারা মাল্টা এবং সার্ডিনিয়াও দখল করে নিয়েছিল। তাদের নৌ-শক্তি ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। সমস্ত ভূমধ্যসাগরে আগলাবী সুলতানদের দখল কায়েম ছিল। কোন কোন সময় তাদের নৌ-শক্তি গ্রীস ও ফ্রান্সের উপকূলেও আক্রমণ চালিয়ে আসতো।

ইয়ামানে যিয়াদিয়া রাজত্ব

২০৩ হিজরীতে (৮১৮ খ্রি) যিয়াদ ইব্‌ন আবূ সুফিয়ানের অধঃস্তন বংশধর মুহাম্মাদ ইব্‌ন যিয়াদ ইয়ামানের শাসক নিযুক্ত হন। ৪০২ হিজরী (১০১১ খ্রি) পর্যন্ত এ বংশ ইয়ামানে রাজত্ব করে। মুহাম্মাদ ইব্‌ন যিয়াদ যুবায়দ নামক শহর প্রতিষ্ঠা করে ঐ শহরকেই তার রাজধানী করেন। তিনি ইয়ামানের পার্শ্ববর্তী তিহামা প্রদেশও বাহুবলে জয় করেন। হাদরামাউত পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকাও তিনি জয় করেন। এ বংশে অনেকে ভাগ্যবান এবং প্রতাপশালী বাদশাহ রূপে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ২৮৮ হিজরী (৯০০ খ্রি)তে তাদের রাজত্বের একটি অংশকে বিচ্ছিন্ন করে আলভীরা যায়দিয়া হুকুমত কায়েম করে। এরপর ধীরে ধীরে এ রাজ্যটি সংকুচিত হতে থাকে। যায়দিয়া হুকুমত আসলে স্বায়ত্তশাসিত থাকলেও আব্বাসীয় খলীফাদের নামে খুতবা পাঠ করা হতো। যিয়াদ ছাড়া যাইদ যখন ইয়ামানের একটি অংশে নিজেদের রাজত্ব কায়েম করলেন তখন তিনিও তাঁর রাজত্বের সীমায় এ খুতবা উঠিয়ে দিলেন। যিয়াদিয়া হুকুমত যখন দুর্বল হয়ে পড়লো তখন তাদের দাস ও তস্যদাসরা রাজত্ব করতে শুরু করে। এরপর ইয়ামানে একের পর এক অনেক বংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। যিয়াদিয়া বংশের রাজত্বকাল চমৎকারিত্বশূন্য নয়। যিয়াদিয়াদের পর ইয়াকুবিয়া, নাজাহিয়া, সুলায়হিয়া, হামদানিয়া, মাহদিয়া, যুরিয়া, আইয়ুবিয়া, রাসূলিয়া, তাহিরিয়া প্রভৃতি খান্দান একের পর এক ১০০০ হিজরী (১৫৯১ খ্রি) পর্যন্ত স্বাধীনভাবে ইয়ামানে রাজত্ব করে। এই শাসক বংশের অনেকে শিয়া, আবার অনেকে সুন্নী ছিলেন। তাদের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য তেমন কিছুই নেই।

খুরাসানে তাহিরিয়া হুকুমত

৪০৫ হিজরী (১০১৪ খ্রি)তে মামূনুর রশীদ আব্বাসী তাহির ইব্‌ন হুসাইনকে খুরাসানের গভর্নর নিযুক্ত করেন। তারপর পঞ্চাশ বছরেরও অধিককাল ধরে খুরাসান তাদের বংশের দ্বারা শাসিত হতে থাকে। তাহিরিয়া বংশীয় শাসকরা আসলে খুরাসানে স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করতে

থাকে। এ জন্যে খুরাসানকে ঐ সময় থেকেই বাগদাদ বিচ্ছিন্ন ছিল বলে মনে করতে হবে। তাহিরীয়া শাসকরা নিজেদেরকে বাগদাদের খলীফার অধীন বলে বিবেচনা করলেও এবং খলীফার নামে তারা খুতবা পাঠ করলেও বাগদাদের খলীফা কোনদিন খুরাসানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতেন না।

খুরাসান ও পারস্যে সাফারীয় হুকুমত

২৫৪ হিজরী (৮৬৮ খ্রি)তে ইয়াকূব ইব্‌ন লাইস সাফার পারস্য দখল করে এ প্রদেশকে আব্বাসীয় খিলাফত থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন। ২৫৯ হিজরীতে (৮৭২ খ্রি) খুরাসানও দখল করে তিনি তাহিরীয় হুকুমতের বিলোপ সাধন করেন। সাফারীয় খান্দান প্রায় ৪০ বছরকাল ধরে রাজত্ব করে। এরপর সামানী বংশীয়রা তাদের বিলোপ সাধন করে। তাহিরীয় ও সাফারীয়দের সম্পর্কে বিগত পৃষ্ঠাসমূহে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে বিধায় তাদের সম্পর্কে স্বতন্ত্র বর্ণনার প্রয়োজন নেই। সুতরাং পাঠকবর্গ পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহে এদের ইতিহাস আর খুঁজবেন না।

মাওরাউন নাহর ও খুরাসানে সামানীয় রাজত্ব

সামানীয়দের অবস্থাও উপরে কিছুটা বর্ণিত হয়েছে। ২৯০ হিজরী (৯০২ খ্রি)-তে যখন মাওরাউন নাহরের সামানীয় রাজ্য সাফারীয়দের নিকট থেকে খুরাসান এবং উলুভীদের নিকট থেকে তাবারিস্তান ছিনিয়ে নেয়, তখন মাওরাউন নাহর অর্থাৎ সমরকন্দ ও বুখারা থেকে নিয়ে পারস্য উপসাগর ও কাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত সে রাজ্যের পরিধি বিস্তৃত হয়ে পড়ে। সে সময় থেকে মাওরাউন নাহর প্রদেশও আব্বাসীয় খিলাফত থেকে বিচ্ছিন্ন ও স্বাধীন হয়ে পড়ে। সামানীয় বংশীয়রা সোয়াশ বছরকাল ধরে রাজত্ব করে। এ রাজবংশ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কৃষ্টি-সংস্কৃতির উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। বুখারা ও সমরকন্দ জ্ঞান-বিজ্ঞানের পীঠস্থানে পরিণত হয় এবং এ এলাকায় এমন সব জ্ঞানী-গুণী জন্মগ্রহণ করেন যে,অদ্যাবধি তাদের সুনাম পৃথিবীতে রয়েছে। প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল পরে খুরাসান পারস্য ও তাবারিস্তান সামানীয় রাজত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং তা বনী বুওয়াইয়াদের দখলে চলে যায়। তারপর এ খান্দানে তুর্কী গোলামদের আধিপত্য বিস্তারের সাথে সাথে তাদের পতন ঘনিয়ে আসে। ৩৮৪ হিজরী (৯৯৪ খ্রি)তে এই খান্দানের জনৈক তুর্কী গোলাম আলপ্তগীন আম্মান নদীর উত্তর তীরের অবশিষ্ট এলাকাও অধিকার করে নিয়ে এ বংশকে উচ্ছেদ করে দেন। সামানীয়দের ইতিহাস এ জন্যেও উল্লেখের দাবি রাখে যে, ঐ রাজত্ব থেকেই আলপ্তগীনের রাজত্বের উদ্ভব হয়। সবুক্তগীন হচ্ছেন আলপ্তগীনেরই উত্তরাধিকারী যাঁর পুত্র সুলতান মাহমূদকে ভারতবর্ষের প্রতিটি শিশুও ঔৎসুক্যের নজরে দেখে থাকে।

বাহরায়নে কারামিতা রাজত্ব

২৮৬ হিজরীতে (৮৯৯ খ্রি) বাহরায়ন প্রদেশও আব্বাসীয় খিলাফত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কারামিতারা সেখানে তাদের স্বাধীন রাজত্ব গড়ে তোলে। তাদের নারকীয় নির্যাতন নিবর্তনে জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। কারামিতাদের নিষ্ঠুর নির্যাতনের বর্ণনা একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে বর্ণিত হবে। ৩৬৪ হিজরী (৯৭৪ খ্রি) পর্যন্ত এদের রাজত্ব টিকেছিল। এরপর অন্যান্য খান্দানের লোকেরা বাহরায়ন শাসন করে। বাহরায়ন ও আশেপাশের এলাকায় অনেক ছোট ছোট স্বাধীন রাজবংশের উদ্ভব হয়।

তাবারিস্তানে উলুভী রাজত্ব

২৫০ হিজরী (৮৬৪ খ্রি) থেকে ৩১৬ হিজরী (৯২৮ খ্রি) পর্যন্ত তাবারিস্তান রাজ্যে রাজত্ব করে যায়দিয়া উলুভী বংশীয়রা। সামানীয়দের হাতে এদের পতন ঘটে। তারপরও কয়েকটি রাজবংশ এ এলাকায় সংঘর্ষরত থাকে এবং তাদের মধ্য থেকেই বনী বুওয়াইয়াদের উদ্ভব হয়। এদের অবস্থা ওপরে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

সিন্ধু প্রদেশ

২৬৫ হিজরী (৮৭৮ খ্রি)তে সিন্ধু প্রদেশও আব্বাসীয় খিলাফত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এ এলাকায় মুলতান ও মানসূরাকে রাজধানী করে দু'দু'টি স্বাধীন মুসলিম রাজত্ব গড়ে ওঠে। মানসূরা রাজ্যের একটি অংশ ছিল সিন্ধুর দক্ষিণাঞ্চল। আর এর উত্তরাঞ্চল ছিল মুলতান রাজ্যভুক্ত। এছাড়াও তূরান, কাসদার, কায়কান, মাকরান, মুশকী প্রভৃতি ছোট ছোট দেশীয় রাজ্যও আরব সর্দাররা কায়েম করে নিয়েছিলেন। এ ছোট রাজ্যগুলো উপরোক্ত বড় বড় রাজ্যের অধীন করদ রাজ্যরূপে ছিল। এভাবে সিন্ধু প্রদেশ স্বাধীন ও আব্বাসীয় খিলাফত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কিন্তু এ সব রাজ্যে খুতবা ঠিকই বাগদাদের খলীফার নামে পাঠ করা হতো। এ সব রাজ্য ধীরে ধীরে নিস্তেজ হতে হতে একশ-সোয়াশ বছরের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। কিন্তু মুলতান রাজ্য সুলতান মাহমূদ গজনভীর ভারত আক্রমণ বরং হিন্দুদের দ্বারা তার ভারত আগমন অপরিহার্য করে তোলা পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

দায়লামী বুওয়াইয়া রাজত্ব

দায়লামী ৩২২ হিজরী (৯৩৩ খ্রি) থেকে ৪৪৭ হিজরী (১০৫৫ খ্রি) পর্যন্ত প্রায় দুশ বছরকাল ধরে পারস্য ও ইরাকে রাজত্ব করে। এ দায়লামীরা রাজধানী থেকে দূরবর্তী কোন প্রদেশকে খিলাফত থেকে বিচ্ছিন্ন করার পরিবর্তে স্বয়ং খলীফাও ইরাক প্রদেশকে কুক্ষিগত করে একেবারে শাব্দিক ও প্রকৃত অর্থেই আব্বাসী খিলাফতের বিলোপ সাধন করে। অবশ্য, খলীফার নাম এবং নামে মাত্র খিলাফত তারা বাঁচিয়েই রাখে। কিন্তু তাদের জন্যে আব্বাসীয় খিলাফতের মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হয়– যার বিবরণ ইতিপূর্বেই মোটামুটি আলোচিত হয়েছে। যেহেতু তারা খলীফা ও খিলাফতকেই কুক্ষিগত করে রেখেছিল এবং খলীফা তাদের হাতে কাষ্ঠ পুত্তলিকাস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, তাই আব্বাসীয় খলীফাদের আলোচনা স্থলে বনূ বুওয়াইয়াদের অবস্থা এবং তাদের রাজত্বের কথা ধারাবাহিকভাবেই একে একে বর্ণিত হয়েছে। পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহে আর তাদের আলোচনার প্রয়োজন অবশিষ্ট থাকেনি।

মিসরে তূলূনিয়া রাজত্ব

ইব্‌ন তূলূন সম্পর্কে পূর্বে আলোচিত হয়েছে। তূলূন বংশীয়রা ২৫৪ হিজরী (৮৬৮ খ্রি) থেকে ২৯২ হিজরী (৯০৪ খ্রি) পর্যন্ত মিসরে রাজত্ব করেছে। এটা যদিও স্বায়ত্তশাসিত বা স্বাধীন ছিল এবং ২৫৪ হিজরী (৮৬৮ খ্রি.)-তেই মিসর প্রদেশ কার্যত আব্বাসীয় খিলাফত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছিল এতদসত্ত্বেও মিসরে খুতবায় আব্বাসীয় খলীফার নাম পাঠ করা হতো। তূলূন বংশীয়রা সিরিয়াকেও তাদের রাজ্যভুক্ত করে নিয়েছিল। এভাবে সিরিয়া ও মিসরে এমন একটি রাজ্য গড়ে ওঠে যারা মুখে বাগদাদের খলীফার অধীন বলে নিজেদের

পরিচয় ব্যক্ত করলেও বাগদাদের খলীফার দরবার থেকে মিসর ও সিরিয়াকে কার্যত বিচ্ছিন্নই করে দিয়েছিল।

মিসর ও সিরিয়ায় আখশাদিয়া রাজত্ব

মিসর ও সিরিয়ায় তূলূন বংশীয়দের রাজত্বের অবসান ঘটলে কিছুদিনের জন্যে বাগদাদ থেকে গভর্নর নিযুক্ত হয়ে আসতেন। এভাবে বাহ্যত এ দু'টি প্রদেশ পুনরায় আব্বাসীয় খিলাফতের অধীন চলে আসে। ৩১৬ হিজরী (৯২৮ খ্রি.) বাগদাদের খলীফা মুক্তাদির বিল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্‌ন তুফাজকে রামাল্লায় শাসক নিযুক্ত করেন। ৩১৮ হিজরী (৯৩০ খ্রি.)-তে তাকে দামেশকের শাসনবার অর্পণ করা হয় এবং ৩২৩ হিজরী (৯৩৪ খ্রি.)-তে মিসরের শাসনভারও অর্পণ করা হয়। মুহাম্মদ ইব্‌ন তুফাজ মাওরাউন নাহর এলাকার ফারগানার প্রাচীন শাসক বংশের লোক ছিলেন। অর্থাৎ তাঁর পূর্বপুরুষ ছিলেন ফারগানার অধীন। সে যুগে ফারগানার শাসকদের উপাধি ছিল আখশিদ। মুহাম্মদ ইব্‌ন তুফাজ মিসরের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করে ৩২৭ হিজরী (৯৩৮ খ্রি)-তে স্বাধীনতা ঘোষণা করে নিজেকে আখশিদ বলে ঘোষণা করেন। ৩৩০ হিজরী (৯৪১ খ্রি.)-তে তিনি সিরিয়াও দখল করে বসেন। ৩৩১ হিজরী (৯৪২ খ্রি.) হিজাযকেও তাঁর রাজ্যভুক্ত করে তিনি বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। এতে তার খুব বেশি একটা কালক্ষেপণও করতে হয়নি। কেননা দায়লামীয় খিলাফতকে নিস্তেজ ও প্রভাববিহীন করে ফেলেছিল। ফলে খলীফার ভয় সকলের অন্তর থেকে তিরোহিত হয়ে যায়। আখশিদীয়রা ৩৫৬ হিজরী (৯৬৬ খ্রি.) পর্যন্ত এ সব রাজ্যে তাদের শাসন চালিয়ে যায়। তারপর উবায়দীয়রা প্রথমে মিসর এবং তার কিছুদিন পরেই সিরিয়াও জয় করে নেয়।

মিসর, আফ্রিকা ও সিরিয়ায় উবায়দিয়া রাজত্ব

২৯৬ হিজরী (৯০৮ খ্রি.)-তে আফ্রিকা (তিউনিসে) আগলাবিয়া হুকুমতের অবসানে সেখানে উবায়দিয়া রাজত্বের সূচনা হয়। উবায়দীয়রা ৩৫৬ হিজরী (৯৬৬ খ্রি.)-তে মিসরে জনৈক অল্পবয়স্ক আখশিদীয় শিশু শাসকের নিকট থেকে মিসর ছিনিয়ে নেয় এবং কায়রোকে তাদের রাজধানী করে শহরের চারদিকে প্রাচীর গড়ে তোলে। ৩৮১ হিজরী (৯৯১ খ্রি.) উবায়দীয়রা আলেপ্পো অধিকার করে এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে মরক্কো সীমান্ত থেকে সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়ে। উবায়দীয়রা যেহেতু কায়রোয়ানের পরিবর্তে কায়রোকে তাদের রাজধানী বানিয়ে নিয়েছিল তাই ভূমধ্যসাগরের দ্বীপসমূহ এবং পশ্চিম প্রান্তের জেলাগুলো তাদের হাতছাড়া হয়ে যায়। তবে ভূমধ্যসাগরের পূর্ব এলাকায় তাদের অধিকার স্বীকৃত হয়। এভাবে পূর্বাঞ্চলের শাসনক্ষমতা সংহত হওয়ায় পশ্চিমাঞ্চলের ক্ষতি তারা পুষিয়ে নিতে সমর্থ হয়। কিন্তু পশ্চিমের হাতছাড়া হয়ে যাওয়া এলাকাগুলোর অধিকাংশই খ্রিস্টানদের করতলগত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে পূর্বাঞ্চলের এলাকাগুলো উবায়দীয়রা মুসলমানদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল। ফলে উবায়দীয়দের মিসর জয়ে ঈসায়ীদের উপকার হয়, কিন্তু মুসলমানদের তাতে ক্ষতিই হয়। উবায়দীয়রা খিলাফতেরও দাবি করে এবং তাদের অধীনস্থ লোকদের নিকট থেকে খিলাফতের বায়আতও গ্রহণ করে। নিজেদেরকে তারা খলীফা বলেই পরিচয় দেয়। এভাবে একই সময়ে পৃথিবীতে তিন তিনটি খিলাফত আত্মপ্রকাশ করে। এর প্রথম এবং প্রধান ধারার সূচনা হয়েছিল হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর হাতে এবং উসমানীয় সাম্রাজ্যের শেষ

খলীফা আবদুল মজীদ পর্যন্ত যা অব্যাহত গতিতে চলে এসেছিল। এ সিলসিলার প্রথমাংশের নাম খিলাফতে রাশেদা, দ্বিতীয়াংশ খিলাফতে বনী উমাইয়া, তৃতীয় অংশের নাম বাগদাদের খিলাফতে আব্বাসীয়, চতুর্থ অংশের নাম মিসরের খিলাফতে আব্বাসীয় এবং পঞ্চম অংশের নাম খিলাফতে উসমানীয় বা উসমানী খিলাফত। এ দীর্ঘ ধারা পরবর্তী খণ্ডসমূহে আলোচিত হবে।

খিলাফতের দ্বিতীয় ধারাটি হচ্ছে স্পেনের তৃতীয় আবদুর রহমানের মাধ্যমে যার সূচনা এবং তারই বংশ দ্বারা যার পরিসমাপ্তি ঘটে। খিলাফতের এ ধারাটি কোন কোন উলামায়ে কিরাম খিলাফতের সিলসিলা বলে স্বীকার করেছেন। তারা স্পেনের খলীফাগণকে ইসলামেরই খলীফার মর্যাদা দিয়ে থাকেন। অর্থাৎ তাঁদের শাসনাধীন মুসলমানদের জন্যে তাঁদের আনুগত্য করা বাধ্যতামূলক ছিল এবং তাদের বিরুদ্ধাচরণকে না-জায়েয ও গোনাহ্‌র কাজ বলে উলামাগণ মনে করেন।

খিলাফতের তৃতীয় যে ধারাটির সূচনা উবায়দীয়রা চালু করে ইসলামী পণ্ডিতগণ এটাকে আদৌ খিলাফত বলে স্বীকার করেন নাই। উবায়দীয়দেরকে তারা আদৌ খলীফা মনে করেন না এবং ইসলামী আইন ও অনুশাসনের আলোকে এদের সে মর্যাদা ছিল বলে তাঁরা ধারণা করেন না যে, এদের আনুগত্য অবশ্য পালনীয় হবে। এরা (উবায়দীয়রা) শির্‌ক ও বিদআতের প্রবর্তন করেছে, ইসলামী প্রতীকসমূহের অমর্যাদা করেছে এবং নানা ধরনের পাপাচার ও অনাচারে লিপ্ত হয়েছে। মিসরে ৫৬৭ হিজরী (১১৭১ খ্রি.) পর্যন্ত এদের রাজত্ব কায়েম ছিল। এরপর সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ূবী উবায়দী রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে আইয়ূবী রাজত্বের সূচনা করেন। মিসরে পুনরায় খিলাফতে আব্বাসীয়ার খুতবা চালু হয়।

মুসেল, জাযিরা ও সিরিয়ায় বনূ হামদান রাজত্ব

আবুল হায়জা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হামদান ইব্‌ন হামদূন ইব্‌ন হারিছ ইব্‌ন লূকমান ইব্‌ন আসাদ ইব্‌ন হাযম ২৮৯ হিজরী (৯০১ খ্রি.) মুসেল প্রদেশে স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্রের পত্তন করেন এবং প্রায় এক শতাব্দীকাল ধরে বনূ হামদানরা মুসেল, জাযিরা ও সিরিয়ায় রাজত্ব করে। তারা তাদের রাজত্বে খুতবায় ঠিকই আব্বাসীয় খলীফার নাম পাঠ করতো। এ বংশের বাদশাহদের মধ্যে সাইফুদ্দৌলা ও নাসিরুদ্দৌলা অত্যন্ত খ্যাতির অধিকারী ছিলেন। বনূ আখশাদিয়াদের হাত থেকে সিরিয়ার অধিকাংশ অঞ্চলই এরা ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। জাযিরাও তাদের দখলে এসে যায়। বনূ বুওয়াইয়া অর্থাৎ দায়লামীদের সাথেও তাদের অনেক সংঘর্ষ হয়। এ সব সংঘর্ষে তারা কোন অংশেই বনূ বুওয়াইয়া থেকে কম যেতেন না। কখনও কখনও বাগদাদের খলীফার উপরও তারা প্রভাব বিস্তার করে বসতেন। তাদের আমলে রোমকদের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ বা রোমকদের আক্রমণ প্রতিহত করার ব্যাপারটা আর বাগদাদের খলীফার সাথে কোনক্রমেই জড়িত ছিল না। বনূ হামদানরাই রোমানদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করতেন আর তারাই আবার রোমানদের হামলা প্রতিহতও করতেন। এদের মধ্যে সাইফুদ্দৌলা রোমানদের বিরুদ্ধে বেশ কটি সফল বড় রকমের জিহাদ পরিচালনা করেন এবং এ ব্যাপারে তিনি বেশ খ্যাতিও অর্জন করেন। শেষ পর্যন্ত সিরিয়া প্রদেশ তাদের হাতেই ছিল। অবশেষে বনূ হামদানের রাজত্ব তাদের গোলামদের দখলে চলে যায়। ঐ গোলাম বাদশাহরা সিরিয়া

প্রদেশে উবায়দীদের নামে খুতবা জারি করে। অবশেষে ২৮০ হিজরী (৮৯৩ খ্রি.)-তে ঐ বংশের রাজত্বের অবসান ঘটে এবং মুসেলে বনূ আকীল ইব্‌ন কাআব ইব্‌ন রাবীআ ইব্‌ন আমের এর রাজত্ব গড়ে ওঠে। তারা জাযিরা প্রদেশ অধিকার করে নেয়। তারপর সিরিয়া প্রদেশের বিভিন্ন অংশে বেশ ক'জন আরব সর্দার তাদের ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্য গড়ে তোলেন। নামেমাত্র এরা কোন বড় রাষ্ট্রের অধীন হতেন। আবার কখনো স্বাধীনতাও ঘোষণা করে বসতেন। সালজুকীদের বাগদাদ দখল পর্যন্ত এ অবস্থায় চলতে থাকে। অবশেষে তাদের বাগদাদ অধিকার করার পর তারা সিরিয়ার বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়েন এবং বিভিন্ন এলাকায় নিজেদের পক্ষ থেকে আমিল নিযুক্ত করতে থাকেন। এভাবে সে সব এলাকাও সালজুক রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে।

মক্কায় বনূ সুলায়মান রাজত্ব

মক্কা মুয়ায্‌যমায় বাগদাদের খলীফার দরবার থেকে আমিল বা গভর্নর নিযুক্ত হয়ে আসতেন। কিন্তু ৩০১ হিজরী (৯১৩ খ্রি.)-তে জনৈক মুহাম্মদ ইব্‌ন সুলায়মান ইব্‌ন সুলায়মান দাঊদ ইব্‌ন হাসান মুসান্না ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবূ তালিবের বংশধরদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি মক্কায় স্বাধীনতা ঘোষণা করে বসেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন সুলায়মানকে সুলায়মান ইব্‌ন দাঊদের পুত্র মনে করা ঠিক হবে না। এ দুই সুলায়মানের মধ্যে এ কুলপঞ্জীতে আরো ২/৩ পুরুষ রয়েছেন বলে ধারণা করা হয়ে থাকে। মুহাম্মদ ইব্‌ন সুলায়মান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এ স্বাধীন রাজ্যটি ৪৩০ হিজরী (১০৩৮ খ্রি.) পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। এ সোয়াশ বছরাধিককাল সময়ে মক্কা শরীফে বেশ কটি বড় বড় দাঙ্গা সংঘটিত হয়। এ বংশের চার-পাঁচজন শাসক মক্কায় রাজত্ব করেছিলেন। কিন্তু এদের রাজত্ব ছিল অদ্ভুত ধরনের। হজ্জের মওসুমে মিসর ও বাগদাদের হাজীদের কাফেলা আসতো। হজ্জের নেতৃত্ব ও খুতবা কে দিবেন তা নিয়ে প্রায়ই কলহ বাঁধতো। উভয় পক্ষে যুদ্ধ পর্যন্ত বেঁধে যেত এবং সেখানে মক্কার শাসকের কোন ভূমিকাই থাকতো না। বাগদাদের পক্ষ হজ্জের আমীররূপে সংঘর্ষে জয়যুক্ত হলে বনূ বুওয়াইয়া ও বাগদাদের খলীফার নামে খুতবা পাঠ করা হতো। পক্ষান্তরে মিসর পক্ষ জয়ী ও আমীর হলে বনূ আখশিদিয়াদের নাম খুতবায় পাঠ করা হতো। তারপর যখন মিসরে উবায়দী রাজত্ব কায়েম হলো তখন উবায়দী ও আব্বাসীয়দের মধ্যে খুতবা কার নামে পাঠ করা হবে তা নিয়ে দ্বন্দ্ব হতো। এদিকে কারামিতারা এসে পড়লে তাদের দখল প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেত। তারা হাজীদেরকে হত্যা ও লুটপাট করতো। কখনো মিসরীয়রা হাজরে আসওয়াদের অবমাননা করতো, তাতে প্রস্তর নিক্ষেপ করতো এবং হাজরে আসওয়াদের নাম ধরে গালাগাল দিত। তখন ইরাকীরা উত্তেজিত হয়ে তাদেরকে হত্যা করতে শুরু করে দিত। ঐ আমলে কারামিতারা হাজরে আসওয়াদ তুলে বাহরায়নে নিয়ে যায় এবং বিশ বছর বা ততোধিক সময় পরে তা মক্কায় ফিরিয়ে দেয়। মোদ্দাকথা, হজ্জের মওসুমে মক্কায় বনূ সুলায়মানের আধিপত্যের কোন লক্ষণ পরিদৃষ্ট হতো না। এরা ছিলেন যায়দিয়া শিয়া সম্প্রদায়ের লোক। এজন্যে স্বাভাবিকভাবেই উবায়দীদের প্রতি এদের ঝোঁক ছিল। কিন্তু কার্যত তারা যে পক্ষকে শক্তিশালী দেখতে পেতেন তাদের পক্ষই তারা সমর্থন করতেন।

মক্কায় হাশিমী রাজত্ব[১]

সুলায়মানীদের পর মক্কায় আবূ হাশিম মুহাম্মদ ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবিল কিরাম ইব্‌ন মূসা জূনের বংশধররা তাদের রাজত্ব কায়েম করে। এরাও বনূ সুলায়মানের মতো মক্কার শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। সালজুকী শাসনের প্রথম দিকে এরা বাগদাদের খলীফার নামেই খুতবা পাঠ করতেন আবার সালজুকীরা দুর্বল হয়ে গেলে আবার তারা উবায়দীদের নামে খুতবা পাঠ শুরু করে দেন। ৫৬৭ হিজরী (১১৭১ খ্রি.)-তে যখন সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ূবীর হাতে উবায়দী রাজত্বের অবসানের সাথে সাথে মক্কার হাশিমী রাজত্বেরও অবসান ঘটে অর্থাৎ হিজায এবং ইয়ামানও সুলতান সালাহুদ্দীনের করতলগত হয় মক্কায় তখন সুলতানের পক্ষ থেকে আমিল নিযুক্ত হয়ে আসতেন। কিছুদিন পর মক্কায় বনূ কাতাদার শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর বনূ নুমাইয়া রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর অন্যরাও মক্কায় নিজেদের অধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। উসমানী বংশীয় সুলতান সালীমের হিজায অধিকার পর্যন্ত এভাবেই চলতে থাকে। তারপর উসমানী আমলে মক্কায় তাঁদের পক্ষ থেকে যিনি শাসক হয়ে আসতেন তাকে বলা হতো শরীফে মক্কা বা মক্কার শরীফ। শেষ পর্যন্ত আমাদের যুগে (মূল পুস্তক রচনার যুগে) মক্কার শরীফ হুসাইন উসমানীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রভূত ক্ষতি সাধন করেন। এজন্য মুসলিম বিশ্বের তিনি ঘৃণার পাত্রে পরিণত হন। বাহ্যত তিনি খ্রিস্টানদের প্রভুত্ব মেনে নিয়ে সায়্যিদ বংশীয় ও হাশিমী বংশীয়দের নামকে কলংকিত করেন।

দিয়ারে বকরে মারওয়ানীয়া রাজত্ব

কুর্দী গোত্রোদ্ভূত জনৈক আবূ আলা ইব্‌ন মারওয়ান দিয়ারে বকর এলাকায় একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ৩৮০ হিজরী (৯৯০ খ্রি.) থেকে ৪৮৯ হিজরী (১০৯৫ খ্রি.) পর্যন্ত শতাব্দীরও অধিককাল ধরে এ বংশের রাজত্ব টিকেছিল। আমুদ, আরজান, মায়া ফারিকীন, কায়ফা প্রভৃতি শহর এ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ বংশের শাসকগণ মিসরের উবায়দী শাসকদের আধিপত্য স্বীকার করতেন বলে উবায়দীরা এদেরকে আলেপ্পোও প্রদান করে। এভাবে তারা অনেকটা হামদানীদের স্থলবর্তী হয়ে গিয়েছিল। এরা বুওয়াইয়াদের অধীনতাও স্বীকার করতেন। সালজুকীদের হামলার মুখে এদের রাজত্বের অবসান ঘটে।

সালজুকী রাজত্ব

সালজুকীদের রাজত্ব ৪৩০ হিজরী (১০৩৮ খ্রি.) থেকে শুরু করে ৭০০ হিজরী (১৩০০ খ্রি.) পর্যন্ত আড়াইশ বছরাধিককাল ধরে টিকেছিল। তাদের রাজত্বের শুরুর দিকটা ছিল অত্যন্ত শান-শওকতপূর্ণ। শেষ দিকে তাদের রাজত্ব খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যায়। সূচনালগ্ন থেকেই তাদের মধ্যে কয়েকটি শ্রেণীর উদ্ভব হয়। যাদের সবচাইতে বড় ধারাটিতে আল্‌প আরসালান ও মালিক শাহের মত বিশ্ববিখ্যাত সুলতানদের উদ্ভব হয়েছিল। এদেরকে ইরানী সালজুকী সুলতান বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। তাদের আলোচনা অনেকটা আমরা ইতিপূর্বেই করে এসেছি। ইনশাআল্লাহ্ তা'আলা এদের সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হবে। এদের ছাড়াও ইরাকী সালজুকী, সিরীয় সালজুকী, রোমান সালজুকী প্রভৃতি সালজুকী রাজাগণও বিখ্যাত হয়ে রয়েছেন। এ সব খান্দানের ইতিহাস কম চমকপ্রদ ও কম আকর্ষণীয়

নয়। আর এ সব সালজুকী গোলামদের এবং আতাবেকদের সালতানাতসমূহ কায়েম হয়। সেগুলোও অত্যন্ত মশহুর এবং ইসলামী ইতিহাসের ভূষণস্বরূপ। সালজুকীদের অবির্ভাব হয় ঠিক সেই মুহূর্তে যখন দায়লামীদের অত্যাচার অনাচারের মুখে বাগদাদের খিলাফত অত্যন্ত অপদস্থ ও অসহায় হয়ে পড়ে। ইসলামী রাষ্ট্রকে লোকজন শতধা বিচ্ছিন্ন করে পৃথক অনেক স্বাধীন ছোট ছোট রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটিয়েছিল। কিছু সংখ্যক স্বাধীন রাষ্ট্র যে বেশ বিপুল আয়তন নিয়েও গড়ে উঠেছিল তা এ অধ্যায়েই বর্ণিত হয়েছে। সালজুকীরা আব্বাসীয় খিলাফতের হৃত মর্যাদা, ঔজ্জ্বল্য ও দাপট ফিরিয়ে আনেন এবং অনেক ছোট ছোট রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে একটি বিশাল ও শক্তিশালী রাষ্ট্রের পত্তন করে খলীফাকে প্রভাব-প্রতিপত্তির আসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু সালজুকীদের রাজত্বের উপাদানসমূহের সবটাই যেহেতু ছিল সামরিক উপাদান এবং ফৌজী সর্দারদেরকেই প্রশাসনিক দায়িত্ব অর্পণ করা হতো তাই কিছুদিনের মধ্যেই বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং সালজুকী সেনাপতিরা বিভিন্ন প্রদেশ ও রাজ্যে নিজ নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠা করে বসে। ফলে পূর্বের অরাজকতা আবার গোটা রাষ্ট্রে ফিরে আসে। সালজুকীরা ছিলেন নওমুসলিম। কিন্তু তাঁদের মধ্যে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। তাঁরা উলুভী ষড়যন্ত্র এবং সাবায়ী কূটচক্র থেকে মুক্ত ছিলেন। তাঁরা দীন ইসলামের খিদমতের পূর্ণ সুযোগপ্রাপ্ত হন এবং এ সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে সম্ভাব্য সকল উপায়ে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং পুণ্যবান ও জ্ঞানীগুণীদের বিপুল খিদমত আঞ্জাম দেন। তাঁরা আব্বাসীয় খলীফাগণকে কেবল এ কারণে সম্মান করতেন যে, ইসলামী পুরনো ঐতিহ্য অনুসারে তাঁরা মুসলমান মাত্রেরই শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। কিন্তু আব্বাসীয়, উমাইয়া ও উলুভীদের পারস্পরিক রেষারেষির দ্বারা তিনি বিন্দুমাত্র প্রভাবান্বিত হননি। না এদের কোন পক্ষের সাথে তাদের বৈরিতা ছিল, না কোন পক্ষের সাথে অপ্রয়োজনীয় মাখামাখি ছিল। এক কথায় তাঁরা ছিলেন সাদাসিধে মুসলমান এবং ইসলামের পাকা পাবন্দ। তাঁরা খ্রিস্টানদের মুকাবিলায় যে শৌর্যবীর্যের পরিচয় দেন তাতে খ্রিস্টান জগতে মুসলমানদের ভীতি ছড়িয়ে পড়ে। ফলে ঈসাইদের অগ্রসরমান সয়লাব এমনভাবে প্রতিহত হয় যে, তারা অনেক দূর পর্যন্ত পিছিয়ে যেতে বাধ্য হয়। সালজুকীদের জন্যেই ইরাকে শেষ পর্যন্ত আব্বাসীয় খিলাফত টিকেছিল।

যে সব চিরাচরিত কারণ বিভিন্ন সময়ে নানা রাজবংশের পতনের কারণ হয়েছে অর্থাৎ পারস্পরিক অনৈক্য ও আত্মকলহ সালজুকীদেরও পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। উপরেই বর্ণিত হয়েছে যে, সালজুকীরা মূলত একটি সামরিক শক্তি ছিল। যে সামরিক বাহিনীর উপর নির্ভর করে তারা চলতেন তার অফিসাররা ছিলেন তুর্কী গোলাম। তীচাক উপত্যকা থেকে তাদেরকে ক্রয় করে আনা হতো। সে সব ক্রীতদাসের ওপরই তারা সর্বাধিক আস্থাশীল ছিলেন। তাদের বিশ্বস্ততায় তাঁরা একটুও সন্দেহ করতেন না। এজন্যে সামরিক বাহিনীর সেনাপতিত্ব থেকে শুরু করে প্রদেশসমূহের গভর্নরী পর্যন্ত তাদেরকে তাঁরা নির্দ্বিধায় প্রদান করতেন। এই ক্রীতদাসরা যখন মার্জিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে সর্দারী লাভ করতেন তখন তাঁরা অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও বীররূপে প্রতিপন্ন হতো। সালজুকী সুলতানরা তাদের কিশোর পুত্রসন্তানদের গৃহশিক্ষকরূপেও এদেরকেই নিযুক্ত করতেন। ভাবী সুলতানরা শিষ্টাচার শিখতেন এদের নিকট থেকেই। এজন্যে এ ক্রীতদাসরা সাধারণত আতাবেক বা গৃহশিক্ষক বলেই অভিহিত হতেন। তুর্কী ভাষায় আতাবেক মানে পিতৃস্থানীয় অভিভাবক আমীর। আতা শব্দের অর্থ হচ্ছে পিতা আর 'বেক' বেগ শব্দেরই অপভ্রংশ যার অর্থ সর্দার। সালজুকী সুলতানরা যখন গৃহযুদ্ধের দরুন

দুর্বল ও নিস্তেজ হয়ে পড়লেন তখন সুযোগ বুঝে এই ক্রীতদাস বা আতাবেকেরা স্থানে স্থানে স্বাধীন রাজ্য গড়ে তুললেন। তাগতাগীন যিনি তুতুশ সালজুকীর ক্রীতদাস ছিলেন তিনি তুতুশের কিশোর সন্তান বেফাক সালজুকীর গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন এবং এই সুবাদে তুতুশের পর তিনিই হয়ে গেলেন রাজ্যের অধিপতি। এভাবে উক্ত ক্রীতদাসটি দামেশকের সুলতান বনে যান। ইমাদুদ্দীন যঙ্গী সুলতান মালিক শাহ সালজুকীর ক্রীতদাসের পুত্র ছিলেন। তিনি মুসেল ও আলেপ্পোতে আতাবেকী সালতানাতের গোড়াপত্তন করেন। ইরাকের সালজুকী সুলতান মাসউদের জনৈক কায়চাকী গোলাম আযারবায়জানে একটি আতাবেকী সালতানাত গড়ে তোলেন। মালিক শাহ সালজুকীর আরেকজন ক্রীতদাস ছিলেন শাকী আবূ সবুক্তগীন। খাওয়ারিযম শাহী সুলতানরা ছিলেন তাঁরই অধঃস্তন বংশধর। অনুরূপভাবে পারস্যে আতাবেকী সালাতানাতের গোড়াপত্তনকারীও ছিলেন সালগার নামক জনৈক আতাবেক সর্দার। মোটকথা হিজরী ৬ষ্ঠ শতকে সমস্ত সালজুকী রাজত্ব জুড়ে অসংখ্য সামরিক সর্দার বিভিন্ন এলাকায় তাদের নিজ নিজ স্বাধীন রাজত্ব গড়ে তোলেন।

ইরাক ও সিরিয়ায় আতাবেক রাজত্ব

মালিক শাহ্ সালজুকীর তুর্কী গোলাম আক সুনকুর ছিলেন তাঁর হাজিব বা প্রাসাদরক্ষীও। তাঁকে আলেপ্পো, সিরিয়া ও ইরাকের গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। ৫২১ হিজরীতে (১১২৭ খ্রি) আক সুনকুরের পর তাঁর পুত্র ইমাদুদ্দীন ইরাকের গভর্নর নিযুক্ত হন। তিনি মুসেল, সঞ্জর, জাযীরা ও ইরানকেও তাঁর রাজ্যভুক্ত করে নেন। ৫২২ হিজরী (১১২৮ খ্রি)-তে সিরিয়ার অধিকাংশ এলাকা এবং আলেপ্পো প্রভৃতি এলাকাও তাঁর অধিকারে চলে আসে। ইমাদুদ্দীন খ্রিস্টান ও রোমকদের বিরুদ্ধে শক্তহাতে জিহাদ করে মুসলিম বিশ্বে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেন। ইমাদুদ্দীনের পর তাঁর পুত্র নূরুদ্দীন মাহমূদ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। মুসেল ও ইরাকের শাসন ক্ষমতা পান তাঁর অপর পুত্র সাইফুদ্দীন। নূরুদ্দীন মাহমূদ খ্রিস্টানদের মুকাবিলায় তাঁর পিতার চাইতেও বেশি মাত্রায় জিহাদ করে অধিকতর খ্যাতি অর্জন করেন। নূরুদ্দীন মাহমূদের পর তাঁর খান্দান আরও ছোট ছোট অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ে। আইয়ূবী বংশের রাজত্ব এই খান্দানেরই একটি শাখায় স্থলাভিষিক্ত হয়। প্রায় সোয়াশ বছরকাল ধরে ইমাদুদ্দীন যঙ্গীর বংশধরদের রাজত্ব টিকেছিল।

আরবেলে আতাবেকদের রাজত্ব

ইমাদুদ্দীন যঙ্গীর তুর্কী অফিসারদের একজনের নাম ছিল আলী কুচাক ইব্ন বুকতাগীন। তিনি তাকে মুসেলে তার নায়েব নিযুক্ত করেছিলেন। ৫৩৯ হিজরী (১১৪৪ খ্রি)-তে যাইনুদ্দীন আলী কুচাক সঞ্জর, হাররান, তিকরীত ও আরবেলকে তাঁর রাজ্যভুক্ত করেন এবং আরবেলকে রাজধানী করে নিজের স্বাধীন স্বায়ত্তশাসিত রাজত্ব গড়ে তোলেন। যাইনুদ্দীন আলী কুচাকের খান্দানে ৬৩০ হিজরী (১২৩২ খ্রি.) পর্যন্ত এ রাজত্ব টিকেছিল। তারপর তা বাগদাদের খলীফার প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে চলে যায়।

দিয়ারে বকরে আতাবেক রাজত্ব

সালজুকী ফৌজের জনৈক অফিসার ছিলেন আরতূক ইব্ন আকসাব। তাঁর পুত্র আবীল গাযী ৪৯৫ হিজরী (১১০১ খ্রি.)-তে একটি স্বাধীন রাজত্বের গোড়াপত্তন করেন। এ বংশের

হাতে তৈমুরের আমল পর্যন্ত নামেমাত্র রাজত্ব ছিল। সুলতান সালাহুদ্দীনের আমলে তারা সুলতানের অধীনতা স্বীকার করে নেন।

আর্মেনিয়ায় আতাবেক রাজত্ব

কুতুবুদ্দীন সালজুকীর গোলাম সুলায়মান কিবতী ৪৯৩ হিজরী (১০৯৯ খ্রি)-তে মারওয়ানী সাম্রাজ্যের হাত থেকে খালাত শহর ছিনিয়ে নিয়ে নিজের স্বাধীন রাজত্ব গড়ে তোলেন। ৬০৪ হিজরী (১২০৭ খ্রি.) পর্যন্ত আইয়ূবীদের হাতে তাদের পরাস্ত হওয়া সময় পর্যন্ত এ রাজত্ব টিকেছিল।

আযারবায়জানে আতাবেক রাজত্ব

সুলতান মাসঊদ সালজুকীর কাবচাকী ক্রীতদাস আলযাকুয আযারবায়জানে নিজের স্বাধীন রাজত্ব কায়েম করেন যা ৫৩১ হিজরী (১১৩৬ খ্রি.) থেকে ৬৩৩ হিজরী (১২৩৫ খ্রি.) পর্যন্ত একশ এক বছর টিকেছিল।

পারস্যে আতাবেক রাজত্ব

তুর্কীদের একটি দলের সর্দার ছিলেন সালগারী নামক জনৈক তুর্কী। তিনি তুগরিল বেগ সালজুকীর দলে ভিড়ে পড়েন। তাঁরই বংশধর সুনকুর ইব্ন মওদূদ ৫৪৩ হিজরী (১১৪৮ খ্রি.) পারস্য অধিকার করেন। ৬৮৬ হিজরী (১২৮৬ খ্রি.) পর্যন্ত পারস্যের শাসন ক্ষমতা তারই বংশধরদের হাতে থাকে। এ খান্দানেরই একজন বাদশাহ আতাবেক সা'দ খাওয়ারিযম শাহের করদ রাজায় পরিণত হন। তাঁরই নামানুসারে শেখ মুসলেহুদ্দীন শিরাজী, তাঁর ছদ্মনাম সা'দী রেখেছিলেন। আতাবেক সা'দের পর আতাবেক আবূ বকর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি আকতাই খান মোগলের আনুগত্য গ্রহণ করেন। শায়খ সাদী তাঁর গুলিস্তাঁ গ্রন্থে এই আতাবেক আবূ বকরের নাম উল্লেখ করেছেন।

তুর্কিস্তানে আতাবেক রাজত্ব

এ খান্দানের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন পারস্যের আতাবেকদের জনৈক ফৌজী সর্দার আতাবেক তাহির। সুনকুর ইব্ন মওদূদ যে বছর পারস্য অধিকার করেন ঐ বছরই তিনি আবূ তাহিরকে তুর্কিস্তান দখলের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। আবূ তাহির ৫৪৩ হিজরী (১১৪৮ খ্রি.)-তে তুর্কিস্তান অধিকার করে সেখানে তাঁর নিজ রাজত্বের পত্তন করেন। এই রাজত্ব ৭৪০ হিজরী (১৩৩৯ খ্রি.) পর্যন্ত কায়েম ছিল। এই খান্দানেরই একটি শাখা দশম হিজরী শতক পর্যন্ত তুর্কিস্তান মাইনরে রাজত্ব করে।

খাওয়ারিযম শাহী আতাবেকদের রাজত্ব

বলগাতেগীন গযনভীর জনৈক তুর্কী গোলাম আনুসতেগীন যিনি পরবর্তীকালে সুলতান মালিক শাহ সালজুকীর ভিত্তিওয়ালা হয়েছিলেন— তাঁকে মালিক শাহ খাওয়ারিযম অর্থাৎ খিভার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি সুলতান মালিক শাহ সালজুকীর ভিত্তিওয়ালা হয়েছিলেন। তারপরে তার পুত্র খাওয়ারিযম শাহ তার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি তাঁর রাজ্যকে আমুদরিয়ার তীর পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। তিনি খুরাসান এবং ইস্পাহানও জয় করেন।

এরপর তিনি দ্রুততার সাথে ৬১১ হিজরী (১২১৪ খ্রি.)-তে আফগানিস্তানেরও এক বিরাট এলাকা গজনী পর্যন্ত জয় করে ফেলেন। তারপর তিনি শিয়া মতে দীক্ষা গ্রহণ করে আব্বাসী খিলাফতকে সমূলে উচ্ছেদের সংকল্প করেন। তাঁর এ সাধ পূর্ণ হবার পূর্বেই চেঙ্গিস খান তাঁর মনোযোগ কেড়ে নেন। অবশেষে মোগলরা তাঁকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখে। তারা তাঁকে উপর্যুপরি ধাওয়া করতে থাকে। অবশেষে পালাতে পালাতে তিনি কাস্পিয়ান সাগরের এক দ্বীপে গিয়ে ৭১৭ হিজরী (১৩১৭ খ্রি.) মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর মৃত্যুর পর তার তিন পুত্রও অহরহ মোগলদের কর্তৃক তাড়িত হতে থাকেন। তাঁর এক পুত্র জালালুদ্দীন খাওয়ারিযমী পালিয়ে ভারতবর্ষে এসেছিলেন এবং দু'বছর ভারতবর্ষে বসবাস করার পর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। অবশেষে ৬২৮ হিজরী (১২৩০ খ্রি.)-তে মোগলরা তাদের রাজত্বের অবসান ঘটায়। খাওয়ারিযম শাহীদের রাজত্ব ৪৭০ হিজরী (১০৭৭ খ্রি.) থেকে ৬২৮ হিজরী (১২৩০ খ্রি.) পর্যন্ত টিকেছিল। কিন্তু তাদের রাজত্বকালের ১২টি বছর এমন উন্নতি অগ্রগতির যুগ ছিল যে, তাঁদের রাজত্ব সালজুকীদের রাজত্বের সমতুল্য বলে পরিগণিত হতো।

আইয়ূবী রাজত্ব

সিরিয়া ও ইরাকের আতাবেকদের কথা আগেই বর্ণিত হয়েছে। তাঁরাই কুর্দিস্তানের অধিবাসী একজন ইমাদুদ্দীন যঙ্গী জনৈক কুর্দী সর্দার আইয়ূব ইব্ন শাদীকে তাঁর পক্ষ থেকে বাআলবাক শহরের শাসক নিযুক্ত করে পাঠান। কালক্রমে তিনি একজন বড় নেতা হিসেবে পরিগণিত হন। আইয়ূবের এক অনুজ ছিলেন শেরকোহ। ইমাদুদ্দীন যঙ্গীর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র নূরুদ্দীন মাহমূদ সিংহাসনে আরোহণ করে শেরকোহকে হিম্স ও রাহবার শাসন ক্ষমতা প্রদান করেন। শেরকোহর মিসরে প্রেরণ করার সময় নূরুদ্দীন তাকে নিজের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করেন। শেরকোহকে মিসরে প্রেরণ করার সময় নূরুদ্দীন তার ভ্রাতুষ্পুত্র সালাহুদ্দীন ইব্ন আইয়ূবকেও মিসরে পাঠিয়ে দেন। এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। সালাহুদ্দীন ৫৬৪ হিজরী (১১৬৮ খ্রি.)-তে তার নিজ রাজত্বের গোড়াপত্তন করেন। তারপর স্বল্পকালের মধ্যেই তাঁর রাজত্ব মিসর, সিরিয়া ও হিজায পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। সালাহুদ্দীনের প্রতিষ্ঠিত এ রাজত্ব আইয়ূবী রাজত্ব নামে অভিহিত হয়ে থাকে। ৬৪৮ হিজরী (১২৫০ খ্রি.) পর্যন্ত এ বংশের রাজত্ব স্থায়ী হয়। সালাহুদ্দীনের পর এ খান্দানটিও কয়েকটি অংশে বিভক্ত হয়ে যায়। হামাত এ খান্দানের একটি শাখা ৭৪২ হিজরী (১৩৪১ খ্রি.) পর্যন্ত রাজত্ব করে। এ খান্দানের শাখাটি মিসরে রাজত্ব করেছিল। তাদেরকে আইয়ূবী ও আদেলিয়া বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। মিসরে তাদের স্থলাভিষিক্তদেরকে সরিয়ে যাঁরা রাজত্ব করে তাঁরা মামলুক বলে পরিচিত ছিলেন।

মিসরে মামলুক রাজত্ব

মিসরের আইয়ূবী রাজত্বের অব্যবহিত পরেই ৫৬০ হিজরী (১১৬৪ খ্রি.) থেকে মিসরের মামলুক সুলতানদের রাজত্ব শুরু হয়। তাদের কথাও পূর্বে আলোচিত হয়েছে। এ মামলুক রাজত্বেরও দুটো ধারা। একটি বাহরিয়া, অপরটি গির্জীয়া ধারা বলে অভিহিত হয়ে থাকে। ৯২২ হিজরী (১৫১৬ খ্রি.)-তে তাঁদের রাজত্বেরও অবসান ঘটে এবং তাঁদের স্থলে মিসরে উসমানী রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

সালজুকী সুলতানদের স্থলাভিষিক্তদের প্রসঙ্গ আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা অনেক দূর এগিয়ে এসেছি। কালের ধারাবহিকতা অনুসারে আরও কয়েকটি মশহুর ও উল্লেখযোগ্য রাজবংশের কথা এখানে আলোচনা করতে পারি নি। যারা এদেরও অনেক আগে তাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সুতরাং এবার খুরাসান, ইরাক ও সিরিয়া প্রভৃতি পূর্বদেশীয় রাজ্যের কথা বাদ দিয়ে পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজত্বসমূহের আলোচনায় আসা যাক।

তিউনিসে যায়রিয়া রাজত্ব

উবায়দী রাজরা কায়রোয়ান থেকে তাঁদের রাজধানী কায়রোতে স্থানান্তরিত করার সময় মিসর থেকে মরক্কো পর্যন্ত গোটা উত্তর আফ্রিকা তাদের রাজত্বভুক্ত ছিল। সেই সময় ভূমধ্যসাগরে উবায়দীদের নৌ-শক্তি সর্বাধিক শক্তিধরণী নৌ-শক্তি বলে বিবেচিত হতো। কিন্তু কায়রোতে (মিসর) রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ার পর পশ্চিম অঞ্চলের উপর তার সে দাপট আর অক্ষুণ্ন রইল না। তাই তিউনিসে যায়রিয়া বংশের স্বাধীন রাজত্ব গড়ে ওঠে। এ রাজবংশের রাজত্ব ৩৬২ হিজরী (৯৭২ খ্রি.) থেকে ৫৪৩ হিজরী (১১৪৮ খ্রি.) পর্যন্ত টিকেছিল।

আলজিরিয়ায় সামাদিয়া রাজত্ব

আলজিরিয়ার স্বাধীন সামাদিয়া রাজত্ব গড়ে ওঠে এবং তা ৩৯৮ হিজরী (১০০৭ খ্রি.) থেকে ৫৪৭ হিজরী (১১৫২ খ্রি.) পর্যন্ত টিকে থাকে। অনুরূপভাবে উবায়দীদের রাজধানী পরিবর্তনের ফলে মরক্কোতে বর্বর উপজাতিগুলোও স্বাধীনতা ঘোষণা করে বসে। পরবর্তীকালে মুরাবিতীন রাজবংশ অবশ্য তাঁদেরকে অধীনতার পাশে আবদ্ধ করে ফেলে।

মুরাবিতীনদের রাজত্ব

বনূ উমাইয়ার রাজত্বকালে ইয়ামানের কোন কোন গোত্র বর্বর অঞ্চল অর্থাৎ তিউনিসিয়া, আলজিরিয়া ও মরক্কোতে এসে বসতি স্থাপন করে। এঁরা ক্রমেক্রমে তাঁদের ওয়ায-নসীহত এবং উন্নত ইসলামী জীবন-যাপন পদ্ধতির প্রভাবে বার্বারদেরকে ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেন। বার্বারজাতিকে ইসলামে দীক্ষিত করার সকল কৃতিত্ব তাঁদেরই। মরক্কোর একটি গোত্র লুমতূনা গোত্রের ফকীহ্ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াসীনের ওয়ায-নসীহতে মুগ্ধ হয়ে এবারও যে সব বার্বার ইসলাম গ্রহণ করেন তারাও এসে দলে দলে ৪৪৮ হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করে। এ বিপুল সংখ্যক নওমুসলিম তাঁদের দীক্ষাদাতা আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াসীনকে তাদের সর্দার বলে ঘোষণা করতে উদ্যত হলে তিনি তাতে সম্মত না হয়ে আবূ বকর ইব্ন উমর নামক আরেক ব্যক্তিকে সর্দাররূপে গ্রহণের পরামর্শ দেন। নওমুসলিম বার্বার গোত্রীয়রা সে মতে আবূ বকর ইব্ন উমরকেই তাদের সর্দাররূপে গ্রহণ করে আমীরুল মুসলিমীন উপাধিতে ভূষিত করে। তাঁদের এ অভূতপূর্ব একতা লক্ষ্য করে আশেপাশের গোত্রগুলো এসে তাঁদের চর্তুষ্পার্শ্বে সমবেত হতে থাকে। মরক্কোতে সে যুগে কোন সুসংহত রাজত্ব কায়েম ছিল না বরং বিভিন্ন গোত্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোত্রীয় রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। এদের কেউ কারো রাজত্বকে মেনে নিতো না। এই অরাজকতার যুগে আবূ বকর ইব্ন উমরের শক্তি দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। আবূ বকর ইব্ন উমর তাঁর অনুচরদেরকে মুরাবিতীন নামে অভিহিত করেন। এর অর্থ হচ্ছে এরা ইসলামের সীমান্তরক্ষী সেনাবাহিনী। এদেরকে মুলছেমীনও বলা হয়ে থাকে। আবূ বকর বার্বার

গোত্রসমূহের মধ্যে ইসলামের সেবার চেতনা সৃষ্টি করে তাদের শৌর্যবীর্য জাগিয়ে তোলেন। তিনি মরক্কো থেকে পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে বাজালমাসা জয় করেন এবং আপন পিতৃব্যপুত্র ইউসুফ ইব্‌ন তাশুফীন আল মুতাওয়াকাফাকে বাজালমাসার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। এই ইউসুফ ইব্‌ন তাশুফীন ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ, বীর এবং প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি। ৪৫৩ হিজরী (১০৬১ খ্রি.) আবূ বকর ইব্‌ন উমরের ইন্তিকাল হলে ইউসুফ ইব্‌ন তাশুফীন রাজ্যের বাদশাহ্ হন। ৪৬০ হিজরী (১০৬৭ খ্রি.)-তে তিনি মারাকিশ শহরের পত্তন করে একেই তাঁর রাজধানীরূপে গ্রহণ করেন। ৪৭২ হিজরীতে খ্রিস্টানরা যখন স্পেনের মুসলমান রঈসদেরকে আক্রমণ করে অতিষ্ঠ করে তোলে তখন তাঁরা ইউসুফ ইব্‌ন তাশুফীনের সাহায্য প্রর্থনা করেন। তিনি তাঁদের আমন্ত্রণক্রমে সশরীরে স্পেনে উপস্থিত হয়ে এক প্রচণ্ড যুদ্ধে পরাস্ত করে তাদের দর্প খর্ব করে দেন। তারপর তিনি তিন হাজার মুরাবিতীন সৈন্য স্পেনের রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে সেখানে রেখে নিজে আফ্রিকা অর্থাৎ মরক্কোতে প্রত্যাবর্তন করেন। চার বছর পর পুনরায় খ্রিস্টানদের উৎপাতে বাধ্য হয়ে স্পেনের মুসলমানরা ইউসুফ ইব্‌ন তাশুফীনের শরণাপন্ন হন। এবার খ্রিস্টানদেরকে পরাস্ত করে তিনি স্পেনের ইসলামী অঞ্চলকে তাঁর একটি প্রদেশে পরিণত করেন। মোটকথা, স্বল্পসময়ের মধ্যেই মুরাবিতীনদের রাজ্য স্পেন, মরক্কো, তিউনিসিয়া, আলজিরিয়া ও ত্রিপোলীসহ বিশাল এলাকায় বিস্তৃত হয়ে পড়ে। নৌ-শক্তি বিস্তারের দিকে তারা তত মনোযোগী ছিলেন না। ৫৫১ হিজরী (১১৫৬ খ্রি) পর্যন্ত মুরাবিতীনদের রাজত্ব টিকে রইল। আপন শৌর্যবীর্য ও তৎপরতা দ্বারা দীর্ঘ এক শতাব্দীকাল ধরে তাঁরা খ্রিস্টান শক্তিসমূহকে শ্বাসরুদ্ধ করে রাখেন।

মুওয়াহ্‌হিদীনদের রাজত্ব

বার্বারদের মাসমূদা গোত্রের এক ব্যক্তির নাম ছিল আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্‌ন তুমার্ত। তিনি ছিলেন জাবালে সূসের অধিবাসী। হাদীস, উসূলে ফিকাহ্ এবং আরবী সাহিত্যে তিনি ছিলেন একজন দক্ষপণ্ডিত। 'আমর বিল মা'রূফ ও নাহী আনিল মুনকারের' কাজে তিনি ছিলেন সদাতৎপর। উপদেশদান ও স্পষ্টবাদিতার ক্ষেত্রে তাঁর কাছে আমীর, গরীব নির্বিশেষে সবাই ছিল সমান। তাঁর তাকওয়া পরহিযগারী তাঁকে সাদাসিধা খাবার ও পোশাক-পরিচ্ছদে পরিতৃপ্ত রাখতো। একদল লোক ছিল তাঁর অনুসারী যারা তাঁকে মাহ্‌দী নামে সম্বোধন করতো। অনুসারীদের মধ্যে তিনি রাজা-বাদশাহর মত প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি তাঁর দলের নামকরণ করেছিলেন মুওয়াহ্‌হিদীন বা একত্ববাদী।

৫২২ হিজরী (১১২৮ খ্রি.)-তে ইন্তিকালের সময় তিনি তাঁর বন্ধু আবদুল মু'মিনকে তাঁর দলের নেতৃত্ব সোপর্দ করে যান। আবদুল মু'মিন মুরাবিতীন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বিভিন্ন এলাকা দখল করতে থাকেন। মাত্র দু'বছর সময়ের মধ্যে তিনি মুরাবিতীনের রাজ্যের বিরাট এলাকা দখল করে নেন। ৫২৪ হিজরী (১১২৯ খ্রি.) তিনি মুরাবিতীনদের রাজধানী দখল করেন এবং কয়েক দিনের মধ্যে তাদের মূলোচ্ছেদ করে স্পেনে একটি সৈন্যদল প্রেরণ করেন। স্পেন ও মরক্কো দখলের পর তিনি আমীরুল মু'মিনীন উপাধি ধারণ করেন। এরপর ৫৪৭ হিজরী (১১৫২ খ্রি)-তে আলজিরিয়া দখল করেন এবং সামাদিয়া রাজবংশের বিলোপ করে ত্রিপোলী দখল করেন। এ সময় মিসর থেকে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত বিশাল ভূভাগ জুড়ে তাঁর রাজত্ব কায়েম হয়। স্পেনও তাঁর অন্তর্ভুক্ত হয়। ৬৩২ হিজরী

(১২৩৪ খ্রি.)-তে তাঁর মুওয়াহ্হিদীন সেনাবাহিনী খ্রিস্টানদের হাতে এমনি শোচনীয় পরাজয়বরণ করে যে, স্পেনে তাঁর রাজত্ব আর টিকিয়ে রাখা সম্ভবপর হয়নি। তবে গ্রানাডার সুলতানগণ সর্বদা সফলতার সাথে খ্রিস্টানদের মুকাবিলা করে যেতে থাকেন। স্পেন হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার পর মুওয়াহ্হিদীন বংশের মধ্যে দুর্বলতা ও পতনের লক্ষণ সুস্পষ্ট হতে থাকে। এরপর সুলতান সালাহুদ্দীন তাদের হাত থেকে ত্রিপোলী কেড়ে নেন। তারপর তিউনিসিয়ায় মুওয়াহ্হিদীনদের পক্ষ থেকে নিযুক্ত হাফসিয়া খান্দানের নায়েব স্বাধীনতা ঘোষণা করে বসেন। এরপর মরক্কোতেও বেশ ক'জন শাসক নিজ নিজ স্বাধীন রাজত্ব প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়। অবশেষে ৬২৭ (১২২৯ খ্রি.) হিজরী এ খান্দানের রাজত্বের অবসান ঘটে এবং মরক্কোতে মুরাইনিয়া বংশ তাঁদের স্থলাভিষিক্তরূপে রাজত্বের অধিকারী হয়।

তিউনিসিয়ায় হাফ্সিয়া রাজত্ব

মুওয়াহ্হিদীনরা তাদের পক্ষ থেকে তিউনিসিয়ায় হাফ্স নামক এক ব্যক্তিকে তাদের প্রতিনিধিরূপে শাসক নিযুক্ত করে। তার বংশধররা বংশানুক্রমিকভাবে শাসনকার্য চালিয়ে যেতে থাকে। অবশেষে ৬২৫ হিজরী (১২২৭ খ্রি.)-তে এ বংশ স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং তিন শতাব্দী ধরে তিউনিসিয়ায় সুনামের সাথে রাজত্ব করে। অবশেষে ৯৪১ হিজরী (১৫৩৪ খ্রি.)-তে উসমানী আমীরুল বাহ্র খায়রুদ্দীন তিউনিস দখল করে এলাকাটিকে উসমানী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে চিরতরে এ বংশের রাজত্বের অবসান ঘটায়।

আলজিরিয়ায় যিয়ানিয়া রাজত্ব

মুওয়াহ্হিদীনদের পক্ষ থেকে আলজিরিয়া প্রদেশে যিয়ানিয়া খান্দানের যে ব্যক্তিটি শাসক নিযুক্ত হয়ে যায়, হাফ্সিয়া খান্দানের দেখাদেখি সেই ব্যক্তিও স্বাধীনতা ঘোষণা করে বসে। তাদের রাজধানী ছিল তিলিমিসান। ৭৯৬ হিজরী (১৩৯৩ খ্রি.) পর্যন্ত তাদের রাজত্ব টিকেছিল। তারপর মরক্কোর মুরাইনিয়া খান্দান তাদের দেশ জয় করে তাদের মূলোচ্ছেদ করে।

মরক্কোয় মুরাইনিয়া রাজত্ব

মুরাইনিয়া খান্দান ৫৯১ হিজরী (১১৯৪ খ্রি.) থেকে মরক্কোয় পার্বত্য অঞ্চলে তাদের স্বাধীন রাজত্ব গড়ে তোলে। ৬২৭ হিজরী (১২২৯ খ্রি.)-তে তারা মুওয়াহ্হিদীনদের রাজধানী দখল করে গোটা মরক্কোতে তাদের শাসন প্রতিষ্ঠা করে। ৭৯৬ হিজরী (১৩৯৩ খ্রি.) এ খান্দানকে তাদেরই একটি শাখা উচ্ছেদ করে এবং নিজেরাই তাদের স্থান দখল করে নেয়। তারপর ঐ দেশে মুসলমানদের দু'টি প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। তাদের কাজ ছিল সর্বদা পরস্পরে হানাহানিতে লিপ্ত থাকা।

এ পর্যন্ত পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহের কেবল সেই সব রাজত্বের তালিকা দেয়া হলো যেগুলো আব্বাসীয় খিলাফতের সমসাময়িক অর্থাৎ ৯০০ হিজরীর (১৪৯৪ খ্রি.) পূর্ব পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিল। আব্বাসীয় খিলাফতের অবসান এবং উসমানী খিলাফতের সূচনার পরবর্তী ইসলামী রাজ্যগুলোর অবস্থান বা বিশ্বের বিভিন্ন এলাকায় নতুন সৃষ্ট অসংখ্য মুসলিম রাষ্ট্রের বর্ণনা এ অধ্যায়ে দেয়া হবে না। কেননা, তারা আব্বাসীয় খিলাফতের সমসাময়িক ছিল না। এরপর উসমানী খিলাফত এবং তাদের সমসাময়িক সমস্ত ইসলামী রাষ্ট্রের বর্ণনা দেয়া হবে।

আর খিলাফতে উসমানীয়া যেহেতু এ বছর অর্থাৎ ১৩৪২ হিজরী (১৯২৩ খ্রি.) পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিল এজন্যে উসমানী খিলাফত এবং তাদের সমসাময়িক মুসলিম রাজত্বসমূহের বর্ণনা সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে ইসলামের ইতিহাসেরও সমাপ্ত হয়ে যাবে।

এই পরিচ্ছেদে যে সব রাজবংশের তালিকা দেয়া হচ্ছে, সেগুলোর কতকগুলো এমন যে এক তালিকায় প্রদত্ত বর্ণনাই সেগুলোর জন্যে যথেষ্ট। কিন্তু অধিকাংশই এমন যার বিশদ আলোচনা হওয়া উচিত। যদিও সেই বর্ণনাও খুবই সংক্ষিপ্ত অথচ সামগ্রিক হবে। এমন রাষ্ট্রগুলোর বর্ণনাই হবে ইসলামের ইতিহাসের তৃতীয় খণ্ড। এ পরিচ্ছেদে পূর্বাঞ্চলীয় কোন কোন রাষ্ট্রের বর্ণনা এখনো দেয়া হয়নি। যেমন ঃ

হাশ্‌শাশীনদের ইসমাঈলী রাজত্ব

হযরত ইমাম জা'ফর সাদিকের পুত্র মূসা কাযিমকে ইসলাম আশারী শিয়ারা তাঁর স্থলাভিষিক্ত ইমামরূপে মান্য করে। কিন্তু ইমাম মূসা কাযিমের এক ভাই ছিলেন ইমাম ইসমাঈল। যারা মূসা কাযিমের পরিবর্তে তাঁর ভাই ইসমাঈলকে ইমামরূপে গণ্য করেন, তাদেরকে বলা হয় ইসমাঈলী শিয়া। উবায়দীদের রাজত্ব ছিল ইসমাঈল শিয়াদের সব চাইতে বড় রাজত্ব। ইসমাঈলীয়া তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে সর্বদা গোপন তৎপরতা এবং রহস্যঘেরা ষড়যন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করেছে। উবায়দী সালতানাত গোড়া থেকেই নিজেদের আকীদা-বিশ্বাসের প্রচারার্থে একটি গোপনীয় বিভাগ চালু করে রেখেছিল। এই বিভাগের মাধ্যমেই তারা শিয়া প্রচারকদেরকে শুধু যে নিজেদের অধিকৃত এলাকাসমূহেই প্রেরণ করতো তাই নয়, অন্যান্য রাষ্ট্রেও প্রেরণ করতো। সে সব প্রচারক, ওয়ায়েয, দরবেশ ও ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে সমস্ত ইসলামী রাষ্ট্রে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। তারা লোকজনকে ইসমাঈলী আকীদা-বিশ্বাস ও শিক্ষা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতো। তাদের কুফরী আকীদাসমূহ ছিল অত্যন্ত বিপজ্জনক। কুরআন শরীফকে তারা আমল করার যোগ্য গণ্য করতো না। তারা ইসমাঈল ইব্‌ন জা'ফর সাদিককে নবী বলে মান্য করতো এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সমমর্যাদাসম্পন্ন বলে ধারণা করতো। তারা ইসমাঈলের পুত্র মুহাম্মদ মকতুমকেও নবী বলে বিশ্বাস করতো। তাদের মতে ইমামদের সংখ্যা ছিল সাত। উবায়দী রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতাকে তারা সপ্তম ইমাম বলে মান্য করতো এবং উবায়দী সুলতানদের আনুগত্যকে মুক্তির পথ বলে প্রচার করতো। তাদের এ প্রচার ও প্রচেষ্টা উবায়দী রাজত্বের পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক প্রতিপন্ন হয় এবং তাদের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করে।

হাসান ইব্‌ন সাব্বাহ নামক এক ব্যক্তি ছিল রে-এর অধিবাসী। তার বংশ সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে। কেউ বলেন, সে ছিল আরব বংশোদ্ভূত। তার পূর্বপুরুষরা ইয়ামান থেকে আগমন করেছিলেন। আবার কেউ বলেন ঃ সে বংশগতভাবে ছিল অগ্নিপূজক। হাসান ইব্‌ন সাব্বাহর পিতা এবং বংশের লোকজন শিয়া আকীদা-বিশ্বাসে বিশ্বাসী ছিল। হাসান ইব্‌ন সাব্বাহ নিশাপুরে শিক্ষা লাভ করে। সে উমর খাইয়াম, আল্‌প আরসালান ও মালিক শাহের প্রধানমন্ত্রী নিযামুল মুল্‌ক তূসীর সহপাঠি ছিল। সে ছিল অত্যন্ত প্রতিভাধর এবং আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন ব্যক্তি।

মুসতানসির উবায়দীর আমলে হাসান ইব্‌ন সাব্বাহ মিসরে গিয়ে উপনীত হয়। সেখানে সে প্রভূত সম্মান লাভ করে। এক বছরেরও অধিককাল ধরে সে মিসরের শাহী মেহমান এবং

মুসতানসিরের পারিষদরূপে সেখানে অবস্থান করে। সেখানে সে ইসমাঈলী মতাদর্শে পরিপক্ব জ্ঞান লাভ করে এবং মুসতানসিরের হাতে বায়আত হয়। সে উবায়দী রাজ সরকারের উচ্চ পর্যায়ের একজন প্রচারক বলে গণ্য হয়।

হাসান ইব্ন সাব্বাহ যখন ইসমাঈলী প্রচারকরূপে মিসর থেকে রওয়ানা হয় তখন সে মসতানসিরকে জিজ্ঞেস করে, আপনার পর আমরা কার আনুগত্য করবো আর কে আমাদের ইমাম হবেন? জবাবে মুসতানসির বলেন যে, তাঁর পরে তাঁর পুত্র নাজ্জার ইমাম হবেন। এজন্যে হাসান ইব্ন সাব্বাহ প্রতিষ্ঠিত দলকে নাজ্জারিয়া জামাআত বলা হয়ে থাকে। মিসর থেকে ইরাক ও ইরানে ফিরে হাসান ইব্ন সাব্বাহ বিভিন্ন শহর ও জনপদে অল্পদিন করে অবস্থান করে লোকজনকে তার মতাদর্শে দীক্ষিত করতে থাকে। এখানে প্রথম থেকেই ইসমাঈলী দাঈদের চেষ্টায় অনেক শিয়া এবং অ-শিয়া ইসমাঈলী মতের অনুসারী হয়ে গিয়েছিল। এজন্যে হাসান ইব্ন সাব্বাহকে তার অনুসারী ও সাহায্যকারী জুটিয়ে নিতে তেমন কোন বেগ পেতে হয়নি বা এজন্যে তার তেমন কোন সময়ও লাগেনি। মালিক শাহের পক্ষ থেকে ইস্পাহান ও কোহিস্তান প্রদেশের শাসক হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন মাহ্দী উলুভী। হাসান ইব্ন সাব্বাহ মাহ্দী উলুভীর নিকট থেকে ইবাদতখানা নির্মাণের জন্যে আলমূত দুর্গ ক্রয় করে নেয়। এ দুর্গে বসে সে তার অবস্থানকে মযবুত করে নেয়। সে তার অনুসারীদেরকে এখানে সমবেত করে এবং আশেপাশের মূর্খ ও দুর্বল লড়াকু গোত্রসমূহে নিজের প্রভাব বিস্তার করে নিজের রাজত্বের গোড়াপত্তন করে। নিজেকে সে শায়খুল জাবাল নামে সুবিদিত করে তোলে। সে অনেক অদ্ভুত ধর্মবিশ্বাস ও আমলের উদ্ভাবন করে লোকজনকে এগুলোতে দীক্ষা দিতে থাকে। সে একটি জানবাজ দল গঠন করে। এ জানবাজরা অনেক বড় বড় কাজ সম্পাদন করে। দুনিয়ার বড় বড় রাজা-বাদশাহ্, উযীর ও পণ্ডিত ব্যক্তিদেরকে সে এসব আত্মঘাতী জানবাজ অনুসারীদের মাধ্যমে খতম করে দিত। হাসান ইব্ন সাব্বাহ তার মশহুর 'দাঈ' কাইয়া বুযুর্গ উমেদকে তার উত্তরাধিকারী মনোনীত করে। এরপর কাইয়া বুযুর্গ উমেদের বংশধরদের রাজত্ব কয়েক পুরুষ ধরে চলতে থাকে। অবশেষে ৬২৫ হিজরী (১২২৭ খ্রি.)-তে হালাকু খাঁর হাতে তার রাজত্বের অবসান ঘটে। হাসান ইব্ন সাব্বাহ প্রতিষ্ঠিত এ রাজত্ব কোহিস্তানে ৪৮৩ হিজরী (১০৯০ খ্রি.) থেকে ৬৫৫ হিজরী (১২৫৭ খ্রি.) পর্যন্ত পৌনে দুশ বছর টিকেছিল। এই ইসমাঈলী রাজত্বের দাপট গোটা বিশ্বে কায়েম ছিল এবং বড় বড় রাজা-বাদশাহ্ তাদের ফিদায়ী বা জানবাজদের ভয়ে আতঙ্কিত থাকতেন। কেননা তারা সব সময় ধোঁকা দিয়ে এবং শত্রুকে একাকী অবস্থায় আক্রমণ করতো।

সিরিয়ায় ঈসায়ী ক্রুসেড হামলা

ইউরোপের ঈসায়ীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে ৪৯০ হিজরী (১০৯৬ খ্রি.) থেকে মুসলমানদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করতে থাকে। ঈসায়ী পাদ্রীরা গোটা ইউরোপে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজনাকর প্রচারণা চালিয়ে খ্রিস্টান সমাজে ধর্মান্ধতার জোয়ার বইয়ে দেয়। তারা সিরিয়া মুসলমানদের দখলমুক্ত করাকে উচ্চস্তরের ধর্মীয় খিদমত ও মুক্তির উপায় বলে আখ্যায়িত করে। ঈসায়ীদের এ আক্রমণের ধারা দীর্ঘ তিনশ বছর ধরে অব্যাহত ছিল। ইউরোপের সমস্ত খ্রিস্টান রাজা-বাদশাহ্ তাদের সমবেত শক্তি সার্বিকভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে নিয়োগ করে

এবং নিজেরা সশরীরে ঈসায়ী হামলাকারীদের সাথে সিরিয়া অভিমুখে রওয়ানা হতে দ্বিধাবোধ করেন নি। এসব হামলা ও যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসের এক আকর্ষণীয় অধ্যায় এবং এ কাহিনীটি একটি অধ্যায়ে ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হবে। এসব ক্রুসেডের যে অংশের সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ূবী কর্তৃক খ্রিস্টানদের মুকাবিলার কথা বর্ণিত হয়েছে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও চিত্তাকর্ষক।

এশিয়ায় মোগল রাজত্ব

চীনের উত্তরাঞ্চলের পার্বত্য এলাকা থেকে চেঙ্গিস খানের নেতৃত্বে মোগল বা তাতারীগোষ্ঠী পশ্চিম দিকে রওয়ানা হয়ে তুর্কিস্তান, মাওরাউন নাহর, খুরাসান, আযারবায়জান, ইস্পাহান, আফগানিস্তান, পারস্য, ইরাক, সিরিয়া, এশিয়া মাইনর, রুশ ও অস্ট্রিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল ভূখণ্ডকে হিজরী সপ্তম শতকের শুরুতেই তাদের আক্রমণ ও লুটপাটের শিকারে পরিণত করে। তারা শত শত রাজত্বের অবসান ঘটায় এবং শত শত রাজবংশকে সমূলে উৎখাত করে। সপ্তম হিজরী শতকের মধ্যভাবে ৬৫৬ হিজরী (১২৫৮ খ্রি.)-তে হালাকু খান বাগদাদ ধ্বংস করে এবং বাগদাদের শেষ আব্বাসীয় খলীফা মুসতাসিম বিল্লাহ্কে হত্যা করে। এ বিবরণ ইতিপূর্বেই দেয়া হয়েছে। ৬২৪ হিজরী (১২২৬ খ্রি.)-তে চেঙ্গিস খানের মৃত্যুর পর মোগল সাম্রাজ্য কয়েক খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়ে। চেঙ্গিস খানের বংশধরদের একটি অংশ চীনের শাসনক্ষমতা লাভ করে। একটি অংশ তুর্কিস্তান ও মাওরাউন নাহরে তাদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করে এবং আরেকটি অংশ খুরাসান ও ইরানে তাদের শাসন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। অপর এক অংশ কাস্পিয়ান সাগরের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলে রাজত্ব কায়েম করে। সেগুলোর মধ্যে হালাকু খান কর্তৃক ইরান ও খুরাসানে প্রতিষ্ঠিত মোগল রাজত্বটি সবিশেষ গুরুত্ববহ। স্বল্প সময়ের মধ্যে অধিকাংশ মোগল রাজত্ব মুসলিম রাজত্বে রূপান্তরিত হয়। অন্য কথায়, মোগলরা ইসলাম গ্রহণ করে এবং ইসলামের সেবায় আত্মনিয়োগ করে। দুশ বা পৌনে দুশ বছর পর এশিয়া মহাদেশে মোগলদের রাজত্বসমূহ ক্রমান্বয়ে দুর্বল হয়ে নিশ্চিহ্ন হতে থাকে আর সেগুলোর স্থলে গড়ে উঠে ইরান, ইরাক, খুরাসান ও মাওরাউন নাহরের স্থানে স্থানে অসংখ্য ক্ষুদ্র রাজ্য।

৮০০ হিজরীর (১৩৯৭ খ্রি.) দিকে মোগলদের পতন ও ধ্বংসের যুগে তৈমুর নামক এক ব্যক্তি তাদের নেতা হন। তিনি উপর্যুপরি রাজ্য দখল দ্বারা গোটা এশিয়া মহাদেশে তোলপাড় সৃষ্টি করেন এবং বিশ্ববাসীর মানসপটে চেঙ্গিস খাঁর বিজয় অভিযানের দৃশ্য আবার জাগিয়ে তোলেন। তৈমুর যেহেতু মুসলমান ছিলেন, তাই তার হাতে ধ্বংস ও হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত হলেও চেঙ্গিস খাঁর হামলা ও হত্যাযজ্ঞের তুলনায় তা অনেকটা নিয়ম মাফিক ও মার্জিত ছিল। তৈমুরের বংশধররা চেঙ্গিয খাঁর বংশধরদের অধিকৃত রাজ্যসমূহের সব ক'টাই নিজেদের করতলগত করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চেঙ্গিস খাঁর বংশধরদের যেভাবে পতন ঘটেছিল তৈমুরের বংশধরদেরও সেইভাবে পতন ঘটে। চেঙ্গিয খাঁর বংশধররা যতকাল ধরে এশিয়ার রাজ্যসমূহে রাজত্ব করেছিল প্রায় ততটা সময়ই তৈমুরের বংশধররাও রাজত্ব করে। অবশেষে ইরাক ও তুর্কিস্তান প্রভৃতি রাজ্যে তৈমুরী মোগল রাজত্বের অবসান ঘটলে তৈমুরের বংশধরদের মধ্যে বাবর নামক একব্যক্তির জন্ম হয়। তিনি ভারতবর্ষ ও আফগানিস্তানে এক শক্তিশালী সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন যা সুদীর্ঘকাল ধরে এ বংশ শাসন করে।

তুরস্কের উসমানী সাম্রাজ্য

গাজের তুর্কীদের উল্লেখ উপরে কোথাও করা হয়েছে। এ গাজ তুর্কীদের অধিকাংশ গোত্রকেই সালজুকীরা আর্মেনিয়া ও কাস্পিয়ান সাগরের উপকূলের দিকে ঠেলে দেয়। এদেরই একটি গোত্র উসমানী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সৌভাগ্য ও গৌরব অর্জন করে। যখন সালজুকীদের উত্থানের যুগ শেষ হয় এবং তাতারীরা এশিয়ার বিভিন্ন দেশে উৎপাত শুরু করে দেয় তখন এশিয়া মাইনরের মুসলিম অধিকারভুক্ত এলাকায় দশ-বারটি ছোট ছোট রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। ঐ সব রাজ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সালজুকী শাহ্যাদারা বা তাদের ক্রীতদাসরা রাজত্ব করে আসছিল। এসব রাজত্বেরই একটি ছিল আর্মেনিয়া সীমান্তে অবস্থিত এবং সেটিই ছিল উল্লিখিত তুর্কীগোত্রের সর্দার সুলায়মান খানের রাজ্য। ৬২১ হিজরী (১২২৪ খ্রি,)-তে যখন মোগলরা আলাউদ্দীন কায়কোবাদ সালজুকীর রাজ্যের উপর আক্রমণ চালায়, তখন সুলায়মান খান এবং তাঁর পুত্র এবং তুগরিল তাঁর সমগোত্রীয় তুর্কীদেরকে সাথে নিয়ে মোগলদের মুকাবিলায় আলাউদ্দিন কায়কোবাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসেন। এই সাহায্য ছিল অত্যন্ত সময়োপযোগী। আর এর ফলশ্রুতিতে মোগলদেরকে পরাস্ত হয়ে রণক্ষেত্র থেকে পালাতে হয়। এজন্য আলাউদ্দীন কায়কোবাদ সালজুকী সুলায়মানকে খিলাত দিয়ে আপন সেনাবাহিনীর সেনাপতির পদ দান করেন এবং তাঁর পুত্র আর তুগরিলকে আঙ্গোরা শহরের সন্নিকটে একটি বিশাল জায়গীর প্রদান করেন। সে সময় আলাউদ্দীন সালজুকীর রাজধানী ছিল কাউনিয়ায়। আর তুগরিলের জায়গীরটি ছিল একেবারে রোম সাম্রাজ্যের সীমান্ত ঘেঁষে। আর তুগরিল তাঁর পিতার মৃত্যুর পর নিজ রাজ্যের পরিধি আরও বিস্তৃত করেন। কিছু এলাকা তিনি কাউনিয়ার সুলতানের পক্ষ থেকে ইনাম ও উপহার হিসেবে প্রাপ্ত হন আর কিছু এলাকা ঈসায়ীদের নিকট থেকে ছিনিয়েও নেন। এভাবে তুগরিলের একটি উল্লেখযোগ্য রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। মোগলরা এশিয়া মাইনরের এই ছোট ছোট রাজ্যগুলোর ব্যাপারে কোনরূপ নাক না গলিয়ে তাদেরকে তাদের মত থাকতে দেয়। ৬৪১ হিজরী (১২৪৩ খ্রি.)-তে আলাউদ্দীন কায়কোবাদের পুত্র গিয়াসুদ্দীন কায়খসরুকে মোগলদের করদরাজ্যে পরিণত হতে হয়। ৬৫৭ হিজরী (১২৫৮ খ্রি.)-তে আর তুগরিলের পুত্র উসমান খান জন্মলাভ করেন। ৬৮৭ হিজরী (১২৮৭ খ্রি.)-তে আর তুগরিলের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র উসমান খান ত্রিশ বছর বয়সে পিতার দেশটির শাসক হন। কাউনিয়ার বাদশাহ্ গিয়াসুদ্দীন কায়খসরু সালজুকী তাঁর কন্যার সাথে উসমান খানের বিয়ে দেন এবং তাঁর সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি পদেও অধিষ্ঠিত করেন। ৬৯৯ হিজরী (১২৯৯ খ্রি.)-তে গিয়াসুদ্দীন কায়খসরু সালজুকী নিহত হলে সালজুকী তুর্কীরা সবাই মিলে উসমান খানকে কাউনিয়ার সিংহাসনে বসায়। এভাবে প্রাচীন রাজত্ব ছাড়া কাউনিয়াও উসমান খানের কর্তৃত্বাধীন হয়। উসমান খান তখন সুলতান উপাধি ধারণ করলেন। তিনিই হচ্ছেন উসমানী খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা উসমান খান—যাঁর নামে উসমানী সাম্রাজ্যের নামকরণ হয়। উসমানী সুলতানরা স্বল্পকালের মধ্যেই সমগ্র এশিয়া মাইনরে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে রোম সম্রাটকে এশিয়া ভূখণ্ড থেকে সম্পূর্ণভাবে হটিয়ে দেন। ৬২৩ হিজরী (১২২৬ খ্রি.)-তে উসমানী সুলতান আদ্রিয়ানোপল অধিকার করে এ শহরকেই তাঁর রাজধানী করেন এবং ত্রিপোলী প্রদেশ দখল করে ইউরোপ মহাদেশের দক্ষিণপূর্ব এলাকায় ইসলামী হুকুমত কায়েম করেন। রোম সম্রাট নতি স্বীকার করে সন্ধি করে তাঁর সাম্রাজ্যের অবশিষ্ট অংশকে উসমানী শক্তির কবল থেকে নিরাপদ করেন। তারপর উসমানী সুলতানগণ

ঈসায়ীদেরকে উপর্যুপরি পরাস্ত করে ইউরোপ ভূখণ্ডে তাঁদের অধিকার বিস্তৃত করতে শুরু করেন। অবশেষে ৭৯২ হিজরী (১৩৮৯ খ্রি.)-তে অস্ট্রিয়া, বুলগেরিয়া, বসনিয়া, হাঙ্গেরী প্রভৃতি ঈসায়ী রাষ্ট্রগুলোর বাদশাহরা সমবেত হয়ে এক বিপুল সংখ্যক সৈন্যবাহিনী নিয়ে একযোগে উসমানীয় সাম্রাজ্যের উপর আক্রমণ পরিচালনা করে। সুলতান মুরাদ খান উসমানী তাঁর স্বল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে কসোভা নামক স্থানে ঈসায়ীদের এ বিশাল বাহিনীর মুকাবিলা করেন এবং তাঁদের সম্মিলিত বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করে সমগ্র ইউরোপ মহাদেশকে প্রকম্পিত করে তোলেন। ৭৯৯ হিজরী (১৩৯৬ খ্রি.)-তে ফ্রান্স ও জার্মানীসহ সমগ্র ইউরোপ মহাদেশ সমবেতভাবে হামলা চালিয়ে উসমানীয় সাম্রাজ্যকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করে। নিকোপোলিস নামক স্থানে সুলতান বায়েযিদ ইব্ন মুরাদ খান তাঁদের মুকাবিলা করেন। বায়েযিদ ইয়ালদারিম নামে খ্যাত এই সুলতানের হাতে এবারও ইউরোপের সম্মিলিত বাহিনী পরাজিত হয়। এ লড়াইয়ে কুড়ি জনেরও বেশি সংখ্যক ঈসায়ী সর্দার বন্দীরূপে সুলতান বায়েযিদের সম্মুখে নীত হন। এঁদের প্রত্যেকেই ছিলেন এক একজন বাদশাহ্ অথবা শাহযাদা। এ শোচনীয় পরাজয় বরণের ফলে সমগ্র খ্রিস্টান জগতে আতঙ্ক ও নৈরাশ্যের কালো ছায়া নেমে আসে। পরাজিত ঈসায়ী সম্রাটগণ নিজ নিজ দেশে ফিরে গিয়ে ক্রুসেড যুদ্ধের বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেন। সমগ্র খ্রিস্টান জগত ধর্মীয় উন্মাদনায় উন্মত্ত হয়ে সুলতান বায়েযিদের মুকাবিলা করার জন্য পূর্বের চাইতে বেশি প্রস্তুতি নিয়ে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হয়। বায়েযিদ ইয়ালদারিম এবারও তাঁদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করে সমগ্র ইউরোপ থেকে বশ্যতার অঙ্গীকার গ্রহণ করেন। বাহ্যত রোমসম্রাট তখন ভীত-সন্ত্রস্ত ও জড়সড় হয়ে কনসটান্টিনোপলে চুপচাপ বসে থাকেন। কিন্তু গোপনে তিনি উসমানীয়দের বিরুদ্ধে ঈসায়ী ধর্মযোদ্ধাদের সাহায্য প্রেরণে একটুও ত্রুটি করেন নি। তাই বায়েযিদ ইয়ালদারিম এবার সর্ব প্রথম রোম সম্রাটকে সমুচিত শাস্তি দানের এবং গোটা বলকান উপদ্বীপ থেকে ঈসায়ী শাসনের সর্বশেষ চিহ্নটুকু মুছে ফেলতে সংকল্প করেন। তাঁর সংকল্প ছিল, এরপর তিনি গোটা ইউরোপ মহাদেশ জয় করে গোটা বিশ্ব থেকে চিরতরে ঈসায়ীদের মূলোচ্ছেদ করবেন। কিন্তু রোম সম্রাটের উপর তাঁর হামলা করতে না করতেই এশিয়া মহাদেশ থেকে খবর এসে পৌঁছে যে, এক বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে তৈমুর বায়েযিদ ইয়ালদারিমের এশিয়ান রাজ্যসমূহের উপর আক্রমণ চালিয়েছেন। তাই অগত্যা বায়েযিদকে কাল বিলম্ব না করে এশিয়া মাইনরে প্রত্যাবর্তন করে তৈমুরের মুকাবিলা করতে হয়।

৮০৪ হিজরী (১৪০১ খ্রি.) আঙ্গোরায় উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধে তৈমুর বিজয়ী হন এবং বায়েযিদ বন্দী হন। এভাবে ইউরোপ মহাদেশ ধ্বংসযজ্ঞের হাত থেকে রেহাই পায়। তারপর মনে হতো যেন, উসমানীয় সাম্রাজ্যের অবসান ঘটেছে। কিন্তু কয়েক বছর পর আবার উসমানীয় সাম্রাজ্য ঠিক তেমনিভাবে উন্নতির চরম শিখরে উন্নীত হয়, যেমনটি ছিল বায়েযিদ ইয়ালদারিমের আমলে। প্রায় পঞ্চাশ বছর পর সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মদ কনসটান্টিনোপল জয় করে বলকান উপদ্বীপ থেকে ঈসায়ীদেরকে সমূলে উচ্ছেদ করেন। তারপর সুলতান সালীম খান ইরানীদেরকে পরাস্ত করেন। মিসর জয় করেন এবং ইরাক ও আরব নিজ অধিকারভুক্ত করেন। এভাবে এক বিশাল ইসলামী সাম্রাজ্যের পত্তন করে ৯২২ হিজরী (১৫১৬ খ্রি.)-তে আব্বাসীয় খিলাফতের অবসান ঘটিয়ে তাঁদেরই স্থলে উসমানীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে, এ খান্দানের ইতিহাস অত্যন্ত চমকপ্রদ এবং মুসলমানদের জন্যে অত্যন্ত শিক্ষণীয়।

কাশগড়ে তুর্কী রাজত্ব

ফারগানার পূর্বাঞ্চলে যে সব তুর্কী গোত্র ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তারা সামানীয় রাজত্ব পতনমুখী হওয়ার পর নিজেদের স্বাধীন রাজত্বের পত্তন করে রাজত্ব ৩২০ হিজরী (৯৩২ খ্রি.) থেকে ৫৬০ হিজরী (১১৬৪ খ্রি.) পর্যন্ত টিকেছিল। তাঁদের মধ্যে আইলক খান তুর্কিস্তানের বিখ্যাত শাসক হন। তাঁর রাজধানী ছিল কাশগড়ে। তিনি ছিলেন গাজ তুর্কীদের অন্তর্ভুক্ত। উসমানী তুর্কীরা ছিলেন তাঁদেরই স্বদেশের লোক। সালজুকী তুর্কীদের অভ্যুত্থানের পর গাজ তুর্কীদের অধিকাংশই আর্মেনিয়া ও আযারবায়জানে চলে যান। সালজুকী তুর্কীরাও তাদেরই স্বদেশীয় এবং সমগ্রোত্রীয় ছিলেন। যে সমস্ত গোত্র পালিয়ে পশ্চিমে চলে যায় তারা কাস্পিয়ান সাগরের আশেপাশে নিজ নিজ রাজত্ব গড়ে তোলে। আর যাদেরকে পূর্বদিকে ঠেলে দেয়া হয়েছিল, তারা পূর্ব তুর্কিস্তান অর্থাৎ কাশগড়ে রাজত্বের পত্তন করে।

ভারতবর্ষে মুসলিম রাজত্ব

ভারতবর্ষের একটি প্রদেশ অর্থাৎ সিন্ধুদেশ হিজরী প্রথম শতকেই ইসলামী খিলাফতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। দীর্ঘকাল ধরে সিন্ধুর জন্যে খলীফার দরবার থেকে আমিল বা গভর্নর নিযুক্ত হয়ে আসতেন। তারপর আব্বাসীয় খিলাফতে দুর্বলতা দেখা দিলে তখন সিন্ধুদেশে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজত্বের পত্তন হয়। ক্রমেই ইসলামী রাজ্যসমূহের পরিধি সঙ্কুচিত হয়ে আসে। মাহমূদ গজনীর হামলার সময় পর্যন্ত সিন্ধুতে একটি ইসলামী রাজ্য বিদ্যমান ছিল। মাহ্‌মূদ গজনভী পাঞ্জাব ও মুলতান অধিকার করে ইসলামী রাজ্যভুক্ত করেন। তারপর যখন ঘোরীরা গজনভীদের স্থলাভিষিক্ত হলে তাঁরা সমগ্র উত্তর ভারত জয় করে ভারতবর্ষে স্বতন্ত্র ইসলামী রাজত্বের পত্তন করেন। ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম মুসলমান বাদশাহ ছিলেন কুতবুদ্দীন আইবেক। তিনি ছিলেন শিহাবুদ্দীন ঘোরীরা ক্রীতদাস। ক্রীতদাস রাজবংশের পর খিলজী রাজবংশ ভারতবর্ষে রাজত্ব করে। খিলজীদের পর তুঘলকরা রাজশক্তির অধিকারী হন। তুঘলক বংশের পর খিযির খাঁর বংশধররা রাজত্বের অধিকারী হন। এরপর লোদী বংশ রাজত্ব করে। লোদীদের পর মোগলরা হিন্দুস্থানে আসেন। কিন্তু শেরশাহ তাঁদেরকে বহিষ্কার করে আপন রাজত্ব কায়েম করেন। মোগলরা শেরশাহর বংশধরদের হাত থেকে হিন্দুস্থান কেড়ে নিয়ে পুনরায় নিজেদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। তারপর ইংরেজরা হিন্দুস্থানে আসে। উপরে উল্লিখিত মুসলমান রাজবংশগুলো দিল্লী ও আগ্রাতে বসবাস করতো। তাঁদের সমসাময়িককালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে আরও অনেক মুসলিম রাজবংশ রাজত্ব করে। যেমন বাহমনী রাজবংশ, গুজরাটী রাজবংশ, জৌনপুরী রাজবংশ, বাংলার রাজবংশ, মালোয়ার রাজবংশ। এসব রাজবংশের বিবরণ সম্বলিত ভারতবর্ষের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থে বর্ণিত হবে। সেখানেই গজনভী ও ঘোরী বংশের ইতিবৃত্ত আলোচনা করা হবে।

ইরাকে জালায়ের রাজত্ব

মোগল অর্থাৎ তাতারদের শক্তি নিস্তেজ হয়ে পড়ার সাথে সাথে মোগলদের ফৌজী সর্দাররা স্থানে স্থানে নিজেদের স্বাধীন রাজত্ব গড়ে তোলে। এদের মধ্যে ইরাকের জালায়েরদের রাজত্ব হচ্ছে অন্যতম। ৭৩৬ হিজরী (১৩৩৫ খ্রি.) থেকে ৮১৪ হিজরী (১৪১১ খ্রি.) পর্যন্ত তাঁরা ইরাকে রাজত্ব করেন। তাঁদের রাজধানী ছিল বাগদাদ। শেখ হাসান

বুযুর্গ জালায়ের ছিলেন এ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর পুত্র ৭৫৭ হিজরী (১৩৫৬ খ্রি.) স্বীয় পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ৭৫৯ হিজরী (১৩৫৭ খ্রি.)-তে তুর্কমেনদের হাত থেকে আযারবায়জান ও তাব্রীয ছিনিয়ে নেন। ৭৫৬ হিজরী (১৩৫৫ খ্রি.)-তে তিনি মুসেল ও দিয়ারে বকরকেও তাঁর রাজ্যভুক্ত করেন। ৭৪৮ হিজরী (১৩৪৭ খ্রি.)-তে মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র বায়েযীদ কুর্দিস্তানে এবং অপর পুত্র আহ্‌মদ জালায়ের ইরাক, আযারবায়জান প্রভৃতি প্রদেশে তাঁর স্থলাভিষিক্ত রূপে রাজত্বের অধিকারী হন। ৭৯৬ হিজরী (১৩৯৩ খ্রি.)-তে তৈমুর সুলতান আহ্‌মদ জালায়েরের গোটা রাজ্য দখল করে নেন। আহ্‌মদ জালায়ের পালিয়ে মিসরে গিয়ে সেখানকার মামলূক সুলতানদের আশ্রয়ে কয়েক বছর কাটান। এরপর তৈমুর সমরকন্দের দিকে ফিরে গেলে তিনি আবার নিজ রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করে পুনরায় তা অধিকার করেন। ৮১৩ হিজরী (১৪১০ খ্রি.)-তে আহ্‌মদ জালায়ের কারা ইউসুফ তুর্কমেনের যুদ্ধে নিহত হলে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র মাহ্ ওয়ালাদ বাগদাদের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। অবশেষে ৮১৪ হিজরী (১৪১১ খ্রি.)-তে কারা কায়ুনলী তুর্কমেনদের হাতে এ খান্দানের রাজত্বের অবসান ঘটে।

মুযাফ্‌ফারিয়া রাজত্ব

মোগল সুলতানদের দরবারে আমীর মুযাফ্‌ফর খুরাসানী ছিলেন একজন দুর্ধর্ষ সর্দার। তাঁর পুত্র মুবায়িয উদ্দীনকে মোগল বাদশাহ আবূ সাঈদ ৭১৩ হিজরী (১৩১৩ খ্রি.)-তে পারস্যের গভর্নর করে প্রেরণ করেন। ৭১৫ হিজরী (১৩১৫ খ্রি.)-তে পারস্যের সাথে কিরমানও সংযোজিত হয়। পারস্য ও কিরমানের শাসনভার হাতে নিয়ে তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করে বসেন। ৭৫৯ হিজরী (১৩৫৭ খ্রি.) পর্যন্ত এ বংশের রাজত্ব টিকেছিল। প্রসিদ্ধ ফার্সী কবি হাফিজ শিরাজী এ বংশেরই সুজা বাদশাহ্‌র দরবারে উচ্চ মর্যাদায় আসীন ছিলেন।

আযারবায়জানে কারাকোয়ুনলী তুর্কমেনদের রাজত্ব

এঁরাও জালায়ের খান্দানের মতো মোগল সৈন্যবাহিনীর সর্দার ছিলেন। এ খান্দান আযারবায়জানে নাহ্‌রাওয়ানের দক্ষিণের রাজ্যগুলোতে রাজত্ব করে। ৭৮০ হিজরী (১৩৭৮ খ্রি) থেকে ৮৭৪ হিজরী (১৪৭৯ খ্রি.) পর্যন্ত এঁদের রাজত্ব টিকেছিল। এ বংশের শাসকদের মধ্যে কারা ইউসুফ তুর্কমেন অত্যন্ত খ্যাতি লাভ করেন। আককোয়ুনলী তুর্কমেনরা তারপর তাদের হাত থেকে রাজত্ব ছিনিয়ে নেয়। কারাকোয়ুনলী শব্দের অর্থ হচ্ছে কালো মেষ। এঁরা নিজেদের পতাকায় কালো মেষের ছবি অংকন করতেন। এজন্যে তাঁদেরকে কারাকোয়ুনলী বলে অভিহিত করা হয়। অনুরূপভাবে আককোয়ুন্‌লী মানে শ্বেত বর্ণের ভেড়া যাঁরা শ্বেত ভেড়ার ছবি তাঁদের পতাকায় অংকন করতেন তাঁরা আককোয়ুনলী বলে অভিহিত হয়ে থাকেন।

আককোয়ুনলী বংশের রাজত্ব

আককোয়ুন্‌লী তুর্কমেনরাও দিয়ারে বকরের পার্শ্ববর্তী এলাকায় ৭৮০ হিজরী (১৩৭৮ খ্রি.)-তে নিজেদের রাজত্ব কায়েম করেন। ৭৮৪ হিজরী (১৩৮২ খ্রি.)-তে তাঁরা কারাকোয়ুন্‌লী তুর্কমেনদেরকে আযারবায়জান থেকে সম্পূর্ণ বে-দখল করে সমগ্র আযারবায়জান ও দিয়ারে বকরে তাদের রাজত্ব গড়ে তোলেন। কিন্তু ৯০৭ হিজরী (১৫০১ খ্রি.)-তে শাহ্ ইসমাঈল সাফাভী তাঁদের রাজত্বের বিলোপ সাধন করে সমগ্র রাজ্য দখল করে নেন।

সাফাভী রাজত্ব

৮০৪ হিজরী (১৪০১ খ্রি.)-তে আঙ্গোরা নামক স্থানে তৈমুর জয়যুক্ত হলে অনেক তুর্কীকে গ্রেফতার করে তৈমুর শায়খ আর্দাবেলীর খিদমতে হাযির হলেন। শায়খ সফীউদ্দীন নিজেকে ইমাম মূসা কাযিমের বংশধর বলে পরিচয় দিতেন, তিনি সুন্নী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। তৈমুর তখন তুর্কী কয়েদীদেরকে মুক্তিদান করেন। কয়েদীরা মুক্তি পেয়েই শায়খের হাতে বায়আত হয়ে যান এবং তখন থেকেই শায়খের খিদমতে অবস্থান করতে শুরু করেন। তৈমুর আর্দাবেল থেকে বিদায় হয়ে গেলেন, কিন্তু তুর্কীরা তাঁর খিদমতে রয়েই গেলেন। দেখতে দেখতে প্রচুর সংখ্যক তুর্কী শায়খের জন্যে আত্মত্যাগকারী খাদেমরূপে তাঁর চতুষ্পার্শ্বে জমায়েত হয়ে যায়। তাঁরা বংশানুক্রমে শায়খের বংশধরদের প্রতিও আনুগত্য প্রদর্শন করে যায়। এমন কি এক পর্যায়ে তারা শায়খের অধঃস্তন বংশধর ইসমাঈল সাফাভীকে নিজেদের বাদশাহ বলে ঘোষণা করে। ইসমাঈল সাফাভী কিন্তু শিয়া মতে বিশ্বাসী ছিলেন। ৯০৩ হিজরী (১৪৯৭ খ্রি.)-তে তিনি ইরানের কয়েকটি শহরে নিজ দখল প্রতিষ্ঠা করেন। ৯২০ হিজরী (১৫১৪ খ্রি.) সুলতান সালীম উসমানী তাঁকে তাব্রীয থেকে কুড়ি ফার্সং দূরে অবস্থিত খালেদরান নামক স্থানে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করেন এবং সাফাভী রাজত্বের কয়েকটি পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ নিজ রাজ্যভুক্ত করে নেন। তারপর তিনি মিসর ও সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করেন। ইসমাঈল সাফাভী এ পরাজয় বরণের পর আরও দশ বছরকাল জীবিত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বংশধররা ইরানে রাজত্ব করতে থাকেন। ১১৪৮ হিজরী (১৭৩৫ খ্রি.)-তে নাদির শাহ ইরানীর হাতে এ রাজত্বের অবসান না ঘটা পর্যন্ত তাদের রাজত্ব অব্যাহত ছিল। তারপর ইরান ও আফগানিস্তানে পাঠানদের রাজত্ব কায়েম হয়। তারপর ইরানে কাচার রাজত্বের সূচনা হয়। আফগানিস্তান এখনও পাঠানদের দখলভুক্ত আছে।

সামগ্রিক দৃষ্টিপাত

বিভিন্ন রাজবংশ ও ইসলামী রাজত্বের উপরোক্ত তালিকা অধ্যয়নের পর এ দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত হতে যাচ্ছে। তৃতীয় খণ্ডের পাঠকদের মস্তিষ্কে এর দ্বারা ইসলামী রাজ্যসমূহের ব্যাপারে একটি সুস্পষ্ট ধারণা অঙ্কিত হবে। পাঠক এর দ্বারা কোন্ কোন্ যুগে কোন্ কোন্ খান্দান কোন্ কোন্ দেশে রাজত্ব করেছেন সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারবেন। এই সামগ্রিক জ্ঞান লাভের পর আব্বাসীয় খিলাফতের অবসান পর্যন্ত তার পূর্ণ বিবরণ ও পতনের গতি সম্পর্কে পাঠক সম্যক ধারণায় উপনীত হতে সক্ষম হবেন। ভবিষ্যতে তৃতীয় খণ্ডে ঐ সব খান্দানের যে ইতিবৃত্তের বর্ণনা আসছে, সেগুলো অনুধাবন করতে এ অধ্যায়টির পাঠ যথেষ্ট সহায়ক হবে।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত (পুনর্মুদ্রণ)

ইফাবা (উন্নয়ন) ২০০৭-২০০৮/অঃ সঃ/৪৫৫৩—৩২৫০

অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ